লক্ষলক্ষরুচিমতী মহিলারা পছন্দ করেন
সুতরাং
আপনার কেশ প্রসাধনে আপনিও বেছে নেবেন ভেষজ-বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় কেশ তৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ : : কলিকাতা

দ মেরী
BRITANNIA
MARIE
BISCUITS
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট
BB-67

অপরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারিণী লীলা দেশাই মুখাবয়বকে নিখুঁত রাখবার জন্যে "ওটীনের" বিশেষত্বের প্রশংসা করেছেন ; সবাই অবশ্য আজ একথা স্বীকার করেন যে এদিক দিয়ে "ওটীনের" সত্যই তুলনা হয় না।

I always use Oatine Cream before retiring. It is so pleasant and soothing and cleanses my skin from anything left by dust or make up. I recommend it to all my friends.

L. G. Desai

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৫৪

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

প্রথম প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিংএর আগমনে হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনতা, ১৬। আমেরিকার ভারতীয়গণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত মিঃ আসফ আলি, ১৭। চিনির অভাবে কলিকাতার একটি বিশিষ্ট খাবারের দোকানের অবস্থা, ১৮। কলিকাতার জেনারেল মোহন সিং—'আই-এন-এ'র প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, ১৯। উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চলে প্রতিগৃহে খানা-তল্লাসীরত সৈন্যদল, ২০। বাঁকুড়া হিন্দু-মিলন-মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কলিকাতাবাসীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ২২। রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বকবির জন্মস্থানের বিশেষ সজ্জা, ২৩। ভারত সেবাশ্রম-সংঘ পরিচালিত বাঁকুড়া হিন্দু মিলন মন্দিরে রক্ষিদল পরিবৃত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২৪। ঢাকা 'সোনার বাংলার' সহকারী সম্পাদক স্বর্গত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ২৫। ওরিয়েন্টাল সেমিনরী স্কুলের প্রাঙ্গনে নববর্ষ উৎসবে বালিকাদের প্যারেড, ২৬। কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

শৈলবালা ঘোষজায়ার

করুণাদেবীর আশ্রম

যমুনা মেয়েটিকে চেনা শক্ত। সব বিষয়েই সে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে। পদস্খলিতা নারীদের প্রতিষ্ঠান "করুণাদেবীর আশ্রম"-এ তার আগমনও যেমন আকস্মিক—অন্তর্দ্ধানও তেমনি রহস্যাবৃত।—২৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

— ❁ এই পৃথিবী ❁ —

বিপরীত আদর্শের সংঘাতে মাঝে মাঝে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহাই এই গ্রন্থখানিতে দেখান হইয়াছে। দাম—৩৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

উ প নি বে শ

পৃথিবী বাড়িতেছে। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।

১ম পর্ব—২৲, ২য় পর্ব—২৲, ৩য় পর্ব—২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

ঝড়ো হাওয়া

প্রকৃতির ঝঞ্ঝার মত সংসার-ক্ষেত্রেও নিত্য ঝড় বহিতেছে। একটি মধুর ঝড়ের অপরূপ চিত্র এই গ্রন্থখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দাম—২৲

পঞ্চানন ঘোষালের

অপরাধ-বিজ্ঞান

দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন অপরাধীদের কথা ও কাহিনী বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গল্পের মত মনোজ্ঞ করিয়া বর্ণিত।

১ম খণ্ড—৩৲, ২য় খণ্ড—৩৲

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হা ই ফে ন

এই উপন্যাসে দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-পর্ব্বে যে চরিত্রটি হাইফেনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা অপূর্ব্ব।

দাম—২৲

আশালতা সিংহের

লগন ব'য়ে যায়

নব-প্রকাশিত ব্যঙ্গ-চিত্র। দাম—১৸০

মুক্তি ১৷৷০ ক্রন্দসী ১৷৷০ কলেজের মেয়ে ১৷৷০
অভিমান ১৷৷০ স্বয়ম্বরা ২৲ পরিবর্ত্তন ১৷৷০

অপরাজিতা দেবীর

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবনচিত্র

আনন্দবাজার বলেন: বইখানির কলেবর বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও পড়িতে ক্লান্তিবোধ হয় না। ঘটনাস্রোত এবং তাহা বর্ণনার বিশিষ্ট ভঙ্গী পাঠকের মনকে স্বচ্ছন্দে ভাসাইয়া লইয়া যায়। দাম—৫৲

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অ তী ত ব স্তু

এই অভিনব বইখানির বৈচিত্র্যময় গল্পগুলিতে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অলক্ষ্য যোগ-সাধনের অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

দাম—২৲

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

চীনের ড্রাগন

এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসখানির মধ্যে দেখিতে পাইবেন—সুবিখ্যাত চীনা রাজনীতিক লী হং চঙের বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার এক নবতম রূপ। দাম—২৷০

চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তীর

মায়ের ডাক

দেশব্যাপী গণজাগরণের যে লক্ষণ আজ প্রকাশ পাইতেছে—তাহার মূলে আছে স্বদেশপ্রেম, মায়ের ডাক। যুগোপযোগী গল্প-গ্রন্থ।

দাম—২৲

শান্তিসুধা ঘোষের

১৯৩০ সাল

একটি সালের যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী এই উপন্যাসখানির পাতায় পাতায় জড়াইয়া আছে—তাহা বিস্ময়াবহ। দাম—২৷০

গোলকধাঁধা

মানুষের পিয়াসী মন দেহ ও কৃষ্টির অমীমাংসিত গোলকধাঁধায় কিভাবে বিভ্রান্ত হয়, তাহারই পরিচয়। দাম—২৲

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকৃতির পরিহাস ২৲
মন পবন ২৲
যার যেথা দেশ ৪॥০
অজ্ঞাতবাস ৪॥০
কলঙ্কবতী ৪৲
দুঃখ মোচন ৪॥০
মর্ত্তের স্বর্গ ৪॥০
অপসরণ ৫৲
বিনুর বই ১॥০
জীবনশিল্পী ১।০
ইশারা ১।০
আমরা ১।০
নূতন রাধা (কবিতা) ১।০
আগুন নিয়ে খেলা ৩৲
পুতুল নিয়ে খেলা ২॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

লাবণ্য ৩৲ পাষাণ ৩॥০
নিশিথিনী ২॥০

ইলা দেবীর

ঘরে হল না খেলা ১৸০
লিকের মুঠি দেয় ভরিয়া ১৸০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য

পদব্রজা ৪৲
রমায়ু ৩॥০ যুদ্ধধারা ৪॥০
দ্বীপের রাণী ৩॥০

বুদ্ধদেব বসু

রা ওরা ও আরো অনেকে ৪৲
লো হাওয়া ৲ সানন্দা ১।০
রিবারিক ৩॥০ পরস্পর ৩॥০
লি পাখি ১॥০ বাসর ঘর ৩॥০

এস ওয়াজেদ আলি

ভাঙা বাঁশী ২৲

শ্রীজ্যোতীন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞান ও দর্শন ৩॥০

সুবোধ ঘোষ

শতভিষা ২৲
কালপুরুষের সাত পাঁচ ২॥০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সহরবাসের ইতিকথা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২॥০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান ৫৲ অন্তরাগ ৪॥০
বিদুষী ভার্য্যা ২॥০
যৌতুক ৪॥০ অমলা ৩॥০

বনফুল

মধ্যবিত্ত ১৲ নির্মোক ৪॥০
জঙ্গম ৩৲ বিদ্যাসাগর ৩৲
চতুর্দ্দশী ॥৶০

নবগোপাল দাস

ডলন্তি পঙ্খের বাঁশী ২॥০
হে আত্মবিস্মৃত ১॥০

নিরুপমা দেবী

অনুকর্ষ ৩॥০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মুক্তির আহ্বান ৩৲

ইসাডোরা ডানকান

আমার জীবন ২॥০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নূতন উপন্যাস যন্ত্রস্থ

বিবাহের চেয়ে বড় ৪॥০
য় যদি যাক
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বিধ্বস্ত দেশ ও বিপর্য্যস্ত সমাজের আলেখ্য। আগুনের অক্ষরে লেখা। দাম—তিন টাকা
কালো রক্ত
আকস্মিক ৩॥০ পলায়ন ৩॥০
নবনীতা ৩॥০ উর্ণনাভ ৩॥০
অমাবস্যা ১॥০ অন্তরঙ্গ ১॥০

শৈলবালা ঘোষজায়া

বিভ্রাট ২॥০ বিনীতাদি ১॥০

জিজি দেবী প্রণীত

যে শুভখনে মম ৩॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরা মাণিক জ্বলে ২৲

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবিন মাষ্টার ৩॥০
তারপর ৩৲ মর্ম্মকর্ম্ম ৩॥০
তরুণী ভার্য্যা ৩॥০
অগ্নি সংস্কার ২॥০
বেতারে বর ৩॥০ প্রহেলিকা ২॥০
[illegible] টাক ৩॥০

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

একটি বুদ্বুদ ২॥০
ভারতীয় প্রশ্ন ২৲
বাস্তবের ভূপৃষ্ঠা ২৲
যে ফুল না ফুটিতে ১॥০

অজয় দাশ গুপ্ত

পলাশীর পরে ১॥০

শচীন সেন

জননী ২৲ প্রলয় ১॥০

অন্নদামোহন বাগচী

প্রমত্ত পৃথিবী ১৲
কুমারী অনিন্দ্যা অঞ্জল ১৲

নজরুল ইসলাম

সঞ্চিতা ৫৲
নজরুল গীতিকা ২৲ অগ্নিবীণা ২।০
[illegible] ২৲

যোগেশ চৌধুরী

পতিব্রতা (নাটক) ১॥০

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

মাটির ঘর ২৲
বিশ বছর আগে ১৸০

মণীন্দ্রলাল বসু

রমলা ৩।০

যামিনী কর

আপটুডেট (নাটক) ৸০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

থার্ড ক্লাশ ২৲

পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বাণীকুমার

স্বরলিপিকা (১ম) ২॥০ (২য়) ২।০

কুমার শচীন দেববর্ম্মনের

সুরের লিখন ২॥০

আশালতা সিংহ

আবির্ভাব ১॥০ অমিতার প্রেম ২৲

মাত্র দশ মিনিটে
10 Saridon
ANALGESIC TABLETS
রিডন
সর্ব্বপ্রকার বেদনা নিরাময় করে

জন-কল্যানের
চিরস্থায়ী অধিকারের গৌরবে ধন্য!

লিলি বিস্কুট কোং :: কলিকাতা

খ নর কার্য্যে, রেলওয়ের কার্য্যে অথবা যে কোন নির্ম্মাণকার্য্যে আমাদের বেল্‌চা সব রকম চোট সহ্য করিবার মত উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাত-লৌহ দ্বারা তৈরী।

বাঙ্গলা ও আসামের জন্য সরবরাহকারী :

মেসার্স গোপীনাথ পাল এণ্ড সন্স,
২১০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
মেসার্স বাবুলাল সিংহ এণ্ড কোং,
৩৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মেসার্স বেস্‌কো এঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড সাপ্লাই কোং,
৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টাটার
এগ্রিকো যন্ত্রপাতি
কিনুন

প্রচারক : দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

নূতন রেকর্ড
শ্রীমতী গৌরী সেন-শ্রীকবিতা রায় অ্যাণ্ড পার্টি
GE 7067
সংগ্রামিকা
১ম ও ২য় ভাগ
কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের
'অভ্যুদয়' হইতে
GE 7071
(আধুনিক)
GE 7074
(পল্লীগীতি)
'রতন' বাণীচিত্র
হইতে
GE 7073
(যন্ত্র-গীতি)
কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ,
Columbia
কলম্বিয়া
MAGIC NOTES
TRADE MARK
দমদম বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী লাহোর

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময়

শশধর দত্তের উপন্যাস—দেহের ক্ষুধা—৩৲

শশধর দত্তের

- ভক্তি ধরণী ৩৲
- ব্যভিচারীর প্রত্যাবর্ত্তন ৩৲
- পাদপি গরীয়সী ২৷৷০
- আগুন ও মেয়ে ২৷৷০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

- সাঁঝের প্রদীপ ২৷৷০
- ঝড় ও বিহঙ্গ ২৷৷০
- লোর ধরণী ২৷৷০
- ভয়ের দোলা ২৷৷০
- মাটির মায়া ২৲
- দীপের আলো ২৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

- রাহুগ্রস্ত শশী ২৷৷০
- ব নায়িকা ২৷৷০
- অনেক দূরে ১৲

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের

- হাওয়া বদল ২৲

পূর্ণশশী দেবীর

- অভিশপ্তা ১৷৷০

আশালতা সিংহের

- সহরের মোহ ২৲

শৈলবালা ঘোষজায়ার

- বিনির্ণয় ২৲
- অরু ২৲
- গঙ্গাপুত্র ২৲
- অভিশপ্ত সাধনা ৩৷৷০
- রঙীন ফানুস ৩৲
- স্নিগ্ধা ২৷৷০ অবাক ২৲

যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের

- সাধের কাজল ২৷৷০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

- দেউলিয়ার জমা খরচ ২৲
- বিয়ের ফুল (২য় সং) ২৲
- স্রোতের ফুল (২য় সং) ২৷৷০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

- জীবনের জটিলতা ২৲
- ধরাবাঁধা জীবন ১৷৷০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

- অপরিচিতা ৩৲
- মুক্তি-মণ্ডপ ২৷৷০

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের

- পতিতা ধরিত্রী (২য় সং) ২৷৷০

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

- হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি ১৲
- বারুম-বুরুম ১৲
- আমার ভূত দেখা ১৲

রহস্যরোমাঞ্চ য্যাড্‌ভেঞ্চার সিরিজ

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস।

প্রত্যেক উপন্যাসের মূল্য ১৲ টাকা

১। মৃত্যুচক্র
২। রক্ত-পিপাসা
৩। রহস্য-বিভীষিকা
৪। গুপ্ত-চক্রান্ত
৫। সয়তান-সঙ্গিনী
৬। বোজার খাড়ে বোঝা
৭। মৃত্যু-প্রহেলিকা
৮। মরণের মায়াজাল
৯। শত্রু-সংঘর্ষ
১০। মৃত্যু-ষড়যন্ত্র
১১। খুনের-জের
১২। রক্ত-তাণ্ডব
১৩। মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী
১৪। পিশাচব্যাঘ্রের জাল
১৫। চীনাদস্যুর ইন্দ্রজাল
১৬। জীবন্ত-কঙ্কাল
১৭। পরীর পাহাড়
১৮। দস্যু-মায়াবী
১৯। খুনের নেশা
২০ রক্ত-লোলুপ
২১ মৃত্যুরূপ
২২ নীল সাগরে রক্ত-লীলা
২৩ ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্ত
২৪ ফিরকথ্ কলম
২৫ মৃতের প্রতিশোধ
২৬। মরণজয়ী
২৭। খুন ডাকাতি গুম
২৮। পিশাচিনী
২৯। দস্যুরাজ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন ধরণের এ্যাডভেঞ্চার

উপন্যাস

১। অর্থমনর্থম্
২। আরামবাগ
৩। ইরাবতী
৪। ঈপ্সা
৫। উপকণ্ঠ
৬। ঊর্ণা
৭। ঋষি-মশাই
৮। "৯"কার

নবরূপ গ্রন্থ। অভিনব রচনাকৌশল। ...ইম-নভেল নূতনতর ঘটনার সমাবেশ।

...্যক উপন্যাস—মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক—[illegible] ৫০, [illegible] কলিকাতা

মুসলীম লীগ কী চায়?

॥ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ॥

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার শুধু জোরালো যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাই নয়, সমাধানের ইঙ্গিতও আছে এ পুস্তকে।

আট আনা

জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

॥ শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী ॥

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্তাঙ্কিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আশ্চর্য শিল্পীকুশলতার সঙ্গে। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই।

তিন টাকা আট আনা

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

॥ বিজয়রত্ন মজুমদার ॥

পি, সি, এল ও বিমল রায়ের অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত নেতাজীর অমর কাহিনী। তিন টাকা

মিত্তির-বাড়ী

॥ আশাপূর্ণা দেবীর ॥

নবতম উপন্যাস

অনন্তকাল হতে যে সংঘর্ষ চলেছে প্রতি যুগে প্রতিটী জীবনে—সে সংঘর্ষ নূতন আর পুরাতনে, সেকাল আর একালে, এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব বিচিত্র চরিত্রে এবং বিস্তীর্ণ পরিবেশে জীবন্তরূপ গ্রহণ করেছে। কলকাতার ১৬ই আগষ্টের ঘটনা সংযোগে উপন্যাসের ব্যঞ্জনা আরো প্রখর হয়ে উঠেছে। তিন টাকা আট আনা

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ধবল (LEUCODERMA) যাঁহাদের বিশ্বাস এই রোগ সারে না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে একটি ছোট দাগ আরোগ্য করিয়া দিব, এজন্য মূল্য দিতে হয় না।

শ্রী তৈল মালিশে ছুলি, মেচেতা, বসন্ত ও ব্রণাদির কুৎসিত দাগ মিলাইয়া চর্ম্মের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনে। মূল্য ১ আউন্স ১৲ টাকা।

পক্ষাঘাত অবশ, শুক-ফুলা ও বেদনাযুক্ত বাত, গেঁটেবাত, সায়াটিকা, কম্পন প্রভৃতি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধে সম্পূর্ণ নিরাময়। মূল্য ৩৸৴০।

একজিমা বা কাউরের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ—"বিচর্চিকারী লেপ" ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য চুলকানির উপশম, সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য। মূল্য এক টাকা, নমুনা ছয় আনা মাত্র।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্ম্মরোগ চিকিৎসক—

পণ্ডিত এস, শর্ম্মা : (সময় ৩-৮) ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পত্র দিবার ঠিকানা—পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচই অব্যর্থ

দুরারোগ্য ব্যাধি, গ্রহবৈগুণ্য, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, কর্ম্মচ্যুতি বা কর্ম্মহীন, নৈরাশ্য, প্রণয়ভঙ্গ, ক্ষতি, অপমান, মামলা অকালমৃত্যু, বংশনাশ প্রভৃতি দূর করিতে দৈবশক্তিই একমাত্র উপায়। ১। নবগ্রহ কবচ দক্ষিণা ৫৲ ২। শনি কবচ ৩৲ ৩। ধনদা কবচ ৭৲ ৪। বগলামুখী কবচ ১৫৲ ৫। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ১৩৲ ৬। নৃসিংহ কবচ ১১৲। ৭। রাহু কবচ ৫৲ ৮। বশীকরণ কবচ ৭৲ ৯। সুধা কবচ ৫৲। অর্ডারের সঙ্গে নাম, গোত্র, সম্ভব হইলে জন্মসময় বা রাশিচক্র পাঠাইবেন। ইহা ভিন্ন অত্র ঠিকুজী, কোষ্ঠি গণনা ও প্রস্তুত হয়, যোটক বিচার, প্রশ্ন ও বর্ষফল গণনা, গ্রহশান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কার্য্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। পত্রে সবিশেষ জ্ঞাত হউন। ঠিকানা—অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ

পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

শৈলেন মজুমদারের

তোমার পতাকা যারে দাও ২৲

দেশপ্রেমমূলক নূতন উপন্যাস

বিভিন্ন পত্রিকার মতামত :

১। **যুগান্তর**—লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রত্যেকটী চরিত্রই স্বাভাবিকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের ভাষা ঝরঝরে; কোথাও আড়ষ্টতা নাই।

২। **দেশ**—লেখকের উপন্যাস রচনায় নূতন ব্রতী কিন্তু রচনায় শক্তির পরিচয় রহিয়াছে।

৩। **দিপালী**—শুধু যাঁহারা গল্পই পড়েন না তাঁহাদের নিকট এই উপন্যাসটির আবেদন ভিন্ন রকমের হওয়া স্বাভাবিক।

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

ভারত-বিখ্যাত রাজবৈদ্য

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ আবিষ্কৃত

যক্ষ্মা রোগের বীজাণুগুলি নষ্ট করিয়া শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ, অবিচ্ছেদী জ্বর, রক্তবমন, নৈশঘর্ম্ম, ফুসফুসের ক্ষত, অরুচি, পেটভাঙ্গা, বমি, রক্তহীনতা, দুর্বলতা ও ক্ষয় নিবারণ করিবার এমন ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : বি, বি, ৫০৩৯

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষের" উল্লেখ করিবেন

ONE POUND NETT
LIPTONS
WHITE LABEL
TEA
BY APPOINTMENT TO THE
লিপটন
বলতেই
ভালো চা
LTR-152 W

মালিকগণ—অধ্যক্ষ মথুরামোহন, লালমোহন ও শ্রীফণীন্দ্রমোহন

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

নূতন রেকর্ড
শ্রীসুকৃতি সেন ও শ্রীমতী গৌরী সেন
জাতীয়-গীতি
শ্মশানে কি নতুন ক'রে
শোণিত অর্ঘ্যে ভারতের মাটি
N 27682
শ্রীমতী বীণা চৌধুরী
আধুনিক
বকুলের পরবাসে
এখনও কি জেগে আছ
N 27683
শ্যামল গুপ্ত
আধুনিক
যে পথে তোমার
আমার ক্লান্ত বকুল
N 27684
আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ
পল্লী-গীতি
সে যেন কি করলো রে
তুমি কবে ছাড়িবা নাও
N 27685
HVK 30
"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"
দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
দিল্লী লাহোর

তিমির বরণ… সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

আষাঢ়—১৩৫৪
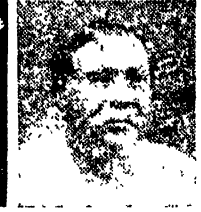
প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আষাঢ়ের অমারাত্রি।   শিবাকণ্ঠে ঘোষিল প্রহর
সূচিতে দ্বিতীয় যাম।   দিনব্যাপী বর্ষণের পর
ক্ষণিক ক্ষান্তিতে যেন বারিধর লভিল বিশ্রাম।
ঝিল্লীস্বনে শোনা যায় ভেকের সঙ্গত-স্বরগ্রাম
আঁধারের রঙ্গমঞ্চে।   মেঘভারে স্তম্ভিত আকাশ।
নক্ষত্রের নাহি দেখা।   রুদ্ধপ্রায় বিশ্বের নিঃশ্বাস ;—
বহে কি না বহে বায়ু—মূর্চ্ছার লক্ষণ যেন তার!
মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্দীপ্ত তপোবনে আশ্রমের দ্বার
বন্ধ সব চারিধারে—যেন-বা তারাও যোগাসনে
রুধি' যত চিত্তবৃত্তি—ধ্যানমগ্ন এ নিশি-নির্জ্জনে।
বশিষ্ঠ-কুটীরে শুধু একটী আলোক দেখা যায়
উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে, রশ্মি যার ফুটে না কুণ্ঠায়।

উঠিলা ব্রহ্মর্ষিবর সন্ধ্যাপূজা করি' সমাপন
রাত্রির বিশ্রাম লাগি' ; শ্রান্তদেহে ছাড়ি' দর্ভাসন
সম্ভাষিলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে—"অরুন্ধতি, কোথা অরুন্ধতি?

(পরক্ষণেই তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ায় মন্দ পদক্ষেপে দেবীর
পার্শ্বে গমন ও ভূমিতলেই উপবেশনান্তে)

—অন্ধকার কোণে হেথা একান্তে বসিয়া কেন সতী,
কুণ্ঠিত বিষণ্ণ মূর্ত্তি?   শোন' কথা, কহি পুনর্ব্বার,
পুত্রশোক বক্ষে পুষি' কতদিন কাটাইবে আর
অঞ্চলে বহ্নির মতো?—সময়ে সকলই যদি যায়,
তোমারই এ চিত্তভার—সেই কি অনন্ত এ ধরায়?
—জানো তো নিয়তিধর্ম্মে! দেহধর্ম্মে অবহেলা করি'
কেন তবে অনুক্ষণ দুঃখ পাও পুনঃপুনঃ স্মরি'
গত শোচনার কথা?—বহু কার্য্য মানবজীবনে,
ঋষি-পত্নী তুমি শুভে, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধরো মনে।

—ঊর্দ্ধে ঐ দেখ চেয়ে দিগ্বিদিক্-ঘেরা অন্ধকার,—
মুক্তকেশী মহামায়া সৃষ্টি জুড়ি' অধিকার যাঁর,
আজিকার কুহুরাত্রে ; তা বলিয়া ভাবিছ কি মনে
নব সূর্য্যোদয় আর হেরিবে না পুনঃ এ নয়নে?

—সবই হেথা ক্ষণস্থায়ী—বিচিত্র লীলা এ ধরিত্রীর,
সত্য-শুভ-সুন্দর সে ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অস্থির—
সকলই অনিত্য ভবে—সেই কথা ধ্রুব জানি' মনে
তাঁরই ধ্যানে আত্মজ্ঞান লাভ' কর কর্ত্তব্যসাধনে।"

শুনি' সে সান্ত্বনা-বাণী সতী-চক্ষে দ্বিগুণিত ধারা
বহিল নয়ন-পথে, নদী যেন সেতুবন্ধহারা!
—"একসঙ্গে শতপুত্র একে-একে গেল যে আমার!
মোর মতো অভাগিনী এ জগতে কে-বা আছে আর?
কহ, প্রভু,"——
রুদ্ধকণ্ঠে আর বুঝি ফুটিলনা স্বর,—
গুমরি' উঠিল যেন ভগ্ন বক্ষে বিদীর্ণ পঞ্জর!
—সেই ক্ষণে পর্য্যণ্যেরও আর্ত্ত বক্ষ গেল যেন ফাটি',—
ভীষণ বজ্রের শব্দে দিগ্দিগন্ত, নদী, গিরি, মাটি'—
কাঁপিল নিখিল পৃথ্বী বিদ্যুতে ধাঁধিয়া চরাচর!
মহাবীর বিশ্বামিত্র,—সেই শব্দে তাঁহারও অন্তর
উঠিল কাঁপিয়া—যেথা, লুকাইয়া গবাক্ষের নীচে
উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে মুহূর্ত্তের সুযোগ মাগিছে
চিরশত্রু বশিষ্ঠের হত্যাপণে চিত্ত করি' স্থির;
—মহাতপা বিশ্বামিত্র, মহারাজা যে-বা পৃথিবীর!

কহিল বশিষ্ঠ-ঋষি পত্নীশিরে স্নেহ-হস্ত রাখি',
'ভাবিওনা তুমি সতী, এ জগতে তুমিই একাকী
সহিছ এ অরুন্তুদ বহুপুত্র-বিয়োগের ব্যথা;—
ভেবে দেখ, ক্ষণকাল, তোমারই সম্মুখে পতিব্রতা,
আমিও যে অংশভাগী! এ জগতে সর্ব্বহারা যে-বা,
মায়াবদ্ধ,—সে জনও যে নিত্য করে নিয়তির সেবা।
তোমার অজ্ঞাত নয়—এ বিশ্বের দুঃখ-ইতিহাস;—
বিশ্বস্রষ্টা—জানো তুমি শাস্ত্রপাঠে, তিনিও যে দাস,
আপন নিয়মবদ্ধ বিধিনিষেধের চক্রতলে,
কর্ম্মাকর্ম্ম দুঃখ-সুখ-রহস্যের দুর্ব্বোধ্য শৃঙ্খলে।"

উত্তরিলা অরুন্ধতী, স্বামীপদে রাখিয়া নয়ন,
"কিন্তু কেন তুমি প্রভু, হেন শত্রু করিলে সৃজন?
সমগ্র ভারত যাঁরে শ্রেষ্ঠ মানে সভয়ে শ্রদ্ধায়,
অস্বীকার করি' সেই তপস্বীর ব্রহ্মর্ষি-আখ্যায়
করনি কি অসম্মান বারম্বার সভামধ্যখানে?
সে দুঃসহ অপমানে বন্ধুরও শত্রুতা জাগে প্রাণে!"

"সত্য, সত্য, অরুন্ধতি, বাক্য তব সত্য অনুমানি;—
ভক্তির না হোক্, তাঁর শক্তির তপস্যা-তেজ জানি।
তাই তো বন্ধুরে বরি' রাজর্ষির যোগ্য প্রতিষ্ঠায়
নন্দিত করেছি তাঁরে আর্য্যাবর্ত্তে তপস্বী-সভায়;—
তথাপি ব্রহ্মর্ষি বলি' সম্মানিতে পারিনি যে তাঁরে,
সেই অভিমানে বুঝি অনিষ্ট সাধিছে বারে বারে।"

উৎকর্ণ আগ্রহভরে বিশ্বামিত্র শুনিলেন কাণে
উভয়ের বাক্যালাপ বাতায়নমাত্র ব্যবধানে,
অন্ধকার অন্তরালে।
শত্রুর সে উগ্র তপোবল
শুনিয়া স্বামীর কণ্ঠে, তাঁরই লাগি' আতঙ্কবিহ্বল
কহিলেন পতিপ্রাণা—
"তবু কেন করনা স্বীকার
ব্রহ্মর্ষি মানিতে তাঁরে? শতপুত্র-নিধন আমার—
সেও এই কর্ম্মফলে! হায়, প্রভু, নিষ্ঠুর দেবতা,
সংশয় জাগে যে চিত্তে,—কহ এর রহস্য-বারতা,—
একান্ত অধীরা আমি"—
দুটি চক্ষে ভরি' এল বারি।
কহিলেন ঋষিবর সে বেদনা সহিতে না পারি',
"শোন' তবে অরুন্ধতী, বুদ্ধিমতী তুমি, আমি জানি;—
নহে মোর অহঙ্কার,—এ আমার অন্তরের বাণী—
—বিশ্বামিত্র মিত্র মোর; কে যে শত্রু,—বুঝিনাক তাই
সত্ত্বগুণে বঞ্চিত সে, তাই বুঝি ঈর্ষা ভোলে নাই!
তবু তার তপস্যার গুণমুগ্ধ—আমি তারে বড় ভালবাসি
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ তারে দেখিবারে তাই তো প্রয়াসী!
যে রাজসি শক্তি তার পূর্ণতার প্রতিবন্ধকামী,
তারই প্রতীকার তরে ব্রহ্মর্ষি বলিনি আজও আমি।

অদূরে বিপুল শব্দে কি যেন পড়িল ভূমিতলে;—
চমকি' উঠিলা দোঁহে সহসা বিস্ময়ে-কৌতূহলে!
মুহূর্ত্তে করিয়া চূর্ণ দুর্ব্বল সে উটজের দ্বার
উন্মাদের মতো যে-বা প্রবেশিল,—যোদ্ধবেশ তার,—
দস্যু বা তস্কর নয়, চকিতে চিনিল দোঁহে চোখে;—
—মহারাজ বিশ্বামিত্র! কুটীরের স্বল্প দীপালোকে।
বিমূঢ় দম্পতীদ্বয়ে মুহূর্ত্ত না দিয়া অবসর
বশিষ্ঠের পদতলে মুক্ত অসি রাখি' যুক্তকর

কহিলেন আগন্তুক,—"যে কথা শুনিনু আজ কাণে,
ধর্ম্ম জানে, কোনও ইচ্ছা নাই আর এ লাঞ্ছিত প্রাণে
বহিতে পাপের ভার। প্রভু মোর, এই অসি লহ,
নিজ হস্তে হানো মোরে—এ জীবন হয়েছে অসহ!
প্রভু মোর, বন্ধু মোর, এত দয়া তোমার অন্তরে
মহাশত্রু 'পরে তব!—নতুবা এ অভিশপ্ত করে
নাশিব এ ঘৃণ্য প্রাণ, শেষ পাপ সমাপ্তির লাগি'!
—অরুন্ধতি, মাতা মোর, পুত্রহারা হায় রে অভাগি!
— আর নয় গুরুদেব; অসহ্য এ জীবন-যন্ত্রণা
দূর কর এ মুহূর্ত্তে,—কৃতঘ্নের এ শেষ প্রার্থনা।"

কহিলা বশিষ্ঠ-ঋষি বিশ্বামিত্রে দিয়া আলিঙ্গন,
বন্ধুবর, আজি তুমি রাহুমুক্ত সূর্য্যের মতন
ব্রহ্ম-ঋষি একসঙ্গে, তপস্যার বিশ্বে তুমি রাজা।
একান্ত প্রার্থনা যদি,—এই তব দিনু
　　　　যোগ্য সাজা!
প্রিয়তম, আজি তুমি অনুতাপ-দহনে নির্ম্মল,
সত্ত্বগুণে বিভূষিত নবধর্ম্মে উদার উজ্জ্বল।

আষাঢ়ের অমারাত্রি পুনরায় ঘনতর মেঘে
ঘনাইল চারিধারে। বর্ষাসাথে বায়ু
　　　　বহে বেগে।
ঊর্দ্ধে মেঘাজিনে বসি' তপস্বী যতেক ব্যোমচর
ধারা-উপবাতধারী বৃষ্টিমন্ত্রে হইল মুখর।
বিদ্যুতের দীপ্ত আঁখি ঘন-ঘন দৃষ্টি মেলি' তার
মর্ত্যলোকে দেখে চাহি' যুগ্মমূর্ত্তি সত্য-সাধনার!

নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা

ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি

।।হ বাঙ্গালী হিন্দু দাবি করিয়াছে—বাঙ্গালার নিরাপত্তা, শান্তি, কল্যাণ ।বং সাংস্কৃতিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি পৃথক ।দেশ চাই। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালার যে-সকল অংশ ভারতীয় যুক্ত-।ষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাদের লইয়া এই নূতন প্রদেশ ঠিত হইবে। ইহার সীমা কি হইবে এবং কোন্ কোন্ অংশ ইহার ন্তর্গত হইবে, এসম্বন্ধে ইতিমধ্যেই জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গ মাইল। মোট লোকসংখ্যা •,৩০৬,৫২৫ জন। ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩৩,০০৫,৪৩৪ শতকরা ৫৪ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সবই হিন্দু) ২৭,৩০১,০৭১ শতকরা ৪৬ জন)।

মুসলমানেরা দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় জাতির অন্তর্গত হন—পৃথক জাতি। সুতরাং বাঙ্গালার যে অংশে এইরূপ মনোভাবাপন্ন ।কের সংখ্যাই বেশী, সেই অংশ হইতে হিন্দু-প্রধান অংশের বিচ্ছিন্ন ওয়া ছাড়া উপায় নাই। বঙ্গবিভাগের উদ্দেশ্য ইহাই। বাঙ্গালার তীয়তাবাদী হিন্দু-প্রধান অংশ বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই কটি প্রদেশ ও তাহার অংশ হইবে।

ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদেশ বিভাগের কোন পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে লে, প্রথমে আমাদের কতকগুলি মূলনীতি মানিয়া লইতে হইবে।

(ক) বিভাগের ভিত্তি:—শাসনবিভাগের যে-কোন বর্ত্তমান ইউনিট্, যেমন বিভাগ, মহকুমা বা থানাকে ভিত্তি করিয়া পার্টিসন করিতে হইবে।

(খ) ভৌগোলিক এক্য:—নবগঠিত প্রদেশ ভৌগলিক হিসাবে এক ও অখণ্ড দেশ হওয়া আবশ্যক, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা ও উহার জন্য অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা করা অসুবিধাজনক।

(গ) সামাজিক, ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক ঐক্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পার্টিসন করা উচিত। অধিকন্তু এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক; কারণ, অন্যথায় সমস্ত শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের অনর্থক প্রতিযোগিতাতেই অপব্যয়িত হইবে এবং জাতিগঠনমূলক কোনো কার্য্যই সম্ভবপর হইবে না।

(ঘ) জনবিনিময়ের প্রয়োজন যত কম হয় ভালো; কারণ বিরাট আকারে জনবিনিময় কোন দেশেই সফল হয় নাই।

(ঙ) সীমান্তে অবস্থিত কোন স্থানে শত্রুভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থান বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক সীমার তথাকথিত সুবিধার মোহে মুসলিম-বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলির মধ্যে কোন মুসলিম-প্রধান অঞ্চল রাখা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়; এবং এইরূপ স্থানগুলিকে ঐ সকল জেলা হইতে বাদ দেওয়াই সুবিধাজনক। তবে চতুর্দ্দিকে হিন্দু অঞ্চল

দ্বারা পরিবেষ্টিত মুসলিমপ্রধান অঞ্চল হিন্দু বঙ্গের মধ্যে আসিতে বাধ্য হইবে।

• (চ) বাঙ্গালা দেশের মোট জমি (৭৭,৪৪২-বর্গ মাইল) হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যা অথবা স্থাবর সম্পত্তির অনুপাত অনুসারে বিভক্ত হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জমিরই মালিক হিন্দু; সুতরাং সেই হিসাবে হিন্দুরই বেশী জমি পাওয়া উচিত। জনসংখ্যার দিক হইতে হিন্দু শতকরা ৪৭ জন; অতএব জমির বাঁটো ঐভাবেও হইতে পারে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুর পাওয়া উচিত ৩৬০০০ বর্গমাইল জমি।

(ছ) অস্থায়ী বিভাগের পরে সীমা নির্দ্ধারণ কমিটির দ্বারা উভয়-প্রদেশের সীমা স্থির করা চলিবে।

বঙ্গ বিভাগে বিশেষ অসুবিধা হইবে না, কারণ এই প্রদেশের পশ্চিমাংশে হিন্দু এবং পূর্ব্বাংশে মুসলমানরা অত্যধিক বাস করে। তাহার উপর হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্থানের বাকি অংশের সহিত সংযুক্ত; সুতরাং ইহাও বিশেষ সুবিধা।

পার্টিসনের ভিত্তি কি হইবে? বর্ত্তমান বিভাগ, জেলা বা থানাকে ভিত্তি করিয়া বঙ্গদেশ পার্টিসন করা যাইতে পারে। আমরা যদি বিভাগকে (ডিভিসন) ভিত্তি ধরি, তাহা হইলে মুসলিমপ্রধান রাজশাহী জেলা হইতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দাবি করিতে পারি না। আবার জেলাকে যদি ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ দুইটি জেলা পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলা বাদ পড়িবে, কারণ এইগুলিতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, একমাত্র যদি থানাগুলিকে পার্টিসনের ভিত্তি ধরা যায়। কয়েকটি জেলা মুসলিম-প্রধান হইলেও উহাদের অন্তর্গত কতক অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই সকল অঞ্চল পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুপ্রধান অংশের সংলগ্ন থাকায় সহজেই হিন্দুবঙ্গের অন্তর্গত হইতে পারে। সুতরাং মুসলিমপ্রধান থানাগুলিকে বাদ দিয়া এবং হিন্দুপ্রধান থানা সকল লইয়া এইরূপ জেলাগুলি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। নবগঠিত জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু-প্রধান জেলাসমূহ এবং পুনর্গঠিত জেলাগুলির সমন্বয়ে যে হিন্দুপ্রদেশ গঠিত হইবে তাহা হইবে এক অখণ্ড প্রদেশ। এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রদেশে বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৭০ জন হিন্দু থাকিবে। থানা-হিসাবে বিভাগ পরিকল্পনাও প্রকৃতপক্ষে জেলা অনুসারে বিভাগ; পার্থক্য শুধু এই যে ইহাতে কেবলমাত্র বর্ত্তমান হিন্দু-প্রধান জেলা-গুলিকেই ধরা হয় নাই, সেই সঙ্গে অন্য কতকগুলি জেলাকে পুনর্গঠিত করিয়া হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

থানাকে যদি পার্টিসনের ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে নূতন বাংলা প্রদেশের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্দ্ধমান বিভাগ এবং কলিকাতা শহর, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা তো আসিবেই, তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে মুসলিম-প্রধান আরও কয়েকটি জেলাও পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলা যেভাবে গঠিত তাহাতে সেখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এইজন্য শ্রীরাজাগোপালাচারী এইগুলিকে মুসলিম বঙ্গে ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই জেলাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এমন অঞ্চল আছে যেখানে হিন্দু সংখ্যায় অধিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার মধ্যে পশ্চিমাংশে হিন্দু-বেশী, আর পূর্ব্ব দিকে বেশী মুসলমান; ঠিক যেমন পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা। সুতরাং প্রদেশ বিভাগের পূর্ব্বে এইরূপ জেলাগুলিকেও বিভক্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমান জেলাগুলির গঠন দোষের জন্য হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা কেন অসুবিধা ভোগ করিবে? এইরূপ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকেও যদি পাকিস্থানে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবিচার করা হইবে। জেলাগুলির সীমা কৃত্রিম এবং অতীতে বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ জেলামধ্যস্থ হিন্দুপ্রধান থানাগুলি যাহাতে হিন্দু বঙ্গে যোগদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মুসলমান বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী জেলার মুসলিম-প্রধান থানাগুলি অনায়াসে পাকিস্থানে যাইতে পারিবে। এই সকল জেলার হিন্দু প্রধান থানাগুলির হিন্দু অধিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের যুক্তিবলে এই ন্যায়সঙ্গত দাবি নিশ্চয়ই করিতে পারে। জেলার সীমা-পরিবর্ত্তনের জন্য বড়লাট বা পার্লামেন্টের নিকট দরবার করিবার প্রয়োজন হইবে না। প্রাদেশিক সরকারই ইচ্ছা করিলে ইহা করিতে পারেন। নিয়ম-তান্ত্রিক কোন অসুবিধা ইহাতে নাই।

লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে বাংলার নিম্নলিখিত স্থানগুলি হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত হইবে:—

বর্দ্ধমান বিভাগ (সম্পূর্ণ)

প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে সমগ্র কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা; এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলি।

রাজসাহী বিভাগের মধ্যে:—সমগ্র দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা; এবং ইহা ছাড়া দিনাজপুর ও মালদহ জেলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলি।

ঢাকা বিভাগের মধ্যে:—ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চল।

উপরে লিখিত জেলাগুলিকে গ্রথিত করিয়া যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে, তাহা এক অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন দেশ হইবে। ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

নূতন বঙ্গ হইবে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রদেশ। ইহার উত্তরে থাকিবে হিমালয় ও ভুটান; পূর্ব্বে আসাম ও মুসলিম বঙ্গ; পশ্চিমে নেপাল, বেহার ও উড়িষ্যা; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

এই নূতন প্রদেশের সীমানা হইবে ৩৬,৬১০ বর্গ মাইল। মোট লোক সংখ্যা আড়াই কোটি; ইহার মধ্যে মাত্র ৭৬ লাখ মুসলমান (শতকরা ২৮ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সকলেই হিন্দু) এক কোটি চুরাশি লক্ষ (শতকরা ৭২ জন)।

এই সংখ্যায় বঙ্গদেশের যে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মুসলিমপ্রধান প্রদেশটিকে কালো করিয়া (shaded) দেখানো হইয়াছে। জেলার মধ্যে যে সংখ্যা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে খোলা (un boxed) সংখ্যাটি বর্ত্তমানে ঐ জেলায় হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত বুঝাইবে, এবং ঐ জেলাটিকে পুনর্গঠিত করিবার পর হিন্দুর জনসংখ্যার যে অনুপাত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে চতুষ্কোণের মধ্যে প্রদত্ত (boxed) সংখ্যা। যথা, উপস্থিত যশোহর জেলায় হিন্দু শতকরা মাত্র ৩৯ জন ; কিন্তু যশোহরের হিন্দু-প্রধান থানাগুলিকে যদি পৃথক করিয়া লওয়া যায়, সেই অংশে হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত হইবে প্রতি শতে ৫৪ জন।

থানা ভিত্তি করিয়া বিভাগের অসুবিধা এই যে, থানাগুলির সীমা অধিকাংশক্ষেত্রেই মনগড়া ; সুতরাং ইহাদের সংযোগে যে প্রদেশ সৃষ্ট হইবে তাহার সীমাও যে খুব সুবিধাজনক হইবে না তাহা ঠিক। তবু পার্টিসন তাড়াতাড়ি করিতে হইলে এই পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। বঙ্গ দেশের থানাসমূহের সীমা যুক্ত একখানি মানচিত্র এবং লোকগণনার কার্য্য বিবরণী (সেন্সস্ রিপোর্ট ১৯৪১) সম্মুখে থাকিলেই ইহা করা যাইবে। পরে সীমা নির্দ্ধারণ কমিটি উপযুক্ত সীমার ব্যবস্থা করিবেন।

বর্ত্তমান দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত হিন্দু প্রধান অঞ্চল লইয়া নূতন জেলা গড়িতে হইবে। এইরূপ করা হইলে ত্রিশ লক্ষের বেশী হিন্দু নূতন হিন্দু প্রদেশে আসিতে পারিবে। এইবার এই জেলাগুলিকে কিরূপে পার্টিসন করা সুবিধাজনক, তাহা আলোচনা করিব।

দিনাজপুর জেলা—দিনাজপুর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বেশী (৫০·৫%), যদিও তিনটির মধ্যে দুটি মহকুমায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই জেলার পূর্ব্বাংশে রংপুর সীমান্তে মুসলমানের বাস খুব বেশী। এই সামান্য স্থান ব্যতীত দিনাজপুর জেলার বাকি অংশে হিন্দু সংখ্যায় অধিক। কিন্তু তথাপি সারা জেলার জনসংখ্যা দেখিলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া যায়। এই ক্ষুদ্র অংশের মুসলমানদের ধরিলে এই সম্প্রদায় দিনাজপুরের হিন্দুর সংখ্যাকে ছাপাইয়া যায়। শুধু এই কারণে দিনাজপুর জেলা মুসলিম বঙ্গে যাইবে, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নয়। সদর মহকুমার মুসলিম-প্রধান চিরির বন্দর, পার্ব্বতীপুর, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট থানা বাদ দিতে হইবে ; এইগুলি মুসলিম বঙ্গে যুক্ত হইতে পারে।

পরিবর্ত্তিত দিনাজপুর জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি পড়িবে—বালুরঘাট ও ঠাকুরগাঁও মহকুমা (সম্পূর্ণ) ; সদর মহকুমার দিনাজপুর, বিরাল, বংশীহাটী, কুশমণ্ডি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও ইটাহার থানা। নূতন দিনাজপুরের আয়তন হইবে ৩,৪২৮ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ ; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৫৩ জন হিন্দু। যদি স্বাভাবিক সীমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পরে যমুনা নদীকে পূর্ব্ব সীমা ধরা চলিতে পারে।

মালদহ জেলা—মালদহ জেলা পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজশাহীর অংশ লইয়া সৃষ্ট হয় ; এবং ইহা ১৯০৫ পর্য্যন্ত বিহারের ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল। হিন্দু বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ভগ্নাবশেষ এই জেলায়। মালদহের উত্তর-পূর্ব্ব, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাংশে হিন্দুর ঘন বসতি। মুসলমান থানাগুলির অবস্থান এমন যে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। ইহাদেরই মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা এবং রতুয়া থানার চারিদিকে হিন্দু অঞ্চল ; সুতরাং ইহাদের হিন্দু বঙ্গে বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইবে। সমস্যা হইয়াছে এই কয়টি থানা—ভোলাহাট, কালিয়াচক, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ। এই থানাগুলি ঠিক মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গে যাত্রার পথে অবস্থিত। চাপাইনবাবগঞ্জ বাদ দিলেও বাকি চারটি থানা আমাদের চাই। ইহাদের মুসলিম জনসংখ্যা কেবলমাত্র আড়াই লক্ষ। মুসলিম-প্রধান থানাগুলির মধ্যে গোমস্তাপুর ও চাপাইনবাবগঞ্জ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র চাপাই-নবাবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর থানা বাদ দিয়া নূতন মালদহ গঠন করিলে তাহাতেও মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বেশী থাকিবে। দশলক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৪৮৬,৪৩৯ (শতকরা ৪৭ জন) হইবে হিন্দু। হিন্দু বঙ্গের অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য ভোলাহাট, কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ থানা নূতন মালদহের অন্তর্গত করায় এই সামান্য মুসলিম সংখ্যাধিক্য হইতেছে। এই তিনটি থানার আড়াই লক্ষ মুসলমানকে স্থানান্তর গমনের সুযোগ দিলে মালদহ জেলায় হিন্দুর অনুপাত বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ৫৮ জন হইবে।

গোদাগরিঘাট ও তাহার সন্নিকটস্থ রেল লাইন বাদ যায়, কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ হইতে মালদহ জেলায় যাইবার ইহাই পথ। সুতরাং এই রেলপথ নূতন মালদহের পূর্ব্ব সীমা হওয়া উচিত। সারা সেতু পথে উত্তর বঙ্গে যে রেল লাইন গিয়াছে তাহা মুসলিম বঙ্গের ভাগে পড়িবে ; সুতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

মুর্শিদাবাদ জেলা—মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমা ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে অল্পপরিসর স্থানে হিন্দুর বাস বেশী। মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গে যাইবার পথে পড়ে জঙ্গীপুর মহকুমা। এই মহকুমার মধ্যে সাগরদীঘি থানা বাদে সকল স্থানেই মুসলমানরা সংখ্যাধিক। দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের মধ্যে পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য এই অঞ্চলের ২ লক্ষ মুসলমানদের স্থানত্যাগের সুযোগ দিতে হইবে।

নবগঠিত মুর্শিদাবাদ জেলায় বসিবে :—কান্দি মহকুমা (সম্পূর্ণ) ; সমগ্র জঙ্গীপুর মহকুমা (মালদহের পথে অবস্থিত মুসলিম থানাগুলি সহিত) ; লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম ও জিয়াগঞ্জ থানা এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত বহরমপুর শহর ও বেলডাঙ্গা থানা। বেলডাঙ্গা সামান্য মুসলিম-প্রধান হইলেও নদীয়া হইতে মুর্শিদাবাদের পথে পড়ে।

এই নূতন জেলার জনসংখ্যা হইবে ১৩ লক্ষ ; তাহার মধ্যে হিন্দু ৭ লক্ষ (শতকরা ৫১ জন)। যদি জঙ্গীপুর মহকুমার মুসলিম অঞ্চলের ২৩৮, ৬৮৮ জন মুসলমান স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে

এই জেলার মুসলমান সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে এবং হিন্দু হইবে শতকরা ৬২ জন।

নদীয়ার পূর্ব্ব সীমার জন্য বর্ত্তমানে পলাশী হইতে লালগোলাঘাট পর্য্যন্ত রেলপথটি কাজে আসিতে পারে। সীমা নির্দ্ধারক কমিটি যদি নিযুক্ত হয় তখন ভৈরব নদকে পূর্ব্ব সীমা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলে বোধহয় সুবিধা হইবে।

নদীয়া জেলা—নদীয়া জেলার মধ্যে আছে বাঙ্গালার বারাণসী নবদ্বীপ। ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানেই হিন্দুর বাস বেশী। নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মহকুমায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং এই জেলার হিন্দু অঞ্চলকে সহজেই মুসলিম অঞ্চল হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণগঞ্জ থানা হিন্দু প্রধান। মুসলিম-প্রধান অংশ বাদ দিলে নূতন নদীয়া জেলায় থাকিবে—সদর বা কৃষ্ণনগর এবং রাণাঘাট মহকুমা (সমগ্র); এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ থানা। মোট জনসংখ্যা হইবে ৬৬৬, ৬৯২; উহার মধ্যে ৩৪৮, ২৫৭ (অর্থাৎ শতকরা ৫৪ জন) হিন্দু।

যশোহর জেলা—যশোহর জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক; অধিকন্তু ইহার কোন মহকুমাই হিন্দুপ্রধান নয়। থানাগুলির মধ্যে কালিয়া, নড়াইল, অভয় নগর ও সালিখা হিন্দু প্রধান। সালিখা থানা মুসলিম অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত; সুতরাং উহাকে হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত করা অসম্ভব। বাকি তিনটি থানাকে খুলনা জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিবে। যশোহর জেলার সীমা পূর্ব্বে বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এককালে সুন্দরবন পর্য্যন্ত যশোহরের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান যশোহর সহরের সহিত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অন্তর্গত।

যশোহরের হিন্দু-প্রধান অংশে পড়িবে নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত নড়াইল ও কালিয়া থানা এবং সদর মহকুমার অভয় নগর থানা। আয়তন ৩৬১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০৪, ২০০; ইহার মধ্যে ১৬৪,০৬৭ (শতকরা ৫৪) জন হিন্দু। এইরূপ ক্ষুদ্র স্থান লইয়া জেলা গঠন হয়তো অসম্ভব হইবে। কিন্তু যশোহরের এই অঞ্চলের সহিত খুলনা জেলার ভৈরব নদের পূর্ব্বে অবস্থিত অংশ যোগ করিয়া একটি নূতন যশোহর জেলা গঠন করা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া আমি মনে করি। ভৈরব এবং মধুমতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান লইয়া এই নূতন জেলা গঠিত হইতে পারে।

ফরিদপুর জেলা—ফরিদপুর জেলা মুসলিম-প্রধান হইলেও উহার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বাস। এই গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং উহার সহিত সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান রাজইর থানা লইয়াই একটি নূতন জেলা অনায়াসে গঠিত হইতে পারে; এবং উহার নাম গোপালগঞ্জ জেলা দেওয়া যায়। মোট লোকসংখ্যা ৭৫২, ১৯০; ইহার মধ্যে ৪১৬, ২১৯ (শতকরা ৫৭ জন) হিন্দু। প্রয়োজন হইলে বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী থানা এই নূতন জেলার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

বাখরগঞ্জ জেলা—বাখরগঞ্জে মুসলিম সংখ্যাধিক্য থাকিলেও, উহার উত্তর-পশ্চিম অংশ হিন্দু-প্রধান। এই অংশ গোপালগঞ্জ মহকুমা ও খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন থাকায়, হিন্দু বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। হিন্দুপ্রধান থানাগুলির মধ্যে নাজিরপুর স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি এবং বরিশাল পরস্পর-সংলগ্ন। গৌরনদী থানা এই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু গোপালগঞ্জ মহকুমার সহিত সংলগ্ন।

বাখরগঞ্জ জেলার নিম্নলিখিত থানাগুলি হিন্দু বঙ্গে আসিবে:— (ক) সদর মহকুমার অন্তর্গত গৌরনদী, ঝালকাঠি ও বরিশাল থানা (বরিশাল সহর ইহার মধ্যে পড়িবে); (খ) পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি থানা। এই অংশের মোট জনসংখ্যা ৭৮৪, ৮৩৫; ইহার মধ্যে ৪৪৪, ২৮৭ (শতকরা ৫৭) জন হিন্দু। গৌরনদী থানা যদি গোপালগঞ্জের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঝালকাঠি, বরিশাল, নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি এই চারিটি থানার মোট জনসংখ্যা হইবে ৫৭২, ৫৯১; উহার মধ্যে ৩২৩, ৪১০ জন হিন্দু। এই অংশ লইয়া একটি পৃথক জেলা গঠন অসম্ভব হইবে না; অন্যথায় ইহাকে বর্ত্তমান খুলনা জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিতে পারে।

নূতন বরিশাল জেলার প্রাকৃতিক সীমার ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। মুসলিম-প্রধান উজিরপুর ও বানরিপাড়া থানা এবং পিরোজপুর ও বাবুগঞ্জ থানার কিয়দংশ যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই অংশ নদী বেষ্টিত ও অধিকতর সুরক্ষিত হইবে। ইহার সীমানা হইবে:—পূর্ব্বে আড়িয়ল খাঁ, কাপুর ও কীর্ত্তনখোলা নদী; পশ্চিমে—হিন্দু বঙ্গের খুলনা জেলা; উত্তরে—হিন্দু বঙ্গের গোপালগঞ্জ; পূর্ব্বে—ঝালকাঠি নদী, গাফখান্ খাল ও পুরাতন দামোদর নদী।

উপরে যে জেলাগুলির সীমানা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত এবং প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের যে অনুপাত হইবে, তাহা নিম্নে পাশাপাশি প্রদর্শিত হইল।

	বর্ত্তমানে হিন্দুর শতকরা অনুপাত	পরিবর্ত্তিত জেলায় হিন্দুর শতকরা অনুপাত
দিনাজপুর	৪৯'৫	৫৩
মালদহ	৪৩	৬৭
মুর্শিদাবাদ	৪৪	৫১
নদীয়া	৩৯	৫৪
যশোহর	৪০	৫৪
ফরিদপুর	৩৬	৫৭
বাখরগঞ্জ	২৬	৫৭

উপরে লিখিত জেলাগুলির হিন্দু অধিবাসীগণের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানান। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, গোপালগঞ্জ ও বরিশালের হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের সকল জেলাই হিন্দু প্রধান। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, খুলনা, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলারও কোনো অদল বদলের আবশ্যকতা নাই।

	হিন্দুর শতকরা অনুপাত	মুসলমানের শতকরা অনুপাত
বর্দ্ধমান বিভাগ	৮৬	১৪
কলিকাতা শহর	৭৬	২৪
২৪ পরগণা	৬৬	৩৪
খুলনা জেলা	৫০'৪	৪৯'৬
দার্জিলিং জেলা	৯৭	৩
জলপাইগুড়ি জেলা	৭৭	২৩

কুচবিহার রাজ্য—কুচবিহার হিন্দু রাজ্য এবং ইহা হিন্দু বঙ্গের সাহিত সহযোগিতা করিবে। ইহার আয়তন ১৩১৮ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৬৪০,৮৪২ ; ইহার মধ্যে ৪০১,৫৯৪ (শতকরা ৬৩) জন হিন্দু এবং কেবলমাত্র ২৪২, ৬৪৮ জন মুসলমান।

ঢাকা শহর—ঢাকা শহরের মোট জন সংখ্যা ২১৩,২১৮ জনের মধ্যে ১৩০,৫২৫ জন হিন্দু এবং মুসলমানরা সংখ্যায় মাত্র শতকরা ৩৯ জন। হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ঢাকা শহর হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত হওয়া উচিত। অনেকে আপত্তি করিবেন যে, এইরূপ বিচ্ছিন্ন দূরবর্ত্তী শহর কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে? তাঁহাদের আপত্তির উত্তর—ফরাসী চন্দননগরের উদাহরণ। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র শহরটি সুদূর পণ্ডিচেরী হইতে শাসিত হয়। ইহাতে যখন অসুবিধা হয় না, তখন বুড়ীগঙ্গা তীরে অবস্থিত ঢাকা বন্দর নূতন বাঙ্গালার অধীনে থাকার পক্ষে কোন অসুবিধাই হইতে পারে না। বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে ঢাকা গমনের বাধা নাই। মুসলিম বঙ্গের নিজস্ব বড় বন্দর রহিয়াছে চট্টগ্রাম ; সুতরাং হিন্দু-প্রধান ঢাকা শহর উহারা কোন কারণেই দাবি করিতে পারে না। হিন্দু বঙ্গের অধীনে ঢাকা শহর স্বায়ত্তশাসনাধীন স্বতন্ত্র (autonomous) শহর হইবে।

হিন্দু বঙ্গের আয়তন হইবে ৩৬,৬১০ বর্গ মাইল। মোট জনসংখ্যা ২৫,৮৫৪,৯৪৯ জন ; তন্মধ্যে মুসলমান ৭,৩৮৯,০৪৭ (শতকরা ২৮) জন এবং অমুসলমানের (প্রায় সবই হিন্দু) সংখ্যা ১৮,৪৬৫,৯০২ (শতকরা ৭২) জন। ইহার সহিত ঢাকা শহর যুক্ত হইলে মোট জন সংখ্যা হইবে ২৬,০৬৮,১৬৭ ; উহার মধ্যে ১৮,৫৯৬,৪২৭ জন হিন্দু।

বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল

বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম ও সিংভূম জেলার কিয়দংশের অধিবাসীগণ বঙ্গভাষাভাষী। ভাষা অনুসারে অঞ্চলিক বিভাগের নীতি কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং এই অঞ্চলগুলির দাবি সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে এই বিষয়ে দাবি তুলিয়া সমস্যাকে জটিলতর করা সমীচিন হইবে না। উপযুক্ত সময়ে পরে গণপরিষদের সম্মুখে এ বিষয়ে দাবি করা চলিবে। বিহারের এই চারটি জেলার মোট লোক সংখ্যা ৭৭৯৯,৪৬৫ ; ইহার মধ্যে হিন্দু ৬,৩৮৫,১১৪ এবং মুসলমান মাত্র ১,৪১৪,৩৫১ জন।

লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে পার্টিসন হইলে মুসলিমবঙ্গে নিম্নলিখিত স্থানগুলি পড়িবে :—

ঢাকা বিভাগে :—ময়মনসিংহ জেলা (আংশিক শাসন বহির্ভূত উপজাতি অঞ্চল ব্যতীত) ঢাকা জেলা (ঢাকা শহর বাদে) ; ফরিদপুর জেলা (গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজৈর থানা বাদে)।

চট্টগ্রাম বিভাগে :—সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা ; নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা (ত্রিপুরা মহারাজের রোশনাবাদ জমিদারী বাদে)। (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম বঙ্গে পড়িবে না)

প্রেসিডেন্সি বিভাগে :—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা (বহরমপুর ও বেলডাঙ্গা থানা বাদে) এবং লালবাগ মহকুমা (জিয়াগঞ্জ ও নবগ্রাম থানা বাদে), নদীয়া জেলার মধ্যে সমগ্র মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া মহকুমা এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমা (কৃষ্ণগঞ্জ থানা বাদে) ; যশোহর জেলার মধ্যে সমগ্র মাগুরা, বনগাঁ ও ঝিনাইদহ মহকুমা, নড়াইল মহকুমা (নড়াইল ও কালিয়া থানা বাদে) এবং সদর মহকুমা (অভয়নগর থানা বাদে)।

রাজশাহী বিভাগে :—সমগ্র রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা ; দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত চিরির বন্দর, পার্ব্বতীপুর, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট থানা ; মালদহ জেলার অন্তর্গত গোমস্তাপুর ও চাপাই-নবাবগঞ্জ থানা।

মুসলিম বঙ্গের আয়তন হইবে ৪০,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৪,২০৪,৫২৩ ; ইহার মধ্যে মুসলমান ২৫,৬০৯,১১১ (শতকরা ৭৫) জন এবং হিন্দু ৮,৫৯৫,৪০৬ (শতকরা ২৫) জন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৭২৭০ জন এবং এবং অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। আদিম অধিবাসীগণের স্বার্থের খাতিরে এই জেলাটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেন্টের অধীনে থাকা উচিত।

ত্রিপুরা রাজ্য—ত্রিপুরার হিন্দু রাজ্য হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও আসামের মধ্য দিয়া যোগাযোগ রক্ষার সুবিধা আছে। এই রাজ্যের আয়তন ৪,১১৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৫১২,৪৫০ জন। নোয়াখালি জেলার ফেনি মহকুমায় এবং ত্রিপুরা জেলায় কুমিল্লা শহর ও সদর বিভাগের কিয়দংশ ত্রিপুরার মহারাজার রোশনাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত। এই অংশ পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ইহা পুনরায় মহারাজাকেই প্রত্যর্পণ করা উচিত।

(ক) লেখকের পরিকল্পনায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র শাসন অঞ্চল 'থানাকে' ভিত্তি করা হইয়াছে। যে-সকল জেলার মধ্যে কয়েকটি হিন্দুপ্রধান থানা একস্থানে একত্রে রহিয়াছে, সেখানে ঐ থানাগুলিকে পৃথক করিয়া নূতন জেলা গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান

সেইগুলির সহিত এই সকল নবগঠিত জেলার সমন্বয়ে হিন্দু বঙ্গ গঠিত হইবে।

(খ) ভৌগলিক ঐক্য ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাধারণ পারিবারিক ভাগবাঁটোয়ারার সময় একজন সরিকের সম্পত্তি যদি সামান্য একটু খোঁচের জন্য খণ্ডীভূত ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অংশ-টুকু উহারই ভাগে দিয়া একটি অখণ্ড হোলডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। সেই নীতি অনুসারে মালদহের দক্ষিণে ও মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে অবস্থিত মোট আটটি মুসলিম-প্রধান থানাকে হিন্দু-প্রধান বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে। এই থানাগুলি মালদহের ভোলাহাট, কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ; এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথপুর লালগোলা ও ভগবানগোলা। এই কয়টি থানায় ৫৮৫,২৬৬ জন মুসলমানের বাস। এই পাঁচ লক্ষ মুসলমানের জন্য হিন্দু বঙ্গের ঐক্য ও প্রায় ৩ কোটি লোকের স্বার্থহানি হইতে কখনই দেওয়া যাইতে পারে না। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের স্থানান্তর গমনের সুযোগ ও ক্ষতিপূরণ দান সহজসাধ্য হইবে।

(গ) নবগঠিত হিন্দু বঙ্গে বাঙ্গালার সমস্ত হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৭০ জন থাকিবে। হিন্দু বঙ্গে শতকরা ৭২ জন হইবে হিন্দু; সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা সদাসর্ব্বদা উত্যক্ত হইয়া থাকিতে হইবে না এবং নিশ্চিন্ত মনে দেশের মঙ্গলজনক উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার সুযোগ লাভ করিবে।

(ঘ) জন বিনিময়ের একান্ত প্রয়োজন হইলেও এইরূপ জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। হিন্দু বঙ্গে মুসলমান থাকিবে ৭,৩৮৯,০৪৭ জন; অন্যদিকে মুসলিম বঙ্গে হিন্দু থাকিবে ৮,৫৯৫,৪০৬ জন।

(ঙ) হিন্দু বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত কোন জেলায় মুসলিম প্রধান কোন স্থান থাকিবে না। ভবিষ্যতে আসাম অভিযানের অনুরূপ কোন আক্রমণ হইলে হিন্দুবঙ্গের ভিতরে বিপক্ষের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন প্রবল সম্প্রদায়ের বাস বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে সেই বিপদের ভয় নাই।

(চ) হিন্দু বঙ্গ পাইবে ৩৬,৬১০ বর্গ মাইল। এই জমির পরিমাণ বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যানুপাতের অনুরূপ। কিন্তু বাংলার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জমির মালিক হিন্দু; সুতরাং হিন্দু ন্যায়সঙ্গতভাবে আরও বেশী জমি দাবি করিতে পারে।

হিন্দু বঙ্গ উত্তরে দার্জিলিং হইতে দক্ষিণে ২৪ পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি অখণ্ড প্রদেশ হইবে। আয়তন ও শাসনতন্ত্র পরিকল্পনার জন্য এই প্রদেশকে মুসলিম বঙ্গের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। অন্যান্য পরিকল্পনায় বিচ্ছিন্ন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্বন্ধে এই অসুবিধা আছে।

নূতন প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা হইবে শতকরা ৭৩ জন।

ইহার মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া ভাবী গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিবে না। যে সকল পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ প্রেসিডেন্সি বিভাগ দাবি করা হইয়াছে তাহাতে এই অসুবিধা আছে।

জনবিনিময় অবশ্যম্ভাবী হইলে, এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রদেশ বেশী সুবিধাজনক।

অন্যান্য পরিকল্পনার তুলনায় ইহাতে মুসলিম বঙ্গে কমসংখ্যক হিন্দু থাকিয়া যাইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পার্টিসন সহজসাধ্য। বঙ্গদেশের যে মানচিত্রে থানাগুলি দেখানো হইল তাহার সাহায্যেই মোটামুটি অস্থায়ী পার্টিসন করা সম্ভবপর হইবে।

এই পরিকল্পনার একমাত্র আপত্তি পূর্ব্বদিকে প্রাকৃতিক সীমার অভাব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের যুগে অতীতকালের ন্যায় নদীর ধারা আদৌ দুর্ভেদ্য নয়। তথাপি সীমা হিসাবে নদী সুবিধাজনক এবং উভয় প্রদেশের সীমানির্দ্ধারণ কালে যাহাতে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

শীতবাষ্পসমাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা-জড়ত্বের ভাঙিয়া দুয়ার
আসে দুর্নিবার।
চকিত অম্বরে হেরি তার আবির্ভাব
চপল চঞ্চলগতি, অকস্মাৎ, অমিত-প্রতাপ!
বনে বনে বাজে আগমনী,
বিহঙ্গ-কাকলী-গীতে চরণের নূপুরের ধ্বনি।
অরণ্য ক্ষণিক-দ্বিধা নিঃশেষে সম্বরি
বাহুমেলি' নিল তারে বরি'।
জরাজীর্ণ রিক্ততার বহির্বাস করি পরিহার
ধরিত্রী ধরিল বক্ষে অশোক-কিংশুক ফুলহার,
অনন্ত যৌবনখানি
মুক্তি পেল দুর্দিনের ছদ্মবেশী জরা-গুণ্ঠ' হানি।

বর্ণগন্ধ-ছন্দ নিয়ে অজস্র-বিলাসে
এই মতো নিত্য মধুমাসে
চলে তার আবর্ত্তিয়া অনন্ত যৌবন
বার্দ্ধক্যে বিদ্রূপ করি, তুচ্ছ করি মৃত্যু-আস্ফালন।
হে ফাল্গুন, যে অগ্নিতে ধরিত্রীর পুঞ্জিত জড়িমা,
জ্বালায়ে জাগায়ে দাও নবীনের মৌন মধুরিমা,
যে অগ্নি জ্বেলেছ বনে বনে
সে অগ্নির স্পর্শ দাও মনে—
আমারে জ্বলিত দাও জরামুক্ত অমৃত-বহ্নিতে।
ক্লেদাক্ত গ্লানিরিক্ত চিতে,
তীক্ষ্ণ করি সূক্ষ্ম অনুভূতি, কদর্য্যের শেষ লেশ মুছি
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে করো মোরে শুচি।

একচিত্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

একটা বিরাট শূন্যতা—রিক্ত প্রাণের ক্ষুধা-কাতর একটি সকরুণ নীরব রব চিত্ততলে ধ্বনিত হ'য়ে উঠে প্রতি মুহূর্তে জীবনের অসারত্ব সপ্রমাণ ক'রে দেয়। জীবনটা বাস্তবিকই যেন মনে হয় একটা মরুভূমির মত! সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতার মাঝেও যেন কোথায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা।

চন্দ্রা ভাবে—সত্যিই কি নারীজন্ম এমনিভাবে বয়ে যাবে তার? ভগবান কি তাকে মা হবার অধিকার এ জন্মে দেবেন না? কামনা তো তার বেশী নয় একটি, মাত্র একটি সন্তান। যাকে বুকে জড়িয়ে সে তার জীবনের সকল বেদনা ভুলতে পারবে। সেই উদ্বেলিত স্নেহ-পারাবার মন্থন করা অমূল্য সম্পদ কি তার জীবনকে ধন্য ক'রে দেবে না? কল্পনার মোহন তুলিকায় যার প্রতিমূর্তি সে মনের মণিকোঠায় গোপনে অংকিত ক'রেছে—প্রতি মুহূর্তে যার মৃদু-মধুর আহ্বান তার মর্মের কানে কানে গুঞ্জরিত হ'চ্ছে, সে কি তার একান্ত আপন হ'য়ে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে না? উঃ, কি অভিশপ্ত জীবন! চন্দ্রার চোখে শ্রাবণের বারিধারা নেমে আসে।

এই পনেরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে চন্দ্রা কি না করেছে? একটি সন্তানের কামনায় উন্মাদিনীর মত ছোট বড় সকলের আদেশ উপদেশ মাথা পেতে নিয়েছে সে··· কত দেবতার দ্বারে সকাতরে মানস-পূর্ণের মানসিক জানিয়েছে··· দৈব-শক্তিসম্পন্ন অসংখ্য মাদুলী তার অংগের ভার বর্ধন করেছে··· গোপনে কতো সাধুর চরণ-ধূলি পরম ভক্তির সংগে সে মাথায় তুলে নিয়েছে। কিন্তু দেবতা কোন কিছুতেই প্রসন্ন হ'লেন না। অথচ এই সমস্ত ব্যাপার তাকে কত সাবধানেই না করতে হয়। পাছে স্বামী জানতে পারেন, তাই প্রত্যেক বিষয় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় তাকে। যা কিছু সে করে সমস্তই স্বামীর অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে। কারণ স্বামী তার ডাক্তার এবং এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক। তুক্-তাক্, দৈব-টৈব বা মান্‌সিক-ফান্‌সিকের 'পরে তাঁর মোটেই আস্থা নেই। তিনি বলেন—'ও সব বাজে। বরাত ছাড়া পথ নেই—বরাতে যদি সন্তান লাভ থাকে তো হবে, নইলে একরাশ মাদুলীই অংগে ধারণ করো, আর সাধু সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো মুঠো মুঠো করেই গেলো, কিছুতেই কিছু হবে না।' চন্দ্রার প্রতি তাঁর কড়া আদেশ —সে যেন ওসব নিয়ে মাতামাতি না করে। বিজ্ঞানের যুগে ঐ সব যত আজগুবী করণ-কারণ শোভা পায় না।

ডাক্তার স্বামী, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটিও চন্দ্রার হয়নি; কিন্তু তাতেও কোন সুফল হল না। স্বামী বলেন —'ক্ষতি কি···নাই বা হ'ল ছেলে! পৃথিবীর সকল নরনারীর ভাগ্যেই যে সন্তান লাভ ঘটবে তার কি মানে আছে!'···অর্থাৎ স্বামীর সন্তানের কামনা খুব বেশী নয়। তাঁর মতে, ও সব না হওয়াই ভালো। ছেলেপুলে হ'লে তার অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এই বেশ।

চন্দ্রার মন কিন্তু এ কথায় সায় দেয় না। সে যেন আরও ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। শাশুড়ী তার মুখের পানে চেয়ে তার দুঃখ নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেন। মাঝে মাঝে কোথাও থেকে একটু জলপড়া নিয়ে এসে চুপি চুপি তাকে ডেকে বলেন—'বৌমা, ঢুক্ ক'রে এটুকু খেয়ে ফেলো তো মা। এ একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! আর এই মাদুলিটি শনিবার সকালে চান ক'রে কোমরে ধারণ করবে। অনেক ব'লে ক'য়ে, ও-বাড়ীর বামুনদিকে ধ'রে রামরাজাতলা থেকে এ ওষুধ আনিয়েচি। বামুনদি বললে —এ ওষুধ ডাকলে সাড়া দেয়। দত্তদের মেজবৌয়ের ব্যাপার কে না জানে? বাইশ বছর ধ'রে একটি ছেলের পিত্তেশে ছুঁড়ি কি কাণ্ডই না করেচে! তারপর যেই বামুনদিকে ধরে এই জলপড়া আনিয়ে খেলে আর মাদুলি ধারণ করলে, অমনি আহা কি চমৎকার ফুটফুটে ছেলে যে হয়েছে বৌমা, তা আর তোমাকে কি বলবো!'

সাগ্রহে হাত বাড়ায় চন্দ্রা, কিন্তু পরক্ষণে মনে প'ড়ে যায় স্বামীর কঠিন আদেশ—বিজ্ঞানের যুগে ও-সব দৈব-টৈবর ধাপ্পাবাজি অচল। কোন বিবেচক শিক্ষিত লোক এই সব বাজে জিনিসের সমর্থন করে না। সুতরাং সে চায় না

যে, তার স্ত্রী ঐ সব নিয়ে মাতামাতি করে এবং কতকগুলো ফুল বেলপাতা বা শেকড়-মাকড় পোরা মাদুলি পরে দেহের শ্রী নষ্ট করে।

হাতখানা কেঁপে ওঠে চন্দ্রার। নিমেষে তার সকল ব্যগ্রতা অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। শাশুড়ী বধূর মনের কথা বুঝতে পেরে খাটো গলায় বলেন—'অরুণ বকবে ভেবে ভয় পাচ্ছো মা? তা দ্যাখো মা, অরু আমার ডাক্তার মানুষ, তার ওপর চিরকালই ওর স্বভাব ঐ রকম—এ সবে বড় অবিশ্বাস! ঠাকুর দেবতাও মানতে চায় না। কর্তা তো তাই অনেক সময় দুঃখু ক'রে বলতেন—আমাদের ছেলে হ'য়ে ও অমন নাস্তিক হ'ল কি ক'রে? সবই কপাল বৌমা, সবই কপাল! নইলে অত লেকাপড়া শিখে এটুকু ও বোঝে না যে, একটা ছেলে বিহনে বংশটা শেষে লোপ পাবে।'

চমকে ওঠে চন্দ্রা। একটু কি ভেবে নিয়ে সে কাতর ভাবে বলে—'মা, আপনার পায়ে পড়ি—যেমন ক'রে হোক আপনার ছেলের আবার বিয়ে দিন। আমার কোন দুঃখু হবে না, বরং তার ছেলে হ'লে—'

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বলেন—'পোড়া কপাল! সে চেষ্টারও কি কসুর করেছি মা। কিন্তু ছেলেকে রাজী করায় কে?'

শাশুড়ীর দেওয়া জলপড়াটুকু ভক্তিভরে পান ক'রে নেয় চন্দ্রা। কত আশানিরাশার তরংগাঘাত তার তার মনখানাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। বহু আয়াসপ্রাপ্ত কবচটি সযত্নে মুঠার মধ্যে চেপে ধরে সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে।

এমনি করেই আশার জাল বুনতে বুনতে দিনের পর দিন তার কেটে যায়। কত বিনিদ্র রজনীতে পুত্র কামনায় সে নৈশ-উপাধান সিক্ত করেছে—কতো নিশিথ-স্বপ্নে পুত্রমুখ চুম্বন করতে গিয়ে সে স্বপ্নভংগে নিরাশ হয়েছে! কোথা হ'তে কোন শিশুর ক্রন্দন তার কানে এলে সে ক্ষিপ্তার মত নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে। এমনি করেই দীর্ঘ পনেরোটি বৎসর তার জীবন হ'তে অতীতের দেশে সরে গেছে।

কিন্তু চন্দ্রা আশ্চর্য হ'য়ে যায় তার স্বামীর পানে চেয়ে। ভাবে—আচ্ছা পুরুষ মানুষের মন কী ধাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন! তাদের প্রাণে কি সন্তানের মুখ দেখার সাধ জাগে না? মেয়েদের মত কি পুরুষরা সন্তানের কামনা মনে মনে পোষণ করে না? কই তার স্বামীর চিত্ত তো সন্তান কামনায় তার মত ব্যাকুল নয়!

সেদিন চন্দ্রার শাশুড়ী চুপি চুপি চন্দ্রাকে ডেকে বললেন—'বৌমা, একটা খবর শুনেচ? গোসাই গিন্নীর মুখে শুনলুম—কালীঘাটে নাকি একজন মহাপুরুষ এসেছেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তিনি মুখ দেখে মানুষের মনের কথা বলে দেন। যে যা কামনা নিয়ে তাঁর কাছে যায়—তিনি তা পূরণ ক'রে দেন। সাক্ষেৎ দেবতা বিশেষ লোক! গোসাই গিন্নীর ছেলের চাকরী গেছলো—ঠাকুরের কেরপায় আবার কাল থেকে একটা ভালো চাকরীতে বাহাল হয়ে গেছে। সেই সাধু ঠাকুরকে দেখবার জন্তে নাকি শহর শুদ্ধু লোক কালীঘাটে ভেঙে পড়েচে। যাবে বৌমা একবার ঠাকুরকে দেখতে? যদি তাঁর দয়া হয়—যদি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন! দরকার কি অরুকে জানাবার—কারুদের বাড়ী বেড়াতে যাচ্চি বলে এক ফাঁকে ঘুরে এলেই হবে।'

প্রতিবারের মত এবার চন্দ্রাকে কেন জানি না—তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গেল না। এত বড় একটা সাধুর আগমন সংবাদেও অন্যান্য বারের মত সে আশান্বিতা হ'য়ে উঠলো না। তার সারা মুখে কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়াই যেন ফুটে উঠলো। ম্লান একটু হেসে সে বললে—'কিন্তু ফল কী কিছু হবে মা? এই পনেরোটা বছর ধরে অনেক কিছুই তো করা হ'ল মা—কী হ'য়েচে?' একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে সে বললে—'বাবা পঞ্চানন্দের দোরে হ'ত্যে পর্যন্ত দিয়েচি। ভেবেছিলুম—বাবার কৃপায় এবার বোধ হয় আশা আমাদের সফল হবে। কিন্তু পোড়া ভাগ্যে কিছুই ফললে না!' তার বড় বড় চক্ষু দুটিতে মুক্তার মত দু'ফোঁটা অশ্রু টল টল করে উঠলো।

শাশুড়ী বললেন—'সবই তো বুঝতে পারি মা, তবে কি জানো—মন কিছুতেই বোঝে না। মনে হয়—এবার বোধ হয় দেবতা মুখ তুলে চাইবেন। তাই বলচি মা—

একবার শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? আমার মন কি জানি কেন—এবার যেন বাছা ভালো গাইচে।'

—'বেশ, তবে যাবো।'

—'হ্যা, আমিও তাই বলি। আর কিছু না হোক, একজন সাধুপুরুষ দর্শনও তো হবে। আজকের খবরের কাগজেও নাকি সাধুর গুণাগুণ আর কখন কি ভাবে তাঁর দেখা মিলবে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছে। তুমি পড়ো নি বৌমা?'

—'কৈ না তো!'

হঠাৎ চন্দ্রার মনে পড়লো…আজ সকালে স্বামীকে চা দিতে গিয়ে সে দেখেছে, আজকের কাগজ থেকে খানিকটা অংশ স্বামী যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। সে তাই দেখে প্রশ্ন করেছিল—'কাগজটার অমন খানা ছিঁড়ে ফেললে কেন গো?' উত্তরে স্বামী গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—'ও কিছু নয়।' কথাটা চাপাই দিয়েছিলেন তিনি। এতক্ষণে চন্দ্রার মনে সেই কাগজ ছেঁড়ার হেতুটা যেন বেশ স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। পাছে চন্দ্রার দৃষ্টিতে খবরটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এবং সে সাধুর দর্শন ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে; তাই তাড়াতাড়ি কাগজের সেই স্থানটুকু তিনি নষ্ট করে ফেললেন।

শাশুড়ীর সংগে কথা শেষ ক'রে চন্দ্রা ঘরে এসে কাগজখানা খুলে দেখলে—একটা পাতার খানিকটা অংশ নেই। সে বুঝলে—এইখানেই সেই সাধুর কথা ছিল।

মুক্ত বাতায়ন পথে স্বচ্ছ আকাশ হতে কিছুটা রৌদ্র ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্ণিমেষ নেত্রে সেই দিকে চেয়ে চন্দ্রা ভাবতে লাগলো—তার স্বামীর অদ্ভুত প্রকৃতির কথা। উঃ, একটি সন্তান লাভ করার জন্ম সে এই দীর্ঘ দিন কী না করেছে! আর তার স্বামী? বাস্তবিক পুরুষদের কি পিতা হওয়ার সাধ জাগে না প্রাণে?

সেদিন ছিল অমাবস্যা তিথি…

পূর্ব পরামর্শ মত সন্ধ্যার কিছু আগে গোপনে শাশুড়ী-বধূতে সাধু দর্শনে বার হ'য়ে পড়লেন। ভাগ্যগুণে সেই দিন চন্দ্রার স্বামীও বাড়ী ছিলেন না—প্রভাতেই কোথায় বেরিয়েছিলেন।' বলে গেছেন আজ ফিরবেন না। সুতরাং তাদের গমনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি।

যথাসময়ে শাশুড়ীসহ চন্দ্রা এসে পৌছালো—কালীঘাটে সাধুর আশ্রম সন্নিকটে। রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য গাড়ী—মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি দাঁড়িয়ে আছে। সাধুর দর্শনাভিলাষী বহু নরনারীর আগমনে সে স্থান যেন এক মেলার আকার ধারণ ক'রেছে। এত লোকের ভীড় এর পূর্বে বোধ হয় আর কখনো দেখেনি চন্দ্রা। সে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল। একটা লোককে দেখবার জন্য এত ভীড়! তবে কি, তবে কি—এতদিনে প্রাণের আশা পূর্ণ হবে তার? ঠাকুর কি তবে মুখ তুলে চাইবেন? একটা অজানা সম্ভাবনার আশায় তার প্রাণটা দুলে উঠলো।

ভীড় বাঁচিয়ে একটা আবছায়া প্রায়ান্ধকার গলি পথ ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলতে লাগলো চন্দ্রারা।

অনেকটা পথ নীরবে চলে আসার পর এক সময় চন্দ্রা শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে—'আর কতটা পথ যেতে হবে মা? রাস্তাটা বড্ড অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। এমন পথও শহরে আছে?'

—'আছে বৈকি মা। কলকাতা শহরে নেই কি?' একটু থেমে শাশুড়ী বললেন—'তবে কি জানো বৌমা, সব দেখে শুনে বড় ভাবনায় পড়ে গেচি। এই এ্যাত লোকের ভীড় ঠেলে আমরা কি সাধুর কাছে পৌছাতে পারবো—দ্যাখা কি পাবো তাঁর? কিন্তু বৌমা এ্যাতদূর যখন এসেচি তখন যাই হোক—দ্যাখা না করে ফিরচি না।'

কথা কইতে কইতে অবশেষে এক সময় তাঁরা উভয়ে এসে উপস্থিত হ'লেন সাধুর আশ্রমে। একটা প্রকাণ্ড স্থান ঘিরে এই আশ্রমটি তৈরী হ'য়েছে। চারিদিকে লোকজন গিস্ গিস্ করছে। একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে মহিলাদের আসা যাওয়া এবং বসা দাঁড়ানোর স্থান। কত নরনারী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কে জানে তাদের আশা সফল হবে কি না! চন্দ্রাও শাশুড়ীর সংগে এসে মহিলাদের ভীড়ের মধ্যে একস্থানে জড় সড় হয়ে বসে পড়লো।

অদূরে দেখা গেল—হোমাগ্নি জ্বলছে, আর তারই সামনে শিষ্য ও ভক্ত পরিবেষ্টিত সাধুজী বসে আছেন একটি মৃত্তিকা-নির্মিত বেদীর উপর ব্যাঘ্রাসনে। অপূর্ব সে মূর্তি…মস্তকের

সুদীর্ঘ জটা সর্পিল আকারে পৃষ্ঠদেশ বেয়ে মাটীতে এসে লোটাচ্ছে—দীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষদেশ প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে—নয়ন যেন ধ্যান নিমিত—ভস্মাচ্ছাদিত সারা অংগে একমাত্র কৌপীন ব্যতীত অন্য কোনও আবরণ নেই। আননে এক অনবদ্য হাস্যের রেখা। হাঁ, সাধু বটে! শ্রদ্ধায় অন্তরখানা যেন সাধুর চরণ পরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রার।

অন্ধ খঞ্জ অনাথ আতুর প্রভৃতি কত শত লোক ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে সাধুর মুখের পানে চেয়ে বসে আছে। যদি তিনি কৃপাদৃষ্টি করেন এই আশায়!

সাধু মাঝে মাঝে চক্ষু উন্মীলিত করে সামনের দিকে প্রতীক্ষিত নরনারীর পানে তাকাচ্ছেন এবং তাদের মধ্য হ'তে কখনও বা এক এক জনকে কাছে ডেকে কথাও বলছেন। তারা কেউ কেউ আবার অন্তরের অভিলাষ জ্ঞাপন করে সাধুর কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছে। সাধুও মধুর হাসির সঙ্গে পাশের ধুনী হ'তে একটু ছাই কারো হাতে—কারো হাতে বা একটা শুষ্ক বেলপাতা কি ফুল—আবার কাউকে এতটুকু একটু কি এক গাছের শিকড় দিয়ে বলছেন—'ঈশ্বর তোমার আশা পূর্ণ করুন . ওঁ শান্তি…'

শ্রদ্ধানত মনখানি নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে চন্দ্রা! অন্তরের কানায় কানায় তার হাসি-কান্নার ফেনিলোচ্ছ্বাস। কে জানে সাধুর কৃপা লাভে তার পোড়া ভাগ্য সমর্থ হবে কি না! বন্ধ্যার মর্ম বেদনা কি সাধু উপলব্ধি করবেন! না সবক্ষেত্রের ন্যায় এবারও বিফল হবে তার আয়োজন?

চন্দ্রার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও হয়তো এমনই নানা কথা চিন্তা করছিলেন। এই সময় কি ভেবে বধূর কানে কানে বললেন—'বৌমা, কি জানি—আমার কেমন যেন হঠাৎ ভয় ভয় করচে মা! অরুণ যদি জানতে পারে যে, আবার আমরা এই রাত্তিরকালে এ্যাত দূরে সাধু দেখতে এসেচি, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। যা রাগী ছেলে! একে তো দৈব-টৈব সাধু-সজ্জন মানেই না সে, তার ওপর—কাজ নেই মা—চলো একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যাক্। আর যা দেখচি, তাতে সাধু ঠাকুরের সুনজর যে চট্ করে আমাদের দিকে পড়বে তা তো মনে হয় না। অন্য আর একদিন না হয় সুবিধে মত আসা যাবে, কি বলো?'

চন্দ্রারও মনটা কেমন ছাৎ করে উঠলো—সত্যিই যদি স্বামী তার জানতে পারেন! স্বামীর কঠিন চিত্ত তো তার ব্যথা বুঝবে না। মনে পড়লো স্বামীর নিষেধাজ্ঞা—বিজ্ঞানের যুগে এসব শোভা পায় না। শাশুড়ীর কথার-উত্তরে কি যেন একটা বলতে গেল সে, কিন্তু সহসা একস্থানে দৃষ্টি প'ড়তেই তার কণ্ঠের ভাষা কণ্ঠেই রুদ্ধ হ'য়ে গেল। বিস্ময়ে তার চক্ষু দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হ'ল।—কিন্তু এও কি সম্ভব!

ঠিক এই সময় সাধুজী ইংগিতে এক ব্যক্তিকে কাছে ডাকলেন। লোকটির চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, যুক্তকর—ধীরে ধীরে সাধুর কাছে এসে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলে। স্মিত হাস্যের সংগে সাধু আশীর্বাদ ক'রে বললেন—'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে…এক বৎসরের মধ্যেই তুমি ভগবানের দয়ায় পুত্র মুখ দর্শন করবে। ঈশ্বর তোমার মংগল করুন…ওঁ শান্তি।' বলেই কি একটা শিকড় তার হাতে তুলে দিলেন। লোকটি পরম ভক্তির সংগে সাধুর সে দান বক্ষে চেপে ধরলো।

—'কে ও—কে!'

আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উন্মাদিনীর মত শাশুড়ীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চন্দ্রা বলে উঠলো—'মা, মা, ঐ দেখুন, আপনার ছেলে, আপনার ছেলে'- আর সে বলতে পারলে না, আনন্দাশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

আর, আর চন্দ্রার শাশুড়ী?

নাস্তিক পুত্রের গোপন আস্তিকতা দর্শনে তিনিও গভীর বিস্ময়ে হতবাক। সূর্যের বিপরীত গতি যদি আজ তিনি চোখের ওপর দেখতেন, তাহলেও বোধ হয় এত বিস্মিত হতেন না। তাঁর অরুণ—ডাক্তার ছেলে অরুণ—ক্ষণপূর্বেও যার অবিশ্বাসী অন্তরের কথা চিন্তা ক'রে তিনি ভীতি প্রকাশ করেছেন—সেও পুত্রের কামনায় আপনার আশৈশব দৃঢ় মতামতকে তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে—দৈবজ্ঞের দরবারে! পুত্রের অভাবনীয় আচরণে হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক করতে পারলেন না তিনি। নিমেষহারা দৃষ্টি তাঁর পুত্রের প্রতি স্থির হ'য়ে গেল।

মূলধন ও যান্ত্রিক উৎপাদন

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধনিকবাদের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সমাধানের জন্য ধুরন্ধর ধনপতিগণ যে কতরকম ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করতে পারে, মার্কসের আমলে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নি, তাই মার্কসের হিসাব থেকে সে সব বাদ পড়েছে। Capitalism বা ধনিকবাদ স্বদেশে যখন পরিপক্ব অবস্থায় (Saturation pointএ) গেল, তখনই তার নূতন বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হল—উপনিবেশিক প্রথায়, সাম্রাজ্যবাদে ও বিশ্ববাণিজ্যে। এর কোনোটাই মার্কসের আমলে তেমন ভাবে দেখা দেয় নি। লেনিন বলেছেন ধনিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য কেবল পরিণামগত (Quantitative) নয়,—এটা গুণগতও (Qualitative)। ধনিকবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ হল সাম্রাজ্যবাদ ; তবুও উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধী ভাবও (Opposition) আছে। কিন্তু মার্কস তেমন ভাবে

মার্কসের "ক্যাপিটেল" (Capital) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের এই দিক সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। এমন কি Imperialism সম্বন্ধেই এ গ্রন্থ প্রায় নীরব। উপনিবেশ ও উপনিবেশপ্রথা (Colonies & Colonisation) সম্বন্ধে তাতে কিছু আছে ; কিন্তু Colony শব্দটিকে তিনি মৌলিক ল্যাটিন অর্থে ধরেছেন—অর্থাৎ অকর্ষিত জমি Virgin soil—যা নবাগতরা এসে চাষ ক'রে শোষণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের যে রূপ এখন আমরা দেখছি—এর আর্থিক রূপ,—তা হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ সম্বন্ধে J. A. Hobson লিখেছেন—"The economic taproot, the chief diverting motive of all the modern imperialistic expansion is the pressure of capitalistic industries for markets—for sur plus markets, for investments & secondarily to supply products of home industry."—অর্থাৎ বর্তমান সাম্রাজ্যিক বিস্তারের প্রধান উৎস ও প্রধান আর্থিক তাগিদ হ'ল বাজার প্রসারের চেষ্টা—প্রধানত টাকা খাটাবার বাজার এবং দ্বিতীয়ত দেশের কারখানার উৎপন্ন মাল বিক্রির বাজার। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ মার্কস দেখতে পান নি। ক্রমেই বিদেশে ও সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশে টাকা খাটাবার প্রথা বেড়ে চলছে। ১৯০৫ সালে দেশে খাটাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি পাউণ্ড এবং বিদেশে খাটাবার জন্য ছিল ২ কোটি পাউণ্ড মাত্র। ১৯১৩ সালে এই অঙ্ক পর্য্যায়ক্রমে হয় ৩½ এবং ১৫ কোটি পাউণ্ড। ১৯১৫ সালে ব্রিটেনের বিদেশে ন্যস্ত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি পাউণ্ড, ফ্রান্সের ছিল ১৮০ কোটি এবং জার্মেনীর ছিল ১২০ কোটি পাউণ্ড।

ইহা অনুভব করতে পারেন নি। উপনিবেশের আদিম অবস্থা—অর্থাৎ কেবল কাচামালের (প্রধানত কৃষিজ) জোগানদারের অবস্থা, মার্কসের আমলে পূর্ণ পরিস্ফুট ও উত্তীর্ণ হয় নি। উপনিবেশসমূহে নূতন নূতন ধন-সম্ভার বের হল—খনিজ তৈল সম্পদ ও রবার চা, পাট প্রভৃতি কৃষিজ সম্পদ এর মধ্যে প্রধান ; অন্যপ্রকারের plantationও আছে। তাতেও ধনিকপ্রথার ফাটা-চেরা অনেকটা ঢাকা পড়ল। তারপর এল বিশ্ববাণিজ্য (international trade) ; তার ফলে ধনিকপ্রথা বিস্তৃত ক্ষেত্র পেল এবং নূতন উদ্যমে বিশ্বকে শোষণ করতে লাগল। গত যুদ্ধের পর আবার এল ফ্যাসিবাদ Fascism , ধনিকবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ যেমন সাম্রাজ্যবাদ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ হল ফ্যাসিবাদ। গত মহাযুদ্ধে ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানে, শ্রমজীবীরা যে অভিনয় করেছে, তাতে তাদের উপর মার্কসের মতো ততটা নির্ভর করা যায় না। মার্কস তাদের আহ্বান করেছিলেন—বিশ্বের শ্রমজীবীরা তোমরা একত্র হও ; শৃঙ্খল ব্যতীত তোমাদের হারাবার কিছু নেই। —"Proletariat of the world, unite , you have nothing to lose but your chains." মার্কসের এই আহ্বানের মর্যাদা শ্রমজীবীরা রাখে নি। দেখা গেল মুসোলিনী ও হিটলারের হাতে তারা ফ্যাসিবাদের পরিপোষক ও বাহক হয়ে উঠল। দুটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোনটাতেই তারা সেই ভাবে বিপ্লবের নামে সাড়া দেয় নি। সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে একদেশের শ্রমিক অপর দেশের শ্রমিককে হত্যা করতে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহায়তা করতেও এরা পরাঙ্মুখ হয় নি। এই যুদ্ধে ভারতেও দেখা গেল essential service বা "অত্যাবশ্যকীয় সেবক" হিসাবে কিছু সুখ-সুবিধা দিলে এরা নিজেদের স্বার্থকে আলাদা ক'রে বিপ্লব বা বৃহত্তর সমাজের কথা বেশ ভুলে থাকতে পারে।

তাই গান্ধী সহজ পন্থা নিয়েছেন ;—তিনি যন্ত্রকে একেবারে বাতিল না করলেও অত্যন্ত সঙ্কুচিত ক'রে রাখতে চান—অর্থাৎ মানুষের একান্ত অনুগত সেবক হিসাবে তার কাছ থেকে যতটুকু সেবা আদায় করা যায় ততটুকুই খুব সতর্কতার সহিত তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ! মার্কস যখন বলেছেন যে মানুষের শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে—"Human labour creates value" বা শ্রমই হ'ল সব মূল্যের গোড়া—"labour is the sole source of value"—তখন তার মনের সামনে যেন রয়েছে কারখানার শ্রমজীবিরা—যাদের দুঃখের জীবন তিনি নিজ জীবনের অঙ্গ ক'রে নিয়েছিলেন। তাই কৃষকদের শ্রমকে তিনি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় প্রায় উপেক্ষাই করেছেন। তাঁর এই একান্ত একমুখী সহানুভূতি তাঁকে শ্রমের সহজ স্বাভাবিক ও আদিমরূপ সম্বন্ধে অন্ধ করেছিল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন—মানুষের শ্রমের সহজ, আদিম ও স্বাভাবিক রূপ হ'ল

তার স্বাধীন স্বাবলম্বী শ্রম—স্বাধীন কৃষক, স্বাধীন কারিগর ও স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর—সমাজসেবার উপচারের বা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন-দ্রব্যের উৎপাদনে যার স্ফুরণ। তাই তাঁর সব দুঃখ দরদ, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সব কিছুই কারখানার শ্রমজীবীদের জন্য। সেখানে গান্ধী ব্যাপকতর ও দূরতর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন ; সেই জন্যই তিনি চেয়েছেন কারখানার অস্বাস্থ্যকর ও ব্যক্তিত্ববিনাশী আবহাওয়া হ'তে সরিয়ে শ্রমিককে তার স্বাস্থ্য ও সবৃত্তিতে স্থাপিত করতে, তার শ্রমের লাঘবের জন্য যন্ত্র সে আনবে ও খাটাবে—কিন্তু প্রত্যেকের শ্রমের অধিকার ও দায়িত্ব অব্যাহত রেখে। শ্রমের যন্ত্র ও উপকরণের মালিক হবে শ্রমিক ; অপরের ক্রীতদাস হয়ে, অপরের মুনাফার জন্য অপরের যন্ত্র ও উপকরণ নিয়ে সে শ্রম করবে না।

মার্কস কেবল কারখানার শ্রমজীবীদের উপরই জোর দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে সমাজ তাদের উপরই গড়তে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের একটা বৃহৎ অঙ্গ—এবং যাদের শ্রমের মূল্য সমাজের পোষণের পক্ষে সব চেয়ে বেশী, সেই কৃষকদের তিনি কার্যত বাদ দিয়েছেন। তাঁর সমাজ-দর্শনের এই একদেশদর্শিতার ত্রুটি বিশেষভাবে ধরা পড়ল রুশ-বিপ্লবের সময়,—লেনিন ও ট্রটস্কী প্রথম নৈষ্ঠিক মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সুরু করেছিলেন—War Communism উগ্র সাম্যবাদ ; কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁরা বৈপ্লবিক সাহসের পরিচয় দিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নিলেন এবং কৃষককে তার ন্যায্য স্থান দিলেন। ষ্টালিন এই কার্যক্রমকে পূর্ণ করলেন, তখন শ্রমিক ও কৃষকের ভোট-ক্ষমতা সমান ক'রে দিলেন।

গত মহাযুদ্ধের পর, প্রাচ্য ইউরোপ—বিশেষ ক'রে বলকান রাজ্য-সমূহে "সবুজ সাম্যবাদ" (Green Socialism) নামে কৃষক-মূলক সাম্যবাদের আন্দোলন সুরু হয়। তাদের কথা ছিল "Peasants of the world, unite"—বিশ্বের কৃষকগণ একজোট হও। বুলগার কৃষক দলের নেতা ষ্টামবুলিসকী (Stambulisky) ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা ; পরে তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নেতৃত্বে এক প্রচার পত্রে বলা হয়েছিল "বুলগেরিয় কৃষক সংঘের এই কংগ্রেস সমস্ত জাতিসমূহের কৃষকদের আহ্বান করছে—নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে আহরণ করার জন্য যেন একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। এই ভাবে সংঘবদ্ধ কৃষকদের পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক কৃষক সংঘের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানব সমাজকে নূতন ক'রে গড়বার কাজে এই বিশ্ব-সংঘ বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে।"*

কৃষকের চেয়ে শ্রমজীবীর সংখ্যা বরাবরই কম—এবং হয়ত বরাবর-ই তা থাকবে। কৃষকরা-ই সমাজের আদিম ও মৌলিক অভাব-পূরণ করে। গান্ধী এটা উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর কার্যক্রমে ও সমাজ-ব্যবস্থায়—এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে কৃষকের দিকে-ই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। খাদ্যের পর-ই মানুষের প্রধান অভাব হ'ল—বস্ত্রের। ইংরাজী বচন আছে—"When Adam delved and Eve span, who was then a gentleman।" —আদিম মানব আদাম যখন চাষ করত এবং তার পত্নী ইভ যখন কাপড় বুনত, তখন ভদ্রলোক ছিল কে ? পূর্বে বলেছি—ধনিকপ্রথার—(Capitalism) সূত্রপাত হয়েছে—বস্ত্র উৎপাদন দিয়ে। এই ঐতিহাসিক তথ্যের হিসাব গান্ধী করেছেন কি না, জানি না ; কিন্তু ধনিকপ্রথা ও ইণ্ডাষ্ট্রীবাদের বিরুদ্ধে অভিযান তিনি সুরু করেছেন বস্ত্র-উৎপাদন দিয়ে-ই। ধনিকপ্রথার একেবারে গোড়ায় আঘাত ক'রে তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অন্যায়, অসত্য ও হিংসা-মূলক ব'লে ঘোষণা করেছেন।

মার্কসের পর বা সমসময়ে অর্থ-ব্যবস্থায় আরও দুটি নূতন প্রথা দেখা দিয়েছে—joint stock company এবং co operative society,—যৌথ ও সমবায় কারবার। পূর্বে যে সব যৌথ কারবার joint stock Co. ছিল, তা ছিল প্রায়-ই সরকারী সনদ প্রাপ্ত (chartered) কোম্পানী—উৎপাদনের চেয়ে বাণিজ্যের প্রতি-ই যার লক্ষ্য ছিল বেশী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কো' (East India Co) এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু দেশে খুচরা আয়ের পরিমাণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমবেতভাবে ও সীমাবদ্ধ দায়িত্ব (limited responsibility) নিয়ে সম্মিলিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কল কারখানা স্থাপন করতে লাগল। বৃহৎ ধনপতিদের একাধিপত্যে—এক নূতন বাধার উদ্ভব হল। আজ শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কারখানা যৌথ কারবার—বহু লোকের অর্থে তা গঠিত এবং বহুলোক এর লভ্যাংশ পায়। এর ফলে শ্রমজীবীরা এবং মধ্যবিত্তরা ও ছোট খাটো ধনপতি (capitalist) হবার সুযোগ পেল এবং স্বস্ব স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হল। এই অবস্থা-ও মার্কস অনুধাবন করেন নি। এর পর এল সমবায় প্রতিষ্ঠান। Capital গ্রন্থে co-operation শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। সেখানে এর অর্থ হল—এক বিরাট কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমের বিভাগ *। সমাজের অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমশীল জনতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই সমবায় প্রথা যে কতটা সহায়ক—তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—সোভিয়েট রাষ্ট্রে। এই বিষয়ে-ও সোভিয়েট রাষ্ট্র-নৈতিক মার্কসীয়বাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে সমবায় প্রথার আশ্রয় নিয়েছে।

যৌথ কারবারে ও বড় বড় কারখানায় শ্রমজীবী ও ধনপতিদের

---

* "The Congress of the Bulgarian Peasants Union invites the peasants of all nations to organise in the name of their common interests and to take political power into their hands. Peasants thus organised have need of a powerful International Peasant Union. And this Union will play a great role in the rebuilding of humanity.

* When numerous workers labour purposively side by side and jointly, no matter whether in different or in inter-connected processes of production, we speak of this as co-operation."—অর্থাৎ যাকে আমরা বলি division of labour—শ্রমের বিভাগ।

স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য, অন্য অনেক রকম ফন্দি-ও উদ্ভাবিত হয়েছে। শ্রমজীবীরা যৌথ কারবারের অংশীদার হ'তে পারে এবং অনেক সময় তাদের সেই সুযোগ-ও দেওয়া হয়। লাভের একটা অংশ আজকাল অনেক কারবারেই শ্রমজীবীদের জন্য ভিন্ন ক'রে রাখা হয়;—**profit sharing**—লাভের অংশ এবং **bonus**—বকসিস—এই দুই ভাবে এটা সাধিত হয়। এর ফলে কারখানায় বা কম্পানীতে যাতে বেশী লাভ হয়, সে দিকে শ্রমজীবীদের একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগে। অনেক যৌথ কারখানার, পরিচালনায় (**management**এ) শ্রমিকদের সহযোগিতা আহ্বান করা হয়; বিভাগীয় পরিচালক বা তার কমিটি তাদের ভোটে ও তাদের মধ্য হ'তে নির্বাচিত হয়। এমন ব্যবস্থাও স্থানে স্থানে হয়েছে—সমস্ত ব্যবসায়টি শ্রমিকগণই পরিচালনা করে এবং লাভও তারা পায়; কেবল ব্যবসায়ের মূলধন হিসাব ক'রে শ্রমিকগণ ধনপতিকে (Capitalist) মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয় মাত্র। এই সব ফন্দি-ফিকিরের ফলে ধনজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে যে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব তা অনেকটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

শ্রমজীবী ও ধনজীবীর যে মৌলিক দ্বন্দ্ব—যার উপর মার্কস তাঁর সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করেছেন, তা আজ নানাভাবে প্রতিহত ও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। শ্রমজীবীগণ এক একটা কারখানায় বা ইণ্ডাষ্ট্রীয় অঞ্চলে জমাট হয়ে বাস করে; কৃষকদের মতো নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকে না। তাই শ্রমজীবীদের ছোটখাটো সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধিকে উস্কিয়ে দিয়ে, তাদের হাত করা অনেক সহজ। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকদের (**Specialised and expert**) এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবস্থার পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে শ্রমিকদের মধ্যেও কুলীন ও ভঙ্গের পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। বেকার সমস্যা বর্তমানে এমন প্রবল যে তার ফলেও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা অটুট রাখা সম্ভব হয় না,—গোলমেলে বা অবাধ্য শ্রমিকের স্থানে বেকার শ্রমিক বসিয়ে কাজ চালানো ধনজীবীদের পক্ষে আজ খুবই সহজ হ'য়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও এই গত যুদ্ধের সময়ও শ্রমিকগণ অনেক সময়ই বিপ্লব-বিরোধী পন্থা নিয়েছে। '৪২ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টায়ও আমাদের দেশের শ্রমিকগণ **essential service**এর খুচরা সুখ-সুবিধা পেয়েই, বিপ্লবের অনুকুল না হয়ে বরং প্রতিকূলই হয়েছিল। আজও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক ধর্মঘটের দিকেই এদের নজর বেশী; দেশের বৃহত্তর জনতার মঙ্গল সাধনে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে এদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। অপর দিকে বরং কৃষকগণ সরকারী প্রলোভনের বেড়া-জালে তত সহজে ধরা দেয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারীয় (czarist) সরকার শ্রমিকদের হাতে রাখার অনেক ব্যবস্থা করে;—**Workers' Group of the War Industry Committee** স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল, উহাই। জারীয় সরকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সফলও হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের দেশে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোন সময়ই কোন দেশের সর্বত্র-বিস্তৃত কৃষকদের তেমন ভাবে হাত করা সরকারের পক্ষে তত সহজ হয় না।

১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইউরোপ ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদনে মেতে উঠেছিল। তার সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা এই ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদনের উপরই গ'ড়ে তুলতে লাগল। কৃষিজ সম্পদ ও কাঁচামালের জন্য তারা নির্ভর করত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উপর। তারা মনে করেছিল এমনি ভাবেই বরাবর চলবে। কিন্তু সাম্রাজ্যিক রেষা-রেষি ও ঈর্ষার ফলে এই ব্যবস্থায় বাধা পড়তে লাগল। কাঁচামাল সংগ্রহের, মূলধন খাটাইবার ও উৎপন্ন মাল বিক্রীর ক্ষেত্র হিসাবে—আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার সাম্রাজ্যিক ও উপনিবেশিক ক্ষেত্র আর তেমন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রইল না। পূর্বে ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও বেচাকেনায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হল না। ক্রমে ইউরোপে জার্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বী হল। পরে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীও এল। জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীনের ও ভারতের কতক অংশ এবং ইউরোপের পরে আগত জার্মেণী ও ইটালী ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদনে ও বেচাকেনায় পূর্বাগত ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতির একচেটিয়া শোষণের বাধা হ'য়ে উঠল। সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ এমন বিশ্বব্যাপী হ'য়ে উঠল এবং মারণ অস্ত্রও এমন গুরুতর হ'য়ে উঠল—যে দূর দূর দেশ হ'তে খাদ্য বা কাঁচা মাল আনা বা দূর দেশে উৎপন্ন মাল বিক্রি ক'রে সমাজের পূর্ব ঠাট বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠল। তার ফলে সব দেশেরই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেরও আবার কৃষির দিকে নূতন ক'রে ঝোঁক দিতে হচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে এবং কৃষি ও কৃষককে উপেক্ষা ক'রে যে সমাজ বড় হ'তে পারে না—তা আজ সকলেই বুঝতে পারছে। অর্থাৎ এক শতাব্দী পূর্বে মার্কসের আমলে ইউরোপীয় সমাজে কৃষি ও কৃষক যেমন কতকটা অনাবশ্যক ব'লে বিবেচিত হত, আজ আর তা নয়। প্রত্যেক দেশেই আজ কৃষক সমস্যা—রাজনৈতিক দলসমূহের নজর আকর্ষণ করছে; সোভিয়েট রুশিয়া এই বিষয়ে প্রায় অগ্রণী। আজ গান্ধীও যদি কৃষকের দিকেই বেশী করে দৃষ্টি দেন, তবে বাস্তব সমস্যার মর্যাদাই তিনি দিচ্ছেন।

সমাজ ব্যবস্থার এই সব নূতন শক্তি ও ঝোঁকের (**tendency**) উদ্ভব, আজ আমাদের হিসাব করা দরকার। সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক মার্কসীয়বাদ থেকে কোথায়ও কোন বিষয়ে-ও কতটা সরে বা এগিয়ে গিয়েছে, তাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে মার্কসীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা সফল হয়েছে বা কতটা ব্যর্থ হয়েছে—আজ তা হিসাব ক'রে আমাদের পন্থা নির্ণয় করা দরকার। লেনিন যে মনোবৃত্তির নিন্দা ক'রে বলেছেন **"learned by rote—without studying the unique living reality"**—একমাত্র জীবন্ত বাস্তবকে অধ্যয়ন না করে, পুঁথির মুখস্ত বিদ্যা—সেই মনোভাব নিয়ে তোতাপাখীর মতো মার্কসের বুলি আওড়িয়ে গেলে, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। মার্কসের অভিজ্ঞতা, অনুমান ও আশার অনেক ব্যতিক্রম অর্থব্যবস্থায় এই পৌণে এক শতাব্দীতে হয়েছে; সোভিয়েট রাষ্ট্র-ও তা কার্যত স্বীকার ক'রে নিয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মার্কসের এমন কি লেনিনের আশাও সোভিয়েট রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে নি। লেনিন বলেছিলেন—স্থায়ী সৈন্য, স্থায়ী পুলিশ

ও আমলাতন্ত্র কম্যুনিষ্ট-আদর্শমুখী রাষ্ট্রে থাকবে না। (No standing army, no standing police and no bureaucracy in the interrim stage.) এই তিনটিই সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ প্রবলরূপে আছে। এর মধ্যে সোভিয়েটরাষ্ট্র-নায়কদের দোষ ত্রুটির কথা বলছি না,—বলছি বাস্তব অবস্থার অপ্রতিহত গতির কথা, যে গতির সামনে কেতাবী বাঁধি গৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। এর উপর এসেছে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সার্বাত্রিক রাষ্ট্র (totalitarian state) সমাজের সর্বাঙ্গকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার বার কায়দা সভ্য মানুষকে শঙ্কিত করেছে।

এমনি অবস্থায় এসেছেন গান্ধী-তাঁর ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ নিয়ে। মার্কসীয় ব্যবস্থার ব্যক্তি হল আত্মসত্তাহীন সমাজের অঙ্গ। তার বিষময়রূপ আমরা দেখছি ফ্যাসীবাদে, যার গঠনে ও প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবীদের অবদানও কম নয়। সমষ্টিগত সমাজের মঙ্গলময় রূপ ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস হচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্রে। এর মধ্যে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থান কতটা থাকবে—আজও তা সন্দেহের। ব্যক্তিকে সমষ্টিগত সত্তার নিকট বিসর্জন দিয়ে মঙ্গলকর ব্যবস্থা কি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে, তাও সন্দেহজনক। তাই গান্ধী ব্যক্তির স্বতন্ত্র আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সত্তা মান্য ক'রে—নূতন অর্থ ব্যবস্থার সূচনা করেছেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ধন সঞ্চয়কে তিনি চৌর্য বলে অভিহিত করেছেন।* গান্ধীর ব্যবস্থার মধ্যে সমবায় প্রথার স্থান সঙ্কুলানও হতে পারে;—এবং সর্বোপরি ব্যক্তির আর্থিক স্বতন্ত্রসত্তা এতে স্বীকৃত হয়েছে।

মার্কস ঐতিহাসিক ডায়েলিকটীকের (historical dialectic) উপর একটু অতিরিক্ত নির্ভর ক'রে আগতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের আর্থিকরূপ যৌথ-কারবার (joint stock co) ও সমবায় সমিতির (co-operative society) সম্ভাবনা দেখতে পান নি,—যদিও তাঁর জীবিতকালেই এই সব দেখা দিয়েছিল। তিনি কৃষকের শ্রমকে উপেক্ষা করেছেন বৃত্তিহীন শ্রমিকদের দুঃখে অভিভূত হ'য়ে এবং সর্বোপরি কল কারখানার এমন তীব্র নিন্দা করেও। বোধ হয় গান্ধীর চেয়েও তাঁর ভাষা এই বিষয়ে কঠোর। তিনি কল-কারখানাকে বাদ দিবার প্রস্তাব করতে সাহস পান নি। আজ গান্ধী মার্কসের এই সব ত্রুটি শুধরিয়ে চলবার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির অভাব থেকে একথা বলছি না;—একথা বলছি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি মার্কস একজন যুগপ্রবর্তক; সমাজের গতি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ ত' সর্বকালের জন্য অভ্রান্ত নন। কিন্তু তিনি যখন শ্রমজীবীর একাধিপত্য বা "Dictatorship of the Proletariat" এর জন্য আহ্বান দিয়েছেন, তখন তিনি যে সমাজের বিরাট শ্রমশীল কৃষক-জনতাকে উপেক্ষা করেছেন, তখন তিনি যে কারখানার বাইরে শ্রমিকের স্বাধীন ও স্বাবলম্বী রূপকে অসম্ভব ব'লে ধ'রে নিয়েছেন—তা ত অস্বীকার করার নয়।* অবশ্য মার্কস বহু স্থলে কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকা ও সম্ভাবনার কথা পরে বলেছেন; কিন্তু প্রধানতঃ ইংলণ্ডের অবস্থাকে মনের সামনে রেখে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি বিত্তহীন শ্রমজীবীকে-ই বা proletariat কে-ই একমাত্র বিপ্লবের যন্ত্র হিসাবে নিয়েছেন। আজ গান্ধী যদি এই ত্রুটি সংশোধন করেন, তবে তা ও স্বীকার ক'রে নিতে হবে।†

* We are thieves in a way if we take anything that we do not need for immediate use and keep it from somebody else who needs it......So long we have got this inequality, so long I shall have to say we are thieves.

* অবশ্য পরবর্তী জীবনে জার্মেনীর কৃষক বিদ্রোহের সংবাদের পর, তিনি কৃষকদের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন থাকতে পারেন নি। কিন্তু তবুও তার ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার শেষ কথা রেখে গেছেন—কারখানার শ্রমজীবীদের একাধিপত্যে (Dictatorship of the proletariat), তার মধ্যে কৃষকের কোন স্থান-ই প্রায় নেই।

† বাংলায় industry শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে চলছে শিল্প। industrial area এ বাংলা হ'ল—শিল্পাঞ্চল। আমার মনে হয়—এটা ভাষার দৈন্যের পরিচায়ক এবং শিল্প শব্দটার প্রতি এতে জুলুম করা হয়। তাই আমি বাংলাতে ইণ্ডাষ্ট্রি শব্দই রেখেছি। এমনি বিদেশী শব্দ ত বাংলায় বহু গ্রহণ করা হয়েছে।

অরুণাচলের ঋষি

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

রাত্রির তৃতীয় যামে তরুণ তাপস তড়িতাহত হয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে—কে যেন তাঁকে ডাকছে। কার ডাক্ তিনি শুনলেন, কে সে, কোথায় সে—স্কন্দপুরাণে তিনি পড়েছেন, তীর্থশ্রেষ্ঠ অরুণাচলের কথা, বালারুণের মত প্রোজ্জ্বল, স্বয়ং ক্ষেমঙ্কর শিব যার কেন্দ্রে অধিষ্ঠান্। দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত নিদাঘতপ্ত গ্রীষ্মের পর ঝরঝর বর্ষা, বর্ষার পরে শুভ্রশরৎ, আলোছায়ার লুকোচুরি নিয়ে, হেমন্তের দিনান্তে ঝলমল করে শস্যমালিনী পৃথিবী, আসে শীত, আসে নবমুকুলিত বসন্ত, পরিব্রাজকের পরিক্রমার কিন্তু শেষ নেই—ক্লান্তিবিহীন পথ। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, খোঁজার আর বিরাম নেই—কোথায় তুমি! উন্মাদ হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান্ দেশে দেশে, অরণ্যে কান্তারে—দেখা দাও দেখা দাও। হঠাৎ এক শুভক্ষণে লগ্ন এলো—বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে উঠেছে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত একটি

রেখা, সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাচল—হাতছানি দিচ্ছে—এসো তুমি বন্ধু সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে আমার এই আশ্রয়ে। বিদ্যুৎদৃষ্টিতে দেখলেন তিনি পাহাড় বাঙ্ময়, প্রাণময়, তার অণুতে অণুতে স্পন্দন্। ওই তো সেই শ্যামলসুন্দর, চিরহাস রসিক, প্রশান্ত মহেশ্বর। ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ে—কি অপরূপ বেশেই তুমি দেখা দিলে প্রভু নাড়ি নাড়া দিয়ে আপনাকে জাগে।

ইনিই তামিল দেশের মহর্ষি রমণ্—আজও অরুণাচলের পাদপীঠে তপস্যামগ্ন। ভারত ইতিহাসের প্রথম পরিচিত পর্বে আমরা শুনেছি মানব কল্যাণ কামনায় হিতব্রত স্থিতধী আরণ্যক ঋষিদের কথা—কত সামধ্বনি হোমধূমাগ্নি কলরবমুখরিত বেদগান। তারপর কতযুগ কেটে গেছে, কত শতাব্দী পার হয়ে মানুষ চলেছে, দেশে দেশে সৃষ্টির রূপ বদলেছে, সংস্কৃতির রূপান্তর, নতুন মত, নতুন রীতি চলতি পথে ভিড় জমিয়েছে, কত দুঃখ বেদনা, আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ বেয়ে সে যাত্রা। শত বাধা বিপর্যয় দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যেও ভারতবর্ষের সাধক কবি কর্মী মনীষীরা ঋষিকুলের সেই পুরাতনী বাণী বহন করে চলেছেন আজও এই বিংশশতাব্দীর পঞ্চম পাদে গুহাগহ্বর আশ্রমের উপান্ত থেকে জনঅধ্যুষিত প্রান্তরে, প্রাণোৎসবের সার্থকতায়।

মহর্ষি রমণ সেই গোষ্ঠীরই একজন। বাংলাদেশে অপরিচয়ের ব্যবধান হেতু তাঁর সম্যক্ স্বীকৃতি হয়ত নেই। কিন্তু যাঁরাই এই তপোজ্জ্বল ঋষিকে তাঁর চিরশান্ত সমাহিত তপস্যার অপ্রগল্ভ আসনে স্থির অচঞ্চল দেখেছেন তারাই মনে মনে নমস্কার জানিয়েছেন। বিখ্যাত লেখক পল্ ব্রণ্টনের লেখাতেই তিনি প্রথমে প্রতীচির কাছে প্রচারিত হন, **A Search in Secret India**, **A message from Arunachala** প্রভৃতি পুস্তকে।

মহর্ষি রমণ্ স্বয়ং তামিল ভাষায় তাঁর সাধন্ সন্ধানের গূঢ় কথা, কয়েকটি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তারই ভাবসৃষ্টির একটু ক্ষীণ পরিচয় নীচে লিপিবদ্ধ হল।

মৌনীমুনি, ধ্যানী অরুণাচল
ঊর্দ্ধশীর্ষ, বিলীনাক্ষ হে অতল
উদয় অচল চূড়ার স্তব্ধ উপান্তে
সমীরিত আকাশের নিমীলিত সীমান্তে
মুক্ত মহাকাল অতন্দ্র আছ জাগি
যুগ যুগ ধরি তব ভক্ত লাগি
কে বলে তোমায় শুধু পাথরে গড়া অচঞ্চল
নির্বাক্ নিষ্প্রাণ্ নিশ্চল
নও তুমি নও তুমি
পাষাণ তৃণগুল্ম গিরিদরীভূমি
মসীলেখা ধরণীর বুকে
তুমি দিলে এঁকে
কালো ঘেরি মরকতরেখা
আলোক আলোর একটি লেখা
মগ্ন শান্ত স্তব্ধ
হিরন্ময় হিরণ্যগর্ভ।
সবিতার দ্যুতি নবোজ্জ্বলা
তব অঙ্গন্ তলে কভু হয়নি নিষ্ফলা

হে প্রভু, শ্যামল শোভন্
মর্মপ্রিয়, মনোমোহন্
তোমাতে আমাতে
পরম প্রীতিতে
কি রীতিতে করিলে উন্মন্
বন্ধনহীন্ নিমন্ত্রণ
মনপ্রাণ নিলে হরে
রূপরসে দিলে ভরে
ধ্যানমগ্ন সে তুমি
সম দুঃখ সুখ জ্ঞানী
তাই নিয়েছি শরণ্
মরণ জয়ী ঐ রাতুল চরণ
তোমার হৃদয় কন্দরে
মোর মন আজি বন্দরে।
আমি শুনেছি তব অশ্রুত ভাষা
নীরব নীরাদ্রির অপ্রমত্ত আশা
অরণ্যবীথির অণুতে রণিত স্পন্দনে
প্রতিটি ধূলিতে পাতে রূপরূপের মন্থনে

শুনেছি তব সাদর সামগান
আকুতি ব্যাকুল আহ্বান্
নিঃসীম নৈঃশব্দ্য মাঝে
অনাহত একতারায় বাজে
প্রত্যুষে সায়াহ্নে
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে
রাত্রির গভীরে উচ্ছ্বসি
রিক্ততা পূর্ণতায় মহীয়সী
শান্তি শিব কল্যাণের সে বাণী
জলে স্থলে ব্যাপি বনানী
অন্তরের আঁখি দিলে খুলে
দৃষ্টি করা দৃষ্টি দিলে মেলে
মনের মণিকোঠায়
পৃথকের সত্তা সেথা লুকায়
বিলুপ্তির বিরামতটে
চির চরমের তটে
পরিপূর্ণ একটি প্রমাণে
সেই তুমি প্রাণারামে।

অৰ্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা - শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

(১১)

নীহারিকা সবই শুনল। বন্ধুমহলে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর এই রকম আলোচনা অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে করল—কিন্তু তার মুখ সে বন্ধ করবে এবং কি করে বন্ধ করবে? বাধা দিলে হবে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। আর প্রদ্যুম্নটাও এমন বোকা; মুখের মধ্যে যেন বুকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। রঘুবংশ পড়তে পড়তে যদি দেখল সে জানালার উপর দিয়ে মেঘ যেতে যেতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ওর মুখ দেখেই মনে হবে যেন ও বলছে—হায়, আজ আর আমার লিপি অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে পৌছাল না। কীট্স্ পড়া যখন হয়—মনে হয় বেচারার হৃদয়ে শত কীট দংশন করছে। আহা এমন সরলহৃদয় বন্ধুর প্রণয় পথ এত অসরল কেন? একই শতাব্দীর দুই যুগের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের এত প্রভেদ কেন?

তাই সে ঠিক করল যে প্রদ্যুম্নকে যুদ্ধাভিমুখী করতে হবে, আর তারই প্ররোচনায় সুরধুনীকেও জাগাতে হবে। তার ফলে মোক্ষদা যদি তাজ্জব বনে যান তা বনতে দাও; তার নিজের মতে নিয়ন্ত্রিত সংসারে বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে বলে যদি মনে করেন ত করতে দাও। বিপ্লব? হ্যাঁ, ওই কথাটাই ঠিক। অতীত যখন বর্ত্তমানের কণ্ঠরোধ করে ভবিষ্যতের সঙ্গীত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে তখন বিপ্লবই চাই। বিপ্লব।

ওর মতে রবি ঠাকুরী মিইয়ে-পড়া চাল ছেড়ে দেওয়া বিলাপের সুরে আর চলবে না। সেদিন বন্ধু বহুক্ষণ তার ঘরে বসেছিল। বেশী কথা হয় নি। কোন ভাব বিনিময়ও হয় নি। শুধু সে জানতে পেরেছিল যে বাড়ীর সবাই থিয়েটারে গেছে। তারও আহ্বান ছিল কিন্তু নীচের স্টলে (স্টেবল অর্থাৎ আস্তাবল নয়, মশায়। ওটাকে স্টল বলে, কারণ সেখানে সেঁটে বসতে হয়) তাকে একা বসতে হত আর সবাইকে—অর্থাৎ যে নিজেই তার কাছে সব, তাকে—বসতে হত আর সবার সঙ্গে উপরে চিকের আড়ালে, পুরুষদের সঙ্গে আড়ি করে। কাজেই প্রদ্যুম্ন বন্ধুর বাড়ীতে বিশেষ নিমন্ত্রণের অজুহাতে অভিনয়ের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছিল। থিয়েটারে যাবার সময় অল্পক্ষণের জন্য সুরধুনীর সঙ্গে একা দেখা হয়েছিল শোবার ঘরে; সে তখন অভিমানে ঘর ছেড়ে রওনা হয়ে যাচ্ছে। দুজনে বেশী কথা হয় নি, বাইরে যে সবাই সোরগোল করে অপেক্ষা করছে। কাজেই সে জানায় নি অভিমান, আর সুরোও বলতে পারে নি নিজে কি চায়। প্রদ্যুম্ন চুপচাপ এসে বসেছিল নীহারিকার ঘরে। বাক্যালাপ হয় নি, হয় নি অভিযোগ বর্ণনা বা অভিমান ব্যঞ্জনা। শুধু নীরবতা সরব হয়ে ঘরটী ভরে ছিল।

সেদিন রাত্রে প্রদ্যুম্ন চলে যাবার পর নীহারিকা অশান্ত উত্তেজনায় সারা ঘর পায়চারী করে কতক্ষণ কাটিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। রাত্রি গভীর হয়ে গেল, চাঁদ আকাশে হেলে গেল। সহরের শেষ 'বাসে'র শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, আর সে একটী সনেট রচনা করে তার পরে ধীরে ধীরে শান্তি পেল।

বিদায় আরতি শেষে নিশীথের বাস
যদি ভারী হয়ে আসে স্মরিয়া তোমায়,
যদি কভু বিরহার্ত্ত হৃদয়ের ভার
ভুলে যেতে চায় তব বসন্ত সন্ধ্যার
সীমন্ত সিন্দুর রাগ—সে হৃদয়খানি
দুরান্তরে রাঙাইব সাধনার বাণী
গুঞ্জরিয়া। যতটুকু তব স্পর্শডালা
তোমারেও না জানায়ে এ দূর নিরালা
জীবন ভরাতে পারে, শুধু সে টুকুরে
যদি পাই—তার বেশী ব্যথাহত সুরে
চাহিব না, প্রিয়ে। যাহা দিলে তৃপ্তি পাও,
যা বরিয়া নিলে মোর মৌন বেদনাও

জ্বলিবে অনল হয়ে, তুমি দিয়ো তাই ;
সে আগুন ছানি' আলো লভিব সদাই ।

কিন্তু আর এই উদাস বিধুর আত্মবিলোপে চলবে না। এখন চাই বিক্রম, চাই আক্রমণ। চাই বিপ্লব, চাই বিপ্লাবন। মোক্ষদার মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। যৌবন যে যায়। তার প্রত্যেকটা দিন, ঘণ্টা, প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত এ চায় বিকাশ ও বিস্তার ; তাদের দাবীকে ঠেকিয়ে নিজেদের বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত্ত করে রাখা চলবে না আর। প্রদ্যুম্নকে প্রয়াস করতে হবে যাতে সুরধুনার মনে জাগে সুরগুঞ্জন আর নিজের মনে আসে সাহস নিজেকে স্বীকার করবার। ভ্রূক্ষেপে উপেক্ষা করো বাড়ীর চিরাচরিত ধারাকে। শাশুড়ীর কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনো নববধূকে। নববিবাহিত দম্পতী কি মিলবে শুধু রাত্রির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে প্রেমাবিষ্ট মোহের মধ্যেই। প্রতিটী ক্ষণের প্রতি চিন্তা কর্ম্ম আশার সহভাগিনী যে—তাকে কি পাওয়া যাবে না সব সময় ইচ্ছা মাত্রই—এই বয়সে—যখন মনে নিত্য দোলা লাগছে, জীবনে জাগছে উচ্ছ্বাস ? তা ত হতে পারে না। অতএব ব্রাউনিং পড়াও সুরধুনীকে।

ইংরেজ কবি ব্রাউনিংকে প্রাচীনপন্থী পরিবারের কিশোরী বধূকে উদ্ধার করবার জন্য কেন ডাকা হল তা জানলে ইংরেজরা এদেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে নিশ্চয়ই। তার একটী কবিতাতে এক ইটালিয়ান ডিউক ফার্ডিনাণ্ড রিকার্ডি নামে আর একজন ডিউকের স্ত্রীকে ভালবাসতেন ; তাকে কামনা করে প্রত্যহ রিকার্ডি প্রাসাদের পাশ দিয়ে যান—আর বধূও তাকে ভালবেসে জানালা থেকে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারা পলায়নের বন্দোবস্ত করেও পালাতে পারলেন না। জীবনে পেলেন শুধু দৃষ্টি বিনিময়। ক্ষণস্থায়ী যৌবন স্বপ্ন মলিন হয়ে আসতে লাগল ; তাই বধূ তার আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপন করলেন বাতায়নে, আর নাচের উদ্যানে ডিউক প্রতিষ্ঠা করলেন তার নিজের প্রতিমূর্ত্তি। অনন্ত প্রেমের এই ক্ষুদ্র পরিণতিকে কবি বলেন পাপ। পূর্ণ মিলন হল না, প্রদীপ জ্বলল না মণিকোঠায় ; জীবনে ছড়িয়ে রইল অভিশাপ। সে কথা বুঝতে হবে প্রদ্যুম্নকে, আর বুঝাতে হবে সুরধুনীকে।

বলা ত সহজ, কিন্তু করার পথ কই ? বাগবাজারের উপর ব্রাউনিংএর বোমা ফাটালেও কোন ফল হবার আশা নেই। রক্ষণশীলতা হচ্ছে সবচেয়ে কার্য্যকর বিফল দেওয়াল, ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যাফল ওয়াল। আধুনিকতার কত বোমা কত গোলাগুলি এসে তাতে ঠেকে হঠে গেল, এমন কি গেঁথে গেল। সে দেওয়ালে ফাটল ধরল, গাথুনী ভেঙ্গে পর্য্যন্ত গেল। তবু পড়বার নামটী নেই। অতএব দূর থেকে গতিবেগ নিতে হবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাকে বলে মোমেণ্টাম।

তাই সে প্রদ্যুম্নকে পরামর্শ দিল সুরধুনীর পিত্রালয় থেকে আরম্ভ করতে। শূন্য ঘণ্টা অর্থাৎ জিরো আওয়ার ঠিক হল রবিবার বিকেল বেলা, যে সময় বাপের বাড়ী থেকে সে ফিরে আসবে স্বামীর সঙ্গে। মোক্ষদার কবলে পড়বার আগেই একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে প্রচণ্ড ভাবে।

বাপের বাড়ীর কন্যা ও শ্বশুর বাড়ীর বধূ একই প্রাণী হলেও একই মন নয়। তারা দুজন সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথিবীর বাসিন্দা। একজন প্রভাত পদ্ম, আর একজন সন্ধ্যার সূর্য্যমুখী। একজন জেগে থাকে সারাদিনের আলো হাসি আনন্দের মধ্যে, অন্যজন মুদে আসে বিষণ্ণ সন্ধ্যার মৌনতায়। কাজেই সুরধুনীর জীবন প্রবাহের গতিমুখ ফেরাবার এই বন্দোবস্ত করা হল তার অজ্ঞাতে।

(১২)

কোন্ কবি বলেছিল ক্লান্ত দ্বিপ্রহর ? সে নিশ্চয়ই আসলে কবি নয়। দ্বিপ্রহরের মত সতেজ সক্রিয় মন প্রত্যূষেও পাওয়া যায় না। মধ্যাহ্ন সঙ্গীতের মত উদাত্ত গভীর সুর সন্ধ্যার পূরবীতে কোথায় ? দুটী প্রাণ আজ যেন জীবনের সঙ্গে ঝুলন খেলায় মেতেছে—অবিরাম, আত্মহারা, আনন্দোচ্ছল।

সুরধুনী। আজ তোমার কি হয়েছে বল ত ?

প্রদ্যুম্ন। কই, রোজ যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছুই নয়।

সু। উহুঃ, মনে হচ্ছে হয়েছে অনেক কিছু।

প্র। যদি হয়ে থাকে ত হতে দাও। অনেক কিছু ও কোন কিছুই না এ দুইয়ে মিলে যাক—যেমন করে আমরা মিলে যাচ্ছি।

সু। না কই ? আমরা ত মিলি নি। তুমিই ত বল

যে আমাদের ঠিক মিলন হচ্ছে না। তোমার সেই জার্ম্মাণ 'হায় হায়' কবি কি বলে এ সম্বন্ধে ?

প্র। ও, সেই 'হাইনের' কথা বলছ ? প্রেমের প্রত্যেক পর্ব্ব সম্বন্ধেই তার কবিতা তৈরী আছে। সখি তবে অবধান কর।

তোমার নয়ন পানে চাহিয়াছি আমি
বাথা অবসান হয়ে ঘুম গেছে দূরে,
মধুর সরম মাখা অধরেতে চুমি
পূর্ণ হয়েছি আমি সর্ব্ব সুখ পুরে ;
তোমার বুকের মাঝে বক্ষ তার রাখি
আমরা বিরাম সুখ অলকার পাই,
বলো সবে আমি শুধু তোমা ভালবাসি
আমি যে আঁখির জলে কাঁদিয়া ভাসাই।

সু। থাক্ থাক্ কবিচোরামণি, ওকথা শুনে আর কাউকে কাঁদতে হয় না।

প্র। কেন ? অতি আনন্দে মানুষ কাঁদে না ? তুমি বলবে যে তুমি আমায় ভালবাস, আর আমি কান্না সামলাতে পারব ?

সু। নাঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। কলেজে পড়েও মানুষের কাণ্ডজ্ঞান হয় না। না হলে যেটা অবশ্যই পাবে তা পাচ্ছ জেনে কেউ কাঁদতে চায় ?

প্র। কে বলে অবশ্যই পাব ? ওই তোমাদের সেকেলে পাওয়া—বিয়ে করে সিন্দুকে চাবী দিয়ে গদীয়ান হয়ে সংসারে বসাটাকে আমি পাওয়া মনে করি না।

সু। ও, তুমি বুঝি একেলে পাওয়া চাও ? প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে ভেসে বেড়ান : কমুনিষ্ট পাওয়া না কি একটা নাম হয়েছে আজকাল লোকে বলে। আচ্ছা কমুনিষ্ট কি ?

প্র। সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ কমন ইষ্টে সবার কম অনিষ্ট হবে বলে যারা মনে করে তারা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট। আমাদের কলেজে কয়েকটা লক্কা পায়রা আছে, লাল ঝাণ্ডাওয়ালা সব পাণ্ডা কম্যুনিষ্ট। কারণ প্রাণটা তাদের নিশ্চিন্ত আছে পৈতৃক সম্পত্তির পাকা ভিত্তিতে। যাক ওদের কথা। চল আজ তোমায় কান্না সাগর দেখিয়ে আনব গঙ্গার বুকে।

"আমার রোদন ভুবন ব্যাপিয়া
দুলিছে যেন।"

সু। কোথায় সেটা ? আর কান্না সাগরই বা কেন ? তার চেয়ে চল না, হাসি সাগর যদি কোথাও থেকে থাকে।

প্র। তুই তোমায় দেখাব। সে কোন্ জায়গায় এখন তোমায় জানাব না। আমাদের গাড়ীটা নূতন এক ড্রাইভার চালিয়ে এনেছে। সে সব জানে। চল আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। মাকে বুঝিয়ে রাজী কর।

সু। বোঝাবারই বা দরকার কী ? ও বাড়ীতে বিকেলে কুটুমরা আসছে বললেই হবে। কেহ ত আর খবর নিয়ে দেখছে না। তুমি কিন্তু কাউকে বলতে পাবে না বলে দিচ্ছি। আর শোন, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা নেই। রাত্রে ফিরেও বাড়ীতে বলতে হবে যে এখানে অনেক লোক এসেছিল—তাই দের হতে দেরা হয়ে গেল।

প্রদ্যুম্ন ভাবছে এ কী পরিবর্ত্তন হল আজ সুরধুনীর। এ যে নূতন লোক, নব বিস্ময়ের আনন্দ ছড়াচ্ছে নিজের চারদিকে। নিজে থেকে সহজে ধরা দিচ্ছে। সাবলীল-ভাবে কথা বলছে, স্বাধীন বাতাসে প্রজাপতির মত রঙীণ পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে তার মন। আজ তার মায়ের পুত্রবধূ নয়, তার নিজের বঁধু—ইটালিয়ানে যাকে বলে 'কারা মিয়া'।

'কারা মিয়া'। প্রিয়া মোর। কথাটী মধুমালতীর মত কেবল মিষ্টই নয়, এতে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধবৈচিত্র্যও আছে। এ যেন শুধু স্বদেশী সন্দেশ নয়, ভেনিসের লেমন কেক। সনাতনী বাঙ্গালিনী চিরন্তনা অভিসারিকারূপে ধরা দিয়েছে আজ, কাছে আসতে চাইছে—খুব কাছে—সজীব সাজে—বুকের মাঝে। এ শুধু মন্ত্রের গ্রন্থিতে গৃহকোণে আবদ্ধ বিবাহিতা স্ত্রী নয়। এর মন জাগাতে হয়েছে, একে জয় করতে হয়েছে, একে পাবার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছে। সহস্র জনের মধ্যে তুমি মাত্র সেই একজন—যে মান অভিমান লোকলজ্জা সব কিছুর পরীক্ষা পার হয়ে ওর মনের কাছে এগিয়ে এসেছে। তাই প্রাপ্তির পূর্ণতাও হয়েছে গভীর। বুকে ফুলের মালার

ব্যবধানটুকুও আজ সইছে না। দেহ সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে কিন্তু আত্মা অসীমে এসে মিশাবে। বধূ আজ হবে বঁধু।

গঙ্গার উদার উন্মুক্ত তীরভূমিতে মোটর হাওয়ার মত উড়ে চলল। সঙ্গে পাল্লা দিল দুটী উচ্ছল উন্মুখ প্রাণ—বাসনাব্যাকুল, মিলনমুখর, অনুরাগরঞ্জিত, পরস্পরসমাহিত। দেহের তটভূমিকে হৃদয়স্রোত এসে ছল ছল রবে স্পর্শ করে যেতে লাগল। আজ কাছে কেহ নেই, নেই কোন সংসারের বাধা বা সময়ের বন্ধন। জনমানব বুঝি নেই পথে, জেটী থেকে ফিরছে না খালাসী কুলীর দল। সামনের শোফারটীও লোপ পেয়ে গেছে। তার মাথার ক্যাপ সামনের দিকে নীচু করে টানা, একমনে সে গাড়ী চালিয়ে চলেছে। সামনের সীট দুটীও পিছনের মাঝখানে কাঁচের পর্দ্দা টানা আছে। গঙ্গাবক্ষে শুব্ধ ষ্টীমারগুলির শাদা ফানেল বাহির বিশ্বের অনন্তে ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের কোন একটার ভিতর থেকে বেতারে নাচের বাজনা ভেসে আসছে—যেন মুগ্ধ সমীরণ স্নিগ্ধ সলিলস্রোত স্পর্শ করে ওদের এসে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন কাল-বৈশাখীর মেঘ ঘন হয়ে নত হয়ে নেমে এসেছে নদীর উপর। ছিন্ন একটু মেঘের ফাঁক দিয়ে কনে দেখা আলো এসে পড়ছে সুরধুনীর লীলাচঞ্চল আনন্দোচ্ছল মুখে। শুধু প্রদ্যুম্ন আর সুরধুনী। ত্রিভুবনে আর কেহ নেই।

সু। শুনছ সেদিন থিয়েটারটা মোটেই ভাল লাগল না।

প্র। কেন? খুব ভাল পালাই ত ছিল। শুনলাম মা নাকি ঠিক করেছেন আবার যাবেন সেটা দেখতে।

সু। তা করুন। আমার ভাল লাগে নি। তবে থিয়েটারের আর এমন কি দোষ ছিল। ওরা ত ভালই করেছিল।

প্র। কি? কি বললে? ওরা ভালই করেছিল? তবু তোমার ভাল লাগল না? পরিহাসে তরল হয়ে সে আবার বলে উঠল—কেন? চিকের পিছনে এতগুলি চোখ—সবাই জমাট হয়ে বসে দেখছিলে, তবু ভাল লাগল না?

কিন্তু সুরধুনী আজ অন্তলোকে বিচরণ করছে। পরিহাসকে সে হাসিমুখে সরিয়ে দিল। সহানুভূতিতে কোমল দুটী আঁখি মেলে বলল—তুমি ত জান না ওই চিকের ঢাকনা আমার মনকে পাথরের মত চেপে রেখেছে। তুমি চাওনা এরকম, তা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি সাহস করে বেঁকে দাঁড়াতে পার না কেন? পার না কেন আমার ওই শত বাধা লোকাচার আর সারাদিনের বিরহের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে? ওদের সামনে নিজেকে মনে হয় আমি নই, আর তোমাকেও দেখি এত অসহায়। কেন, কেন তুমি পার না?

ওর কণ্ঠে একটু উত্তেজনার আভাস এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে বিহ্বল হৃদয়াবেগে প্রদ্যুম্নর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। কি নিশ্চিন্ত নির্ভর, কি পরম পরিতৃপ্তি।

ক্ষণপরে সুরধুনী বলল—চল, আজ আবার আমরা থিয়েটারেই যাই। আর সেই থিয়েটারেই যাব।

প্র। কেন, সেটা ত একবার দেখলে? চল, বরং অন্য কোনটাতে যাওয়া যাক।

সু। না, সেটাতেই যাব। আমাদের বিয়ের পর প্রথম অভিনয়-দেখা এমন ভাবে অঙ্গহান হয়ে থাকতে দেব না। সেদিন যা দেখেছি তা অভিনয় নয়, নিজের মনের অভিচার। আজ সেখানে গিয়ে দুজনে একসঙ্গে নীচের হলে সবার মাঝে বসে সেদিনটার উপর প্রতিশোধ নিব।

প্র। ঠিক, ঠিক বলেছ। চল, ওখানেই যেতে হবে। ড্রাইভার, চলো শ্যামবাজার।

ক্রমে ভীড়ের পথে মোটর চলতে লাগল। চার পাশে উৎসুক প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি, মোটরের কাঁচের জানালার খুব কাছে দাঁড়াচ্ছে ট্রামের যাত্রীর দল। একবার পথে পুলিশ গাড়ী থামালে—মনে হল সবাই গাড়ীর ভিতরের দিকে তাকাচ্ছে। আপনার অজ্ঞাতসারে সুরধুনীর মাথার ঘোমটা একটু নেমে এল।

প্রদ্যুম্ন লক্ষ্য করল। ভয় হল, এবার বুঝি তার ক্ষণস্থায়ী নবলব্ধ জীবনের উচ্ছ্বাস ও স্বাধীনতার উপর যবনিকা নেমে আসছে। সারা দ্বিপ্রহরের অশিক্ষিতপটু প্রেমকূজনের পর গঙ্গাতীরের উদার প্রশস্ত বিস্তার সুরধুনীর মনে যে প্রবাহ জাগিয়েছিল পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত স্পর্শ লেগে তার গতিপথ ক্ষুণ্ণ হয়ে আসছে; জনতার বালিতে স্রোতধারা

শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে; সংস্কার সংহার করতে সুরু করেছে সগু অর্জ্জিত স্বাধীনতাকে।

লঘু পরিহাসে গুরু আবহাওয়াকে সহজ করে তুলবার জন্ম সে বলল—এই দেখ, এই রাস্তাতে কতগুলি সিনেমা নূতন গজিয়ে উঠেছে। এগুলিতে মেয়েদেরই এত ভাড় হয় কেন জান?

ক্লান্ত, অনেকটা নিস্পৃহ সুরে সুরধুনী বলল—না, তুমি বল, কেন?

প্র। দেশী ছবি দেখে ভবিষ্যৎ আর অনন্ত যৌবন সম্বন্ধে সবারই আশা হয়। মনে হয় যে যাক্, বয়স আর বাড়বে না। যতই মোটা হয়ে যাই, মুখে বয়সের রেখা পড়ুক, তন্বী তরুণী নায়িকা সাজা আমার আটকায় কে? কায়কল্প চিকিৎসারও দরকার নেই। ওগো তুমি চিরপঞ্চদশী?

সু। বা রে, বেশ ত। আর তোমরা বুঝি হতে চাও না চিরপঞ্চবিংশতি?

প্র। চাই বই কি। কিন্তু দেয় কে? নায়িকার যে প্রেম খোলে না নায়কের বয়স বেড়ে গেলে। দর্শিকারা দেয় না হাততালি, আর দর্শকরা দেয় গালাগালি। নায়িকাদের অবশ্য সাতখুন মাপ। সিনেমার পর্দ্দায় পাবে খাঁটী শিভ্যালরীর শিহরণ। তাই ত দেশী ছবিগুলি অত কাঁপে।

সু। আর থিয়েটারে কি হয়?

প্র। থিয়েটারে গেলে মনে হয় সারাটা জীবন শুধু অভিনয় করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। নাচো কাঁদো কথা কও সবেতেই বীর রস। ভীরু বাঙ্গালী জীবনে বীরত্ব আমরা পুষিয়ে নিয়েছি ওইখানে। ভাবের অভাবকে ভরে দিয়েছি কথার ভারে। এই যে এসে গেল দেখতে দেখতে। চলো আমরা অভিনয়ের মুখোমুখী হয়ে বসি আজ।

মোটরের ভিতর থেকে চারদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে অবগুণ্ঠন একটু নামিয়ে নিল সুরধুনী। হাত ধরাধরি করে দ্রুত সাবলীল গতিতে প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। নারী জেগে উঠেছে আজ অর্দ্ধেক মানবাতে; অর্দ্ধেক কল্পনা এসে মিশে গেছে তার সঙ্গে। আজকের অভিনয় যেন না ভাঙ্গে ওদের জীবনে।

ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এসে ক্যাপটী খুলে চুলের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে নীহাররঞ্জন তখন স্মিত প্রসন্ন মুখে থিয়েটারের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

সমাপ্ত

* ভানিয়া

শ্রীউমাশশী দেবী বি-এ, বি-টি, সরস্বতী

[ত]াকার কুশনের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মিলোচ্কা ফুঁপাইয়া [ফুঁ]পাইয়া কাঁদিতেছিল। সুন্দর গোলাপ ফুলের মত [মু]খানি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে [দিন]টীর জন্ম সে এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া অপেক্ষা [ক]রিতেছিল—সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দিনটী আজ তাহার [দ্বা]রে আসিয়া করাঘাত করিতেছে; কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর [পরি]হাসে তাহাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

প্রথানুযায়ী ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তাহাদের খৃষ্টমাস উৎসবের নাচের মজলিসে যাইতে হয়। মিলোচ্কা তাহার যৌবনের প্রথম প্রভাত হইতেই এই দিনটীর জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আজ সকালে তাহার মা তাহাকে জানাইয়াছে যে, এ বছর টাকার টানাটানির জন্ম নূতন পোষাক কেহই পাইবে না এবং সেইজন্ম নাচের আসরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাই নয়, নাচে যাওয়ার জন্ম খরচ জোগাড় করা স্বপ্নের অতীত। এ নিষ্ঠুর আঘাতের জন্ম মিলোচ্কা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

* একটী রাশিয়ান গল্প হইতে।

বাল্যকাল হইতে সে ভোগবিলাসের ভিতর দিয়া লালিত হইয়াছে, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সে যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে তখনি। তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই সমস্ত সংসারটা যেন প্রবল ঝটিকায় ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মিলোচ্‌কারও সুখের জীবন শেষ হইয়াছে। তিনি যে সামান্য কয়েক হাজার রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা শেষ হইলে তাহাদের এখন নূতনভাবে সাধারণ জীবনযাপন করিতে হইতেছে।

খ্রীষ্টমাসের ছুটীতে মিলোচ্‌কা প্রচুর আনন্দ, প্রচুর আশা লইয়া বোর্ডিং হইতে ফিরিয়াছিল। সামাজিক নাচে সে তাহার মায়ের সহিত যাইবে বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল, আশা আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্ত্তে মায়ের আদেশে ভাংগিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। খ্রীষ্টমাস উৎসবের জন্য বাড়ীতে সামান্য কিছু আয়োজন হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের দুঃখ লইয়াই বিব্রত হইয়াছিল। এমন সময় ঘরে ঢুকিল তাহার উনিশ বছরের ভাই ভানিয়া।

মিলোচ্‌কা তাহার সুন্দর মুখখানি ভানিয়ার দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"টানিয়াকে তোমার মনে আছে? সেই লাল চুল ঝুঁটিভরা মুখ।"—ভানিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানায়, মনে আছে। মিলোচ্‌কা আবার বলিতে সুরু করে, "টানিয়া আর আমি কতদিন ধ'রে এই দিনটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলুম। আমরা ঠিক করেছিলুম যে, সে পরবে তার গোলাপী রংয়ের ফ্রক, আর আমি পরব আমার সাদা মস্‌লিনের ফ্রক, কিন্তু মা আজ সকালে বল্লে, মস্‌লিনের ফ্রক হয়ত আসতে পারে কিন্তু নাচে যাওয়া চলতেই পারে না, মা নাকি তার ভাল কাপড়-চোপড় সব বেচে ফেলেছে"। মিলোচ্‌কা কুশনে মুখ লুকাইয়া আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভানিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বোনটীকে কাঁদিতে দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে দালানে আসিল। দালান হইতে সে সৎমা এন্নার ক্রুদ্ধকণ্ঠ শুনিতে পাইল—"আমাকে জ্বালাতন কোর না, বারবার বল্‌ছি না যে এবার খ্রীষ্টমাস ট্রী হবে না। যদি কান্না বন্ধ না কর, তাহলে ঘর থেকে বের ক'রে দেব।" একটু চুপচাপ কাটিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার এন্নার স্বর শোনা গেলো, "ফের কাঁদছো! শুনবে না আমার কথা! ওঠ, ওঠ, যাও নার্সারীতে।" এন্না রোরুদ্যমানা মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে দরজা খুলিয়া দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল ভানিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে।

এন্না কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বেরুনো হচ্ছে শুনি।" ভানিয়া থতমত খাইয়া বলিল, "আমি এক্ষুণি ফিরছি।"

এন্না কঠোর স্বরে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি চাই না যে তুমি সব সময় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও। আমি বুঝতে পারি না, তুমি বাইরে সব সময় কোথায় থাক। আজ দু'মাস ধ'রে দেখছি, শুধু খাবার সময় বাড়ী আস। কোথায় থাক, কি করো কিছুই বলো না, কিন্তু জানো ত যে তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর। আর লোকেই বা বলবে কী? বলবে, সৎমা কিনা, তাই ছেলেটা কি ক'রে না ক'রে কোন খোঁজই রাখে না।"

ভানিয়া বলিল, "আমি তো অন্য কোথাও যাই না মা। আমি যাই আমার পড়া তৈরি করতে।"

এন্না বলিল, "আজ তোমার না গেলেই ভাল হত, বাড়ীতে অনেক কাজ, তুমি থাকলে তবু কিছু সাহায্য পাওয়া যেত। হ্যাঁঃ, আজকাল তোমার ঘরে সর্ব সময় তালা বন্ধ থাকে কেন?"

ভানিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "সোনিয়া আর মিটিয়া পাছে আমার বই খাতাপত্তর ছিঁড়ে দেয়, সেইজন্যে তালা দিই।"

এন্না শ্লেষের সুরে কহিল, "তবু ভাল এত সাবধানী হয়েছ।" বলিয়া সে কন্যাকে লইয়া নার্সারীতে ঢুকিল।

খাবার ঘরে বসিয়া মিলোচ্‌কা তখনও কাঁদিতেছিল। নার্সারিতে সোনিয়া আর মিটিয়া চোখের জলে ভাসিয়া নার্সকে বলিতেছিল, আগে তাহাদের কত সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রী হইত। ভগবান তাহাদের বাবাকে তাহাদের কাছ হইতে নিজের কাছে লওয়ার দরুণ এবার আর তাহাদের খ্রীষ্টমাস ট্রী হইল না। বুড়ী নার্স ইহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। শত শত বৎসর আগে একটী দেবশিশু কেমন করিয়া আস্তাবলের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই গল্প বুড়ী ইহাদের

শুনাইতেছিল। ছেলেরা নিজেদের দুঃখ ভুলিয়া, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া সেই অদ্ভুত শিশুটীর কথা শুনিতে লাগিল।

এন্না বিছানার উপর বসিয়া তাহার জীবনের সুখ, শান্তিপূর্ণ দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছিল। মনে পড়িতেছিল বাল্যের সেই আনন্দের দিনগুলির কথা—এতদিন সে মনের আনন্দে সঙ্গিনীদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত। কলেজের উচ্ছসিত লীলাচঞ্চল দিনগুলি। সহপাঠিনীদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইত। অবশেষে সে ষোল বছরে পড়িল এবং সকলের মত লম্বা ফ্রক পরিতে পাইল। তাহারই মাত্র এক বছর বাদে অর্থাৎ সতের বছর বয়সে ভানিয়ার বাপের সহিত তাহার বিবাহ হইল। ভানিয়া তখন মাত্র এক বছরের শিশু। স্বামীকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং তাহাদের বিবাহিত জীবন সুখেরই হইয়াছিল।

মাঝে মাঝে যে খুঁটিনাটী বাধিত, তাহা ভানিয়াকে উপলক্ষ করিয়া। এন্না কিছুতেই ভুলিতে পারিত না যে, অল্প কিছুদিন পূর্বেই তাহার স্বামী আর একজন রমণীকে তাহারই মত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সেই ভালবাসার চিহ্ন, ভানিয়া আজো বর্তমান। আর এদিকে ভানিয়াও ছিল একরোখা—এন্নাকে সে কিছুতেই মা বলিয়া ডাকিত না, তাহার কাছেও আসিত না। সে তাহার যত অভিযোগ, অভিমান, আব্দার বাবার কাছেই প্রকাশ করিত। এই মাতৃহারা পুত্রটীকে পিতা—পত্নীর চক্ষের আড়ালে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন।

এন্না ভানিয়াকে কোনদিন ভালবাসে নাই, ভালবাসিবার চেষ্টাও করেন নাই এবং তাহার জন্ম কোনদিন তাহার মনে কোন অনুতাপই আসে নাই। আজও তাহার চিন্তা ভানিয়াকে লইয়া নহে, তাহার নিজের পুত্র-সন্তানদের লইয়া। যে দারিদ্র্য রাক্ষসী হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে, সে তাহার করাল গ্রাস হইতে কেমন করিয়া তাহাদের বাঁচাইবে। কয়েক বছর আগেও সে তাহার পরিচিত মহলে রূপবতী বলিয়া গর্বিত ছিল। তাহার বিলাসিতার প্রাচুর্য্য ছিল। বিরাট বাড়ীতে ঝি চাকর পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীর মত থাকিত। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার লইয়া কত তর্ক করিয়াছে। কত জোরের সহিত বলিয়াছে, আজিকার যুগে পুরুষের নারীকে দাবাইয়া রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার।

কিন্তু আজ! এন্না অশ্রু-সজল চোখে ঠোঁট কামড়াইয়া ভাবে, স্বাধীনতা আর সমান অধিকারটুকুই আছে, আর সব কবরে গিয়াছে। আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বাহিরে যত সৌন্দর্য্যই থাক না কেন, ভিতরটা একেবারে যুড়াইয়া গিয়াছে। আজ সে তাহার স্বামীর ভালবাসার দান-গুলিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া বাঁচাইবার চিন্তাই করিতেছে। এন্নার মনে পড়িল, তাহার স্বামীর বাঁচিয়া থাকিবার দিনগুলি। মনে পড়িল সেই মানুষটীর স্বহস্তনির্মিত সেই বিরাট খ্রীষ্টমাস ট্রি। কত লোক আসিত উৎসবে যোগ দিতে, ঘটা করিয়া চলিত আহার পানের পর্ব।

হঠাৎ এন্নার মনে পড়িয়া গেল খাবার সময় হইয়াছে। খাবার ঘরে আসিয়া এন্না দেখিল ভানিয়া তখনও আসে নাই। সোনিয়া আর মিটিয়া পুরাণো তোলা পোষাকগুলি পরিয়াছে। মিলোচ্‌কার মুখ তখনও গম্ভীর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটী লাল হইয়া রহিয়াছে।

এন্না ছেলেদের সুপ্‌ পরিবেশন করিতে করিতে অসন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভানিয়ার মন কেবল বাইরে বাইরেই থাকে।" ছেলেরা মায়ের মেজাজের উষ্ণতা বুঝিয়া চুপচাপ খাইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কেবল ছুরি কাটার টুং টাং শব্দই নীরবতা ভংগ করিতে লাগিল। হঠাৎ মিটিয়া তাহার গোলাপী গালদুটীকে দোলাইয়া এবং ফোলাইয়া ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজিতে লাগিল এবং ঘরে কাহাকেও না পাইয়া চেয়ারের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, "নিয়ানিয়া, ভগবান কি তাঁর এঞ্জেলদের এতক্ষণে পাঠিয়েছেন?" নার্স বলিল, "হ্যাঃ, পাঠিয়েছেন বৈকি। তুমি চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও, নইলে আবার তারা উড়ে পালিয়ে যাবে।" হঠাৎ এঞ্জেলের নাম শুনিয়া এন্নার দমিত ক্রোধ আবার জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—"নিয়ানিয়া, খাবার টেবিলে আমি পরীর গল্প-টল্প ভালবাসি না।"

নার্স বলিল, "না, না—আমিতো পরীর গল্প বলছি না। আমি বলছিলুম ওরা যদি কান্নাকাটি না ক'রে, বেশ ভাল ছেলের মত থাকে তাহলে ওরা বেশ ভাল খ্রীষ্টমাসট্রী পাবে।"

এল্গা রাগিয়া বলিল—"খ্রীষ্টমাস ট্রী পায় আর না পায়, তার সংগে এঞ্জেলদের সংগে কি সম্বন্ধ আছে ?"

বৃদ্ধা নার্সের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিল, সে বলিল, "সে কি কথা মা, আপনি ওকথা বলছেন কেন ? আপনি কি জানেন না যে খ্রীষ্টমাস উৎসবের আগের দিন ভগবানের দূতেরা ধার্মিক লোকদের উপহার দিতে আসেন।"

এল্গা কিছু বলিবার আগেই সোনিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"মা—মা, ভানিয়া এসেছে।" মা রাগিয়াই ছিলেন, সোনিয়ার চীৎকারে আরো রাগিয়া কহিলেন, "এসেছে তো এসেছে, তোমার অমন ক'রে চেঁচানোর কি আছে।" ইতিমধ্যে ভানিয়া ঘরে আসিয়া তাহার চেয়ারে বসিয়াছে। এল্গা ভানিয়ার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?" ভানিয়ার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিল,—"আজকে বছরকার দিনে তোমার অন্ততঃ একটু পরিষ্কার ভদ্রভাবের কাপড় পরা উচিৎ ছিল। আজকের ডিনারে কোন অতিথি নেই বলে কি তোমায় একটু ভদ্রলোকের মত থাকতে নেই ? কি অদ্ভুত তোমায় দেখাচ্ছে দেখ ত।" এল্গা তাহার ছেঁড়া, ছোট কোট্‌টার দিকে আঙুল দেখাইতেই ভানিয়া লজ্জায় লাল হইয়া গেল। নিজের প্লেটের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"আমার যে আর পরার কিছু নেই, সবই ছোট হয়ে গ্যাছে আর ছিঁড়ে গ্যাছে।"

এল্গা বলিল, "পাচ্ছ তো কুড়ি রুবলেরও বেশী। বলি পড়াশোনা হচ্ছে কেমন ?" ভানিয়া আহত হইয়া এল্গার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কিন্তু আমি যা পাই তার সবই তো তোমায় এনে দিই।" এল্গা ইহার কোন জবাবই দিল না, ছেলেদের খাওয়ানোর দিকে মন দিল। সোনিয়া আবার নিস্তব্ধতা ভংগ করিল, বলিল—"মা, ভানিয়ার ঘরে আমি একটা সুন্দর ছবি দেখেছি। ভানিয়া সেটা মেঝেতে ফেলে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে কি সব আঁকছিল। ভানিয়া যদিও তার ঘরে আমায় ঢুকতে দেয় না—তবুও আমি সব জানি।"

এল্গা বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "ভানিয়া কি আজকাল ছবি আঁকা ধ'রেছ নাকি ? সিক্সথ ফরমের ছেলে, যার পরীক্ষা আসন্ন, তার পক্ষে পড়াশোনা ছেড়ে ছবি আঁকাই উপযুক্ত বটে। অবিশ্যি সেজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

ভানিয়া কোন কথা বলিল না, প্লেটের উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িল। মায়ের বাক্য যন্ত্রণা তাহার কাছে নূতন নয়। জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সে ইহা সহ্য করিয়া আসিয়াছে। ভানিয়া যে আশা লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল তাহা ভাংগিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। একটী দিনের তরেও সে মায়ের স্নেহ পায় নাই, বাপের বাড়ীতে তাঁহাকে চির-অপরিচিতের মত কাটাইতে হইয়াছে। বাবা তাহাকে ভাল খুবই বাসিতেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এঞ্জিনীয়ার হওয়ার জন্য বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইত। কাজে কাজেই বাপের সংগ পাওয়া ভানিয়ার দুষ্কর ছিল। ভানিয়ার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা থাকিলেও বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যখন তিনি দেখিতেন ভানিয়া বিনাদোষে অন্যায় ব্যবহার পাইতেছে তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট কথা দ্বারা আদর করিতেন, বুঝাইতেন। বড় হইয়া ভানিয়া বুঝিল, পিতার সংসারে তাহার স্থান কোথায় ? সৎমার সহিত সম্পর্কের যদিও কোন উন্নতি হয় নাই তথাপি সে সংঘর্ষের আভাষকেও বাঁচাইয়া চলিত। প্রাণপণে চেষ্টা করিত তাঁহাকে খুশী করিবার। ইতিমধ্যে বাবা চিরদিনের মত তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া পৃথিবী ছাড়িলেন।

সমস্ত পরিবারের ভিতরেই একটা বিরাট পরিবর্তন আসিল। সেই বিলাসবহুল জীবন, ধনী বন্ধুবান্ধব, দাসদাসী সবই যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হইল। বাবার বহু টাকা রোজগার থাকিতেও মৃত্যুকালে পেনসনের অর্থ ছাড়া কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আজ তাহাদের বড় বাড়ী ছাড়িয়া একটা ছোট ফ্ল্যাটে বাস করিতে হইতেছে। ভানিয়া সংসারের এই দুঃখ কষ্ট দেখিয়া অবসর সময় কিছু কিছু রোজগার করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে তাহার স্কুলের বেতন ও তাহার ঘরের ভাড়াটা পোষাইয়া যায়। এল্গা অবশ্য প্রথমে ভানিয়ার রোজগারের কিছু লইতে চায় নাই, কিন্তু তাহার একান্ত অনুরোধে সে লইতে বাধ্য হইয়াছে। ছোট ভাই বোনগুলিকে সে নিজের চাইতেও বেশী ভাল বাসিত। স্কুলের পড়া শেষ করার জন্য সে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। ভানিয়া ঠিক করিয়াছিল, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া সে কোন টেক্‌নিকাল স্কুলে শিক্ষা লইয়া বাপের চাকুরী গ্রহণ

করিবে, বাপের মত অর্থ রোজগার করিয়া তাহাদের পরিবারকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ছিল তাহার স্বপ্ন, এই ছিল তাহার জীবনের আশা।

মায়ের কাছে অন্যায়ভাবে তিরস্কৃত হইয়া মনে সে অত্যন্ত ব্যথা পাইল কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, যাইবার সময় ভক্তিভরে মায়ের হাতে চুমা খাইয়া চলিয়া গেল। ভানিয়ার চুপচাপ স্বভাব দেখিয়া এন্না ভাবিতেছিল পিতার সহিত পুত্রের কোথাও মিল নাই। ছেলেটা বোধ হয় তাহার মায়ের স্বভাব পাইয়াছে। হঠাৎ ভানিয়ার মায়ের কথা মনে পড়িতেই এন্নার বুকে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ইহাই এতদিন তাহার মনের অগোচরে তুষের আগুনের মত তাহাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করিতেছিল্। এন্না সকল কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে যাইবার জন্য খাবার ঘরের দরজায় আসিতেই ভানিয়ার গলা শোনা গেল—"মা, মিলোচকা—শীগ্‌গীর আমার ঘরে এসো। দেখ তোমাদের জন্যে একটা ভারী মজার জিনিষ করেছি। সোনিয়া আর মিটিয়াকে ডাক, তাদের জন্যে আমি খ্রীষ্টমাস ট্রী তৈরী করেছি, বাতিগুলো এখুনি জালিয়ে দিচ্ছি।" এন্না যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যেন সে কিছু ভুল শুনিয়াছে, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খ্রীষ্টমাস ট্রী করেছ ?"

মায়ের কণ্ঠস্বরে লজ্জিত হইয়া ভানিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মা। তোমাদের আশ্চর্য করব ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলুম, বলিনি।" বলিয়া সে নিজেই নার্সারি হইতে সোনিয়া আর মিটিয়াকে আনিতে গেল। এন্না তখনও বিস্ময়ের ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। যে ছেলের দিকে সে এতদিন ফিরিয়াও চাহে নাই, যাহাকে সে সংসারের প্রতি উদাসীন বলিয়া ভাবিয়াছে, সে ছেলে তাহাদের আনন্দের জন্য গোপনে এমন একটী আয়োজন করিয়াছে।

ভানিয়া ইতিমধ্যে নার্সারিতে চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে "সোনিয়া, মিটিয়া শীগগীর এসো, দেখে যাও ভগবান আমাদের খ্রীষ্টমাস ট্রী পাঠিয়েছেন।" ঘরের ভিতর সকলে ঢুকিয়া দেখিল, আলোয় আলোকিত হইয়া একটী সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রী সাজান রহিয়াছে। সোনিয়া ও মিটিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। মিলোচকা নিজের দুঃখ ভুলিয়া ভাইয়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ভাইয়া, দুষ্টু ছেলে, তুমি কি ক'রে এ সব জোগাড় করলে ?"

"আরো কিছু আছে" বলিয়া, ভানিয়া একটী প্যাকেট খুলিয়া একটী খুব সুন্দর পোষাক-পরা বড় পুতুল সোনিয়ার হাতে দিয়া বলিল—"সোনিয়া এটা তোমার। আর মিটিয়া এটা তোমার চড়বার ঘোঁড়া" বলিতে না বলিতেই মিটিয়া চাকা-লাগানো কাঠের ঘোঁড়ায় চড়িয়া বসিল এবং চাবুক মারিয়া চাকার সাহায্যে চালাইতে লাগিল। ভানিয়া কৃত্রিম ভয়ে বলিল, "সোনিয়া সাবধান, ঘোড়ার কাছে দাঁড়িও না—এখুনি চাপা দেবে," বলিয়া সে নিজেই ভীতভাবে জড়সড় হইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। সারা ঘরে যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়া গেল।

এন্নার মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার প্রতি তাহার চিরাভ্যস্ত কঠোর দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এ কি! এতদিন তো সে ইহা দেখে নাই। আনন্দের উত্তেজনায় ভানিয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঘন আঁখি পল্লবের ভিতর দিয়া চক্ষুর দীপ্তি আনন্দে উত্তেজনায় উছলাইয়া পড়িতেছে; ইহা যে তাহারই মৃত স্বামীর হুবহু প্রতিমূর্তি। চোখ থাকিতেও এন্না ইহা দেখে নাই বলিয়া মনে মনে নিজে বারবার ধিক্কার দিতে লাগিল। যে হিংসার বরফ জমা হইয়া তাহার মনকে শীতল কঠোর করিয়া তুলিতেছিল,—আজ বসন্তের উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাহা গলিয়া মাতৃস্নেহের রসে মনকে ভরিয়া দিল। সে অধীরভাবে ভানিয়ার কাছে আগাইয়া গেল। ভানিয়া বলিল, "মাগো, তোমার জন্যে এইটা" বলিয়া এন্নার হাতে সে একটী ছোট ভেলভেটের কেস দিল। কৌতূহলী এন্না সেটি খুলিয়া দেখিল, লাল রংয়ের ভেলভেটের ভিতর একটী সোনার ব্রোচ্, তাহার মাঝখানে স্বামীর মূর্তি অংকিত করা।

সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে এন্না এই প্রথম মাতৃস্নেহে ভানিয়াকে চুমা খাইলেন। ভানিয়া আনন্দে মাতার দুইহাত ঠোঁটে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে একটী প্যাকেট লইয়া মিলোচ্‌কার হাতে দিয়া বলিল, "আর কাঁদবে না তো ? এইবার তুমি 'বল্' নাচের মজলিসে যেতে পারবে। আর মায়ের জন্যে

সাটিনও এনেছি।" মিলোচ্‌কা ততক্ষণে প্যাকেট খুলিয়া তাহার অতি সাধের অতি সুক্ষ্ম সাদা মস্‌লিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। মিলোচ্‌কা এইবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভানিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভাইয়া, কত লক্ষ্মী ভাই।" ভাইয়ের গলা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল সে, তাহার অত সাধের মসলিন মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপও করিল না। এন্না হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি একলাই তোমার ভাইকে আদর করবে, আর আমি বুঝি আমার ছেলেকে আদর করতে পাব না?"

এন্না জীবনে এই প্রথম বলিল, আমার ছেলে। তাহার চোখ দুইটীতে মাতৃস্নেহ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার মাথাটী বুকের ভিতর রাখিয়া বলিল, "ভানিয়া বাবা আমার।" তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া ভানিয়াকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে তাহার বাল্যের আনন্দহীন দিনগুলির কথা ভুলিয়া গেল। যে মাতৃস্নেহের জন্য সে তৃষিতের মত ঘুরিতেছিল, তাহা পাইয়া আজ সে আনন্দ, প্রীতির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। মা ও ছেলে নির্বাক আনন্দে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহ ও প্রীতি দিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধা নার্স নিয়ানিয়া এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে পরিবারের এই আনন্দ মিলন দেখিতেছিল। সে চোখ বুজিয়া হাত দুইটি বুকের উপর রাখিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

এন্না ভানিয়াকে কাছে বসাইয়া বলিল, "তুমি এসব জোগাড় করলে কি ক'রে বাবা?" ভানিয়া বলিল, "মা, তোমার দুঃখ দেখে ভাবতুম কি ক'রে আমি তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার করব। বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি কিছু কিছু প্ল্যান আঁকার কাজ জোগাড় করেই আমি এসব করেছি।" এন্না প্রশ্ন করিল, "সোনিয়া যাকে ছবি আঁকা বলছিল সেকি তোমার প্ল্যান?"

"হ্যাঃ মা।" এন্নার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িল, অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিল, "তুমি আর এতো খেটো না, এতে যে তোমার শরীর ভাল থাকবে না" ভানিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি ভাবছ কেন মা। এতে আমার কিছু হবে না। দেখ না আমি বাবার মত শক্ত হয়েছি, আমি বাবার মতন কাজ শিখছি। আর বাবার মত টাকা রোজগার ক'রে তোমাদের সবাইকে সুখে রাখবো।" মিলোচ্‌কার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক কিনা বল মিলোচ্‌কা?"

একটী সুন্দর সুমিষ্ট অনুভূতি এন্নার মনকে আবিষ্ট করিয়া দিল! ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে দুঃখ, ভয়, নিরানন্দ তাহাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহা যেন হঠাৎ কোন্ যাদুকরের মন্ত্রে দূর হইয়া আনন্দ আলোয় তাহাকে ভরিয়া তুলিল। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভানিয়াকে দেখিতেছিল, ঠিক তাহার বাপের মত শক্তিশালী পুরুষোচিত চেহারা, তেমনি পদবিক্ষেপে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ় বাহু তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিতেছে, "তুমি ভয় খাচ্ছ কেন মা? আমি বাবার মতই শক্তিশালী হয়েছি।"—

মৃত্যুর পারে

রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(২)

আত্মা যে অবিনশ্বর এ বিশ্বাস বর্ত্তমানে প্রত্যেক ধর্ম্মের জনগণের মধ্যেই বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু মানব ইতিহাসে এই বিশ্বাসের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। আদিতে সকল ধর্ম্মে এই বিশ্বাস ছিল না। হিন্দুর প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদে অবশ্য পরলোকের কথা আছে। প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়ার ধর্ম্মেও ছিল। কিন্তু ইহুদীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে পরলোকের কথা পাওয়া যায় না। মুসা পরলোক সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। মুসার পরবর্ত্তী পয়গম্বরদিগের উপদেশের মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ থাকিলেও বন্দীভাবে বেবিলনে নীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহুদীদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পার্থিবজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাইরাস কর্ত্তৃক বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইহুদীদিগের মধ্যে স্যাডুকি ও ফ্যারিসি নামে দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মুসার উপদেশের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে কোনও কথা নাই বলিয়া স্যাডুকিগণ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু ফ্যারিসিগণ উক্ত মত গ্রহণ করে এবং সেই অবধি উহা ইহুদী ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও তাঁহার শিষ্যগণ কেবল যে মানবাত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন তাহা নয়, জন্ম-পূর্ব্ব অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সে বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। রোমে সিসিরো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাধারণ মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য অনেক যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন—বলিয়াছেন মৃত্যু মানবকে সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি দেয়, কিন্তু স্বর্গে সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, একথা বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন মৃত্যুতে সত্তার বিনাশ হয়, যাহাদের সত্তা নাই তাঁহাদের দুঃখভোগও নাই। গিবন বলেন, সিসিরো এবং প্রথম কয়েকজন সম্রাটের রাজত্বকালে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণে কখনও পরলোকে বিশ্বাস এমন ভাব প্রতিপন্ন হয় নাই।

কিরূপে পরলোকে বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বপ্নে মৃত মানবের দর্শন হইতে এই ধারণার উৎপত্তি। মানুষ যখন স্বপ্নে মৃত আত্মীয়কে দর্শন করে, তখন মৃত্যুতে যে আত্মীয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই, তাহার এক অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, এই কথাই তাহার মনে উদিত হয়। তাহারা মনে করে মানবের একই আকৃতিবিশিষ্ট দুইটী দেহ, মৃত্যুতে মাত্র একটীর বিনাশ হয়, স্বপ্নে দ্বিতীয়টির দর্শন পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় অংশটীই কালক্রমে "আত্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট সেপ্‌ন্সার (Herbert Spencor) এই মতাবলম্বী। আচার্য্য মার্টিনো প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বপ্নে তো কেবল মৃত মানুষই আমরা দেখি না, নশ্বর অনেক দ্রব্যও তো দেখিয়া থাকি। শীতের সময় নিষ্পত্র বৃক্ষসম্বলিত উদ্যানকে যখন স্বপ্নে পত্রপুষ্পশোভিত অবস্থায় দেখি, তখন তো কল্পনা করি না, পত্র ও পুষ্পের দ্বিতীয় দেহ আছে। বাস্তবিক জীবাত্মার উৎপত্তি হয় আমাদের স্বকীয় অনুভূতি হইতে। আমাদের মধ্যে যে এক অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্ব আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা তাহা অনুভব করি। আমরা দেখিতে পাই, সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা আমাদের সমগ্র জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের অনুভব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছা সমস্তই সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাতে আরোপ করি। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমাদের দেহে ও মনে প্রভূত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আমাদের personal identity অটুটই থাকিয়া যায়। এই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকে আমরা দেহ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে অভ্যস্ত এবং ক্রমে বুঝিতে পারি—আমাদের দেহ "আমি" নয়, যিনি আমাদের মধ্যে "আমি" পদবাচ্য দেহ তাঁহারই। দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া যখন "আমি"কে দেখিতে আরম্ভ করি, তখনই আত্মার ধারণা হয় এবং তখনি প্রশ্ন উঠে—"মৃত্যুর পরে 'আমি'র কি হয়? দেহের সঙ্গে চিতার আগুনেই কি তাহার লয় হয়, অথবা তাহার পরিণাম ভিন্ন?"

জড়বাদিগণ বলেন, প্রত্যেক মানুষই অতি ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ দৃশ্য প্রোটোপ্লাজ্‌ম কণা (Protoplasm) হইতে উৎপন্ন হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌ম কণা ও জীবজগতের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এক কোষবিশিষ্ট জীবের শারীরিক গঠনে কোনও পার্থক্য নাই। সেই সূক্ষ্ম প্রোটোপ্লাজম্ কণা মাতৃগর্ভে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া মানব-শরীরে পরিণত হয়। এই পরিণতি কালের মধ্যে ঠিক কোন সময়ে অবিনশ্বর আত্মা আসিয়া শরীরে অধিষ্ঠান করেন? তবে কি ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে আত্মা আসিয়া শিশুর দেহ অধিকার করে? অথবা পরবর্ত্তীকালে শিশু যখন নিরাধার গুণের (abstract thought) চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, তখনই আত্মার আবির্ভাব হয়? আত্মা কি বাহির হইতে আসিয়া দেহে প্রবেশ করে, না ভ্রূণ অথবা শিশুর মধ্যে অবস্থিত কোন কিছু ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া আত্মায় পরিণত হয়? ইহা প্রত্যেক মানব শরীরে আত্মার আবির্ভাবের কথা। প্রোটোপ্লাজম্‌এর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না। আত্মা কি প্রাণের সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিল, না প্রোটোজোয়া হইতে মানবে পরিণতি লাভ করিতে যে বিপুল সময় লাগিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনও এক সময়ে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল? যদি মানবেই আত্মার প্রথম আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মা কি সম্পূর্ণ নূতন কোনও পদার্থ অথবা জীবশরীরে বর্ত্তমান কোনও পদার্থের পরিণতি?"

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নানা ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় মতদ্বারা প্রভাবিত পাশ্চাত্য জগতে মানবাত্মার জন্ম-পূর্ব্ব অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না। ইতর জীবের আত্মা আছে, ইহা স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তি-গুলি সহজেই উত্থাপিত হইতে পারে। তাঁহাদের পক্ষ হইতে ঐ সমস্ত আপত্তির উত্তর আছে, আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহারা বলেন, ইতর জীবে যে চৈতন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মানবাত্মা তাহারই পরিণতি, ইতর জীবের চৈতন্য তাহাদের প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণশক্তি রাসায়নিক (Chemical) ও ভৌতিক (physical) শক্তির অভিব্যক্তি। ভৌতিকশক্তি বহুযুগ অতিক্রম করিয়া যখন মানবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তখনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি ছিল না। পৃথিবীর উত্তাপ তখন এত বেশী ছিল, যে রাসায়নিক শক্তির প্রকাশিত হইবার অবকাশ ছিল না। তাপ বিকীরণ দ্বারা যখন পৃথিবী শীতলত্ব প্রাপ্ত হইল, তখনি রাসায়নিকরূপে নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। ইহার পর যুগের পরে যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, অবশেষে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অবস্থা প্রস্তুত হইলে প্রাণশক্তিরূপ আর এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। আবার যুগের পরে যুগ অতিক্রান্ত হয়, প্রাণ উন্নত হইতে উন্নততররূপ পরিগ্রহ করে। অবশেষে যখন সময় পূর্ণ হইল, তখন প্রজ্ঞা, অহংকার ও নৈতিকজ্ঞান সহ মানবাত্মা আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু এই মতের সহিত অমরত্বের সামঞ্জস্য কোথায়, বুঝিতে হইলে "আকস্মিক অথবা অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তিবাদ" নামক নূতন দার্শনিক মতটি বুঝিতে হইবে।

গ্যালিলিওর সময় হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুবাদ দ্বারা জগতের

সমস্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মতে বর্ণ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি গৌণ গুণ সকল (Secondary qualities) পরমাণু সমূহের অদৃশ্য কম্পনের ফল। জড় পদার্থ অদৃশ্য অণু পরমাণুর (molecules, atoms, protons, electrons প্রভৃতি) সমষ্টি, এবং অণুদিগের কম্পনের সংকেত। জড়ের গৌণ গুণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (Perception) সম্বন্ধ যে আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে অণুর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কম্পন দ্বারা নির্দ্দিষ্টবর্ণ বা শব্দে, অথবা তাপের প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অণ্ডাকার (elliptical) কক্ষে কেন ভ্রমণ করে, গণিতের সাহায্যে তাহা বোধগম্য হয়। Binomial Theorem এর সত্যতা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু বায়ু বা কম্পন দ্বারা শব্দের জ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, ইথারের কম্পনে কেন আলোর প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে, তাহা এরূপ কোনও যুক্তির দ্বারা বোঝা যায় না, কেননা বায়ু ও ইথারের কম্পন ও উত্তাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। তারপরে ভৌতিক বিজ্ঞানের নিয়মদ্বারা রাসায়নিক (Chemical) নিয়মের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। রসায়ন শাস্ত্রের বলে দুই আয়তনের জলজান (Hydrogen) এবং এক আয়তনের অম্লজান (oxygen) মিলিত হইলে জলের উৎপত্তি হয়। ইহার ব্যাখ্যার জন্য বলা হয় একটী অম্লজান পরমাণুর সহিত দুইটী জলজান পরমাণুর (affinity) আছে; এইজন্য অম্লজানকে বলা হয় দ্ব্যণু সংসক্ত এবং জলজানকে বলা হয় একাণু সংসক্ত। কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞান অম্লজান ও জলজান পরমাণুর বৈদ্যুতিক গঠন সম্বন্ধে এমন কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যাহা দ্বারা জলজান একাণুসংসক্ত হইবে এবং অম্লজান, দ্ব্যণুসংসক্ত হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ভৌতিক নিয়ম দ্বারা যেমন রাসায়নিক কার্য্য বোঝা যায় না তেমনি ভৌতিক ও রাসায়নিক নিয়ম দ্বারা প্রাণ ও চৈতন্যের ব্যাপার সকল ব্যাখ্যা করা যায় না। ভৌতিক বিজ্ঞানে ও রসায়নে 'উদ্দেশ্যের' কোনও স্থান নাই। কোনও ভৌতিক কার্য্য বা রাসায়নিক কার্য্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত হয় না। কিন্তু প্রাণের যাবতীয় কার্য্যই উদ্দেশ্যমূলক, প্রত্যেক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কৃত হয়। জীবজগতের যে জীবন সংগ্রাম Darwin জীবন অভিব্যক্তি ব্যাখ্যার প্রথম সূত্রে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই জীবন যে উদ্দেশ্য-মূলক তাহা প্রমাণিত হয়। ভৌতিক ও রাসায়নিক বিজ্ঞান হইতে এই ব্যাপারের যে আলোচনা হয় তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা হইতে যুক্তি দ্বারা এই জীবন-সংগ্রামের অস্তিত্ব উৎপাদন করা যায়, যাহাকে জীবন-সংগ্রামের কারণরূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। মস্তিষ্কের ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের মানসিক ব্যাপারের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অবশ্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আগে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু কেন এ সম্বন্ধ—কেন বহির্জগতের সহিত আমাদের সে অনুপম সম্বন্ধকে আমরা "জ্ঞান" বলি, মস্তিষ্কের পরমাণুর গতি দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয়—এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে Samuel Alexander প্রমুখ চিন্তাশীল দার্শনিকেরা জড় ও জড় পরমাণুর স্পন্দন দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে যদিও চৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য দেহাত্ম ও প্রাণের প্রয়োজন, প্রাণের আবির্ভাবের জন্য রাসায়নিক সংযোগের প্রয়োজন, রাসায়নিক সংযোগের জন্য পরমাণুর প্রয়োজন, তথাপি এই সকলের মধ্যে কোন একটীর আবির্ভাবেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না। নূতনের এই আবির্ভাবকে তাঁহারা Emergent Evolution নাম দিয়াছেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বোঝা যাইবে চৈতন্য ও জ্ঞান জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জড় কর্তৃক উৎপন্ন হয় না। অভিব্যক্তির ইতিহাস ব্যক্তিগঠনের ইতিহাস। অসীম শূন্য মধ্যে অসংখ্যপ্রটোন ও ইলেক্ট্রন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্ট্রনের সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের (element) যখন সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন হইতে ব্যক্তিগঠন আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে নূতন দ্রব্য সৃষ্টি ব্যক্তিগঠনের দ্বিতীয় ক্রম। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সমবায়ে উদ্ভিদও জীবদেহ সৃষ্টি তৃতীয় ক্রম; সর্ব্বশেষ ক্রম অহংকারিক একত্ব ও নৈতিক জ্ঞান সমন্বিত মানবের আবির্ভাব। ইহার জন্য যুগযুগান্তর ব্যাপী অভিব্যক্তি ধারা প্রবাহিত। যুগযুগান্তর ধরিয়া দারুণ যাতনায় প্রকৃতি গর্ভে মানবভ্রূণ শায়িত ছিল। পিতৃ শোণিত কণা মাতৃগর্ভে যেমন ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়, মানব ভ্রূণ ও তেমনি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির গর্ভে পরিপুষ্ট হইতেছিল। রাসায়নিক শক্তি ও প্রাণশক্তির আবির্ভাবে ভ্রূণের আবির্ভাবের ক্রম। ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতৃ-গর্ভস্থ শিশু যেমন মাতৃশরীরের অংশ মাত্র থাকে, নাভি নাড়িদ্বারা মাতার শরীর হইতে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। মানব ভ্রূণও তেমনি প্রকৃতি-গর্ভে প্রকৃতির অংশ রূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। অকস্মাৎ তাহার নাভি নাড়ি ছিন্ন হইয়া গেল, প্রকৃতির সহিত যোগসূত্র কাটিয়া গেল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া সে প্রজ্ঞা ও নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানবরূপে দাঁড়াইয়া উঠিল। ব্যক্তিত্ব গঠন তখন সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেহ ও মস্তিষ্ক যখন প্রজ্ঞা ও অহংকারকে প্রকাশিত করিবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই প্রজ্ঞা ও অহংকার অবধি পূর্ণ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিল; স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করিয়া অবিনশ্বর অনন্ত জীবন দান করিয়াছিল। প্রজ্ঞা ও অহংকারের আবির্ভাবের পর হইতে দেহ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন হইল। সদ্যপ্রসূত শিশুর শরীরের গঠনের সহিত সম্যক পুষ্ট ভ্রূণের শারীরিক গঠনের বিশেষ পার্থক্য নাই; প্রসবের অব্যবহিত পরেই শিশু সত্তার সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেখানে সে মাতৃ শরীরের অংশ নয়, স্ব-প্রতিষ্ঠ।

এই পরিবর্ত্তন তাহার প্রগতির জন্ম অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে মানবের প্রথম আবির্ভাবের সময়েও শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন তেমন বেশী কিছু ছিল না, অভিব্যক্তি ধারায় যে জীবদেহ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (natural selection) ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন সূত্রে মানব দেহে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সহিত নূতন দেহের হয়তো বেশী ভেদ ছিল না, মানসিক গঠনেও ভেদ হয়তো সামান্যই ছিল, কিন্তু মানসিক জগতের যে স্তরে এই নূতন জীব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রগতির বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমানে শিশুর জন্মকালেও অতীতে মানবত্বের প্রথম উন্মেষকালে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই নূতন শক্তিবিশিষ্ট নূতন জীবের আবির্ভাব, পুরাতন জগৎ হইতে নূতন জগতে প্রবেশ, উচ্চতর জগতে জাগরণ। একমাত্র মানবই প্রকৃতি হইতে পৃথক জীবন ধারণে সমর্থ। পৃথক হইলেও প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নয়, প্রকৃতি গর্ভধারিণী মাতা না হইলেও ধাত্রী বটে। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে প্রকৃতির স্তন্য পান করিতে হয়, মৃত্যুর পরে হয়তো পূর্ণ স্বতন্ত্রতা।

অহংকার অথবা আত্মজ্ঞানের মূল ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ যখনি ছিন্ন হয়, তখনই অহংকারের উদ্ভব হয়। অহংকার হইতেই স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক দায়িত্ব বোধের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের সহিত স্বকীয় সম্বন্ধের অনুভূতি এবং সীমাহীন উন্নতি লাভের সামর্থ্য জন্মে। ব্যক্তিত্বের অর্থ স্বতন্ত্র আত্মিক জীবন ও অমরতা। কোনও জীবজন্তুর মধ্যে শিক্ষা দ্বারা যদি আমিত্ব জ্ঞান উৎপন্ন করা সম্ভব হইত তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে নৈতিক দায়িত্ব-বিশিষ্ট জীবে পরিণত হইত এবং অমরতা লাভ করিত।

উপরি উক্ত আলোচনায় জড়বাদীদিগের প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গেল তাহা এই :—

(১) ইতর জীবে আত্মা নাই, অমরত্বের দাবীও তাহাদের নাই। তাহাদের চৈতন্য আছে সত্য কিন্তু আমিত্ব নাই, আমিত্বই অমরতা দান করে।

(২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যখন আমিত্বের জ্ঞান প্রকৃতি হইতে স্বাতন্ত্র্যভাবে লাভ করে তখনি তাহাকে আত্মা বলা যায়।

(৩) অভিব্যক্তি ধারাতেও যখন আমিত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখনই আত্মার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে নয়।

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সহিত এসিয়া মহাসম্মিলনকে সমপর্য্যায়-ভুক্ত করিতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ নাই। সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের নৈকট্য সপ্রমাণ করিতেও আমাকে আদৌ কষ্ট পাইতে হইবে না। মূল মহাভারত পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতকামী বহু ব্যক্তি বহুবার রাজাকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছিলেন। সাবধানী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার দিগ্বিজয়ী সহোদরদ্বয় ভীমার্জ্জুনের আগ্রহাধিক্যসত্ত্বেও মনস্থির করিতে পারেন নাই। দ্বারকায় তাঁহার একজন হিতৈষী বান্ধব বসতি করেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই এই সংবাদ প্রকাশ পাইবামাত্র দ্বারকায় দূত প্রেরিত হইল; দ্বারকাবাসী বন্ধুও অনতিবিলম্বে খাণ্ডবপ্রস্থের নবীন রাজধানীতে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, ভাই, সকলে আমাকে বলিতেছেন রাজসূয় যজ্ঞ করিতে; কিন্তু আমি যজ্ঞাধিকারী হইয়াছি কিনা তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই জন্যই আমি তোমার পরামর্শ বাঞ্ছা করি। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

বস্তুতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন প্রবলপ্রতাপ রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন সত্য; কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহার, যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একছত্র সম্রাট। যুধিষ্ঠির 'দ্বারকাবাসীন্' বন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই জানিতে চাহিলেন, আমি কি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আমি কি সম্রাট?

শ্রীকৃষ্ণকে এ প্রশ্ন করার কারণ ছিল। তদানীন্তন সমাজে তিনি ছিলেন সমাজপতি, রাজারও উপরে, সম্রাটেরও ঊর্দ্ধে; অধিকন্তু তিনি নির্ভীক, নিরপেক্ষ, সত্যদর্শী। সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠিরের তাঁহার উপর অশেষ নির্ভর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ, মগধসম্রাট জরাসন্ধ থাকিতে আপনার বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ত দেখি না। আপনার রাজসূয় যজ্ঞের আহ্বান সাধুগণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না এবং আমার আশঙ্কা হয়, সম্রাট জরাসন্ধও তাহাতে বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারেন।

আমাদের এই ভারতবর্ষ একদা এসিয়ার অধিনায়কত্ব করিতেন। বহু মিথ্যার বেসাতি করিলেও ইতিহাস ইহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। তারপর, একদিন ভারতের মত এবং ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশাল এসিয়ার উপরও দুঃখনিশার ঘনান্ধকার নামিয়াছিল। তথাপি, এসিয়া পরিব্যাপ্ত দুঃখ, দুর্য্যোগ ও পরাধীনতার মধ্যেও অস্মদ্দেশে এসিয়া সম্মিলনের প্রস্তাব নানা সময়ে নানাভাবে উঠিয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদালি, চিত্তরঞ্জন দাশ, এমন কি পণ্ডিত জওহরলালও এসিয়া ফেডারেশনের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু 'দ্বারকাবাসী'র সম্মতির অভাবে

প্রস্তাব 'উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে'। সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের সর্ব্বপ্রধান স্বপ্ন ছিল, একত্রিত এসিয়া। 'দ্বারকাবাসী'র অলিগার্কি-দরবারে তিনিও দরবার করিয়াছিলেন ; কিন্তু গান্ধীজীর মুখ দিয়া ক্ষুদ্র একটি একাক্ষরের 'হাঁ' বাহির করা সম্ভব হয় নাই। তা না হোক, সুভাষ তাঁহার সাধনার স্বপ্নকে ক্ষেত্রান্তরে ও রূপান্তরে সার্থকতা দান করিয়া ধরায় যে কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া অনন্ত কালসমীপে যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, অনন্ত জগত অনন্ত কাল তাহা স্মরণ করিয়া ধন্য হইবে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 'দ্বারকাবাসী'র সম্মতি মিলিয়াছে ; জরাসন্ধ "হুইট ইণ্ডিয়া" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। ১৯৪৭ সালের ২১এ মার্চ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ সংলগ্ন ক্ষেত্রে দিল্লীর পুরাণ কেল্লায় এসিয়ার রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল।

জওহরলাল রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও এই রাজসূয় করিয়াছে। লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য অভিন্ন ; স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। বিশাল মহাদেশ এসিয়ার আজ বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অস্ত্র শস্ত্র অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিমা নিরঞ্জনান্তে এসিয়া আজ বিজয়া সম্মিলনীতে মিলিত হইয়াছে। বিজয়া সম্মিলনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ শান্তিবারি সিঞ্চন। পুরোহিত ভারতে ; তাই এসিয়ার সমাবেশ, ভারতবর্ষে।

এ যেন সেই—

"ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?"

প্রবাস-শেষে, এসিয়ার সন্তান-সন্ততির উৎস-মূলে এই শুভ-সমাগম ! এসিয়ার ইতিহাসে এই ঘটনা অভিনব ও অবিস্মরণীয়। এসিয়া এক ও অখণ্ড, এ তারই শুভ সূচনা।

এসিয়া মহাসম্মিলনের ক্ষেত্র ভারত ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে ?

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান

জওহরকে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটত্বে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য আহুত হয় নাই। ইহাকে এসিয়ার রাজসূয় বলাই সঙ্গত। এসিয়া এসিয়ার রাজচক্রবর্ত্তী ; এসিয়া এসিয়ার সম্রাট ; এসিয়ার এসিয়ার সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং এসিয়ারই এই যৌবন অভিষেক। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আজ রবীন্দ্রনাথ নাই, যৌবনে রাজটীকা কে আর তেমন করিয়া দিতে পারিবে ? এসিয়াকে দুর্ব্বল, অসহায় ও নাবালক বোধে পাশ্চাত্যের বুভুক্ষু অপিচ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কখনও একক, কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এসিয়ার উপরে শাসন ও শোষণের কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কালক্রমে, সাগরে জলোচ্ছ্বাসের মত, বর্ষাগমে নদীর বালির বাঁধের মত, যৌবনাগমে যুবতী নারীর লজ্জা সঙ্কোচের প্রাচীরের মত একটির পর একটি নাগ পাশ ছিন্ন করিয়া এসিয়া তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধৃত করিয়াছে। কেহ সম্মুখ যুদ্ধ, কেহ গেরিলা যুদ্ধ, কেহ কূটনৈতিক যুদ্ধ করিয়াছে, হয় ত বা এখনও করিতেছে ; আর কেহ বা অভিনব ও অপূর্ব্ব অহিংস যুদ্ধ পরিচালিত

অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, বর্ত্তমানেও বিশাল বিশ্বে ভারত যে প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করিয়াছে তাহারই বা তুলনা কোথায় ? তবু আজ ভারত পুরাপুরি স্বাধীন হয় নাই। তথাপি ভারতের সৌহার্দ্দ্যকামনায় বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের আগ্রহাকুলতা কে না দেখিতেছে ? আমেরিকা, চীন, রাসিয়া, ফ্রান্স ভারতের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে যে তৎপরতা দেখাইয়াছে, পৃথিবী কি অন্ধ, তাহা দেখে নাই ? ভারতের আত্মিক ও নৈতিক বল যে শত সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় দিগ্দেশ প্রভাসিত করিয়াছে ; সমগ্র বিশ্বে যাহার বন্দনা গীত হইল, ভারতের নিকটতম প্রতিবাসী এসিয়ার দেশসমূহের নিকট কখনই তাহা অজ্ঞাত, অদৃশ্য ও অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। পৃথিবীর সহিত এসিয়াও প্রেম, সত্য ও অহিংসারচিত সে মহা-সঙ্গীত শুনিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতল তল হইতে পূর্ব্বস্মৃতি সোনার আখরে জাগিয়া উঠিয়াছে ; ভারতের নেতৃত্ব তাহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত এসিয়াকে দেখাইয়াছে, বিনা অস্ত্রে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, শুদ্ধমাত্র নৈতিক বলে প্রবলের প্রভঞ্জন-সদৃশ অভিযানও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ভারতই পৃথিবীকে দেখাইয়াছে যে অর্দ্ধবিশ্ববিজয়ী সম্রাটের সাম্রাজ্য-প্রাসাদও নিঃসহায় নিরস্ত্রের বাসনাবাষ্পের ভর সহিতে পারে না, ভূমিকম্পে অট্টালিকার মত ভূমিসাৎ হয়। যে যুগে এ্যাটম্ বম্বের মন্ত্রগুপ্তির জন্ত অর্দ্ধবিশ্ব সন্ত্রস্ত এবং অপরার্দ্ধ অপহরণোদ্যোগে উদ্‌গ্রাব অধীর, সেই যুগে সেই পৃথিবীতে এমন এক কটীবাসসম্বল শীর্ণকায় জীর্ণকরনিঃস্ব মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে—যে লোক একত্রিত এসিয়াকে দিগ্বিজয়ের বর দান করিতেছে, অথচ কাহারও হাতে একখানি অস্ত্র দেয় নাই, মুখে হিংস্র বা ধ্বংসাত্মক একটি শব্দ দেয় নাই! এসিয়া সেই বার্ত্তা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছে; ইয়োরোপ আমেরিকাও শুনিয়াছে। স্বর্গে যদ্যপি দেবতারা আজও থাকিয়া থাকেন তাঁহারাও শুনিয়াছেন। যে কালে প্রবল অহর্নিশ দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজকীয় বিশুদ্ধ গালভরা অভিধান প্রয়োগে অপকর্ম্মগুলিকে রাষ্ট্রীক আভরণে আবরিত করিতেছে, যে

প্রবেশ তোরণ—পুরাণো কিল্লা

ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

কালে নরপশুতে নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, ধর্ম্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বর্ব্বরোচিত পাশবিক অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষে পরোক্ষে রাজনৈতিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত হয় না, হায়! সেই কালেও, এবং সেই মনুষ্যালয়েও অত্যাচারিত ও নিগৃহীত মানুষকে প্রেম ও অহিংসার শান্ত স্নিগ্ধ ও অভয় মন্ত্রে নির্ভয় করিবার মানুষ যে কেবলমাত্র ভারতেই বিদ্যমান, সেই ভারতে, মহামানবের সেই লীলাক্ষেত্রে এসিয়ার সুধীসমাগম হইবে না ত কোথায় হইবে? সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তথাগত বুদ্ধ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে বীজ আজ বপন করিলেন, তাহাই একদিন মহামহীরুহের আকার ধারণ করিয়া রণক্লান্ত লোভক্লান্ত পৃথিবীকে অভয় ও আশ্রয় দান করিবে, এসিয়া মহাসম্মিলনের বসন্ত-সন্ধ্যায় ইমন কল্যাণে তাহারই পূর্ব্বরাগ সঙ্গীত গীত হইতে শুনিলাম।

বিজয়া সম্মিলনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে জওহরলাল বলিয়াছিলেন, "এখানে আমরা রাজনীতি চর্চ্চা করিব না।" এত বড় কথা বলিতে ইংলণ্ডের বেভিন পারেন না, ফ্রাঁসের বিদোল্ট পারেন না, মার্কিন মার্সেল পারেন না, সোভিয়েটের মলোটভও পারেন না; কিন্তু ভারতের জওহর নিঃসঙ্কোচ। ভারত নির্লোভ, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার; ভারতের ধর্ম্ম নিষ্কাম। সিংহাসন অধিরোহণ ও বনবাস ভারতের নিকট তুল্যমূল্য ও অভিন্ন। ভারতের জওহরলাল ভাইকাউন্ট মাউণ্টব্যাটেনের টেবিলে বসিয়া খানা খাইয়া ভাঙ্গী বস্তিতে আসিয়া ছিন্ন চ্যাটাইয়ে বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতে দ্বিধা করে না। বিরাট ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালন ভার (যদিচ আংশিক) স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এই জওহরলালই অসূয়াবিচ্ছিন্ন ধরিত্রীকে অভয় বাণী শুনাইয়াছিল, ভারতের অপ্রমেয় ধনবল, জনবল, ভারতের বক্ষে অফুরন্ত ধনরত্ন, মৃত্তিকাভ্যন্তরে অপরিমিত খনিজ সম্পদ। অদূর ভবিষ্যতে সেদিন আসিবে যেদিন ভারত, শুদ্ধমাত্র এসিয়ারই নহে, সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বাধিকারও পাইতে পারে; কিন্তু নেতৃত্বের যে মূর্ত্তি আজ বিশ্বে প্রকট, ভারত কোন দিন সে নেতৃত্ব কামনা করে না। শক্তিমান ভারত অশক্তকে গ্রাস করিবে না, রক্ষা করিবে; বিশাল ভারত প্রতিবাসী রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া আত্মোদর স্ফীত করিবে না, প্রতিবাসীকে সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে বদ্ধ করিবে; শক্তিমত্ততার দাবা-খেলায় বড়ের চাল চালিবে না; আর্ত্ত দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা মোচনেই আত্মোৎসর্গ করিবে।

বিপুলা চ পৃথ্বীর মানুষের আজ ত আর এ সত্য আদৌ অবিদিত নাই যে ভারতের আশা-আকাঙ্খা কামনা বাসনা এই একটি মানুষের আননে ও নয়নে প্রতিবিম্বিত; ভারতের আত্মার ভাষা এই একটিমাত্র মানুষের ভাষণেই প্রতিধ্বনিত! মহা-সম্মিলনে সম্মিলিত এসিয়া যে এই মানুষটির সান্নিধ্য কামনায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। গান্ধীজীর অদর্শনে এসিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সান্ত্বনা ছিল যে গান্ধীর শাশ্বত আদর্শে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রভাসিত হইতে তাহারা দেখিয়াছে। বুদ্ধকে কয়জন লোক দেখিয়াছে? তথাপি বুদ্ধ চিরপ্রদীপ্ত। প্রথম দিনের সভাধিবেশনের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল যখন আশ্বাসিত করিলেন যে হয়ত মহাত্মাজী একদিন আসিতেও পারেন, তখন সেই বিশাল সভাস্থল যেন আশাতীত কল্পনাতীত হর্ষোল্লাসে হতবাক্ হইয়া গেল। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কথা কেতাবেই পড়িয়াছি, বিদ্যুৎ প্রবাহে বাস্তবে জীবের কি দশা হয় সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। অকস্মাৎ এক সময়ে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে সেই যে লক্ষ করতালি ধ্বনি ধ্বনিত হইল, তাহার আর বিরাম নাই। যেন বর্ষার বারি বক্ষ, থর থর কাঁপে, টল টল নাচে, খর বেগে ধায়—সে দৃশ্য দেখিবার, অনুভব করিবার।

কিন্তু গান্ধী তখন কোথায়? জওহরলালই জানাইলেন, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতের পথে প্রান্তরে সেই লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার মানসে নরোত্তম মানুষটি নগ্ন দেহে নগ্ন পদে ভারতের পল্লী পরিক্রমা ব্রত উদযাপন করিতেছেন। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।' পৃথিবীর শক্তিমানগণ এ্যাটম-খোরিয়াম খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আর গান্ধী মানুষের লুপ্ত মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। কে জানে, কবে

কোথায় ও কেমন করিয়া হারাধন পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিবে ; অথবা আদৌ ঘটিবে কি-না !

শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু সভাধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কন্যা পদ্মজার সঙ্গে তাহার শয়ন কক্ষে উপনীত হইয়া দেখিলাম, প্রবল জ্বরাক্রান্ত। তখন ভাবিয়াই পাই নাই যে দুঃসহ হৃদয়বেদনায় কাতর এই বর্ষিয়সী নারী পরদিন সন্ধ্যায় পঁচিশ সহস্রাধিক নরনারীকে মেঘমন্দ্ররবে ভারতের রূপরসগন্ধামোদিত ত্রিপথগা ভাগীরথীর পূতপবিত্র বারিসম নির্ম্মল আত্মার তীর্থ সলিলে অবগাহনে আহ্বান জানাইতে সমর্থ হইবেন। আমাদেরই ভুল। ভারতের নারী, দ্রৌপদীর অংশে উদ্ভূত, তপস্বিনী উমার বরে উজ্জীবিত, এত অল্পে কাতরতা সম্ভবে না পুরাণের দ্রৌপদী ও দুর্গাকে আমার বড় ভাল লাগে। একজন পাণ্ডব জয়দ্রথ-দলনী, অপরজন মহিষমর্দ্দিনী। সীতা, দময়ন্তী, কুন্তী, তারাকে আমি পূজা করিতে পারি ; কিন্তু দুর্গা ও দ্রৌপদীকে আমাদের আজ বিশেষ প্রয়োজন ! দুঃখ এই যে সরোজিনী দেবী ও বিজয়লক্ষ্মী মাত্র দু'টি। তবে দুঃখই বা করি কেন ? এক সূর্য্য ও এক চন্দ্র কি পৃথিবীর তমিস্রা দূর করে না ?

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়ডু

দুই শতবর্ষকাল বৃটিশ অসীম যত্ন ও অনন্ত অধ্যবসায় সহকারে বিশ্বময় বহু রামায়ণ মহাভারত রচনা ও প্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়াছে যে সভ্যতাভব্যতাবর্জ্জিত ভারতে নারীতে ও গৃহপালিত পশ্বাদি পশুতে কোনই পার্থক্য নাই। এসিয়া মহাসম্মিলন বৃটিশের সত্যবাদিতার যোগ্য উত্তর নহে কি ? শ্রীমতী সরোজিনী সভানেত্রীর অভিভাষণে সেই অপপ্রচারের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেই বোধ করি বলিলেন, আমি নারী ; ভারতে নারীর আসন মহোচ্চ ; কারণ, ভারতে নারীই গৃহকর্ত্রী। অতিথিকে আমন্ত্রণ দিবার, অতিথি সৎকার করিবার অধিকার একান্তরূপেই আমার। অন্য দেশে যাহাই হৌক, ভারতবর্ষে এ অধিকার চিরদিন নারীর। সেই জন্যই এত বিদ্বান, এত জ্ঞানবান লোকবিখ্যাত পুরুষ বর্ত্তমানেও এই আসনে নারী উপবিষ্টা।" ইহার পরেও কি হ্যালিফক্সের জ্ঞাতি গোষ্ঠী ভারত নারীকে ধেনুপদবাচ্য করিয়া বেণু বাজাইবে ? তবে আর বোধ করি তাহার প্রয়োজন হইবে না। ১৯৪৮ সালেই অষ্টাদশ পর্ব্বাবসান।

"আমার শাশ্বত ও সনাতন অধিকার বলে আমি এসিয়াকে আহ্বান দিতেছি। আমার দেশে যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর অতিথিকে তাহা দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার আবেদন আমিই জানাইতেছি। ভারত চিরদিন দান করিয়াছে, কুণ্ঠাভরে নহে, কৃপণকরেও নহে, অকাতরে অবলীলায় সাগ্রহে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হয় নাই। একদিন দানশৌণ্ড ভারতের দানে এসিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল, আজ আবার সেইদিন আসিতেছে, ভারত তাহার কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেছে। কে আছ আর্ত্ত, এসো অমৃতময় এই ভারতে ; কে আছ জ্ঞানপিপাসু, দেখো জ্ঞানমন্দাকিনী প্রবাহিত এই ভারতে। আর কে আছ সত্যপ্রেমত্যাগ-তিতিক্ষানুরাগী, এসো এই ভারতে, দেখিবে, কৌপীনে সাম্রাজ্যের ষড়ৈশ্বর্য্য ! সর্ব্বহারা সর্ব্বত্যাগী বিশ্বে মহৈশ্বর্য্য বিলাইয়া ভাঙড় ভোলার বেশে শ্মশানে মশানে গাজীর বিহার।" এই উদ্বোধন সন্ধ্যার কথা কেহ কোনদিন ভুলিবে না। ভারতের নারী যে সত্যই ভারতের গৃহকর্ত্রী, তাহার কর্ত্তৃত্বের উপরে কর্ত্তৃত্বাধিকার যে কাহারও নাই, সরোজিনীতে সেই মহিয়সী সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিই ফুটিয়াছিল। ভাব ও ভাষার কমনীয় মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যের সহিত ভারতের অক্ষয় অব্যয় আত্মস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে অকাতর আদরসোহাগের কি সে ত্রিবেণী সঙ্গম ! ছার রাজনীতি ! রাজনীতি কি হিমালয়ের উচ্চতা, হিমালয়ের অপরিম্লান পবিত্রতা, হিমালয়ের মধুর শৈত্য দিতে পারে ! সার্থক নাম সরোজিনী ! আর সার্থক এসিয়া মহাসম্মিলন।

এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা হাসির কথা বলি। সরোজিনীর স্নেহসম্ভোগের সুযোগ আমার দীর্ঘকালের। সম্মিলন শেষে একদিন বলিলাম, দিদিভাই, এই সভামাঝে তোমায় বাঙ্গালী বলিয়া বন্দনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন, খবর্দ্দার, ও কাজ করিও না, এখানে হায়দ্রাবাদের অনেক লোক আছে, তুমি কৃশকায় ব্যক্তি তোমাকে অতিশয় উত্তম মধ্যম দিয়া ফেলিবে। হাসির কথা থাক্, "বঙ্গের বধূ বুক ভরা মধু," আমি জানি অন্তরটি বঙ্গনারীর মতই মধুময়।

সরোজিনীর কণ্ঠস্বরে মেঘগর্জ্জন করে, আবার সজলস্নেহে রুদ্ধ হইয়া আসে। শেষকালে যখন বলিলেন, "এসো এসিয়া, আমি আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার, ধনের ভাণ্ডার, গুণের ভাণ্ডার খুলিয়া দিই, অবাধে অসঙ্কোচে পূর্ণানন্দে তোমার ঈপ্সিত রত্নরাজি আহরণ করো, আমি তোমায় সে অধিকার দিলাম" তখন বিশাল সভাস্থল সত্যই চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এসিয়া শ্রদ্ধাবনতশিরে মহান নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া ধন্য জানিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আখ্যান দিয়া আমি এই আখ্যায়িকার অবতরণিকা করিয়াছিলাম, অন্যায় করি নাই; কথাটা আর একবার আসিয়া পড়িতেছে। হস্তিনায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞশালে শিশুপাল স্বভাবসুলভ দুর্ব্বুদ্ধিবশে কিছু উৎপাত করিয়াছিল, আধুনিক হস্তিনায় যাহারা উপদ্রব বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের ভারতও যে তাহার ব্যতিক্রম এমন কথা খুব জোর করিয়া বলা যায় না। তবু যে আজ ভারতের একটি বিশাল ও বিশিষ্ট অংশ ঘাতকের ছুরির নামেই ধিক্কার দেয়, নিঃসন্দেহে ইহা গান্ধী-প্রভাবের অব্যবহিত ফল। গান্ধীবাদের অসামান্য শান্ত ও সিদ্ধ প্রভাব সত্ত্বেও আজিকার হিন্দু-ভারতের ক্ষুদ্রাংশ সাময়িকভাবেও ছুরিকার চাকচিক্যে আকৃষ্ট যদি হইয়াও থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক নির্য্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করিয়াই সেই অনধিকৃত পথে তাহারা পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাহাতে সে সুখী নহে। সাময়িক প্রয়োজনে ও আপদ্ধর্ম্মে পশুবৃত্ত হইলেও পরমুহূর্ত্তেই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মধিক্কারে প্রায়শ্চিত্তানুশীলনে আত্মশুদ্ধির

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতি

করিল তাহারা শিশুপালের বংশধর কি-না বলিতে পারিব না বটে, তবে আকার প্রকারে অদ্ভুত সামঞ্জস্য। বিজয়া সম্মিলনে রাজনীতির স্থান নাই জানিয়াও যজ্ঞভঙ্গের পণ্ডশ্রমে শ্রান্তি দেখিলাম না। শেষ পর্য্যন্ত বিফলযত্ন হইয়া দৈত্যদানা হস্তে ছুরি দিয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিল। দিন কয়েক ধরিয়া রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে গুপ্ত ঘাতকের কর্ম্ম-কুশলতা প্রখর হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য জল্লাদদলের সঙ্ঘ সংগঠন! যেন টেলিগ্রাফের তারের টরে টক্কা ধ্বনি। দিল্লীর তারঘরে খটাখট করিলে কলিকাতা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, আসাম, সীমান্ত, নোয়াখালি ও কানপুর একই সঙ্গে ছুরিকা ঝলসে।

রাষ্ট্রতন্ত্রে ও রণশাস্ত্রে ঘাতক ও ছুরির স্থান চিরদিন আছে। শ্রীকৃষ্ণ, জন্য লালায়িত হইয়াছে। ইহাও কথার কথা নহে, অন্তরেরই সত্য অভিব্যক্তি। ভারতের রাষ্ট্রনীতি যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই ঘাতকের ছুরিকাগ্রে আবর্ত্তিত হইবে ভারতের রাষ্ট্রসাধক কি কুস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন? ইহা ছিল, তাঁহার দুঃস্বপ্নেরও অতীত।

শিবহীন যজ্ঞের কথা, গান্ধীবিহীন এসিয়া মহাসম্মিলনের দুঃখ আগেই বিবৃত করিয়াছি। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পুরুষোত্তমের অদর্শনে মনস্তাপের অন্ত থাকে না। আশার ক্ষীণ সূত্র ধরিয়াই আলাপ আলোচনা চলিতেছিল এবং দিনান্তে একটি করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস নিত্য সন্ধ্যাবায়ুতে লীন হইতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আরও একটি মানুষের অভাব মহাসম্মিলনকে পীড়িত করিতেছিল। সদ্যঃ-স্বাধীন

ভারতেনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুলতান শারিয়রকে সান্নিধ্যে প্রাপ্তির আশা এক সময়ে এমনই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বয়ং ভারত-রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টকেই একদিন হাওয়াই জাহাজের আফিসগুলির সামনে হাওয়াই জাহাজের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে দেখিলাম। বর্ত্তমান পৃথিবীর শিলাগাত্রে দুইজন সার্থক সাধকের নাম খোদিত হইয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতা সাধনার সার্থকতা তাঁহাদের স্ব স্ব জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। ভারতে গান্ধীজী ও ভারতেনেশিয়ায় সুলতান শারিয়র সাহেব। সম্মিলনের সৌভাগ্য, সার্থক সাধকদ্বয় একই দিনে একই সন্ধ্যায় একই মঞ্চে উপস্থিত হইয়া এসিয়ার সুধী-সমাজকে সাদর সম্ভাষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেদিনের সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, এ জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না; আমি ত জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। বলিতে লজ্জা নাই যে, আমি পৌত্তলিক হিন্দু, পৌত্তলিকের মনের বর্ণে সেদিনের পরিচয় আমি লিখিতে পারি। যে গৃহ-বিগ্রহের আমি চিরদিন পূজা করি, আমার ভাগ্যবশে যদি কোনদিন আমার পাথরের দেবতা প্রাণবন্ত হইয়া আমার বিগ্রহ মন্দির ধন্য করেন দেখি, তাহা হইলে আমার কি দশা হয় জানি-না বটে; তবে একটা কিছু যে হয় তাহা নিশ্চিত জানি। সেদিন প্রত্যেকটি মানুষের যদি শত চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে গান্ধীকে দেখা সম্পূর্ণ হইত; যদি সহস্র কর্ণ থাকিত, তবেই গান্ধীর অমৃত-বাণী শ্রবণ সার্থক হইত। সহস্র সহস্রের পরিতৃপ্ত সর্বেন্দ্রিয় নিঃশব্দে যেন এক বাক্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, এই সেই গান্ধী'!

যাক্। বিশ্বা সম্মিলন আখ্যা যখন দিয়াছি তখন মিষ্টমুখ অথবা খানা দানার কথা না বলা অশোভন হয়। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কৃপালনীর উদ্যান সভার কথা বলি। আচার্য্য-দম্পতীর 'কুটীরে' স্থানাভাব, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যানে এসিয়া জলপানে আমন্ত্রিত হইলেন। খাদ্য সচিবের উদ্যান হইলে কি হয়, খাদ্যাবস্থা শোচনীয়। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে জলের অভাব হইবার নহে, অনায়াসে প্রাপ্তব্য, শীতল, উষ্ণ কোনটাই দুর্লভ নহে। সভানেত্রীর অভিভাষণে অতিথিপরায়ণা নারী সাধে কি আর কপালে করাঘাত করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, হায়, আমার সে ভারত কি আজ আছে! অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার অন্নসত্র আজ নিঃশেষে শূন্য হইয়া গিয়াছে! সাগরেও আজ বারি নাই! পণ্ডিত জওহরলালও জলসত্র দিয়াছিলেন। বলা বোধহয় বাহুল্য, তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে জল বলিতে সেই জল বুঝিতে হইবে, যে "নির্ম্মল জলের কোন বর্ণ নাই, গন্ধও নাই।" এইখানেই 'ইম্‌প্রেশারিও' হরেন্দ্র ঘোষ নয়নাভিরাম ছউ নৃত্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। জওহর-আবাসে, জওহর-বিরচিত, ভারতাবিষ্কারের ছন্দোবন্ধে লীলায়িত নৃত্য ঝঙ্কার মহিয়সী ভারতের মহিমময়ী মূর্ত্তিটিরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সারাজীবন ভেঙেখাটা জওহরের সহিত ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সুরুচির কি অবিচ্ছিন্ন সংযোগ! শ্রীমান হরেন্দ্র ঘোষের সাধনাও সার্থক। জওহরলাল আবিষ্কারের ইতিবৃত্তই লিখিয়াছিলেন—ইতিহাসকে নৃত্যচ্ছন্দে রূপায়িত করিতে হরেন্দ্রই পারেন।

বড়লাটপত্নী সুন্দরী লেডী মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁহাদের কন্যা সুন্দরী প্যামেলা পণ্ডিতজীর ভবনে সান্ধ্য-সভার শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় মূর্খ লোক আশা করিতেছিলাম যে ভারতের শেষ ভাইসরয়ও হয়ত বা পেচকাভিজাত্য-সংস্কারের শ্রীমুখে নুড়ো জ্বালিয়া দিয়া 'ভারতাবিষ্কার' নৃত্য বাসরে হাজিরা দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু, বৃথা আশা। যদিচ মাউণ্টব্যাটেন মহোদয় দুইশত বৎসরের পুরাতন আভিজাত্য-গর্ব্বের গগনস্পর্শী বিফল প্রাচীরের ইষ্টক ভাঙ্গিতেই আসিয়াছেন, তবুও, প্রবাদের হিসাব অনুযায়ী লক্ষ্মী ছাড়িলেও 'চাল' ছাড়া সম্ভব হয় না। আমাদের আশা করিবার কারণটি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই যোগান্ দিয়াছিলেন। যে চন্দ্রমাশালিনী মধুরহাসিনী শুক্লা যামিনীতে জওহরাবাসে অতীতের খুসরোজের সুসংস্কৃত মেলা বসিয়াছিল, সেইদিন অপরাহ্ণেই বড়লাট এসিয়ার সুধী-সমাজকে সমাদরে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শুধু কি তাহাই? অসূর্য্যম্পশ্যা না হোক্ অভারতীয়ম্পশ্যা সমগ্র রাজপ্রাসাদটির অন্ধ রন্ধ্র পর্য্যন্ত দর্শনের ব্যবস্থাও তাঁহার ইচ্ছাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় যে আশা

সুধীসঙ্ঘের একাংশ ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

আমরা করিয়াছিলাম তাহা কি খুবই অস্বাভাবিক অন্যায়? লাট-ভবন প্রাঙ্গণে মলয়ানিলান্দোলিত বাসন্তী-সন্ধ্যায় সদ্যঃসমুত্থিত পূর্ণচন্দ্রের দিব্য বিভায় যিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এসিয়ার সেই বিজ্ঞতম সুধী জওহরলালের আতিথ্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহা মনে করা আর যাহাই হোক, মূঢ়তা নিশ্চয়ই নহে। এসিয়া মহাসম্মিলনকে লর্ড মহোদয় যদি আদৌ নস্যাৎ করিতেন, তাহাতেই বা কাহার কি বলিবার থাকিত? তাঁহার 'পূর্ব্বপুরুষ' লর্ড ওয়াভেল 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' থাকিলে তাহাই যে করিতেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। মুস্লীম লীগ বর্জ্জিত সম্মিলনকে পাত্তা দিবেন, লর্ড ওয়াভেল এমন কঠোরহৃদয় শাসক ছিলেন না ইহা সকলেই জানে। প্যারিটি রাখিতে ভদ্রলোক কি প্রাণান্তই না হইতেন, আহা! কিন্তু নূতন লাটের ত "বিল্বমঙ্গল নাটকের" 'কোথ' চিন্তামণি' দশাপ্রাপ্তির খবর আজও পাওয়া যায় নাই!

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রমতে শেষ দৃশ্য আলোকোজ্জ্বল ও মিলনান্ত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধতা না হওয়াই স্বাভাবিক ; এবং শেষদিনে গান্ধীজী শাস্ত্রাচারের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই "ভারত বাক্য" উচ্চারণ করিয়াছিলেন, দিল্লীর স্মৃতি ভুলো না, ভুলো না।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, দিল্লীর স্মৃতি কি ? গান্ধীজীই তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। ভারতবর্ষ এসিয়াকে প্রেমের আমন্ত্রণ দিয়াছে, এসিয়া প্রেমের আহ্বানেই ভারতে আসিয়াছেন। প্রেমের আদান প্রদানের জন্যই এই মহাসম্মিলন আহূত হইয়াছিল ; আবার প্রেমালিঙ্গনের ভিতর দিয়াই বিদায় সম্ভাষণ। ভারত এসিয়াকে প্রেম বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে, বিনিময়ে চাহিয়াছে, প্রেম। তাই গান্ধীজীর শেষ কথা, এই প্রেমমাখা স্মৃতিটুকু ভুলিয়ো না। আমার দুঃখ হইয়াছিল, এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

"প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে ;
প্রেমের গান গগন ভরা প্রেমের কিরণ ভুবনময়।"

দাক্ষিণাত্যবিজয়িনী—শান্তা

ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

গানটা কেহ গাহিল না ! আমি অনেক দুঃখ সহিতে পারি কিন্তু আমার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষার অনাদর (আমার দেশে) দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। এসিয়া সম্মিলনে গাহিবার পক্ষে বাঙ্গলা গানের কুবেরের ভাণ্ডারে যে মহৈশ্বর্য্য সঞ্চিত আছে, শুধু ভারতে কেন, সমগ্র এসিয়াও তাহা কল্পনা করিতে পারে কি ? কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির কত কথাই ত শুনি, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য যে কোহিনুর সম্ভারে সমুজ্জ্বল, এ কথাটা ত কেহ বলিল না। দুঃখ হয়, "সোনা বাইরে আঁচলে গেরো।" এসিয়াকে যদ্যপি বঙ্গসাহিত্যের অমৃত প্রস্রবণের সন্ধানই ভারত না দেয়, তাহা হইলে দান পূর্ণ হইবে কি ? এসিয়া যদি বঙ্গ- সাহিত্যের সুস্বাদই না পাইল, তাহার প্রাপ্যও মিটিল কি ?

আশা করি আমার কথাগুলির কদর্থ কেহ করিবেন না। সেই ভরসাতেই সশ্রদ্ধ নিবেদনে প্রশ্ন করিতেছি ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভাবময়ী ভোগবতী-প্রবাহ বঙ্গসাহিত্যে যেমন মূর্ত্ত, যেমন সমৃদ্ধ, তেমন কি আর্দ্ধও কোথায়ও আছে ? "বন্দেমাতরম্" মাত্র কি আর কেহ দিতে পারিয়াছে ? রবীন্দ্রনাথের মত ভারতের আত্মার নিষ্কলুষ মহিমার ঠিকানা কি আর কোথাও সম্ভব হইয়াছে ? যে বিবেকানন্দের সাধনার সিদ্ধফল সুভাষচন্দ্র, বাঙ্গলার সাহিত্য ইতিহাস নাটক উপন্যাস সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যে ভারতের উত্তর সাধনা সার্থক হইয়াছিল, ভাগ্যদোষে আজিকার ভারতে তাহার কোন স্থানই নাই ! এসিয়া সেই 'মণি কোঠা'রই সন্ধান পাইল না ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি এই দীন সাহিত্যসেবক অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীই আজ করিতেছে যে বঙ্গসাহিত্যের স্বর্ণ সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে এসিয়ার ভারত পরিচিতি অসম্পূর্ণই রহিয়া যাইবে। ইহা দম্ভোক্তি নহে, সত্য দর্শন !

লক্ষবিদ্যুৎ বর্ত্তিকায় আলোকসমুজ্জ্বল সভামণ্ডপে লক্ষ ব্যগ্র নয়ন শীর্ণকায় তপঃক্লিষ্ট প্রেম সাধকের পানে যখন নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ধীরে—অতি ধীরে সেই মোহাবিষ্ট মানব-সমাজ যে মুহূর্ত্তে আনতশিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধানতি জ্ঞাপন করিল—ধীরে—অতি ধীরে রঙ্গমঞ্চের রেশমী যবনিকা আনমিত হইল, রাজসূয় যজ্ঞাবসান ঘোষিত হইল। হয়ত স্বপ্ন—দিবাস্বপ্নও হইতে পারে, আশ্চর্য্য নহে। তা হৌক, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি আমার মানসনেত্রে মানসে মুদ্রিত যে মহা-ভারতের মহামহিমময় চিত্র অবলোকন করিলাম, সে নয়নাভিরাম মনোময় দৃশ্য কি জীবনান্তকালেও ভুলিতে পারিব ? এতদিন আমরা বোম্বাই হইতে ব্রহ্মপুত্রতটে আসাম, হিমাচল হইতে নীলাচল, খাইবার গিরিবর্ত্ম হইতে কন্যাকুমারিকার কল্পনাতেই বিভোর ছিলাম, আজ রাজসূয় যজ্ঞাবসানের মিলনোজ্জ্বলদীপালোকে আরব সাগর হইতে ককেশাশ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহা-ভারতের মহাসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে দেখিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল। সেই মহা-ভারতের ভিত্তি প্রস্তর মহাভারতের হস্তিনাতেই আজ প্রোথিত হইল।

এই মহা-ভারত রচনায় এসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির আগ্রহ উৎসাহই সমধিক। এসিয়ায় মুসলমান রাষ্ট্রের সংখ্যা সত্যই অধিক। স্বাধীন ভারতকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া এসিয়া মহারাষ্ট্রের অপরূপ রূপ-পরিকল্পনায় ভারতেনেশিয়া, ভারতচীন, তুরস্ক, পারস্য, আরব, আফগানিস্থান, কুর্দ্দিস্থান, ইরাণ, ইরাক, উজবেগীস্থানকে অবিচলিত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও, ভারতের কি অপরিসীম দুর্ভাগ্য যে ভারতের মুসলমান- সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ উদাসীন—বিরূপ। রামায়ণের বিভীষণ, মহাভারতের শকুনি মামা হইতে সুরু করিয়া একালের পরিচিত বন্ধুগণ পর্য্যন্ত অভাগিনী ভারতের ভাগ্য কি যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে, কল্পে কল্পে একই পঙ্কিল আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে ? মীরজাফরি-অনুশাসন কি ভারতের সঙ্গের সাথী ? এই পাপ চক্রের অবসান নাই কি ?

মাসখানেক পূর্ব্বে আমি আর একবার দিল্লী আসিয়াছিলাম। তখন আর এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। স্বাধীন ভারতের

শাসনতন্ত্র রচনার প্রথম পর্ব্বে, রাজধানীতে সত্তআহূত গণতন্ত্র পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন চলিতেছিল। আশায় আনন্দে উৎসাহে উল্লাসে দিল্লী সুন্দরী যেন বিবাহের বধূর বেশ ধারণ করিয়াছিল। ভরা নদীতে বান আসিলে যেমন হয়, বসন্তের ফুল্লকুসুমিতা উপবনে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিলে যে শোভা হয়, শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার নামে যে পুলকের প্লাবন প্রবাহিত হয়, সারা ভারতবর্ষের নরনারীর অসনে বসনে নয়নে আননে তাহাই প্রতিবিম্বিত। আর তাহারই মাঝে ম্লান মলিন মুখে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী বিশ্বের করুণার দ্বারে কৃপাপ্রার্থী। রবীন্দ্রনাথের সেই "ভিখারিণী" কবিতাটি যেন দীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে সে যে কি মর্ম্মন্তুদ ব্যথা ও বেদনার পাষাণ স্তূপ সৃষ্টি করিতেছিল, বাঙ্গালী ভিন্ন কে তাহা বুঝিতে পারে?

বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হয়, কোথাকার কোন্ দৈত্যদানার দানবীয় পেষণে ও পীড়নে মৃতকল্প ও মুমূর্ষু বঙ্গদেশ আজ জীবিতে মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করিতেছে? বাঙ্গালীর স্বদেশ-সাধনার সমুদ্রমন্থনে এই হলাহলই কি তাহার ভাগ্যফল? শ্যামল বঙ্গের সে স্নিগ্ধ শ্যামলতা নাই; মৃত্তিকার সে সুরভিত সরসতা নাই; প্রাচুর্য্যভরা বঙ্গদেশে আজ নিত্য হাহাকার; বাঙ্গলার কুঞ্জবনে আজ পিক কূজন নাই; গীতি-বৃন্দাবন বঙ্গে আজ গীতিরব স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার পুরুষের প্রাণে আজ প্রাণের স্পন্দন শুনি না; মধুর আধার নারীর অধরের মধু আজ শঙ্কায় শুষ্ক হইয়াছে; বাঙ্গলার শিশু আজ মাতৃক্রোড়ে শুইয়াও আজ আহ্লাদে হাসে না, ভয়েও কাঁদে না, স্বপ্নেও দেয়ালা করে না। অভয় মন্ত্রের সিদ্ধ পীঠ বাঙ্গলার পানে ভারত আজ ভয়চকিত নেত্রে চাহিয়া থাকে! অদৃষ্টের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস কি ইতিহাস অন্বেষণ করিলেও মিলিবে?

আজ এই মহা ভারতের সৃষ্টিকালেও সেই কথাই বার বার মনে হইতে লাগল, আমাদের কোন্ মহাপাপে বাঙ্গলা আজ বিশ্বের উপহাসের সামগ্রী হইল? ইহার শেষ কোথায় এবং কবে?

বেচারা

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে সকালের কাগজখানা নিয়ে বসেছিলাম। সকালে কাগজ পড়ার সময় হয় না—একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া চলে মাত্র। রাস্তার দিককার ঘরের আমার খোলা দোর দিয়ে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে খগেন ও ভোলানাথ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—বাঁচা গেল—বাড়ী আছ তুমি!

আমিও বাঁচলাম তোমরা আসায়। কারণ কাগজ নাড়াচাড়া করে আর চলছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, খবরের কাগজে কোন খবর নেই—যত রাজ্যের বাজে কথা বোঝাই।

মেঝের পাতা মাদুরে বসতে বসতে ভোলানাথ বলল—আমরা কিন্তু খবর এনেচি একটা।

বাঁচিয়েচ ভাই। বল এখন কি খবর আনলে, শুনি। বলে কাগজ রেখে উৎসুকভাবে আমি ভোলানাথের দিকে ফিরে বসলাম।

সে আরম্ভ করল—শচীন একটা গল্প লিখেচে এবং ছাপায় বেরিয়েচে তার সে গল্পটা।

বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়েই আমি বলে উঠলাম—বল কি? শচীন গল্প লিখেচে? মিউমিউ করা ঐ লোকটির মধ্যে যে একজন কবি অজ্ঞাতবাসে আছেন—কে মনে করেছিল তা?

কিছু না; আমি ওকে কবি বলব না—কিছুতেই না। বলে' ভোলানাথ জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

কেন কবি বলবে না ওকে? কি অপরাধ ওর? কারণ বল, কেন বলবে না।

চোখে দেখে লেখা ওর গল্প—যত জানা কথা লিখেচে ও।

না—সব জানা কথা নয় ভাই। খগেন সংশোধন করে দিল ভোলানাথকে।

কিন্তু কি জানা কথাটা নিয়ে গল্পটা ও লিখল সেটা জানতে দাও আগে—শুনি আগে সে গোড়াকার কথাটা।

মাণিকের বিয়ের কথা নিয়ে গল্প লিখেচে ও। জানা কথা নয়?

হাঁ, কিছুটা ওর জানি বটে, তবে হয়ত অনেকটা জানিনে। বিশেষ শেষের দিকের প্রায় কিছুই জানিনে।

জানইত আমার সঙ্গে ও তেমনভাবে মিশত না কোনদিন—বেশ একটু আলগোচে থাকত যেন। যাক্ এখন বল কি হল শেষটা।

একবারে গোড়ায় গলদ করে বসেচে—

অর্থাৎ?

যা করবার তা না করে, মাণিক করেছে যা করবার নয় তাই।

ও যা হয় করুক—শচীন কি করেচে তাই বল?

সেই কথাই ত বলতে এসেচি—একবারে বিল্কে চটকেচে—যা হয়েচে তা লেখেনি—যা লিখেচে তা হয়নি।

তাতে দোষ হয়েচে কি? গল্প ত ঐ করেই হয়। কতক যার থাকে ঘটনায়—বাকিটা, অর্থাৎ বেশির ভাগটাই যার থাকে লেখকের কল্পনায়।

কিন্তু তাই বলে যে ঘটনাটা নিয়ে গল্প আরম্ভ করল—যেমন যেমন ঘটল সেটা—তা লিখবে না?

আরে—ঘটবার যা তা ত ঘটেই গেল—তার আর লিখবে কি? কিন্তু ঐ যা ঘটল তা ঠিকমত ঘটল না—ঘটনার সংশোধন করে দিলেন কবি তাঁর গল্পে। এই হল গল্প—এ কবির নূতন সৃষ্টি। এই করেই গল্প লেখা হয়। নইলে লেখার মানেই হয় না কোন! ঘটনায় যা হয় তা দিয়ে গল্প হয় না। চোখের সামনে যা ঘটে, মন আমাদের ঠিক খুশি হয় না তাতে এবং মনকে খুশি করবার জন্যই সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের ময়ান দিতে হয়।

কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে ত সবটা? খাপ খাইয়ে দিতে হবে ত এটার সঙ্গে ওটার?

নিশ্চয়। তা না হলে ত গল্পই হবে না। শচীন কি তা পারেনি নাকি? কিন্তু গল্প যখন ওর মাসিকে ছাপা হয়েচে, তখন অতটা গলদ হয়েচে বলে মনে হয় না।

হাঁ—গল্পটা ওর ছাপা হয়েচে বটে কিন্তু নিতান্ত বাজে একখানা কাগজে।

তাতে দোষ হয়নি। কারণ অজ্ঞাতকুলশীলদের লেখা নামকরা কাগজ প্রায়ই ছাপে না। তারা বরং জানা লোকের রাবিশ ছাপবে, কিন্তু অজানা লোকের ভাল লেখা ছাপবে না।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ঠিকই হয়েচে শচীন যা লিখেচে।

তা কেমন করে বলব? আগে শুনি ব্যাপারটা কি হয়েচে আর ঐ বা কি লিখেচে, তারপরে না মতামত বলব আমার? বল—ঘটনাটা বল—শুনি কি হয়েচে?

জানো তার অনেক কথাই। কিন্তু তবু সংক্ষেপে বলে যাই ব্যাপারটা। শোন—যে বছর মাণিক বি-এ দেয় সেই বছরের গোড়ার দিকে—সম্ভবত জানুয়ারি মাসে—কি একটা খবর নিতে একদিন সকালে ওকে কলেজ আপিসে যেতে হয়েছিল। বাইক চড়ে গিয়েছিল ও এবং রাস্তা থেকেই ও দেখল যে কয়েকটি মেয়ে আপিসের দিকে যাবার পথটায় দাঁড়িয়ে জটলা করচে। গেটের বাইরে থেকেই কিড়িং কিড়িং করে মাণিক তার বাইকের বেল বাজিয়ে দিল—মতলব এই যে মেয়েরা সরে যাবে তাকে পথ দেবার জন্য। কিন্তু মেয়েরা তা বুঝল না—কে যেন বাজাচ্চে—কেন বাজাচ্চে—কোন খেয়ালই করল না তারা এবং জটলা যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। এদিকে জানই ত, মাণিক কি রকম ব্যস্তবাগীশ। তার ওপরে সকালের পড়া ছেড়ে আসতে হয়েচে তাকে। একটু দাঁড়িয়েই অধীর হয়ে উঠল ও একবারে এবং বার-বার বেল বাজাতে লেগে গেল। কিন্তু যারা ওর পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ঠিক বুঝতে পারল না যে তাদের পথ ছেড়ে দিতে বলচে মাণিক—তর্ক করতেই মশগুল ছিল তারা, অন্য কোন কথা তাদের মাথাতেই আসে নি। দেখতে দেখতে মাণিকের মেজাজ তেতে উঠল এবং বাইক চড়েই যেন ওদের ফুঁড়ে চলে যাবে এইভাবে গেটের ভেতরে ঢুকে একবারে ঐ মেয়েদের ওপরে চড়াও হয়ে উঠবার উপক্রম করল। তর্ক ওদের থেমে গেল, কিন্তু পথ ওরা ছেড়ে দিল না—বরং যুদ্ধং দেহির ভাবে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ওরা সকলে মিলে সংহত হয়ে। জোর কথা কাটাকাটি চলতে লাগল—মাণিক ইংরিজিতে—ওরা বাংলায়।

মাণিক ইংরেজিতে তর্ক করল ওদের সঙ্গে?

করবেই ত—বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ ছাড়বার পাত্র ও নয়, জান না তুমি?

আচ্ছা তারপরে কি হল? এসব খবর আমি জানতাম না। কি হল শেষ পর্য্যন্ত—

শেষ পর্য্যন্ত আর গড়াল না কারণ ঠিক ঐ সময়ে

একজন প্রফেসার ওপর থেকে নীচে আসছিলেন। তাঁকে দেখে মেয়ের দল নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

তা না হয় গেল—কিন্তু এর মধ্যে গল্প এল কোথা দিয়ে?

বলচি হে বলচি। ঐ যে মিনিট দু'তিনের জন্য ওদের দুপক্ষের তর্কাতর্কি হল তার মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে কড়া কথা ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল—মাণিক করল কি—এক ঘটক লাগিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে নিজের বিয়ের ঠিক করে ফেলল।

বল কি? একবারে রোম্যান্টিক ব্যাপার যে!

তা না হলে আর গল্প হল?

কিন্তু এই সব কথা লিখেচে শচীন?

সব লেখেনি, তবে কিছু কিছু লিখেচে—খগেন বলল।

এইবার তাহলে তুমিই বল ভাই খগেন—আমি একটু জিরিয়ে নিই।

আমি বলতে পারি, কিন্তু চা না হলে একটি কথাও বেরোবে না আমার মুখ দিয়ে—সাফ বলে দিচ্চি ভাই। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই আমার কাছে।

নিমেষের মধ্যে উঠে পড়লাম আমি এবং নিজের কৈফিয়তে বললাম—একবারে ভুলে গিয়েছিলাম ভাই কথাটা। একটু বোস, আমি এক্ষুণি আসচি—বলে বরাবর রান্নাঘরে গিয়ে রাধাকে বললাম—চা করে দাও ত শিগ্‌গির তিন কাপ।

কিন্তু চা যে ফুরিয়ে গিয়েচে একবারে।

ফুরিয়ে গিয়েচে? আগে বলতে হয় কথাটা।

কি করে জানব যে এই রাত দুপুরে তিন কাপ চা চেয়ে বসবে তুমি?

কাল সকালে দরকার হবে—তা ত জানতে।

সকালের এক কাপ হয়ে যাবে—এমন একটু আছে।

এক কাপের যায়গায় দু'কাপ হলেও চলত উপস্থিতের মত।

মুখ বিকৃত করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে রাধা বলল—এক কাপ কোন রকমে হবে। দু'কাপ হবার মত নেই চা—এই দেখ বলে কৌটো থেকে হাতের তোলায় ফেলে দেখালেন—চা যা আছে।

কিন্তু উপায় কি? চা যে চাই।

কিনে নিয়ে এস—আর কি উপায় আছে?

ভাববার সময় ছিল না। রাধাকে বললাম—সব ঠিক করে রাখ তুমি—চা নিয়ে আসচি—বলে বাক্স থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পেছনের দোর দিয়ে।

গলির মোড়েই চায়ের দোকান। যে চাটা আমি কিনি শুনলাম সেটা ফুরিয়ে গিয়েচে। তার চেয়ে বেশি দামের চা'টাই তাই কিনতে হল—তবে অবশ্য কোয়াটার পাউণ্ড ঐ ভাল চা কিনতেও খরচ আমার তেমন বেশি হল না। ভাবলাম, ভাল চা যে কিনলাম ভালই হল বরং সেটা। নাকের কাছে ঠোঙাটা তুলে বুঝলাম গন্ধটা ভালই বোধ হল।

চা নিয়ে ফিরছিলাম, দেখলাম সামনের খাবারের দোকানে সিঙাড়া ভাজচে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—ভাবলাম শুধু চা খেতে দেব—না দুখানা করে সিঙাড়া দেব তার সঙ্গে? কিছু কচুরি ও সিঙাড়া কিনে ফেললাম।

বাড়ী ফিরে দেখি কেটলিতে জল নিয়ে রাধা বসে আছেন—চামচে, ছাঁকনি, দুধ, চিনি, কাপ, ডিস সব হাতের কাছে নিয়ে। খাবারের ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, আগে দুখানা রেকাবে কচুরি সিঙাড়াগুলো সাজিয়ে দাও। রসগোল্লা দুটো দিও না কিন্তু—ও এনেচি কাল সকালে খোকা খাবে বলে। দাও, শীগগীর করে দাও সাজিয়ে—রেকাব দুখানা ত দিয়ে আসি ওদের—ওরা খেতে থাক—ততক্ষণ তুমি চা করে ফেল দু-কাপ।

তবে বলছিলে তিন কাপ চা চাই?

আমি একটু খাব ভেবেছিলাম।

নাঃ, তোমার আর চা খেয়ে কাজ নেই এই এত রাত্রে।

না আমি খাব না আর। খেলে ত তিন কাপই করতে বলতাম। আর দুটোর বেশি ত কাপ নেই—আমি খেতে চাইলেই কি দিতে পারবে?

ক্ষিপ্রহস্তে রেকাবে খাবার সাজিয়ে দিলেন উনি। তাই নিয়ে বাইরের ঘরে ওদের দুজনের সামনে ধরে দিলাম।

এ কি? আমরা ভাবলাম, চা আনবে তুমি?

চা আনচি। কথাটা যে ভুলে গিয়েছিলাম এ তারই কৈফিয়ৎ।

অধিকন্তু তাহলে? বেশ।

কিন্তু চায়ের সঙ্গে এই সিঙাড়া কচুরি দেবার আইডিয়াটা কার? তোমার নয়—বোধ হয়?

ভোলানাথ জোর করে বলে উঠল—নিশ্চয় নয়। আমি হলফ করে বলতে পারি সে কথা। তেষ্টার জল চাইলে এক গেলাস জল তুমি এনে দিতে পার, কিন্তু গেরস্তর পক্ষে তৃষ্ণার্ত্তকে শুধু জল দিতে নেই—জল ভাল লাগবে বলে কিছু মিষ্টি অভাবে গুড়ও দিতে হয় সেই সঙ্গে। চা চেয়েছি বলেই সিঙাড়া এসেচে—জল চাইলে আসত সন্দেশ।

মাঝের দোরের শিকল ঠন ঠন করে উঠল। আমি উঠে গিয়ে দু'হাতে দু-কাপ চা নিয়ে রাখলাম দুজনের ওদের সামনে।

খাওয়া বন্ধ করে ভোলানাথ বলে উঠল—বাঃ দিব্যি গন্ধ বেরিয়েচে ত তোমার চায়ের।

কাপটা মুখের কাছে তুলে তাতে এক চুমুক দিয়ে খগেন বলল—শুধু গন্ধটি ভাল নয়, স্বাদে বর্ণে গন্ধে যেন প্রতিযোগিতা চলচে এই চায়ের মধ্যে—কোনটা যে বেশি ভাল—তা বলা শক্ত।

অতটা বলতে চাইনে কিন্তু চা'টা যে বেশ ভাল হয়েচে তা বলচি।

কিন্তু তুমি মনে করো না ভাই যে একটু বেশি দাম দিয়ে চা কিনেচ বলেই ভাল হয়েচে তোমার এই চা। এ ভাল হয়েচে তৈরির গুণে।

যেমন গল্প ভাল হয় বলবার কায়দায়—খগেন বুঝিয়ে দিল ঐ সঙ্গে।

ঠিক মনে করে দিয়েচ ভাই। গল্পের কথা ত প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বল কি হল তার পরে।

তার পরে শচীন লিখেচে যে সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করেচে মাণিক। আসলে কিন্তু মাণিক বিয়ে করেচে আর একটি মেয়েকে এবং যতদুর বোঝা যায়, টাকার লোভেই সে করেচে ঐ বিয়ে। আমরা বারণ করেছিলাম তাকে ও বিয়ে করতে এবং তার বিয়েতে কেউ আমরা যাইনি।

বটে!

এখন কথা হচ্চে এই যে এ অবস্থায় তুমি বল—শচীনের কি উচিত ছিল না, বেশ করে দুটো কড়া কথা মাণিককে শুনিয়ে দেওয়া?

তা'তে অবশ্য একটা আঘাত করা হয় মাণিককে, কিন্তু গল্প খেলো হয়ে যেত ভাই।

কিন্তু অন্যায় যে করল তাকে আঘাত করব না?

আঘাত ত তোমরা করেচ। ওর বিয়েতে যে তোমরা যাওনি—ও কি বুঝতে পারেনি তার কারণটা? বুঝতে পেরেচে, কিন্তু গ্রাহ্য করেনি সে আঘাত। গল্পের মধ্যে লিখলে অবহেলা করতে পারত না তার আঘাত।

কে বলল? কে জানত যে কাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্চে? সে পক্ষের কোন লাভই হত না—মাঝে থেকে গল্পটা বাজে হয়ে যেত।

অর্থাৎ তোমার মত এই যে শচীন ঠিকই করেচে—মাণিককে যে ও আঘাত করেনি—ভালই করেচে তা না করে। কেমন?

ঠিক তাই। আঘাত যে শচীন করেনি তাতে শুধু গল্পের নয়, মাণিকের পর্য্যন্ত মর্য্যাদা বাঁচিয়ে গিয়েচে শচীন। আমার আরো মনে হয় তোমাদের কথায় যা হয়নি হয়ত শচীনের কথায়—কিছু না বলার ফল তার চেয়ে ভাল হবে। কিন্তু সে আলাদা কথা—গল্পের ভাল মন্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

তাইতে তুমি বলতে চাও যে ঠিক করেচে শচীন? নূতন করে খগেন জিজ্ঞাসা করল।

আমার ত তাই মনে হচ্চে ভাই তোমাদের মুখে শুনে। কিন্তু লেখা গল্প শুনে সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না—পড়ার দরকার। দাওনা পড়ে দেখি কি লিখেচে শচীন—বলে হাত বাড়ালাম আমি ভোলানাথের দিকে।

মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব করল—না আমার কাছে নেই কাগজখানা। ওরই হাতে ছিল। নিয়ে আসছিল ও তোমাকে দেখাবে বলে। গলির মোড়ের ঐ দোকানটায় সিগারেট কিনতে দাঁড়িয়ে গেল ও—আমরা আগিয়ে এলাম। খানিকদুর এসে পেছনে চেয়ে দেখি ও আসচে না। আগিয়ে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর দিকে চলচে ও। ডাকলাম চেঁচিয়ে—শুনতে পেল না বোধ হয়—অন্তত ফিরত না সে ডাক শুনে।

কিন্তু এলে ভাল করত হয়ত—

নিশ্চয়—এমন ভাল চা'টা খেতে পেত। ভাগ্যে নেই—

ও এক রকমের মানুষ—নিন্দা সইতে পারে কিন্তু সুখ্যাতি সইতে পারে না।

ঠিক বলেচ—দুঃখ হচ্চে বেচারার জন্য—বলতে বলতে খগেন উঠে পড়ল—বলল—আর না এইবার যাওয়া যাক, বলে কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল—দশটা বাজে।

দুজনে ওরা রাস্তায় নেমে পড়ল।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব

সোমবার বেলা ছুটোর মধ্যেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার এসে গেল। তিনদিনের জন্য তিনি আমাদের মাউন্ট আবুতে মোটর নিয়ে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা ভারী খুশী। এইবার আরামে সব দেখে বেড়ানো যাবে। কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ যে তখনও মুখটিপে হাসছিলেন এ কথা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। মনের আনন্দে ছুটে গেলুম আবু মোটর সার্ভিসের ম্যানেজারের কাছে। বললুম—এই নিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঢালা হুকুম! তিনদিনই গাড়ী চাই আমরা। আজ এখনি বেরুবো 'দিলবারা মন্দির' আর 'অচলগড়' দেখে আসতে।

পণ্ডিতজী বললেন—গাড়ী আমি এখনি দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু, আমার গাড়ী নিয়ে তো আপনারা অচলগড় যেতে পারবেন না!

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম কেন? ও ছুটো তো একই পথে পড়বে! আমরা 'দিলবারা' দেখে তারপর 'অচলগড়' যাবো!

পণ্ডিতজী বললেন—আমার সমস্ত গাড়ীর লাইসেন্স মাত্র আবু মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা পর্য্যন্ত। দিলবারা মন্দির মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে। সে পর্য্যন্ত আমাদের গাড়ী যাবে। 'অচলগড়' সিরোহী রাজের এলাকায়। ওখানে "সিরোহী বাস এণ্ড মোটর সার্ভিস কোম্পানী" বলে পৃথক একটি কোম্পানী আছে। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন অচলগড়ে যাবার গাড়ীর জন্য। ওদের গাড়ীর অচলগড় যাবার লাইসেন্স্ আছে।

কী ফ্যাসাদ!! যদিবা তিনদিন পরে কর্ত্তাদের কাছে আবেদন নিবেদনের ফলে মোটর চড়ে মাউন্ট আবু ঘুরে বেড়াবার আদেশ-নামা পাওয়া গেল, মোটর কোম্পানী বলে কিনা কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যেই আমাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখতে হবে!

অথচ, পূর্ব্বেই বলেছি, অধিকাংশ দ্রষ্টব্য স্থান এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাইরে। সুতরাং; মোটর গাড়ী পাওয়াও যা, আর না-পাওয়াও তাই! একেই বলে ভবিতব্য!

তবে কিনা, আমরা কিছুতেই হাল ছেড়ে ব'সে পড়তে রাজী নই বলে শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই করে ফেলা গেল! আবু মোটর সার্ভিসের গাড়ী আমাদের 'দিলবারা' মন্দির পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে সিরোহী মোটর সার্ভিসের গাড়ী নিয়ে আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাবো।

বেরিয়ে পড়লুম আমরা সদলবলে বেলা তিনটে না বাজতেই!

পথে যেতে যেতে মোটর চালক বামভাগের একটি মন্দিরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে—ঐটি নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মেয়েরা শুনেই শিব-সন্দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গাড়ী থেকে উঁকি মেরে দেখলুম অতি সাধারণ একটি মন্দির। স্থাপত্যকলার কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। বললুম—৬টা বাজলেই দিলবারা মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। আগে চলো দিলবারা দেখে আসি। ফেরার পথে নীলকণ্ঠ মহাদেবের সন্ধ্যারতি দেখে ফেরা যাবে। প্রস্তাবটা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হল। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো।

আবু মোটর সার্ভিসের রিটায়ারিং রূম্ থেকে দিলবারা মন্দিরের দূরত্ব দেড় মাইলের বেশী নয়। অধিকাংশ যাত্রীই পদব্রজে যাতায়াত করে। আমরা গাড়ীতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলুম।

মন্দিরের প্রবেশ পথের মুখেই 'টেম্পেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস'। এইখানে মাথাপিছু পাঁচসিকা দক্ষিণা দিয়ে যাত্রীদের মন্দির দর্শনের অনুমতি পত্র নিতে হয়। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত মন্দির দেখবার সময় নির্দ্দিষ্ট। যে কোনও ভারতীয় যাত্রীকে মন্দিরে প্রবেশ

করতে দেওয়া হয়। জাতি ধর্ম্মের কোনো বাধা নেই। কেবল অভারতীয় দর্শকদের আবুর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ পত্র না আনলে মন্দিরের মধ্যে যেতে দেওয়া হয় না। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি জিনিস নিয়ে যাওয়া নিষেধ—যেমন ভোজ্য, পানীয়, অস্ত্র-শস্ত্র, লাঠি ছড়ি ছাতা, জুতা, চামড়ার কোনও জিনিস, যেমন ক্যামেরা, বাইনোকুলার, মণিব্যাগ, চশমার খাপ, রিষ্টওয়াচ ব্যাণ্ড, ইত্যাদি। মন্দিরের মধ্যে ধূমপান শুধু নিষেধ নয়—অপরাধ বলেও গণ্য।

দুঃখের বিষয় আমাদের সঙ্গে সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুগুলিই ছিল। মন্দিরের দ্বারপালের কাছে আমরা একটি একটি করে সবাই সব কিছু জমা রাখতে তবে আমাদের অগ্রসর হতে দিলে। কেবল টর্চগুলি নিয়ে যাবার অনুমতি পেলুম। বাবাজীর ক্যামেরাটির খাপটি ছিল চামড়ার, কিন্তু যন্ত্রটি ছিল রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল ধাতু নির্ম্মিত। দ্বার-পালের সঙ্গে তর্ক ক'রে কেসটি তার কাছে জমা রেখে ক্যামেরাটি বার

দিলবারা মন্দিরের মণ্ডপ বা নাটমন্দির

করে সঙ্গে নেওয়া হ'ল। ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেবার আগে তিনি সেটি নিয়ে বেশ করে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করে দেখলেন তার মধ্যে কোথাও চামড়ার কোনওপ্রকার কিছু সংস্রব আছে কিনা; কারণ কোনও জিনিসের সঙ্গে এতটুকু চর্ম্ম সম্পর্ক থাকলেও তা নিয়ে যাওয়া নিষেধ। বুঝতে পারলুম—এদের প্রাচীন বর্ণ-বিদ্বেষটাই বর্ত্তমানে এই চর্ম্ম বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে।

যেখানে আমাদের কাছে দক্ষিণা নিয়ে প্রবেশপত্র দেওয়া হ'ল, ঠিক তার সামনেই একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে দেখে আমরা ভেবে-ছিলুম এইটিই বুঝি দিলবারা মন্দির। বিশাল দেউল। প্রশস্ত পাষাণ সোপান উঠে গেছে পথ থেকে প্রায় আধ তলা উঁচু পর্য্যন্ত। মন্দিরটির আকৃতি দেখে খুব পুরাতন বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সেটি প্রথমতঃ মর্ম্মর শিলায় নির্ম্মিত নয় এবং তার স্থাপত্য কলা ও কারু কার্য্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করতে পারে। কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে এ মন্দির কখনই সেই জগদ্বিখ্যাত দিলবারা মন্দির নয়।

আমাদের অনুমান যে ভুল নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল একজন পথপ্রদর্শকের কাছে। অত্যন্ত পরিচিতের মতো কাছে এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার হিন্দীভাষায় বললে—আসুন, মন্দির দেখতে যাবেন তো আপনারা? চলুন এই পথ দিয়ে। আমি সব মন্দিরগুলি আপনাদের ভাল করে দেখিয়ে দেব।

'সব মন্দির?' প্রশ্ন করলুম 'এখানে দিলবারা মন্দির ছাড়া আরও অন্য মন্দির আছে নাকি?'

পথপ্রদর্শক হেসে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, 'দিলবারা' বললে তো কোনও একটি বিশেষ মন্দিরকে বোঝায় না। 'দিলবারা' শব্দটির অর্থ হল 'মন্দির ভূমি' বা তীর্থস্থান। এখানে পাশাপাশি পাঁচটি মন্দির আছে, তাই এস্থানের নাম 'দিলবারা' বা 'মন্দির-তীর্থ'। অবশ্য পাঁচটি মন্দিরই সমান নয়। ওর মধ্যে প্রধান হ'ল দুটি—'বিমলশাহী মন্দির' আর 'বস্তুপাল-তেজপাল মন্দির'

বুঝলুম দিলবারা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনি। লোকটিকে সঙ্গে নিতে হ'ল।

মন্দিরের সামনে গিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। ও হরি! এর নাম 'দিলবারা'? অতি সাধারণ চুণকাম করা উঁচু পাথরের সাদাসিধা প্রাচীর। মধ্যে একটি মাঝারি রকম প্রবেশ দ্বার। কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, শিল্পকলার চিহ্ন মাত্র চখে পড়ে না কোথাও। আমাদের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। যাব কি যাব না ভাবছি। মোটর খানা ছেড়ে না দিলেই ভাল হ'ত। আমাদের নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেছে। ৬টার পর আবার নিতে আসবে বলে গেছে!

পথপ্রদর্শক ডাক দিলে—ভিতরে আসুন।

বললুম—ভিতরে এর চেয়ে ভাল কিছু দেখবার আছে কি?

লোকটি হেসে বললে—এর ভিতর দিয়ে গিয়ে বহিরঙ্গন পার হয়ে তবে আসল মন্দিরে ঢোকবার প্রবেশ দ্বার পাবেন। এটাত কিছুই নয়। মন্দিরটিকে বিধর্ম্মী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্য বাইরে দিকে এ একটা ছলনার আবরণ মাত্র! এটি না থাকলে কি আপনারা কেউ আজ 'দিলবারা' এমন অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেতেন? আহম্মদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা অচলগড় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। বার বার সিরোহী আক্রমণ করেছে তারা। দিলবারার সন্ধান পেলে কি রক্ষা ছিল?

কথাগুলো নেহাৎ বাজে বা যুক্তিহীন বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রবেশ করলুম তার পিছু পিছু। বহিরঙ্গন উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যখন মূল মন্দিরের মর্ম্মর তোরণ দ্বারে এসে দাঁড়ালুম—আমরা একেবারে নিস্পন্দ! বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা থাকে বলে!

প্রবেশ দ্বার খুব বড় বা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু শ্বেত পাথরে গড়া সেই মন্দির তোরণের প্রতি ইঞ্চিটি এমন নিখুঁত ও সূক্ষ্ম শিল্প কারুর রম্য নিদর্শনে সমাচ্ছন্ন যে তা দেখে নির্ব্বাক না হ'য়ে উপায় নেই! একটুও বোঝা যায় না যে এসব পাথর। মনে হয় যেন শাদা মোমের ছাঁচে গড়া সেই [illegible] পাতা ও মূর্ত্তিগুলির কমনীয় সুষমা প্রখর রৌদ্রতাপে এখনি গলে যাবে হয় ত!—এমনিই পেলব কোমল তার আবেদন!

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বিমল শাহের নামে এই মন্দিরটির নাম হয়েছে 'বিমলশাহী মন্দির'। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ প্রথম ভীমদেবের প্রধান সচিব শ্রেষ্ঠী বিমলশাহ বারো কোটি টাকা ব্যয় করে পৃথিবীর এই পরম বিস্ময়কর মর্ম্মর দেউল নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। কথিত আছে যে তদানীন্তন আবু পর্ব্বতের অধীশ্বর প্রামারা রাজের কাছে তিনি যখন মন্দির নির্ম্মাণ উপযোগী ভূমি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন প্রামারারাজ উপেক্ষার হাসি হেসে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—"ভীমদেবের উদ্ধত মন্ত্রীকে বোলো যে প্রামারা রাজ জমী বেচার ব্যবসা করে না। কতটাকা আছে তোমাদের বিমল শাহের? সমস্ত জমীটা সে যদি রজত মুদ্রায় ঢেকে দিতে পারে তাহ'লে আমি দিতে পারিএ জমী তাকে।"

মন্দির নির্ম্মাণে দৃঢ় সংকল্প বিমলশাহ সেই মূল্য দিয়েই জমী সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু কারা সেই যাদুকর শিল্পী—কঠিন পাষাণকে নিয়ে যারা এমন কোমল মাখনের ন্যায় যদৃচ্ছা রূপান্তরিত করে তাকে অপরূপ রূপ দিয়েছিলেন? মহাকালের অতল বিস্মৃতির গর্ভে তাঁরা আজ মিলিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অসামান্য সৃষ্টি আজও অক্ষয় হয়ে আছে। মন্দির দ্বার উত্তীর্ণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম একটি মাথা ঢাকা চকমিলানো চতুষ্কোণ অলিন্দ বা চত্বরে। সমস্ত মন্দিরটির চারিপাশ ঘিরে আছে এই প্রশস্ত চত্বর। চত্বরের কোলেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি গম্বুজাকৃতি মণ্ডপ এবং এই মণ্ডপের সমুখেই প্রধান মন্দিরটি স্থাপিত।

মন্দির প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ হ'লেও আয়ত ক্ষেত্রের (Oblong আকার। চারপাশের অলিন্দটি অঙ্গন থেকে আন্দাজ একফুট উঁচু মণ্ডপের সমতল ভূমিও অঙ্গন থেক অন্ততঃ একধাপ অর্থাৎ প্রায় ইঞ্চি উঁচু। আর প্রধান মন্দিরের চত্বর প্রায় দু ফিট উঁচু। তিন ধাপ বেয়ে তবে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। অঙ্গনটি দৈর্ঘ্যে ১৪ ফিট এবং প্রস্থে ৯০ ফিট। চারপাশের অলিন্দ আন্দাজ ৮ফিট চওড়া এই অলিন্দের ছাদটিকে ধরে আছে ৪৮টি স্তম্ভ।

পূর্ব্বেই বলেছি অলিন্দের কোলেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ, কিন্তু অলিন্দে পিছনেই মন্দিরের উচ্চপ্রাকার বেষ্টনী। বাইরে থেকে দেখলে অব প্রাকার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না, কিন্তু মন্দিরে ঢুকে এ প্রাকারের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উল্টো পিঠে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পার্শ্ব পরিবৃ অলিন্দের পিছনে সারি সারি পরের পর ৫২টি ছোট ছোট প্রাকারগাে

মণ্ডপের মধ্যে

অন্তঃপ্রবিষ্ট মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের দরজার দুপাশে জোড়া জোড় অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের থাম। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে।

আমরা প্রথমেই এই দীর্ঘ অলিন্দ প্রদক্ষিণ ক'রে চারপাশে প্রত্যেক ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে ঢুকে ঢুকে সেই ৫২টি তীর্থঙ্করে মূর্ত্তি দর্শন করলুম। অলিন্দের ছাদের নিম্নভাগ (cielings) এ একটি ছোট ছোট চতুষ্কোণ চন্দ্রাতপে বিভক্ত। ছাদের এই অভ্যন্ত ভাগের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণস্থাপত্যকারুগুলি, প্রত্যেক ছোট বড় শি সমুৎকীর্ণ স্তম্ভটি এবং একস্তম্ভ থেকে অপরস্তম্ভের শীর্ষদেশে যে বিচি কারুখচিত পুষ্পধনু আকারের তোরণ-মাল্য সংযুক্ত-সে সব দেখতে দেখতে বিস্ময়বিমুগ্ধ ও মোহাভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়।

স্মৃতিপথে ভাস্বর হয়ে উঠছিল বহুকাল আগে পড়া Abbe Dubois

এর Memoirs of Travels in India. তিনি এই মন্দির দেখে লিখে রেখে গেছেন—"The sight alone of these enchanting beauties is sufficient to intoxicate the senses of the blessed and to plunge them into a perpatual ecstacy that is far superior to all mere earthly pleasures.

এই অধ্যাত্মলোকের ভাবুক সাধক, ধর্ম্মগতপ্রাণ বিদেশী সন্ন্যাসী—
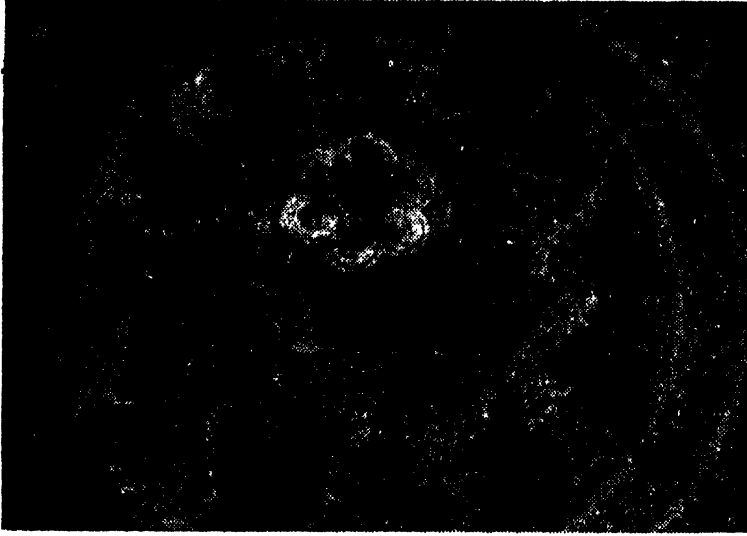
অলিন্দের ছত্রতলের একটি চন্দ্রাতপ

প্রধান মন্দির

শতাব্দী আগে যা লিখে রেখে গেছেন তার একবর্ণও অতিরঞ্জিত মনে হয় না। যথার্থই এই মন্দিরের মোহিনীরূপ ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য শুধু একবার চোখে দেখবার সৌভাগ্য হবে যার, সে ভাগ্যবানের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি রূপমদে বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং তার সমস্ত চিত্ত এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে তন্ময় হয়ে পড়বে, কোনও পার্থিব সুখের সঙ্গেই সে অনুভূতির তুলনা করা চলে না। পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় ভরা সে যেন এক লোকোত্তর পরমানন্দ!

আলোক চিত্রে এ অলোকসামান্য মন্দিরের সমগ্র সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না। কুন্দধবল তুষারশুভ্র শিলায় গড়া সৌন্দর্য্যে ঝলমল দেউলটি এই। মর্ম্মর-স্বপ্ন তাজমহলের অনুপম কারুকার্য্যও এর পাশে যেন ম্লান হয়ে যায়। দিলবারার শিল্পীরা যেন সিদ্ধ যাদুমন্ত্রে জড় পাষাণকে জীবিত করে তুলেছেন! কঠিন পাথর যেন তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া লেগে সদ্যবিকশিত পুষ্পগুচ্ছের মতো স্তরে স্তরে অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে উঠেছে! নবনীত কোমল যেন তার সুকুমার পরশ, পেলব কমনীয় যেন তার লাবণ্যের সুষমা। মনে হয় বুঝিবা—'সহেনা ভ্রমর চরণ ভর!'

প্রত্যেকটি পাষাণ স্তম্ভের মূলপ্রান্ত থেকে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত এত রকমের বিচিত্র কারুকার্য্যে মণ্ডিত যে অবাক হয়ে ভাবতে হয়—না জানি শিল্পীর কত যুগযুগান্ত কেটে গেছে এই এক একটি স্তম্ভ উৎকীর্ণ করতে। প্রত্যেকটি মর্ম্মর তোরণ-মালিকা এবং ছাদের নিম্নভাগের প্রত্যেক ছত্রী বা চন্দ্রাতপতে (ceiling) এমন বিচিত্র কারুকার্য খচিত যে সেই শিল্প শোভার দিকে মাথাটি পিছনে হেলিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যায়, তবু যেন দেখে আশ মেটে না! সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর হল এই, যে—প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই নূতন ও স্বতন্ত্র কোনোটিই কোনোটির অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়!

ক্রমশঃ

দিগন্তলিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—ছয়—

নাজীপুর থানা থেকে রঞ্জুর বাবা বদলি হলেন।

চাকরীতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। মফঃস্বলের একটি ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার ইন্‌-চার্জ হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল বাঁধাছাঁদার পালা। লীলাঞ্চলা আত্রাই, ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, স্কন্ধকাটার হাইতোলা মজে-আসা আলেয়াদীঘি, রবিশস্যে ভরা ইস্কুলে যাওয়ার মাঠটা, মশানীর মন্দির, কবিরাজের বড় আমবাগানটা আর অবিনাশবাবুর ভাঙা আশ্রম; বাদল, অশ্বিনী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, উষা, নিশিকান্ত আর অবিনাশবাবুর ওপর দিয়ে চিরদিনের মতো যবনিকা নেমে এল।

ছেড়ে আসতে খুব কি দুঃখ হয়েছিল রঞ্জুর? না। এই ছোট গ্রাম, এই থানা, এই গঞ্জ। এর বাইরে আর একটা বিশাল এত বিশাল, যে রঞ্জু কল্পনাও করতে পারে না—একটা দেশ আছে। তার উত্তর-পূবে কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, হিমালয় আর খাসিয়া জয়ন্তীয়ার অলঙ্ঘ্য বিস্তার, তার দক্ষিণে গাঢ় নীল ঢেউ নিয়ে নেচে নেচে খেলা করছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। কলকাতা, কাশী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। সে এক আশ্চর্য দেশ, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। মানচিত্রের ওপরে নানা রঙের ছাপ আর নানা বিচিত্র নামের ভেতরে রঞ্জু তাদের নাজীপুরের নাম কোথাও খুঁজে পায়নি। এই বিপুল দেশের কাছে তাদের নাজীপুর কত ছোটো, কত নগণ্য!

মনে আছে রঞ্জু এই ভারতবর্ষের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ডাক শুনেছিল হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরামের, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগরের। পৃথিবীর পথে যাত্রা সুরু হল তার। ধুলো-ভরা যে মেটে পথটা উঁচু উঁচু তালগাছের হাতছানিতে তার মনটাকে বারে বারে নিয়ে গেছে পাশাবতীর পুরীতে, শঙ্খমালার দেশে, একদিন সন্ধ্যাবেলা গোরুর গাড়ীতে করে সেই পথ দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়ল মানচিত্রে আঁকা আশ্চর্য দেশটার সন্ধানে।

গোরুর গাড়ির পেছনে ছইয়ের ভেতরকার ছোট কাটা জানলাটা দিয়ে ঘুম-ঘুম বিহ্বল চোখ মেলে সে দেখছিল একটু একটু করে কেমনভাবে নাজীপুরের ছটো-চারটে মিটমিটে আলো ক্রমশ পেছনে সরে যাচ্ছে। শুধু অন্ধকারে কবিরাজের আমবাগানটাকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে এখনো, যেন শেষবারের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কারা যেন কী একটা কথা বলতে চাইছে রঞ্জুকে। রঞ্জুর গা ছম ছম করে উঠল, ভয় করতে লাগল। মুহূর্তে সে ছইয়ের ভেতরে মাথাটা টেনে নিলে, তার পর মার কোলে মুখ বুজে শুয়ে পড়ল। আর অনুভব করতে লাগল অসমতল এলোমেলো রাস্তায় গাড়িটা কেমন মাতালের মতো টলতে টলতে অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবী। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের তুষার তীর্থের পথে।

* * * *

শহর। যেখানে ঘোড়ার গাড়ী আছে, মোটর আছে, রেলের ইস্টিশন আছে। যেখানে দোতলা-তেতলা মস্ত মস্ত দালান, যেখানে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধানো, যেখানে রাস্তার পাশে পাশে রাত্তিরে আলো জেলে দিয়ে যায়। যেখানে সাবধানে চোখ চেয়ে পথ না চললে তুমি গাড়ি চাপা পড়তে পারো, অন্য মানুষের সঙ্গে তোমার গায়ে ধাক্কা লাগতে পারে। রঞ্জুর জীবনে, সেই প্রথম শহর। নাম—ধরা কি মুকুন্দপুর।

নিতান্তই মফঃস্বল শহর। শ্রী নেই, রূপ নেই, স্বাস্থ্য নেই। বর্তমানের চাইতে অতীতের জীর্ণ একটা সোঁদা গন্ধই যেন চারদিকে পাক খেয়ে বেড়ায়। ধুলো আর

অপরিচ্ছন্নতা। কাঁচা ড্রেনে দুর্গন্ধ সবুজ কাদা। পচা পুকুর আর জংলা আমের বাগান। পাড়াগুলো অনাবশ্যক ভাবে দূরবিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট—যেন একটা দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে খামখেয়ালের বশে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রঞ্জুর কাছে সেই প্রথম শহর। এর জীর্ণ নিরানন্দ রূপ প্রথম দৃষ্টিতেই যেন তাকে জয় করে নিলে। নাজীপুরের তুলনায় কত বিরাট, কত বিচিত্র! তার কুন্দপুরের চাইতে বহু দূরের শহর কলকাতা অনেক বড়, অনেক আশ্চর্য—এ কথা তার বিশ্বাস হত না, এ কথা ভাবতে তার কষ্ট হত।

শহরের সঙ্গে পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। একটা বিপ্লব দেখা দিলে সংসারে। এতদিনের নিশ্চিন্ত সহজ জীবনে জটিলতার গ্রন্থি-বন্ধন অনুভব করলে রঞ্জু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় থানা থেকে বাবা যখন কোয়ার্টারে ফিরলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ থম থম করছে। শুভ্র বিস্তীর্ণ ললাটে কতগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠেছে, একদিনের মধ্যে যেন কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে বাবার। সেদিন বাড়ির ছোট বোনগুলো পর্যন্ত চেঁচিয়ে কাঁদতে সাহস পেল না, আস্তাবল থেকে ঘোড়ার সহিসটার সিদ্ধি খাওয়া গলায় রামায়ণের সুর শোনা গেল না, বড়দার ঘরে সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত গানের মজলিশ বসল না, ঠাকুরমা গলা খুলে একবারও চেঁচিয়ে উঠলেন না। একটা অশুভ আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত বাড়িটা ডুবে রইল স্তব্ধতার মধ্যে।

কয়েক মাসের ভেতরেই যেন অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে পাক খেয়ে গেল পৃথিবীটা। সেই সব দিনগুলো ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো (রঞ্জু তখনো সিনেমা দেখেনি) পর পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অপসারিত হয়ে গেছে, একটার পর আর একটা জড়ানো—সবগুলো মিলে এইটে মনে পড়ে—বাবার চাকরী গেল।

আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ করে তাঁর চাকরী গেল। যতদূর মনে আছে এস্-পির সঙ্গে কী একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। বাঙালী পুলিশ সাহেবের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল এবং তার ফল যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

লজ্জায়, অপমানে এবং অবিচারের ক্ষোভে বাড়িতে মৃত্যুশোকের ছায়া নেমে এল। কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল, বন্দুক রিভলবার রইল না, ঘোড়াটা বিক্রী করে দিতে হল। তারপর আশ্রয় নিতে হল শহরের প্রান্তে একটা ভাঙা বাড়িতে।

মা বললেন, এখানে থেকে আর কী হবে? চলো, দেশে চলে যাই।

বাবা কঠিনভাবে বললেন, না।

—কিন্তু এখানে থাকা কত বড় অপমান সে কি বুঝতে পারছ না?

বাবা বললেন, না। অপমান এতদিন ছিল, এবার সে অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

সেইদিন রাত্রে রঞ্জুর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল একটা।

সন্ধ্যার পরেই বাড়ির যত বিলাতী কাপড়, পুলিশী ইউনিফর্মের অবশেষ, একগাদা টুপি, দু-তিনখানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট স্তূপাকার করে উঠোনে জড়ো করা হল।

ঠাকুর মা আর্তনাদ করে উঠলেন: খোকা, এ তুই করছিস কী। এত দামি দামি সব কাপড় জামা—

বাবার গলার স্বর পাথরের মত শক্ত শোনাল: তুমি চুপ করো মা।

কিন্তু দু তিনশো টাকার জিনিস-পত্তোর—

—অপমানের শেষ চিহ্নটুকুও রাখব না। অনেক আবর্জনা জমেছিল, আজ পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেব।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন ঠাকুরমা। তারপর জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে উঠে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর আবার হাঁপানির টান উঠেছে। তবু সে অবস্থাতেও ঘরের ভেতর থেকে তাঁর একটা অব্যক্ত আর অস্পষ্ট কান্না-ভরা বিলাপ শোনা যেতে লাগল।

বাবা কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজের হাতে আধ টিন কেরোসিন এনে ঢেলে দিলেন কাপড়ের স্তূপের ওপর, জেলে দিলেন দেশলাইয়ের কাঠি। আগুন নেচে উঠল।

অন্ধকার উঠোনটা উল্লসিত হয়ে উঠল অতি তীব্র খানিকটা আলোর দীপ্তিতে। উঠোনের বেঁটে পেয়ারা

ছটার মাথা ছাপিয়ে শিখাগুলোর সরীসৃপ রেখা কাশের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। কাপড়, আলপাকা, টুু, তুলো আর পোড়া কেরোসিনের দুর্গন্ধে বিস্বাদ হয়ে য়ে উঠল বাতাস। অনেক অপমান, অনেক পাপ এক ঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাবা নিশ্চল একটা মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে ইলেন। আগুনের একটা লাল আভা এক একবার তাঁর খের ওপরে পড়ে সরে সরে যেতে লাগল, কেমন আশ্চর্য ার ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল তাঁকে। আর মাঝে মাঝে ার চোখ সম্মুখের ওই আগুনটার চাইতেও শাণিত হয়ে সে জ্বলে উঠতে লাগল। সেই চোখ, ঠিক সেই চোখ— চোখ সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—সেই তিরিশ লের বন্যার সময়। রঞ্জুর কেমন ভয় ধরেছিল, কেমন কটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন অকারণে মনে হয়েছিল বাবা ন আজ প্রকৃতিস্থ নেই। তাঁকে যেন আজ ভূতে রেছে, একটা প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। সেকি বিনাশবাবুর প্রেতাত্মা?

যতক্ষণ আগুনটা জ্বলল ততক্ষণ বাবা তেমনি নিশ্চল র বারান্দায় বসে রইলেন। তারপর একটা উত্তপ্ত ন্ধকারে উঠোনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল, একটা রক্তাক্ত তের মতো কিছুক্ষণ ধরে দপ দপ করতে লাগল স্তীর্ণ একটা অগ্নিশয্যা, বাতাসে পোড়া ছাইগুলো এলো-লোভাবে উড়তে লাগল।

সেই রাত্রেই বাবা ওদের তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন। লণ্ঠনের আলোয় বাবার আর এক মূর্তি সেই যেন থম চোখে পড়ল রঞ্জুর। মেজেতে একখানা হরিণের মড়ার আসন পেতে তিনি বসেছেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গ হে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধপ ধপ করছে, একটা অপূর্ব চতায় প্রশস্ত কপাল জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর। আঠারো রের জমাট গ্লানি থেকে সত্যিই আজ মুক্তিস্নান হয়েছে । আঠারো বছর ধরে বাবার এইরূপ, এই ব্রাহ্মণোত্তম কোথায় লুকিয়েছিল?

সামনে বসে মা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব পড়ছিলেন। লেদের পায়ের শব্দে তিনি বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকালেন। রপর মহাভারত বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে রিয়ে গেলেন তিনি।

বাবা বললেন, বোসো তোমরা।

তিন ভাই সভয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালো। কেমন অভিভূত হয়ে গেছে তারা। ঘরে ধূপ জ্বলছে, কোথা থেকে চন্দনের সুগন্ধ আসছে। যেন ঠাকুর ঘরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে একটা। তিন ভাই কুণ্ঠাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্যদিন হলে হয়তো বাবা একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। কিন্তু ওই হরিণের চামড়ার আসন, গলার ওই ধবধবে পৈতেটা, চন্দন আর ধূপের গন্ধ—সব মিলিয়ে যেন সব কিছুর একটা আশ্চর্য রূপান্তর হয়ে গেছে। প্রশান্ত স্বরে বাবা আবার বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো সব ওখানে।

সসঙ্কোচে তিনজনে বসল। বসল মাটিতে চোখ নামিয়ে। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো শিক্ষা অথবা সৎসাহস ওরা এ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে নি।

—তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি।

তিন জোড়া কাণ উৎকর্ণ হয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বাবা বললেন, আজ তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

তিন জোড়া চোখ একবারের জন্যে একটুখানি উঠেই আবার মাটির দিকে নেমে গেল। বিস্ময়ে ওদের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, একটা বিশ্রী অস্বস্তি ওদের পীড়ন করছে।

—প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী করবে না। আর মনে রাখতে হবে যাদের কাছে ন্যায় নেই, বিচার নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

যন্ত্রচালিতের মতো তিন ভাই উচ্চারণ করলে, প্রতিজ্ঞা করলাম।

প্রতিজ্ঞা! রঞ্জু জানে সবচেয়ে সার্থক প্রতিজ্ঞা, সব চাইতে বড় সংকল্প সেদিন সে উচ্চারণ করেছিল। এর গুরুত্ব সেদিন সে বুঝতে পারে নি, সেদিন এর বিন্দুমাত্রও তার পক্ষে অনুমান করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা ভুলতে পারে নি। ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মিথ্যা বলতে পারা যায় না, তেমনি

ধূপ-চন্দনের গন্ধে ভরা শুচিতায় আবিষ্ট সেই ঘরটিতে, হরিণের চামড়ার আসনে বসে থাকা সেই উজ্জ্বল দীপ্ত মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে সংকল্প সে নিয়েছিল, তার অনিবার্য নির্দেশের লৌহ-তর্জ্জনা প্রসারিত হয়ে রইল তার আগামী ভবিষ্যতের দিকে।

শিলালিপিতে আর একটি আঁচড় পড়ল।

এইবারে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা দিল রঞ্জু।

এতদিন একটা গণ্ডি ছিল তার—নিষেধের একটা বেড়া টানা ছিল চারদিকে। এইবার খোলা পৃথিবী থেকে দমকা বাতাসের ঝাপ্‌টা এল একটা, যে বেড়ার আর চিহ্নমাত্র রইল না। প্রকাণ্ড জগৎটাকে দেখতে চেয়েছিল রঞ্জু, তাই সে প্রকাণ্ড জগতের মানুষগুলো তার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

স্রোতের মতো চলে গেছে সময়, দু বছর বয়েস বেড়েছে রঞ্জুর। নতুন পরিবেষ্টনীর সঙ্গে অভ্যস্ততা পুরোণো হতে হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা একটা জমিদারী কাছারীতে ম্যানেজার হয়ে বসেছেন—মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রাচুর্য এখন আর কষ্ট দেয় না। ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি না হলেও এখন রঞ্জুর খাওয়া হয়, ক্ষীরের মতো দুধ না হলে এখন আর কান্না পায় না, মাসে মাসে নতুন জামা জুতো এল কিনা সে সম্পর্কে এখন আর সজাগ থাকবার দরকার আছে মনে হয় না। ছেঁড়া প্যান্ট, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—পাড়ার মধ্যবিত্ত ছেলেদের সঙ্গে সে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

পাড়ার নাম মনসাতলা। নামটা হওয়ার একটা কারণ আছে। এই পাড়ার চৌমাথার তিনকোণা একটা দ্বীপের মতো একফালি জমি ছিল। কতদিন আগে কে জানে—কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে বট অশ্বত্থের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দুটি গাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে বড় হয়েছে, রচনা করেছে বিস্তীর্ণ একটা বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। এই জোড় গাছের তলায় প্রায় প্রতি বছর ঘটা করে মনসা পুজো করা হয়, বিষহরির গান হয়। তাই পাড়ার নাম হয়েছে মনসাতলা।

এই মনসাতলার শান্ত ছায়ার নীচে কী মনে করে মিউনিসিপ্যালিটি লম্বা একটা সিমেন্টের বেঞ্চি তৈরী করে দিয়েছে। ফলে এটা হয়েছে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় পাড়ার সকলের একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই জায়গাটা ছেলেদের দখলে থাকে। বেঞ্চিটা যখন প্রথম তৈরী করা হয়, তখন কাঁচা সিমেন্টের ওপর কোনো এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা (ছেলেরা তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ) ষোলো ঘুটি বাঘবন্দীর গোটা কয়েক ছক তৈরী করে রেখেছিলেন। ছেলেরা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা থেকে খোয়া কুড়িয়ে এনে সেখানে দলে দলে খেলতে বসে যায়, ছাগলের চক্রব্যূহে বাঘকে বন্দী করে ফেলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে। বেঞ্চিটার নীচে মাটিতে সারি সারি ছোট ছোট গর্ত—বেশ যত্নসহকারে গর্তগুলোকে নিখুঁত গোলাকার করবার চেষ্টা হয়েছে। সকালে বিকালে এবং রবিবারের সমস্তটা দিন ধরে সেখানে মার্বেল খেলা চলে।

মার্বেল খেলার সে সব সাংকেতিক বাক্যগুলো আজও দুটো চারটে মনে পড়ে। ইংরেজি ভাষার অমন অপূর্ব সদ্ব্যবহার বোধ হয় আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'সিংগিল্ মেলালিং' মেলালিং এও না।

"উড্ডু কিপ্"—(মার্বেল মাটি উঁচু করে বসিয়ে দাও।)

"হাত ইস্টেট"—(হাত উঁচু করে ইচ্ছেমতো মারো।)

"ঠ্যাকাউন্‌স্ বাই ফমৃটি ফিপ্‌টি হাণ্ড"—(আটকে দিলেই মার্বেল চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।) এই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠত মার্বেলের ঠকাঠক শব্দ। কে কতটা মার্বেল ফাটাতে পারত এই ছিল কৃতিত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পরে যখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাঘবন্দীর 'কোর্ট' আর মার্বেলের গর্ত ছেড়ে ছেলেদের বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হত, তখন এই মনসাতলায় এসে বসতেন পাড়ার অভিভাবকেরা। সাধারণ মফঃস্বল শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তদের মতোই তাঁরা আদালত আর কাছারী নিয়ে আলোচনা করতেন, রাজনীতির শ্রাদ্ধ করতেন, সুযোগমতো ফিস্‌ফাস করে পরের হাঁড়ির খবরাখবর নিয়ে গবেষণা করতেন, মিউনিসিপ্যাল্ কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা পর্যালোচনা করে আগামী নির্বাচনে সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবার পরিকল্পনা নিতেন। আর মাঝে মাঝে মার্বেল

খেলার গর্তে পা পড়ে কেউ কেউ যখন হোঁচট খেতেন তখন তাঁদের উত্তেজনা আরো বেশি বেড়ে উঠত। জাতির এই সব অপোগণ্ড বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁরা দৈববাণী করতেন এবং স্থির করতেন, পরের দিন মার্বেল খেলতে এলেই হতভাগাগুলোকে ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেবেন।

কিন্তু আগের রাত্রির কথা পরের দিন তাঁদের মনে থাকত না। আর বেলা সাড়ে আটটা না বাজতেই হৈ হৈ করে মার্বেল নিয়ে ছেলের দল এসে পড়ত।

এই দলের যে পাণ্ডা ছিল তার নাম ভোনা।

বেঁটে চেহারার ছেলে, শরীরের ওপরের দিকটার চাইতে নীচের দিকটা বেশি মোটা। পায়ের পাতা দুটো এত বেশি বড় যে সেই বারো তেরো বছর বয়েসেই ভোনা তার বাবার একটা পুরোণো ছেঁড়া চটি পরে আসত। খেলার সময় যখন দৌড়োত, তখন হাতীর চলার মতো শব্দ উঠত থপ থপ করে। গালের ডানদিক দিয়ে সব সময়ে বেরিয়ে থাকত জিভের ডগাটা—মনে হত সারাক্ষণ যেন কাউকে ভেংচে চলেছে সে।

আর মুখখানা। ওরকম পাকামিভরা মুখ হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। নীচের ঠোঁটে কয়েকটা কালো কালো দাগ পড়েছিল তার—ছেলেরা বলত ভোনা লুকিয়ে বিড়ি টানে। আর হিন্দুস্থানীরা খৈনি খেয়ে যেমন করে থুথু ফেলে, তেমনি করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলত সে। অভ্যেসটা কোত্থেকে আয়ত্ত করেছিল সেই জানে।

মার্বেল খেলায় ভোনার হাত ছিল পরিষ্কার। দৈনিক অন্তত দুগণ্ডা করে সে মার্বেল জিতত, ষোলো ঘুঁটি বাঘবন্দী খেলায় তাকে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। তা ছাড়া অজস্র কথাবার্তা বলতে পারত চোখেমুখে, আর কোমর দুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নেচে নেচে আলিবাবার গান গাইত:

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল
এত্তা বড়া উঠানমে এত্তা জঞ্জাল—"

বলা বাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে নেতা হওয়ার পক্ষে এই গুণগুলোই যথেষ্ট। বাপের জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে বাপের মতোই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভোনা। কিন্তু সে গুণাবলী ক্রমশ প্রকাশ্য।

রঞ্জুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা যেভাবে হওয়া উচিত সেই ভাবেই হল। একটা প্রকাণ্ড লাট্টু নিয়ে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছিল ভোনা, আর মাঝে মাঝে সেটাকে হাতের তেলোতে তুলে নিয়ে সকলকে গুণমুগ্ধ করে তুলছিল। তারপর হঠাৎ রঞ্জুর দিকে চোখ পড়তেই প্রশ্ন এল: এই গঙ্গাফড়িং, তোর নাম কিরে?

অপমানে কাণ লাল করে রঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল, ভোনা এসে তার কাঁধে হাত দিলে।

—আরে চটছিস কেন? তোকে গঙ্গাফড়িং বললাম, তুই না হয় আমাকে ভোঁদড় বলবি। চটাচটির কী আছে ভাই? এই নে—কামরাঙা খাবি?

এরকম লোকের ওপরে রাগ করা শক্ত। রঞ্জু হেসে ফেলল।

—হাসি ফুটেছে? আঃ—বাঁচালি। কারো গোমড়া মুখ দেখলে বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। নে—খা এই কামরাঙাটা। ভয় নেই, টক নয়। পিটার সাহেবের বাগান থেকে চুরি করা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি।

ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যেন বাধে রঞ্জুর। মনসাতলার অন্যান্য ছেলেদের মতো—ভোনাকে তার ভালো লাগে, একধরণের শ্রদ্ধাও আছে তার সর্বাঙ্গীণ দক্ষতার ওপরে। তবু কোথায় যেন মনের দিক থেকে মস্ত একটা বাধা আছে, ভোনাকে সে ঠিক গ্রহণ করতে পারে না।

বৈশাখের দুপুর। ইস্কুলে গরমের ছুটি—বাড়ি থেকে পালাবার সুযোগ এবং অবকাশের অভাব হয় না। আম-বাগানে ছেলেদের আড্ডা জমেছিল।

একরাশ কাঁচা আম জড়ো করা হয়েছে। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণের সাহায্যে সেগুলোর সদ্গতি করা চলেছে। টকে আর আরামে একধরণের মুখভঙ্গি করে ভোনা বললে, এই থাঁদু, রায় বাড়ির বিমলি কী করেছে জানিস?

থাঁদু ভোনার প্রধান সহচর। আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী করেছে রে?

তারপর তেমনি চোখ আর মুখের ভঙ্গি করে, জিভটাকে বিচিত্র ধরণে বের করে কতগুলো কথা বলে গেল ভোনা। সে কথাগুলো রঞ্জুর কাছে অপরিচিত—

সে সব কথা মনে করতে গেলে আজও সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে আর শিউরে আসতে চায়। তাদের অর্থ সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা ভাবে কী একটা ইঙ্গিত তার চেতনার ভেতরে নাড়া দিয়েছিল সেদিন। রঞ্জুর কান গরম হয়ে উঠেছিল, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, হৃৎপিণ্ডটা যেন আচম্‌কা ভয় পেয়ে ধক্ ধক্ করে উঠেছিল বার কয়েক। তারপর রঞ্জু আর সেখানে বসতে পারে নি, সোজা এক ছুটে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে। বহুদিন পরে মনে হয়েছিল, আজ যেন আবার পেছনে পেছনে সেই হাড়গিলা পাখিটা কক্ কক্ করে তেড়ে আসছে।

পেছন থেকে ভোনা, খাঁদু এবং অন্যান্য ছেলেদের অট্টহাসি ভেসে আসছিল। ওরা কৌতুক বোধ করেছে। বিদ্রূপ করে বলছে : কাপুরুষ!

কাপুরুষ! তা হোক। ও কথাটায় তখন লজ্জা হয়নি।

বাড়ি ফিরে এল রঞ্জু। খিড়কি দরজার পেছনে যেখানে ছাইয়ের মস্ত একটা গাদা জমেছে; রান্না ঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে চাল থেকে ঝরা বৃষ্টির রেখায় সবুজ ছ্যাত্‌লা ধরা জমিতে যেখানে গজিয়েছে ছোট বড় কতগুলো ব্যাঙের ছাতা; এলোমেলো কচু গাছের সঙ্গে ডোম্না কাটা সাপের মতো লম্বা লম্বা বুনো ওলের ডাঁটা উঠেছে আর সবটা মিলে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নতুন ফুলে ভরা বড় বাতাবী লেবুর গাছটা—সেখানে, সেই নির্জনতা ঘেরা আবর্জনার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল রঞ্জু।

কান দুটো তখনো তার ঝাঁঝাঁ করছে, তখনো কপাল বেয়ে তার টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে সেই প্রথম একরাশ কাদা ছিটকে লাগল মালঞ্চমালা, কঙ্কাবতী আর পাশাবতীর সাত রঙে আঁকা কল্পনার অপরূপ ছবিতে। নরনারীর ভেতরে সব চাইতে স্থূল, জৈবিক সম্বন্ধের কুশ্রী চিত্রটা কদর্য রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে একটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো ভাসতে লাগল।

রঞ্জুর মনে হল আজ সে পাপ করেছে। মিথ্যে কথা বলা নয়, পড়ার বইয়ের আড়ালে গল্পের বই লুকিয়ে মা-কে ফাঁকি দেওয়াও নয়। তার চাইতে এ অনেক বড় অন্যায়, ঢের বেশি অপরাধ। এ অপরাধের জন্যে তার ক্ষমা নেই—কারো চোখের দিকে সে আর চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। রঞ্জুর কান্না পেতে লাগল, হাতজোড় করে বলতে ইচ্ছে করল, ঠাকুর, আমায় মাপ করো, আর কোনোদিন আমি ভোনার সঙ্গে মিশব না।

নিজের অপরাধের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে অনেকক্ষণ সেই ছাই গাদার ওপরে বসে রইল রঞ্জু। তারপরে যখন খেয়াল হল তখন বাতাবী লেবু গাছটার হাল্‌কা ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, ফুলের গন্ধে বাতাস যেন থেমে দাঁড়িয়েছে, তিন চারটে শালিক পাখি নেচে নেচে ব্যাঙের ছাতার তলায় তলায় কেঁচো খুঁজছে, আর একটু দূরের রেল লাইন দিয়ে বিকেল পাঁচটার প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ঝরাং ঝরাং করে চলেছে কাটিহারের দিকে।

উঠোনে ঢুকতেই প্রথমে মায়ের নজর পড়ল।

এগিয়ে এসে মা কপালে হাত দিলেন: কি রে, তোর হয়েছে কি? চোখ ছল ছল করছে কেন? জ্বর আসছে নাকি?

—না।

মার তবু সংশয় যায় না।—না বললেই শুনব? বাঁদর ছেলে হয়েছে, সারা দুপুর খালি টো টো করে বেড়ানো, আর যত ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে কাঁচা আম খাওয়া। আজ রাত্রে আর ভাত পাবে না।

রঞ্জু আস্তে আস্তে বললে, না মা, আর আমি দুপুরে বেরুব না, ওদের সঙ্গেও মিশব না।

মা হেসে ফেললেন: খুব সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ভাত বন্ধ করার নামেই বুঝি? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, এখন হাত পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-বিভাগ ও পশ্চিম বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জ্জন যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালাকে পৃথক করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশ সেই ঘোষণার প্রতিবাদে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর ১৬ই অক্টোবর যখন সত্য সত্যই বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল, সেদিন সারা বাঙ্গালার বিক্ষুব্ধ নরনারীর মুখে অন্ন উঠিল না। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আশ্বিনের সেই অরন্ধনের এবং বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মিলিত অভিযানের প্রতীক রাখীবন্ধন উৎসবের কথা বঙ্গবাসী আজও ভুলিতে পারে নাই। জাতীয় জীবন ঊষার প্রথম অরুণোদয়ের রক্তাক্ত স্মৃতি আজও জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর মনে সোনার অক্ষরে লিখিত আছে।

সেই বাঙ্গালীই যে আবার বাঙ্গালাকে ভাগ করিবার জন্য সংগ্রাম সুরু করিবে, ইহা সত্যই ভাবা যায় না। কিন্তু বাঙ্গলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থার সহিত যাঁহাদের এতটুকু পরিচয় আছে, তাঁহারা বুঝিবেন যে কতখানি বেদনা এবং হতাশা লইয়া বাঙ্গালার হিন্দুরা আজ মাতৃঅঙ্গচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বিদেশী শাসকসম্প্রদায়, বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে সেদিন কোন ভেদাভেদ ছিল না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সেদিন হিন্দুনেতা সুরেন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন মুসলিম নেতা লিয়াকৎ হোসেন ও আবদুল রসুল। আজ হিন্দুরা এই প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠতার লাঞ্ছনায় সকল দিক হইতে নিগৃহীত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে বাঙ্গালার মোট জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪.৭ জন এবং অমুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪৫.৩ জন (ইহার মধ্যে ৪১.৬ ভাগ হিন্দু)। এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে মুসলমান জনসাধারণের প্রতিভূ সাজিয়া লীগদল বাঙ্গালার গদীতে গত ১০ বৎসর ধরিয়া কায়েমী হইয়া বসিয়াছেন এবং মুসলিম জনগণের হৃদয় জয় করিবার অস্ত্র হিসাবে হিন্দু-বিদ্বেষ মূলধন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুস্বার্থ পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। বাঙ্গালায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নাই এমন নয়, এখনও এই প্রদেশে বহু মুসলমান আছেন যাঁহারা মনেপ্রাণে কংগ্রেসভক্ত এবং ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করিয়া যাঁহারা ভারতবাসী হিসাবে হিন্দুকে ভাই বলিয়া স্বীকার করেন ও অকৃত্রিম ভালবাসেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ এই শ্রেণীর মুসলমানের বাঙ্গালার শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কোনই ক্ষমতা নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম বৎসর হইতেই বলিতে গেলে বাঙ্গালাদেশ লীগ মন্ত্রীসভার অধীনে রহিয়াছে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১.৬ ভাগ হইয়াও গণতন্ত্রের মাহাত্ম্যে এদেশে হিন্দুদের সত্যকার অধিকার বলিয়া গত দশ বৎসর কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে অবস্থা তবু একটু ভাল ছিল, মাঝে মাঝে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জুলুম সাময়িকভাবে একটু কমাইয়াছিল, গত বৎসর হইতে কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে বাঙ্গালার পরিস্থিতি একান্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হইতেছে, পরিবর্ত্তনের এই সুযোগে ক্ষমতা লাভের লোভে আত্মহারা হইয়া লীগদল যেখানেই নিজেদের কিছু প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানেই গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে। লীগ সচিবসঙ্ঘের আমলে সমগ্রভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য বাঙ্গালার হিন্দুরা সর্ব্বত্রই নিগৃহীত হইতেছে। লীগ সচিবসঙ্ঘের মুখপত্র ইত্তেহাদের পৃষ্ঠাতেই দেখা যায়, লীগ মন্ত্রীসভা বাঙ্গালার দেওয়ানী বিভাগে মুসলমানের জন্য শতকরা ৮০টি চাকুরী রিজার্ভ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৮০ জন মুসলমান হাকিম পাঠাইয়াছেন, পুলিস হিসাবে দলে দলে পাঞ্জাবী মুসলমান আমদানী করিয়াছেন, কোটি কোটি টাকার কনট্রাক্ট বিতরণ ও দোকান বন্টনের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করিয়াছেন, কলিকাতার অধিকাংশ থানায় মুসলমান অফিসার বসাইয়াছেন, 'ইসলামিয়া বাজেট' পাশ করাইয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি বিহারের মুসলমানদের জন্য বাঙ্গালার সরকারী তহবিল হইতে অজস্র টাকা খরচ করিয়াছেন। বাঙ্গলার বাজেটে গত ৭ বৎসর যাবৎ ঘাটতি চলিতেছে এবং যুদ্ধশেষ হইলেও ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই ঘাটতির পরিমাণ ১৯ কোটি টাকার বেশী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পে-কমিশন রিপোর্ট এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে ব্যবসাদির ক্ষতিতে রাজস্ব হ্রাস বিবেচনা করিলে মনে হয় ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘাটতি বাজেটের অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে এবং উপরিউক্ত দুই বৎসরের মোট ঘাটতির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাদেশিক অর্থনীতির হিসাবে এই অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, লীগ মন্ত্রীসভা যে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণ ও হিন্দুদের পীড়নসূচক ব্যবস্থায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন, ইহার অধিকাংশই যোগাইতেছে বাঙ্গালার হিন্দু, আসিতেছে শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম বাঙ্গলা হইতে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা মুসলমানপ্রধান, কিন্তু ইহা কৃষিপ্রধান এলাকা। এই এলাকায় সরকারের এমন কিছু আয় হইতে পারে না যাহাতে সচিবসঙ্ঘ গৌরীসেনের মত টাকা উড়াইতে পারেন। পূর্ব্ববঙ্গে যেটুকু আয় হয়, তাহারও একটি বড় অংশ হিন্দু জমিদার, ব্যবসাদার এবং আড়তদারগণ যোগাইয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও এখানকার হিন্দুরা মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত এত গণ্ডগোলের মধ্যেও একরূপ সদ্ভাবে বাস করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে, যেখানে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য, সেখানে মুসলমানেরা রাজকীয় মেজাজে

হিন্দুদের উপর চড়াও হইয়া যে সব অত্যাচার করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সেই ব্যাপক অনাচারের তুলনা হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় মোট জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ৮১°৪, ৭৭°১ ও ৬৭°৩ জন। এই সব জায়গায় মুসলমানেরা হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ আজ আর লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘ সমগ্র প্রদেশবাসীর অভিভাবক, কিন্তু এই সব জেলার দুর্গত হিন্দুদের রক্ষায় তাঁহারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। কাজেকাজেই সবদিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু এখন এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছে যে, হিন্দুর কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা সামাজিক ও আর্থিক জীবনের সংহতি রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে নিজস্ব একটি বাসভূমি সংগ্রহ করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ঠ সংখ্যাগুরু হইয়াও শুধু হৃদয়াবেগ-জনিত দৌর্ব্বল্যে তাহারা আর অখণ্ড বাঙ্গলায় বাস করিয়া চিরকাল নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে রাজী নয়। তা ছাড়া বাঙ্গালার হিন্দু জাতীয়তাবাদী, দেশের মুক্তিসংগ্রামে তাহারা চিরকাল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের বাসভূমির সম্পর্ক দৃঢ় ও নিবিড় হোক, ইহাই তাহারা চায়। মুসলীম লীগ যে এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে, সেই এলাকার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হইবারই সম্ভাবনা। সে হিসাবেও বাঙ্গালী হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রদেশের প্রয়োজন।

অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় অবশ্যই অনেক আশাপ্রদ। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতার আশে পাশে বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব শিল্পাগারে অসংখ্য লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গ পৃথক রাষ্ট্র হইলে আশা করা যায় শিল্পাদির স্থানীয়করণ সহজ হইবে বলিয়া এখানে আরও বহুসংখ্যক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ কৃষির দিক হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান নদনদীর অভাবে চাষ-বাসের এখন কিছুটা অসুবিধা হইলেও এই অঞ্চলের নদীগুলি সংস্কার করিয়া চাষের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। একমাত্র দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলেই পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ নদনদীর সংস্কার হইলে কারখানা চালাইবার উপযোগী প্রচুর পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা অনেক কলকারখানা চলিতে পারিবে। তাছাড়া কৃষির দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যদিইবা ঘাটতি অঞ্চল হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে তাহার সেই ঘাটতি প্রতিবেশী উড়িষ্যাদি উদ্বৃত্ত প্রদেশ অবশ্যই পূরণ করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাঙ্গালার শিল্পসমৃদ্ধির জন্য এখানে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান যেমন সহজ হইবে, সেইরূপ প্রচুর কাজকারবারের মধ্যে অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে। ব্রিটেন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ দেশ, কিন্তু ব্রিটেনও কৃষির দিক হইতে স্বাবলম্বী নয়। পূর্ব্ববঙ্গ কৃষিসমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে এই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের পক্ষে রাষ্ট্রপরিচালনার সর্ব্ববিধ ব্যয়সঙ্কুলান করা অবশ্যই কঠিন হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্পদ রাণীগঞ্জ—আসানসোল অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি। এই খনিগুলির কয়লার উপর শুধু বাঙ্গলার নয়, বোম্বাইয়ের কলকারখানাসমূহ পর্য্যন্ত বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। ব্রিটেনের কয়লা সম্পদই যে বরাবর তাহার শিল্পসমৃদ্ধির অনুপূরক হিসাবে কাজ করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিল্পসম্প্রসারণে লৌহ প্রভৃতি যেসব ধাতুর প্রয়োজন সেগুলি বাঙ্গালায় বিশেষ পাওয়া না গেলেও (লৌহাদি যাহা পাওয়া যায় সবই প্রায় সঞ্চিত আছে পশ্চিম বাঙ্গালার বরাকর অঞ্চলে) খনিজসম্পদ সংগ্রহের দিক হইতে পূর্ব্ববাঙ্গলার তুলনায় পশ্চিম বাঙ্গালারই সুবিধা বেশী। পূর্ব্ববাঙ্গলা আসামের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করিলে (এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে) তবেই কিছু কিছু খনিজসম্পদ পাইতে পারে; পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্ত্তী ছোটনাগপুরের ম্যাঙ্গানিজ ও বকসাইট, কোডারমা, হাজারিবাগ ও গিরিডির অভ্র, ময়ুরভঞ্জের লৌহমাক্ষিক, হাজারীবাগ অঞ্চলের টিন, সিংহভূমের তামা প্রভৃতি অনায়াসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা পশ্চিম বাঙ্গালার পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। পূর্ব্ববাঙ্গালায় পাট জন্মায়, কিন্তু বাঙ্গলায় যে ৯৯টি চটকল আছে তাহাদের সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার আশপাশে অবস্থিত। নূতন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে চটকল বসাইয়া সমস্ত উৎপন্ন পাট কাজে লাগানো শীঘ্র সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। চটকল প্রতিষ্ঠার যন্ত্রপাতির সমস্যা ছাড়া চটকল চালাইবার মত কয়লারও পূর্ব্ববঙ্গে একান্ত অভাব। তাছাড়া কাঁচা পাটের জন্য পশ্চিম বাঙ্গালার চটকলগুলির ক্ষতি হয়তো হইতে পারে, কিন্তু এই শিল্প এখনও এত অধিক পরিমাণে বিদেশীদের করায়ত্ত যে চটকলগুলি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের তেমন কিছু আসিয়া যাইবে না।

কাপড়ের দিক হইতেও পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক সমৃদ্ধ। কাপড়ের হিসাবে শুধু পূর্ব্ববঙ্গ নয়, প্রস্তাবিত সমগ্র পাকীস্থানী এলাকাই অত্যন্ত অস্বচ্ছল। বাঙ্গলায় এখন যে ৩৯টি কাপড়ের কল আছে তন্মধ্যে ৩১টি পশ্চিমবঙ্গে। ইহা সত্ত্বেও কাপড়ের অভাব পড়িলে পশ্চিমবাঙ্গালার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজে বোম্বাই আমেদাবাদ হইতে কাপড় আমদানী করা যাইতে পারিবে। পশ্চিম বাঙ্গালায় সমরাস্ত্র উৎপাদন কারখানা যেভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে এই শিল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় রাষ্ট্রের নয় সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইছাপুর ও কাশীপুরের কামান এবং

গোলাবারুদের কারখানা পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকতর নিরাপত্তার বিধান করিবেই। পূর্ব্ববঙ্গে ইনজিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা যখন মাত্র ১৩ টি, তখন পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ ২০৩ টি কারখানা আছে। এছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার টাটা কোম্পানী হইতে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা পাইবে। এক কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের এলাকাভুক্ত হওয়ায় ব্যাঙ্ক, বীমা হইতে ছোট বড় নানা কাজকারবারের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট মৌলিক সুবিধা লাভ করিবে। রেলপথ ও বিমান পথের দিক হইতেও একই কথা বলা চলে। কাঁচড়াপাড়ার রেলওয়ে কারখানাও পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

মোটের উপর, মিঃ জিন্না হইতে শুরু করিয়া লীগের ছোটবড় নানা নেতা যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিভক্ত হইলে পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দুরাও আর্থিক বিপন্ন হইয়া পড়িবে,—একথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি বিলাতের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকাও পাকিস্থানী এলাকাগুলির কৃষিসমৃদ্ধির উপর জোর দিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের অধিবাসীদের সুবিধা অসুবিধা প্রায় সমান সমান হইবে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্প-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যেমন ভাল হইবার সম্ভাবনা, সেই স্বাচ্ছল্যের জন্য এবং কলিকাতা বন্দর হাতে থাকায় বাণিজ্যশুল্ক ও আয়কর খাতে প্রচুর অর্থাগম হইবে বলিয়া এই রাষ্ট্রের রাজস্ব তহবিলও বিশেষ আশাপ্রদ হইবে! অবশ্য ঘটনাচক্রে পশ্চিম বাঙ্গলা সাময়িকভাবে অর্থাভাবগ্রস্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়া তাহাকে বিপদ-মুক্ত করিবেন।

এদিক হইতে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজস্ব তহবিলে উপস্থিত দীর্ঘকাল ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা এবং পাকীস্থানী এলাকাসমূহের প্রায় সবগুলির অবস্থা একইরূপ হইবে বলিয়া পাকীস্থানী কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গত পূর্ব্ববাঙ্গালাকে বিশেষ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবেন না। দীর্ঘকালের জন্য এই তীব্র অনটনের সম্মুখীন হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আক্রাম খাঁ, ফজলুল হক হইতে সুরাবর্দ্দি সাহেব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার লীগের পরস্পর-বিরোধী নেতৃবৃন্দ সকলেই বঙ্গবিভাগের প্রশ্নে সমবেতভাবে বাধা দিতে আগ্রহশীল।

আগেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার হিন্দু কংগ্রেসভাবাপন্ন, উপায় থাকিলে অখণ্ড ভারতে অখণ্ড বাঙ্গালাই তাহাদের একান্ত কাম্য। কিন্তু অবস্থাগতিকে ভারত বিভাগ যদি অনিবার্য্য হয় এবং স্বার্থবাদী লীগ নেতৃবৃন্দের হাত হইতে বহুসমস্যাপীড়িত বাঙ্গালার শাসনদণ্ড সরাইয়া লইবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দুর বিশাল সংস্কৃতি, সংহতি ও ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের বৃহৎ মর্য্যাদা বাঁচাইতে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত না করিয়া উপায় নাই। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, পশ্চিম বাঙ্গলার নবগঠিত প্রদেশের বা সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা বা নিরপত্তার অভাবজনিত কোনপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হইবে না। বরং এইরূপ পশ্চিমবঙ্গে কর্ম্মসংস্থানের এত বেশী সুযোগ থাকিবে যে পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে যে সব শিক্ষা-সংস্কৃতি-অভিমানী ও রুচিমান ব্যক্তি নিজস্ব বাসভূমি জ্ঞানে পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিবেন, এখানে অন্নসংস্থান করা তাঁহাদের পক্ষেও কঠিন হইবে না।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্রের বাটীর বাহিরের দালান। বিক্রম ও অবনী।

বিক্রম। আজ্ঞে না, আর ছুটি পাবার আশা নেই। প্রয়োজনও নেই। আপনারা রইলেন, আমি নিশ্চিন্ত।

অবনী। এখানকার চিন্তা অবশ্য আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। তবে নিশ্চিন্ত আপনি থাকতে পারবেন না। আপনার চেয়ে বড়ো আত্মীয় এদের আর কে আছে।

বিক্রম। যাবার আগে জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না। আজও তো ফিরলেন না।

অবনী। জয়ন্ত—জয়ন্তর ফেরবার কথা আর বলবেন না।

বিক্রম। সে কী? কেন, ফিরবেন না?

অবনী। মানে, ফিরতে দেবে না ওকে। যাক্ সে কথা।

মধুর প্রবেশ

মধু। বাড়ীওলাবাবু এসেছেন।

অবনী। এসেছেন? চল, যাচ্ছি।

মধুর প্রস্থান

আপনাকে বলিনি বোধ হয় এ বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে এদের আমার ওখানেই নিয়ে যাব আজ। অবনীর প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে রাধার প্রবেশ

রাধা। ট্রেণ আপনার কখন বীরুবাবু?

বিক্রম। ঠিক কটায় তা জানিনে, তবে আর বেশি দেরি করবার সময় নেই এটা জানি।

রাধা। দেরি করতে বলছি না আমি। কিন্তু না খেয়ে যাবার মত তাড়া নেই নিশ্চয়।

বিক্রম। না, না, ওসব করবেন না। ওর জন্যে ব্যস্ত হবেন না—

রাধা। ব্যস্ত হই নি। আর যদি হই, একটু তা হলুমই বা। আর তো কখনও এ সুযোগ পাব না। আপনি আমাদের জন্যে এতদিন ব্যস্ত হলেন, আমি না হয় একদিন—

বিক্রম। ও কথা তুলো না রা—মাপ করবেন, মিসেস সেন।

রাধা। মাপ করব কেন? আপনি আমার চেয়ে বড়ো, তুমি বলবারই তো কথা। নাম ধরেই তো ডাকবেন। এবার থেকে ঐ সম্বোধন রইল। আমি আপনার ছোট বোন বইতো নয়।

বিক্রম নিরুত্তর

রাধা। কিন্তু জেঠামশাই আজও এলেন না, কী হবে?

বিক্রম। শেখরবাবু? নিশ্চয় আসবেন। আপনার বাবার চিঠি পেয়ে কি না এসে থাকতে পারেন?

রাধা। তার বড়ো সাধ ছিল বাবাকে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যান তাঁর কাশীর বাড়ীতে। কতবার বলেছেন। বাবারও এত ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে গিয়ে শান্তিতে কাটাবেন কটা দিন।

বিক্রম। অবনীবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা আছে, শেষ করে নি এইবেলা।

বিক্রমের প্রস্থান। রাধা অন্যমনস্কভাবে বিক্রমের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিছন হইতে প্রবেশ করিল সুমিত্রা ও তৎপশ্চাতে অনুরাধা।

সুমিত্রা। একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন মা? কী ভাবছ?

রাধা। জেঠামশাই এখনও এলেন না, কী জানি তিনি যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন—তাই ভাবছি।

সুমিত্রা। তাতে ভাবনার কী আছে মা? নাই বা এলেন তোমার জেঠামশাই। আমি তো রয়েছি, আর নিয়ে যাচ্ছি যেখানে সেটা কি তোমাদের বাড়ী নয়?

রাধা। সেই তো ভাবনা মাসীমা? আমি হতভাগী যে ডাল আশ্রয় করি সেই ডালই কাটা পড়ে। এমনই কপালের ধার। আবার আপনার বাড়ী গিয়ে কী বিপদ টেনে আনব কে জানে।

সুমিত্রা। ছি রাধা! মায়ের সামনে অমন কথা মুখে আনতে নেই। তোমার দ্বারা কখনও কারও ক্ষতি হতে পারে না। আসুন তোমার জেঠামশাই, দুদিন বিশ্রাম করুন আমাদের বাড়ীতে। তারপর ঘরে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করে রেখে (এই কথা বলিতে বলিতে একহাতে অনুরাধাকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিল) খোকার আর আমার লক্ষ্মীমার হাতে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিয়ে মায়ে-ঝিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

অবনীর প্রবেশ

অবনী। বাড়ীওলার সরকার এসেছিলেন। ভাড়াপত্তর চুকিয়ে দিলুম। আর বলে দিলুম বিকেলে দারওয়ানকে পাঠিয়ে দিতে বাড়ীটা চাবি দিয়ে যাবে।

রাধা। (সসঙ্কোচে) জয়ন্তবাবুর কোনও খবর এলো না মেসোমশাই?

অবনী। খবর? হাঁ, না, জয়ন্তর কাছ থেকে কোনও খবর আসে নি।

অনুরাধা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা। তুমি বল না। খোকার কাছ থেকে না আসুক, কী খবর এসেছে বল। আমার শোনবার সাহস আছে।

অবনী। তাতে আমি সন্দেহ করি নি। সাহস আমারও আছে বলবার। এই যে ক'টা দিন তোমার খোকা বাড়ী ছাড়া, এই ক'দিনে আমার দর কতখানি বেড়ে গেছে জানো? গবর্ণমেণ্টের সবগুলো চোখ আমার সদর দোরে ধরণা দিয়ে পড়ে আছে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ।

রাধা। পুলিশ? কেন, পুলিশ কেন?

সুমিত্রা। তাই আমার মন অমন ছটফট করতো। খোকা পুলিশের ভয়ে নিরুদ্দেশ হল?

অবনী। সেই জয়ন্ত বোসের বাপ আমি। কত বড় গর্বের কথা বল তো? জয়ন্ত বোসের বাপ!

(সুমিত্রা নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে, সেই মূর্তির পানে চাহিয়া)

জয় ফিরে আসবে গো, আসবে। তবে দেরি হবে। কতদিন তা জানি না, দেরি হবে। ভয় নেই।

সুমিত্রা। ভয় কী? ফিরে আসবে খোকা, সে কি তুমি আমাকে বলে দেবে তবে জানব? আর তুমি যা মনে করছ তা হবে না, দেরি হবে না। শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে খোকা, দেখো।

বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

রাধা। আপনি সব কথা ওঁকে বলেন কেন মেসোমশাই? যদি সত্যিই ধরা পড়েন জয়ন্তবাবু? সে কি মাসীমা সহ্য করতে পারবেন? এত কথা ওঁকে না বললেই হোতো।

অবনী। তুমি তো ওঁকে চেনো না মা। সত্যি খবর সহ্য করতে বরং পারবে, কিন্তু সহ্য করতে পারবে না মিথ্যে। মিথ্যে দিয়ে ওকে ভোলানো অসম্ভব। রাধার প্রস্থান

সুমিত্রা পুনঃ প্রবেশ করিল

সুমিত্রা। দেখ, মনে কোরো না আমি অহঙ্কার করে বল্লুম। আমার নিজের জোরে এ অহঙ্কার নয়। আমার জয়ন্তর জন্যে যে উমার মতো তপস্যা করছে ঐ মেয়েটা। তোমরা জানো না, আমি তো জানি। ঘুরছে ফিরছে, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে মাথা ঠুকছে। মা মা করে আমার পায়ে পায়ে ফেরে, আমার কাছটিতে শোয়। ঘুমোয় না সারারাত। থাকে থাকে বিছানার ওপর উঠে বসে হাত জোড় করে। দেখি আর সাহস বাড়ে আমার।

অবনী। কিন্তু ও প্রণাম প্রার্থনা কেন কার জন্যে, তা জানলে কী করে?

সুমিত্রা। জানা যায়। আমি যে খোকার মা, আমার খোকার জন্যে কার প্রাণ কাঁদছে তা পাশে থেকেও আমি বুঝতে পারবো না?

বিক্রমের প্রবেশ।

বিক্রম। একটা কথা বলবার ছিল। আপনার যখন সময় হবে—

অবনী। সময় তো আমার এখনও কিছু কম নেই বীরুবাবু। আপনি বসুন।

সুমিত্রা প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া বিক্রম বলিল—

বিক্রম। তা বলে এমন কোনও কথা নয় মা, যা আপনার সামনে বলা যায় না।

সুমিত্রা। তার জন্যে নয় বাবা, আমি খাবার আয়োজন করি গে।

প্রস্থান

বিক্রম। দেখুন মিসেস সেনকে বলি নি, মানে বলতে পারি নি, অভিলাষের কিছু টাকা আমার কাছে পড়ে রয়েছে, টাকাটা আপনার হাতে দিয়ে যাব। আপনি সময় মতো দিয়ে দেবেন।

অবনী। তা বেশ। কিন্তু আপনি রাধাকেই দিয়ে যান না।

বিক্রম। না, না। সে উনি নিতে চাইবেন না।

অবনী। কেন? নিতে চাইবে না কেন? আপত্তি কিসের?

বিক্রম। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) সে উনি, মানে সেন্টিমেন্টাল আপত্তি আর কি। অর্থাৎ টাকাটা—অভিলাষের লাইফ্ ইন্সিওরের টাকা, স্ত্রীর বিশেষ অমত সত্ত্বেও সে পালিসি নিয়েছিল।

অবনী। ও। তা বটে। স্বামীর জীবন বিনিময়ের টাকা।

বিক্রম। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে শেখরনাথ প্রবেশ করিল। তাহার দক্ষিণ হাতের লাঠি স্কন্ধের উপর রহিয়া প্রান্তভাগে একটি পুলিন্দা রক্ষা করিতেছে। বাম হাতে খাবারের ঝুড়ি একটি। আজানু-ধূলি-ধূসর দুইটি পা।

শেখর। কই হে মাহিন্দর, কোথায় গেলে? এখনও ঘুমুচ্ছ নাকি?

বিক্রমের প্রবেশ।

বিক্রম। (সাগ্রহে) এই যে আপনি এসেছেন! (নমস্কার করিল)

শেখর। এসেছি তো বটেই। কিন্তু নমস্কার ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই, হাত জোড়া।

বিক্রম। এত দেরি হল—চিঠি পেয়েছিলেন তো?

শেখর। চিঠি পেয়েছি বই কি। কিন্তু দশ দিন পরে। ছিলুম না কাশীতে কিনা। তাইতেই তো এত দেরি হল। সে যাক, আমার মায়েরা গেলেন কোথা? ক্ষিদের পেটের নাড়ী হজম হয়ে যাবার যোগাড় যে।

বিক্রম। আপনি বসুন। আমি অনুরাধাকে বলে আসি আপনার খাবারের জন্যে।

শেখর! শুধু খাবারে তো আমার—

বিক্রম। সে জানি। আপনার খোরাকও আনতে বলছি।

শেখর। না, সে কথা নয়। তবে বলি শোনো। সেবারে পালিয়ে গিয়ে অবধি মনটা অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। শেষে মহিন্দরের চিঠি পেলুম, ভাল আছে, আমার সঙ্গে কাশী আসতে চায়। তবে নিশ্চিন্ত হই। তা ভাবলুম, কাশীর বরফি খানিকটা নিয়ে যাই। একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে'খন। মহিন্দরটা ঘুমুচ্ছে বোধহয়? ততক্ষণ বরং এক কল্কে—

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে অনুরাধার ও পিছনে গড়গড়া ও গাড়ু গামছা লইয়া মধুর প্রবেশ।

এই দেখ! ভাগ্যবানের বোঝা শুধু ভগবান নয়, ভগবতীরাও বয়ে থাকেন। এসো মা এসো।

মধু গাড়ু ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। অনুরাধা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে নতমস্তকে চোখ মুছিতেছে দেখিয়া শেখর বলিল—

শেখর। আঃ, কেন তোরা কলকেয় ফুঁ দিতে যাস্ বল তো? ওসব কী তোদের কাজ? চোখে কয়লা পড়েছে তো?

অনুরাধা। নীরবে মাথা নাড়িল।

শেখর। না তো কী। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তবু স্বীকার করবে না। বুড়ো বলে ঠকাতে চাস ছোটমা, এখনও অত বুড়ো হই নি। (হাসিতে লাগিল)

অনুরাধা। হাত পা ধুয়ে নিন, জেঠামশাই। ওঃ, কী ধুলো লাগিয়েছেন পায়ে।

শেখর। তা রাস্তায় যা ধুলো তোদের।

বিক্রম। আপনি কি হেঁটে এসেছেন নাকি?

শেখর। হুঁ।

অনুরাধা। হাওড়া থেকে হেঁটে এসেছেন জেঠামশাই? একটা গাড়ী নিলেও তো হতো।

শেখর। নিয়েছিলুম একটা রিকশা। এক টাকা ভাড়া নিলে। তাতেই পুঁটলিটা ঝুড়িটা চাপিয়ে দিলুম। নইলে বোঝা ঘাড়ে করে আর কি চলতে পারি এ বয়েসে।

অনুরাধা ও বিক্রম মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল শেখরের মুখের পানে।

শেখর। হ্যাঁরে, বড় মা খুব রাগ করেছে, না? সেবারে না খেয়ে পালিয়েছিলুম বলে এবারে খেতেও দেবে না, দেখাও দেবে না বুঝি?

অনুরাধা। আপনি আগে কিছু না খেলে দিদি আসবে না বলেছে।

বিক্রম। তুমি এইখানেই কিছু খাবার এনে দাও অনু।

শেখর। না, খাবার আর আনতে হবে না। দুখানা রেকাব নিয়ে আয় ছোট মা। আর ডাক সেই ছোকরাকে। দুটো ছেলে বসে বসে খাই আর দুটো মায়ে পরিবেশন কর। তিনটে রেকাব আনিস, তুমিও বসে যাও বাবা।

অশ্রু গোপন করিতে অনুরাধা প্রস্থান করিল। শেখর খাবারের পুঁটুলির বাঁধন খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে পাইল না, ধীর নিঃশব্দ পদে রাধা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বিক্রম সরিয়া গেল।

শেখর। (গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে) কই হে, উঠেছ?

রাধা। ও সব রাখুন জেঠামশাই, বাবা নেই।

শেখর। (মুখ তুলিবার পূর্ব্বেই) নেই? কোথা গেছে?

(বলিতে বলিতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল। চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া শেখর দেখিল বিধবা বেশধারিণী রাধাকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শেখর ভাষা খুঁজিয়া পাইল) এই রূপ দেখাবার জন্যে আসতে চিঠি লিখেছিলি মা? আর এই কথা শোনাবার জন্যে?

রাধা। যখন চিঠি লিখেছিলুম তখন ভাল ছিলেন—(আর সে বলিতে পারিল না)

শেখর। হঠাৎ পালিয়ে গেল? লিখলে তুমি এস, একসঙ্গে যাব। সব মিথ্যে কথা। পালিয়ে গেল আগেই।

রাধা। ভেতরে আসুন জেঠামশাই। হাত পা ধুয়ে—

শেখর। না মা, আর নয়। আর আমাকে বলিসনি—

একপাশে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা সুমিত্রার প্রবেশ, সঙ্গে অনুরাধা

সুমিত্রা। রাধা, তোমার জেঠামশাইকে আমার প্রণাম দিয়ে বল ভেতরে না এলে তো চলবে না, বাড়ীর অপরাধ কী?

শেখর বিস্মিত ও নীরব।

সুমিত্রা। রাধু, আমাকে তোমার জেঠামশাই চিনতে পারছেন না। বল, আমি অনুরাধার মা। এখন এ আমার সংসার। যদি বাড়ীর ওপর অভিমান করে এখানে স্নানাহার না করেন তা হলে আমাকেও উপবাসী থাকতে হবে।

শেখর উঠিল।

শেখর। চল মা।

সুমিত্রা, অনুরাধা ও শেখর ভিতরে গেল। রাধাও যাইতেছিল, এমন সময় বিক্রমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইল।

রাধা। বীরুবাবু, যাবার দিনে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যেতে চান? না, চুপ করে থাকলে চলবে না। চলুন, ঝগড়া করতে চান?

বিক্রম। না। .

রাধা। নিশ্চয় চান। আর আপনি না চাইলেও আমি চাই। এ কী কাণ্ড আপনার বলুন তো? উনি কখখনো ইন্সিওর করেন নি। আপনি মিথ্যে কথা বলে আমার জন্য মেসো মশাইয়ের কাছে অতগুলো টাকা দিয়েছেন, কেন?

বিক্রম। বাঃ, করে নি কী রকম? আমি সাক্ষী ছিলুম কাগজ পত্তরে। আপনি কী করে জানবেন? এসব খবর কি আপনাকে বলতে গেছে?

রাধা। করলে নিশ্চয়ই বলতেন। আর তাছাড়া আমার পাওনা টাকা যদি হয়, আমার সই ছাড়া টাকা দিলে কী করে?

বিক্রম। সে কোম্পানীর ডাইরেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু। ও রকম হয়। আপনি বুঝবেন না।

রাধা। আমিই বুঝেছি। আর মিথ্যা কথা বলে আমার পাপের বোঝা বাড়াবেন না বীরুবাবু। আমি জানি তাঁর ইন্সিওর ছিল না। ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, ও আমি নিতে পারবো না।

বিক্রম। না নিতে পারেন, রাস্তায় ফেলে দিন, ভিখিরি কাঙ্গাল ডেকে দিয়ে দিন, আমি নেব কেন?

রাধা। নেবেন, কারণ আপনার টাকা।

বিক্রম। আমার টাকা? পাগল হয়েছেন আপনি? অত টাকা আমি পাব কোথায়? বিশ্বাস করুন, ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখুন, সাঁইত্রিশ টাকা ক আনা পড়ে আছে আজ কত দিন। তার ক্ষয়ও নেই, বৃদ্ধিও নেই। অত টাকা আমার আসবে কোত্থেকে?

রাধা। সে আপনিই জানেন। এই সেদিন দেশে গিয়েছিলেন। হয়তো আপনার ভিটের অংশটুকুও বেচে এসেছেন। আপনার অসাধ্য কিছু নেই।

বিক্রম। না, না—

(তাহার প্রতিবাদের সুর ফুটিল না, ভাষাও খুঁজিয়া পাইল না।)

রাধা। নিশ্চয় তাই করেছেন। বলুন, সত্যি কি না?

বিক্রম। আপনার চোখে এক্সরে আছে। মানুষের বুকের ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পান।

রাধা। সকলের পাব কেমন করে। যারা বুকের কপাট খুলে দেয় তাদেরই বুকের ভেতর দেখতে পাই। কিন্তু কেন একাজ করতে গেলেন আপনি? আমার তো কিছু প্রয়োজন নেই। জেঠামশাইয়ের আশ্রমে থাকব। কিসের অভাব আমার? দেখছেন তো, বাবার চেয়ে উনি আমাকে কম ভালবাসেন না। তবে কেন?

বিক্রম। ওঁর বয়েস হয়েছে।

রাধা। সে অবস্থা যদি আসে, তখন আপনার কাছে চাইব। ততদিন—

বিক্রম। ততদিন আপনার কাছেই থাক না। (রাধা নিরুত্তর) না, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। অভিলাষ থাকলে আমার টাকা তার কাছে রাখতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করত না? কিন্তু সে তো নেই। আপনার মনে যদি গ্লানি বোধ হয়, তবে দরকার নেই রেখে। ফেরৎ দেবেন আমাকে।

রাধা। (একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, ফেরৎ দেব না। ও টাকা আমি নিলুম।

বিক্রম। এ দয়া আমি ভুলব না কোনদিন।

রাধা। দয়া বলবেন না। আমি আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নিলুম।

বিক্রম। আমি চলি।

রাধা। সে কী? এখনই চল্লেন? অনুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

বিক্রম। না, ও বিদায়-টিদায় নেওয়া আমার আসে না। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। আর বলবেন, তার বিয়ের সময় আমি নিশ্চয় আসব।

রাধা। একটু দাঁড়ান।

বলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইল

বিক্রম। (ত্রস্ত হইয়া পিছাইয়া) না, না, ও করবেন না—

রাধা। কেন করব না? আপনি আমার দাদা হন। দাদাকে প্রণাম—

বিক্রম। আগে দাদা হই, তার পরে প্রণামের যোগ্য হব।

বলিতে বলিতে যেন ছুটিয়া পলাইল। রাধা তাহার পলায়ন গ্রাহ্য করিল না, শূন্য ভূমিতলে উদ্দিষ্ট প্রণাম সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। দিদি, জেঠামশাই প্রস্তুত হয়ে নিতে বল্লেন। এই দুপুরের গাড়ীতেই উনি চলে যাবেন। আমি এত বল্লুম, এত কষ্ট করে রাত জেগে এসেছেন, একটা দিন বিশ্রাম করুন।

রাধা। মাসীমা কী বলছেন?

অনুরাধা। মাসীমাও—

রাধা। মাসীমা আমার, তোর নয়। তোকে যা বলে ডাকতে বলেছেন তাই বলবি।

অনুরাধা। উনিও অনেক করে বললেন, জেঠামশাই শুনবেন না।

রাধা। বলা বৃথা। বাবা পালিয়ে গেছেন, সেই অভিমানে উনি এবাড়ীতে একটা বেলা টিকতে পারছেন না। চ, প্রস্তুত তো আমরা হয়েই আছি।

অনুরাধা। দিদি।

রাধা। কী?

অনুরাধা কথা কহিল না। লজ্জানত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধা। (সস্নেহে) কী বলবি বল? কী হয়েছে অনু?

অনুরাধা। দিদি, আমাকে তোমরা রেখে যাও এখানে।

রাধা। (সবিস্ময়ে) এখানে? এখানে কোথা থাকবি?

অনুরাধা। এ বাড়ীতে নয়।

রাধা। মাসীমার কাছে? এখন কেন ভাই? ওই তো তোর বাড়ী। কিন্তু জয়ন্ত ফিরে আসুক—

অনুরাধা। (নতমুখে) আমি এখানে থাকলে যদি শীগ্‌গির ফেরেন। আমার ওপর রাগ করেই ওপথে পা দিয়েছেন। তোমরা জানো না, আমিও তখন বুঝি নি—

রাধা। আর বলতে হবে না বোন। আচ্ছা জেঠামশাইকে বলি।

অনুরাধা। সকলে চলে গেলে মা বড় একলা হবেন দিদি।

রাধা। বুঝতে পেরেছি ভাই। তাই হবে।

অনুরাধা। বীরুদা কোথায় গেলেন দিদি?

রাধা। চলে গেছেন। না, চলে যান নি, পালিয়ে গেছেন।

অনুরাধা। পালিয়ে গেছেন? কেন?

রাধা। আমার পেন্নামের ভয়ে।

অনুরাধা। একটা কথা বলব দিদি? বীরুদা তোমাকে ভালবাসেন। তুমি দেখ নি ওঁর চোখ—

রাধা। (বাধা দিয়া) না, না, ও আমি দেখি নি। দেখতে নেই। ওকথা মুখে আনতে নেই। তুই থাম্।

রাধার দ্রুত প্রস্থান। অনুরাধা দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণপরে নেপথ্যে কণ্ঠ শুনিয়া অনুরাধা ভিতরে চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল অবনী ও মজুমদার।

অবনী। ইম্‌পসিব্‌ল্। কেন তুমি একাজ করতে গেলে? এ আমি হতে দেব না, আমি আসল কথা প্রকাশ করে দেব।

মজুমদার। ইউ উইল্ ডু নাথিং অফ্ দি সর্ট। এ তোমার প্রভিন্স্ নয় অবনী, এখানে তুমি মাথা গলিও না বলে দিচ্ছি।

অবনী। কিন্তু এ আমি চুপ করে এলাউ করব কেমন করে? আমার ছেলের মুক্তির জন্যে তুমি জেলে যাবে, মিথ্যে করে, বিনা দোষে—

মজুমদার। ডোন্ট্ বি সো সেলফিস্ অবনী। স্বার্থে অন্ধ না হলে দেখতে পেতে যে এ আমি তোমার ছেলের জন্যে করছি না। করছি আমার ছেলের জন্যে, আমার মেয়ের জন্যে। আর সত্যি মিথ্যের প্রভেদ, দোষী নির্দোষের বিচার করতে লজ্জা করে না? ওসব সুপারস্টিশন তোমার শিকেয় তুলে রাখো। এই মরা শুকনো বুড়োটা ফটকের এপারে বসে বসে দিন গুণবে, আর ঐ জ্যান্ত তাজা ছেলেটা ফটকের ওপারে দিন দিন শুকিয়ে নিবে আসবে—সেইটেই কি সত্যি কাজ হবে? ও কুসংস্কার আমার নেই।

অবনী। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবেই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

মজুমদার। সে ব্যবস্থা আমার। ওদের আসামী পেলেই হ'ল। বামাল পেলেই হ'ল। তাহলেই জয়ন্তের ওপর ওয়ারেন্ট্ নাকচ হবে। বামালসমেত সে আসামীকে আজ ওরা পেয়ে গেছে। আমার রেকর্ড আমাকে সাহায্য করেছে। আরে বুঝছ না, ওদের একটা আসামী নিয়ে কথা। আমারও ও পার্ট করা আছে, ষ্টেজে বেমানান হব না। (হাস্য)

অবনী নীরবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

মজুমদার সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল—

মজুমদার। তুমি ভেবে দেখ অবনী, একজন তোমার ছেলে, আর একজন তার মেয়ে। এরা আমারই ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া আর কী উপায় আছে বলতে পার? আই কাণ্ট এলাউ হিস্‌টরী টু রিপিট্ ইট্ সেল্ফ,—দি ক্রুয়েল হিসটরী অফ্ থারটি ইয়ারস্ এগো। সেই দুর্ঘটনা আবার আমার ছেলেমেয়ের জীবনে ঘটবে, আমি বাধা দেব না?

অবনী তথাপি নীরব

মজুমদার। নাঃ, এই সব সেন্টিমেণ্টাল ফুলদের নিয়ে আর পারা গেল না। হ্যাঁ, ভাল কথা। (হাত হইতে আংটি খুলিয়া) এটা ধর তো। নাও ধর। (অবনী আংটি লইল। মজুমদার পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া পাতা উলটাইতে উলটাইতে বলিল) তোমার

কাছে আমার দেনা—দেনা হল—(পাতা উলটাইতেছে এবং আঙ্গুলে গণিয়া হিসাব করিতেছে) দূর কর ছাই। ঠিকে ভুল হয়ে যায় কেবল। ও অনেক আছে। তুমি এইটে বেচে শোধ করে নিও।

অবনী। এই নীলা—

মজুমদার। (মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল) আঃ, থাম। (হাত তুলিয়া থামাইয়া দিল)

অবনী। না, তোমার আংটি আমি বেচতে পারবো না। কিছুতেই না। য়্যাব্‌সার্ড।

মজুমদার। পারবে না? কিন্তু আর তো কিছু নেই এখন। তাহলে তোমার দেনা—ব্যই জোভ্‌! হাউ ষ্টুপিড্‌ অফ্‌ মি! বেচতে হবে না তোমাকে। ওটা আমার ছেলেবউকে দিও। আমার মেয়ে জামাইকে দিও। আর তোমার দেনা? ও আমি শোধবার চেষ্টা করব না? আমি ঋণী থেকেই মরব।

অবনী। ইউ আর গ্রেট, মজুমদার!

মজুমদার। (দুই হাত দিয়া অবনীর দুই হাত ধরিয়া) য়্যাণ্ড্‌ ইউ আর এ সিলি ওলড্‌ গুজ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ—(চক্ষে জল ঝরিয়া পড়িল, তথাপি হাসিতে লাগিল)

যবনিকা

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

মস্কো সম্মেলনে ব্যর্থতা

মস্কো-সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিণ-রুশ-ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই; সুদীর্ঘ দেড় মাসব্যাপী আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে পোট্‌স্‌ড্যাম্‌ সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, জার্ম্মানীর সমর-শিল্প কমাইয়া দিয়া তাহার আক্রমণ-শক্তি নষ্ট করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীতে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনে উৎসাহ দিয়া তাহাকে আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করা হইবে। নাৎসী দলের আক্রমণমূলক নীতি সমর্থন করিয়া জার্ম্মান জাতি জগতের যে ক্ষতি করিয়াছে, সেজন্য তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে জার্ম্মানী সাধ্যানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিবে। পোট্‌সড্যামে নির্দ্ধারিত এই মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই মস্কোয় পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন।

মস্কোয় জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মার্কিণ প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন—এই আক্রমণমুখী দেশটিকে আর অখণ্ড রাখা হইবে না; ইহাকে বহু বিভাগে বিভক্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বিভিন্ন স্বতন্ত্র অংশের (ষ্টেটের) প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ষ্টেট্‌ পরিষদ, জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পাইবে; পক্ষান্তরে, স্বতন্ত্র ষ্টেটগুলির সর্ব্বাধিক ক্ষমতা থাকিবে।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসরে বৃটেন এখন সর্ব্ব ব্যাপারে আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থক। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ বেভিন চোখ বুজিয়া মিঃ মার্শালের কথায় সায় দিয়াছিলেন।

সোভিয়েট প্রতিনিধি অখণ্ড জার্ম্মানী ভাঙ্গিয়া দিবার বিরোধিতা করেন; তাঁহার যুক্তি—জার্ম্মানীকে হিট্‌লারবাদের প্রভাবমুক্ত করাই মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য; জার্ম্মাণ জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মঃ মলোটভ্‌ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ৮টি সর্ত্ত সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রধান কথা—জার্ম্মানী অখণ্ড, শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে; সমগ্র জার্ম্মানীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত দুইটি পরিষদ হইবে জার্ম্মানীর পার্লামেণ্ট। এই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন এবং গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। জার্ম্মানীর বিভিন্ন ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হইবে। জার্ম্মানীর পার্লামেণ্ট সমগ্র জার্ম্মানীর জন্য এবং প্রদেশগুলি তাহাদের নিজেদের জন্য গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করিবে।

জার্ম্মানীর জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও হইয়াছিল। এই পরিষদ ক্রমে জার্ম্মানীর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইবার কথা। সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, কেবল বিভিন্ন ষ্টেটের ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধি লইয়াই নহে—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, ট্রেড্‌ ইউনিয়নের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া এই পরামর্শ পরিষদ গঠিত হইবে।

মিঃ মার্শাল ও বেভিন্‌ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধির মূল প্রস্তাব এবং সাময়িক ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব, দুইয়েরই প্রবল বিরোধিতা করেন।

জার্ম্মানীকে খণ্ডিত করিবার পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধির যুক্তি—ইহাতে জার্ম্মানীর সমর-শক্তি নষ্ট হইবে; সে আর জগতের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না। ইহার বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রতিনিধির যুক্তি—একমাত্র বহু জাতি অধ্যুষিত রাজ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থা প্রযোজ্য। জার্ম্মানীতে বহু জাতি নাই—জার্ম্মানরা একটি অবিভাজ্য রাজনৈতিক জাতি; এই জাতিকে খণ্ডিত করা অন্যায়। মঃ মলোটভ্ বলেন যে, এই অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে জার্ম্মানীতে পুনরায় একনায়কের উদ্ভব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে; "ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মানী চাই"—এই সঙ্গত দাবী তুলিলে নূতন "হিট্‌লার" অনায়াসে অসন্তুষ্ট জার্ম্মান জাতির সমর্থন পাইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ভার্সাইয়ের অন্যায়ই ছিল হিট্‌লারের রাজনৈতিক শক্তির নৈতিক উৎস। জার্ম্মান রাজ্য খণ্ডিত করিলে প্রকৃতপক্ষে আর এক "ভার্সাই"-ই সৃষ্টি হইবে। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্ম্মানীকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। এবার মলোটভ্ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, কতকটা এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াই তখন বৃটেন ও আমেরিকা ফরাসী প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল।

প্রকৃত কথা এই—প্রথম মহাযুদ্ধের পর রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে। পূর্ব্ব দিক হইতে বলশেভিক প্লাবনের পশ্চিমমুখী গতি রোধ করিবার জন্য তখন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জার্ম্মানীর প্রয়োজন ছিল। আর, এবার সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে ইতিমধ্যে জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে; সেখানে জনগণের হাতে সকল ক্ষমতা গিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রভাব হইতে জার্ম্মানীর অবশিষ্টাংশকে এখন বাঁচান প্রয়োজন। বৃটিশ ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম অঞ্চলে হিটলারী আমলের জমিদার শ্রেণী, ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিদিগকে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। এই অঞ্চলে ইউরোপের প্রগতি-বিরোধী ঘাঁটী সযত্নে রচিত হইতেছে; ইহাকে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর ছোঁয়াচ হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে বাঁচাইবার আগ্রহ স্বাভাবিক।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য চায় না। কিন্তু জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্যের জন্য তাহারা কুম্ভীরাশ্রু পাত করিয়া থাকে। অথচ গত ডিসেম্বর মাসে তাহারা পূর্ব্ব জার্ম্মানীকে বাদ দিয়া বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম জার্ম্মানীকে অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ একচেটিয়া ব্যবসায়ীদিগকে জার্ম্মানীর অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দিবার জন্য এবং জার্ম্মান অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হয়। মঃ মলোটভ্ দাবী করিয়াছিলেন—সমগ্র জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক মিলন ঘটাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলের মিলন বাতিল করিতে হইবে। বলা বাহুল্য—মিঃ বেভিন্ ও মিঃ মার্সাল তাহাতে সম্মত হন নাই।

বৃটিশ ও মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জার্ম্মানীর জন্য দরদে বিগলিত হইয়া বলিয়াছেন যে, রুশিয়া অসঙ্গতভাবে জার্ম্মানীর চল্‌তি উৎপাদন হইতে ক্ষতি পূরণ লইতেছে; এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিবার শক্তি তাহার নাই। রুশিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তাহারা প্রশ্ন করেন নাই। রুশিয়ার ১২ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ক্ষতির জন্য জার্ম্মানী দায়ী। রুশিয়া মাত্র ১ হাজার কোটী ডলার অর্থাৎ তাঁহার ক্ষতির শতকরা মাত্র ১০ ভাগের জন্য ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছে। এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি চলে না; তাই বেভিন্-মার্সাল বাঁকা পথ ধরিয়াছেন।

এই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকা মোটেই অনাসক্ত নহে। বিদেশে অবস্থিত জার্ম্মানীর বিপুল সম্পত্তি তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জার্ম্মানীর ৩ শত ৩০ কোটী ডলারের সম্পত্তি তাহাদের কুক্ষীগত হইয়াছে। জার্ম্মানীর ২ শত ২০ কোটী ডলার মূল্যের মালবাহী জাহাজ এখন ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির হাতে। জার্ম্মানীর পেটেণ্ট, বিভিন্ন আবিষ্কার বাবদ এবং স্বর্ণের মূল্য বাবদ ৫ শত কোটী ডলার ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি পাইয়াছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ জাতির এই দরদীরা তাহাদের ১ হাজার ৫ শত কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। যুদ্ধে ইহাদের ক্ষতি সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি অপেক্ষা অনেক কম; অথচ ক্ষতিপূরণ বাবদ রুশিয়ার মোট দাবী অপেক্ষা ৫ শত কোটী ডলার বেশী ইহারা লইয়াছে।

জার্ম্মানীর চলতি উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে আপত্তির প্রধান কারণ—এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে জার্ম্মানীর সমর-শিল্প নষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার, শ্রমশিল্পক্ষেত্র হইতে ধনিকদের প্রভাব ও ধনিকদের জোঁটের (Cartel) উচ্ছেদ আবশ্যক। সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে এই সব ব্যবস্থা সম্পাদিত হওয়ায় এখন সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা ৭০ ভাগ পণ্য উৎপন্ন হইতেছে। মিঃ মলোটভ্ বলেন যে, সমগ্র জার্ম্মানীতে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে এবং রপ্তানী-বাণিজ্যে উৎসাহ দিলে জার্ম্মানী অনায়াসে চল্‌তি উৎপাদন হইতে ক্ষতি পূরণ দিতে সমর্থ হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলে অধিকাংশ সমরশিল্প অটুট রহিয়াছে, ধনিকদের জোঁট ভাঙ্গা হয় নাই, রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না। কাজেই, সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ উৎপন্ন হইতেছে।

রুঢ়ের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও মস্কোয় মতভেদ ঘটে। রুশিয়া রুঢ়ে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাহিয়াছিল। বৃটেন্ ও আমেরিকার তাহাতে আপত্তি। এই অঞ্চলে জার্ম্মানীর লৌহ, ইস্পাত ও কয়লা শিল্পের দুই-তৃতীয়াংশ অবস্থিত। এই অঞ্চলে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা না হইলে সমগ্র জার্ম্মানীর অর্থনীতিকে সংহত করা অসম্ভব।

চীনের সঙ্গীণ অবস্থা

গত ২৫শে মে চীনের ডিমোক্রেটিক লীগের মুখপাত্র ডাঃ লো মন্তব্য করিয়াছেন, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি অবিলম্বে চীনকে আরও সাহায্য না করে, তাহা হইলে চিয়াং-কাই-সেকের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটিবে।" তিনি বলেন যে, আমেরিকা যদি আরও সমরোপকরণ সরবরাহ না করে, চীনের সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কাজ চালাইয়া না যায় এবং আরও অন্যভাবে সাহায্য না করে, তাহা হইলে আমেরিকার পক্ষে পতনোন্মুখ চৈনিক গভর্ণমেণ্টকে টিকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না।

কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী য়েনান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর ফাঁকা মাঠে সৈন্য পরিচালনা করিয়া চিয়াং-কাই-সেকের সেনাপতিরা

কম্যুনিষ্টদের রাজধানী অধিকার করিয়াছেন বলিয়া বড় বেশী আস্ফালন করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কম্যুনিষ্ট বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া উত্তর চীনে সান্‌সি হইতে স্যাণ্টাং পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে পর পর অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চিয়ান্‌-চুন্‌ এখন বিপন্ন। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর চাপে অতিষ্ঠ হইয়া মার্কিণ নৌ-সেনা-দল উত্তর চীনের চিন্‌ওয়াংটাও ত্যাগ করিয়াছে।

সামরিক অবস্থা যখন এইভাবে সরকার পক্ষের অত্যন্ত প্রতিকূল, সেই সময় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থারও দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে। গত ৪ মাসে সাংহাইর রাস্তা হইতে ৮ হাজার নিরাশ্রয় শিশুর মৃতদেহ কুড়াইয়া লওয়া হইয়াছে ; কেবল এপ্রিল মাসেই পাওয়া গিয়াছিল ৩ হাজার শিশুর মৃতদেহ। দুর্ভিক্ষ এত ব্যাপক যে, অনেক জায়গায় অনসনক্লিষ্ট জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া খাদ্য শস্যের দোকান লুণ্ঠন করিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ। আমেরিকা আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে চীনকে সাহায্য করিয়াছে ৪ শত কোটী ডলার। ইহাতে চীনের অর্থ-নৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। মার্কিণ সাহায্যের একটা মোটা অংশ মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও চীনের দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের পকেটে।

চিয়াং-কাই-সেক গভর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা, দুর্নীতিপরায়ণতা এবং নিরর্থক গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত ১৫ই মে সর্ব্বপ্রথম সাংহাইয়ে ৫ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ; তাহারা ধ্বনি তোলে—"গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ কর।" ক্রমে নান্‌কিং-এ এবং পিপিংএ ছাত্র আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া, কম্যুনিষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ছাত্রদিগকে শান্ত করা সম্ভব হয় নাই। গত ২০শে মে নান্‌কিংএ ৬ হাজার ছাত্রের এক শোভাযাত্রার সহিত সশস্ত্র পুলিস দলের সংঘর্ষ ঘটে। তাহার পর হইতে ছাত্র-আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার, খাদ্যাভাব এবং গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আগামী ২রা জুন চীনের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ সংবাদ (২৬শে মে)—চীনের পিপ্‌ল্‌স্‌ পলিটিক্যাল্‌ কাউন্সিলের ১ শত সদস্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তির আলোচনা চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্ট সদস্যদিগকে অনুরোধ জানান হইবে। এই কাউন্সিলের ২৫০ শত সদস্যের মধ্যে ৭জন কম্যুনিষ্ট ; তাঁহারা গত ২ বৎসর এই কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দান করেন নাই।

মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্‌ আজ অসুবিধায় পড়িয়া সময় লাভের জন্য যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করিতেছেন কিনা বলা যায় না। সামরিক অবস্থা প্রতিকূল হইয়া উঠিলে তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তির কপট ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তবে, এ কথা সত্য, তিনি যদি কম্যুনিষ্ট-দিগকে সামরিক বলে দমন করিবার দুরাশা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চীনা জাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনাই বাড়িবে ; তাঁহার নিশ্চিত পতন তাহাতে বন্ধ হইবে না।

জাতি-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ

নিউ ইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া গেল। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৭টি শক্তির প্রতিনিধি লইয়া একটি তথ্য-সংগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ দল প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিয়া সেখানে পরোক্ষ ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চায়। তাহারা জাতি-সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে তিনটি চাল চালিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা হঠাৎ আরবদের জন্য দরদী হইয়া উঠেন এবং ইহুদীদের বক্তব্য শুনিতে আপত্তি করেন। কোন রকমে একটি কমিটী খাড়া করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট লওয়া এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ সুসম্পন্ন করা ইঙ্গ-মার্কিণ দলের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় প্রতিতিধি মিঃ আসফ্‌ আলি এবং সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো এই চাল ধরিতে পারিয়া-ছিলেন। তাঁহারা উভয়পক্ষের পরিপূর্ণ বক্তব্য শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের দাবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ দলের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তথ্য-সংগ্রহ কমিটীর আলোচ্য বিষয়ে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাদ দিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ দল জিদ করেন। মিঃ আসফ্‌ আলি ও মঃ গ্রোমিকোর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ভোটের জোরে ইঙ্গ-মার্কিণ দলের এই চাল সফল হইয়াছে। মিঃ আসফ্‌ আলি এই সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারত আজ কেবল দৃঢ়তার দ্বারাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য-বাদীর নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। প্যালেষ্টাইনবাসীরও প্রবল দৃঢ়তা আছে। কাজেই, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকারে বঞ্চিত করিবার শক্তি কাহারও নাই।" সর্ব্বশেষে, ইঙ্গ-মার্কিণ দল প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে দূরে রাখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়। এই জন্যই তাহাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল—তথ্য-সংগ্রহ কমিটীতে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির কোনও প্রতিনিধি থাকবে না। রুশিয়াকে বাদ দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সাতটি রাষ্ট্র লইয়া কমিটী গঠন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধি কমিটীতে না থাকিলেও এই তাঁবেদাররা যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করিবে, ইহা জানা কথা। মিঃ আসফ্‌ আলি এই ব্যাপারে বাস্তব রাজনীতিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাবপ্রবণ গণতন্ত্রপ্রিয়তারই পরিচয় বেশী দিয়াছেন। তিনি বৃহৎ ৫টি শক্তিকে বাদ দিয়া কমিটী গঠনের প্রস্তাবই সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ দলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ৭টি ছোট রাষ্ট্র লইয়াই কমিটী গঠিত হইয়াছে।

২৮।৫।৪৭

ভীমপলশ্রী

বনফুল

৮

অত্যুচ্ছ্বসিত সদারঙ্গ বিহারীলালের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে সুশোভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল? নামটা শোনা-শোনা ঠেকছে। অনীতারই সম্পর্কে কোথায় যেন শুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

"আপনার বিয়েতে যেতে পারি নি। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আমার 'তার'টা পেয়েছিলেন তো?"

সুশোভনের আবছাভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় অনীতাদের বাড়িতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে যেন বলেছিল সদারঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না।

"হ্যাঁ, আপনার 'তার' পেয়েছিলাম বই কি"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম" সায় দিতে হল সুশোভনকেও। সুশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল সুরু করলেন তখন।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি"

"আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি"

"হ্যাঁ আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তো বটেই, আরও অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি লুকিয়ে থাকতে পারে কখনও—হেঁ হেঁ হেঁ—"

এ কথা শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল সুশোভন। একটু ইতস্তত করে' চুপ করে' রইল, আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইলে একবার।

"আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাইট স্কুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?"

প্রশ্নের ভঙ্গীতে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ভুরু নাচালেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও,নাইটস্কুলে"—ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনি করলে সুশোভন।

"হ্যাঁ, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা ব্যাপারের জন্যে আপনার আসা হয় নি। সম্ভবত কোনও জরুরি মিটিংএ আটকে পড়েছিলেন"

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন সুশোভনের দিকে, যেন কোন দেবদুর্লভ ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি।

বিদ্যুৎ-চমক-বৎ সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ল এঁদের চক্ষে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী হয়ে উঠেছেন)—অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, হয়েছে সান্ত্বনার সঙ্গে! অপ্রত্যাশিত নেপথ্যালোকে সহসা পরকীয়া লাভ করে' সুশোভনের অবচেতন মানসে বেশ একটু পুলক সঞ্চার হল। মন্দ কি! উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবার সখ নেই তার, কিন্তু সান্ত্বনার স্বামী হওয়াটা—অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও—লোভনীয়। বেশ, অভিনয় যদি করতেই হয় ভালভাবেই করতে হবে। বিব্রতভাবটা ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সুশোভন।

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশী ছিলেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিটেই তিনি জটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। গোঁসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে, কথাবার্ত্তা থেকে এ-ও বুঝলেন যে ইনি একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী। অনেকদিন থেকে সদারঙ্গ-বিহারীলালের একটি বদ্ধ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধীর পাল্লায় পড়ে যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী অহিংসাকেই

স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁসি তুলতে প্রস্তুত অর্থাৎ মনে মনে সবাই সহিংস। তাই যদিও রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁর মোটর বাইকে 'মোবিল' ছিল না তবু এমন একটা সুযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন নাম-জাদা কংগ্রেসকর্ম্মীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে' কি ছাড়া যায়? প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রশ্নের ধরণ থেকেই কি উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। বিশেষ বেগ পেতে হল না সুশোভনকে।

"আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করেন না কি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বলছি। কাগজে অবশ্য আপনাদের পোষাকী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাজ হাঁসিল করবার জন্যে বক্তৃতায় অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়—অ্যাঁ, কি বলেন—কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাতেই আমাদের দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?"

"মোটেই না"—একটু হেসে সুশোভন উত্তর দিল—"কিন্তু ও কথা বলা ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর কি আছে বলুন"

"দ্যাট্‌স্ ইট্! আপনাদের অহিংস মুখোসের তলায় তাহলে—কিছু মনে করবেন না উপমাটায়—মানে—"

"না, না মনে করবার কি আছে"

"আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনোভাব তাহলে ওই"

"আমার তো তাই বিশ্বাস"

"সত্যি? বাঃ! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে এসেছি। প্রকাশ্যে আপনারা অবশ্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—"

"তা পারি কি"

"চমৎকার, চমৎকার। যাক সন্দেহটা মিটে গেল। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে ভণ্ডামিই বলতে হবে—প্লীজ এক্স্‌কিউজ মি—ঠিক জুৎসই কথাটা মনে আসছে না। মানে, বুঝতে পেরেছেন আশাকরি আমার মনের ভাবটা"

সুশোভন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর তার ছিল না।

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সুভাষবাবুর সম্বন্ধে মহাত্মাজির আসল মনোভাবটা কি বলুন তো"

"আমি—আমি ঠিক জানি না"

"আপনি জানেন না? বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে না কি"

"তা আছে একটু। মাপ করবেন আমাকে"

"না, না, তাহলে জোর করতে চাই না। সার্টেন্‌লি—"

সদারঙ্গবিহারীলাল উদ্ভাসিত মুখে সান্ত্বনার দিকে চাইলেন—চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন।

"সত্যি ভারী আনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে'। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এমন সরলভাবে যে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। বাঃ—বাঃ—ভারী আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থাই তাহলে মনে মনে বামপন্থী—বাঃ চমৎকার। রাগ করলেন না কি?"

"না রাগ করবার কি আছে এতে—ঠিকই তো বলেছেন"

"বাঃ বাঃ, ভারী খুশি হলাম। আচ্ছা এবার চলা যাক। গোঁসাইজি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু হলেই হবে"

"সর্ষের তেল হলে হবে?"

"সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? লুব্রিকেটিং অয়েল চাই"

"আজ্ঞে না, আমরা গেঁয়ো লোক, ওসব রাখি না"

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন, "বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু বিপদ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবি নি। একটু মোবিল না পেলে মারা যাব যে একেবারে। মাইল খানেক হেঁটে আসছি। বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা। দুর্গতি যাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়—শেষকালে কি—এইখানেই রাতটা—"

"আপনার হাজার অসুবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে জায়গা দিতে পারব না আপনাকে"—একটু গলা-খাঁকারি

দিয়ে গোঁসাইজি বললেন—"আপনার সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি ব্রজেশ্বরবাবুরা নিয়েছেন"

সুশোভন অস্বস্তিবোধ করল একটু।

"আপনি যাবেন কোথা"—সান্ত্বনা জিগ্যেস করলে।

"ছিপ-ছররামারি। ছিপছররামারিতেই থাকি আমি। ওই যে বললাম না, ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ চৌবে লোকটা সুভাষ বোসের খুব প্রশংসা করত তাই ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস করেছিলাম প্রথমে। তারপর জনার্দ্দনবাবু আমার চোখ খুলে দিলেন—এখন দেখছি যদিও একটু ঘুঁতঘুঁতে ধরণের তবু বৈজুপ্রসাদ লোকটাই ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট। ভুল সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল। তা হোক। ব্রজেশ্বরবাবু আপনারও এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখা উচিত—ঐতিহাসিক মানুষ আপনি—এদিকের ইন্টিরিয়ারে চমৎকার চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, কতকগুলি মূর্ত্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? আসা মুস্কিল অবশ্য। কাছে-পিঠে কোনও স্টেশন নেই কি না। আপনারা বাই রোড এসেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক মাইল দূরে। আমরা হেঁটে এসেছি এখানে রাতটা কাটাবার জন্যে"

"আমাকেও আপনাদের সঙ্গী না হতে হয়, কি বিপদ দেখুন তো"

"না আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন" আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"আমিও আপনার সৎকার করতে অক্ষম আপাততঃ" গোঁসাইজি বললেন।

"তা-ও বটে, ঘর খালি নেই আপনার। যদি থাকতেই হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয় তো—কিম্বা বাইরে—হা-হা-হা-হা"

"হা-হা-হা-হা"—জোর করে' হেসে উঠল সুশোভন। লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়!

গোঁসাইজি ভ্রূকুটি করলেন।

"পাঁচ মাইল তো মোটে"—সান্ত্বনা বললে।

কণ্ঠ-স্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে উৎসাহ দিল সুশোভন—"হ্যাঁ, ঠিক পৌঁছে যাবেন আপনি"

সদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আশ্বাসজনক। "হ্যাঁ, মোটে পাঁচ মাইল পৌঁছে যাওয়া উচিত তো। তাছাড়া গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাণ্ডাও হয়েছে খানিকটা, গর্মে ছিল ভয়ানক। বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে, কি বলেন"

"হ্যাঁ, রাত হয়েছে, আর দেরি করা উচিত নয়"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী। অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্তু ঘাবড়ে দিয়েছিল বেশ। মনে হচ্ছিল ইন্‌লেট্ ভালভের স্প্রিংই গেছে বুঝি একটা। এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড্ হয়েছিলাম। মিকশ্চারটা আর একটু রেগুলেট করে' নিতে হবে তার মানে। একটু 'রিচ্' হয়ে গেছি সম্ভবত। আচ্ছা, নমস্কার তাহলে, নমস্কার—"

ঝুল-কালি-মাখা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বড় আনন্দ পেলাম। আবার আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগগির। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রংই বদলে যায়। চমৎকার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী"

"নারায়ণের কৃপায় পৌঁছে যান ভালয় ভালয়। আমার এখানে স্থান নেই মোটে"

গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন আবার গোঁসাইজি।

"খানিকটা গিয়ে বাইক যদি ফেল করে তাহলেও দেবেন না"

"আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও দেব না, মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোড়া থেকেই বলছি আপনার সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত।"

"তাহলে যা থাকে কপালে বলে' বেরিয়ে পড়া যাক এইবার। কি বলেন! গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর বেগ দেবে না বোধ হয় আশা করি"

সদারঙ্গবিহারীলাল মরীয়া হয়ে অগ্রসর হলেন দ্বারের দিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার সান্ত্বনা দেবী, নমস্কার ব্রজেশ্বরবাবু। বা বা চমৎকার কুকুরটি তো—খাসা। কি সুন্দর লোম। আপনার কুকুর বুঝি সান্ত্বনা দেবী—বাঃ"

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে জানালে যে ঝুনু তারই কুকুর।

"বাঃ—"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু ঝুঁকে ঝুনুকে আদর করলেন। ঝুনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে নিজের মনিবের দিকে তাকালে একবার। তারপর হাঁচলে।

"বাঃ, সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার। ঝুনু, চলি বুঝলে, নমস্কার"

গোঁসাইজি গলা-খাঁকারি দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন ভাল করে'।

"এতক্ষণে গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া উচিত অন্তত, আচ্ছা চলি এবার, নমস্কার তাহলে"

গোঁসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। একটি কথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অনুগমন করলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসলে একটু। ভোজকাজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর বাড়ির গিন্নির যে রকম মুখভাব হয় সান্ত্বনার মুখভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল। দড়াম করে' সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। গোঁসাইজি ফিরে এলেন। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে গভীর দুটি রেখা ফুটে উঠেছে দেখা গেল।

"আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন"

সুশোভন রুমালটা বার করে' নাক ঝাড়তে লাগল। সান্ত্বনাই জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্ম্মী"

"ও, আমি ধরতে পারি নি ঠিক। আপনি কোন দিকে?"

"কিসের কোন দিকে—মানে আপনি যে দিকে—মানে"

"আপনি অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে না বিপক্ষে"

"অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের?

সুশোভন ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজির দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলে একবার। তার মনে হল গোঁসাইজির মতো লোকের অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি স্বপক্ষে"

"ও, স্বপক্ষে! বটে—"

ওষ্ঠ দ্বারা অধরকে নিষ্পিষ্ট করে' গুম হয়ে গেলেন গোঁসাইজি। তাঁর চক্ষুর দৃষ্টি থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অস্বস্তিজনক সমন্বয়।

"সিংহাসনে সবাই বসতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক" এইটুকু বলে' একটু থেমে "হ্যাঃ" বলে' গোঁসাইজি তার বক্তব্য শেষ করলেন। তার পর কি মনে হল হঠাৎ ঘুরে বললেন—"সিংহাসনে বসছেন বসুন, কিন্তু ঘুস্ নেওয়াটি বন্ধ করতে পারবেন? এই যে আপাদমস্তক সবাই চোর, দিনদুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি তাহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা"

"আজ্ঞে হ্যা,ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ঢুকতে চাই"

"ভাল। আমার অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যখন নাম লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে দেবেন দয়া করে'। একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী আমার হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন এ নজির পাঁচজনকে দেখাবার মতো"

পুনরায় অধর দিয়ে ওষ্ঠকে চাপলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না ঠিক।

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে গোঁসাইজি বললেন, "আপনারা শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল শোওয়াই নিয়ম"

"বেশ তো, বলেন তো এখনি যেতে পারি"

সান্ত্বনা ঝুঁকে ঝুনুকে কোলে তুলে নিলে। গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন।

"ও কি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা"

"শুতে"

"ও আপনার সঙ্গে শোবে!"

"হ্যা, কেন"

"এক বিছানায়?"

গোঁসাইজির কণ্ঠস্বরের গ্রাম দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল।

"তাই তো শোয় বরাবর"

"আপনি ব্রজেশ্বরবাবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় শোয় বরাবর!"

"নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আপনার আপত্তি আছে না কি"

"আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন!"

তার পর সুশোভনের দিকে ফিরে প্রায় চীৎকার করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কুকুরটার সঙ্গে শোন আপনি!"

"আমি—মানে হ্যা, তা শুই বই কি। বাচ্চা বেলা থেকে পুষেছি কি না—"

গোঁসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। অষ্টধাতু-অঙ্গুরীশোভিত তর্জ্জনী তুলে বললেন—"এখানে শোবার ঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। এ খৃষ্টান হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিল আমার—

সুশোভনের ধৈর্য্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠছিল, এ কথা শুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল।

বলে উঠল—"আপনার ধারণার সীমা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই আমাদের। আমাদের কুকুর নিয়ে শোয়াই অভ্যাস"

"অভ্যাস? এই ম্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোরগলায় বলছেন আবার! আপনি একজন কংগ্রেসকর্ম্মী না? এ কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার"

"কেন, কংগ্রেসকর্ম্মীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি"

"এই কি স্বদেশী আচরণ? যাই হোক আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না সোজা কথা"

"অদ্ভুত হোটেল আপনার!"

"এটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস—দয়া করে' মনে রাখবেন সেটা"

(ক্রমশঃ)

সীমান্তে লীগ আন্দোলন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন, এইরূপ প্রচার করিয়া তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলবিরোধী আন্দোলন সুরু করে। লীগ সমর্থকরা মর্দানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিতে গিয়া সীমান্ত পরিষদের বিরোধী দলের নেতা খান আবদুল কোয়ায়ুম খান, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খান সামিন জান খান ও অপর চার জন লীগ নেতা প্রথম দিনেই গ্রেপ্তার হন।

পেশোয়ারের লীগপন্থীরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া পরদিন আগ্নেয়াস্ত্র, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর বাংলোর নিকটে গিয়া উপস্থিত হয়। প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বাংলোর জানালা ও শার্সির ক্ষতি করে এবং বাংলোর অলিন্দে দণ্ডায়মান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ও শিক্ষা মন্ত্রী মহম্মদ ইয়াহিয়া জানের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে। লীগপন্থীদের এই বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পুলিশ ঐদিন সীমান্ত প্রাদেশিক লীগের প্রাক্তন সভাপতি খান বখৎ জামাল খান ও পেশোয়ার সিটি লীগের সম্পাদকসহ অপর ১৪ জন লীগনেতাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

ক্রমে এই আন্দোলন ডেরাইসমাইলখান, বান্নু, টঙ্ক প্রভৃতি সহরে ছড়াইয়া পড়ে ও সহর ছাড়াইয়া গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং লীগের মন্ত্রীমণ্ডল বিরোধী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনেও পরিণত হয়। সীমান্তের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইহাদের হাতে নিহত হইতে লাগিল, তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল, ধর্ম্মস্থান কলুষিত হইল এবং তাহাদিগকে জোরপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইল।

মার্চ মাসে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড দেখা দিলে সীমান্তের এই উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। লীগপন্থীরা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাত্রা আরও চড়াইয়া দিল। ৯ই মার্চ পেশোয়ারের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া এবং স্থলপথেরও যোগাযোগে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া কয়েক দিনের জন্য পেশোয়ারকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। ইহার পর হইতে বিক্ষোভকারীরা সরকারী আদালত ও অফিস সমূহের সম্মুখে পিকেটিং, সরকারী ভবনে লীগ পতাকা উত্তোলন, অফিসের নথিপত্র বিনষ্ট করা, রেল লাইন তুলিয়া ফেলা, ট্রেনের গতিরোধ করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হত্যা করা, ষ্টেশনে জোরপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া পাকিস্থানী টিকিট বিক্রয় করা, গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি বে-আইনী কার্য করিতে থাকিল। মাঝে মাঝে বোর্খা পরিহিত মহিলারাও শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং কোথাও কোথাও পিকেটিং আরম্ভ করিল।

২১শে মার্চ নমাজের পর এক জনতা হাজারা জেলার মনসেরায় একটি

বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। তাহাতে একশত দোকান ভস্মীভূত হয় এবং কয়েক ব্যক্তি হতাহত হয়।

১৫ই এপ্রিল এক অগ্নিসংযোগের ফলে ডেরাইস্মাইলখান বাজারে প্রায় চারশত দোকান ও গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া একটি সিনেমা হল, টাউন হল, দুইটি ধর্মস্থান, একটি কলেজ, একটি বিদ্যালয় ও একটি সরাই ভস্মীভূত হয়। ডেরাইসমাইলখান জেলায় ১৫ই হইতে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে ১১৮ জন নিহত ও ৮১ জন আহত হয়। ডেরাইসমাইল-খান সিটি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভগবান দত্তওয়াধা বলেন যে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত ডেরাইসমাইলখান সহরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটী টাকা এবং মালপত্রসহ ভস্মীভূত দোকানের সংখ্যা এক হাজার। ডেরাইসমাইলখান জেলার কোল সাহাম, শের কোট, বুন্দ, খান্দুখেল, টাকওয়ারা, হাথালা, পোরী প্রভৃতি গ্রামে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্মান্তরিতকরণ চলিতে থাকে। আন্দোলনকারীরা কয়েকজন মন্ত্রীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে।

সীমান্তের অবস্থা এইভাবে চরমে উঠিলে ২৮শে এপ্রিল বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একদিনের জন্য সীমান্ত সফরে বাহির হইলেন। তিনি সীমান্তের আন্দোলন সম্পর্কে গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং স্থানীয় লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিলেন। এমন কি কয়েকজন বন্দী লীগ-নেতাকে বিমানযোগে নয়াদিল্লী গিয়া হাঙ্গামা সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সহিত পরামর্শ করিবারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মিঃ জিন্নার সহিত লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সত্ত্বেও কিছুই হইল না। মে মাসের প্রথম দিকে সীমান্তের লীগ নেতারা আন্দোলন প্রত্যাহার না করিবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মিঃ জিন্নাও নয়াদিল্লী হইতে এক বিবৃতিতে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাইলেন।

লীগের আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা স্থানীয় লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। উপদ্রুত স্থানে যথেষ্টসংখ্যক পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করিয়া এবং খোদাইখিদমদ্‌গার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আনাইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীমান্তের এই ধ্বংসাত্মক বে-আইনী কার্যকলাপ অতি সহজেই দমন করা যাইত, যদি না সীমান্ত গভর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো মন্ত্রীমণ্ডলীকে ডিঙাইয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে যাইতেন। তিনি মন্ত্রীদের কাজে বরাবর বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। এমন কি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে থাকেন এবং লীগের সন্তুষ্টিসাধনের জন্য প্রদেশে পুনরায় নূতন নির্বাচনের যাহাতে ব্যবস্থা করিতে পারেন, বড়লাটের সহিতও এসম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন। সরকারী কর্মচারীরা এক দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর, অপর দিকে গবর্ণরের এই দ্বৈত আনুগত্য প্রদর্শন করিতে যাওয়ায় দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের কাজে আরও সুবিধা পাইল। ইহা ছাড়া আন্দোলনকারীদের অনেকে উপজাতি এলাকায় আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে সীমান্তে আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং নিজেদের প্রচারের দ্বারা অনেক উপজাতিকেও বিভ্রান্ত করিয়া দলে ভিড়াইল। এই উপজাতি অঞ্চলে সীমান্ত গবর্ণরের এক বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে, এখানে মন্ত্রীসভার কোনও হাত নাই। পলিটিক্যাল এজেন্টেরা এই সকল উপজাতি এলাকায় খোদাইখিদমদগার বাহিনীকে মোটেই প্রবেশ করিতে দেয় না, অথচ লীগপন্থীদের প্রচারের সুযোগ দিয়া থাকে।

সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্গিয়া ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এসম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন এবং সমগ্র দেশব্যাপী ইহা লইয়া আন্দোলন করিবারও আভাষ দিলেন। কারণ মাত্র একবৎসর পূর্বে যাহারা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছে, সেখানে পুনরায় নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া সীমান্তের ব্যবস্থা পরিষদে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন কংগ্রেসী সদস্য, ২জন স্বতন্ত্র, ১জন আকালী শিখ ও মাত্র ১৭ জন লীগপন্থী। এখানে কংগ্রেস অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারোর নূতন নির্বাচনের আগ্রহ সম্পর্কে খান আবদুর গফুর খান বলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সত্যই আগামী বৎসরে ভারত ত্যাগ করে তাই গভর্ণর লীগের খান ও নবাবদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ খোদাই খিদমদ্‌গার আন্দোলনের সময় উহারাই বৃটিশকে সর্বোপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। লীগবন্ধু স্যার ক্যারো, বড়লাট পেশোয়ারে যাইলে লীগপন্থীদের দ্বারা সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খান আবদুল গফুর খান আরও বলেন যে ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে 'কিসৃখানি' হত্যাকাণ্ডের সময়ে এই ক্যারোই তখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য যুগল কিশোর ও দেওয়ান চমনলাল সীমান্তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাহারা সীমান্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহারা বলেন, সীমান্তে লীগের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে শত শত লোক খুন হইয়াছে, শত শত দোকান ও গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্থানে বহুলোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে। তাঁহারা বিবৃতিতে আরও বলেন যে, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য করিতে পারেন, স্যার ওলাফ ক্যারোর পরিবর্তে সীমান্তে এখনই এরূপ একজন গবর্ণর নিয়োগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে লীগের আন্দোলন চলিতে থাকিলেও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব সীমান্তের লীগ পন্থীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন, আমরা যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন উহারাই বৃটিশের সহায়ক হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে মতলব আঁটিত। তাহা সত্ত্বেও আমি এখন বলিতেছি যে উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নাই। আমরা সকলেই পাঠান সন্তান, আমাদের লক্ষ্য বৃটিশকে ভারত হইতে তাড়ান, তখন সেই স্বাধীন ভারতে প্রত্যেকেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে।

এই সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের জন্য বড়লাটের উদ্যোগে গান্ধী-জিন্না আবেদন প্রচারিত হইলে সীমান্ত সরকার প্রদেশের সকল লোককেই এই আবেদনে পূর্ণ সহানুভূতি প্রদানের কথা বলেন এবং জানান যে, যে সকল রাজনৈতিক বন্দীর বিরুদ্ধে কোন হিংস কার্যকলাপের অভিযোগ নাই, অবস্থা একটু শান্ত হওয়া মাত্রই তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইবে। এরূপ রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। কিন্তু সীমান্তের লীগ আন্দোলনে গান্ধী-জিন্না আবেদন কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না এবং দাঙ্গাও এতটুকু শান্ত হইল না। সমগ্র প্রদেশ জুড়িয়াই একপ্রকার হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ম্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি লাগিয়া রহিল।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বরাবরই অহিংসায় বিশ্বাসী। ইহা দেখিয়া সীমান্তের জনসাধারণ লীগের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে এবং উহার নাম দেয় "জালেমি পাখতুন" (তরুণ আফগান)। ইহার লক্ষ্য হইল শুধু আত্মরক্ষা, আক্রমণ নহে। ইহা অহিংসায় বিশ্বাসী খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জালেমি পাখতুনের পাল্টা জবাব হিসাবে লীগও এক সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিল এবং তাহার নাম দিল গাজী পাখতুন।

মিঃ জিন্না সীমান্তের লীগ নেতাদের আন্দোলন প্রত্যাহার না করার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা হিন্দু বা শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছি না, আমরা সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত গ্রহণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি। কিন্তু মিঃ জিন্না ভুলিয়া যান যে মাত্র একবৎসর পুর্বেই সীমান্তের অধিবাসীরা তাঁহাদের প্রকৃত অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন। নির্বাচনে লীগকে অধিকাংশ স্থলেই পরাজিত করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন তাহারা কংগ্রেসেরই সমর্থক। আর মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুচরেরা সীমান্তের লীগ আন্দোলনকে শুধু মন্ত্রিমণ্ডল বিরোধী আন্দোলন বলিয়া প্রচার করিলেও ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে ইহা সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনও বটে। তাহা না হইলে ভারতের মধ্যে যে প্রদেশে হিন্দু ও শিখরা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অল্প ও মুসলমানরাই সর্বাধিক সংখ্যায় গরিষ্ঠ সেখানে এত হিন্দু ও শিখকে হত্যা করা হইল কেন। লীগ সীমান্তের হিন্দু ও শিখদের হত্যা করিয়া বিহারের প্রতিশোধ বলিয়া হয়ত কিছুটা আত্মপ্রসাদলাভ করিতে পারে কিন্তু ভুয়া ও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তাহারা সহজে বীর পাঠানদের উপরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

৩রা জুনের বৃটিশ পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে, লীগ সভাপতি মিঃ জিন্না ঐ দিন নয়াদিল্লী হইতে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় সীমান্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী ৪ঠা জুন সীমান্ত লীগ সমর—পরিষদ আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই ভাবে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সাড়ে তিনমাস কাল সীমান্তে লীগের আইন অমান্য আন্দোলন চলিবার পর তাহা বন্ধ হইল। লীগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার দিনই ৪০০ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে আরও বন্দীদের মুক্তি দান করা হয়।

৩রা জুনের বৃটিশ প্রস্তাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যদিও উক্ত প্রদেশের নির্বাচিত ৩ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যেই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন; তথাপি পাঞ্জাবের অধিকাংশ সদস্য বর্তমান গণপরিষদে যোগদান না করায় এই প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া, সীমান্তের জনসাধারণ বর্তমান গণ-পরিষদ না পাকিস্থান গণ-পরিষদ কোনটিতে যোগদান করিবে তাহা জানিবার জন্য গণ-ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।

লীগ ইতি মধ্যেই সীমান্তের গণ-ভোটে যাহাতে জয় লাভ করিতে পারে তাহার তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। লীগ নির্বাচনে জিতিবার জন্য হিংসা পথ অবলম্বন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তাই এই লইয়া সীমান্তে আবার না একটা হাঙ্গামা হয়, ইহাই আশঙ্কা হইতেছে। ৬।৬।৪৭

দেউলিয়া

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

মনের আড়ালে
যাহা কিছু মোর
সঞ্চিত হ'য়েছিল,
এক এক করি
আজি এ প্রভাতে
নব সাজে দেখা দিল।

বিচারক হ'য়ে
বসিয়াছি আজ
সঞ্চিত স্মৃতি মাঝে।
পরখ করিতে
পাথেয় বলিয়া
কোন্ স্মৃতিটুকু আছে।

সঞ্চিত যাহা
ছিল এতদিন
সারা জীবনের সাথে।
কিছুই তাহার
লাগিল না কাজে
ওপারে যাবার রাতে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৫

আমরা সেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম যে, ধ্বংস স্তূপের মধ্য দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ নিম্নদিকে ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়াছে। পথটি এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার, কিন্তু এত সঙ্কীর্ণ যে কেবল একজন ব্যক্তিমাত্র সহজে এই পথ দিয়া গমন করিতে পারে। দুই পার্শ্বে প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড, বালুকা ও ধূলারাশি উচ্চ প্রাকার রচনা করিয়াছে। আমরা একৈক শ্রেণীবিন্যস্ত হইয়া এই পথ বাহিয়া ভগ্ন দুর্গের মধ্যে আমাদিগের অস্ত্রাগারাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বাগ্রে ছিল নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ, তাহার পশ্চাতে ছিলেন আর্য্য অর্হতপাদ মহাস্থবির, তৎপরে ছিলাম আমি এবং আমার পশ্চাতে প্রজ্ঞা-শেখর-প্রমুখ নায়কগণ। আমরা সকলে এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা একটি নাতি-ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। এই অঙ্গনের তিন দিক অত্যুন্নত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পরিবৃত।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে সাতটি প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া অস্ত্রাগারে পরিণত করা হইয়াছে। কক্ষগুলি দীপালোকে উদ্ভাসিত। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিকের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততম কক্ষে আমরা সকলে প্রবেশ করিলাম। সমগ্র কক্ষতল পশুলোম নির্ম্মিত পেলব সুকোমল আস্তরণ বিমণ্ডিত। আমরা সকলে কক্ষ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। আমাদের সম্মুখে কীর্ত্তিবর্ম্মণ বসিল। তাহার পার্শ্বে পড়িয়াছিল কুণ্ডলীকৃত দুইটা মনুষ্য নামধেয় জীব। তাহাদের হস্তপদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ এবং তাহাদের চক্ষু বস্ত্রদ্বারা অতি সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণরূপে আবৃত—অনুমান হয় বাহিরের আলোকের ক্ষীণ রেখাও তাহাদের নয়ন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আমি কীর্ত্তিবর্ম্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?" যে কক্ষে আমরা বসিয়াছিলাম তাহার দ্বারদেশে বাহিনীর দুইজন সদস্য কোষমুক্ত অসি হস্তে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং আরও নয়জন সদস্য সশস্ত্র হইয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছিল। তাহারাও প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত এবং বাহিরের অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের অনধিকার আগমন প্রতিরোধে সম্যক্ প্রস্তুত ও সম্পূর্ণ সজাগ।

আমার প্রশ্নের উত্তরে কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল, "আমি মন্ত্রণা সভায় যথা সময়ে যাইতেছিলাম, পথে এই দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রথমে একজনকে বনের মধ্য দিয়া আমাকে অনুসরণ করিতে দেখিতে পাই। আমাদের বাহিনীর মন্ত্ররক্ষামণ্ডলী সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ এই অরণ্যের মধ্যে এবং সর্ব্ব সময়ে, কয়েকজনকে যে কোনও প্রকার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখিয়া থাকে। আমি দাঁড়াইলাম এবং পিছনে চাহিয়া দেখিলাম কে—যেন একটা বৃক্ষের উপর হইতে একটা ভগ্ন শাখা নাড়িয়া আমাকে সঙ্কেত করিল যে, এই গুপ্তচর আমাদিগের মণ্ডলী নিযুক্ত প্রহরীর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। আমি একটা সুদীর্ঘ বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া আন্দোলন পূর্ব্বক আমাদের মণ্ডলী-নিযুক্ত সঙ্কেতকারী প্রহরীকে আমার নিকট ডাকিলাম। সে নিঃশব্দে আমার নিকটে আসিয়া অনুচ্চস্বরে আমাকে জানাইল যে, দূরে আরও একজন চর বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে; তাহাকেও একজন প্রহরী লক্ষ্য করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বন পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিতে ও চরদিগকে বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলাম। আমাদের রক্ষামণ্ডলীর সদস্যগণ বন ঘিরিয়া ফেলিল এবং

এই দুই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিল। ইহাদের বন্দী করিয়া আনিতে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা ব্যতীত আর কেহ ইহাদের যে সহকর্ম্মী কোথাও লুক্কাইত ছিল না বা নাই, তাহার নিশ্চয়তা আছে কি ?"

—আমাদের মন্ত্ররক্ষামণ্ডলী সমগ্র অরণ্য পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া আর কাহারও সন্ধান পায় নাই।

—ইহাদের বন্দী করিবার সমস্ত ব্যাপারটা আমরা শুনিতে চাই। কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ইহাদের বিচার কার্য আরব্ধ হইবে।

—ইহারা সশস্ত্র ছিল এবং ধৃত হইবার পূর্ব্বে অস্ত্র বাহির করিয়া আমাদের মণ্ডলীর সদস্যগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা স্বল্পায়াসেই ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া ও হস্ত-পদ রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছি। ইহারা আমাকে অনুসরণ করিবার সময়ে গমন পথে ও বনের মধ্যে যে সকল নিদর্শন নিজেদের সপক্ষ কর্ত্তৃক ইহাদের অনুসন্ধান সুগম করিবার জন্য, অথবা ইহাদের আপনার পথ চিনিয়া বন হইতে বাহির হইবার জন্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তাহাও আমরা সযত্নে ও সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এই ব্যাপারের জন্য আমাকে অনেকক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল এবং এই কারণেই আমি অদ্যকার সন্ধ্যার মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষম হইয়াছিলাম।

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "প্রথমে নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণের মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতির বিচার হউক। আমার মতে বর্ত্তমান চর প্রতিরোধ কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনায় কীর্ত্তিবর্ম্মণের অদ্যকার মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতি মার্জ্জনীয়।"

সকলের ঐক্যমতে কীর্ত্তিবর্ম্মণের মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতি অপরাধ বলিয়া গণনা করা সমীচীন হইল না। সকলেই বলিল যে, কীর্ত্তিবর্ম্মণ গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের জন্য মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যেহেতু সে কোনও অপরাধই করে নাই, তখন তাহাকে মার্জ্জনা করারও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এই প্রস্তাব সর্ব্বানুমোদিত হইলে শেখর বলিল, "কীর্ত্তি-বর্ম্মণের সতর্কতার দ্বারা এবং সে তাহার কর্ত্তব্যের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়ায় সংঘ একটা ঘোর বিপদ হইতে আজ মুক্তিলাভ করিল। এই ঘোর আকস্মিক বিপদ হইতে সংঘকে মুক্ত করিবার জন্য সংঘ কীর্ত্তিবর্ম্মণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রহিল এবং অতঃপর কীর্ত্তিবর্ম্মণ মন্ত্ররক্ষণ মণ্ডলীর সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে বৃত হউক।"

সংঘকর্ত্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল এবং মহাস্থবিরের অনুজ্ঞা ও উপদেশ মত, সর্ব্বানুমতিক্রমে আমি নায়কের কপালে শ্বেতচন্দনের টীকা রচনা করিয়া দিলাম।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরকে বলিলাম "এখন চরদিগের বিচারকার্য্য আরম্ভ হউক।"

মহাস্থবির বলিলেন "হাঁ, তাহাই হউক!" নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ, ইহাদিগকে সংঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া দাও এবং ইহাদের স্বপ্রথানুযায়ী সংঘকে অভিবাদন করিতে আদেশ কর!

একজন সংঘসৈন্য কীর্ত্তিবর্ম্মণের ইঙ্গিতে বন্দীদিগের পদ রজ্জুমুক্ত করিল এবং দুইজনের এক একটা পদে এক একটা লৌহবলয় দৃঢ়রূপে পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ঐ বলয় দুইটি একটি সার্দ্ধ একহস্ত দীর্ঘ শৃঙ্খল দ্বারা যুক্ত করিয়া ঐ শৃঙ্খলের মধ্যভাগে আর একটা দীর্ঘ শৃঙ্খল সংযুক্ত করিয়া উহার অপরপ্রান্ত গৃহপ্রাচীরে প্রোথিত একটা দৃঢ় লৌহ-শলাকায় সংলগ্ন করা হইল।

ইহাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলে ইহারা তাহা পালন করিতে অস্বীকার করিল। তখন কীর্ত্তিবর্ম্মণ সংঘের অনুমতিক্রমে লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ইহাদের দেহে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে অতি অল্পক্ষণ পরেই বীরদ্বয় উঠিতে বাধ্য হইল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাবনিকপ্রথায় সংঘকে অভিবাদন করিল। আমরা হাসিলাম।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরকে অনুরোধ করিলাম বন্দীগণের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য। দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকার ব্যক্তি আমার পরিচিত এবং আমার প্রাক্তন

গৃহশিক্ষক। সে পুরুষপুর নগরে ডেমিট্রীঅস নামে খ্যাত। তাহার সমগ্র ইতিহাস সভায় জ্ঞাপন করিলাম।

মহাস্থবির প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, বন্দীগণ, এখন তোমরা কি স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রভাবে তোমাদের পরিচয় সংঘের নিকট জ্ঞাপন করিবে? না, তাহার জন্ত আবার কীর্ত্তিবর্ম্মণকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে?"

বন্দী ডেমিট্রীঅস্ বলিল, "আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন তাহা করিতে পারেন, আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত রহিলাম।"

মহাস্থবির বলিলেন, "বেশ! তোমাদের সুমতি হইয়াছে দেখিতেছি! আচ্ছা, বলত ভাই তোমাদের নাম কি।"

ডেমিট্রীঅস্ বলিল, "আপনি কি আমাদের সকলকে একত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিতেছেন? আমরা কয়জন এই অবস্থায় আছি তাহা ত আমি জানি না। আমার চক্ষু খুলিয়া দিলে আমি বুঝিতে পারিব আপনি কাহার উদ্দেশ্যে আপনার প্রশ্ন করিতেছেন।"

মহাস্থবির বলিলেন, "চক্ষুর বন্ধনী এখন খুলা হইবে না। আমি তোমাকেই প্রশ্ন করিতেছি। তোমার নাম বল।"

—আমার নাম "জেনোফিলস্ পলিক্রিট্টস্।"

—মিথ্যা বলিতেছ।

—না, মিথ্যা বলি নাই।

—আমরা তোমার যথার্থ নাম জানি। তুমি তাহা বলিবে কি? না, তোমাকে তোমার যথার্থ নাম আমরা বলাইব? কিন্তু, তাহা তোমার পক্ষে, অন্ততঃ তোমার শরীরের পক্ষে বড় শুভ বা স্বস্তিপ্রদ হইবে না।

—আমি আমার নাম গোপন করি নাই।

—আমরা তোমার পরিচয় জানি।

—আমার যে পরিচয় আপনারা জানেন তাহাই যে আমার যথার্থ পরিচয়, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

—তাহা পরে জানিবে। এখন সহজে তোমার যথার্থ নাম সংঘকে জানাইবে কি? না, তাহার জন্ত কিঞ্চিৎ অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে?

—আমি আমার যথার্থ নামই বলিয়াছি।

—তুমি যে ডেমিট্রীঅস্ নামে পুরুষপুরে অনেকের নিকট পরিচিত আছ তাহা কি তোমার যথার্থ নাম নহে?

—আমি নগরে কাহারও নিকট ডেমিট্রীঅস্ নামে পরিচিত নহি এবং ছিলাম না।

—তুমি কি এই নগরে কোনও বৌদ্ধ গৃহপতির বাটীতে তাঁহার পুত্রকন্তার গৃহশিক্ষকরূপে কখনও নিযুক্ত ছিলে না?

—না, ছিলাম না।

—মনে করিয়া দেখ দেখি—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাহার পর সেই গৃহপতিই তোমাকে আবার ক্ষত্রপের শাসন-বিভাগে এক মণ্ডলেশ্বরের অধীনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও অবধি সেই কার্য্যেই তুমি নিযুক্ত আছ।

—না, সেরূপ কোনও কথা আমার স্মরণ হয় না।

—এই চারের কর্ম্ম তোমার অন্নসংস্থানের জন্ত সর্ব্বজন-বিদিত কার্য্য নহে; তুমি চারের কার্য্য তোমার অবকাশ মত করিয়া থাক এবং তাহার জন্ত তুমি স্বতন্ত্র বেতন ও পুরস্কার পাইয়া থাক। কেমন? ঠিক না? অস্বীকার করিবে কি?

—না, ঠিক নহে; ইহা ভ্রান্ত অনুমান মাত্র।

—বনের মধ্যে ঢুকিয়াছিলে কেন?

—উদ্দেশ্য ছিল মৃগয়া এবং এই বনভূমি মৃগয়ার উপযোগী কিনা তাহাই আমরা পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলাম।

—তোমরা সশস্ত্র ছিলে, কেমন?

—ছিলাম।

—কি কি অস্ত্র তোমাদের ছিল?

—শরপূর্ণ তূণ, ধনু, ভল্ল, শূল, পরশু ও তরবারি।

—এই সকল অস্ত্র কি মৃগয়াভূমি পর্য্যবেক্ষণ বা মৃগয়ার জন্ত আবশ্যক হয়?

—না হইতে পারে, কিন্তু অপরিচিত বনভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে একটু সতর্ক হইতে হয়, তজ্জন্ত আমরা অজ্ঞাত ও আকস্মিক কোনও বিপদের আশঙ্কায় বিশেষভাবে সাবধান হইয়া আসিয়াছিলাম। বনভূমিতে দস্যু ত থাকিতে পারে; আমাদের এরূপ সম্পূর্ণরূপে সশস্ত্র হইয়া আসার উদ্দেশ্য বন্যপশু, দস্যু ও অপর কোনও অজ্ঞাত আততায়ীর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা।

ক্রমশঃ
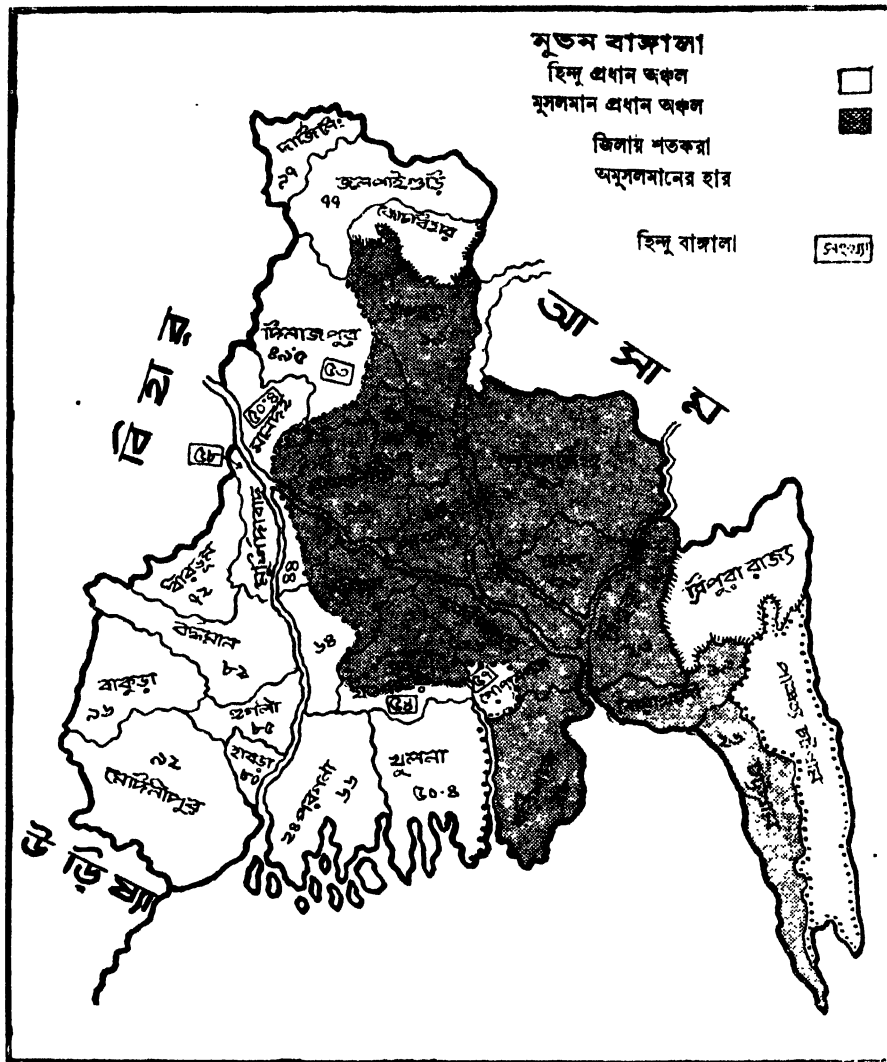
এই সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের—'নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা' নামক প্রবন্ধের ম্যাপ

টুক্‌রো কবিতা

(মিনতি)

শ্রীলীলাময় দে

অধরের সনে অধর মিলনে
আঁকিল যে প্রেমচিহ্ন
সেই ত আমার পূজার কুসুম
করো না তাহারে ছিন্ন।
অবসর ক্ষণে মুকুরের মুখে
তুলিয়া অধরখানি

ওষ্ঠের রেখা সাদরে সোহাগে
অন্তরে নিও টানি।
সে যে সরমের শঙ্কিত শিখা
স্বপ্নে জাগিয়া রয়
আমার প্রেমের চিহ্ন যেন গো
তোমারেই করে জয়।
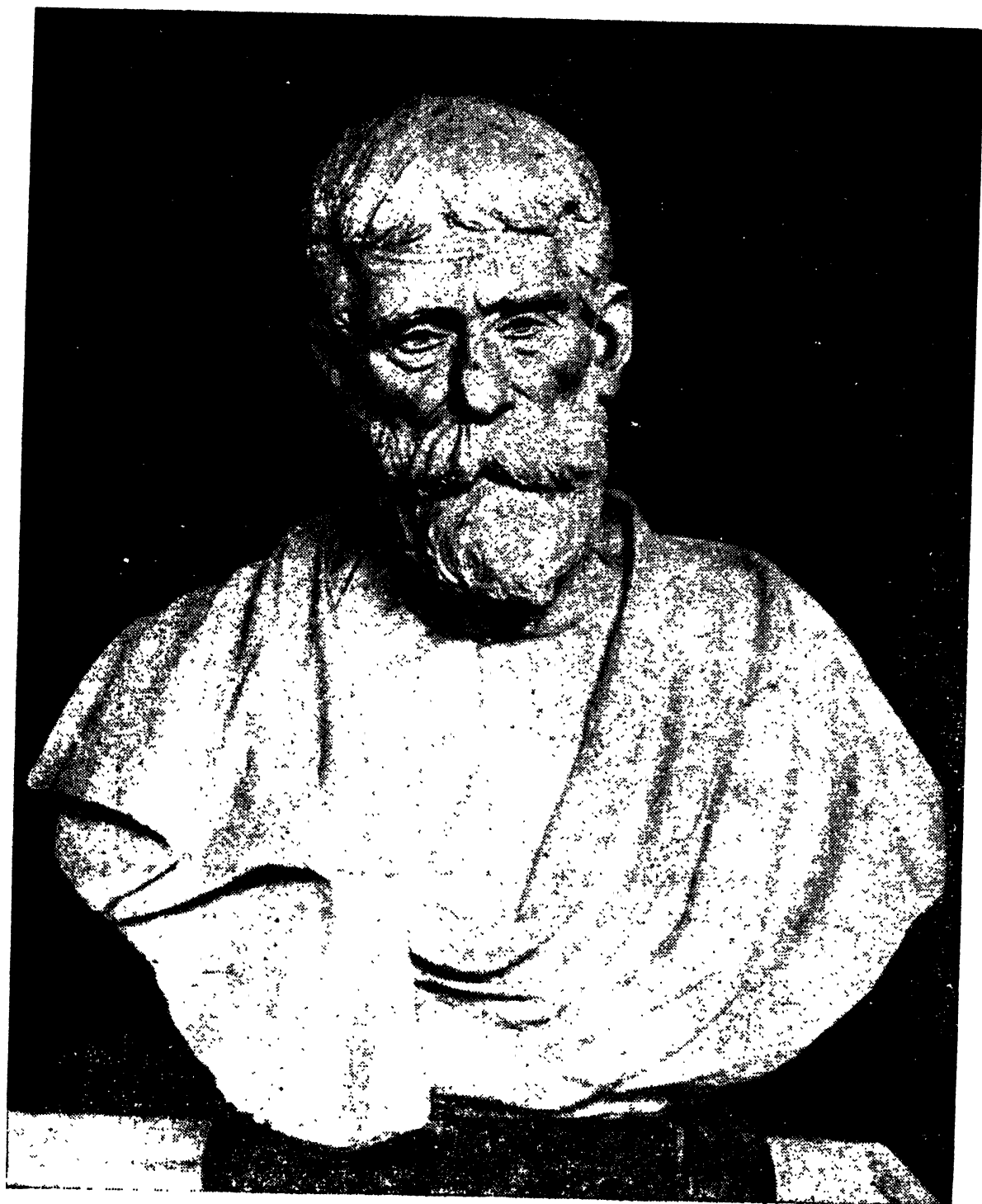
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি

(বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের জন্য প্রস্তুত)
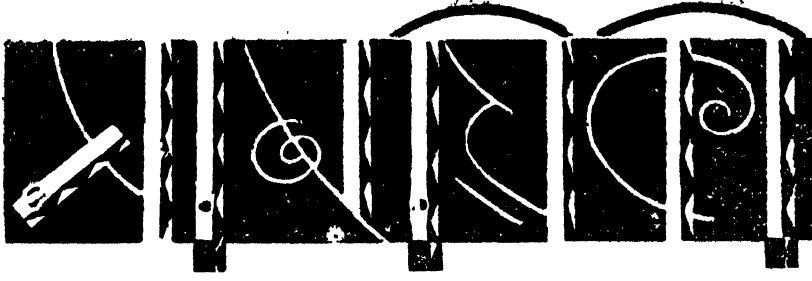
বড়লাটের ঘোষণা—

বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কয়দিন বিলাতে থাকিয়া বৃটীশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ভারতে ফিরিয়া ২রা জুন ভারতের ৭ জন নেতার সহিত পরামর্শের পর ৩রা জুন নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন—

"গত মার্চ্চ মাসের শেষে এদেশে আসিয়া পৌঁছিবার পর আমি প্রায় প্রত্যহই নানা সম্প্রদায় ও দলের বহুসংখ্যক প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে যে সকল তথ্য এবং পরামর্শাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে সদ্ভাব সহকারে বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি একটি অবিভক্ত ভারতীয়রাষ্ট্র বজায় রাখিতেন তবে তাহাই হইত সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধান—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত কয় সপ্তাহে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। গত একশত বৎসরের উপরে আপনারা ৪০ কোটি লোক এক সঙ্গে বসবাস করিতেছেন এবং ভারতবর্ষ একটি গোটা দেশ হিসাবেই শাসিত হইতেছে। ইহার ফলে এই দেশের জন্য একই চলাচল ব্যবস্থা, একই দেশরক্ষা, ডাক ও মুদ্রানীতির ব্যবস্থার কাজ চলিতেছে। ইহার ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক ও বাণিজ্যঘটিত কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই; ইহার জন্যই একটি অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে এই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে না—আমার মনে এই প্রত্যাশা প্রবল ছিল। সেইজন্যই আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি পুরাপুরিরূপে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মানিয়া লইয়াছেন এবং আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সমুদয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী মিশনের কিংবা ভারতের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষার অনুকূলে অন্য কোনও পরিকল্পনা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কিন্তু কোন একটি বৃহৎ অঞ্চল—যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যবিশিষ্ট গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিতে বাধ্য করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বলপ্রয়োগে বাধ্য করার পরিবর্ত্তে যে উপায় আছে তাহা হইল অঞ্চল বিভক্তকরণ। কিন্তু মুসলীম লীগ যখন ভারত বিভাগের দাবী তুলিল তখন কংগ্রেসের তরফ হইতে ঠিক একই যুক্তির দ্বারা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশ বিভাগের জন্য দাবী উঠিল। আমার মতে এই যুক্তি অখণ্ডনীয়। বস্তুতঃ কোন পক্ষই নিজেদের সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা বৃহৎ অঞ্চলকে অন্য সম্প্রদায়ের গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাখিতে সম্মত হন নাই। অবশ্য আমি নিজে ভারত বিভাগেরও যেমন পক্ষপাতী নই, প্রদেশ বিভাগও তেমনি সমর্থন করি না। উভয় ক্ষেত্রেই না করিবার কারণ এক এবং মৌলিক। সাম্প্রদায়িক মত-বিরোধের উর্দ্ধে, যেমন ভারতীয় মনোভাব আছে বলিয়া আমার ধারণা, তেমনি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী মানসিকতা বলিয়া একটা মনোভাব আছে যাহা প্রদেশের প্রতি জনগণের আনুগত্য বোধ জাগাইয়াছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয়, ভারতবাসীদের নিজেদেরই ভাগাভাগি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক শাসন-

বড়লাট ভবনে নিমন্ত্রিত গণপরিষদের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

ক্ষমতা এক বা একাধিক গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহাতে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন তাহার উপায় এক বিবৃতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা পরে দেওয়া হইল। কিন্তু সে সম্পর্কে দুই একটি বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

পাঞ্জাব, বাংলা ও আংশিকভাবে আসামের লোকের মনোভাব জানিয়া লইবার জন্য ঐ সকল প্রদেশের মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও বাকী অংশের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাই যে, সীমানির্দ্ধারণ কমিশনই উভয় এলাকার মধ্যে চূড়ান্তভাবে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সাময়িকভাবে

নির্দ্ধারিত এই সাম্প্রতিক সীমারেখা এবং চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত সীমারেখা একই হইবে না ইহা প্রায় নিশ্চিন্তরূপেই বলা যায়। শিখদের অবস্থা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই বীরজাতির জনসংখ্যা সমগ্র পাঞ্জাবের জনসংখ্যার প্রায় এক অষ্টমাংশ। কিন্তু তাহারা এমন ছড়াইয়া আছে যে, পাঞ্জাবকে যেমনভাবেই ভাগ করা হউক না কেন, সকল অংশেই কিছু না কিছু শিখ থাকিয়া যাইবেই। আমরা যাহারা অন্তরের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মঙ্গলই কামনা করি, তাহারা ইহা ভাবিয়া দুঃখিত যে শিখসম্প্রদায়ের নিজেদেরই অভীপ্সিত পাঞ্জাব বিভাগের ফলে তাঁহারা নিজেরাই অল্পাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা কত কম বা কত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন সীমানির্দ্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে। অবশ্য এই প্রতিনিধি কমিশনে শিখদের প্রতিনিধি থাকিবে। আলোচ্য পরিকল্পনার সবটাই একেবার নিখুঁত নাও হইতে পারে, অন্যান্য সকল পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনার সাফল্যও ইহার পরিচালনার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে তাহা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত, ইহাই আমার মত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যদি সমগ্র ভারতের জন্য সর্ব্বসম্মত শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ যদি প্রদেশ বিভাগেরও সিদ্ধান্ত হয়। পক্ষান্তরে গণপরিষদগুলি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বেই যদি শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই নাই। এই সঙ্কটপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য আমি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি যে, আবশ্যক ব্যবস্থাদি করা হইয়া গেলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখনই এক বা একাধিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনশীল গবর্ণমেণ্টের হাতে বৃটিশ ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করিবেন। আশা করা যায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে। সুখের বিষয়, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করিবার জন্য এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইণ্ডিয়া অফিসের আর বিশেষ কিছু কাজ থাকিবে না। ভবিষ্যতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত কাজকর্ম্মের ভার কোন নূতন দপ্তরের উপর দেওয়া হইবে। সমগ্র ভারতের কিম্বা বিভক্ত হইলে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রস্তাবিত আইনে কোনপ্রকার বাধা নিষেধ

পেশোয়ারে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটন—পার্শ্বে ডাঃ খান সাহেব

আরোপ করা হইবে না ইহা আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে চাই। আমাদের মধ্যে চরম আশাবাদীদের প্রত্যাশার চাইতেও অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবার পথ এখন পরিষ্কার হইয়াছে; অথচ ভারতবাসীগণের উপরেই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের ভার রহিল। ইহাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বৃটিশ ভারতেরই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বলিয়া আমি দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে কোন কিছু বলি নাই।

শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ শেষ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। গত কয়েকমাস যাবৎ যেভাবে বিশৃংখলা ও বে-আইনী ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে তাহা আর চলিতে দেওয়া ত দূরের কথা, এ সময়ে কোন প্রকার দ্বন্দ্বের বা মনোমালিন্যের প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হইবে না। আমরা কিরূপ খাদ্য-সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাওয়া কাহারও উচিত নয়। হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া ত চলিতে পারে না। এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত। ভারতবাসীদের সিদ্ধান্ত যে প্রকার হউক না কেন, আমার স্থির বিশ্বাস, বৃটিশ অফিসারদিগকে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে বলিলে তাঁহারা এদেশে থাকিয়া ভারতবাসীদের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদের যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। মহামান্য সম্রাট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমাকে ভারতীয়দের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইতে বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমি ভারতীয়দের মধ্যে আছি বলিয়া আমি গর্ব্ব বোধ করি। ভারতবাসিগণ বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হউন এবং মিঃ গান্ধী ও জিন্নার মিলিত আবেদনের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় কার্য্যকরী করিয়া তুলুন—আমি এই কামনা করি।

পরিকল্পনা

(১) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ-ভারতের শাসনভার তুলিয়া দিবেন। ১৯৪৬ সনের ১৬ই মে মন্ত্রী (কেবিনেট) মিশন যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, ভারতীয় প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতায় তাহা কার্য্যকরী করা যাইবে এবং ভারতবর্ষের জন্য একটি সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র গঠন করা সম্ভবপর হইবে এরূপ আশা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। (২) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং দিল্লী, আজমীঢ়-মাড়বার ও কুর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ ইতিমধ্যেই একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কার্য্যে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। অপরপক্ষে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং বৃটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধিসহ মুসলিম লীগ দল গণপরিষদে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিংএর আগমনে হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

৩। ভারতীয় জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। ভারতীয় রাজনৈতিকদলসমূহ একমত হইতে পারিলে এই কাজ অনেক সহজ হইতে পারিত। ঐরূপ ঐক্যের অভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা যাহাতে জানা যাইতে পারে সে উপায় নির্দ্ধারণের ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপরেই পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। একথা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টরূপে জানাইয়া রাখিতেছেন যে, ভারতবর্ষের চরম শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই; ভারতীয়েরা নিজেরাই তাহা করিবেন। এই পরিকল্পনায় এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা

আমেরিকায় ভারতীয়গণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত মিঃ আসফ আলি

ভারতকে অবিভক্ত রাখিবার জন্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা দ্বারা ঐক্য স্থাপন এবং ভারতবর্ষকে অবিভক্ত রাখার পথও এই পরিকল্পনাতে খোলাই রাখা হইল। ৪। বর্ত্তমান গণপরিষদের কাজে বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি প্রদেশ সম্পর্কে যখন বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে, তখন এই ঘোষণার পরে যে সকল প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি বর্ত্তমান গণ-পরিষদে ইতিমধ্যেই যোগদান করিয়াছেন সেই সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ-প্রতিনিধিরাও উহাতে যোগ দিয়া উহার কাজে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিবেন। সেই সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত কোন শাসনতন্ত্র দেশের যে-সকল অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ঐ সকল অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের শাসনতন্ত্র (ক) বর্ত্তমান গণ-পরিষদ কর্তৃক রচনা করিবার পক্ষপাতী কিম্বা (খ) বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নূতন ও পৃথক একটি গণ-পরিষদের মারফতে তাঁহাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে চাহেন, তাহা নির্দ্ধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায় হইল নিম্নে বর্ণিত পন্থাটি,—এবিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। এই বিষয়টি স্থির হইয়া গেলে পরে কোন্ এক কিম্বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে তাহা স্থির করা সম্ভব হইবে। ৫। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনপরিষদকে (ইউরোপীয় সদস্যদের বাদ দিয়া) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিবেশন

চিনির অভাবে কলিকাতার একটি বিশিষ্ট খাবারের দোকানের অবস্থা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

করিতে বলা হইবে;—এক অংশে থাকিবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিগণ, অন্য অংশে থাকিবে প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধিবৃন্দ। জেলার লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্ম ১৯৪১ সনের আদমসুমারিকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইবে। (এই ঘোষণার পরিশিষ্টে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে)। ৬। প্রদেশ বিভক্ত হইবে কি না সে সম্বন্ধে, মতামত দিবার ক্ষমতা উভয় প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের পৃথকভাবে মিলিত প্রতিনিধিদের দেওয়া হইবে। বিভক্ত ব্যবস্থা পরিষদের কোন একটি অংশ সাধারণ ভোটাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেই প্রদেশ বিভক্ত হইবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হইবে। ৭। পরিণামে যদি প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়, তবে ঐ অবিভক্ত প্রদেশ কোন্ গণ-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাদেশিক আইন-সভার মুসলমান-প্রধান ও অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের জানা দরকার।

সুতরাং উভয় আইন পরিষদের কোনও প্রতিনিধি যদি দাবী করেন, তাহা হইলে, ইয়োরোপীয় সদস্যগণ বাদে আইন সভার সমুদয় সদস্যদের লইয়া এক পূর্ণ অধিবেশন বসিবে এবং সেখানে ভোটের দ্বারা স্থির হইবে—প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সমগ্র প্রদেশটি কোন্ গণ-পরিষদে যোগদান করিবে। ৮। প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে প্রদেশের নিজ নিজ অংশের প্রতিনিধিগণ স্থির করিবেন, উপরে লিখিত ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) ও (খ) এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। ৯। প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে, সিদ্ধান্ত করার সুবিধার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন সভার সদস্যগণ মুসলমান-প্রধান (পরিশিষ্টে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে) ও অবশিষ্ট গায়ে গায়ে সংযুক্ত অঞ্চলগুলি অন্য অংশে পড়ে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে, বিবেচনা করিতেও কমিশনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। বাংলার সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কেও সীমানির্দ্ধারক কমিশনকে অনুরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যে প্রযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্প্রতি যে রূপ (পরিশিষ্টে উল্লিখিত) ভৌগলিক সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই মানিয়া চলা হইবে। ১০। সিন্ধুর প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ (ইয়োরোপীয় সদস্যগণ বাদে) এক বিশেষ বৈঠক করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের (ক) ও (খ) বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ১১। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র ধরণের। এই প্রদেশের নির্ব্বাচিত
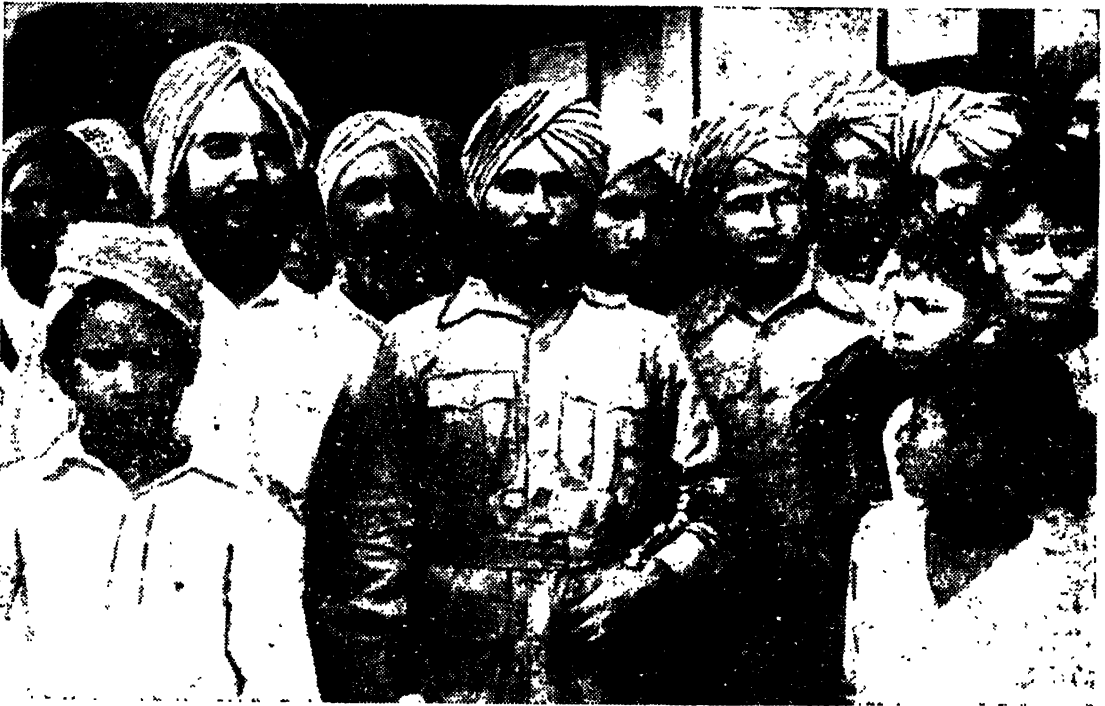
কলিকাতায় জেনারেল মোহন সিং—'আই এন এ'র প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

জেলার প্রতিনিধি হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে আইন সভায় বসিবেন। ইহা প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং নিছক সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। উভয় প্রদেশকে পাকাপাকি বিভাগ করিতে গেলে ভৌগলিক সীমা নির্দ্ধারণের কাজে খুঁটিনাটি বিচারের প্রয়োজন হইবে। প্রদেশ দুইটির যে কোন একটি বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই মাননীয় বড়লাট একটি সীমা নির্দ্ধারক কমিশন বসাইবেন। এই কমিশনের বিচার্য্য বিষয়গুলি এবং সদস্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে। এই কমিশনকে পাঞ্জাবের দুইটি অংশের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে যে সকল অঞ্চল জনসংখ্যায় মুসলমানপ্রধান ও গায়ে গায়ে আছে সেগুলি এক অংশে এবং অমুসলমান প্রধান ও তিন জন প্রতিনিধির মধ্যে দুই জনই বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, সমগ্র পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের কোনও অংশ যদি বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে আর একবার পুনর্ব্বিবেচনার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী অর্থাৎ পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের অংশ বিশেষ বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগ না দিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্ত্তমান আইন সভার নির্ব্বাচনে ভোটদাতাদের মতবাদ জানিবার ব্যবস্থা করা

হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে এই গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। ১২। বর্ত্তমান গণ-পরিষদে বৃটিশ বেলুচিস্থানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি একজন থাকিলেও তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশকেও তাহার অবস্থা পুনর্ব্বিবেচনার এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইবে। কী উপায়ে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বড়লাট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ১৩। আসাম বহুলরূপে অমুসলমানপ্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার অন্তর্গত বাংলাদেশের সংলগ্ন শ্রীহট্ট জেলাটিতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে শ্রীহট্টকে বাংলার মুসলিম অংশের সহিত যুক্ত করিতে হইবে বলিয়া দাবী উঠিয়াছে। সুতরাং বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে শ্রীহট্ট জেলাটি আসামের সহিতই থাকিয়া যাইবে অথবা নব-গঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশের সম্মতিক্রমে ঐ প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইবে

উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চলে প্রতিগৃহে খানাতল্লাসীরত সৈন্যদল

ফটো—শ্রীপান্না সেন

এ বিষয়ে শ্রীহট্টের জনসাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে ইহা করা হইবে। জনমত যদি শ্রীহট্টকে পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশের সহিত যুক্ত করার অনুকূল দেখা যায় তাহা হইলে পাঞ্জাব ও বাংলার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত কমিশনের ন্যায় শ্রীহট্ট জেলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও উহার সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য অঞ্চলগুলির সীমা নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তাহার পরে ঐ অঞ্চলগুলিকে আসামপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইবে। সকল অবস্থাতেই আসামের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমানে গণ-পরিষদের কাজে যেরূপ যোগ দিতেছেন সেরূপই যোগ দিতে থাকিবেন। ১৪। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থাই যদি সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমিশনের ১৬ই মে (১৯৪৬) পরিকল্পনার নীতি অনুযায়ী বিভক্ত অংশের জনসংখ্যার প্রতি দশ লক্ষের জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি পুনরায় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সেখানেও অনুরূপভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এলাকা হিসাবে নিম্নলিখিত হারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে :—

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মো
শ্রীহট্ট জেলা	১	২	—	৩
পশ্চিম বঙ্গ	১৫	৪	—	১৯
পূর্ব্ব-বঙ্গ	১২	২৯	—	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	৬	৪	২	১২

বাঁকুড়া হিন্দু-মিলন-মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো—পি-দালাল

১৫। বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিগণ প্রাপ্ত নির্দ্দেশ অনুসারে হয় বর্ত্তমানের গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন অথবা পৃথকভাবে নূতন গণ-পরিষদ গঠন করিবেন। ১৬। বিভক্তকরণ স্থির হইলে যথাসম্ভব সত্বর বিভক্ত অংশগুলির শাসন পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু করা দরকার হইবে :—(ক) দেশরক্ষা, অর্থ, চলাচল ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ; (খ) ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষ ও [illegible]

মধ্যে ; (গ) যে প্রদেশগুলি বিভক্ত হইবে সেগুলির বেলায় প্রাদেশিক কর্তৃত্বাধীন বিষয়গুলি যথা দেনা-পাওনার অংশ বিভাগ, পুলিশ, হাইকোর্ট, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৭। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পর্কে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী যথাযোগ্য শাসন কর্তৃপক্ষের মারফতে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৮। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছেন যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি শুধু বৃটিশ ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে ১৯৪৬ সনের ১২ই মে তারিখের মন্ত্রীমিশনের স্মারক-লিপিতে যে নীতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। ১৯। যাহাতে পরবর্ত্তী শাসন কর্তৃপক্ষেরা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন, সেজন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যে পরিণত করা প্রয়োজন। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এই পরিকল্পনার সর্ত্তসমূহের ব্যত্যয় না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ বা উহাদের বিভক্ত অংশগুলি যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে এই পরিকল্পনার কাজ সুরু করিতে পারিবে। বর্ত্তমান গণ-পরিষদ এবং নূতন গণ-পরিষদ (যদি গঠিত হয়) ও নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন। নিজেদের জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়নের অধিকারও তাঁহাদের থাকিবে। ২০। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অবিলম্বে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানাইয়াছেন। এই দাবীর প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহারা আগামী ১৯৪৮ সনের জুন মাসে অথবা সম্ভব হইলে তাহার আরও পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া দিতে ইচ্ছুক আছেন। তদনুযায়ী যথাসম্ভব সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত এবং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কার্য্যকরী উপায় হিসাবে তাঁহারা এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে (এই ঘোষণার পর ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ স্থির করিবেন) উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চলতি বৎসরেই আইন রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের কোন অংশ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রহিবে কিনা তাহা স্থির করিবার যে অধিকার সেই অংশের গণ-পরিষদের আছে এই আইনের দ্বারা তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না। ২১। উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বড়লাট প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিবেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কলিকাতাবাসীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফটো—শ্রীপান্না সেন

পরিশিষ্ট

১৯৪১ সনের আদমসুমারী অনুসারে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের মুসলমানপ্রধান জেলাগুলির নাম :—

পাঞ্জাব—লাহোর বিভাগ :—গুজরাণওয়ালা, গুরুদাসপুর, লাহোর, শেখপুরা ও শিয়ালকোট।

" রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ—এটক, গুজরাট ও ঝেলাম, মিয়ানওয়ালি, রাওয়ালপিণ্ডি, ও শাহপুর।

" মুলতান বিভাগ—ডেরাগাজিখান, ঝাং, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, মুলতান ও মজঃফরগড়।

বাংলা—চট্টগ্রাম বিভাগ :—চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

" ঢাকা বিভাগ—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ।

" প্রেসিডেন্সি বিভাগ—যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া।

" রাজসাহী বিভাগ—বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী ও রংপুর।

পরিবর্ত্তে আমাদের পাথর দেওয়া হইয়াছে। আমরা যে পাকিস্থান চাহিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই।" এখন বড়লাট প্রদত্ত এই 'সোনার পাথরবাটী' লইয়া দেশবাসী ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।।

বাঙ্গালা বিভাগ সুনিশ্চিত—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদকে বড়লাটের ঘোষণা মত দুই

রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বকবির জন্মস্থানের বিশেষ সজ্জা। ফটো—শ্রীপান্নাসেন

বড়লাটের ঘোষণা ও নেতৃবৃন্দ—

নূতন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বড়লাটের ঘোষণায় দেশবাসী কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তবে সকলেই 'মন্দের ভাল' হিসাবে এই ঘোষণা মানিয়া লইয়া কাজ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত কে-এন-যোগলেকার বলিয়াছেন—"নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসীকে আরও বহুদিন সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত হইয়া থাকিতে হইবে।" আর বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন বলিয়াছেন—"আমরা মাংস চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার

ভাগে বিভক্ত করিলে পশ্চিম বাঙ্গালায় যে অংশ হইবে তাহার সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। কাজেই বাঙ্গালা বিভাগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবে।

হিন্দু সদস্য—সাধারণ—	৪২
জমীদার (প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ)—	২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—	১
শ্রমিক (দার্জ্জিলিং চা-বাগান ও রেল শ্রমিক প্রতিনিধি (কম্যুনিষ্ট) ব্যতীত—	৬
বণিক—	৪
মহিলা—	১
মোট—	৫৬

ভারতীয় খৃষ্টান—	১
এংলো-ইণ্ডিয়ান—	৪
মুসলমান সদস্য—সাধারণ—	১৮
শ্রমিক—	২
(নৌ-শ্রমিক ও হুগলী-শ্রমিক)	
ব্যবসায়ী—	১
মহিলা—	১
মোট—	২২

শ্রীযুত ভি-ভি-গিরি—

শ্রীযুত এম-এস-আনে সিংহলে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত ভি-ভি-গিরি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত গিরি খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও বহু বৎসর শ্রমিক আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম-সংঘ-পরিচালিত বাঁকুড়া হিন্দু মিলন মন্দিরে রক্ষিদল পরিবৃত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফটো—পি-দালাল

বর্দ্ধমান জেলা সম্মিলন—

গত ১৭ই ও ১৮ই মে বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যপুরে গণ-পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান জেলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ নন্দী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা জেলা ভাণ্ডারের জন্য ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের জন্য সম্মেলনে আবেদন করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার দুরবস্থা—

ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে কোথাও কাপড় পাওয়া যায় না। চাউলের দাম ভীষণ রকম বাড়িয়া গিয়াছে—অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও দুর্লভ হইয়াছে। তাহার ফলে গত ৬ মাসে ঢাকার গ্রামাঞ্চল হইতে অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক বাঙ্গালার অন্যান্য জেলায় বা বাঙ্গালার বাহিরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে শুধু বাসগৃহগুলি জনশূন্য হয় নাই—চাষের কাজও কমিয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ ও সদরের গ্রামে চাউলের মণ কমপক্ষে ২৫ টাকা। কোথাও বা ৩০ টাকা। চিনি ও আটা ৬ মাস যাবৎ কোথাও পাওয়া যায় না

ঢাকা "সোনার বাংলার" সহকারী সম্পাদক স্বর্গত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

ফটো—কে-ভদ্র

চোরাবাজারের সন্ধান—

গত ৩রা জুন মঙ্গলবার নয়া দিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতে চোরাবাজারের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"ভারতের কয়েকজন ব্যবসায়ী শুধু চোরাবাজারের কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, আসল চোরাকারবারীদের সন্ধান আজ সরকারী অফিসেও

পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট সত্যই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা আজ দুর্নীতিপরায়ণ, তাহারা ইউরোপীয় অথবা ভারতীয়, হিন্দু অথবা মুসলমান হউক না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যদি সরকারী অফিসে এইরূপ দুর্নীতি ও ঘুসের কারবার চলিতে থাকে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ সত্যই সন্দেহজনক। দেশবাসী যদি এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য না করে, তবে রাজাজী বা রাজেন্দ্রবাবুর পক্ষে এই দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে না।

ওরিয়েনট্যাল সেমিনরী স্কুলের প্রাঙ্গণে নববর্ষ উৎসবে বালিকাদের প্যারেড ফটো—জে-কে-সান্যাল

স জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে সকলের সকল শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছে।" চোরাবাজারে কারবার করিয়া ও তাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য দান করিয়া ারত আজ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। াান্ধীজির কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে কি না, কে জানে?

শরৎচন্দ্র স্মৃতি ব্যবস্থা—

স্বর্গত অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ক্ষা কমিটী' হইতে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ াজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ টাকার সুদ ইতে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর বাঙ্গালা বক্তৃতা এবং পুরস্কার পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যিনি বক্তা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে অন্তত ৩টি বক্তৃতা দিতে হইবে ও তজ্জন্য ৫ শত টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে এক হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হইবে। এত দিন পরে যে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হইল, ইহাই আনন্দের কথা।

ঢাকায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৩শে মে শ্রীযুত মাখনলাল সেনকে সঙ্গে লইয়া সকালে বিমানযোগে ঢাকায় গমন করেন। তিনি সারাদিন তথায় নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণের সহিত বঙ্গ-ভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনার পর সন্ধ্যায় বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। জগন্নাথ হলে এক জনসভাতেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

খুলনা সম্মেলন—

বাঙ্গালার বিভাগ দাবী করিবার জন্য গত ২৭শে মে খুলনা সহরে নীলা হলে এক জেলা সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় জেনারেল মোহন সিং—

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিং গত ২২শে মে প্রথম কলিকাতায় আগমন করায় তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনিই বিদেশে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং মুক্তিলাভের পর এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

কলিকাতায় মহিলা সম্মেলন—

গত ১১ই মে রবিবার উত্তর কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে এক মহিলা সম্মিলনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত

কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মহিলা সভায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার

ফটো—জে-কে-সান্যাল

হইয়াছে। মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থ যুবকদিগকে বদ্ধ পরিকর হইতে আহ্বান করিয়া তথায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির কাশ্মীর ভ্রমণ—

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী কাশ্মীর রাজ্যে ভ্রমণের পর ২৭শে মে তারিখে লাহোরে ফিরিয়া জানাইয়াছেন—শীঘ্রই রাজনীতিক বন্দীরা (কাশ্মীরে) মুক্তি লাভ করিবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জাতীয় দলের আপোষ হইবে। রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরে মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া সকল রাজনীতিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ১০ দিন কাশ্মীর রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া, বাকুলিয়ায় সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন তোরণ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য বাড়ায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হিরন্ময় সেনের ভাষণের পর শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর চৌধুরী সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাপদ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বক্সী প্রমুখ অনেকে আলোচনা করেন। মানভূম, মধুতটীতে আগামী বৎসর সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। টাটানগর, আসানসোল, ধানবাদ, পুরুলিয়া, রাঁচি, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বার্ণপুর, কুলটি, ঝরিয়া, হাজারিবাগ, রাণীগঞ্জ, সীতারামপুর, গিরিডি, মধুপুর ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

আটার সহিত তেঁতুল বীচির গুঁড়া—

গত ২৮শে মে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাশ প্রকাশ করেন যে,

শ্রীভবেশ দাশ

সহরে আটা কম সরবরাহের ফলে আটার সহিত তেঁতুল বীচির গুঁড়া মিশাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। তিনি একটি কারখানায় তেঁতুল বীচি গুঁড়াইতে দেখিয়া আসিয়াছেন।

যে সকল কারখানা ঐ কাজ করে বা যে দোকান উহা বিক্রয় করে, তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য দেশে কি শাসক নাই। দেশ কি আজ অরাজক হইয়াছে ?

নূতন মেয়রের কার্য্যদক্ষতা—

কলিকাতা সহরকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত আলোচনার

শ্রীসুধীরকুমার রায়চৌধুরী

র অবিলম্বে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভর্ণমেণ্ট পরে কর্পোরেশনকে আরও ৩ কোটি টাকা া দিতে সম্মত হইয়াছেন। কর্পোরেশনকে এইভাবে ৰ্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে ১০০ সশস্ত্র প্রহরীও য়াছেন। নূতন মেয়র সুধীরবাবু এই কর্ম্মতৎপরতার া সহরবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন।

লিকাতায় পাইকারী জরিমানা—

গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতায় যে দাঙ্গা চলিতেছে, জন্য গত ২০শে মে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সরকার বড়বাজার, লা, জোড়াসাঁকো ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানার অধিবাসীদের র মোট ৬১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী জরিমানা করিয়াছেন। কিন্তু এই জরিমানা ও ক্রমাগত সান্ধ্য ন জারি করিয়াও দাঙ্গা বন্ধ করা যায় নাই। উপরের ৪টি থানার লোক ছাড়া অন্য কোন থানায় লোক কি দাঙ্গায় যোগদান করেন নাই ?

সাহিত্য বাসরে সম্বর্দ্ধনা—

সম্প্রতি কলিকাতা চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এ হলে সাহিত্য বাসরের এক সভায় বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন ও নবদ্বীপনিবাসী সাহিত্যিক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়

দুর্গামোহনবাবু প্রায় ৫০ বৎসর কাল বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। জনরঞ্জনবাবু সাহিত্য সাধনা ছাড়াও ৩০ বৎসরের অধিক কাল নবদ্বীপের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অন্ত নাই। রেশনের দোকানে প্রায়ই আটা ও চিনি পাওয়া যায় না—বাজারে তরকারী বা মাছ আসে না—যাহা আসে তাহারও মূল্য অত্যন্ত অধিক। দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ। ইহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

নেতৃবৃন্দের অভিমত—

বড়লাট দিল্লীতে ফিরিয়া নিম্নলিখিত ৭ জন নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা স্থির করিতেছেন—কংগ্রেসের পক্ষে—রাষ্ট্রপতি কৃপালনী, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার পেটেল। লীগের পক্ষে—মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ ও মিঃ আবদর রব নিস্তার। শিখ পক্ষে সর্দ্দার বলদেব সিং। ৩রা জুন বড়লাটের ঘোষণার পরই রেডিও সাহায্যে মিঃ জিন্না, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার বলদেব সিংকে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী বড়লাটের ঘোষণায় সম্মতি প্রকাশ করেন। মিঃ জিন্না মুসলেম লীগ কাউন্সিলের নির্দ্দেশ সাপেক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

নববর্ষ উৎসবে ওরিয়েনট্যাল সেমিনরী স্কুল প্রাঙ্গণে ব্যাণ্ড পার্টি বালকবালিকাদের প্যারেড ও ড্রিল

ফটো—জে-কে-সান্যাল

কলিকাতার হাঙ্গামা—

গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতা সহরে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও গোপনভাবে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজিও একেবারে শান্ত হয় নাই। গত ৩১শে মে শনিবার উহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সহরে একদিনে কয়েকশত লোক হতাহত হয়। তাহার পর ২রা জুন হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় সর্ব্বত্র বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হাঙ্গামার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। হাঙ্গামার ফলে সহরের ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ, ফলে সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার

দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা—

গত ২১শে মে ভারতসচিব লর্ড লিষ্টোয়েল বিলাতে ভারতের দাঙ্গায় হতাহতের নিম্নরূপ হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ১৮ই নভেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে পর্য্যন্ত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রদেশ	হত	আহত
মাদ্রাজ	০	১৩
বোম্বাই	৩২১	১১১৯
বাঙ্গালা	১৮৬	৯৬৫
যুক্তপ্রদেশ	১৭	৫৩
পাঞ্জাব	৩০২৪	১২০০
বিহার	৭	৩৫
মধ্যপ্রদেশ	২	১২
আসাম	১৪	০
সীমান্ত প্রদেশ	৪১৪	১৫০
দিল্লী	২৯	৬৯
মোট	৪০১৪	৩৬১৬

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেনিস ঃ

আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে যে টেনিস খেলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে তার উৎপত্তি প্রথম হয়েছিল ফ্রান্সে। তবে সে সময়ের টেনিস খেলার পদ্ধতি এবং খেলার নিয়মাবলী আজকের টেনিস খেলা থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের ছিল। সে সময়ের টেনিস খেলার নাম ছিল 'লে পাম' (Le Paume) অর্থাৎ the Palm (the hand)। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের উৎসাহী খেলোয়াড়দের হাতে দাস্তানা লাগিয়ে বল নিয়ে এই 'the Palm' খেলতে প্রথম দেখা যায়। তারপর দাস্তানা বাদ দিয়ে খুন্তির আকারে কাঠের ব্যাট এবং পরবর্ত্তীকালে টেনিস র‍্যাকেটের প্রচলন হয়েছে। ঘরের দেওয়াল ব্যবহার করা হ'ত বলে এই 'লে পাম' খেলা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই খেলাকে ঘরের বাইরে চালানোর চেষ্টা চলে। উন্মুক্ত জায়গায় দেওয়াল তুলে প্রথম প্রথম খেলা চলতে থাকে ; কিন্তু এই ভাবে দেওয়াল তুলে যখন খেলা সম্ভবপর হ'ল না তখন নেটের প্রচলন হ'ল। ১৩ শতাব্দীতে টেনিস খেলাকে পুরোপুরি 'indoor game' হিসাবেই গ্রহণ করা হ'ল। ফলে ফাঁকা জায়গায় টেনিস খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল। ফ্রান্সের রাজা ঘরের মধ্যে 'কোর্ট' তৈরী ক'রে টেনিসকে 'ঘরোয়া খেলা' হিসাবে মর্য্যাদা দিলেন। পরবর্ত্তীকালে ঐ খেলাই বর্ত্তমানের 'কোর্ট টেনিসে' রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্সে তখন এই খেলাকে বলা হ'ত 'Royal Tenez'। ইংরেজরা ১৩৭৫ সালে ফ্রান্সের এই 'Royal Tenez' খেলা ইংলণ্ডে প্রচলন করে এবং এই টেনিস নাম ইংরেজদেরই দেওয়া। ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত এই 'কোর্ট টেনিস' ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। ১৪ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে বহুদিন পর্য্যন্ত টেনিস খেলা ফ্রান্সের রাজন্যবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, জনসাধারণের পক্ষে টেনিস খেলা তখন আইনবিরুদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ আইনের কঠোরতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ খুশিমত টেনিস খেলতে পায়। ফলে দেখা গেল, ১৬ শতাব্দীতে এক প্যারিসেই ২০০০ 'ইন-ডোর টেনিসক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সারা ফ্রান্সের ক্লাব সংখ্যা তখন ২,৫০০ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রাজপরিবার যেমন জাঁকজমক দেখিয়ে টেনিস খেলতেন—জনসাধারণের খেলায় তা সম্ভব ছিল না এবং দর্শকেরা তাদের খেলায় সেই পরিমাণ উৎসাহ পেত না। পনের এবং ষোল শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহু খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়ের জন্ম হ'ল, যার ফলে ইংলণ্ডে একাধিক আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। কেবলমাত্র 'সখের' টেনিস খেলোয়াড়দেরই ঐ সব প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া হ'ত। সতের শতাব্দীতে দেখতে দেখতে অনেক সখের খেলোয়াড় 'পেশাদার' খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হ'লেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের যুবশক্তি টেনিস খেলায় ঝুঁকে পড়ল। জনসাধারণ শারীরিক দক্ষতা এবং আমোদ-প্রমোদ হিসাবে ব্যাপক ভাবে টেনিস খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে। এদিকে টেনিসের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে একদল জুয়াড়ী টেনিস খেলাকে লাভজনক ব্যবসায়ে খাটাতে আরম্ভ ক'রে দেয়। ভাল ভাল টেনিস খেলোয়াড়রা মোটা দামে বিক্রী হ'য়ে হাত পাল্টে যেতে থাকেন। দেশে অসৎ ব্যবসায়ীর দল ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে শেষে দেখা গেল, টেনিস খেলা তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের টেনিস খেলাকে জনসাধারণের নির্দ্দোষ আমোদের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব হ'ল। দেশের

রাজপরিবার, সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় টেনিস খেলা একেবারে বর্জ্জন করলেন। খেলায় তাঁদের আগ্রহ আর রইল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল ইংলণ্ডে জনসাধারণের আর কোন টেনিস কোর্ট নেই, প্যারিসের দু'চারটিতে তখন টেনিস খেলা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বড় বড় রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ টেনিস কোর্টগুলি ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে টেনিস খেলা যে একদিন জনসাধারণের জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার সমস্ত নিদর্শনই যেন নিশ্চিহ্ন হ'তে লাগলো।

এরপর ১৮৭৩ সালের কথা। বৃটিশ সৈন্যবিভাগীয় কর্ত্তা মেজর ওয়াল্টার সি উইংফিল্ড একদিন বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করলেন, গ্রীস থেকে তিনি Sphairistike নামে এক অভিনব আমোদ-উদ্দীপক খেলা শিখে এসেছেন এবং এই খেলা তিনি 'পেটেণ্টের' জন্য আবেদন করতে মনস্থ করেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর বন্ধুরা ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বাড়িতে সমবেত হ'ন এবং তাঁদের মেজর ওয়াল্টার গ্রীসের Sphairistike অর্থাৎ বল খেলায় ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখিয়ে প্রশংসা লাভ করেন। এই খেলাই শীঘ্র tenis-on-the laon নামে দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হ'ল এবং পরবর্ত্তীকালে 'Lawn Tennis' নামে আখ্যা লাভ করেছে। ১৮৭৩ সালে টেনিসের মূল কোর্ট লম্বায় ৬০ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে 'Base line পর্য্যন্ত ৩০ ফিট ছিল। মাঝখানের জায়গার মাপ ছিল ২১ ফিট। নেট লম্বায় ৭ ফিট, নেটের মাঝখান ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি। নেট থেকে কোর্টের মাঝখানের একটি চিহ্নিত স্থান থেকে খেলোয়াড় বল সার্ভ করতো।

১৮৭৪ সালে মেজর উইংফিল্ড কোর্টের মাপ পরিবর্ত্তন করলেন—দৈর্ঘ্য হ'ল ৮৪ ফিট, প্রস্থ ৩৫ ফিট। নেটের মাঝখানের উচ্চতা কমে গিয়ে ৪ ফিট দাঁড়ালো। কয়েক বছর পর কোর্টের দৈর্ঘ্য ৩৯ ফিট করা হ'ল।

১৮৭৫ সালে মেরী লিবোন ক্রিকেট ক্লাব টেনিস খেলার নতুন নিয়মাবলী প্রস্তুত করে। এই নিয়মানুসারে কোর্টের দৈর্ঘ্য ৭৮ ফিট (আজও এই মাপে কোর্ট তৈরী হচ্ছে) এবং প্রস্থ ৩০ ফিট দাঁড়াল। পোষ্টের কাছে নেট ৫ ফিট এবং মাঝখানে ৪ ফিট করা হ'ল।

১৮৭৫ সালে টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে অগ্রবর্ত্তী হ'ল All-England Croquet Club. এই প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি টেনিস খেলার মাঠ তৈরী ক'রে রীতিমত টেনিস খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে দেয়।

১৮৭৭ সালে প্রথম টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিযোগিতায় মাঠের প্রস্থ কমিয়ে ২৮ ফিট করা হয়, নেটের মাঝখানের উচ্চতা কমিয়ে ৩ ফিট ৩ ইঞ্চি রাখার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮২ সালে অল্-ইংলণ্ড ক্লাব দেশের টেনিস খেলা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং সর্ব্বত্র টেনিস খেলার মাঠের সীমানা ৭৮ × ২৮ ফিট, নেট পোষ্টের কাছে ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় এবং মাঠের মাঝখানে উচ্চতায় ৩ ফিটের জন্য সুপারিস করে। সেই থেকে আজও ঐ মাপে টেনিস খেলার সীমানা তৈরী হচ্ছে।

১৮৮৮ সাল লন্ টেনিস খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ বছর ইংলিস লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়।

এদিকে বেরমুদার জনৈক বৃটিশ অফিসার ছুটি উপলক্ষে যখন দেশে অবস্থান করছিলেন, ১৮৭৩ সালে মেজর উইংফিল্ড কর্ত্তৃক আহূত এক প্রীতিভোজ সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হ'ন। উক্ত অফিসার মেজর উইংফিল্ড কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'Sphairistike' খেলা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন এবং চাকরীতে পুনরায় যোগদানের সময় ১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে তিনি ঐ খেলার সরঞ্জাম বেরমুদায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে তার প্রচার করেন। ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আমেরিকান মহিলা মিস মেরী ইউইং আউটারব্রিজ বেরমুদায় (Bermuda) বেড়াতে গিয়ে ঐখানের অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁদের একান্ত আগ্রহে টেনিস খেলা শিক্ষার চেষ্টা করেন। মিস আউটারব্রিজ টেনিস খেলায় বিশেষ উৎসাহিত হয়ে পড়েন ; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি একসেট টেনিস খেলার সরঞ্জাম অফিসারদের কাছ থেকে উপহার পান। আমেরিকার কাষ্টমস বিভাগ খেলার এই সরঞ্জামগুলি হস্তগত ক'রে এক সপ্তাহ আটক রাখে। কারণ আমেরিকায় তারা এই প্রথম টেনিস খেলার সরঞ্জাম হাতে পাবার সুযোগ পায়। শেষে বিনা মাশুলেই

আউটারব্রিজকে টেনিস খেলার সরঞ্জামগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়। মিস আউটারব্রিজের পরিবারবর্গ, ষ্টেটেন আইল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বেসবল ক্লাব ক্রিকেট মাঠে একটি টেনিস খেলার মাঠ তৈরীর অনুমোদন লাভ করেন। মিস আউটারব্রিজ তাঁর এক বান্ধবীকে টেনিস খেলার নিয়মাবলী শিখিয়ে দিলেন। আউটারব্রিজের বাবা, তাঁর দুভাই, আউটারব্রিজ এবং তাঁর বান্ধবী আমেরিকার মাটিতে প্রথম টেনিস খেলে আমেরিকায় টেনিস খেলার প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৭৫ সালে তাঁরা ২নং টেনিস কোর্ট তৈরী করলেন। ১৮৮০ সালের বহু পূর্ব্বেই চিকাগো এবং ফিলাডেলফিয়াতে টেনিস খেলার প্রচলন হয়েছিল। দেখতে দেখতে আমেরিকার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে টেনিস খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলো। ১৮৮১ সালে মিস আউটারব্রিজের ভাই মিঃ ই এইচ আউটারব্রিজ সমস্ত টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিউ ইয়র্কে সমবেত করেন। ১৮৮১ সালে ৩৩টি বিভিন্ন টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে খেলায় এক ধরণের আইন অনুসরণের সুপারিশ করেন এবং ঐ বছরেই একটি টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ঐ বছরেই ইউনাইটেড ষ্টেটস লন টেনিস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং সেই থেকেই আমেরিকার সখের টেনিস খেলা এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে।

টেনিস খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ যোগ্য যে, রোমের Lusio Pularis খেলার সঙ্গে প্রাচীন টেনিসের অনেক সাদৃশ ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক দাবী করেন। ৪৯০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারস্যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লম্বা ছড়ির মুখে জালের থলি নিয়ে এক রকম বল খেলা হ'ত বলে জানা গেছে। 'পোলো' খেলার প্রধান ঘাঁটি ছিল এই পারস্য এবং ঐ সময়ে প্রায় বার রকমের পোলো খেলা হ'ত। তার মধ্যে পূর্ব্বের বর্ণিত খেলা 'Salvajan' নামে পরিচিত ছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে আর 'Salvajan' খেলা হ'ত না, তখন ঘোড়া বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে কোর্ট তৈরী করে খেলা হ'ত। এ খেলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'Chigan'। অনেকের মতে এ খেলাও অনেকটা টেনিসের মতনই ছিল, তবে অপরিণত অবস্থায়। তবে যে ফ্রান্স বর্ত্তমান টেনিসের জন্মভূমি সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ করার নেই।

টেনিস খেলায় রেকর্ড ঃ

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী সানফ্রান্সিস্কোতে মিসেস হেলেন উইলস মুডী এবং ভূতপূর্ব্ব ডেভিস কাপ খেলোয়াড় হাওয়ার্ড কিনসে (বর্ত্তমানে পেশাদার খেলোয়াড়) টেনিস খেলায় একটি রেকর্ড ক'রেছিলেন। তাঁরা উভয়ে ৭৮ মিনিটকাল একটানা বল খেলেছিলেন—কোন রকম বলটি না 'ফস্কে'। ঐ সময়ে তাঁরা সর্ব্বসমেত ২,০০১ 'সট' মেরেছিলেন। তাঁরা এ রেকর্ড জানতেই পারেন নি; রেফারী তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই রেকর্ডের কথা উল্লেখ করলে উভয়কেই বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সগরল"—২৷৹

অধ্যাপক সনৎ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গণপরিষদ ও কংগ্রেস"—৩৲

শীতল বর্দ্ধন প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "বুলবুল্ নামা"—২৷৹

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রণীত "আগষ্ট আন্দোলন ও আমাদের শিক্ষা"—।৵৹ "পঞ্চায়েত কি ও কেন ?"—৵৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশ তৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

হিমানী * কলিকাতা

বর্ষণমুখর সকালটিকে ঘিরে থাকে কালো মেঘে ঢাকা আকাশ, বৃষ্টিতে ভেজা গাছের পাতা আর জলভরা চিকচিকে ঘাস। গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন পাখীর আনন্দসঙ্গীত স্তব্ধ ক'রে আপন গাম্ভীর্য্য ঘোষণা করে। হে অনিন্দিতা, তুমি কি এমনি বর্ষণমুখর সকালটিতে নিজেকে প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাও? এমনি দিনে জবাকুসুম মনে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ আনন্দের সৃষ্টি করে। বর্ষার জোলো হাওয়া থেকে চুলকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করে জবাকুসুম।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

লক্ষ লক্ষ রূচিমতী মহিলারা পছন্দ করেন
সুতরাং
আপনার কেশ প্রসাধনে
আপনিও বেছে নেবেন
ভেষজ-বিশারদ নগেন্দ্র
নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় কেশ তৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ : : কলিকাতা
KARUKRIT-HK/4

A.D.

ALL YOU NEED IS Charm
এই অসামান্যা সুন্দরী মহিলার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য হাজার হাজার লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। কিন্তু তিনি বলেন শুধু "ওটীনের" জন্যই এ সম্ভব হয়েছে।
তাই সৌন্দর্য্যলাভ ও তা রক্ষা করতে হলে "ওটীন" আজ অপরিহার্য্য।
Oatine
SNOW for DAY CREAM for NIGHT

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৫৪

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

৬০খানি চিত্রযুক্ত যৌন-বিজ্ঞানের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

এলো যবে যৌবন

কম বয়সের ছেলেমেয়েদের এ বই বিক্রয় হয় না।

দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সমস্যার সমাধান, আধুনিক মতবাদ, স্ত্রী-ব্যাধির প্রতিকার, যৌবনে জানবার সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, জীবনকে দীর্ঘ ও সুখী করবার কৌশল প্রভৃতি তথ্যে ভরা। বিজ্ঞাপনে সব লেখা চলে না। দাম ২৷৹

তশাস্ত্র নরনারীর সৃষ্টিতত্ত্ব, লক্ষণ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু তথ্যপূর্ণ—ফটোশোভিত। দাম ১৷৹

স্বামী-স্ত্রী—২৷০

স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ এই গ্রন্থ নববধূকে দিন। অদূর ভবিষ্যতে সে হবে মা—মাতার শিক্ষার আদর্শে সন্তান হবে মানুষ। তাই শিশুশিক্ষা, শিশুপালন, স্বামিসেবা, ভালবাসা, ধাত্রীবিদ্যা, হিসাব, রন্ধন, কারুকার্য্য, গীতবাদ্য প্রভৃতি শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ উপহার দিয়ে আদর্শ সংসার গড়ে তুলুন।

গুপ্তগৃহ—যুবক-যুবতীর একান্ত পাঠ্য গ্রন্থ—২৷০

১৩৯খানি বিস্ময়কর চিত্রে সম্বলিত

যৌবন পথে

যৌন-বিজ্ঞান মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লইয়া ১৮শ সংস্করণ। নর-নারীর সকল সমস্যা, তথ্য ও আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ। বিবাহের আগে ও পরে এই বই পড়া একান্ত প্রয়োজন। ছবির এলবাম সহ। দাম ২৷৹

আশায় বাঁধে ঘর নব প্রকাশিত উপন্যাস। জীবনে এল ঝড়—নারীর আশায় বাঁধা ঘর ভেঙে পড়ল...তাকে নামতে হ'ল পথে। সংসারের আবর্ত্তের মাঝে নিজের সত্তা বজায় রেখে কেমন ক'রে সে বাঁচল তারই আনন্দ-অশ্রু-উজ্জ্বল কাহিনী আবেগতপ্ত ভাষায় পেয়েছে রূপ। দাম—১৷৹

মায়ার বাঁধন বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত সমন্বয়ে শাণিত ভাষায়, বলিষ্ঠ ভাবধারায় আর নূতন দৃষ্টিভংগীতে লেখা ১৷৹

শতজীবনী অতীতে ফেলে আসা সাধু-মহাপুরুষ ও আদর্শ ব্যক্তির ১০৮টি জীবনী পড়ে ধন্য হোন। ফটো যুক্ত দুই খণ্ড—২৷৹

সৌখীন পাকপ্রণালী (১৩শ সংস্করণ) চপ, কাটলেট থেকে নিরামিষ ও মাছ-মাংস-ডিমের সব রান্না, সব মিষ্টান্ন প্রভৃতি ৫০০ রকমের মুখরোচক রান্নার বই। দাম—২৲

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ (সামাজিক নাটক) ১৷৹

নবপ্রকাশিত বুককাঁপান দু' রঙা ছাপা রহস্যপূর্ণ ডিটেকটিভ—রহস্য...রোমাঞ্চপূর্ণ...নিঃশ্বাস চেপে পড়তে হবে। প্রত্যেকটি পৃথক গল্প।

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল—১৷৹ **কাঠের ড্রাগন**—১৷৹
মুখোস যখন খুলে গেল—১৷৹ **সীমান্তের বন্ধু**—১৷৹
বজ্র ভৈরবের মন্ত্র—১৷৹ **হত্যা যাদের নেশা**—১৷৹

উপন্যাস, গল্প, রোমাঞ্চ, শিশু-সাহিত্য, উপহার গ্রন্থ প্রভৃতি সব বই ভবানীপুরের দোকানে প্রচুর আছে

সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স

রহস্য রোমাঞ্চ

(সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মাসিকপত্র)

সম্পাদক : **ধ্রুব সরকার**

বাংলা দেশে এ যাবৎ নানা রকমের ডিটেকটিভ গল্প ও বই বেরিয়েছে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্রভাবে শুধুমাত্র ডিটেকটিভ ক্রাইম, রহস্যঘন ও অপরাধমূলক গল্প ও উপন্যাস সমষ্টি নিয়ে কোনো মাসিকপত্র বাজারে বেরোয় নি। রহস্য রোমাঞ্চ সে দিক থেকে একেবারে নতুন। সাহিত্যগুণ বজায় রেখে সবকটি গল্প হ'বে সার্থক। বিখ্যাত বিদেশী ক্রাইম গল্পগুলিরও অনুবাদ প্রতিমাসে এতে স্থান পাবে। যাঁরা লিখছেন তাঁরা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত : **শ্রীপবিত্র গাঙ্গুলী, অশোক গুহ, রঞ্জিত সেন, বিমলকর**, এবং আরো অনেকে।

আশ্বিন থেকে বর্ষারম্ভ।

প্রতি সংখ্যা : ৷৹ আনা

সডাক বার্ষিক : ৬৷৶৹, সডাক ষাণ্মাষিক : ৩৷৶৹

সচিত্র সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এই মাসিকপত্রখানি আপনার পক্ষে অপরিহার্য। আজই গ্রাহক হোন।

অফিস :

১৬৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ৬

যাবতীয় সরঞ্জাম

বর্ম্মা সেগুন কাঠের সরঞ্জাম, লেড, কোটেসন, ইষ্টিক, রুল, লেডকাটার মেসিন, বিক্রয়ার্থে সর্ব্বদা মজুত থাকে। লটের সন্ধান দেওয়া হয়।

K. K. BHATTACHARYA
46 1. BECHU CHATTERJEE ST. CAL

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পৃথিবী বিখ্যাত ওলার হ্রদের খাঁটী

পদ্মমধু

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান এবং যাবতীয় চক্ষুরোগের স্বভাবজ মহৌষধ। ড্রাম শিশি ২৲। ৩ শিশি ৫৷৹। ৬ শিশি ১১৲। ডাকমাশুল পৃথক। ডজন ২২৲ টাকা, মাশুল ফ্রি।

নূতন বই   নূতন বই   নূতন বই

তারাশঙ্করের
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিরাট বিচিত্র উপন্যাস
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ৫৲

শৈলজানন্দের উপন্যাস
হে মহামরণ ! ২৲
যশস্বী সাহিত্য-নায়কের অপরূপ সৃষ্টি।

বনফুলের
নূতন বই
আরও কয়েকটি ২৲

শৈল চক্রবর্তীর
বহুবর্ণে বিচিত্র রুচিসম্মত উপহারের বই
যাদের বিয়ে হবে ৩৲
যাদের বিয়ে হল (৩য় সং) ৩৷৹

সতীনাথ ভাদুড়ীর
যুগান্তকারী উপন্যাস (অভিনব মুদ্রণে ২য় সং)
জাগরী ৪৷৷০

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
জাপানী বন্দী শিবিরে ২৷৷০
আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালার সপ্তম বই। লেখক নিজে আজাদ-হিন্দ দলে ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মহাকাল
সুবৃহৎ অভিনব উপন্যাস। ৩৷৹

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিজয়লক্ষ্মী
অজস্র চিত্রমণ্ডিত উপন্যাস। ২৸৹

নন্দগোপাল সেনগুপ্তর
যৌবন জল তরঙ্গ
অজস্র চিত্রমণ্ডিত নাট্যগুচ্ছ। ১৷৹

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির
পূর্বরাগ ২৲
'রূপবাণী' গৃহে বহু সমাদৃত ছবির উপন্যাসান্তরণ

সুধীরকুমার চৌধুরীর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
বৃহৎ বিচিত্র উপন্যাসের ১ম পর্ব ৩৷৹

একান্তা
অতুলন কাব্যগ্রন্থ। ৩৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদিত
১৩৫২র সেরা গল্প ৪৲
অচিন্ত্যকুমার, আশাপূর্ণা দেবী, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র, বিভূতি মুখো, বিভূতি বন্দ্যো, মনোজ বসু, মাণিক বন্দ্যো, সরোজ রায়চৌধুরী, নবেন্দু ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের গল্প।

বনফুলের
ভুয়োদর্শন ৩৲
শোভন প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণে বহু খ্যাত বইয়ের নূতন সংস্করণ

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের
যুযুৎসু জাপান
ছাপা হচ্ছে।

আমাদের **নূতন ক্যাটলগের** জন্য চিঠি লিখুন তাতে আমাদের সমস্ত বইর খবর পাবেন

মনোজ বসুর **ভুলি নাই** (৯ম সং) ও **ওগো বধূ সুন্দরী** (২য় সং) ছাপা হচ্ছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হারানো সুর ৩৲
চৈতালী ঘূর্ণি ১৸৹ **দ্বীপান্তর** ১৷৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের
তেরো নম্বর বসতি ২/০
আপভম্ ২৲ সাম্রাজ্ঞ ২৲
কল্লান্ত ২৲ অঙ্গরাগ ২৲
পথ্রতীর্থ ২৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
কাঠ-খড়-কেরোসিন ১৸০
আসমান জমিন ২/০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কুহকের দেশে ২/০
ভাবীকাল ২৸৹ **কুড়িয়ে ছড়িয়ে** ২৲

প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ২৲
ডাকিনী ১৷৷০
পরিহাস বিজল্পিতম্ ১/০

বনফুলের
নঞতৎপুরুষ ৩৲
বনফুলের গল্প ২৲ **দশভাণ** ২৸৹

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
আশাবরী ৩৷৹ **রাজপথ** ৪৲
অমলতরু ৩৲ **দিকশূল** ৪৷৷৹
রাজপথ (নাটক) ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দিবারাত্রির কাব্য ২৸০
চিন্তামণি ১৸০
আজ-কাল-পরশুর গল্প ২৷৷৹

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিষের ধোঁয়া (৩য় সং) ৩৲
পথভূত ১৸৹ **ব্যুমেরাং** ২৷৷৹
গোপন কথা ২৷৷৹ **জালপাঞ্জা** ১৷৹

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
জলে জাগে ঢেউ ২৷৷০
ভাগীরথী বহে ধীরে ২৷৷০

মনোজ বসুর
শত্রুপক্ষের মেয়ে ৩৷৷০
ভুলি নাই ২৲ **সৈনিক** ৩৷৷০
ওগো বধূ সুন্দরী ২৸০
নূতন প্রভাত ১৸৹ **প্লাবন** ১৷৹
দুঃখ নিশার শেষে ২৲
নরবাঁধ ২৲ **বনমর্ম্মর** ২৷৷০
পৃথিবী কাদের ? ১৷৷০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সূর্য্য সারথি ৩৲
স্বর্ণ সীতা ২৷৷৹ **তিমির-তীর্থ** ২৷৷৹
দুঃশাসন ২৲ **বীভৎস** ২৲

নবেন্দু ঘোষের
কালো রক্ত ২৸৹
এই সীমান্তে ২৷৷০
ডাক দিয়ে যাই (৩য় সং) ৩৲

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
একাকিনী নায়িকা ২৷৷০

অলকা মুখোপাধ্যায়ের
তোমারই ২৲

পবিত্র স্নান

অবগাহন ব্যতীত প্রকৃত স্নান বা স্নানের প্রকৃত তৃপ্তি মেলে না—এ ধারণা আমাদের মনে বহুদিন থেকে বদ্ধমূল। দুঃখের বিষয়, এ যুগের শহরের বাসিন্দাদের ভাগ্যে এই রকম স্নানের সুযোগ বা অবসর মেলে কই? তবে ভালো সাবান দিয়ে গাত্রমার্জ্জনা করে প্রচুর জল ঢেলে স্নান করতে পারলে সেই পরিতৃপ্তি যে মেলে না এমন নয়। আর 'রেণু' এমনই একটি ভালো সাবান যা মাখলে স্নানের আনন্দ সত্যিই বেড়ে যায়—'রেণু'-র সুগন্ধী সুপ্রচুর ফেনরাশি শরীরের প্রতিটি রোমকূপ সুপরিষ্কৃত করে স্নানের প্রকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এনে দেয়। 'রেণু' সহজলভ্য ও সুলভ।

সোল সেলিং এজেন্ট—ওরিএন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিঃ, ৬৬ এ & বি .

মোহন বিংশ শতাব্দীর রবিনহুড। পাপী, অত্যাচারী, সমাজের শত্রু এবং যে সব ধনী সমাজের বুকে বসিয়া ফাঁকি দিয়া নির্বিবাদে তাহাদের কুকর্ম্ম সাধন করিয়া চলিয়াছে, দস্যু মোহন তাহাদের কি ভাবে শায়েস্তা করে তাহার বিচিত্র কাহিনী পড়িয়া আপনি বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন।

বিশ্ব-সাহিত্য-কল্পনায় এমন বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টি অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই।

রচনা—শ্রীশশধর দত্ত ঃঃ প্রতি খণ্ডের মূল্য এখনও পূর্ব্ববৎ ২৲

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমা-হারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্ম্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারী-ত্রাতা মোহন (১২) ব্রহ্ম-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোস মোহন (১৪) মোহনের তূর্য্যনাদ (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত-দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত-সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো-যুদ্ধে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযান (২৩) মোহন ও পঞ্চম বাহিনী (২৪) ফাঁসির মঞ্চে মোহন (২৫) রমার দাবি (২৬) মোহন ও গুপ্তশাসক (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী (২৮) বার্লিনে মোহন (২৯) স্বপন ও দস্যু (৩০) বন্ধু মোহন (৩১) মোহন ও হুই (৩২) তরুণ মোহন (৩৩) জার্ম্মান-ষড়যন্ত্রে মোহন (৩৪) ছদ্মবেশী মোহন (৩৫) স্বপনের ব্রহ্ম অভিযান (৩৬) রাজ্যেশ্বর স্বপন (৩৭) মোহনের অভিনয় (৩৮) নিশাগ্রামে মোহন (৩৯) মোহন-চপলা সংঘর্ষ (৪০) মোহনের অনুরাগ (৪১) প্রিয় মোহন (৪২) সর্ব্বজ্ঞ মোহন (৪৩) মোহনের তিন শত্রু (৪৪) ত্রয়ী-যুদ্ধে মোহন (৪৫) অফিসার মোহন (৪৬) মোহনের প্রতিদান (৪৭) স্বপনের এডভেঞ্চার (৪৮) নবরূপে মোহন (৪৯) মোহনের নূতন অভিযান (৫০) ত্রাতা মোহন (৫১) সুন্দরবনে মোহন (৫২) যুবক মোহন (৫৩) মোহন ও আণবিক বোমা (৫৪) মোহনের প্রতিশোধ (৫৫) মোহনের ঋণ-পরিশোধ (৫৬) করদরাজ্যে মোহন (৫৭) মোহন ও বনবিহারী (৫৮) বিচারক মোহন (৫৯) সোভিয়েট রাশিয়ায় মোহন (৬০) মোহন ও বেকার (৬১) মোহনের পণ-রক্ষা (৬২) মোহনের দ্বিতীয় অভিযান (৬৩) মোহন ও মিলার (৬৪) মহাযুদ্ধে মোহন (৬৫) সাগরতলে মোহন (৬৬) বন্দী মোহন (৬৭) নারী-ত্রাতা স্বপন (৬৮) মোহন ও যখের ধন (৬৯) বিপন্ন-ত্রাণে মোহন (৭০) সহৃদয় মোহন (৭১) মুক্তিদাতা মোহন (৭২) মোহনের মানবতা (৭৩) অপহৃতা রমা (৭৪) ছদ্মদস্যু মোহন (৭৫) মোহন ও হীরা।

বিশেষ সুবিধা—সাধারণ পাঠকেরা মোহন সিরিজের যে-কোন পাঁচখানি বা তদধিক বই একত্রে ভি, পি'তে লইলে ডাক-ব্যয় লাগিবে না, অর্থাৎ পুস্তক-মূল্যেই বইগুলি পাইবেন।

ঘোষ ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১১৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ:
জলপাইগুড়ি
বি,বি,২২৫৭

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

হেড অফিস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মুলধন ২০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মুলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড ২৩,০০,০০০৲
টাকার উপর

শাখাসমূহ

বাঙলা
কলিকাতা
বড়বাজার
শ্যামবাজার
ক্যানিং ষ্ট্রীট
হাইকোর্ট
হাটখোলা
ভবানীপুর
কালীঘাট
বালিগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
ময়মনসিংহ
চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
ফরিদপুর
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জলপাইগুড়ি
আসানসোল

বিহার
পাটনা
গয়া
মজঃফরপুর

উড়িষ্যা
কটক

আসাম
গৌহাটী
ডিব্রুগড়

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
নাগপুর
ইটওয়ারী
জব্বলপুর
জব্বলপুর ক্যাণ্ট
অমরাবতী
রায়পুর

মাদ্রাজ
মাদ্রাজ

পাঞ্জাব
লাহোর
রাওয়ালপিণ্ডি
অমৃতসর

যুক্তপ্রদেশ
লক্ষ্ণৌ
আমিনাবাদ
কাণপুর
মেষ্টন রোড
এলাহাবাদ

যুক্তপ্রদেশ
কাটরা
বেনারস
বেরিলি
মীরাট
আগ্রা

দিল্লী
চাঁদনী চক
সদর বাজার

বোম্বাই
কোর্ট—বোম্বাই
স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড
কলবাদেবী
আহমেদাবাদ
মস্কট মার্কেট
সুরাট

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
পেশোয়ার

বেলুচিস্থান
কোয়েটা

রাজপুতানা
আজমীর

সিন্ধু
করাচী

লণ্ডন এজেণ্টস্: মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

"ক্যালকাটা ন্যাশনাল"-এর সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্টটি অতিশয় জনপ্রিয়।

মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়।

বিনামূল্যে ধবল

বা শ্বেতকুষ্ঠের ৫০,০০০ প্যাকেট

ঔষধ বিতরণ ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০ আনা। ঔষধে উপকার না হইলে এই প্রকার প্রথমে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা সম্ভব কিনা তাহা আপনারা বিচার করিবেন। অনর্থক অর্থ ব্যয়ের পূর্ব্বে ঔষধে উপকার হইবে কিনা যাচাই করিয়া লউন। কুষ্ঠ ও বাতরক্ত দরুণ, গাত্রে চাকা দাগ ও স্পর্শশক্তি লোপ, হস্তপদাদির অঙ্গুলীসমূহ বক্র, মুখ, নাক, কান ফোলা নির্দ্দোষ নিরাময়ের জন্য পত্র লিখুন।

সালিখা কুষ্ঠাশ্রম—কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায়, বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি ১নং হরগঞ্জ রোড, পোঃ সালিখা, জেলা হাওড়া। ফোন: হাওড়া, ১৮৭
ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—৪৯সি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পুরুষকার ও দৈব শক্তির অধীন বলিয়া ভক্তিসহকারে মন্ত্রপূত কবচ ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাভূত করা, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভও অনায়াসে করা যায়। বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্রও ধনবান্ হইয়া থাকেন। পত্র লিখিলেই ধারণের নিয়মাবলী পাঠান হয়।

সারিডন
সকল যন্ত্রণার
উপশম করে

জননীর তুষ্টি
শিশুর পুষ্টি
LILY
BRAND
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
যুবকের তৃপ্তি
বৃদ্ধের সহায়
জন-কল্যানের
চিরস্থায়ী অধিকারের গৌরবে ধন
লিলি বিস্কুট কোং :: কলিকা

পড়িবার মত ও উপহার দিবার ভাল বই

সুভাষ আলেখ্য ২॥০

সুভাষচন্দ্রের জীবনের কয়েকটী বাণী-চিত্র
পরিকল্পনা, চিত্র-সম্পাদনা
প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (Piciel)

সত্যের সন্ধানে ২৲

মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সম্বলিত একখানা এলবাম
পরিকল্পনা ও চিত্রাঙ্কন
প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পি, সি, এল)

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়

দাম—৩॥০ টাকা
ডাঃ শচীন সেন
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বই পড়িয়া প্রশংসা করিয়াছেন

রবিরশ্মি ১ম খণ্ড ৭॥০

ঐ ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শরৎচন্দ্র ৪৲

ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত প্রণীত

কাব্য-সাহিত্যে

মাইকেল মধুসূদন ৩৲

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সীতা ও সরমা ২৲

মধুসূদন কাব্য-পরিচয় ২৲

Constituent Assembly of India 10/-

By Dr. A. C. Banerjee M.A. P.R.S. PH.D.

CABINET MISSION IN INDIA 6/-

By Dr. Banerjee & Bose.

History of India 12/8

By Dr. N. K. Sinha M.A. P.R.S. PH.D.
Dr. A. C. Banerjee M.A. P.R.S. PH.D.

Holocaust 4/8

(Story of the Second World War)
By S. L. Ghose

SCIENCE OF PALMISTRY 7/-

By Devacharya M.A.

জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী ৫৲

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

শতাব্দীর সূর্য্য ৩॥০

রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা
শ্রীদক্ষিণা বসু প্রণীত

প্রেম-গীতিকা (উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা) ২॥০
কনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সোনার বাংলা ২॥০

গল্পে বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাস
কনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বীরের দল (ছোটদের জন্য) ১॥০
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

হিপ্নোটিজম ২৲ ম্যাজিক শিক্ষা ১॥০
সহজ ম্যাজিক
যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার প্রণীত

অম্বপালী (বৌদ্ধযুগের নাটিকা) ২৲
শ্রীগোপাল দাস চৌধুরী প্রণীত

[illegible] (উপন্যাস) শ্রীঅশোক সেন ১॥০

নূতন বই ! বাহির হইল নূতন বই !

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

টিক্‌টিকি ও চড়াই ২৲

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-সমস্যার কয়েকটি চমৎকার ছবি। সমালোচকেরা বলেন—"এইরূপ সরস সমাধান কেউ দিতে পারেনি। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন ছাড়া সৎসাহিত্য সৃষ্টি কখনই সম্ভব নহে। বইখানিতে নূতনত্ব আছে যথেষ্ট।"

লেডিজ ওন্‌লি ২৲

লেখক এ যুগের 'লেডি ও ল্যাড' দিগের ভাবিবার খোরাক দিয়াছেন

*

তরুণের স্বপ্ন

১ম পর্ব্ব ৩৷৽ ২য় পর্ব্ব ২৸৽

চিন্তাশীল পাঠকদিগের নিকট খুব সমাদর লাভ করিয়াছে।

তাসের ঘর ২৷৽

কণ্ট্রোলের শাড়ী ২৲

চলতি নাটক-নভেল এজেন্সি
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রুবাইয়্যাত ওমর খয়্যাম

শ্রীযুক্তা অপরাজিতা দেবী সম্পাদিত ও অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা। এই কাব্যানুবাদে ৩৬০টি রুবাই দেওয়া হয়েছে। বাংলায় এত অধিক রুবাইয়ের একত্র সঙ্কলন এই প্রথম। ইহাই সর্ব্বোত্তম সংস্করণ—নিঃসন্দেহে উপহারের শ্রেষ্ঠ বই। অসংখ্য রঙিন ছবি, উৎকৃষ্ট ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, ৩৷৽

বিশ্বের সেরামানুষের প্রেম-পত্র

মিস্ ডরোথী পার্কার সম্পাদিত অভিনব বই

প্রিন্স অব ওয়েলস্, জার্ম্মেনীর প্রিন্স, বিসমার্ক, সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই, লর্ড পিটারবরো, লর্ড বায়রণ, ডিউক অব মার্লবরো, নেপলিয়ন, নেলসন, গেটে, শিলার, স্কট, শেলী, কীটস, হুইকট্, জনসন, সেক্সপীয়ার, ব্রাউনিং, হুগো, বলজাক, মোঁপাসা, কারলাইল, টলষ্টয় প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন কবি, বীর, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা এবং তাঁদের প্রেয়সীদের লেখা প্রেমপত্রের অনুবাদ। উপহারের শ্রেষ্ঠ বই—২৷৽

নারীর রূপ-সাধনা

কালোকে শ্যাম, শ্যামকে গৌরে পরিণত করতে, কুগঠিত মুখাবয়ব, বক্ষ, চুল প্রভৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে গ্রন্থকর্ত্রী লতিকা বসুর এই বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করুন। বহু চিত্র সম্বলিত। ২৷৽ টাকা

আজাদী সৈনিকের ডায়েরী

লেফ্‌টন্যান্ট এন্‌, জি, মুলকর, বি-এ লিখিত ডায়েরীর অনুবাদ ২৷৽

GREAT SHORT STORIES

17 Best short stories with the novelette Ball-of-Fat, Guy de Maupassant. Rs. 2

Golden Treasury of LOVE POEMS

With Rubaiyat of Omar Khayyam, Selections of Love Poems from 16th to 20th Century. Compilled by S. Cunninghum. Rs. 2-8

Works of Dr. S. K. Mukhorjee M.B.

কাম-সূত্র (বাৎস্যায়নের বঙ্গানুবাদ) গোস্বামী ২৲

চুম্বন—চিত্রে ও কাব্যে এবং চুম্বনের ইতিহাস (কঙ্কাবতী) ২৲

KAMA-SUTRA

Anthentic English Translation of Vatsyana's Kama-Sutra- 14 illustrations. Rs. 5

PSYCHOLOGY OF LOVE Rs 2

MARRIAGE & WISE PARENTHOOD

Illustrated Rs. 2

(চিঠি লিখিলে ক্যাটেলগ পাঠান হয়)

ওরিএন্ট্যাল এজেন্সী

শৃঙ্গার
কলা
SNOWFIRE
SNOWFIRE
SNOWFIRE
SNOWFIRE
FACE POWDER
SNOWFIRE JELLY

লরেন্সের গল্প

ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে লরেন্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। আগ্নেয়গিরির দুরন্ত তীব্র উত্তাপ তাঁর ভাষায়, মনে বিচিত্র রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য। ইংলণ্ডের শান্ত গম্ভীর বনেদী চালের সাহিত্য-জগতে তিনি মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন। লরেন্সের যে কয়টি রচনা অনুবাদ করা হয়েছে, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় সেগুলির মধ্যে মিলবে। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩৷৽

মম্‌-এর গল্প

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে সমারসেট মম্‌ একটি নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁকে জাতিতে ইংরেজ কিন্তু সাহিত্যিক প্রকৃতিতে ফরাসী বললে বোধ হয় খুব ভুল করা হয় না। তাঁর রচনার বুনন তেমনি সূক্ষ্ম, সরল ও বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু সম্পূর্ণ গল্প যেখানে শেষ হয় সেখানকার অপ্রত্যাশিত বিস্ময় একেবারে মর্মে গিয়ে লাগে। মম্‌-এর গল্পগুলি আশ্চর্য, অপরূপ, অসংখ্য চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩৲

পিরানদেল্লোর গল্প

ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লুইজি পিরানদেল্লোর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। গভীর বেদনারসে পরিপ্লুত গল্প, কখনো মধুরের আভাস এনে দেয়, কখনো বিদ্রূপের বাঁকা হাসি, কখনো বা অশ্রুজল। সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। নিজের ও অন্যের রচনা সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে রুচি এর উৎকর্ষের পরিমাপ। দাম ৩৲

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

ইউরোপীয় সাহিত্য-জগতে এর মতো আর কোনো উপন্যাস এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি বোধহয় করেনি। নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও ডি, এইচ লরেন্সের এই বই আজো যে জীবন্ত হয়ে আছে তার কারণ লরেন্সের অসামান্য বহ্নিদীপ্ত প্রতিভা। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনিন্দ্য অনুবাদ। চারিশো বত্রিশ পাতা। দাম ৪৲

ভারতবর্ষ শুধু যে স্বাধীন হবে তা নয়

জ্ঞানে গুণে শ্রীতে, ধর্মে কর্মে সম্পদে সে জগতসভায় শীর্ষ আসন অধিকার করবে। তার বর্তমান আজ পঙ্গু ও শৃঙ্খলিত হলেও তার অতীতে রয়েছে সেই প্রতীতি, তার ভবিষ্যতে রয়েছে সেই সম্ভাবনা। যার, অতীত এত উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ কখনো অন্ধকার হতে পারে না। আর কী সেই দীর্ঘদীপ্ত অতীত...

অক্লান্ত দেশকর্মী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের রচনা

এই দেশেরই রাজপুত্র প্রথম যৌবনে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করে বহুকল্পদুর্লভ বোধিসত্ত্ব লাভ করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এই দেশেরই রাজা দেশবিজয়ের পর শিলালিপিতে ঘোষণা করেছিলেন যুদ্ধবিজয়ের ব্যর্থতা, অহিংসার স্নেহবাণী। এই সেই দেশ যেখানে অপজাত হয়েও সত্যকাম ঋষি বলে পূজা পেয়েছিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়েও মুনি-কপিল ভগবান-কপিল বলে কীর্তিত হয়েছিলেন। এই দেশেরই মেয়ে অলংকার বা ভূষণসজ্জা না চেয়ে প্রার্থনার ভাষায় আর্তনাদ করেছিলেন: যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমার কি হবে?'...আমাদের অন্ধকার অতীত এই বইয়ের রশ্মিপাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাঙলা ভাষায় এই বই অভিনব সৃষ্টিকার্য। বিজ্ঞান কাব্য ও ইতিহাসের সজীব সংমিশ্রণ। দাম ৪৲

আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়া-প্রেম...শচীন্দ্র মজুমদারের

লীলাময়ী

উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কতো মধুর হতে পারে এ-বইয়ে তার পরিচয় মিলবে। সংস্কৃত কাব্যের গাম্ভীর্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য এর প্রতি ছত্রে উৎসারিত। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নরনারী এ-উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়া-প্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩৲

প্রকাশক, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা২০

কোনো খেদ নাই

জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মীর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতিসিংএর আত্মজীবনী

বইটি সম্বন্ধে জওহরলালের অভিমত: 'আমার খুব ভালো লেগেছে। ভারি সুখপাঠ্য, মনকে একেবারে নিবিষ্ট করে রাখে। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের মূল্য যদি কিছু থাকে, সে হচ্ছে এই যে, বারে বারে ভাগ্যের নিপীড়নকে আমরা অগ্রাহ্য করেছি, তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। প্রত্যুত্তরে যে-দণ্ড পেয়েছি বিনা দ্বিধায় তাকে মেনে নিয়েছি। ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই লড়াই চিরকাল আরম্ভ করেছি আমরাই, ভাগ্য নয়। কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মনের মধ্যে ছবির পর ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে-যাওয়ার, ফিরে-পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে পেয়ে বসেছে।' পণ্ডিত-পরিবার ও হাতিসিং-পরিবারের বিভিন্ন চিত্রে সজ্জিত। দাম ৫৲

"প্রিয়জনের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা আমাদের দেশের মেয়েরা উজাড় করে দেয় তাকে

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
নেতাজীর প্রামাণ্য সম্পূর্ণ জীবনী।

সুভাষচন্দ্র ৪॥

ডুটহামস্থনের জগৎপ্রসিদ্ধ উপন্যাস

ভ্যাগাবণ্ডস ৩॥০

অনুবাদ করেছেন—শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীকুমারেশ ঘোষের নূতন অবদান, যাহা প্রত্যেক মেয়ের এবং মেয়ের অভিভাবকদের পাঠ করা উচিত :—

ওগো মেয়ে সাবধান ২৲

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের দুখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

জ্যোতির্গময় ৪৲

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (১ম পর্ব) ৩॥০

শুণধর ছেলে (ফাল্গুনী) ১৲

ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি অনূদিত

কামসূত্র

ঋষি বাৎস্যায়ন প্রণীত সমগ্র কামসূত্রের সরল প্রাঞ্জল অনুবাদ। (২য় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত)—৪৲

বাহির হইল ! বাহির হইল !

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

জীবন রুদ্র ৩॥০

চিতাবহ্নিমান ৩॥০

নালালক্ষ্ক ২॥০

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের

রাত্রির যাত্রী ৩॥০

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের

বন্ধনহীন-গ্রন্থি ৩৲

রুবেন রায়ের

জাগ্রত জীবন (যন্ত্রস্থ)

Read :—

BOUNDARY PROBLEM OF NEW BENGAL

Dr. Santoshkumar Mukherjee /10/

ভারত বুক এজেন্সি :: ২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (৪নং ঘর)

ধবল (LEUCODERMA) যাহাদের বিশ্বাস, এই রোগ সারে না, তাহারা আমার নিকট আসিলে একটি ছোট দাগ আরোগ্য করিয়া দিব, এজন্য মূল্য দিতে হয় না।

শ্বেতী তৈল মালিশে ছুলি, মেচেতা, বসন্ত ও ব্রণাদির কুৎসিত দাগ মিলাইয়া চর্ম্মের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনে। মূল্য ১ আউন্স ১৲ টাকা।

পক্ষাঘাত অবশ, শুক-ফুলা ও বেদনাযুক্ত বাত, গেঁটেবাত, সায়াটিকা, কম্পন প্রভৃতি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধে নির্ণিত নিরাময়। মূল্য ৩৸৹।

একজিমা বা কাউরের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ—"বিচর্চ্চিকারী" ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য চুলকানির উপশম, সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য। মূল্য এক টাকা, নমুনা ছয় আনা মাত্র।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্ম্মরোগ চিকিৎসক—

পণ্ডিত এস, শর্ম্মা : (সময় ৩-৮) ২৩।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পত্র দিবার ঠিকানা—পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

ভাটপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচই অব্যর্থ

দুরারোগ্য ব্যাধি, গ্রহবৈগুণ্য, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, কর্ম্মচ্যুতি বা কর্ম্মহীন, ...রাজ, প্রণয়ভঙ্গ, ক্ষতি, অপমান, মামলা অকালমৃত্যু, বংশনাশ প্রভৃতি ...র করিতে দৈবশক্তিই একমাত্র উপায়। ১। নবগ্রহ কবচ দক্ষিণা ৫৲ ...। শনি কবচ ৩৲ ৩। ধনদা কবচ ৭৲ ৪। বগলামুখী কবচ ১৫৲ ...। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ১৩৲ ৬। নৃসিংহ কবচ ১১৲ ।৭। রাহু কবচ ৫৲ ...। বশীকরণ কবচ ৭৲ ৯। সূর্য্য কবচ ৫৲। অর্ডারের সঙ্গে নাম, গোত্র, ...ভব হইলে জন্মসময় বা রাশিচক্র পাঠাইবেন। ইহা ভিন্ন আমার কোষ্ঠী, ...কোষ্ঠী গণনা ও প্রস্তুত হয়, যোটক বিচার, প্রশ্ন ও বর্ষফল গণনা, গ্রহশান্তি, ...য়ন প্রভৃতি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কার্য্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়।

ভারত বিখ্যাত রাজবৈদ্য
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম. এ. আবিষ্কৃত

সোমরস

সর্ব্বপ্রকার জ্বর, রক্তদুষ্টি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডু, কামলা, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও যকৃতের দোষ অজীর্ণ, পিত্তশূল ও হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি বহু-রোগনাশক মহৌষধ।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পুস্তিকা চাহিয়া পাঠান।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ফোন : বি. বি. ৪০৩১

ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নিষ্ফল

জানাইলে মূল্য ফেরৎ দিব !

নারীর—স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমে ও অন্যান্য জটিল উপসর্গে ক্রো-মে পিলস্ একমাত্র নির্দ্দোষ পেটেন্ট মহৌষধ মূল্য ৩॥০। আজকালকার স্ত্রী-পুরুষের আবশ্যকীয় সমস্ত ঔষধ আমার কাছে পাওয়া যায় ইহা সম্বন্ধে সন ১৩৪০ হইতে ১৩৫২ পর্য্যন্ত "ভারতবর্ষ" "বসুমতী" "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকায় আমার বড় বিজ্ঞাপন দেখিবেন। বহু কারণে বড় বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ আছে। বিনামূল্যে তালিকা পাঠান হয়।

লিপটন
চা
JAKOOJA BRAND
FINEST DUST TEA
LIPTON'S
JAKOOJA

বি, সরকার এণ্ড সন্স
লিঃ
"গিনি হাউস"
গিনি সোনার গহনার
—একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—
সুনিপুন গঠন ও আধুনিক রুচিসম্মত
ডিজাইনের স্রষ্টা
১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৪৪ কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৯০
গ্রাম : "গিনিহোস"
ভারতের অন্যতম অলঙ্কার
নির্ম্মাতা।

"বেনারসী
শাড়ী"
টাওয়ার
ব্লক
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

দিবাস্বপ্ন ২৲

কলরব ১।০

অবিকল ১।০

নবীন যুবক ২৲

নিশি-পদ্ম ২॥০

ঘুম ভাঙার রাত ১॥০

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত

দাম—দুই টাকা

প্রিয়-বান্ধবী

সদ্য-প্রকাশিত সুশোভন সংস্করণ।
তরুণ-সমাজে "প্রিয়-বান্ধবী" প্রিয়-সাথী।

দাম—৩৲ টাকা

তরুণী-সঙ্ঘ ১॥০

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ১৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

বহ্ন্যুৎসব ১॥০ ময়ূরাক্ষী ১॥০

ক্ষণ-বসন্ত ১॥০ মধুচক্র ১৲

আকাশ ও মৃত্তিকা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

উ প নি বে শ

নূতন ভৌগোলিক পটভূমিকায় রূপায়িত নূতন ধরণের উপন্যাস।

১ম পর্ব—২৲, ২য় পর্ব—২৲, ৩য় পর্ব—২৲

চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

মায়ের ডাক

সুখোপাঠ্য গল্প গ্রন্থ। এই গ্রন্থের "পিতা-পুত্র" গল্পটি নব কলেবরে ছায়া-চিত্রে রূপান্তরিত করিতেছেন সিনে প্রডিউসার্স "মায়ের ডাক" নামে এবং "কাশীর মা" গল্পটি নাট্যরূপে মঞ্চস্থ হইবার আয়োজন চলিতেছে এক প্রগতিশীল রঙ্গমঞ্চে। বইখানির সম্বন্ধে Amrita Bazar Patrikaর অভিমত: The stories have been told with art and elegance and the characters portrayed with power. The collections will have warm welcome from lovers of Bengali literature.

দাম—২৲

ধীরেন্দ্রনাথ বিশী প্রণীত হাস্যোদ্দীপক কৌতুক-চিত্র

অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইন্‌ডাসট্রি কোং ১৲

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মদন ভস্মের পর ১॥০

আশালতা সিংহ প্রণীত

লগন ব'য়ে যায়

নব-প্রকাশিত ব্যঙ্গ-চিত্র।

কল্পনা ও বাস্তবের আবর্ত্তে পতিত অসহায় হতবুদ্ধি মানুষের চিত্র নিশ্চয়ই করুণ, কিন্তু তাহা হাস্যরসেরও খোরাক যোগায়। সুরঞ্জিত প্রচ্ছদপট। দাম—১৷০

স্বয়ম্বরা ২৲ মুক্তি ১॥০ ক্রন্দসী ১॥০

অভিমান ১॥০ পরিবর্ত্তন ১॥০ কলেজের মেয়ে ১॥০

মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কুমারী-সংসদ ২॥০ ভুলের মাশুল ১॥০

দুঃখের পাঁচালী ১॥০ জাগ্রতা ভগবতী ১॥০

অদৃষ্টের ইতিহাস ২৲ মরুর মাঝারে বারির ধারা ১॥০

শান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত

গোলকধাঁধা ২৲ ১৯৩০ সাল ২॥০

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম

যমুনা মেয়েটিকে চেনা শক্ত। সব বিষয়েই সে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে। পদস্খলিতা নারীদের প্রতিষ্ঠান "করুণাদেবীর আশ্রম"-এ তার আগমনও যেমন আকস্মিক— অন্তর্দ্ধানও তেমনি রহস্যাবৃত। ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট। ২৲

শান্তি ১॥০ তেজস্বতী ১॥০

বিপত্তি ২॥০ নমিতা ২৲

অপরাজিতা দেবী প্রণীত

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবনচিত্র

আনন্দবাজার বলেন: * * দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা এমন নিপুণতার সহিত এত সহজ সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, বইখানির কলেবর বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও পড়িতে ক্লান্তিবোধ হয় না; ঘটনাস্রোত এবং তাহা বর্ণনার বিশিষ্ট ভঙ্গী পাঠকের মনকে স্বচ্ছন্দে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

দাম—পাঁচ টাকা।

চীনের অধিবাসীদের কাছে চা-টা যেমন তেমন করে খেয়ে শুধু একটু তৃপ্তি লাভ করার বস্তু নয়, চা-পান তাঁদের কাছে একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুন তাঁরা সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং যত্নের সঙ্গে পালন করেন। চীনবাসীদের চা-পানের পদ্ধতিও একটু স্বতন্ত্র। তাঁদের চায়ের কাপে কোনো হাতল থাকে না, কিন্তু একটা ঢাকনা দেওয়া থাকে। এই কাপেই চায়ের পাতা ভেজানো হয়, চা-তে দুধ বা চিনি মেশানো হয় না। একটি আঙুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে কাপের ঢাকনাটি ঈষৎ উন্মুক্ত করে তা থেকে চা পানের অভ্যাসটি আয়ত্ত করা বেশ একটু শক্ত এবং সময় সাপেক্ষ। প্রথম কাপের চা ফুরিয়ে গেলে অতিথিকে আবার চা এনে দেওয়া হয় বটে কিন্তু এই দ্বিতীয় বারের চা-কে অতিথির প্রতি বিদায় নিতে বলার গৌণ এবং বিনীত ইঙ্গিত বলেই মনে করা হয়। চীনবাসীরা সাধারণত স্বল্পভাষী। কথার চেয়ে মনের ভাব তাঁরা আকারে ইঙ্গিতেই বেশি ব্যক্ত করেন। তাই চা শুধু পানীয় হিসেবেই তাঁদের কাছে প্রিয় নয়, প্রীতিসম্ভাষণ, আদর আপ্যায়ন বা অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিতও চায়ের মারফতেই প্রকাশ করা হয় ব'লে তাঁদের সামাজিক জীবনে চা অপরিহার্য। চল্লিশ কোটি চীনবাসী দিবারাত্র সমানে চা পান করেন, চা তাঁদের কাছে অফুরন্ত তৃপ্তি ও আনন্দের উৎস।

চীনের পথেঘাটে সর্বত্র চায়ের দোকান দেখতে পাওয়া যায়, এগুলোকে চীন দেশে বলা হয় "কোয়ঙ"। প্রত্যেকটি কোয়ঙ-এর বাঁধা খদ্দের আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের খদ্দেররা চায়ের দোকানে এসে মিলিত হন, কেটলির জল তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফুটতেই থাকে।
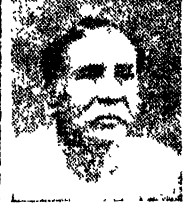
শ্রাবণ—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

এরই লাগি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিস্টার-এট-ল

এরই লাগি এ তপস্যা করেছি কি যুগ যুগ ধরি ?
ফাঁসীমঞ্চে ঝুলিয়াছি, আন্দামানে রহি দ্বীপান্তরে
রাজদণ্ড হাসিমুখে অকাতরে লইয়াছি বরি'
হে জননী বঙ্গমাতা, দ্বিখণ্ডিতা দেখিতে কি তোরে ?···

ঝরেছে মায়ের অশ্রু, পিতারে করেছি সুখহারা,
স্নেহহীন গৃহহীন ঘুরিয়াছি তস্করের বেশে,
বন্দিয়া জননী তোরে হাসিমুখে বরিয়াছি কারা
শুকায়নি রাজবর্ত্মে তাজা খুন অহিংস এ দেশে।···

এরই লাগি চিরদিন কল্পনায় আঁকিয়াছি ছবি,
হাস্যময়ী শস্যভরা প্রীতিফুল্ল দেশজননীর।
মলিন অঞ্চলতলে ছায়াঘন আম্রবনচ্ছায়ে
কাটাইতে যে বাসনা সে কি শুধু কল্পনা কবির ?···

ভালবাসি বঙ্গভাষা, ভালবাসি বঙ্গভাষাভাষী
ভালবাসি বাঙ্গালীরে সুখেদুঃখে উত্থানে পতনে।
ভালবাসি পল্লীছায়া হেমন্তের শস্যপূর্ণ ধরা,
বাঙ্গালী হয়েছি বলে শত গর্ব্ব আমি রাখি মনে।···

হে জননী বঙ্গমাতা, আপন আয়ত্তাধীনে আসি,
লভিবে যে স্বাধীনতা এই তার যথার্থ স্বরূপ ?
একি তার প্রতিকৃতি অথবা এ কঙ্কালের ছায়া
আমি যারে ভালবাসি শতছিন্ন এই তার রূপ !···

সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ ভালমন্দ যাহা হয় হবে,
তোমারে বিমাতা জানি কাটাইব বাকী দিনগুলি,
সে যেন না সত্য হয়, জ্যোতির্ম্ময়ী আপন গৌরবে
হও রাজ-রাজেশ্বরী ! সত্য হোক্ কল্পনার তুলি।···

তুমি হও পরিপূর্ণা তোমার সন্তানদের মাঝে,
হোক্ তারা বহুধর্ম্মী, তবু তারা বাঙ্গালী বলিয়া—
দেয় যেন পরিচয় সগৌরবে মনুষ্য সমাজে,
বাঙ্গালার পরিচয়ে ওঠে যেন হৃদয় দুলিয়া।

বাঙ্গালার ভূমি ব্যবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার জমি

একদিন ছিল বাঙ্গালীর ধান দুধ মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান, নিজের জমি গরু পুষ্করিণী ও বাগান হইতে সংগ্রহ হইত। আর গ্রামের শিল্পীরা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। মাঝে মাঝে মুসলমান বাদশাহ নবাবদিগের আত্মকলহ এবং সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিত এবং সাধারণ লোককে বিব্রত করিয়া ফেলিত। এইরূপ বাঙ্গালী জীবনের পক্ষেরও বিপক্ষের অবস্থাগুলি আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকরা তৎকালীন বাঙ্গালী সংসারের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সুবিধার দিকে বেশী অঙ্কে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সমাজ চলিতেছিল, তাহা ইংরাজ আমলে বিপর্যাস্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজ মুসলমান বাদশাহ নবাবদিগের মত কেবল দেশ শাসন করিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার আদিমরূপ বণিকবৃত্তিকে রাজশক্তির সহায়তায় অতি কদর্য্যরূপে প্রকাশ করিল। প্রথমে বাঙ্গালার মাল রপ্তানি করিয়া চালাইল, পরে বাঙ্গালায়, তথা ভারতবর্ষে, জমি লইয়া আবাদ করিয়া মূল উৎপাদন হইতে বিদেশী বাণিজ্যের সমস্ত ভার ও লাভ একচেটিয়া করিয়া রাখিল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা যে সকল মাল ভারতবর্ষে আমদানি করিতে পারিত, এখানে উৎপন্ন মাল যাহাতে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিল। যেখানে তাহার শিল্পদ্রব্য স্থানীয় দ্রব্যাদির সহিত গুণে ও দরে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, নানা নির্য্যাতনে সেই শিল্প ধ্বংস করিতে ইংরাজ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত কিছুই হয় নাই। ফলে লোকে ক্রমেই কৃষির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করিতে বাধ্য হয় এবং জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িতে থাকে। যাহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন, সংসার প্রতিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি, সেই জমিকে "মা" বলিয়া মনে করে এবং মাতার ন্যায় ভিটাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। পিতৃপিতামহের ভদ্রাসন হইলে সেই ভিটার টান আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভদ্রাসনের এক টুকরা রক্ষা করিতে, দাঙ্গা ও মামলায় যে অর্থ ব্যয় করে, তাহা দ্বারা ভিন্ন স্থানে সমস্ত ভদ্রাসনের পরিমাণ বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জমি ক্রয় করা সহজ। সাধারণতঃ শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে সে ভিটা ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। জমি আঁকড়াইয়া অনশনে থাকিবে, তথাপি অন্যস্থানে যাইতে সম্মত হইবে না।

বাঙ্গালার ভূমি স্বত্ব

জমির উপর অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকিবার পক্ষে বাঙ্গালীর অন্য কারণ আছে। বাঙ্গালী, এমন কি সাধারণ প্রজা বা রায়ত নিজ জমিতে স্বত্ববান হইয়া ভোগদখলীকারসূত্রে একই জমিতে নিবদ্ধ থাকিয়াছে। সাধারণতঃ প্রজা বদল করা বা জমি হইতে উচ্ছেদ করা নীতি বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলন ছিল না। ইংরাজও স্থানীয় জমিদারদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী জমি ব্যবস্থার সময় যতদূর সম্ভব সে নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

পুরাতন কথা

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংরাজ বাঙ্গালা দেশের অংশ বিশেষে নবাব সরকারে জমিদার অথবা প্রজা হিসাবে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত্ত পত্তন করিয়াছে। ১৬৯৮ সালে মুসলমান জমিস্বত্ব আইনে নির্দ্দিষ্ট খাজনায় তদানীন্তন নবাব আজিম-উল্-সান-এর নিকট কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর তিনটী গ্রামের জমিদারী স্বত্ব গ্রহণ করে। তৎপূর্ব্বে তাহারা সুতানুটীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের মধ্যে প্রজা হিসাবে জমি পাইবার আশায় স্থানীয় জমিদারের নিকট আবেদন করে। কিন্তু "because they were a powerful people" ইংরাজরা শক্তিমান এবং পরে তাহাদের দেশীয় প্রজার ন্যায় উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় বলিয়া জমিদার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইংরাজ নবাব সরকারে দরখাস্ত করিয়া সফল মনোরথ হয়। খাজনার হার,—ডিহি কলিকাতার জন্য ৪৬৮৷৴৯ পাই, সুতানুটীর ৫০১৸৶৬ পাই, পাইকান পরগণার গোবিন্দপুর ১২৩৸৶৩ পাই এবং কলিকাতা গোবিন্দপুর অংশ বাবদ ১০০৷৴১১ পাই, একুনে বাৎসরিক ১১৯৪৸৶৫ পাই, ধার্য্য হয়।

বাঙ্গালার জমি স্বত্ব আইনের একটী বিষয় এই ব্যাপারেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মুসলমান বাদসাদিগের আমল হইতেই বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি বিলি হইত এবং ইংরাজ সেই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া জমিদারী ইজারা লয়। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারা নিজ প্রজাদের নিকট খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা—,

"Received a peremptory Perwannah from the soubah (Governor) forbidding them ; in which the Soubah told them that they were presuming to do a thing which they had no power to do ; and if they persisted they would by the laws of the Empire forfeit their lands."

অর্থাৎ তাহারা নবাবের নিকট হইতে যে জরুরি পরোয়ানা পায় তাহাতে বুঝিতে পারে যে, তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের আইন বিরুদ্ধ কাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাহারা সম্পত্তি হইতে বেদখল হইবার দায়ী হইয়া পড়িতেছে।

তাহার পর ১৭১৫ সালে ইংরাজ চব্বিশ পরগণার মধ্যে আরও

আটত্রিশটী গ্রামের ইজারা লইবার চেষ্টা করে। সম্রাট ফারোকশিয়ার সম্মত হইলেও বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলি খাঁ দুরন্ত ইংরাজের আরও শক্তি বৃদ্ধি করিতে অসম্মত হন। পরে ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট এই সম্মতি লাভ করে। রাজনৈতিক গোলমালের মধ্যে তাহারা নিজের স্বার্থ একটু ভুলে নাই। পাছে পরে আপত্তি হয়, সেই কারণে ১৭৫৭ সালের ৩রা জুন তাহারা মিরজাফরের নিকট আবার সেই দলিল পাকা করিয়া লয়। পলাশী যুদ্ধের পর দখল কায়েম করে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই জমিদারের জন্য বাৎসরিক ২,২২,৯৫৮৲ খাজনা নির্দ্ধারিত হয়। ১৭৫৯ সালে ১৩ই জুলাই চব্বিশ পরগণার জমিদারী ক্লাইভকে জায়গীর হিসাবে দান করা হয়। তাহার পর ১৭৬৫ সালের ২৩শে জুন আরও দশ বৎসরের জন্য এই জায়গীরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং আরও স্থির হয়, এই মেয়াদ অন্তে সমস্ত সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আসিবে এবং মোগল রাজসরকারে আর কোনও খাজনা দিতে হইবে না।

বাঙ্গালার মসনদ লইয়া যে গোলমাল চলিতে থাকে, ইংরাজ তাহার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে। মীর কাশিমকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে তাহারা ১৭৬০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিনা খাজনায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করে এবং মিরজাফর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৭৬৩ সালের ৬ই জুলাই ইংরাজ তাঁহার নিকট ঐ পত্তনী কায়েম করিয়া লয়। তাহাতেও নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহের সম্মতি সংগ্রহ করে।

১৭৬৫ সালে বাদশাহ সাহ আলমের নিকট লর্ড ক্লাইভ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ইংরাজের নিকট নিয়মিত টাকা পাইবার আশায় বাদশাহ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনও বাঙ্গালার শাসন বিভাগে দুইটী স্বতন্ত্র প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজস্ব সম্পর্কে দেওয়ান ও রাজ্যশাসন বিভাগে নাজিম ছিলেন। ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাদশাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয় এবং এই অঞ্চলের নাজিমের সংসার খরচ বাবদে ১৭,৭৮,৮৫৪৲ এবং সমস্ত নিজামতের খরচ চালাইবার জন্য ৩৬,০৭,২৭৭৲ দিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। তখন বাঙ্গালার নামমাত্র নাজিম মিরজাফরের জারজ পুত্র নাজমদ্দৌলা; আর রেজা খাঁ—নায়েব ও দেওয়ান। নাজিমের শক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ তাহার গৃহস্থালী ও অপরাপর খরচ কমাইয়াছে।

বলা বাহুল্য কলিকাতার জমিদারী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পর্য্যন্ত সমস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ইংরাজ স্বত্বলাভ করিয়া আসিয়াছে।

পরিবর্ত্তনের চেষ্টা

খাজনার নিরিখ বৃদ্ধি লইয়া ইংরাজ একবার নবাব সরকার হইতে বাধা পাইয়া অনেকদিন নিশ্চেষ্ট ছিল। দেওয়ানী প্রভৃতি লইয়া এবং সামরিক শক্তিতে আস্থাবান হইয়া ইংরাজ নূতনভাবে জমি বিলি ও খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরাজ প্রভুর যে কয়েকটী নায়েব বা দেওয়ান নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রজার উপর অত্যাচার করার জন্য আজও নিন্দিত হইয়া আছেন। প্রথম রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে ও রাজা সীতাব রায় ১৭৭০ সালে পাটনার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। প্রজা বিলি করিবার নানা পরীক্ষা চলিয়াছে। কখনও ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের তত্ত্বাবধানে খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইয়াছে। কখনও বাৎসরিক, কখনও ত্রৈবার্ষিক বিলি করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই জমিদার ও প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছে। পূর্ব্ব মর্য্যাদাবশে যে সকল জমিদার নিজেরা ইংরাজের নিকট পত্তনী লইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা আদায়ের জন্য ইংরাজ নিজেদের মনোনীত ইজারাদার নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিনাজপুর জমিদারীতে দেবী সিংহ, রাজসাহীতে দুলাল রায় এবং বর্দ্ধমানের ব্রজকিশোর যে অমানুষিক অত্যাচার এবং জমিদারদিগের অসম্মানজনক আচরণ করে, তাহা ইংরাজ রাজস্ব বিভাগের ইতিহাসের এক অত্যন্ত মসীলিপ্ত অধ্যায়। এই সময় ইংরাজের (বোর্ড অফ রেভিনিউর) মূল দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ বর্দ্ধমান জমিদারদিগের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এমন গুরু কর চাপাইয়া যান, যাহার তুলনা অন্য কোনও জমিদারীতে আজ পর্য্যন্ত নাই।

জমিদার যাঁহারা নবাব বাদশাহ আমলে রাজ সম্মান লাভ করিয়াছেন, একের পর একটা করিয়া লোপ পাইতে লাগিলেন। এত অত্যাচারেও নিয়মিত এবং আশানুরূপ খাজনা আদায় হইল না। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা ভুল পথে চলিয়াছেন। জমিদার প্রজা কাহারও শান্তি নাই; বাঙ্গালার প্রতি চাষীই কোনও না কোনও শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের শিল্প নষ্ট হওয়ায় আয় কমিল; তাহারা নিয়মিত খাজনা দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইলেই নূতন "জমিদার" দেখা দিতে লাগিল; প্রাণপণে তাহারা ইংরাজ সরকারের খাজনা মিটাইতে এবং আপনাদের লাভের অঙ্ক ভারি করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের দুর্দ্দশা চরমে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন বৃটিশ পার্লামেণ্টের টনক নড়িল এবং আইন দ্বারা অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল। ১৭৮৪ সালে মন্ত্রী পিট এই আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক গ্রহণ করাইলেন। সম্রাট ভারত শাসনের ভার লইলেন। সাধারণতঃ প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিবার উপায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; অথচ নীলামের ডাকে খাজনা বৃদ্ধি করিয়া জমিদারি পত্তনের ব্যবস্থায়, অনিশ্চিত এবং ক্রমবর্দ্ধিত হারে খাজনা চলিতে থাকায় জমিদারকুল লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আভাষ

তখন জমিদারদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট জমায় বিলি করিবার জন্য কলিকাতা এবং পরে ব্রিটেনে বিতণ্ডা চলিতে থাকে। কলিকাতায় মিঃ/

ফিলিপ ফ্রান্সিস ইহার পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরে সেই মতই পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৭৮৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস-এর (Court of Directors) ১৭৮৬ সালের ১২ এপ্রিলের এক নির্দেশ লইয়া আসেন। সেই অনুশাসনে জমিদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের পরামর্শ দিয়া দেশের অনুপযোগী নূতন উপায় অবলম্বন করার জন্য কলিকাতার কর্ম্মকর্ত্তাদের তিরস্কার করেন। এই নির্দেশ অবলম্বন করিয়া ১৭৯০ সালে প্রথমে দশ বৎসরের মেয়াদে জমিদারদিগের সহিত জমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। তিন বৎসর যাইবার পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং আজ দেড়শত বৎসরেরও অধিক সেই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

রাজস্বের পরিমাণ

জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইবার সময় বাঙ্গালা বিহার ও ও উড়িষ্যার (মেদিনীপুর) আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ লইয়া বড়ই অসুবিধা হয়। মীর কাসিমের সময় (১৭৬২-৬৩) এক বৎসর ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, পরের দুই বৎসর মিরজাফরের আমলে ৭৬ লক্ষ ১৮ ও ৮১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আদায় হয়। অত্যাচারী রেজা খাঁ (১৭৬৫-৬৬) ইংরাজের তরফে যে খাজনা আদায় করিয়াছিল, তাহাও ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার অঙ্ক অতিক্রম করে নাই। তাহার পর ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ গেল, তাহাতেও ইংরাজের রাজস্ব কম পড়িতে পারে নাই। অত্যাচারের সাহায্যে তাহা বাড়িয়া গিয়াছে। যখন জমিদারদিগের সহিত খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইল, ইংরাজ কোনও হিসাবেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে দেখিল ১৭৯০-৯১ সালে মোট ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। কত দেবী সিং, দুলাল রায়, রাজকিশোর এবং তাহাদের "গুরুজী" গঙ্গাগোবিন্দ সিং মিলিয়া রাজস্বের পরিমাণ সকল হিসাব অতিক্রম করিয়া দাঁড় করাইয়াছে তাহা দেখা হইল না। অন্য কোনও দিকের প্রতি কোনও লক্ষ্য না রাখিয়াই জমিদারদিগের সহিত ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা খাজনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেল। রাজসম্মানের অধিকারী বহু জমিদার প্রতি সন পরিবর্দ্ধিত রাজস্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই বন্দোবস্তে সম্মত হইয়া গেলেন; প্রকৃতপক্ষে এইরূপ খাজনা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সে কথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। অধিকাংশ জমিদারদিগের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক না হইলেও বাঙ্গালা দেশের অসংখ্য প্রজা ও জমিদার তখনকার মত রক্ষা পাইয়া গেলেন।

প্রয়োজন

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এ

সকাল হইতে বিহারী মণ্ডল সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া শেষটায় নিরাশ হইয়া বাড়ির পথ ধরিল। পরিশ্রমের বেদনা বিহারীকে পীড়া দিতেছিল প্রচুর, ততোধিক পীড়া দিতেছিল তাহাকে তাহার এই বিফলতার লজ্জার গ্লানিতে। তাহাদের গ্রামে কোন স্কুল নাই, নিজে সে তাহাদের গ্রামে একটা স্কুল স্থাপনের জন্য প্রস্তাব দিয়া আসিয়াছে জমিদারবাবুর কাছে। আজ স্কুল আরম্ভ হওয়ার কথা, কিন্তু সারাটি গ্রামের কোন বাড়ি হইতেই একটী ছেলেকেও পাওয়া গেল না। নোতুন পাড়ার বাঁশবনের ধার হইতে সে শুনিতে পাইল, ওধারে দোল ভিটার সামনে কদম গাছের ছায়ায় একপাল ছেলে কলরব করিয়া খেলা করিতেছে। এতগুলি ছেলেকে এক জায়গায় হাজির পাওয়া যাইবে এবং চেষ্টা করিলে দলের ভিতর হইতে দুই একটিকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে, এই কথা মাথা...

উঠিল। কিন্তু বাঁশবনের আড়াল ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেই তাহার সমস্ত আশা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। বেহারীকে দেখা মাত্রই ছেলের দল যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইল। এক নিশ্বাসে নাম ধরিয়া বিহারী—মধু, যাদব, কেষ্ট, সুধাময়—ছয় সাত জনকে ডাকিয়া ফেলিল, কিন্তু ওপক্ষ হইতে কোন সাড়াই মিলিল না। মধ্যাহ্নের নীরবতার মাঝে বায়ুকম্পিত বেণুকুঞ্জ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর স্নেহের পরশ বুলাইয়া গেল। উদাস দৃষ্টিতে বিহারী সামনের শস্যহীন মাঠের দিকে তাকাইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিহারী কদমগাছে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। —ইস্কুল খুললে কি হবে খুড়ো, ছাত্র হবে না—বলিতে বলিতে নোতুন পাড়ার নোতুন মাতব্বর বনমালী বালা আসিয়া

বিহারী চমকাইয়া উঠিল। সহসা ফাটিয়া-পড়া বেলুনের মত চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল—হবে না কেন শুনি!

—গ্রামের কেউ ইস্কুলে ছেলে পাঠাবে না।

—আলবৎ পাঠাতে হবে। পাঠাবে না—তবে কাল এক গাঁয়ের লোক সভা ক'রে মত দিলে কেন? আমাকে আজ এমনি ক'রে জব্দ করার জন্য?

—কিন্তু গ্রামের লোক ভয় পাচ্ছে—তারা মূর্খ, তারা ত সব বোঝে না—

—বুঝুক আর না বুঝুক—জমিদারের হুকুম, এ হুকুম তাদের মান্‌তেই হবে। ইস্কুলটা কি বাপু আমার ইচ্ছেয় হচ্ছে, যে তোমরা ছেলে পাঠাবে না বলেই খালাস?

—তাদের ভয়টাই ত সেইখানে। জমিদার আর তুমি দুজনে পরামর্শ করে ইস্কুল ক'রছ। ছেলেপেলেদের ইংরেজী পড়াবে, তারা সব পর হয়ে যাবে—

বনমালীর এই অজ্ঞতায় বড় দুঃখেই বিহারীর হাসি পাইল। সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ বনমালী শুধু তাকাইয়া থাকিল বিহারীর মুখের দিকে।

পরদিন বড়তলার বাবুদের কাচারী ঘরে জমিদার রামনারায়ণ লাহিড়ী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। অপরাধীর মত মাথা নিচু করিয়া সাম্নে দাঁড়াইয়াছিল বিহারী। রামনারায়ণবাবু বলিতেছিলেন—তোমাদের নিয়ে আমাকে চ'লতে হবে। তোমাদের মানুষ ক'রে তুল্‌তে না পারলে আমার শান্তি নেই। ইস্কুল আমাকে একটা করতেই হবে, আর তোমারই যখন বেশি ইচ্ছে তখন তোমার গ্রামেই সেটা আগে হবে বিহারী!

জমিদারবাবুর এই উক্তি ব্যর্থ হইল না। রামনারায়ণবাবু নিজে গিয়া হাজির হইলেন চতুরিয়া গ্রামে। বিহারী মণ্ডলের কাচারী ঘরেই চতুরিয়া স্কুলের প্রথম উদ্বোধন হইল। বলা বাহুল্য জমিদারবাবুর ভয়ে সকলেই ছেলে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

দশ বছর পরের কথা। চতুরিয়ার সেই স্কুলের চেহারা আজ সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের অমানুষিক পরিশ্রম আর জমিদারবাবুর অযাচিত অর্থব্যয়ের ফল ফলিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের কাচারী ঘরের সেই পাঠশালা আজ আর নাই, তাহার পরিবর্ত্তে বারোয়ারী তলার দোল ভিটার পাশে প্রকাণ্ড একখানি দোতালা টিনের ঘরে আজ বসিয়াছে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। আজ আর ছাত্র সংগ্রহের জন্য বিহারী মণ্ডলকে প্রচার কার্য্যের ভার লইতেও হয় না—বা জমিদারবাবুকেও শক্তির ভয় দেখাইতে হয় না। আজ শতাধিক ছাত্র বুকে লইয়া গর্বোন্নতশিরে চতুরিয়ার স্কুল দাঁড়াইয়া আছে, নোতুন যুগের নোতুন দিনের জয় পতাকার প্রতীক।

জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে, এই স্কুল হইতেই বনমালীর ছেলে সুধাময়। আনন্দ সংবাদ বাতাসের আগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। জমিদারবাবু চতুরিয়ায় আসিয়া হাজির হইলেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কীর্ত্তনের আসর পড়িল। ঘটা করিয়া হরির লুট হইল। গানের শেষে বিহারী মণ্ডল সভায় দাঁড়াইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় বক্তৃতা করিল। এক কথাই বার বার সে বহু কথার মধ্য দিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সমাজের এই যে গৌরব, আজিকার এই যে আনন্দ উৎসব, এ সকলের মূলে গ্রামের পিতৃতুল্য জমিদার রামনারায়ণবাবু। ঘন ঘন হাততালি আর হরিধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইয়া গেল।

বনমালী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া জমিদারবাবুকে আভূমি প্রণাম করিল। সুধাময়ের মাথায় হাত রাখিয়া রামনারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—

—তুমি আরও পড়বে সুধাময়—

সুধাময় মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কিন্তু হতাশ ভাবে বনমালী বলিল—সহরের ইস্কুলে কী ক'রে ওকে পাঠাই? জানেন ত বাবু আমার অবস্থা।

—যতদূর ইচ্ছে, তুমি পড়তে থাক, আমি তোমার সব খরচ জোগাব।

জমিদারবাবু ঘোড়ায় চাপিলেন। বনমালী ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া শুধু ভাবিতেছিল।—রামনারায়ণবাবুই তার পুত্রের সত্যিকারের পিতা। সুধাময়কে শুধু সংসারে আনিবার ভারই বনমালী লইয়াছিল, কিন্তু সেই ভ্রূণ শিশুকে বড়ো করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, জমিদারবাবু নিজে।

সুধাময় তাহার চলার পথে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়কে বহু পিছনে রাখিয়া বছরের পর বছর আগাইয়া চলিয়াছে। সম্মুখে বহুদূরে তাহার দৃষ্টি।

আট বছর পরে। বি-এ পরীক্ষার পর সুধাময় তিনমাস বাড়ীতেই আসিয়া বসিয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। সকালবেলা সেদিন যেন বনমালীর কাছে তাহার বাড়িখানা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল। সে আস্তে আস্তে বিহারীর বাড়ীর দিকে চলিল।

বেগুনের চারাগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে। গাছগুলি ঘিরিবার জন্য বিহারী বাঁশ চাঁচিয়া চটা বানাইতেছিল। কাচারীর বারান্দা হইতে তামাক সাজিয়া লইয়া বনমালী আসিয়া তাহার পাশে বসিল। বিহারী গুন গুন করিয়া গান ধরিল। সে গানের দিকে বনমালীর মন ছিল না। সে বলিতে লাগিল—

—ছেলেকে কাছে পেয়েও, খুড়ো কেমন যেন ভয় ভয় করে; তার সাথে কথা কই কিন্তু সব সময়ই মনে হয়, আমার ছেলে আমার যেন কেউই নয়। সুধাময় যেন পর হয়ে গেছে। এই বাড়ি, এই ঘর, এই গ্রামের সে যেন কেউ নয়।

বিহারী বনমালীর কথার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল। অর্থহীন সে হাসি।

কাচারীর প্রাঙ্গণে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। দুজনেই ছুটিয়া সেদিকে আসিল। দেখিল, ঘোড়ার উপর বসিয়া জমিদার রামনারায়ণবাবু নিজে। বিহারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। জমিদারবাবু বলিলেন—

—সুধাময় বি-এ পাশ করেছে বনমালী, এইমাত্র আমি টেলিগ্রাম পেলাম। বিহারীর বুকখানা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বনমালী তবুও এ সংবাদে খুসী হইতে পারিল না। তাহার বুকখানা বার বারই শুধু খালি হইয়া আসিতে লাগিল।

বারোয়ারীতলায় বহু পুরাতন কদম গাছের শীতল ছায়ায় স্কুল ঘরটি। সম্মুখে দক্ষিণে দিগন্ত-জোড়া নল ময়দানের মাঠ। শ্যামল স্নেহে পরিপূর্ণ এই মাঠখানির বুক। আষাঢ়ের প্রথম। আউস ধানে পাক ধরিয়াছে। ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাটের জমিগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিস্তীর্ণ মাঠখানির একটি পাশ ঘিরিয়া দক্ষিণ সীমান্তে ক্ষীণ সরলরেখার মত বড়তলা গ্রামখানি। বিহারী আর বনমালীকে সাথে লইয়া রামনারায়ণবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন কদম গাছের ছায়ায়। রামনারায়ণবাবুর দৃষ্টি দূরে ঐ দিক্ চক্রবালের দিকে নিবদ্ধ। ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাইয়াই যেন তিনি বলিতেছিলেন—

—বলতে পার বনমালী, ক'দিন আর বাঁচব?

বনমালী বলিল—ওসব অলক্ষুণে কথা কেন মুখে আনেন কর্ত্তা?

—কিন্তু তার আগে যে একটা কাজ করে যেতে হবে। আমার চতুরিয়ার এই মাইনর ইস্কুলকে আমি হাই ইস্কুল ক'রব। আর আমার সেই ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার হবে সুধাময়। তা হ'লেই আমি হতে পারব নিশ্চিন্ত।

সেবারও সুধাময়ের পাশের সংবাদ লইয়া গ্রামের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সেবারও সভা, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন আর হরির লুটে বারোয়ারী তলা হযে উঠ্‌ল মুখরিত।

এই ঘটনার পরে আবার দশটি বছর কাটিয়া গেল। সুখে দুঃখে কাটিয়া গেছে সুদীর্ঘ এই দিনগুলি। বড়তলার জমিদার রামনারায়ণবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। চতুরিয়ার বিহারী মণ্ডল, বনমালী বালাও বুড়া হইয়া গিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে রামনারায়ণবাবুরও যৌবনে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। কত স্বপ্ন তাঁহার সফল হইয়াছে। বিফলতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে আরও কত। নিজের অর্থ, নিজের শক্তি, নিজের রক্ত নিঃশেষে অঞ্জলি পুরিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, রামনারায়ণবাবু চতুরিয়ার স্কুলের বেদীমূলে। তাই চতুরিয়ার সেই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় একদিন সত্য সত্যই পরিণত হইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সুধাময় কিন্তু হেড্‌মাষ্টার হইয়া গ্রামে আসিল না। কোন এক সরকারী অফিসে চাকুরী লইয়া সে কলিকাতাতেই থাকিয়া গেল। এই স্কুলকে লইয়া বিহারীরও উৎসাহের অবধি ছিল না। কেবল শান্তি ছিল না বনমালীর—উৎসাহ ছিল না তাহার। তাহার একমাত্র পুত্র বিদেশমুখা হইয়া গেল। তাই তাহার শুধু মনে হয়—এই ইস্কুল, এ শুধু পর করিয়া দিতেছে গ্রামের সব ছেলে-গুলোকে। তবে তাহাকে উৎসাহ যোগাইবার [illegible]

উপায় কিছু ছিল না তাহার। জমিদারবাবু নিজে গ্রামে আসিয়া বিহারীর সাথে তাহাকেও এই স্কুল কমিটির সভ্যরূপে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। বাইরের আস্ফালন দিয়া তাই তাহাকে নিয়ত গোপন করিতে হইতেছে তাহার অন্তরের আর্ত্তনাদকে।

সেবারকার শীতান্তে চতুরিয়া গ্রামে নোতুন করিয়া নোতুন বসন্তের সাড়া পড়িয়া গেল। মুকুলিত আম্রমঞ্জরী, প্রস্ফুটিত ভাঁটী ফুলের গন্ধ, বহন করিয়া আনিতেছিল যেন কত যুগ আগেকার কত পুরাতন গন্ধ। তিন মাসের ছুটি লইয়া সুধাময় বাড়িতে আসিয়াছে। তাহার উপস্থিতিতে গ্রামে যেন নোতুন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল। রোজ সন্ধ্যায় স্কুলে, কাচারীতে, খেলার মাঠে সভা বসিতে লাগিল। বিহারী, বনমালীকে কিন্তু কেউ ডাকে না সে সভায়। নোতুন যুগের নবীন ছেলেদের উৎসাহদীপ্ত জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় সভা প্রাঙ্গণ। বনমালী উদাসকণ্ঠে তাই সেদিন বলিতেছিল—

শুনেছ খুড়ো, সুধাময় কী সব বলে বেড়াচ্ছে আজকাল?

বিহারী সবই জানিত, বলিবার মত কিছু না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। পুরণো দিনের কথা মনে পড়িতেই তাহার বুক চিরিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

বনমালী বলিতে লাগিল—সুধাময় ব'লে বেড়াচ্ছে, এই ইস্কুল আমাদের, আমাদের ছেলেদের দেওয়া মাইনে নিয়েই এই ইস্কুল চল্‌ছে। অন্য গ্রামের অন্য লোক কেন এসে এ ইস্কুলে মাতব্বরী ক'রবে? দক্ষিণ পাড়ার নবীন রায় রামনারায়ণবাবুর সমান টাকার লোক। রামনারায়ণ-বাবুকে বাদ দিয়ে তাকে করা হবে এবার ইস্কুলের সেক্রেটারী।

বিহারী শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

স্কুলের মাঠে প্রকাণ্ড সভা বসিয়াছে। সভাপতির আসনে বসিয়াছিলেন মাননীয় মহকুমাপতি। তাঁহার একদিকে এক চেয়ারে সুধাময়। অপর দিকের চেয়ারে রামনারায়ণবাবু। রামনারায়ণবাবুর পাশে বিহারী আর বনমালী পাশাপাশি বসিয়াছিল। সুধাময় বক্তৃতা দিতে উঠিল—

—বাইরের জগৎ আজ জেগে উঠেছে। যার যার নিজের পথ, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে নেওয়ার দিন আজ এসেছে। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লে চলবে না আজ। বন্ধুর মুখোস পরে উপকার যারা ক'রে আস্‌ছে এতদিন, পরোক্ষে তারা তোমাদের প্রাণশক্তিকে চুষে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের এ সর্ব্বনাশের দিকে আজ চোখ দিতে হবে—

ঘন ঘন হাততালির মধ্যে সুধাময় তাহার বক্তব্য শেষ করিল। রামনারায়ণবাবু বিহারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সুধাময় কিন্তু বেশ দু'কথা বল্‌তে শিখেছে।

বিহারী আর বনমালী দু'জনেই তখনও যন্ত্র-চালিতের মত হাততালি দিতেছিল। রামনারায়ণবাবুর কথায় এতক্ষণে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল।

সভ্যপদপ্রার্থীদের ভোট গ্রহণের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিহারী আর বনমালী সবিস্ময়ে দেখিল—রামনারায়ণ বাবুর নাম সভ্য পদ হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

সভা শেষ হইল। রামনারায়ণবাবু গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। বনমালী আসিয়া প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। রামনারায়ণবাবু সুধাময়ের পিঠে হাত রাখিয়া ক্ষণিক পরে একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—তুমি ভাবছ সুধাময়, আমি হেরে গেছি, না? কিন্তু আমি যে আজ কত বড় বিজয়গর্ব্বে ফিরে যাচ্ছি, সেটা তুমি বুঝবে কিছুদিন পরে। বিহারীর উদ্দেশ্যে বলিলেন—আমি তা হ'লে যাই বিহারী।

বিহারী নির্ণিমেষ-নেত্রে অপস্রয়মান পাল্কীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মনে মনে ভাবিল—চতুরিয়ায় আসিবার প্রয়োজন রামনারায়ণবাবুর ফুরাইয়া গিয়াছে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জনশূন্য। দিনান্তের আবছা অন্ধকারে সেই কদম গাছের তলায় বসিয়াছিল শুধু বিহারী আর বনমালী। বিহারী আর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বনমালীর হাত ধরিয়া কহিল—চল বনমালী আমরাও যাই, আমাদের কাজও ত শেষ হয়ে গেছে।

দুজনে চলিতে লাগিল। তাহাদের কাণে ভাসিয়া আসিল বহুদূরের স্তব্ধ প্রান্তরের মধ্য হইতে রামনারায়ণবাবুর পাল্কীর বেহারাদের চন্দ্রারপথের একটানা গান।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভয়-বাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সাহসের বাণী মুক্তির বাণী। মুক্তিপথের যাত্রী, চিত্তে শঙ্কার বিভীষিকা পুষে অগ্রগমন করতে পারে না। স্বাধীনতা-কামীর অন্তঃকরণ নির্ভীক হওয়া চাই। তাই ভীত, ত্রস্ত এবং নিষ্পেষিত স্বদেশবাসীর পক্ষ হ'তে কবি প্রার্থনা করেছিলেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোক-ভয়, রাজ-ভয়, মৃত্যু-ভয় আর।

কারণ চির অবমানিত, অন্তরে বাহিরে দাসত্বের রজ্জুতে বাঁধা, সহস্রের পদপ্রান্ততলে লুণ্ঠিত, চিরদিন মনুষ্য-মর্য্যাদা গর্ব্ব বর্জ্জিত সলজ্জ মানুষ নরু হ'তে পারে না। তাই কবির প্রার্থনা—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

রাজ ভয়, লোক-ভয় বা মৃত্যু-ভয় পরিহারের উপদেশ সাধারণ। কোনো গুরুতর কার্য্য মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে সম্পাদিত হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব মাত্র শব্দঝঙ্কারে বা ভাষার দ্যোতনায় নয়। তিনি এ তিন ভয় বিসর্জ্জনের সপক্ষে আধ্যাত্মিক হেতুর যুক্তি দেখিয়েছেন। লোক ভয় কোন্ লোকের ভয়? যাঁর সঙ্গে চির-দিবসের পরিচয় তিনি যে সনাতন সর্ব্বাশ্রয় লোক-পাল। তাঁর পরিচয়ে মর্ত্ত্য-জগতের লোকের ভয় ভিত্তি-হীন কুহেলিকা। রাজ-ভয়ও অলীক। কারণ—

জগতের যত রাজা মহারাজ   কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ
সকালে ফুটিছে সুখদুঃখ লাজ, টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

আসল কথা, রাজ-রাজেশ্বর ভগবান

যার বিরাজে অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়—স্বাধীন সে বন্দীশালে।

মৃত্যুভয় আবার কি? তিনি যে অমৃত। এ দুদিনের প্রাণ তাঁরি দান।

দু'দিনের প্রাণ—
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান?
এত প্রাণ-দৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রবো?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি। বিশ্ব-প্রাণের সমাচার যুগ-যুগান্তর তাঁর জন্ম-ভূমির সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করেছে। সেথায় তার নির্ভীকতার উৎস মুখ। সাহস অবিবেচকের অসার দুঃসাহস মাত্র নয়। এ সাহসের বিশদ হেতু পাওয়া যায় অন্য গাথায়। নির্ভীকতা, আত্ম-মর্য্যাদা, পৃথিবীর তুচ্ছ মান বা সম্পদের ভ্রান্ত-গর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ—

মোর মনুষ্যত্বসে যে তোমারি প্রতিমা
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

সুতরাং প্রবলের প্রভুত্ব আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করলে, অবমাননা হয় আত্মার মহিমার। অত্যাচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ নিজের তুচ্ছ ব্যক্তিত্বের অহমিকা বা দম্ভ নয়। আত্মার মহিমা শাশ্বত। অতএব—

সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্ব মহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেব-দ্রোহী ব'লে
সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর।

পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা-যজ্ঞের মহাপ্রাণ হোতাদের সাথে একমত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতের ঋত্বিক কবি। মানুষ মানুষের উদ্ধত দম্ভের নিষ্পেষণ কেন সহ্য করবে? কেন করবে না তার কারণ বিবৃত করেছেন উভয় ভূখণ্ডের নরের হিতকামীরা বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। সে কারণের উৎস-মুখের সন্ধান পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে।

অবদমিত জন-গণ-মনের মুক্তির সাধক রৌসো, তার দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মানুষের আদিম অধিকারের ভিত্তিতে। মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মেছে, তার মুক্তির দাবী সহজ। তাঁর প্রাণে ও লাঞ্ছিত, পদানত, দীন-প্রাণ-দুর্ব্বলের চির-পেষণ যন্ত্রণা অরুন্তুদ মর্মবেদনা সৃষ্টি করেছিল। মুক্তি অভিলাষী জর্জ্জ ওয়াশিংটন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দাম্ভিক শাসন অবলুপ্তির মানসে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁরও যুক্তির মূলে ছিল মানুষের অধিকার, নাগরিকের ন্যায্য রাজনৈতিক মুক্তি। কার্ল মার্ক্স মানুষের প্রাণশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতির হিসাব নিকাশের ফলে সাম্যের দাবীর অমোঘ যুক্তি দেখিয়েছেন। মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার ক'রে লেনিন রুশিয়ার মুক্তি সাধন করেছেন। এঁদের চিত্তের কৃপা এবং সমরনিষ্ঠুরতা প্রশংসনীয়। এঁরা বরণীয়, এঁরা স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সাম্যের নির্দেশে লেনিনবাদী বা মানবের কোনো হিতৈষী মলিনতা লক্ষ্য করবার অবকাশ পাবে না।

বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী, বারেকের তরে ভুলাও জননী—
কে বড় কে ছোট, কে দীন কে ধনী, কেবা আগে কেবা পিছে।
কার হ'ল জয়, কা'র পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়, কেবা আগে কেবা পিছে।

অবশ্য রাজনীতির প্রসঙ্গে একথা বলা হয় নি। এ সরস্বতীর বন্দনা। বিশ্বার আদর্শ যদি এই শুভ চিত্তবৃত্তি হয় তা'হলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। সেই তো উদার অভয় বাণী, মুক্তির বাণী। কবির আদর্শ—

গাঁথা হয়ে থাক্ এক গীতিরবে, ছোট জগতের ছোট বড় সবে

সুখে পড়ে থাক্ পদপল্লবে যেন মালা একখানি।

বলছিলাম, পাশ্চাত্য দেশ-হিতৈষী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই সাম্যবাদী, নরের মুক্তির দাবীদার, কিন্তু পাশ্চাত্যের দাবী নরের পক্ষ হ'তে,তার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সেই অধিকার—প্রয়াস মানব-আত্মার মুক্তির কামনায়। নরনারায়ণ। পুণ্য-তীর্থ ভারতবর্ষে প্রথমে তিনি দু'বাহু বাড়ায়ে নর-দেবতারে নমস্কার করেছেন !

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর পুণ্য মাতৃ-ভূমির সংস্কৃতিতে।

হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি

ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি।

পৃথিবীর সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। অত্যাচারীর প্রতাপ হাস্যাস্পদ বাতুলতা। ভারত শিখায়েছে, নরদেহ আত্মার মন্দির। নরের অবমাননায় দেবতার অবমাননা। আত্মা দুর্ব্বলের লভ্য নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো। তাই কবির অভয় বাণীর সুর উদাত্ত। তাই নিজের প্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন স্বদেশবাসীকে উপনিষদের বাণীতে। মুক্তকণ্ঠে তিনি দেশবাসীকে নিভয়ে বলতে উপদেশ দিয়েছেন—

ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত

মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো।

যারা অমৃতের সন্তান, মানুষের দম্ভের বিলাসে তাদের কী ভয় ? অতএব মানবের অধঃপতনে কবি মহতী বিনষ্টির বিভীষিকার করাল ছায়ায় শিহরেছেন। দাসত্ব রজ্জুতে বাঁধা যার অন্তর বাহির, তার পক্ষে মুক্তির সাধনা অসম্ভব। বাঁধন খুলতে সাহস চাই। কারণ এ বাঁধন ছেদন, মাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকার লাভ নয়—তার পটভূমিতে আছে আত্মার চরম মুক্তির সঙ্কেত। তাই রাজাধিরাজ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলেছেন—

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি

অপমান অবিচার সহ্য করে যদি

তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়

দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়। দুর্ব্বল আত্মায়

তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ় নিষ্ঠা ভরে।

কবি বহু গানে, নানা ছন্দে, অশেষ মনোরম ভঙ্গিতে, আত্মার মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। মুক্তি কেবল সাম্রাজ্যবাদের বন্দী-শালা হ'তে নয়। আত্মা মুক্তি চায় সকল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হ'তে। রাষ্ট্রে সমান অধিকার না থাকিলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম হয় বৃথা। বৃক্ষের ভূমি—বন্দী শালা হ'তে উদ্ধারে তিনি উল্লসিত। স্বপ্ন-ভাঙ্গা নির্ঝর যখন মুক্তির কামনায় পাগলের প্রায় মেতে উঠ্‌লো, তারও মুখে ফুটলো অভয় বাণী—

ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙরে বাঁধন,

সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর পরে লহরী তুলিয়া

আঘাতের পরে আঘাত কর।

যে কবি জড় নির্ঝরকে অভয় বাণী শুনিয়েছেন, তিনি স্নেহার্ত্ত জননী বঙ্গভূমিকে বড় অভিমানে বলেছেন—

সপ্তকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি

রেখেছ বাঙালী করি মানুষ করনি।

কবির মাতৃ-ভক্তি সু-গভীর, তাই মায়ের সন্তানের সদা সহায়তার আবেগে কবির প্রাণ ভরপুর। তিনি বাঙলার দিগন্ত-প্রসার ক্ষেত্রের উদার শান্তি ভালবাসতেন। তাই বলেছেন—

করো আশীর্ব্বাদ

যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ

তখনি তোমার কাজে আনন্দিত মনে

সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

কেবল পরাধীনতার ফাঁসই ভারতবাসীর অগ্রগমনে প্রতিরোধক নয়। বহু নিরর্থক শাসন অনুশাসন সমাজকে পঙ্গু করেছে। কর্ম্মের অন্তরাত্মা বিদায় নিয়েছে, অবশিষ্ট আছে বাঁধনের দড়ি। দেশ, মান, পাত্রের উপযোগিতা আজ সমাজ বিস্মৃত। বলেছি রবীন্দ্রনাথের মুক্তির সঙ্কেত, আত্মার মুক্তির প্রয়াসে। যেমন আত্মা বলহীনের লভ্য নয়, তেমনি

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

স্বরাজ্য সাধনা স্বাধীন চিত্তের অনুবর্ত্তিনী শক্তি সাপেক্ষ। ভক্তি মার্গেরও সেই কথা। কবিরাজ গোস্বামী মনোরম ভাষায় শুদ্ধা ভক্তির পরিপন্থী আচারের বাঁধন নির্দেশ করেছেন। একান্ত আন্তরিক পরিশ্রমে ভক্তিলতার পরিপুষ্টি। উপশাখার কবল হ'তে তাকে সংরক্ষণ না করলে, আশ্রিত-লতার মূল-শাখা শুষ্ক হয়।

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা

ভুক্তি মুক্তি শাখা যত অসংখ্য তার লেখা।

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ

যে সকল শাখা উপশাখা বাড়ি যায়

শুষ্ক হইয়া মূল-শাখা বাড়িতে না পায়

প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন

তবে মূল-শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।

আমাদের বহু দেশাচার প্রাচীন। যে কালে তারা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল, তাদের উপযোগিতা ছিল সে যুগে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না ক'রে মাত্র বাহ্যিক বিধান মানা জ্ঞান বা বলের প্রসারের পরিপন্থী। ধানের শাঁস ফেলে তুঁষ খেলে দেহ পরিপুষ্ট হয় না। তেমনি নিরর্থক বিধানের নিগড় উন্নতির অন্তরায়। গুরু বলেছিলেন—

ফলমূল খাকে হরি মিলেতো বাদুড় বান্দর হোই
নিত নাহনেসে হরি মিলেতো জলজন্তু হোই

তুলসীদাস বলেছিলেন—

পাথর পুজনে হরি মিলে তো ম্যঁয় পুজে পাহাড়।

সত্যই

বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ-লালা।

কবি রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন যে নিরর্থক দেশাচারের বাঁধন অনর্থকর। তাদের অত্যাচারও পেষণ-যন্ত্রণা বাড়ায়।

দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা গতি-পথে বাধা
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

কবি সত্যই বলেছেন—

কর্ম্মেরে করেছ পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছ হত শাস্ত্র কারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছ সঙ্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে।

ধর্ম্ম-দর্শনই তো আধ্যাত্মিক বাণী। হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য এইখানে। সামাজিক অনুশাসন সবাই মানে। কিন্তু মনের উন্নতি বা জ্ঞানের প্রসার হয় মুক্ত চিন্তা ধারায়। তাই অধিকারী ভেদের ব্যবস্থা, স্বরাজ্য সিদ্ধির আয়োজন। কবির বলেছেন—

সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ
তব্ কয়লা কী ময়লা ছোটে যব আগ ক'রে পরবেশ।

হজরত আলি বলেছেন—

মন্ আরাফা নফ্সে ফকদ্ আরাফা রব্বে।

যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাই প্রাণে সুরের আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন।

উন্নতির পথ প্রদর্শক বরণীয়। কিন্তু সাধনা প্রত্যেক মানুষের নিজের ধর্ম্ম। কর্ম্মের অবহেলায় মানুষ বৃক্ষ-সম হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের নিজের প্রাধান্যের বাণী প্রচার করেছেন

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসন-ভার, হে রাজাধিরাজ।

তাই তিনি অভয় বাণী শুনিয়েছেন

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য গদ্যে পদ্যে, স্পষ্ট কথায়, উপমায়, সঙ্কেতে ও ইঙ্গিতে স্বাধীনতার অভয়-বাণীতে পরিপূর্ণ। স্বাধীনতা চাই মনের। বিলাস-বাসনা স্বাধীনতার উপাধি নয়। ভারতের জীবন সরল, ভাবনার পথ উদার। তার ভাষা মিষ্ট, অন্তরে শোনে সে উদাত্ত স্বর। মাভৈঃ তার ইষ্ট মন্ত্র। কবির কথায় বলি—

কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তি মদমত্ত এই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা মথিত নকল রত্নকে কবি হলাহল বুঝেছিলেন। তাই তার উক্তি—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।

আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে নটরাজের বাঁধন খোলা, বাঁধন পরার দিন আগত ঐ। আজ চাই দুর্দমনীয় সাহস। আজ আত্ম-অবিশ্বাস কঠিন ঘাতে নাশিতে হবে, পুঞ্জিত অবসাদ ভার অশনি পাতে হানতে হবে। আজ বলতে হবে—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগবো আমি দাও মোরে সেই কান।

বল্তে হবে—

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।

আজ যদি অগ্রগতির ডাকে কেহ না সাড়া দেয়, রক্ত-মাখা চরণতলে পথের কাঁটা দলতে হ'বে।

যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর্য্য মহাস্থবির একটু অধীরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ও কিঞ্চিৎ কঠোরতা দেখাইয়া বলিলেন, "ভীরু কাপুরুষ! মিথ্যা কথায় কি তোমরা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়াছ ?"

—আমি সত্যই বলিতেছি !

—ঘটনার সমাবেশে তোমার সকল কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি তোমাকে প্রশ্ন করিলে বৃথা সময় নষ্ট হইবে। কীর্ত্তিবর্ম্মণ, ইহারা যে সকল নিদর্শন ইহাদের অভিযানের পথনির্দ্দেশক সঙ্কেতরূপে বা ইহাদিগের অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধান কার্য্যের নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে অভিযান পথে ও বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল সে সকল সংগৃহীত নিদর্শনাদি কোথায় রক্ষিত আছে ?

কীর্ত্তিবর্ম্মণ, গৃহকোণে রক্ষিত একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত পোট্টলিকা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "সংগৃহীত নিদর্শন সকল ঐ বস্ত্রাবৃত পোট্টলিকায় রক্ষিত আছে।"

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "ইহারা ত স্বেচ্ছায় আপনাদিগের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছি। ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু অবগত হইয়া ভবিষ্যতের কোনও রূপ অনাগত বিপদের পথরোধের প্রচেষ্টায় অবহিত হওয়া আবশ্যক।"

কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল, "আমি সংগৃহীত নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাদের আবাসস্থলের নির্দ্দেশ পাইয়াছি। জানিয়াছি যে, ইহারা এক বাটীতেই বাস করে এবং আমি মন্ত্ররক্ষা-বাহিনীর পঞ্চদশ কর্ম্মীকে, একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে ইহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়াছি। ইহাদের আবাসস্থলে গিয়া যাহা কিছু ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতির সম্বন্ধে নিদর্শনাদি পাওয়া যায় এবং ইহাদের তৈজসপত্রও লুণ্ঠন করিয়া আনিতে বলিয়া দিয়াছি। তাহারা সকলেই মুখচ্ছদ ধারণ করিয়া গিয়াছে। তাহারা অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ অনুমান হয়।"

এমন সময়ে প্রেরিত মন্ত্ররক্ষামণ্ডলীর কর্ম্মীগণ অধ্যক্ষের সহিত বন্দীদিগের বাসস্থানের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা যে কক্ষে বসিয়াছিলাম তাহারা সে কক্ষের দ্বার সম্মুখের প্রাঙ্গণে আসিয়া সামরিক রীতিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং আমাদিগকে সামরিক রীতিতে অভিবাদন পূর্ব্বক একে একে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখচ্ছদ-গুলি খুলিয়া গৃহকোণে অবস্থিত একটা দারুনির্ম্মিত আধারে রক্ষা করিল, অতঃপর একে একে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহারা বাহিরের প্রাঙ্গণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং কীর্ত্তিবর্ম্মণের তূর্য্যধ্বনির সহিত তাহারা, একে একে সকলে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। রহিল কেবল মন্ত্ররক্ষামণ্ডলীর নেতা চণ্ড সেন। সে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সমূহ কক্ষতলে রক্ষা করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মণের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কীর্ত্তিবর্ম্মণ তাহাকে বলিল, "তুমি এখন এইখানেই থাক!"

কীর্ত্তিবর্ম্মণ চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "চণ্ডসেন, কোনওরূপে কেহ তোমাদের চিনিতে পারে নাই ত ?"

চণ্ডসেন উত্তর দিল, "না, কেহই আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই—এইরূপ ত আমার অনুমান হয়।"

—কেহ কি তোমাদের বাধা দিয়াছিল ?

—হাঁ, দুইজন আমাদের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের যবন বলিয়াই মনে হয়। আমরা তাহাদের মুখ, হাত, পা ও চক্ষু বাঁধিয়া জড়পিণ্ডের মত ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদেরই বস্ত্রে তাহাদের বাঁধিয়াছি।

এই দুইজন বন্দী একই স্থানে এবং একই গৃহে বাস করে?

—হাঁ, ইহারা একই স্থানে এবং একই গৃহে স্বতন্ত্র কক্ষে বাস করে।

—ইহাদের কাহারও কি কোনও আত্মীয়-স্বজন সেখানে আছে?

—গৃহে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল—তাহাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের সহিত আমাদের কোনও কথা হয় নাই। আমরা পরস্পরের মধ্যে আমাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম; কেহ তাহা শুনিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারে নাই।

আমি চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের—এই বন্দীদের—পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ কি?"

চণ্ডসেন বলিল, "হাঁ, ইহাদিগের গৃহে বা আবাসস্থলে সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যেই ইহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে।"

—ইহাদের কি নাম বল ত!

—ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ডেমিট্রিঅস্, অপরের নাম থিওফিলস্—তবে কে ডেমিট্রিঅস এবং কে থিওফিলস্ তাহা আমি বলিতে পারি না।

আর্য্য মহাস্থবিরকে আমি বলিলাম, "ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বোধ হয় আর কিছু আবশ্যক করে না। ইহারা যে গুপ্তচর ও যবন এবং ইহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও মন্ত্রভেদ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

বিচার সভার সকলেই আমার সহিত একমত হওয়াতে আমি পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিলাম, "গুপ্তচরের যে চরম শাস্তি, ইহাদিগকে তাহাই দেওয়া হউক। ইহাই আমার প্রস্তাব।"

আমি আর্য্য মহাস্থবিরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি মত?"

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সংঘ যেরূপ যুক্তিযুক্ত ও যথাবিধি বিবেচনা করিবেন আমার তাহাতে অন্যমত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।"

আমাদের মধ্যে শেখর অর্থশাস্ত্রবিদ্ রাজনীতিবিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি সম্বন্ধে পারদর্শী সুপণ্ডিত। সে তাহার এই আলোচনায় তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। আমি বিচার সংঘের অনুমোদনক্রমে শেখরকে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ দিলাম।

শেখর ইহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল বিবৃতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিল, "ইহাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা ইহাদের সপক্ষে কোনও প্রকার দোষ স্খালনের যুক্তি বা বিবৃতি নাই। ইহাদের গৃহ হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী ও পত্রাদি হইতে ইহাদের অপরাধ ও ইহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ সপ্রমাণ করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "তবে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের চরমদণ্ড সম্বন্ধে বিচার সংঘের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব কর। আরও এই সকল সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী যাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাদেরই বা কি ব্যবস্থা করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও একটা প্রস্তাব বিচার সংঘের নিকট আলোচনার জন্যও উপস্থাপিত করা আবশ্যক। তাহাও তুমি কর।"

শেখর কিছুক্ষণ মৌন ছিল—বোধ হয় বিচার্য্য বিষয়গুলি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে শেখর বলিল, "শত্রুদ্বারা মন্ত্রভেদ উদ্দেশ্যে নিযুক্তকারের শাস্তি প্রাণদণ্ড—ইহাই দণ্ডনীতির ব্যবস্থা এবং তদনুসারে আমি বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিতেছি এবং আরও প্রস্তাব করি যে, সংগৃহীত দ্রব্যাদিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া নিশ্চিহ্ন করা হউক। তাহা না করিলে আমাদের ত্রাণ সংঘের বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

বিচার সংঘের সকল সদস্যই এই দুই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন। আরও স্থির হইল যে বন্দীদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড বিধান করা হইবে এবং সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ অগ্নিদাহ করিয়া তাহাদিগের ভস্মরাশি ইহাদের দেহাবশেষের সহিত এই বিধ্বস্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত একটা গভীর জলহীন কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি দ্বারা এই পুরাতন কূপটাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে।

বন্দীগণের হস্তপদ পুনরায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ধ্বংসস্তূপের প্রান্তে পুরাতন একটা শুষ্ক কূপের নিকট

প্রস্তুত করা হইল। অস্ত্রাগার হইতে দুইটি শাণিত কুঠার আনীত হইল এবং ত্রাণসংঘের দুইজন সদস্যকে এই প্রাণদণ্ড বিধানের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইল। চল্লিশজন অপর সদস্য খনিত্র গ্রহণ করিয়া, বন্দীদিগের মৃতদেহ কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, মৃত্তিকারাশি ও প্রস্তরখণ্ডসমূহদ্বারা ঐ কূপ পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল। সংগৃহীত দ্রব্যসমূহে অগ্নি প্রদত্ত হইল এবং উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করিবার জন্য বাহিনীর একজন সৈন্য নিযুক্ত হইল।

স্বল্পকাল মধ্যে সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। বন্দীদিগের শাস্তি বিধানের সময় তাহাদের মুখের ও চক্ষুর বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সভয় কাতর চীৎকারে সেই ভগ্নাবশেষ প্রাচীন দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাও নিতান্ত অল্পক্ষণের জন্য। শাণিত কুঠারের আঘাতে তাহাদের জীবনের সহিত সেই করুণ ক্রন্দনও শেষ হইয়া গেল।

বন্দীদিগের মৃতদেহ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যসমূহের ভস্মরাশির সহিত মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ডসমূহ দ্বারা কূপ পূর্ণ করা হইল। চল্লিশজন সদস্যের দ্বারা এই কূপ পূর্ণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আমরা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলাম যে, অদ্য রজনীতে বাহিনী পরীক্ষণ স্থগিত থাকুক। চারদিগের অনুসন্ধানে অদ্য ক্ষত্রপ কর্ম্মচারাদিগের এই বন মধ্যে আগমন অসম্ভব নহে।

এখানকার কার্য্য শেষ হইলে শেখর তূর্য্যধ্বনি করিল। একজন নায়ক আসিলে তাহাকে বলিল যে, বিশেষ কারণ-বশতঃ অদ্য বাহিনী পরীক্ষণ হইবে না। সে বাহিরে গিয়া তিনবার বংশীধ্বনি করিল। পরীক্ষণ প্রাঙ্গণে সমবেত প্রায় পঞ্চশত বাহিনীসদস্য নিঃশব্দ ছায়ার মত কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিত জ্যোৎস্নালোকে বিলীন হইয়া গেল। আমরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তখন যামিনী দ্বিপ্রহরের প্রথম পাদে উপনীত হইয়াছে।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে মন্ত্ররক্ষা
নামক পঞ্চদশ বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

বাংলার মাছ ও মাছধরা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম্-এস্‌সি

"মাছ ত কেবল জলেই করে না খেলা
খেলে বাঙালীর স্মৃতিসরে সারাবেলা।"—মাটির মায়া।

বাংলাদেশে নদী, নালা, খাল, বিল, ডামস, কোল, নর্দামুখ প্রভৃতির প্রাচুর্য্যবশতঃ এখানে যত বিভিন্ন প্রকারের অপর্য্যাপ্ত মাছ দেখা যায় ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাহা লক্ষিত হয় না।

চিংড়িকে সচরাচর মাছ বলিলেও উহা যে প্রকৃত মৎস্যশ্রেণীভুক্ত নয় তাহা অনেকেই জানেন। এই চিংড়ির মধ্যেও যে অনেক শ্রেণী আছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মাছের মধ্যে সাধারণতঃ দুই ভাগ করা যাইতে পারে—আঁইশযুক্ত এবং আঁইশহীন মৎস্য।

কই, রুই, কাতলা, ইলিশ প্রভৃতি অধিকাংশ মৎস্যই আঁইশযুক্ত, পক্ষান্তরে সিঙ্গি, মাগুর, আড় প্রভৃতি মৎস্য আঁইশহীন।

আমাদের পরিচিত মাছগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

ডানকানা, পুঁটি, মৌরালা, সরলপুঁটি, তিনকাঁটা, খলসে, কই, টেংরা, রামটেংরা, আড়, চেলা, ভেদা বা মেনি, বাটা, ফ্যাসা, কাজলি বা বাঁশপাতা, খয়রা, খরসোলা, সোল, গজার, টাকি, শিঙ্গি, মাগুর, পারসে, তপসে, ভেটকি বা কোরাল, ইলিশ, রুই, কাতলা মৃগেল মহাশোল ভোল, রিঠা, চাঁদ, পাঙ্গাস, বাগাড়, বোয়াল, গুরজালি, পাবদা, ফলি, চিতল, গাংদাঁড়া বা স্বর্ণ খিড়কি, কালবোস, বাচা, ভাঙ্গন, কুঁচো, বাইন, চাঁদা ও পিয়েলি বেলে প্রভৃতি। সবত স্থানভেদে উল্লিখিত অনেকগুলি মাছের স্বতন্ত্র নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে এই প্রবন্ধ দেখিয়া মনে করিতে পারেন লেখক কি লিখিতব্য বিষয় খুঁজিয়া পাইলেন না যে এই অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে চাই বর্ত্তমানে দেশে দুধ ঘি যেরূপ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রাণে বাঁচিতে হইলে মাছের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দুধের অভাব মাছের দ্বারা যতটা পূরণ হইতে পারে অন্য কোন সহজপ্রাপ্য খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে তাহা সম্ভবপর নয়। শিঙ্গি, পারসে, বাঁটা, মাগুর প্রভৃতি মাছের আমিষ পদার্থ দুধের আমিষ পদার্থের মতই সহজপাচ্য ও উপকারী বলিয়া খাদ্যবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ কালিপদ বসু মহাশয় এবিষয়ে বহু পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমিষ পদার্থের প্রধান কাজ আমাদের শরীরের আমিষ অংশ অর্থাৎ [illegible]

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

না:—রঞ্জু সত্যিই আর ওদের দলে নয়। ওরা সত্যই বদ ছেলে, খারাপ ছেলে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মনসাতলায় মার্বেল খেলা চলছে। শব্দ উঠছে ঠকাস্ ঠকাস্। তেম্নি উল্লসিত চীৎকার কানে আসে: উড্ডু কিপ্, হাত ইস্টেট—অল্—ফিপ্টিন—টুয়েন্টি—

ভোনা ডাকে, রঞ্জু—রঞ্জু—উ—উ—

মন ছল ছল করে ওঠে—প্রতিজ্ঞা বুঝি আর টেঁকে না। কিন্তু নিজেকে সাম্লে নেয় রঞ্জু। তারপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে বাড়ির ভেতরে, খিড়কি দুয়োর পেরিয়ে এসে বসে নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। নিজের নিঃসঙ্গতাটাকে কেমন ভালো লাগতে সুরু করেছে আজকাল। বাতাবী গাছের ছায়ায় বসে হলদে পাখির ডাক শোনে, নিজের মনে ব্যাঙের ছাতাগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে, একটুকরো বাঁকারি কুড়িয়ে নিয়ে ওগুলোর তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে দেখে রাজছত্রের নীচে সত্যি সত্যিই কোনো ব্যাঙ্ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে কিনা।

তারপর আস্তে আস্তে এই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে নিজের একটা নতুন রূপ আবিষ্কার করল রঞ্জু। দুপুরের রৌদ্রে আমবাগানের আড্ডাটা তাকে ডাকল না, ওই রৌদ্রটাই তাকে ডাক দিলে। ঝরাং ঝরাং শব্দ করে যেদিকে কাটিহারের গাড়িগুলো চলে যায়, সন্ধ্যেবেলায় গাঁয়ের লোক শহরের কাজকর্ম শেষ করে জুতো হাতে করে যেদিকে জঙ্গলে ঘেরা মেঠো পথটা দিয়ে অদৃশ্য হয়, আশ্চর্য স্বরে ডাক দিয়ে যেদিকে হলদে পাখি উড়ে যায়—শহর ছাড়িয়ে সেই বুনো বিশৃঙ্খল অজানা রাস্তাটা রঞ্জুর নাড়ীতে নাড়ীতে একটা দুর্বার আকর্ষণ জাগিয়ে তুলল।

রঞ্জু শুনেছে, ওই পথের শেষে, অনেক দূরে আছে কাঞ্চন নদী। বৃষ্টি ধোয়া ভিজে আকাশের মতো ছলছলে নীল তার জলের রঙ, তার পাঁচ হাত নীচে নুড়িগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার দুধারে অনেক দূর অবধি সাদা বালি ঝক ঝক করছে, সেই মিহি মখমলের মতো নরম বালির ওপরে বক আর কাদাখোঁচার পায়ের ছাপে যেন আল্পনা আঁকা। অজস্র বঁইচির বন সেখানে যেন ফলে ফলে একেবারে ভেঙে পড়তে চায়। তার ওপর দিয়ে রেলের মস্ত বড় পুল—কেউ বলে এক মাইল, কেউ বলে আধ মাইল লম্বা।

ছোট নদী কাঞ্চন—নামটির মতোই মিষ্টি। তবু ওই নদীটাকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত ভয়ের সংস্কার আছে লোকের মনে। তার আশেপাশে বহুদূর জুড়ে একটা নির্জনতা থম থম করে। লোকে বলে কালী বাস করেন নদীর জলে। লোহার পুলটার ঠিক মাঝখানে—যেখানে বড় বড় থামগুলোকে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ী নদীর জল গর্জন জাগিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানে নদীর মস্ত একটা দহ আছে। আর সময়ে অসময়ে সেই দহ থেকে নাকি বিশালকায় একখানা কালীমূর্তি ভেসে ওঠে জলের ওপরে। লক লক করছে তার রক্তাক্ত দীর্ঘ জিহ্বা, তার হাতের খড়্গ থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অমন শান্ত নিস্তেজ নদী তাই প্রতি বছর দুটি একটি করে নরবলি নেয় দেবীর তৃপ্তির জন্যে, অতি সতর্ক সাঁতারুও কেমন করে যে নদীর জলে ডুবে মরে এ একটা আশ্চর্য রহস্য।

লোকে আরো বলে, এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস পুরোণো—যখন এদিকে প্রথম রেলের লাইন হয় সেই তখনকার কাহিনী। তখন কাঞ্চন নদী এমন করে মরে যায়নি। তার স্রোত ছিল প্রচণ্ড, তার গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মণ পাথর ঢেলেও

কোম্পানি নদীকে কাবু করতে পারল না। স্রোতের মুখে কুটো পড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই রাশি রাশি পাথর কোথায় যে ভেসে যেতে লাগল তার আর ঠিক ঠিকানাই নেই।

তখনকার দিনে ইংরেজ এমন ম্লেচ্ছ ছিলনা, তাদের দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল বলে শোনা যায়। তাই সাহেব এঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন দেখলেন, রাত্রির কালো জলের ওপর অতিকায় একটা কালীমূর্তি শোভা পাচ্ছে। সে মূর্তি সাহেবকে ডাক দিয়ে বললে, আমার পুজো দাও, তাহলে পুল বাঁধতে পারবে। সাহেব প্রণাম করে বললে, আচ্ছা মা তাই হবে, তোমার পুজো দেব।

পুজোর আয়োজন হল। পুরুত এলেন, পাঁটা বলি হল। কিন্তু অমন জাগ্রত দেবতা, তিনি মেটে আর মেঠো-কালীর মতো শুধু পাঁটার মুড়ো চিবিয়েই খুশি থাকলেন না। নিজের প্রাপ্যটা নিজের হাতেই তিনি যথাসময়ে আদায় করে নিলেন।

ঘটনাটা ঘটল এরই দিনকয়েক পরে। জলের ভেতরে কুলিরা মস্ত বড় একটা লোহার ফাঁপা চোঙ্ বসাচ্ছিল, ওই চোঙ্‌টার ভেতর দিয়ে তারা পিলারের গাঁথ্‌নি তুলবে। সব ঠিক আছে, দিব্যি সাফসুফ কাজ চলছে—এমন সময় কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, অতবড় চোঙটা দেখতে দেখতে ঠিক দুমিনিটের মধ্যে যেন চোরাবালির টানে নিশ্চিহ্ন হয়ে অতলে মিলিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পনেরো ষোলোজন কুলিরও কেউ সন্ধান পেলনা। সার্থক হল রক্তলোলুপা দেবীর পুজো।

তার পরে বিনা বাধায় পুল গড়ে উঠল। মস্ত বড় লোহার পুল। কেউ বলে আধমাইল, কেউ বলে তার বেশি, আবার কেউ বলে পুরো এক মাইলের কম নয়। ঝম ঝম করে ওর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায়, যাত্রীরা নিশ্চিন্তে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে, কেউ ঘুমোয়, কেউ তাস-পাশা খেলে। এ পুলের ইতিহাস তারা জানেনা।

কিন্তু সেই যে শুরু—সেই থেকেই ধারাটা চলে আসছে। প্রতি বছর কালী তাঁর নিয়মিত বলি আদায় করে নেন। দলবল না থাকলে লোকে নদীতে স্নান করতে নামেনা, একা একা দুপুরে সন্ধ্যায় নদীর কাছে যেতে তারা ভয় পায়। নির্জন বালির চর আর বৈঁচিবন নিয়ে রহস্যময়ী কাঞ্চন কলচঞ্চলা ধারায় বয়ে যায়।

ছেলেবেলায় আত্রাইকে দেখেছে রঞ্জু, দেখেছে তিরিশ সালে ক্ষ্যাপা নদীর সেই বানের দৃশ্য। তার রক্তের ভেতরে আমের জামের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীর সুর আছে, সেই জলের গান বাজে উল্লসিত ছন্দে। রঞ্জু জলকে ভালোবাসে, নদীকে ভালোবাসে। তাই ভয়ের জাল দিয়ে ঘেরা এই বিচিত্রস্রোতা কাঞ্চনও তাকে ডাক দিলে।

একদিন দুপুরে যখন আবার তেমনি করে ডাক দিয়ে একটা হলদে পাখি পশ্চিমের দিকে উড়ে গেল, তখন রঞ্জু আর থাকতে পারলনা। অবিনাশবাবুর সেই নিশির ডাকের মতো কেমন বিহ্বল হয়ে গেল সে—ছায়ায় ঘেরা বাতাবী লেবু গাছের নীচেকার আসনটি ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

ধুলোয় ভরা পথটা দিয়ে খানিকটা যখন এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল খাঁদুর ডাক।

—রঞ্জু, এই রঞ্জু?

রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো।

—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

রঞ্জু আর জবাব দিলেনা, নীরবে এগিয়ে চলল।

পেছন থেকে ঠাট্টা করে উঠল খাঁদু: ইস্, বড্ড ভালো ছেলে হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আর কথাই কইবেন না!

রঞ্জু চলতে লাগল। এ ধরণের পথ তার অচেনা নয়, এর সঙ্গে তার শৈশবের নাজীপুর একাকার হয়ে গেছে। এ শহর মুকুন্দপুর নয়, এখানে দোতলা-তেতলা বাড়ি নেই, এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, এখানে পথের পাশে পাশে সরকারী আলো জ্বলেনা। এখানে বন-জঙ্গল, আমের বাগান, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি। রঞ্জুর মনে হারানো দিনগুলোর নেশা লাগল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া মাটির ছোঁয়া লেগে সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

রেল লাইন পাশে রেখে রঞ্জু চলল। বেশ লাগে অজানা পথ দিয়ে চলতে, অদ্ভুত মোহ জাগে একটা। মনের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার কেমন একটা নেশা আছে [illegible]

ভেতরে বিস্ময় নেই, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে দেখে তুমি বলতে পারো এ আমার—এ একান্তই আমার। এই শহর, এই বাড়ি ঘর, ওই ল্যাম্পপোষ্টগুলো, আমের বাগান, ভূপাল রায়ের প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ির পেছনে মজা পুকুর আর আদ্যিকালের সেই অতিকায় জাম গাছটা—এদের ওপরে নিজস্ব কোনো দাবী নেই রঞ্জুর। এ ভোনার, এ খাঁদুর—এ আর সকলের। কিন্তু এই পথটা—যা সহরের সীমা ছাড়িয়ে জংলা বাগান, বিলাতী পাকুড়ের বন আর উঁচু নীচু অসমতলের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে, এ পথে আফ্রিকার দুর্গমের ভেতর দিয়ে অভিযানের মতো বিচিত্র আস্বাদন আছে একটা। হয়তো কোনো নতুন ফুল চোখে পড়বে, যা পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি; কোনো নতুন পাখি—যে পাখি দূর মেঘলোকের ওপারে মেঘমালার পুরীর রূপোর দাঁড় থেকে সোনার শেকল কেটে বেরিয়ে এসেছে। এখানে যা দেখবে সব একান্তভাবে তোমার—যা পাবে সব তোমার নিজস্ব। এ পথচলা নয়, এ আবিষ্কার।

চলতে চলতে—বাঃ, এই কি কাঞ্চন! এই কি সেই ভয়ে থম্ থম্ করা আশ্চর্য নদী!

কিন্তু রঞ্জুর ভয় করল না, ছম ছম করে উঠল না শরীর। রঞ্জু আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুপুরের রোদে অনেকটা জুড়ে ধবধবে মিহি বালি রূপোর মতো ঝিকমিক করছে, তার ওপরে দেখা যায় এক ফালি নীল জল। এত শান্ত, এত মৃদু যে স্রোত বইছে কিনা সন্দেহ। একটু দূরে রেলের পুলটা টানা রয়েছে, তার বারো আনিই শুকনো ডাঙা বালির ওপর দিয়ে। সব স্বাভাবিক, সব সহজ। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, দুটি চারটি করে বালি উড়ছে, ছোট-খাটো ছু একটা বালির ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে। ডেকে ডেকে জলের ওপরে ঘুরছে মাছরাঙা। এ নদী ভয় জানায় না, নেশা ধরায়।

গরম বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে চলল রঞ্জু। পায়ের নীচে যেন ফোশ্‌কা পড়ে যাচ্ছে এম্‌নি মনে হয়। কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না। এগিয়ে এসে জলের কাছে বসল। বসল ভিজে ভিজে নরম বালির ওপরে, জলের ভেতরে পা ডুবিয়ে। পায়ের ওপর দিয়ে তির [illegible] যেতে লাগল, শির শির করতে লাগল শরীর। কী চমৎকার ঠাণ্ডা জলটা! বসে বসে রঞ্জু দেখতে লাগল কেমন করে এক একটা ছোটো ছোটো রূপোলি মাছ জলের ওপরে অকারণ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠছে, আর কেমন করে মাছরাঙারা মাথা নীচু করে তাদের ওপরে তীরের মতো পড়ছে ছোঁ দিয়ে।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমক লাগল একটা। পেছন থেকে মৃদু গলায় কে ডেকেছে, রঞ্জু!

রঞ্জুর মুখ দিয়ে ভয়-বিহ্বল একটা স্বর বেরুল আপনা থেকেই: মা কালী! কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে তার সাহস হল না—ভয়ে হাত পা পাথর হয়ে আসতে চাইছে।

যে পেছন থেকে ডেকেছিল সে এবার মিষ্টি গলায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

—মা কালী কি রে! এখানে বসে তুই কালী-সাধনা করছিস নাকি?

স্বরটা চেনা। লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল তাদের পাড়ারই একটা ছেলে। পরিমল।

—পরিমল—তুই!

—হ্যাঁ আমি। ভয় নেই—ভূত নই।

—তুই এখানে কেন?

—সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার আগে তোকেই ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

—আমি—রঞ্জু ঢোঁক গিলল একবার: আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

পরিমল আবার হেসে উঠল। তার পর রঞ্জুর পাশেই বালির ওপরে বসে পড়ে বললে, তাই বলে এই দুপুর রোদে! বেড়াবার আর সময় পেলি না নাকি।

রঞ্জু জবাব দিলে না।

তরল গলায় পরিমল বলে চলল, এখানে ভয় আছে, তুই জানিস?

—জানি।

—তবু আসতে ভয় করল না?

—না।

—না কেন?

—এখানে তো ভূত নেই, মা কালী আছে। দেবতাকে

পরিমল আরো জোরে হেসে উঠল। স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি—এত সহজে ছেলেটা এমন করে হাসতে পারে—আশ্চর্য! বললে, সব গাঁজা, ও-সব বিশ্বাস করিস কেন?

—বাঃ, দেবতা বিশ্বাস করব না?

—কচু! দেবতা থাকলে তো?

—কী যা তা বলছ সব। এই নদীতে মা কালী আছেন।

—তোর মুণ্ডু আছেন!—পরিমল একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে: আমি তো সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসি এখানে। কোনোদিন কোনো কালী-কালীর টিকির ডগাটিও দেখতে পাইনি। কালী যদি কোথাও থাকে তবে মন্দিরে আছে, এখানে নদীতে ডুবে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে?

কী ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে আছে নাকি! অবাক বিস্ময়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের দিকে! পরিমল হাসছে, কিন্তু জোরে নয়। মুচ্কি মুচ্কি দুষ্টুমির হাসি।

—তুই তো সাংঘাতিক ছেলে পরিমল।

—সেই জন্যেই তো তোদের ভোনা অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে আমার বনি-বনা হয় না।

কথাটা ঠিক। মনশাতলার ছেলে হয়েও পাড়ার কারো সঙ্গে খুব সম্প্রীতি নেই পরিমলের। মাঝে মাঝে আগে মার্বেল খেলতে আসত, কিন্তু এত খারাপ খেলত যে পাঁচ মিনিট পরে ভোনা তার সব মার্বেলগুলো পকেটস্থ করে ফেলত। সেজন্যে কোনোদিন ক্ষোভ করেনি, মুখ কালো করেনি একটুও। তা ছাড়া পাড়ার দলবলের সঙ্গে মেশামেশি তার একেবারেই নেই। তার বাবা শহরের বড় উকিল। মস্ত বাড়ী তাদের। সে বাগানে হরিণ আছে, ময়ুর চরে। বিকেলে দেখা যায় পরিমল আর তার বোন সেই বাগানে হরিণের পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

ভোনা মুখ ভেংচে তার অভ্যস্ত রীতিতে বলেছে, ওরা বড়লোক, অহঙ্কারে একেবারে চারখানা হয়ে ফেটে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে ওরা মিশবে কেন?

রঞ্জুরও তাই ধারণা ছিল। সত্যিই কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে পরিমলের, আছে স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমা রেখা—যে রেখা ওরা যেন অতিক্রম করতে পারে না। বয়সের তুলনায় পরিমল একটু বেশি লম্বা—সুন্দর সুগঠিত শরীর, ভোনার একেবারে বিপরীত। টকটকে ফর্সা রঙ, আর রঙটা অত ফর্সা বলেই মাথার চুলগুলো কেমন লালচে। চোখের তারা দুটোয় কপিল বর্ণ। কথা বলার চাইতে হাসে বেশি, আর যখন হাসেনা তখনও চোখ দুটো যেন হাসিতে জ্বল জ্বল করতে থাকে তার। সে বড়লোক—এই অপরাধে ভোনা অবশ্য সুযোগ পেলেই তাকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু পরিমল ভ্রূক্ষেপ করে না—যেন এই সব তুচ্ছতাকে অবহেলা করবার মতো সহজাত কবচ-কুণ্ডল নিয়েই সে জন্মেছে। তাই পরিমল পাড়ার ছেলে হয়েও পাড়ার সকলের থেকে আলাদা।

এই সময়টুকুর ভেতরে এক সঙ্গে এতগুলো কথা ভেবে নিলে রঞ্জু।

—কিন্তু তুই এখন এখানে কেন পরিমল?

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সে কথা আজ বলব না।

—কেন?

—সময় হয়নি।

—কিসের সময়?

—সব কথা বলবার।

—কী এমন কথা?—রঞ্জুর যেমন বিস্ময় তেমনি কৌতূহল বোধ হল।

পরিমল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল। বললে, আর এখানে বসে রোদে চাঁদি পুড়িয়ে লাভ নেই রঞ্জু। বাড়ির দিকে যাবি তো চল।

নীরবে রঞ্জুও উঠে দাঁড়ালো। পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল না। শুধু তখন যেন মনে হল, পরিমল এমন একটা জগতে বাস করছে যা তার পরিচিত পরিবেশের চাইতে বহুদূরে—যে জগতের দরজা আজও তার কাছে অবরুদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাহিরে শিল্পকলা প্রচারের জন্য দায়ী অল্প কয়েকজন দুঃসাহসী বাঙ্গালী শিল্পীর মধ্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় একজন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ইনি নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া মাদ্রাজে যান শিল্পশিক্ষা করিতে। ছাত্রাবস্থায় বহু বাধা

পল্লীদৃশ্য"

বিপত্তি এবং অত্যন্ত আর্থিক অনাটন সত্ত্বেও তিনি সসম্মানে আর্টস্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আজ সুশীলকুমারের শিল্প আমাদের দেশের

শিল্পী এবং শিল্পরসিক সমাজে সুপরিচিত। শুধু আমাদের দেশেই ন বিদেশেও ইঁহার শিল্প সৃষ্টি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

“বোহেমিয়ান্‌স”—(শিল্পীবন্ধু ল্যাম্বার্টের ষ্টুডিও

‘গ্রাম’

গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সরকার, প্যারিস সহরে ইউনেস্কো (U. N. E. S. C. O) আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য সমসাময়িক বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীদের অঙ্কিত পঞ্চাশটি চিত্র সংগ্রহ করেন। সুশীলকুমারের একখানি চিত্র এই বিশিষ্ট সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি এই চিত্র সংগ্রহ লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিশুশিল্পের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মন তৈয়ারী করিতে শিল্প শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সুশীলবাবু কার্য্যকরী পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ সম্প্রতি মাদ্রাজ শিক্ষা বিভাগ যে bifurcated course in art সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে তাহার অধিকাংশ গৌরব সুশীলকুমার দাবী করিতে পারেন। এই ব্যাপারে মাদ্রাজ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ প্রাদেশিকতার ঝাপসা পরিপ্রেক্ষণে কর্ম্মকুশলতার বিচার না করিয়া বাঙ্গালা শিল্পী সুশীল-কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতামত এবং সাহায্য গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। প্রবাসে নানারূপ বাধা বিপত্তি এবং বিরুদ্ধ ভাব ও মতের মধ্যে থাকিয়াও সুশীলবাবু মাদ্রাজের শিল্পী, শিল্পরসিক—শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছেন, তাহা ইঁহার কর্ম্মকুশলতা ও নির্ভীক চরিত্রের পরিচায়ক।

পার্থিব সাফল্য এবং লোকখ্যাতি বহু উদীয়মান শিল্পীর কর্ম্মজীবনে অন্তরায় ঘটাইয়াছে। সুশীলকুমার এবিষয়ে সচেতন। তাঁহার মতে "জন সমাজে পরিচিত হওয়া একটা বিরাট কিছু নয়। সত্যকার শিল্পী শুধু বিজ্ঞাপন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার অবিমিশ্র আনন্দ

শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

—বিশেষ সাফল্য হ'ল সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে। মনের মতকাজই যদি করতে না পারলাম, ত হাজার লোকের সস্তা বাহবায় কি মন ভরে?"

এই সঙ্গে আমরা সুশীলবাবুর যে সকল কালোসাদায় অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রকাশ করিলাম তাহা তাঁহার একেবারে আধুনিক কাজ না হইলেও—বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ।
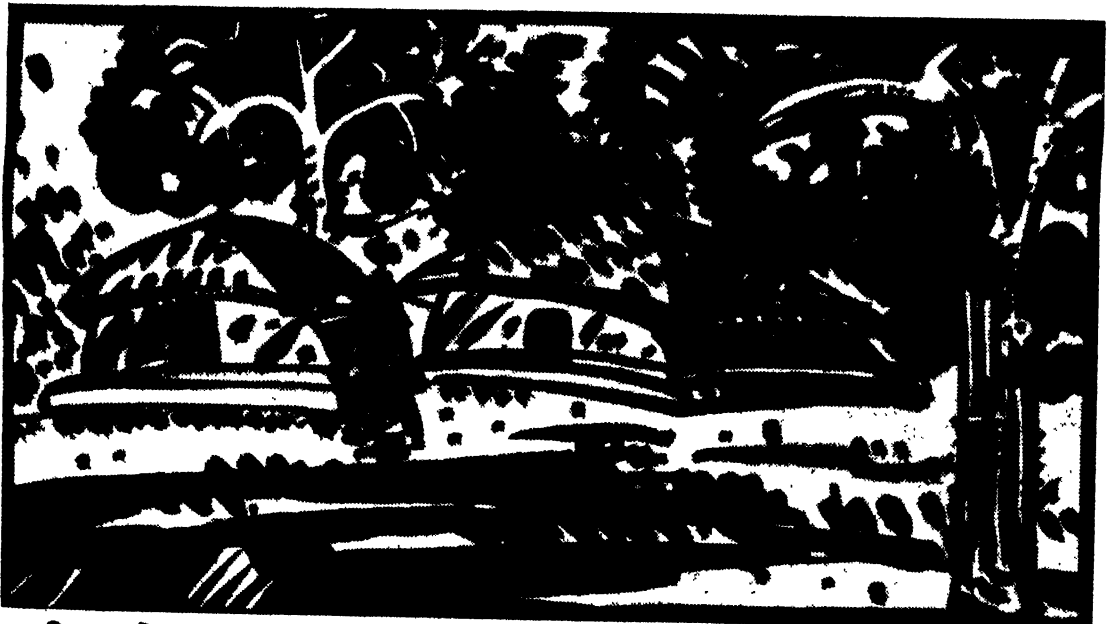
সেনবংশের প্রাচীন রাজধানী

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম-এ

বাংলার ইতিহাসে সেন নৃপতিগণের রাজ্যকাল একটী গৌরবময় অধ্যায়। পাল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেন প্রভুত্ব বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয় সেন সেন-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা কর্ণাট দেশ হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়া রাঢ় অঞ্চলে বসতি করেন এবং পাল রাজগণের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হন।

রাঢ় দেশে ইঁহাদের রাজধানী কোথায় ছিল? সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিতে পালভূপতিগণের সামন্ত স্বরূপে নিদ্রাবলের অধিপতি বিজয় রাজের নামোল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, নিদ্রাবলপতি বিজয়রাজ ও বিজয় সেন অভিন্ন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপির ১৯ সংখ্যক শ্লোকও এই মতের সমর্থন করে।

এক্ষণে বিবেচ্য নিদ্রাবল রাঢ় দেশের কোন অংশে অবস্থিত ছিল।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে কাটোয়ার সন্নিকটে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সীতাহাটী-নৈহাটী গ্রামে যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় তাহাতে লিখিত আছে যে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজত্বের একাদশবর্ষে বিজয়পত্নী ও বল্লালজননী শূরবংশোদ্ভবা রাজ্ঞী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্ব-মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী বাল্লহিট্ঠ গ্রাম শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করেন। বাল্লহিট্ঠ গ্রামের বর্ত্তমান নাম বালুটিয়া: ইহা সীতাহাটী হইতে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, রাজমাতা বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াই উক্ত দানকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে যে তিনি নিদ্রাবল হইতেই স্নান করিতে আসিয়াছিলেন—কেন না রাঢ় দেশের অনেক স্থানের লোকই গঙ্গাস্নান করিতে আজিও সীতাহাটী আসিয়া থাকেন। এই অনুমান হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নিদ্রাবল এমন কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল যেখান হইতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে সীতাহাটী আসিতে হইত। আরও উক্ত নিদ্রাবল যখন রাঢ় দেশের অন্তঃপাতী তখন উহা সীতাহাটীর পশ্চিমেই হইবে এবং সীতাহাটী হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী না হওয়ারই সম্ভাবনা, কেননা তখনকার দিনে রাজধানী সাধারণতঃ নদীতীর হইতে অধিকদূরে স্থাপিত হইত না—হইলে ব্যবসাবাণিজ্যের বড়ই অসুবিধা হইত।

সীতাহাটী হইতে সাত-আট মাইল পশ্চিমদিকে নিরোল বা নিড়োল নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি সমৃদ্ধ ও তদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে আহম্মদপুর কাটোয়া রেল পথের একটী ষ্টেশনও আছে। অনুমান হয় নিড়োলই প্রাচীন নিদ্রাবল। নিদ্রাবল হইতে হইয়াছে নিদবল—তাহা হইতে নিদোল এবং তাহা হইতে নিড়োল।

আমি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহোদয়কে এ বিষয় জানাইয়াছিলাম—তিনি উত্তরে আমায় লিখিয়াছেন যে, "নিদ্রাবল" অতি স্বাভাবিক ভাবেই "নিড়োল"-এ পরিণত হইতে পারে।

নিড়োল ব্যতীত এতদঞ্চলভুক্ত আরও কয়েকটী স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে যে নৈহাটী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছি ইহাতে কোনও এক নৃপতির রাজধানী ছিল তাহার কিছু ধ্বংসাবশেষ আজিও পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া নৈহাটী গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও চৈতন্য-চরিতামৃতে স্বীয় জন্মভূমি ঝামটপুরের পরিচয় প্রসঙ্গে নৈহাটীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নৈহাটীর রাজপ্রাসাদ সেন ভূপতিগণের ছিল অথবা দনুজমর্দ্দন রাজের ছিল ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হওয়া উচিত।

ল'ড়েই লহ ইন্দ্রপ্রস্থ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

স্বর্ণ লঙ্কা বানিয়ে রাবণ চালিয়েছিল বেশ
যতদিন না হরণ ক'রে ধরলো সীতার কেশ;
'অতিদর্পে হত লঙ্কা' সাক্ষ্য রামায়ণ—
মহাভারত হাঁক্‌ছে "সামাল্! দামাল দুঃশাসন!"
যাজ্ঞসেনী মুক্ত বেণী—কোথায় গো ভীমসেন?
শ্রীভগবান্ সারথি কই? "আসবো" বলেছেন॥
জাগো দেশের জড় ভরত, ভোলো লজ্জা ভয়
'জাতিস্মর' না হয়ে, হও বিজাতীয় বিস্ময়
রাজ্য তরে খুনোখুনি এ নহে নূতন
কিন্তু এ যে মূষিক বৃত্তি—কামড়ে, পলায়ন!
তেজস্বী যে, ধর্ম্মান্ধ সে হোক না, নাহি ভয়
বীরের মত লড়াই করে করুক বিশ্বজয়!
কাঁদাও কেন না বহিনকে, বাচ্ছা শিশুকেই;
শান্তি প্রিয় নিরীহ যে—ধুঁক্‌ছে এম্‌নিতেই?
সাজাও চমূ, বাজাও ভেঁপু, নাচাও সৈন্যদল,
যুযুৎসু যে মিটাও তাহার বুকের দাবানল—
ক্লান্ত দেহ শান্তি প্রিয়ে, নারী, শিশু, বুড়ায়,—
ল'ড়েই লহ' ইন্দ্রপ্রস্থ, উজল রাখো চূড়ায়!

বিচারের ঘণ্টা

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

মুঘল সম্রাট্ জহানগীর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) 'তুজুক্-ই-জহানগীরী' সংজ্ঞক স্বরচিত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, সিংহাসনলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি একটি ঘণ্টাসংযুক্ত শৃঙ্খল ঝুলাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। শৃঙ্খলটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত এবং ত্রিশ গজ দীর্ঘ ছিল ; উহার সহিত ষাটটি ঘণ্টা সংলগ্ন ছিল। উহার ওজন ছিল ভারতীয় মাপের চারি মণ এবং ইরাক দেশীয় মাপের বিয়াল্লিশ মণ। শৃঙ্খলের একদিক আগ্রাদুর্গের শাহীবুরুজের প্রাকারে আবদ্ধ করা হয় এবং অপরদিক যমুনাতীরবর্ত্তী একটি শিলাস্তম্ভে সংবদ্ধ থাকে। বাদশাহের উদ্দেশ্য ছিল যে, বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীরা যদি সুবিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের মোকদ্দমা সম্পর্কে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে অথবা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়, তবে সেই প্রার্থীরা শৃঙ্খলটি আন্দোলিত করিয়া সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। ঘুলাম হুসেন রচিত 'সিয়র্ উল্-মুতখেরিন্' হইতে জানা যায়, ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট্ মুহম্মদশাহ্ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) জহানগীরের অনুকরণে অনুরূপ একটি সুবিচারের শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সহিত একটি ঘণ্টা সংবদ্ধ করা হয়। শৃঙ্খলটি অষ্টকোণ বুরুজের বহির্ভাগের নদীতীরবর্ত্তী অংশে ঝুলান হইয়াছিল। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা পাইত, তবে সে ঐ শৃঙ্খল টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতে পারিত। ঘণ্টাধ্বনিতে বাদশাহের মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। তিনি বিচারার্থীকে ডাকাইয়া তাহার মোকদ্দমার সুমীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন।

কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, সুবিচারের প্রসারোদ্দেশ্যে ঘণ্টাসংযুক্ত শৃঙ্খল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্রাট্ জহানগীরের স্বকপোলকল্পিত। আবার অনেকে মনে করেন যে, তিনি পারস্য বা ইরাণ দেশের জনৈক প্রাচীন নরপতির অনুকরণে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুইটি সিদ্ধান্তের কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জহানগীরের পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক ভারতীয় মুসলমান নরপতি কর্ত্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি দাসবংশীয় সুলতান ইল্‌তুৎমিশ (১২১১-৩৬ খ্রীঃ)। সুলতান মুহম্মদ-বিন্-তুঘলুকের (১৩২৫-৫১ খ্রীঃ) শাসনকালে ইব্‌ন্-বতুতা নামক একজন মরোক্কো দেশীয় পর্য্যটক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে সুলতান ইল্‌তুৎমিশ কর্ত্তৃক বিচারের ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইল্‌তুৎমিশ প্রথমে আদেশ দেন যে, অবিচারপীড়িত ব্যক্তি রঙীণ পরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রাসাদে সাধারণতঃ শ্বেতপরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত বলিয়াই ঐরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার কার্য্যকারিতায় সুলতান সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি প্রাসাদের দ্বারদেশে দুইটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সিংহস্থাপন করেন। সিংহদ্বয়ের গলদেশে একটি লৌহশৃঙ্খল সংবদ্ধ হয় এবং উহাতে একটি বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত হয়। অবিচারপীড়িত ব্যক্তিগণ রাত্রে প্রাসাদের সিংহদ্বারে আসিয়া ঐ ঘণ্টা বাজাইত। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র সুলতান বিচারার্থীর সন্ধান লইতেন এবং তাহাকে সুবিচারে সন্তুষ্ট করিতেন।

সুবিচারের কাহিনীগুলি হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের মুসলমান রাজগণ অনেকে সুবিচার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই। অবশ্য তাঁহাদের বিচার-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, সুবিচার আয়াসলভ্য করিবার উদ্দেশ্যে ঘণ্টাস্থাপনের ব্যবস্থা আধুনিক মানদণ্ডে ত্রুটিবিমুক্ত বলিয়া বোধহয় না। কারণ প্রবলকর্ত্তৃক অত্যাচারপীড়িত দুর্ব্বলের পক্ষে বিচারের ঘণ্টা বা তৎসংলগ্ন শৃঙ্খলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করা সর্ব্বক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল, এরূপ মনে করা কঠিন। যাহা হউক, মধ্যযুগের মানদণ্ডে বিচারের ঘণ্টা স্থাপনকে উৎকৃষ্ট বিচার ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যায়। সুতরাং যে সকল মুসলমান নরপতি উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রশংসার্হ। যদি তাঁহাদিগকে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভাবয়িতা প্রমাণ করা যায়, তবে তাঁহারা অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বিচারের ঘণ্টা স্থাপন মুসলমান বিচারব্যবস্থার উপর ভারতীয় প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভারতে এবং ভারতীয় সভ্যতায় সমৃদ্ধ প্রাচ্যদেশসমূহে যে বিচারের ঘণ্টা স্থাপন বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। সুতরাং বিচারের ঘণ্টা উদ্ভাবনের প্রশংসা প্রাচীন ভারতীয় রাজগণের প্রাপ্য।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ ন্যায়বিচারকে প্রজাপালক নরপতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলিয়াছেন, "উপস্থানগতঃ কার্য্যার্থিনামদ্বারাসঙ্গং কারয়েৎ। দুর্দ্দর্শো হি রাজা কার্য্যাকার্য্যবিপর্য্যাসম্ আসন্নৈঃ কার্য্যতে। তেন প্রকৃতিকোপম্ অরিপরবশং বা গচ্ছেৎ।" অর্থাৎ, "সভাসীন রাজা বিচারার্থী ব্যক্তিগণকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন না। রাজদর্শন যদি প্রজাদিগের পক্ষে দুর্লভ হয় এবং রাজকার্য্যের ভার সহকারী কর্ম্মচারিবর্গের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তবে বিচারাদি কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ফলে রাজাকে প্রজার বিরাগভাজন এবং শত্রুর বশবর্ত্তী হইতে হয়।" এই উচ্চ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করার জন্য অনেক প্রাচীন ভারতীয় নরপতি আগ্রহপ্রদর্শন করিতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী' সংজ্ঞক কাশ্মীরদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংকলিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কাশ্মীরপতি হর্ষ (১০৮৯-১১০১ খ্রীঃ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—

সিংহদ্বারে মহাঘণ্টাশ্চতুর্দ্দিশমবন্ধয়ৎ।
জ্ঞাতুঃ বিজ্ঞপ্তিকামান্ স প্রাপ্তাংস্তদ্বাদসংজ্ঞয়া॥
আর্ত্তাং চ বাচমাকর্ণ্য তেষাং তৃষ্ণানিবারণম্।
প্রাবৃষেণ্যঃ পয়োবহশ্চাতকানামিবাকরোৎ॥

অর্থাৎ, "রাজা হর্ষের প্রাসাদের সিংহদ্বারে বিশাল ঘণ্টাসমূহ লম্বিত ছিল। বিচারার্থী প্রজাগণ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা রাজদর্শন কামনা বিজ্ঞাপন করিত। বর্ষাকালীন মেঘ যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের পিপাসা নিবারণ করে, সেইরূপ প্রজাগণের আর্ত্তবাক্য শ্রবণমাত্র রাজা হর্ষও তৎক্ষণাৎ তাহাদের সন্তোষবিধান করিতেন।" কাশ্মীরপতি হর্ষ প্রজাপালকের ভারতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, 'রাজতরঙ্গিণী'র বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় নরপতিকেও তাঁহারই স্থায় বিচারের ঘণ্টাবন্ধন করিতে দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলের প্রচলিত বৌদ্ধকাহিনীসমূহ সঙ্কলিত করিয়া 'মহাবংশ' নামক পালি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে এড়ার নামক জনৈক সিংহলপতির বিবরণ লিখিত আছে। এড়ার চোলদেশ অর্থাৎ আধুনিক তাঞ্জোর-ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চলের অধিবাসী এবং তামিল অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতীয় ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৪৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন এবং আনুমানিক ১০১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ধার্ম্মিক রাজা এড়ারের শয্যার শীর্ষদেশে একটি ঘণ্টা সংবদ্ধ ছিল; ঐ ঘণ্টাসংলগ্ন একগাছি সুদীর্ঘ রজ্জু প্রাসাদের বহির্ভাগে লম্বিত ছিল। যে কেহ সুবিচারের প্রার্থী হইয়া রজ্জু আকর্ষণপূর্ব্বক ঘণ্টাটি বাজাইতে পারিত। রাজা এড়ারের ন্যায়বিচার এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। একদা রাজা এড়ারের একমাত্র পুত্র রথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথে বৎসসহ একটি গাভী বিশ্রাম করিতেছিল। দৈবক্রমে রাজপুত্রের রথচক্র বৎসটির গ্রীবার উপর দিয়া চলিয়া যায়। ফলে উহার মৃত্যু ঘটে। পুত্রশোকে অধীর হইয়া গাভীটি রাজার ঘণ্টাবিলম্বিত রজ্জু আকর্ষণ করিল। রাজা এড়ার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপরাধী পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রাজপুত্রকে রথচক্রের নীচে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। একবার এক সর্প তালবৃক্ষে উঠিয়া একটি পক্ষিশাবক ভক্ষণ করিয়াছিল। শোকাতুরা পক্ষিমাতা রজ্জু টানিয়া ঘণ্টা বাজাইল। রাজা সর্পটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উহার উদর হইতে শাবকটিকে বাহির করিলেন। আর একদিন এক বৃদ্ধা বিচারের ঘণ্টা বাজাইল। রাজা এড়ার বৃদ্ধার অভিযোগ শুনিয়া জানিলেন যে, বৃদ্ধা কিছু তণ্ডুল রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিল; কিন্তু অকালবৃষ্টিতে অকস্মাৎ উহা ভিজিয়া যায়। রাজা স্থির করিলেন, তাঁহারই কোন পাপের ফলে অকালে বৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি উপবাসের দ্বারা পাপক্ষালন করিলেন। অতঃপর শক্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন যে, রাজা এড়ারের রাজ্যে সপ্তাহে মাত্র একবার রাত্রিকালে বৃষ্টি হইবে। উল্লিখিত কাহিনীগুলি সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক না হইতে পারে; কিন্তু উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'মহাবংশ' রচিত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলদেশে বিচারের ঘণ্টা বন্ধন অজ্ঞাত ছিল না।

দক্ষিণ দিক্‌স্থিত সিংহলের স্থায় পূর্ব্বদিকের হিন্দুচীন ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহেও প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে যেমন সুবিচারক নরপতি কর্ত্তৃক ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী দেখিতে পাই, হিন্দুচীনের অন্তর্গত শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশের ইতিহাসেও তদ্রূপ উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্যামদেশের সুখোথৈ অর্থাৎ সুখোদয়বংশীয় নরপতি রামরাজ বা রাম খম্‌হেং খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিচারের ঘণ্টা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মদেশের তুংগুরাজবংশে অনকৃপেৎলুন্ (১৬০৫-২৮ খ্রীঃ) নামক জনৈক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি মুঘল সম্রাট্ জহাঙ্গীরের সমসাময়িক। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে, জহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বিচারের ঘণ্টা সংযুক্ত শৃঙ্খল স্থাপনের প্রায় ১৭ বৎসর পরে, ব্রহ্মরাজ অনকৃপেৎলুন তদীয় রাজধানী পেগুনগরস্থিত রাজপ্রাসাদে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বন্ধন করেন। উহার গাত্রে ব্রহ্ম ও তলৈঙ্ ভাষায় লিখিত ছিল যে, যে কোন বিচারপ্রার্থী ঐ ঘণ্টা বাজাইয়া রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদিও হিন্দুচীনের রাজগণ পূর্ব্ব হইতেই বিচারের ঘণ্টা স্থাপনের প্রথা অবগত ছিলেন, তবুও জহাঙ্গীরের ঘণ্টা বন্ধন বার্ত্তা ব্রহ্মরাজ অনকৃপেৎলুনকে আংশিক ভাবেও প্ররোচিত করে নাই, একথা জোর করিয়া বলা সম্ভব নহে। কারণ এই সময় ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বয়িন্নঙের দূতগণ ফতেপুরসিক্রীর প্রাসাদে মুঘল সম্রাট্ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। যাহা হউক, অনকৃপেৎলুন কর্ত্তৃক স্থাপিত বিচারের ঘণ্টাটির প্রতি অদৃষ্ট বিরূপ ছিল। অল্পকাল পরে আরাকানের অধিপতি থিরিথুদম্ম অর্থাৎ শ্রীসুধর্ম্ম (১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) পেগু অধিকার করেন। বিচারের ঘণ্টাটি তৎকর্ত্তৃক আনীত হইয়া তদীয় রাজধানী ম্রোহঙের একটি মন্দিরে স্থাপিত হয়। কথিত আছে, প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রিটিশপক্ষীয় অশ্বারোহী সেনাদলের জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী ঐ ঘণ্টাটি ম্রোহং হইতে ভারতবর্ষের আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলিগড় শহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

ডাক্তারের মুখে যুধিষ্ঠিরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কথা শুনে মাণিক স্তম্ভিত। বলবার কিছু না পেয়ে কেবল বললে—"বলেন কি? wonderful lampকেও নিবিয়ে দিলে যে!—তারপর?"

বিনোদ হেসে বললে—"এখনো তারপর? তারপর আর শুনে কাজ কি—সে আরো wonderful—এখন কম্বলখানা মেজেয় পেতে দাও—একটু গড়াই। জেলে তো আর খাট বিছানা কেউ দেবে না!"

মাণিক ভেবড়ে গেলো। শেষে বললে—সে চিন্তা করছি না Sir, ভগবানের দয়ায় যে বাসা খুঁজে বার করতে পেরেছিলুম, সে জেলের ওপর যায়। কোথাও আমাদের আর কষ্টের কারণ হবে না। যাক্—তারপর যুধিষ্ঠির কি বললে, সেইটাই বলুন।"

"বলেছি তো—সে আরো wonderful। বিপদে ভদ্রলোকে যেমন অভয় দেয়, উৎসাহ দেয়—যুধিষ্ঠির ভদ্র না হলেও, ভদ্রতা জানে, রাখেও। সে বললে—"কোন' চিন্তা রাখবেন না, ভাববেন না। আমি আছি, ওসব ঠিক্ হয়ে যাবে।—শুনলে? পাপীও রামনাম করে!"

মাণিক সোৎসাহে বললে—"তবে আপনি এতো ভাবছেন কেনো?"

তার কথা শুনে বিনোদ এবার সত্যই বিরক্ত হয়ে বললেন—"তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি? তুমি আমাকে ওই খুনে দুরাত্মাদের বিশ্বস্ত এজেন্টের কথা বিশ্বাস করতে বলো নাকি?—যে লোক আমাকে চোর প্রমাণ করবার ভার স্বীকার করে এখানে এসে রয়েছে ও আমার পশ্চাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলের মতো টাকা ছড়াচ্ছে—আবশ্যকে নরহত্যা পর্য্যন্ত যাদের সহজসাধ্য, তোমার যুধিষ্ঠির তাদেরি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। যাদের ওই সব কার্য্যসিদ্ধির ওপর মান মর্য্যাদা, মাইনে বাড়ে—উন্নতি নির্ভর করে, তাদেরই একজন আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে, অভয় দিয়েছে। তা জেনেশুনেও তুমি বলছো—"তবে এত ভাব্‌ছেন কেনো?" বেশ, তাহলে আমাকে মেনে নিতে হয়—নির্ভাবনায় থাকাই আমার উচিত। এই না?"

মাণিক করজোড়ে সবিনয়ে বললে—"আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তা হ'লে আমি এখনো তাই বলবো Sir—না হয় চুপ করেই থাকবো। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আপনি যেমন একটা অনুমানসিদ্ধ কথা শুনিয়েছেন—"ও অপয়া হার যদি কোনো বেগমের হয়—ও তা চুরি গিয়ে থাকে এবং তিনি ওটাকে তাঁর হার বলে নিজে সাক্ষ্য দেন, তার পর আর প্রমাণের প্রশ্ন থাকে কি" ইত্যাদি। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমিও বলি—"বেগম যদি বলেন"—কিছুদিন পূর্ব্বে আমার যখন কঠিন ব্রংকাইটিস হয়, আমি ডাক্তার বিনোদবাবুকেই call দিয়েছিলুম (ডেকে ছিলুম); তিনি বিশেষ যত্নে আমাকে রোগমুক্ত করেন। তখন আমার গলায় ওই হারছড়াটি থাকতো। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে—আমি খুশি হয়ে, তখনকার মতো তাঁকে সেই হার present করি—উপহার দি, ও অনেক করে' তাঁর পত্নীর ব্যবহারের জন্যে তা নিতে রাজি করি'। অমন নিঃস্বার্থ অমায়িক মানুষ আমি দেখিনি;" ইত্যাদি। তাতেও প্রমাণের প্রশ্ন আর থাকে কি? সে কথা আপনিও বোঝেন, সাহেবও বুঝবেন।—যাক্, এ সব বাজে কথা—অনুমানের বৃথা কথা আর বাড়াবেন না। মায়ের কৃপায় সব মিটে যাবে, ওসব কিছুই হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"অর্থাৎ—যুধিষ্ঠিরের অভয়বাণী স্বীকার করে' শুয়ে পড়ি!"

"ক্ষমা করবেন, আমি এখনো তাই বলব Sir—"

ডাক্তার সত্যই একটু চিন্তিত হলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করলেন—"কারণ?"

মাণিক ইতস্ততঃ না করেই বললে—"সেটা কিন্তু এ মূর্খের মুখে শোভা পায় না। আপনার অনুমতি পেয়ে বলছি। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নয়।"

"বেশ—তাই বলো—আমি উৎকর্ণ।"

মাণিক আরম্ভ করলে—"শুনেছি যারা অতি বড় পাষণ্ড নরপিশাচ, যাদের কোনো অমানুষিক কাজই আটকায় না, হত্যাকাণ্ড যাদের কাছে খেলার মতো, তারা নিজেকে বীর ভেবেই থাকে, সেই গর্ব্বই তাদের সবার বড় সম্পত্তি। প্রাণকেও তুচ্ছ করে—তা রক্ষা করে। হঠাৎ কোনো বিপন্নের ব্যথা প্রাণে আঘাত দিলে, আকস্মিক মুহূর্ত্তে সাময়িক ঝোঁকের বশে তাকে অভয় দিয়ে ফেললে জীবনপণে তা রক্ষা করে। সে যে কথা দিয়ে ফেলেছে—বীরের কাছে কথা দিয়ে ফ্যালা মানেই কথা রাখা—এই বীরজনই পোষণ করে ও পালন করে। নইলে সে কিসের বীর? ভবিষ্যতের চিন্তা তারা রাখে না—ততো হিসিবি বুদ্ধি তারা ধরে না। দিয়ে ফেলা কথা তাকে রাখতেই হয়—সোজাসুজি এই—"

—"তার পর লীলাময় আছেন, তখন তাঁর রহস্য আরম্ভ হয়। সেই ঝুটো বীরকে 'সত্য' পেয়ে বসে! বিপন্নকে শাস্তি দিতে গিয়ে বা দিয়ে, সে তখন এমন একটা শাস্তি ও আনন্দ অনুভব করতে থাকে, যার সুখাস্বাদ তার ভাগ্যে পূর্ব্বে কোনোদিন ঘটেনি। সে ভাবে—এ কি! এতদিন অ্যাতো বড় বড় ভীষণ ভীষণ কাজ করেও এমন আনন্দ তো কোনো দিন সে পায়নি! এর মানে কি? একজনকে বিপদ মুক্ত করা—এই সামান্য কাজে এমন আরাম কোথা থেকে এলো!" এই ভাবে তার প্রথম পরিবর্ত্তনের সুচনা হয়। এই নাকি স্বাভাবিক।

—মনে হয় যুধিষ্ঠির আপনাকে বাঁচাবে, নিজেও বাঁচবে, তাই আপনাকে বার বার বলেছে—নিশ্চিন্ত থাকুন। এই আমার ধারণা Sir—যে হত্যাকারী বা মহাপাপী, মূর্খতা-বশতঃ নিজেকে বীর ভেবেছে সে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে মিথ্যাকথা কয়ে বাঁচতে চায় না, ছোট হয় না, বীরের গুমোর বজায় রাখে। আপনি "নিশ্চিন্তই" থাকুন।

ডাক্তার মাণিকের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বললেন—"কবে কার কাছে এত্ত শিখলে? শুনে আমি সত্যই বড় খুশী হয়েছি। গুরুটা কে?"

"আমার সবই আপনি। নিজের বেলা এত ভুলে যান কেনো, এই তো সেদিনের কথা। সিভিল সার্জ্জনের কথা শুনে এসে—"

"থাক হয়েছে। সময় মতো কত কি বলতে হয়। যাক্ তুমি তো এতক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে বীর বানালে, কিন্তু তারা কথা দেয় কাকে? কেনো? যাকে তাকে নাকি?"

"তা কি সম্ভব হুজুর? যাকে তার ভালো লেগেছে, মনে ধরেছে। সেখানে ও প্রশ্ন থাকে না, বিচারও থাকে না। ওসব লোক যে স্বাধীনপ্রকৃতি রাখে—"

বিনোদ বললেন—"হয়েছে, এখন কম্বলটা তুলে খাটেই পাতো। তিনটে বাজলে আমাকে তুলে দিও। সাহেবের কাছে একবার Finalটা শুনে আসতে চাই, তারপর আমারও Final."

বেলা তিনটের পর মাকে স্মরণ করে ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন।—"তবে হয়ে আসি মাণিক?"

"যাবেন বইকি, ভালো খবরই পাবেন।"

"আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। ধোঁকা দিতেও অমন আর জুটি নেই।" বলে' হাসতে হাসতে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

মাণিক আপন মনে—"এমন মানুষের এ কি দুর্ভোগ?" মাণিক চোখ মুছলে।

পথে বেরিয়ে ডাক্তারের মনেও—সেই মাণিক।—"তাকে কি এই জন্যই এনেছিলুম? তার তরে যে কত কি ভেবেছিলুম! তার পরিণাম কি এই! আমার জন্যে সে যেন না বিপন্ন হয় মা। তুমি কি তার মুখ দিয়ে, যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে কথাগুলো আমাকে শোনালে?

পথে কে দু'জন লোক কথা কইতে কইতে ষ্টেশনের দিকে চলেছিলেন। একজন কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। অপরটি দ্রুত পা বাড়াতেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন—"ভুলনা, ওর একটি কথাও মিথ্যা নয় জেনো।"

শুনে বিনোদ চমকে গেলো—ও ওকি আমাকেই শোনালে?" বিনোদ বিভ্রান্তের মতো এগুলেন।

হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে কানে এলো—এই যে, নমস্কার। কবে এলেন ডাক্তারবাবু?

"একি—কিশোরী? কেমন আছ ভাই? শুনলুম সাহেব এসে গেছেন, আমার দেরী হল' নাকি?"

"না, ঠিকই এসেছেন। সাহেব নামেমাত্র গিয়েছিলেন। প্রায় দু'হপ্তা হবে—মেমসাহেবকে নিয়ে ফিরেছেন। তাঁবে

কলকেতার হাঁসপাতালে রেখে এসেছেন। তাঁর নিদ্রা নাকি একেবারেই নেই! সাহেব সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন। ঘোরাঘুরিও তেমনি বেড়েছে, একদণ্ড স্থির নন্। চাঞ্চল্যও বেড়েছে।"

"আমাকে খুঁজেছিলেন কি?"

মেমসাহেবকে আনবার পরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ডাক্তারবাবু এসেছেন কি?"

ডাক্তার চিন্তিতভাবে বললেন—"এতো কি কাজ পড়লো কিছু জানো?"

"তা ঠিক জানি না। ম্যাডামের অসুখই প্রধান বলে' মনে হয়। বলেন কি—বৎসরাধিক তাঁর নিদ্রা নেই, কত বড়ো চিন্তার কথা। তবে হ্যাঁ—এর মধ্যে দু'দিন আপনাদের বোর্ডের সেই চেয়ারম্যান এসেছিলেন বটে, তাঁকে নিয়েও বেরিয়েছিলেন। সাহেবকে খবর দেবো কি? দেখা করবেন তো?"

"অমনভাবে জিজ্ঞাসা করলে সে?—সেলাম দিতেই তো এসেছি।"

কিশোরী তাড়াতাড়ি বললে—"দেবেন বই কি, নিশ্চয়ই দেবেন। এসময় তাঁর প্রাইভেট কামরায় একজন আছেন কি না, প্রায়ই থাকেন—তাই। ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর তিনি যান। তাঁর যাবার সময়ও হয়েছে। আপনি এসেছেন শুনলে—"

ডাক্তার চিন্তিতভাবে—"নিত্য আসেন? কে বলো দিকি? কোনো অফিসার নাকি? কোন' সাহেব?"

কিশোরীর মুখে এতক্ষণে হাসি এলো, বললে—তাঁর কাছে আমরাই সাহেব। এমন কালো লোক দেখেনি!

জুতোর শব্দ শুনে—"সাহেব আসছেন বোধ হয়। জানেন তো আগন্তুকদের এগিয়ে দেওয়া সাহেবের অভ্যেস। আপনি থাকুন—আমি একটু সরে যাই।"

যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি অন্যমনস্ক। ডাক্তার থাকতে না পেরে দ্রুত এগিয়ে—"একি, আপনি এখানে?" বলেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

বললেন—"আমাকে খুঁজতে নাকি? আমি এখানে তাই বা আপনি জানলেন কি করে?"

তিনি বললেন—"আমি না জানি, ভাগ্য তো সঙ্গে রয়েছে, তার চরের অভাব নেই। জানকুম বিটায়ার্ড করা মানে কাজকর্ম্মের শেষ, অর্থাৎ খতম্। তারপর বেশীদিন বেঁচে থাকাটাই মুখ্যুমি। পাপ বলতেও পারো। এটা আমার তারি সাজা ভোগ হে! ছেলেপুলে নেই তাই রক্ষে, নইলে তাদের কোলে করেই দিন কাটতো—"মিনসে বসে বসে খাবে কেনো" সে মধুর কাকুলি ত শুনতেও হোত—

—কিন্তু এ কি করলে বলো দিকি—তোমাদের ওই কিশোরীটি?—শান্তিপুরে থাকতে কিছুদিন আমার কাছে পড়া বলে নিতে আসতো, "Moral class book" পড়তো। তখন ওই বইখানির চলন বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই ছিল—ইংরেজদের বিষ্ণুশর্ম্মার বুলি বা হিতোপদেশ। সেই শান্তিপুরের কিশোরী কিনা এতদিন পরে তারি শোধ তুললে, এই অশান্তিকর immoral কাজ করলে। তোমাদের সাহেবের নায়েব হয়ে, আমার মাষ্টার বলে এই আখেরটি করলে। আমাকে তাঁর একটা বেয়াড়া কাজে জুটিয়ে দিলে।

—"আমি আর ও কাজ করব না, এখানেও থাকব না, বলায়—ভয় দেখিয়ে আমার পিতার্থীর মতো, লম্বা সদুপদেশ আরম্ভ করে দিলে! তার মর্ম্মটাই আমার সহজ ভাষায় তোমাকে বলি। তার সে জ্যেষ্ঠতাতামির ভাষা আমার আসবে না, তুমিও বুঝবে না। বললে—"খবরদার অমন ছেলেমানুষী করবেন না। সাহেব অতি চমৎকার লোক, কিন্তু রেজিমেণ্টের O/C, 'ওসি' বোঝেন তো! কিছুদিন চুপচাপ কাজ করুন। তারপর হঠাৎ একদিন—ময়লা কাপড়, জামার একটা হাতের আধখানা নেই—কাঁদতে কাঁদতে এসে—শ্রীমতী সম্বন্ধে তাঁর বিপন্ন অবস্থা জানালেই আপনাকে ছেড়ে দেবেন। বেশ করে শুনে রাখুন—মেয়েদের কথা কিনা—এই যেমন—Her son coming। very আসন্ন Sir—Belly badly heavy—No one to un-son her, বলে কেঁদে ফেলবেন। বাপ আর কথা sin like ত্যাগ করবেন, মুখে আনবেন না। wipএর কথাই ফি হাত থাকবে, আর ওই কান্নাটা। সেটা সুর বদলে যেন 'ভ্যাঁক, পর্য্যন্ত যায়।" সংক্ষেপে তার মর্ম্মটা এই ছিল। আমার প্রতি কিশোরীর কৃতজ্ঞতার বহরটা শুনলে? সে বিলিতি হিতোপদেশের moral ঝাড়তে বাকি রাখেনি!

যে Black market রেট্‌কে হাটিয়ে দিয়েছে রে পাজি। এ বয়সে না কারো বাপ মা থাকে, না পরিবার বিওয়। একি ওদের লয়েড জর্জ পেলি নাকি ?"

কথা আর বাড়লো না। সাহেব একটু আড়াল থেকেই আন্দাজে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, বেরিয়ে এলেন— "Hallo doctor কবে এলে ? খবর ভালো তো ?"

"আজ সকালে এসেছি Sir—খবরটা আপনার কাছেই শুনবো।"

সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন—"তুমি এঁকে চেনো নাকি ?" ডাক্তার বললেন—He is my uncle Kalachand—

My খুড়ো Sir—

সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—"You too have a খুড়ো, তোমারও খুড়ো আছে ? খুড়ো তোমাদের দেশে বড় সস্তা দেখছি—very cheap !

"Yes Sir—ওঁদের দয়াতেই তো আমরা সাবধান হয়ে চলতে শিখি। সর্ব্বদা আমাদের সতর্ক থাকতে ওঁরাই তো শিক্ষা দেন। আপনাদের বিসমার্কের চেয়ে বেশী "মার্কের" লোক।"

হো হো কোরে হেসে খুড়োর দিকে চেয়ে সাহেব বললেন—"আমার Doctor সম্বন্ধে তোমার opinion জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

খুড়ো বললেন—"By all means—in a word. He is my pride—এক কথায় ডাক্তার আমার গর্বের বস্তু—But too good, for this world, which is awfully civilized—I mean-amounts to 'good for nothing'—am therefore always afraid—He may someday invite trouble and suffer for nothing—may God help him—

অত ভালমানুষ এত চতুর জগতে চলে না, কোনদিন বিপদে পড়ে যাবে। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।

সাহেব হেসে বললেন—আচ্ছা, এখন তোমাদের কথা সত্বর সেরে নাও। ডাক্তারকে আমি চাই। Good day বলে ভেতরে চলে গেলেন। (ক্রমশঃ)

মেদিনীপুরের তমলুক

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

বহুদিনের আকাঙ্খিত মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহর পরিদর্শনের সৌভাগ্য এবার ঘটিয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের দেয় এই সুযোগকে লাভ করিয়া নিজকে যথেষ্ট ধন্য মনে করি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে গত মার্চ্চ মাসে মহিষাদল থানার লক্ষ্যা গ্রামে একটি জেলা হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল—সেই সম্মেলনের প্রচার কার্য্যের দায়িত্বই আমার তমলুক পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটাইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রচার কার্য্যের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ মেদিনীপুর সহরে কিছু প্রচার কার্য্য করিলাম। তারপর তমলুক সহরে আসিলাম। সহরটী রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হাট, বাজার, দোকান-পাট সবই গ্রাম্য-ধরণে সজ্জিত। সহরটী পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশন হইতে ১৩ মাইল দূরে—বাসে যাইতে হয়। যাওয়ার পথে বাস হইতেই বহু প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরগুলির কোন কোনটী তিনশত বা চারিশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। অধিকাংশ মন্দিরই সংস্কার করা হয় নাই—জীর্ণ। আর ১ ঘণ্টা পরে বাস তমলুকে পৌঁছিল। পূর্ব্ব হইতেই আমার তমলুকে যাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা ছিল—তাই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই উঠিলাম।

তমলুক খুবই প্রাচীন শহর। এই শহরটীই প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বলিয়া পরিচিত। সমুদ্রতটে সহরটী আধুনিক কলিকাতার ন্যায়-বন্দর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। দেশ বিদেশ হইতে আগত বাণিজ্য-তরণীতে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ বহুদূর ভরিয়া থাকিত। বিভিন্ন দেশের বিচিত্র নিশান বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া এক অভিনব শ্রী ধারণ করিত, এ-বর্ণনা আমরা প্রাচীন ইতিহাসে পাই। পদ্ম-পুরাণে বেহুলার উপাখ্যানে এই তাম্রলিপ্ত সহরের সহিত প্রাকৃতিক সাদৃশ্যসম্পন্ন একটি সহরের উল্লেখ আছে। উপাখ্যানে আমরা পাই—সর্পাঘাতে মৃত স্বামী লখিন্দরের শব ভেলায় রক্ষা করিয়া সতী সাধ্বী বেহুলা ভাসিয়া চলিয়াছেন দামোদরের বক্ষ বাহিয়া। ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে ভেলা একটি বন্দরে পৌঁছিল—সেখানে নেতী ধোপানী কাপড় কাচিতেছিল। এই বন্দরের বর্ণনার সহিত তমলুকের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য

আছে। সুতরাং এই তাম্রলিপ্তি শুধু ঐতিহাসিক যুগেও নয়, পৌরাণিক যুগেও যে অস্তিত্ব লইয়া জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যে পুষ্করিণীর ঘাটে বেহুলার তরণী লাগিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ সেই পুষ্করিণীটিও আমি দেখিয়াছি।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখি—বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েণ যখন ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারত ত্যাগকালীন তাঁহার বর্ণনায় পাই যে, তিনি ৪১০ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন এবং এই সহরের বিদ্যা, অর্থ, সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যখন তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—তখনও তিনি এই বন্দরেই জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি এই স্থান হইতে সিংহলে

ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তি—তমলুক

গমন করেন এবং তাঁহার সময় লাগিয়াছিল ১৪ দিন। তারপরও প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ চীন, শ্যাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ হইতে বহুশত বণিক, শিক্ষার্থী, ধর্ম-যাজক, তাম্রলিপ্তিতে অবতরণ করিয়া নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির বিদ্যাগার ও সঙ্ঘারামে আসিত। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং শ্রীবিজয় হইতে নাক্কবরম্ হইয়া আরও পনের দিনে তাম্রলিপ্তি বন্দরে পৌছিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থান, বিদ্যাগার, সঙ্ঘারামগুলি পরিদর্শনের পূর্ব্বে এক বৎসর এই তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার

করে, ফলে তাম্রলিপ্তি সহরের অবনতি ঘটিতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই তাম্রলিপ্তির অদূরবর্ত্তী গ্রামে যে তাম্রশাসনটী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্য শাসনের অনেক কথাই পাই। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

বৈকালে আমি বিখ্যাত শ্রীশ্রীবর্গভীমা মাতার মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটী সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। মন্দিরের গঠন পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। অভ্যন্তর ভাগের গঠন পদ্ধতি আরও বিচিত্র ধরণের। তমলুকে আরও একটি প্রাচীন মন্দির আছে সেটী শ্রীশ্রীবিষ্ণুহরির মন্দির। শ্রীশ্রী-বিষ্ণুহরির বিগ্রহ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসখা অর্জ্জুনের মূর্ত্তি সমন্বিত। প্রবাদ, যখন তমলুকের মহাপরাক্রমশালী রাজা তাম্রধ্বজ রাজত্ব করিতেন তখন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং অর্জ্জুন এই সহর জয় করেন।
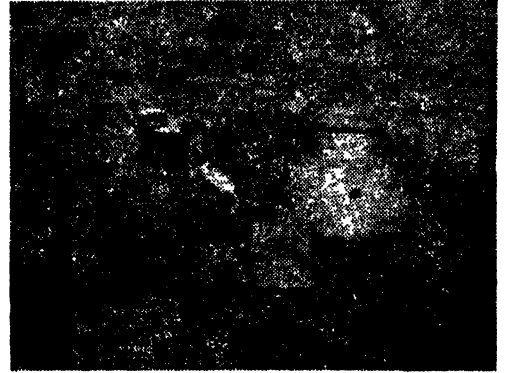
কূপ হইতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র—তমলুক

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজা তাম্রধ্বজ এই মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করান। শ্রীশ্রীবর্গভীমা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুহরির মন্দিরের গঠনপদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের, তাহাতে মনে হয় দুইটী মন্দির সমসাময়িক।

পরদিন প্রাতে আমি তমলুকের রাজা শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া বিভিন্ন প্রকারের আলোচনায় প্রায় ২ ঘণ্টা কাটিল। রাজবাড়ীর সম্মুখে একটি বৃহদায়তনের দীঘি আছে। সেই দীঘির মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ মন্দির আছে। এক বৎসর এই দীঘিটীর জল প্রায় শুকাইয়া যায়। সেই বৎসর দীঘির সংস্কারোদ্দেশ্যে খনন কার্য্য করা হয় এবং অল্প কিছু খুঁড়িতেই একটি বৃহৎ কূপ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন সহরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা, মৃৎপাত্রাদি পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি সিংহল ও অন্যান্য প্রদেশের এবং এই গুলির অনেকগুলিই খৃঃ পূর্ব্ব ৪০০ শতের আমলের। এইরূপ মুদ্রা বা অন্যান্য নিদর্শনও বর্ত্তমানে গ্রামসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি

পাওয়া গিয়াছে। যে স্থলে এই সকল সুপ্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দূরত্ব হিসাব করিলে মনে হয় যে সহরটী পূর্ব্বে প্রায় ৪।৫ মাইল বিস্তৃত ছিল।

বৈকালে আমি সহরের অন্যান্য প্রান্ত ও গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিলাম। সহরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। আমি মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য সহর বা জনপদসমূহ ঘুরিয়াছি কিন্তু এইরূপ ঘনবসতি আর কোথাও দেখি নাই। এই ঘনবসতিই প্রাচীন সহরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

তারপর স্থানীয় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে স্কুলে সংরক্ষিত মুদ্রা, প্রস্তর-মূর্ত্তি, একটি স্তম্ভ, একটি ফসিল এবং আরও কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন দর্শন করাইলেন।

প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষী হিসাবে বাংলার বক্ষ হইতে যে সমস্ত নিদর্শন মিলিয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও তমলুকের ভূগর্ভ হইতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বৈদেশিক মুদ্রা তাম্রলিপ্তি বন্দরে পাওয়া যায়। আড়াই নাক্ কবরম্, সুমাত্রা, যাভা হইতে যে সমস্ত বণিক বাণিজ্য করিতে আসিত তাহাদের আনীত মুদ্রা সকলই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। সে যাহা হউক, এই তমলুকই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৭ই মার্চ্চ প্রাতে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ মোদক, শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মোহন রায় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তমলুকে যাই এবং তাঁহাদের সকলকেই তমলুকের প্রাচীন দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাই; রূপনারায়ণ নদ ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে সহর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার নদী পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে এবং সহরটী বর্ত্তমানে একেবারে নদীর উপকূলে। নদী যে ভাবে তাহার ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে, ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই তমলুক সহরের কিয়দংশ নদীর বক্ষে বিলীন হইবে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হইয়া স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি কতকগুলি বহুমূল্য স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং কলিকাতার যাদুঘরে তাহা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তারপর সরকার পক্ষ ভূতত্ত্ববিদ্গণের সহায়তায় তমলুক সহরের নিকটবর্ত্তী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—যে স্থান হইতে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে।
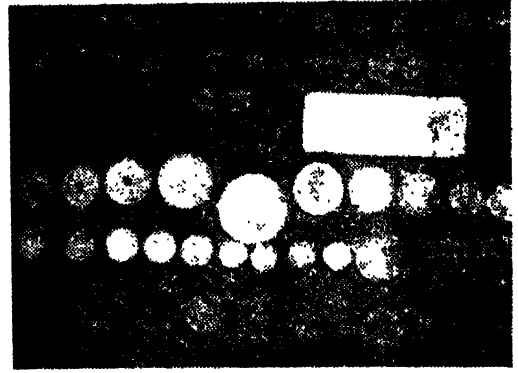
তমলুকে আবিষ্কৃত কয়েকটি মুদ্রা···মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ ৫০০ শতের বলিয়া প্রমাণিত

কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার। তাই আজ পর্য্যন্ত তাহার খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। নদী যে ভাবে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় খনন কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহর নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। তাই যাহাতে অবিলম্বে উক্ত খননকার্য্য আরম্ভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ, ভূতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অনুরাধা—জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে—এ বিষয়ে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে মতভেদ নাই। ব্রিটিশ সরকার এই জমিদারি প্রথার প্রবর্ত্তক। ভাগ্যে জমিদারি প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—তাই বাংলা কথাসাহিত্যের একটা প্রধান উপজীব্য পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে তারাশঙ্কর পর্য্যন্ত অধিকাংশ কথা-সাহিত্যিকেরই প্রধান অবলম্বন জমিদার যুবক। যে শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের লইয়া কথাসাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থাবলীতে জমিদার নায়কের সংখ্যাই বেশি। ইহার একটা কারণ, প্রেমলীলা দেখাইতে হইলে প্রেমিক-প্রেমিকাকে অন্নবস্ত্রের সমস্যা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন। অন্নবস্ত্রের সমস্যা যেখানে প্রবল, জঠরের দাবি যেখানে প্রবলতর, সেখানে হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলে না। আর একটি প্রয়োজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে সন্তান-সন্ততির দায় হইতে নিষ্কৃতি দান। সন্তান-সন্ততি প্রেমের প্রজাপতি জীবনের অন্তরায়।

অনুরাধা গল্পটির নায়ক বিজয় একাধারে জমিদার ও ব্যবসাদার। বিজয়কে ধনী এবং জমিদার বানাইবার সার্থকতা ছিল, সেহাৎ অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার [illegible]

সন্তানটি প্রেমলীলার অন্তরায় না হইয়া প্রেমলীলার সংঘটক হইয়াছে। অনুরাধা গল্পে ইহাতেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে। বিলাতফেরতা উদ্ধত ধনী জমিদার যুবক গ্রামে আসিয়াছিল একটি কুমারী যুবতীকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্ম। সঙ্গে আনিয়াছিল নিজের মাতৃহীন শিশুপুত্রটিকে। এই মাতৃহীন শিশুই ঐ যুবতীর মধ্যে নিজের জননীর অনুকল্প লাভ করিল—সে তাহার মধ্যে নিজের মাতাকে আবিষ্কার করিল। অনুরাধা শিক্ষিতা নয়, সুরূপাও নয়, প্রেমের ছলাকলাও জানে না, প্রেম নিবেদনও করে নাই, নিজের দারিদ্র্য ও অসহায়তা লইয়া সে সরিয়া থাকিতেই চাহিয়াছিল। আর বিজয় বিলাতফেরতা নব্যযুবক, একজন সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট মহিলার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াই ছিল। তবু অনুরাধা বিজয়ের হৃদয় জয় করিল। শরৎচন্দ্র অনুরাধার প্রতি বিজয়ের প্রেম সঞ্চারের দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথম, শিশুপুত্র কুমার অনুরাধার স্নেহাতিশয্যে তাহার বশীভূত হইয়া অনুরাধার মধ্যে তাহার মৃতা জননীকে খুঁজিয়া পাইল। যে শিশু কখনও মাতৃস্নেহ পায় নাই—তাহার আকর্ষণ হইল দুর্গম। সে স্নেহের আকর্ষণে অনুরাধাকে বিজয়ের হৃদয়ের কাছে আনিয়া দিল। বিজয়ও নারীহস্তের পরিচর্য্যা বহুকাল পায় নাই, তাহার তৃষিত হৃদয় অনুরাধার আন্তরিক সেবা পরিচর্য্যা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। শরৎচন্দ্র ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন—বিজয়কে আর রোগে শয্যাগত করিয়া অনুরাধাকে শয্যাপার্শ্বে আনিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

এই গল্পটির বৈশিষ্ট্য এই—যুবক-যুবতীর প্রেমসঞ্চারের মামুলী উপকরণ এই গল্পে পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ অভিনব ভঙ্গীতে পরস্পর-বিসংবাদী বহুদূরবর্ত্তী দুইটি হৃদয়কে এই গল্পে মিলাইয়াছেন। রচনায় কলাশ্রী কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গল্পটি যেভাবে উপসংহৃত হইয়াছে তাহাও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরই উপযুক্ত। অলিখিত পরিচ্ছেদটি যে ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর কবল হইতে অনুরাধার উদ্ধার এবং সবৎসা ধেনুর মত অনুরাধাকে কুমারের সহিত গৃহে আনয়ন—তাহা যদি কেহ না বুঝিয়া থাকেন—তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া তিনি যেন বারবার বৃথা ক্ষুব্ধ না হ'ন।

মন্দির—মন্দির গল্পটিতে বেশ একটি গীতিকবিতার সুর আছে। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র শক্তিনাথের জীবনে একটি আর্টিষ্টের মানস সঞ্চারিত করিয়াছেন। শক্তিনাথ কুমারবাড়ীতে পুতুল তৈরির কাজে সহায়তা করিয়া আনন্দ পাইত কিন্তু তাহার বড়ই ক্ষোভ—পুতুলের গায়ে কুমারদাদা বড় অযত্ন করিয়া রঙ দিত—কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। কুমারের কৈফিয়ৎ—ভাল ক'রে এঁকে ফল কি, এক পয়সার পুতুল ত আর কেউ চার পয়সায় কিনবে না। সত্যই ত! পুতুল কিনিবে বালকে, দুদণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে, তারপর ভাঙিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত? আর্টিষ্টের মন কোনদিন তাহা বুঝে নাই। তাই শক্তিনাথ যখন পুতুলে রঙ দিবার অধিকার পাইল—তখন সে একবেলা ধরিয়া একটি পুতুলকে চিত্রিত করিল।

পিতার মৃত্যুর পর শক্তিনাথকে ঠাকুর গড়া ছাড়িয়া ঠাকুর পূজা করিতে হইল। এ যেন আর্টিষ্টকে সমালোচকের কাজে নিয়োগ করা। "পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন রঙ বেশি মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়—কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয় এসব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না।"

শরৎচন্দ্র এই শক্তিনাথের জীবনের দ্বারা দেখাইতে পারিতেন মূর্ত্তি-রচনার আনন্দময় সাধনা হইতে মূর্ত্তিপূজার জীবন আবেষ্টনীতে নীত হইয়া শক্তিনাথের শিল্পিমনের কিরূপ Tragedy ঘটিল—শরৎচন্দ্র এই প্রত্যাশা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার কল্পনায় অপর্ণাই প্রাধান্যলাভ করিল—শক্তিনাথ একটা উপকরণে পর্য্যবসিত হইল। শক্তিনাথের জীবনকে আর আগাইতে দেওয়া হইল না। জীবন্ত মানুষের প্রতি বিরাগিণী জড় দেবমূর্ত্তির অনুরাগিণী অপর্ণার উদাসীন চিত্তকে আঘাত দেওয়ার জন্য শক্তিনাথের মৃত্যু ঘটাইলেন।

মন্দিরের মধ্যেও নূতন শিল্প সাধনার অবকাশ ছিল—শক্তিনাথের শিল্পিমানসের সার্থকতাও তিনি মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে দেখাইতে পারিতেন।

শরৎচন্দ্র কাশীনাথের জ্ঞানাসক্ত প্রকৃতিকে অপর্ণার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন—কেবল জ্ঞানের স্থলে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জ্ঞান-চর্চ্চা ঐন্দ্রয়িক আকর্ষণের পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির আবেদন ত তাহা নয়। যাহাই হউক, অপর্ণা নিজের প্রেমে অমরনাথকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে নাই। অপর্ণার দাম্পত্যজীবনে একটা বিপ্লব ঘটিল—কিন্তু শরৎচন্দ্র সে বিপ্লব লইয়াও অগ্রসর হইলেন না। অমরনাথ চিত্তে ক্ষোভ লইয়াই মারা গেল। ইহাকে ঠিক দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার পরিণাম বলা যায় না। দেবমন্দিরের প্রতি অপর্ণার অনুরাগ এতই অধিক যে অতিসহজেই সে বিধবা হইয়া দেবমন্দিরেই ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যজীবনকে ভুলিয়া গেল। অমর-নাথ জানিয়াছিলেন—অপর্ণা পাষাণী। পাষাণ মন্দির যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছিল—সে ভাবিল দেবতার আহ্বানে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে ভাবিল ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। জীবন্ত মানুষের প্রতি যাহার দরদ নাই, পাষাণ মূর্ত্তিই যাহার সব, শরৎচন্দ্র তাহার চিত্তে শেষ আঘাত দিবার জন্য মন্দির হইতে বিতাড়িত পূজাপুষ্পের মত সুরভি ও শুচি শক্তিনাথের জীবনাবসান ঘটাইলেন। নীলখোসের লিপি দুটি লইয়া অপর্ণা দেবতার পায়ে রাখিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমি যাহা লইতে পারি নাই—তাহা তুমি লও। নিজের হাতে আমি কখন পূজা করি নাই আজ করিতেছি! তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

ফেলারামবাবুর চিঠি-সমস্যা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল

আচ্ছা মশায়, আপনারা রোজ কে ক'খানা করে চিঠি পান বলুন ত? আর লেখেন ক'খানা করে?

আপনারা হয়ত আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যাবেন। বলবেন: ভদ্রলোক বলে কি? আমরা কে ক'খানা করে চিঠি পাচ্ছি, আর লিখছি—সে খবরে তোমার দরকার কি বাপু? চিঠিপত্রের আদান প্রদানটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, অথবা আপিস সংক্রান্ত হলে সেটা আরো বেশি গোপনায়। বাইরের লোকের সেখানে মাথা গলাতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা মাত্র।

কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন? আমি নজির খুঁজছি। মানে, পত্রজগতে আমার মনের ভাব এক এবং অদ্বিতীয়, না তার কোনো দোসোর আছে? অর্থাৎ আমার সম-মনোভাবাপন্ন আর কেউ আছেন কিনা, তাই আমার জ্ঞাতব্য।

নববিবাহিত দম্পতিকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি না। কারণ আমার বিবাহিত জীবনের নবীনতা অনেক-দিন কেটে গেছে। সে যুগের ভাবের বাহনগুলোকে (উভয় পক্ষের) গৃহিণী তাড়া-বন্দী করে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। ভয়, পাছে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল দৃষ্টি গিয়ে তাদের উপর পড়ে। মজা দেখুন ত! একদিন যে চিঠির জন্য উভয় পক্ষ তীর্থের কাকের মত পিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকা যেত, চিঠি এলে আনন্দের সীমা থাকত না, একই জিনিস বার বার পড়েও সাধ মিটত না, না পেলে জগতকে অন্ধকার মনে হত,পরস্পরের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত, মান-অভিমানের অন্ত থাকত না—প্রথম যৌবনের সেই রঙিণ চিঠিগুলোর আজ এই দুর্দশা। একেই বলে 'কালের কুটিল গতি'—আর কি।

আমার মত হয়েও যাঁদের থেকেও নাই, অর্থাৎ প্রথম যৌবনকে পিছনে ফেলে রেখে এসেও যাঁদের সপরিবারে সব সময় একত্র বাস করবার দুর্ভাগ্য হয় নাই, তাঁদেরও আমার কোনো জিজ্ঞাস্য নাই। বিরহী যক্ষের মত তাঁরা শুধু বর্ষা কেন, ষড় ঋতুতেই ষোড়শ প্রকারে বিরহের আনন্দে মিলনের দুঃখ স্মরণ এবং উপভোগ করুন, এবং পত্রদূতের সাহায্যে অভাব ও অসুবিধার চিরন্তন কার্য্যের আদান-প্রদান করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাঁদের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হতে পারে; কিন্তু মশায়, পুরানো জুতো পরে আরাম আছে। যেখানে বরাবর পা দুটি থাকে, ঠিক সেই-খানে গিয়ে পড়বে। দু'একটা পেরেক যদি একটু আধটু খোঁচাও দেয়, তাও কড়াপড়া জায়গায় বিঁধতে পারবে না। নূতন জুতা কিনবার সামর্থ্য নাই বলার চেয়ে পুরানো জুতার আরাম অনেক বেশি, এই কথা বলাই ভাল নয় কি? তাই তাঁরা মহা আরামে বিরহের সুখে কাতর হোন, আর পত্র-দূত এলেই সশঙ্কচিত্তে দুরু দুরু বক্ষে তার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাঁদের আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

আর, আপিসের গোপনীয়তার কথা বলছেন? না মশায়, আপিসের কোনো কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না। ও যারা আপিসে কাজ করে, তাদের কাছেই ভালো। আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে কাজ নাই।

আমি তাঁদেরই একথা জিজ্ঞাসা করছি, যাঁদের আমার মত চিঠি-বাই আছে - না পেলে মন কর্ কর্ করে, পেলে অস্বস্তি বাড়ে, উত্তর দিতে গিয়ে সংসার খরচে টান পড়ে।

উত্তর দিলেই প্রত্যুত্তর পাবার আশঙ্কা থাকে এবং আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা যদি অন্ততঃ দশজনও হয়, তা'হলে চিঠির আদান-প্রদান ব্যাপারটা প্রাত্যহিক কর্মেরই সামিল হ'য়ে পড়ে। চায়ের সময় চা-টি না পাওয়া গেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, ডাকের সময় চিঠি না আসলে মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যায়। তারপর চিঠি আসুক আর না আসুক, চিঠি একখানা করে না লিখলেও মনে শান্তি আসে না। বন্ধুদের চিঠির উত্তর না দিলে তাঁরা অসামাজিক জীব ভেবে কথার চাবুক মেরে সামাজিকতার নিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন; গুরুজনদের চিঠির উত্তর না দিলে তাঁরা ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়বেন, আর স্নেহাস্পদ স্নেহাস্পদাদের ত কথাই নাই।

তারপর ধরুন, আপনার যদি একটু আধটু লেখার সখ থাকে—মানে, সাহিত্য জগতে একটুখানি আসন পাবার জন্য যদি আপনি উৎসুক হয়ে থাকেন, তাহলে ঐ দশজনা ছাড়াও আরো কয়েকজন অতিরিক্ত লিখন-বন্ধু জুটবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত লিখন-বন্ধুরা বড় নির্দয়। নববধূকে চিঠি লিখবার সময় যেমন খামের ভিতর ডাক-টিকিট পুরে দিতেন, এঁদের চিঠি লিখবার সময়ও তেমনি উত্তর পাবার প্রত্যাশায় ডাকটিকিট অথবা ঠিকানা-লেখা খাম দিতে হয়। তা সত্ত্বেও কেউ উত্তর দেন, কেউ দেন না। টিকিট দেওয়া সত্ত্বেও বধূ চিঠির উত্তর না দিলে মান-অভিমান রাগরোষ করা চলত; কিন্তু এঁদের উপর তা করবার জো নাই। এঁরা হলেন সাহিত্যিক জগতে প্রবেশ পথের দ্বাররক্ষক। এঁদের চটালে সাহিত্যিক যশ-প্রার্থীর আখেরে ভালো হয় না। এ কথা তাঁরা ভালো করেই জানেন এবং আপনি আমিও ঠকে শিখেছি। তাঁরা উত্তর দেন আর না দেন, আপনাকে প্রাণের তাগিদে লিখতেই হয়, আর উত্তর পাবার প্রত্যাশায় প্রত্যহ ডাক আসবার সময় ছেলেকে ডাক ঘরে পাঠাইতেই হয়।

না, যুদ্ধের বাজারে আমার চাকর বাকর রাখবার মত আর্থিক সংস্থান নাই। ছেলেটা আট পেরিয়ে নয়ে পা দিয়ে লায়েক হয়ে উঠেছে। সেই গিন্নীর আর আমার ফাই ফরমাস খেটে থাকে। ফরমাসগুলো গিন্নীরই বেশি, আমার কেবল রোজ সকাল নটার সময় একবার করে ডাক-ঘর যাওয়া আর আসা। কিন্তু কেমন অবিচার দেখুন, গিন্নীর তাতেই রাগ। বলেন, তোমার ঐ চিঠি-চিঠি করে ছেলেটার নাওয়া খাওয়া গেল। ওকে আর পড়তে শুনতে হবে না, না?

আধ ঘণ্টার জন্য ডাকঘর যাওয়া আর আসা। তাতেই যদি ছেলেটার মাথা খাওয়া যায়, তাহ'লে তার মাথায় যে কিছু নাই, এই কথাই বলতে হবে। কিন্তু বলবার উপায় নাই। বলতে গেলেই এখনি বলে বসবেন, কাগজে লেখা ছাপা হলেই যেন এখনি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। কাগজের অভাবে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারছে না, আর উনি দিস্তার পর দিস্তা কাগজে ছাই ভস্ম লিখে চলেছেন, আর গাঁটের পয়সা খরচ করে সেগুলো খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাচ্ছেন। তাও যদি সবলেখা ছাপত, কিম্বা ছাপা হলে কাগজের দামটাও দিত—

না মশায়, মেয়েমানুষের সঙ্গে বাজে তর্ক করতে নেই। তাই আমি চুপ করেই থাকি। কাজ কি ঘাঁটিয়ে। সাহিত্যিক হতে হলে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, তা অসাহিত্যিক হয়ে উনি কি বুঝবেন!

তারপর আবার ব্যাপার দেখুন। আমার চিঠিপত্র এলে গেলেই ওঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠে, সংসার খরচে টান পড়ে। কিন্তু চিঠিপত্র বিষয়ে উনিও যে আমার কাছা-কাছি যান, সে কথা আর বলে কে? অর্ধাঙ্গিনী যখন তখন দশজনের অর্ধেক, মানে পাঁচজন পর্যন্ত আমার বরদাস্ত করাই উচিত। কিন্তু তাঁর তিন সহোদরা, দুই সহোদর, এক গঙ্গাজল, এক ব্রজধূলি, তারপর তাঁর নিজের মাতা—এইগুলি আবশ্যকীয়। অতিরিক্ত কেউ নাই, তাই রক্ষা। তাঁর সহোদরা-পতিরা এবং শ্বশুরমশায় আমার ভাগে পড়েছেন। সাম্যের যুগ বলেই চুপ মেরে থাকতে হয়। চুপ মেরেই আমি থাকি, কিন্তু আমার এই একা চিঠি লেখার জন্যই সংসার খরচে টান পড়ছে, একথা যখন শুনি তখন সত্যিই অসহ্য ঠেকে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন যদি ঠিক হয়, তবে আটে দশে পার্থক্য কোথায়, অঙ্কে তাঁর মাথা পরিষ্কার থাকলেও এ সামান্য কথাটা কেন যে তাঁর মাথায় ঢুকে না তা ভেবে আমি অবাক হই। আমার অতিরৈক্তিক লিখনবন্ধু আছে, তাঁর নাই। তার জন্যও কি আমি দায়ী?

এই যুদ্ধের ধাক্কায় খরচপত্র নিয়ে কে বেসামাল না হয়ে পড়েছে বলুন? মসীজীবীদের ত হাড়মাস ক্ষয়ে গেল। কাগজ মিলে ত কালি মিলে না, কালি মিলে ত কাগজ মিলে না। কালি কলম কাগজ মিলল ত অভাব অনটনের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল, লিখতে বসে খেই হারিয়ে গেল। কোনো মতে লেখাটা যদি বা খাড়া করা গেল ত মাসিকে স্থানাভাব। নিজে খরচ করে ছাপতে যাবেন ত প্রেস-ওয়ালারা লোকাভাব এবং কাগজের অভাব জানিয়ে সাফ্ জবাব দিয়ে বসবে। লেখা ছেড়ে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টারীর খোঁজ করব কিনা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ যুদ্ধ গেল থেমে। এতে আর আমার অপরাধ কোথায় বলুন?

অথচ হিসাবটা খুব জটিল নয়। অংকে আমার ভালো

মাথা না থাকলেও আমি এটুকু বুঝি যে, চিঠি লেখা বাবদ দৈনিক গড়পড়তা দু'আনা করে খরচ করলেও বার্ষিক সেটা পঁয়তাল্লিশ টাকা দশ আনায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই টাকাটা যদি যুদ্ধের পূর্বে দশ বছর ধরে জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে যুদ্ধের সময় কোনো একটা ব্যবসা করা যেত, অথবা কোনো কণ্ট্রাক্টারী নেওয়া যেত—তাহলে সেই চারশ একষট্টি টাকা বার আনা কোন্ না আজ কমপক্ষে চার হাজার ছ'শ চৌদ্দ টাকায় এসে দাঁড়াত। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। আগামী দশ বছরের মধ্যে যদি আবার যুদ্ধ বাধে—সেই আশায় আবশ্যকীয় এবং অতিরিক্ত সব রকম চিঠির আদান প্রদান বন্ধ করে দিব কিনা; সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। সেই জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার মত অবস্থায় আপনারা কেউ পড়েছেন কিনা? পড়ে থাকলে আমি যেমন ভাবে ভাবছি ঠিক সেই রকমভাবে ভাবছেন কিনা? ভাবলে আমি যে সম্ভাবনার ইঙ্গিতটা করছি, তা কাজে খাটানো চলতে পারে কিনা, তাই অনুগ্রহ করে বলবেন আমাকে। ধরুন, যুদ্ধটা যদি আর না-ই বাধে তবু আপনার জমানো টাকাটা মাঠে মারা যাবে না। আপনার অবর্তমানে ছেলেরা নিশ্চয় সে টাকাটা কোনো না কোনো কাজে লাগাবে।

"ওগো শুনছ?"

এমন মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর বহুদিন কানে প্রবেশ করে নাই। লেখা ছেড়ে অর্ধাঙ্গিনীর দিকে তাকাইতেই দেখি তাঁর হাতে একখানা চিঠি। সাগ্রহে বললাম, "ডাকঘর থেকে ফিরল ছেলেটা? মোটে একটা চিঠি এসেছে আজ?"

তিনি হাসিমুখে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমার নয়, আমার। 'চলতি জগৎ' মাসিকের অফিস থেকে এসেছে। আমার একটা গল্প মনোনীত হয়েছে, তার সংবাদ।"

খবরটা পড়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। উনিও যে আবার সাহিত্য-সাধনায় মন সংযোগ করেছেন, তা জানতাম না। আর আমার ভাববার কোনো কারণ নাই। এ এমন এক নেশা যে, একবার ধরতে আরম্ভ করলে আর ছাড়বার যো থাকে না। নাম আমার ফেলারাম হলেও কথাটা কিন্তু ফেলনা নয়। তবু নেহাৎ কর্ত্তব্যবোধে সতর্ক করবার জন্য বললাম, "দেখ, তোমার নামে লেখা ছাপা হবে, এতে অবশ্য আমারও গৌরব বোধ হবে। কিন্তু লেখা ছাপিয়ে লাভ নাই কিছু। অনর্থক কতকগুলো অপব্যয় মাত্র।"

বুঝতেই পারছেন, এর উত্তরে আমি কি পেলাম। যাক, বাঁচা গেল। আর হিসাব পত্রে কোনো কাজ নাই। যুদ্ধ না বাধলে সামান্য টাকাতে বড়লোকও হওয়া যায় না। তবে আর মিছামিছি কেন চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করি। যাঁর আপত্তি ছিল তাঁর মুখও বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের টানাটানির কথা বললে, এর পর আমিও কিছু মুখ খুলতে কসুর করব না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার বাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সত্যসন্ধী আচার্য্যের তিরোভাবের সহিত ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় স্মৃতির শেষ অধ্যায় রচিত হইলেও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দরপণের কলঙ্ক, অন্যায় অনাচার ও দুর্নীতিতে রাহুগ্রস্ত নরনারীর নিকটে আচার্য্যের জীবনবেদ, ষোল আনা সত্যের গবেষণার কথা, অমৃত সমান। আচার্য্যদেব ছিলেন তিনপুরুষ বাঙ্গালীর দরদী আদর্শ গুরু। বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা তিনি চিরকাল জানাইয়াছেন, দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী যুবক কিসে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে তাহার জন্য এই শিক্ষাব্রতী "আপনি আচরি ধর্ম্ম" অপরকে শিখাইবার জন্য পরিণত বয়সেও আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যায় বিপন্ন নরনারীকে, গৃহহারা পরিশ্রান্ত দুঃস্থকে একমুষ্টি অন্ন ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলিহস্তে উল্কাপিণ্ডের মতন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং দেশের যুবকদিগকে মনুষ্যত্বলাভ করিয়া শান্ত ও সমাহিত জীবনযাপন করিবার আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতি: জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর নিকটে আজও অপূর্ব্ব বিস্ময়। আচার্য্যদেবের স্বপ্নের "এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ" বাঙ্গালী শতবৎসরের সংগ্রামের পরেও "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া উপলসঙ্কুল বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করিতেছে। আচার্য্যের অসাম্প্রদায়িক বাণী তাই আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়, ও সকল আদর্শবাদীর আশাপ্রদীপ।

টাঙ্গাইলে, জীবন সায়াহ্নে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটুকুরা রত্ন তাঁহার শ্রান্তক্লান্ত দিশাহারা ভাইভগিনীদের জন্য এখানে উপস্থিত করি।

ছত্রিশ রকমের পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিবদমান জাতির মধ্যে আচার্য্যের মতসমন্বয়ের আদর্শ, মন্দির মসজিদে এবং দেউলের বিভিন্ন চৌহদ্দীর মধ্যে বিশাল ও বৈচিত্র্যময় পৃথিবীই ব্রহ্মের মন্দির, সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং। আচার্য্যদেব বলিতেন মানুষের মনের গোঁড়ামি তখনই লোপ পাওয়া সম্ভব, যখন মানুষের মনে এই শাশ্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তনী সত্যের উদয় হয়। মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে এই সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ মানবদেহই শুভ্র মন্দির এবং মানুষের জীবন্ত মনই এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পূজারি তখন সে কেমন করিয়া এই দেহকে পাপে মলিন ও কলঙ্কিত করিতে সক্ষম হইবে। ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন এই প্রাণময় পূজাপদ্ধতি আচার্য্যদেব মনপ্রাণ দিয়া "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তঃ" গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব বলিতেন এই সাধনায় মানুষের মনে দুর্নিবার শক্তির সৃষ্টি হয়। ইহাকেই তিনি মানবজীবনের Storage battery বলিতেন। রসায়নশাস্ত্রের চর্চার সহিত তিনি ধর্ম্মজীবনকে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—গবেষণার মূলসূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান। গবেষণায় যেমন ফাঁকি চলে না ধর্ম্মজীবনেও ঠিক তাই। সারাজীবনের কাজে উপাসনার ছন্দ যদি ফুটিয়া না উঠে তবে সকল কিছুই বৃথা "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনম চ তদুপাসনামেব", সুদীর্ঘ জীবনে জীবন বিধাতার প্রিয়কার্য্যের সাধনাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি বলিতেন আমি মার্কামারা তিলকধারী ব্রাহ্ম নই এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমি একটি hidebound, creedbound, লোহার ছাঁচে ঢালা হাত পা বাঁধা dogmatic religion বলিয়া কোনও দিন বুঝি নাই এবং গ্রহণ করি নাই। চিরগতিশীল এবং চিরচলিষ্ণু মনুষ্য সমাজ, জলস্রোতের ন্যায় অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে ইহা ছিল তাঁহার বিশ্বাস, তাই ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে ever wakeful ever progressive and ever expanding। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিতে দেখিয়া তিনি মাঝে মাঝে হতাশ হইতেন এবং বলিতেন যুক্তির দ্বারা সত্যমিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। তিনি বলিতেন যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকটে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ বাহিরে জন সমাজে এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই, সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তিনি বলিতেন, এদেশে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতি দেশকাল—লোকাতীত মহামানবসকল এই সত্যের উপরেই জীবনকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, ঠিক এই কারণে মহাত্মা গান্ধীকে তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং "বার সেপাহীর তের হাঁড়ি" লইয়া তিনি বহু বক্তৃতা ও বহু চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিস্মৃত হইয়া M. Sc. পাশ বরকে পালটী ঘরের উপযুক্ত যৌতুক লইয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা প্রায় বলিতেন। "স্নেহলতার" আত্মহত্যা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল এই সকল সামাজিক পাপের জন্য বাংলার যুবশক্তিকে দায়ী করিয়া তিনি তীব্র কশাঘাত করিয়াছিলেন। নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ আদর্শের ভনিতা করিয়া যাহারা পাশ্চাত্যের দুষ্টব্যাধি আমদানী করিতেছেন তাহাদের নিন্দা করিতে গিয়া Co-education, Birth control, Nudist Colony স্থাপন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের খোসাভূসি অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড টিটকারী করিয়া গিয়াছেন। বিদেশের চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব প্রভৃতির বাহ্যিক অনুকরণকেই তিনি ধারকরা খোসাভূসি বলিতেন, তাঁহার মতে মানুষের সত্য পরিচয় তাহার অন্তরাত্মার পবিত্রতায়। উচ্চ আদর্শের নামে আপোষকে তিনি ঘৃণা করিতেন এবং উদ্দেশ্যমূলক মিতালীর তিনি বিরোধী ছিলেন। স্বার্থরক্ষার অজুহাতে হরিজন আন্দোলনের প্রতি তাহার তেমন প্রীতি ছিল না, "সকল মানবই এক বিধাতার সন্তান এবং এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ" এই সত্যাদর্শের উপর স্থির হইতে পারিলেই হরিজন ও বর্ণহিন্দুর ভেদাভেদ বিদূরিত হইবে—ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস।

নরনারী সকলের সমান অধিকার

(যার) আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাতবিচার।

হিন্দুসমাজ এই আদর্শ গ্রহণ করিলে Communal Award এর প্রয়োজন হইত না ইহা তিনিই বলিয়াছেন। দুঃখ করিয়া তিনি বলিতেন, কত তিলি, তাম্বুলী, সুবর্ণবণিক ও বৈশ্য সাহা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা, শীলতা এবং সংস্কৃতিতে এমন লোক রহিয়াছেন যাঁহারা আভিজাত্যগর্ব্বিত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন। এই সম্পর্কে দেশবিখ্যাত কতিপয় পণ্ডিতদের নামও তিনি উল্লেখ করিতেন। হিন্দুসমাজকে বাঁচিতে হইলে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ বর্জ্জন করিবার উপদেশ তিনি বহুভাবে দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুসমাজের অন্যতম পাপ দ্বিধাহীনভাবে বর্জ্জন। স্ত্রীকে দস্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ পুরুষের স্ত্রীত্যাগকে তিনি নির্লজ্জ কাপুরুষোচিত কাজ বলিতেন। আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, হিন্দুসমাজ ছুতা পাইলেই বর্জ্জন করিতে জানে—কিন্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণী বিভেদের ফলে বিবাহাদির অসুবিধার জন্য সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, যাহারা থাকিতেছে তাহাদেরও নৈতিক স্বাস্থ্য নানাকারণে দুষ্ট ও নৈতিক শুভবুদ্ধি হৃত। এই সকল কারণে তিনি প্রায় জাপানের সামুরাই জাতির উল্লেখ করিয়া বলিতেন, সামুরাইদের মতন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যদি তাহার সামাজিক বিশেষ অধিকার ও আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে একাধারে পুরাতন ব্রাহ্মণদের মতন ত্যাগী, ক্ষত্রিয়দের মতন বীরব্রতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ না হয় তবে এ জাতির মুক্তির আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বিড়ম্বনা মাত্র। আচার্য্যদেব দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, চামার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠো ভাতের জন্য আমার দুয়ারে আসে তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করি না সত্য, কিন্তু পাতের [illegible]

অস্পৃশ্য ; তাহাকে বলি ঐ দূরে বাগানের কোণে গিয়া বস্, সকলের খাওয়া হলে পাত্ কুড়ানো সব পাবি। এই সকল অশিক্ষিত মূক, নির্য্যাতিত নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গুটীকয়েক আত্ম-প্রতারিত শিক্ষিত যুবকদিগকে বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করিয়া উপরে জল ঢালিতে দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন আর বলিতেন

হে মোর জননি
সাত কোটী বাঙ্গালীরে
রেখেছ বাঙ্গালী করে
মানুষ কর নি।

দধীচির মতন তিল তিল করিয়া আচার্য্যদেব আমাদের জন্য শেষ রক্ত-বিন্দুও দান করিয়া গিয়াছেন, বিংশশতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক এই মহান গুরুর সাধনায় আমাদের অনেকটা অধিকারগত, স্বাধীনতার দ্বারে উপস্থিত হওয়ায় যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহুও বাঙ্গালী যুবকের করায়ত্ত। ভবিষ্যতের বাঙ্গালীকে আচার্য্যদেবই পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের চলার পথের সকল বাধাবিপত্তি বিদূরিত হউক। আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,

এস কে আছো হৃদয়বান, কে আছ প্রেমিক, কে আছ কর্ম্মী, কে আছ বীর, উহাদিগকে—সহস্র বৎসরের সামাজিক অত্যাচারে পশুত্বে যাহারা পরিণত—উহাদিগকে উঠাও, তোল মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালায়, বারোয়ারী মণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে বাটে, ঘাটে, বাজারে বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার মৃতসঞ্জীবনী লইয়া যাও, আর বল মহানিশার অবসান হইয়াছে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।

সংস্কৃতিরক্ষার উপায়

পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

মোগল, পাঠান দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে টিকিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ বেশীদিন পারিল না।

রাজনীতির দিক্ হইতে ইহার একটা ব্যাখ্যা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর একটা দিক্ দিয়া আলোচনা না করিলে ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝা যাইবে না।

পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতি এ দেশ হইতে ইংরাজকে তল্পীতল্পা গুটাইতে বাধ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, ইংরাজ এ দেশের সঙ্গে নিজেকে মোটেই খাপ খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়াই এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

মোগল পাঠানও হিন্দুস্থানে বিদেশীর মতই আসিয়াছিল, নানা অত্যাচারের কলঙ্ক আজও তাহাদের স্থায়িত্বের অনেক অংশ মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাপি তাহারা একটা দরদ দেখাইয়াছিল—ভারতবর্ষকেই তাহারা তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আর ভারতবাসীর প্রাচীন সমাজজীবনকে তাহারা কোনদিনও ওলোট্-পালোট্ করিতে চাহে নাই। দুই একজন সম্রাট দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আঘাত হানিতে গিয়া ব্যাহত হইয়াছিলেন। এই যে সমাজজীবন অব্যাহত ধারায় চলিতে পাইয়াছিল, ইহারই ফলে ভারতে সুদীর্ঘকাল মুসলমানের টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব হিন্দুর এই সমাজ-জীবনে আঘাত হানিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধতার চূড়ান্ত চিত্র তাই ভারতের মানচিত্র হইতে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত বৈভব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে যে সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরতাকে বীরত্বের নামে অর্দ্ধসহস্র বৎসর মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল, সেই সোমনাথ আজও রহিয়াছে—যাহারা ভাঙ্গিয়াছিল, আজ তাহারাও তুল্য গোলাম হইতে বাধ্য হইয়াছে। সোমনাথ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গা যায়, কিন্তু সোমনাথের যে অধিকার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের হৃদয়মন্দিরে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, সে অধিকার অক্ষুণ্ণই রহিল।

গাজ্নীর সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচাইয়া মুসলমান যেদিন এদেশেরই মাটিকে মা বলিয়া ডাকিল, আমরা সোমনাথের ব্যথা ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু সোমনাথকে ভুলি নাই। তাই মোগল পাঠানের মৃত্যুতে আনন্দ পাই নাই। আজও সিরাজদ্দৌলা, টিপু সুলতানের জন্য স্মৃতিসভা হয় ; নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে বাহাদুর সার সমাধিক্ষেত্রে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা যে ভয়ানক ভাবপ্রবণ, এতটুকু আত্মীয়তার গন্ধ পাইলেই যে আমরা স্নেহান্ধ না হইয়া পারি না। ইংরাজ আমাদের এদিক্টা বুঝিয়াও বুঝিল না। সাংঘাতিক শোষণ-বুদ্ধি তাহাদিগকে এতকাল শুধু পর পর করিয়াই রাখিল। তাহারা চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া কাহারও তাই এতটুকুও দুঃখ হইতেছে না ; নানা ছলে পাছে না যায়, বরং এই আশঙ্কাই অনেককে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাস কবে আসিবে—ইহারই জন্য দিন গণিবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। এক ফোঁটা অশ্রুজলও সে আজ জনাকয়েক **vested interest** ছাড়া কাহারও চক্ষে সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই। এতবড় বুদ্ধিমান হইয়াও ইংরাজ আজ সত্যসত্যই নিতান্ত বুদ্ধিহীন সাব্যস্ত হইয়া গেল।

শুনিয়াছি ৺গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন—"ইংরাজ, তুমি সত্যসত্যই ভারি বীর। তোমার বুদ্ধিও আছে, বীরত্বও

আছে। তুমি গখাদ্য ভোজনটা ত্যাগ করিয়া এদেশেই যদি স্থায়ীভাবে বাস করিতে পার, তবে তোমায় ক্ষত্রিয় বলিয়া চালাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। এদেশের সমাজে যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একবার ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হইতে পার, তবে আর তোমার মার নাই। তুমি এদেশেতে চিরকাল টিকিতে পারিবে।" একজন টিকিধারী পণ্ডিতের কথাটার তাৎপর্য্য তাহার মগজে ঠিকমত প্রবেশ করে নাই। বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধিই তাহাকে বড় করিতে লাগিল। শিখ, গুর্খা, মারাঠা, রাজপুত—একের দ্বারা অপরকে দমন করিবার কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি দেখিয়া ইংরাজ তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিল। বল-নাচে নাচিয়া নাচিয়া বীরত্বের সমাধি রচনা করিল। ডান্‌কার্কের কেলেঙ্কারী তাহার মুখ দেখানো ভার করিয়া তুলিল। ভারতকে দাবাইয়া রাখিবার মত আজ আর না আছে তাহার বীর্য্যবল, না আছে ধনবল, জনবল। আর সর্ব্বোপরি তাহার মনোবল পর্য্যন্ত ঘুচিয়াছে।

ধনজন কাহারই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনোবল তাহার নষ্ট হইল কেন? ইংরাজ ভারতকে আত্মীয় করিতে পারে নাই, বরং ভারতীয় মহত্বকে চূর্ণ করিবারই চক্রান্ত করিয়া আসিয়াছে। মোগলের অত্যাচারের কথাগুলিই ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিতে পারিয়াছে, কিন্তু আজও শা' আলম্ বাদ্‌শার ফার্ম্মান্ দ্বারা অধিকার গৌরীদাস স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমন্দিরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, তাহার কথা কোথায় লিখিয়াছে? সুখে দুঃখে এদেশের ভালো মন্দের সঙ্গে মোগল যেমন করিয়া কতকটা আপনার হইতে পারিয়াছিল, ইংরাজ কুত্রাপি তাহা পারে নাই।

ইংরাজ ভাঙ্গিতে শিখাইয়াছে—গড়িতে চাহে নাই। ফলে ভারতের শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন দ্রুত উপদ্রুত হইয়াছে। ঠগীদের বিচারের রিপোর্ট দাখিল করিবার সময় কর্ণেল শ্রীমান্ বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"উহাদের মধ্যে এমন অসংখ্য ঠগীকে দেখিয়াছি, যাহারা সামান্য একটা মিথ্যা কথা বলিলেই হয়ত তাহাদের ধন, সম্পত্তি এমন কি জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা পাইতে পারিত, কিন্তু একজনও মিথ্যা কথা বলে নাই।" ভারতের এই সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া ইংরাজ বিস্মিত হইয়াছিল—তারপর কি করিয়া কি হইল, সে সুদীর্ঘ ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। ফল হইয়াছে এই যে, ইংরাজ যাইবার সময় দেখিতেছে—ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে অধর্ম্মের বন্যা বহিতেছে, সত্য আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, মিথ্যা নানা আবরণে রাজসম্মানে বিভূষিত। এ অবস্থায় ইংরাজ যাইতেছে বলিয়া দুঃখ করিবার কিছুই থাকিল না। বরং ইংরাজের আমলে আমাদের সংস্কৃতির ধারা যে ভাবে উৎসাদিত হইতে চলিয়াছে, কেমন করিয়া এখন তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়, সেই ভাবনাতেই ভারতবাসী আকুল হইয়াছে।

এককাল যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে; কিন্তু যাই যাই করিয়া এইবার ঠিক জাহাজ ভাসাইবার আগে ইংরাজ যেভাবে এদেশের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ উৎপাত হইবার অবসর করিয়া দিল, যাহারা সংস্কৃতি রক্ষায় এতটুকুও দরদী, তাহারা কোনদিনই তাহা ক্ষমা করিতে পারিবে না।

Eastern Express (৬, মার্চ ১৯৪৭) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—

We hear so much about the efficiency of British administration in India and the ability of British officers. But is not Calcutta where there is so little security of life and property at the present moment still administered by a British Police Commissioner? Does not the ultimate responsibility for the maintenance of law and order and the investigation of crimes lie upon him? Is not Calcutta the seat of the Chief Secretary and the Home Secretary, both of whom are British? The pretention of provincial autonomy can not absolve them of their responsibilities

প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার এখন যে তাহার ভাণমাত্র এ কথাও পরবর্ত্তী ছত্রেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

If the Minister's words are so sacred, then how did the officers in the Civil Service and the Imperial Police flout the Ministers' instructions during the 1942 movements?

এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ১৯৪২ সালেও ইংরাজের আশা ছিল, আরও কিছুকাল ভারতে সাম্রাজ্য সুখভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু আজ আর তাহার সে আশা নাই। পার্লামেণ্টে চার্চ্চিলের দল চীৎকার করিতে থাকিলেও, ইংরাজজাতি আর ভারতকে তাবে রাখিতে যে অশক্ত, শ্রমিক সরকার অকুণ্ঠ কণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজকে এদেশ ছাড়িয়া যাত্রা করিতেই হইবে।

কিন্তু এই মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিরও যে মহাযাত্রার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এ দেশের যে শিক্ষাপদ্ধতি যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের সমাজ জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার বন্যা-প্লাবনে তাহার মূলোচ্ছেদ হইবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, এ দেশের টোলগুলি প্রায়ই সব উৎসাদিত হইয়াছে। প্রাচীন গৌরবের অবদানপরম্পরা যাহারা বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহাদের অধিকাংশেরই বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহারা মরে নাই, তাহাদের খুবই কঠিন 'জান্' সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারাও কতক না পাইয়া তিলে তিলে মরিতেছে, আর কতক 'বুদ্ধিমান্' ইংরাজীয়ানার আওতায় আত্মরক্ষা করিয়া সাময়িক পরিত্রাণের পথ করিয়া লইয়াছে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা-পরম্পরা এখন কেমন করিয়া যে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে, তাহাই এখনকার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম সমস্যা।

দেশে এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক গুণ্ডামী চলিবেই। ১৯৪৮ সালের জুন মাস তো দূরের কথা—তাহার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার ভরসা নাই। সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী [illegible] [illegible]

সঙ্কটপূর্ণ। এই সময় একদল ত্যাগী দেশসেবক চাই, যাহারা আমাদের সংস্কৃতি রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিবে। স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় কারাবরণ —এমন কি ফাঁসীর মঞ্চে মরণ স্বীকারেও এ দেশের ছেলেরা পশ্চাৎপদ হয় নাই, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া তিলে তিলে মরণ স্বীকার করিয়া লইয়াও নিজেদের সংস্কৃতির ধারা রক্ষায় উৎসাহী দল কোথায়? এই দলের অভাব হইয়াছে—সাহসের অভাব জন্য নয়, সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেমেরই অভাবজন্য।

অথচ এই সংস্কৃতি ঘুচিয়া গেলে, আমাদের রহিল কি? মোগল পাঠানের মতো ইংরাজের রাজ্যও হয়তো ঘুচিল। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি—আমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত জগন্মঙ্গল সংস্কৃতির পবিত্র ধারা ঘুচিতে দিব কেন? যাঁহারা আজ সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যশোকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, তাঁহারা তো জানেন, রাশিয়া আজ পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব নিদর্শনগুলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমরাই তবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিব কেন? ভারতের গর্ব্ব গৌরবের অনেক কিছু ঘুচিয়াছে, এখনও যাহা আছে, তাহাও কি পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু নয়?

বাঙ্গালোর হইতে এই সেদিনও তো সংবাদ বাহির হইয়াছে—৮০ বৎসর বয়স্কা এক বিধবা ভিখারিণী তাহার সারা জীবনের ভিক্ষালব্ধ সঞ্চয় মোট ১ হাজার টাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিয়া বলিয়াছে যে, এই টাকার উপস্বত্ব যেন উলসূরের ঠাকুর শ্রীসোমেশ্বর স্বামীর মন্দিরে পূজায় ব্যয় করা হয়।

টাকার পরিমাণ বেশী নয়, কিন্তু প্রাণের পরিমাণ কতখানি?

এত কাণ্ডকারখানার পর আজও এই চিত্র লোপ পাইল না। শক্রর মুখে ছাই দিয়া ভিখারিণী তাহার হৃদয়-স্বামী সোমেশ্বর স্বামীকেই ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে।

ভিখারিনী যাহা করিল, ভিখারীর দলের তাহা দেখিয়া কি চৈতন্যোদয় হইবে? আমাদের পবিত্র সংস্কৃতি বাঁচাইয়া রাখিতে একদল কি অগ্রসর হইবে?

নির্লিপ্ত মৌলিকগণ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণ কমল রায়

আমাদের পৃথিবীটা বিরানব্বইএর আওতার মধ্যে আছে। ইহার যাবতীয় শরীর—বৃক্ষলতা, গাছপালা, পশুপক্ষী, পাহাড়পর্ব্বত, জল-বায়ু একান্তভাবে ঐ বিরানব্বইটী মৌলিকেরই পরিণতি। মৌলিকদের মধ্যে কোন কোনটী একা থাকিতে ভালবাসিলেও প্রয়োজনমত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, ইত্যাদি এই শ্রেণীর মৌলিক। আবার উহাদের কোন কোনটা মোটেই একা থাকিতে পারে না, যুক্তাবস্থায় থাকাই উহাদের স্বভাব। ঐ যুক্তাবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের কতকগুলি আইন্ কানুন মানিয়া চলিতে হয়। উহাদের বলে রাসায়নিক গঠন প্রণালী। মৌলিকগণ যখন উহা রাসায়নিক প্রণালী মাফিক পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয় তখন আমরা ঐ যুক্তফলকে 'যৌগিক' আখ্যা দিয়া থাকি। কাজেই এ বিশ্ব সংসার যৌগিক ও ও মৌলিকেরই রাজত্ব। মৌলিকদের মধ্যে কিছু দিন হয় একটি তৃতীয় শ্রেণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহারা কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে রাজি নয়। মৌলিকদের যুক্ত হওয়াটা আমাদের সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সামিল। মৌলিকদের মধ্যে কতকগুলি ঘোর সংসারী, কতকগুলি অর্দ্ধসংসারী, আবার কতকগুলি মোটেই সংসারী নয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুগুলি সংসারী হইলেও নির্লিপ্ত। সংসার জীবন গ্রহণ করিয়াও ইহারা মহান। পটাসিয়াম, সডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিণ, ব্রোমিন্, ইত্যাদি মৌলিকগণ ভীষণ সংসারী। এক মুহূর্ত্ত সংসার ধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত হইতে ইহাদের বাসনা নাই। দুনিয়াটা প্রকৃতপক্ষে রক্ষা ক'রে ইহারাই। তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকগণ জীবনে কখনও সংসার আস্বাদন করে নাই। উহারা নিত্যমুক্তের মত। শুনিয়াছি নিত্যমুক্তেরা অজর, অমর হইয়া শূন্যে বিরাজ করেন। আমাদের এই নিত্যমুক্তগণও আকাশে থাকিতেই ভালবাসে।

মহাত্মা লর্ড র‍্যালে (Rayleigh) এই মুক্ত মৌলিকদের আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে আকাশে বায়ুর $\frac{4}{5}$ ভাগ নাইট্রোজেন ও $\frac{1}{5}$ ভাগ অক্সিজেন। এই যে বিভাগ ইহা যথার্থ বিভাগ নয়। চুলচেরা বিচার করিলে উহাদের ছাড়াও বায়ুতে ৫টী মৌলিকের অবস্থান দেখা যায়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেভেনডিস, এক সময় তাহার পরীক্ষাগারে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর বেশীদূর অগ্রসর হন নাই। কেভেনডিস্ কতকটা পরিমিত বায়ু হইতে নেত্রজান ও অক্সিজেনকে একদম অপসারণে চেষ্টিত হন্ কিন্তু দেখা যায় তাহার সমস্ত চেষ্টাতেও বায়ুর $\frac{1}{120}$ ভাগ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই শেষাংশ অক্সিজেনও নয়, নাইট্রোজেন ও নয়। প্রায় ৫০ বৎসর পরে লর্ড র‍্যালে কেভেনডিসের পরীক্ষণ ব্যাপারটীতে মনসংযোগ করেন এবং প্রমাণ করেন যে ঐ অবশিষ্ট গ্যাসটুকু নিশ্চয়ই কোন নূতন মৌলিক। পণ্ডিতপ্রবর স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে এ সময় র‍্যালের সহায়ক ছিলেন। দুইজনের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে আরগণ নামক মৌলিকটা ধরা পড়ে (১৮৯৪), প্রথমতঃ পণ্ডিত-সমাজ উহাদের ঘোষণাকে অবহেলা করেন, কিন্তু ক্রমশঃ উহাদের যুক্তি তর্কের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হন্। সকলেই ইহা মানিয়া

লইয়াছেন যে, বায়ুতে আরগণের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ। ইহা বর্ণহীন, অক্সিজেন ও নেত্রজান হইতে দেড়গুণ ভারী।

পরবর্তী শীতকালে র‍্যামজে যখন আরগণ অবস্থিতির নূতন সূত্র খুঁজিতেছিলেন ঠিক সেই সময় স্যার হেন্‌রি মায়ারস্ তাঁহাকে একটি খনিজ পদার্থ পরীক্ষা করিতে দেন্। র‍্যামজে ইহা নিয়া পরীক্ষা করিতে যাইয়া অপর একটি মৌলিকের সন্ধান পাইলেন। ইহার নাম "হিলিয়াম"। ইহাও একটি বর্ণহীন নির্লিপ্ত মৌলিক। হাল্‌কা হিসাবে ইহার স্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পরেই। ইহা বায়ুতে ২০০,০০০ ভাগে এক ভাগ আছে।

আরগণ ও হিলিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতদের বদ্ধ ধারণা জন্মে যে বায়ুতে নিশ্চয়ই আরও কয়েকটা নির্লিপ্ত মৌলিক আছে। কারণ দেখা গিয়াছে—কোন পরিবারই একটি দুইটী মৌলিক দ্বারা সাধারণতঃ গঠিত নয়। এই ধারণায় উৎসাহিত হইয়া র‍্যামজে ও তাঁহার সঙ্গীগণ বায়ুতে উহাদের তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে থাকেন এবং ১৮৯৮ খৃঃ উহারা সত্য সত্যই ক্রিপটন্, জেনন্ ও নিয়নের সন্ধান পান। কিন্তু শেষোক্তকে পাওয়ার জন্য ডর্ণ নামক পণ্ডিতের ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ক্রিপটন্ আছে বায়ুতে ৬৫০০০ ভাগে এক ভাগ; জেনন্ আছে ১,০০০,০০০ ভাগে ১ ভাগ ও নিয়ন আছে ১১,০০০,০০০ ভাগে এক ভাগ। প্রথম দিক দিয়া উহারা সকলেই পণ্ডিতদের নিকট কৌতূহলের বস্তু ছিল, ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োগ করার কোন সুযোগ সুবিধা না পাওয়াতে তখন কেহই উহাদিগকে বেশী প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হয় নাই। তৎপর প্রায় ২০ বৎসর পরে প্রমাণিত হয় যে নির্লিপ্ত হইলেও আরগণ একদম অকর্ম্মণ্য নয়। আরগণের স্ফুটানাঙ্ক নাইট্রোজেনের ১০ ডিগ্রি বেশী, অক্সিজেনের ৩ ডিগ্রি কম। বায়ুকে তরল করিলে,তরল বায়ু হইতে জেনন্ সর্ব্ব প্রথম উড়িয়া যায়, তৎপর ক্রিপটন্, অক্সিজেন, আরগণ, নেত্রজান ও সর্ব্বশেষে নিয়ন ও হিলিয়াম একে একে বাহির হয়। ইহাদের কাজেই বাষ্পীকরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ করা যায়। নির্লিপ্ত আরগণকে পাইয়া মানুষ ধন্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা বিদ্যুৎ আলো গোলোকের মধ্যে বিরাজ করিয়া ইহার প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে। এখন পূর্ব্বের মত গোলকের তার ততটা নষ্ট হয় না। একমাত্র এই ব্যাপারেই প্রচুর আরগণ লাগে।

আমেরিকাতে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ হইতে হিলিয়াম প্রায়শঃ উত্থিত হয়। ইহাও নির্লিপ্ত, কাজেই দাহ্য নয়, অথচ বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা; এই সমস্ত গুণের সাহায্য পাইয়া বৈজ্ঞানিক ইহাকে ব্যালুন, বা উড়োজাহাজে ব্যবহার করেন। নিয়ন্ গ্যাসটা ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যুৎবাহী গোলক নিয়ন পূর্ণ থাকিলে ইহা হইতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সময় কমলা বর্ণ আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই উজ্জ্বল আলো দ্বারা বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীগণ রাত্রিতে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে আরগণের পরিবর্ত্তে ক্রিপটন্ ও জেনন্, বিদ্যুৎ গোলকে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে ইহাতে গোলকের জীবন ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ১২০০ টন্ তরল বায়ু হইতে ১ পাউণ্ড জেনন্ পাওয়া যায়।

বিষকন্যা

শ্রীআশা দেবী এম-এ

হে রূপসী তব ঊষর বুকের মাঝে,
ফোটে নাকি সেথা কামনার শতদল--
অকারণে কভু বিমনা হও না সাঁঝে?
গোধূলি আঁধারে হও নাকি বিহ্বল?
তুলসীর মূলে জ্বালো নাকি তুমি আলো,
সন্ধ্যা-শঙ্খ বাজে না তোমার ঘরে?
নিশার আঁধারে শুধু ছায়া কালো কালো
ঘুরে মরে শুধু তব অঙ্গন পরে।
চক্ষে তোমার যে নীল-কাজল-রেখা,
সে যে মরীচিকা---সাহারার মায়া রাগ,
লীলালক্তকে কার শোণিতের লেখা,
আলুল বেণীতে গর্জ্জায় কাল-নাগ।
হে বিষকন্যা, একি খেলা অভিনব!
ছলনা তোমার নিত্য নূতনতরো।

একি অভিসারী সজ্জা রচেছ নব,
হে মৃত্যুরূপা—মানসী মূরতি ধরো।
হে ছলনাময়ী, হে অভিশপ্তা নারী!
তুমি চিরদিন জ্বালো মরু বুকে তৃষা,
বাঁধ নাকো ঘর তুমি চিরপথচারী,
তোমার আকাশে ঘন দুর্যোগনিশা।
তব অভিমানে অশ্রু বারি যে ঝরে,
ধারা নয় সে তো তরল বহ্নি-জ্বালা,
তব নিশ্বাস ওড়ে বৈশাখী ঝড়ে,
ঝরা-উল্কায় তোমারি ছিন্নমালা।
হে স্বর্ণমৃগ, তোমার বিনাশ নাই,
তিল তিল বিষে তুমি যে তিলোত্তমা,
কত ট্রয় কত কুরুবর্ষেতে তাই,
জ্বলে তব রূপ কৃষ্ণ-বহ্নি সমা।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্র দেব

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

বিমলশাহী মন্দির পরিবেষ্টনীস্বরূপ অলিন্দ প্রদক্ষিণ ক'রে ও তৎসংলগ্ন ৫২টি তীর্থঙ্করের গুহামন্দিরগুলি দর্শনান্তে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে তার মধ্যস্থলে নির্ম্মিত সেই মর্ম্মর মণ্ডপটিতে গিয়ে উঠলুম। এটি যেন অনেকটা সেই গর্ভ মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরের মতো।

মর্ম্মরনির্ম্মিত বৃহৎ আটটি স্তম্ভের উপর সেই নাটমণ্ডপের বিশাল গম্বুজ। এক একটি দিন উদয় অস্ত যদি কেবল এক একটিমাত্র স্তম্ভ গাত্রে সেই নিপুণ শিল্পীদের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি ও কারুকলার বৈচিত্র্য অনন্যমনে অনুধাবন করবার অবকাশ পেতুম তাহ'লে হয়ত সেগুলি আশ মিটিয়ে দেখা হ'ত। কিন্তু সময় ছিল না। ৬টায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হ'য়ে যাবে।

"একরাত্রি শুধু পরমায়ু—!
তারি মাঝে শুনে নিতে হবে—
ভ্রমর গুঞ্জন গীতি,
বনান্তের আনন্দ মর্ম্মর !"

স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্য শিল্প ভারতে যে একদিন চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল একথা দিলবারা মন্দির ও তাজমহল দেখবার পর আর অস্বীকার করবার উপায় নেই! ভারতবাসীদের যারা বর্ব্বর ও অসভ্য বলে পৃথিবীর লোককে বোকা বুঝিয়ে এসেছেন, তাঁদেরও এখানে এলে আর বাক্যস্ফুরণ হবে না!

সুচারু স্থাপত্যকলা ও সুরম্য ভাস্কর্য্য শিল্পের এখানে একেবারে রাজযোটক হয়েছে যেন! কারু ও কলার মহামিলনের ঐক্যতান ছন্দ বেজে চলেছে যেন এই মন্দিরের দিকে দিকে। যুগে যুগে কালে কালে তা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে বিস্ময়স্তম্ভিত দর্শকের বিহ্বল মনে আনন্দের তালে তালে! অন্তরে অন্তরে গুঞ্জরণ করে ওঠে এই মর্ম্মর সঙ্গীতের মর্ম্মগীতি। অনুরণিত হয়ে ওঠে মুগ্ধ হৃদয়ের দিক্‌দিগন্ত—

"তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী !
আমি শুনি—শুধু অবাক হয়ে শুনি !"

কারুকার্য্যখচিত তিনটি প্রশস্ত মর্ম্মর সোপান ব'য়ে আমরা উঠলুম গিয়ে প্রধান মন্দিরের চত্বরে। প্রশস্ত চত্বর, উন্মুক্ত দ্বারপথেই দেখা যাচ্ছে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত জৈন তীর্থংকর আদিনাথের সমুজ্জ্বল বিরাট মূর্ত্তি। মণিময় তাঁর নয়নে মাণিক্যপ্রভার দ্যুতি, বিবিধ মহামূল্য রত্নাভরণে ভূষিত তনু। কিন্তু মূর্ত্তিটি বিবসন। পূর্ব্বদৃষ্ট ৫২টি তীর্থংকরেরও প্রত্যেকটির মূর্ত্তিই বিবসন, কিন্তু নিরাভরণ নন কেউই! প্রত্যেকেরই চক্ষে বক্ষে নাভিকুণ্ডে স্কন্ধদেশে ভ্রূমধ্যে ও পাদপদ্মে মূল্যবান মণিরত্ন সন্নিবেশিত রয়েছে।

নাটমন্দিরের গম্বুজটির অভ্যন্তরভাগে চক্রাকারে পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা আছে অপ্সরী বিদ্যাধরী ও গন্ধর্ব্বকন্যাদের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গীতে গঠিত প্রতিমূর্ত্তি। অলিন্দেরও প্রত্যেক চন্দ্রাতপে (ceiling) কোনোটিতে উৎকীর্ণ করা আছে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কমলকলির সঙ্গে কল্পলোকের ফুলকারি। কোনোটিতে ইন্দ্রসভার উর্ব্বশী মেনকাদের লীলায়িত নৃত্য। কোনোটিতে তেত্রিশ কোটী দেবতাদের সমাবেশ! রামায়ণ, মহাভারতের কত কাহিনীই না উৎকীর্ণ রয়েছে প্রত্যেক স্তম্ভ গাত্রে! স্তরে স্তরে খোদিত আছে নানা বিচিত্র শিল্প কলার সুচারু পরিকল্পনার সঙ্গে—দেবাসুরের যুদ্ধ, সমুদ্রমন্থন, শিবতাণ্ডব, মদনভস্ম, মোহিনীরূপ ইত্যাদি নানা পৌরাণিক কাহিনীর মূর্ত্ত আলেখ্য মন্দিরটির সর্ব্বত্র!

গণপতি, কার্ত্তিকেয়, বীণাপাণি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, যক্ষ, বিদ্যাধর, কমলা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর নয়নাভিরাম দিব্য মূর্ত্তি। আর আছে—নিখুঁত বাস্তব রূপে পরিবেশ-সমুদ্ভাসিত ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, বৃষ, গরুড়, হংস,

প্রধান মন্দিরের চত্বরে

প্রথম জৈন তীর্থংকর—আদিনাথজীর মূর্তি

মকর, ময়ূর, মৎস, মৃগ প্রভৃতি দেববাহন ও কল্পতরু, মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি দেবতরু। ধ্বজপতাকাসমন্বিত কত রথ, কত যুদ্ধরত সৈনিকের দল ও কিন্নর কিন্নরীর কমনীয় মূর্তি

প্রবাদ যে এই অম্বাদেবীর মন্দিরটি অতীব প্রাচীন। বিমলশাহী মন্দির নির্ম্মিত হবার বহুপূর্ব্ব হ'তে এই মন্দিরটি এখানে ছিল। এই প্রাচীন মন্দিরটিকে অক্ষত রাখবার জন্যই নাকি বিমলশাহকে তাঁর মন্দিরের নক্সা বাধ্য হয়েই এইরূপ আয়তক্ষেত্রাকারে করতে হয়েছিল। অম্বাদেবীর মহার্ঘ বসনপারিপাট্য যে কোনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মন্দির দ্বারে এক ভৈরব মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এক হাতে অসি আর এক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। পাশেই একটি কুকুর রুধির পানের জন্য লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিমলশাহি মন্দির দেখে আমরা বেরিয়ে এলুম পার্শ্ববর্ত্তী বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি দেখতে।

এই উভয় মন্দিরের সংযোগস্থলে আছে বিমলশাহের হস্তীশালা। এই হস্তীশালার প্রবেশ পথে স্থাপিত আছে স্বয়ং বিমলশাহের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি। হস্তীশালার মধ্যে দশটি বড় বড় মার্ব্বেল পাথরে তৈরী শ্বেত হস্তী রয়েছে। প্রত্যেক হস্তীপৃষ্ঠে এক একজন আরোহী ছিল। তাদের অধিকাংশই আজ অদৃশ্য হয়েছে। কে বা কারা সেগুলি ভেঙে নিয়ে গেছে জানা নেই। পাছে বাকীগুলিও অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভয়ে হস্তীশালাটি আজকাল সুরক্ষিতভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে।

বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি ১২৩১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়েছে। দ্বাবিংশতম জৈনতীর্থঙ্কর নেমিনাথজীর নামে ধনী শ্রেষ্ঠী বাস্তুপালও তেজপাল দুই ভাই মিলে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর মন্দির যেমন বিগ্রহের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাতার নামে 'বিমলশাহী মন্দির' বলে পরিচিত, এ মন্দিরটিকেও তেমনি লোকে 'নেমিনাথের মন্দির' না বলে বাস্তুপাল তেজপালের মন্দির বলে।

বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি তৈরী হয়েছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় দুটি মন্দিরই যেন একই শিল্পীর হাতে গড়া! দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ব্যবধানেও ভারতের অতুলনীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের যে এতটুকুও অবনতি ঘটেনি এটা বড় কম বিস্ময় ও গৌরবের কথা নয়! সব চেয়ে আশ্চর্য্য হ'তে হয় এই ভেবে যে, আবু পর্ব্বতের ধারে কাছে কোথাও মর্ম্মর-শিলার অস্তিত্ব মাত্র নেই! না জানি কত দূরদূরান্তর থেকে বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা এই মর্ম্মর প্রস্তর এত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল এবং সেগুলিকে টেনে তোলা হয়েছিল এই পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে উঠবার যে কোনও ভাল ও সুগম পথঘাট ছিলনা একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কেমন করে তাঁদের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল ভেবে দিশেহারা হ'তে হয়। যে মন্দিরের এক একটি স্তম্ভ, এক একটি তোরণধনু, এক একটি গম্বুজ ও ছাদের নিম্নভাগের বিভক্ত ছত্রী বা চন্দ্রাতপগুলির অপরূপ ভাস্কর্য্য শিল্প ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে একটা গোটা দিনেও কুলিয়ে ওঠেনা, না জানি এ মন্দির শেষ করতে কতগুলি শিল্পীর কতকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করতে হয়েছিল!

নেমিনাথের মূর্ত্তিও মহামূল্য মণিরত্নালঙ্কারে ভূষিত। সর্ব্বত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে এত মূল্যবান রত্নাভরণে মণ্ডিত করে রাখার তাৎপর্য্য বা সার্থকতা কিছু বুঝলুম না! জৈন ভক্তদের অস্বাভাবিক গহনাপ্রীতি ছাড়া এ পুঞ্জ পুঞ্জ রত্নগুলির আর কি অর্থ হ'তে পারে?

পূর্ব্বেই বলেছি পরিকল্পনার দিক থেকে দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দিরের সঙ্গে দু'শো বছর আগের তৈরী প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দিরের বিশেষ কোনও পার্থক্য চখে পড়ে না। তবে, এ মন্দিরটির গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ বা নাটমন্দির বিমলশাহী মন্দিরের চেয়ে বড় ও অনেকটা উঁচু, স্তম্ভগুলিও দীর্ঘতর, এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া জৈনধর্ম্ম পুরাণোক্ত কয়েকটি মূর্ত্তি ও দৃশ্যাবলীও উৎকীর্ণ আছে এর মন্দিরছত্র বা চন্দ্রাতপতলে। নানাদিক দিয়ে এ মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য্য আরও সুসঙ্গত, সাবলীল, সূক্ষ্ম রুচির পরিচায়ক এবং সুসম্পূর্ণ ও উন্নত ধরণের বলা চলে। সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর নিয়ত অনুশীলনের ফলে ভাস্কর্য্য শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের এ উৎকর্ষ লাভ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিকল্পনার কোনও নূতনত্ব না দেখতে পেয়ে বোঝা গেল এদের হাত এগিয়েছে, কিন্তু মাথা পিছিয়ে পড়ে আছে।

দিলবারা

বাস্তুপাল ও তেজপাল মন্দিরাভ্যন্তরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য শিল্প বলা যায় মণ্ডপের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণ বসন্তোৎসবের একটি দৃশ্য। মধুঋতুর আবির্ভাবে মিলনব্যাকুল তরুণতরুণী যেন সারা প্রকৃতির আনন্দ স্পন্দনের সঙ্গে তাদের যৌবনের ছন্দকে বন্ধহীন করে মুক্তি দিয়েছে! ধনদাত্রী লক্ষ্মী ও জ্ঞানদাত্রী বাণীকে উপেক্ষা করে তারা ঋতুরাজ বসন্তের অনুগত হয়ে মন্মথের উপাসনায় প্রমত্ত!

অগণিত পশুপক্ষী, ফুলফল, মাল্য, মুকুট ইত্যাদি ছাড়া প্রসারিত বেদীপৃষ্ঠে বিবিধ ভঙ্গীতে অসি-চর্ম্ম-ধনুর্ধর অনেকগুলি বীর যোদ্ধার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

নেমিনাথের প্রধান মন্দিরের দু'পাশে দুটি বৃহৎ কুলুঙ্গী আকারের প্রাচীর গাত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এ দুটির স্থানীয় নাম "দুরানী-জিঠানী কি-আলিয়া"। প্রবাদ যে বাস্তুপাল ও তেজপাল দুই ভাইয়ের পত্নীদ্বয় তাদের নিজেদের অর্থকোষ থেকে সওর লক্ষ টাকা এক একজন ব্যয় করে এ দুটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। চমৎকার এর পরিকল্পনা। নিখুঁত এর গঠনভঙ্গী। আমরা দেখি আর ভাবি যে মন্দিরের দেওয়ালে দুটি কুলুঙ্গী নির্ম্মাণ করতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, সে মন্দিরটি গড়তে না জানি কত কোটি টাকাই ব্যয় হয়েছে!

মর্ম্মর মাল্য-তোরণ

বাস্তুপাল ও তেজপাল মন্দিরের আশ্চর্য্য নিদর্শনগুলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য বস্তু হ'চ্ছে—পাল ও মাস্তুল শোভিত সাগর-গামী সুদৃঢ় তরণী নিচয়! এই অর্ণবপোতগুলির অস্তিত্ব দর্শকদের কাছে এই কথাই সপ্রমাণ করে যে 'একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগর-ময়!' কথাটা মিথ্যা নয়। নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধনী শ্রেষ্ঠী বাস্তুপাল ও তেজপাল হয়ত, সমুদ্রে বাণিজ্য জাহাজ ভাসিয়ে দেশ দেশান্তরে আমদানী-রপ্তানীর কারবার চালিয়েই এমন অগাধ অর্থশালী হয়েছিলেন, যে অর্থ বলে শ্রেষ্ঠী বিমলশাহের মতো তাঁরাও একদিন রাজা বীরধবলের মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিলেন।

বিমলশাহী মন্দির ও বাস্তুপাল-তেজপাল মন্দির, দিলবারার পরম বিস্ময়কর এই দুটি মন্দির দেখে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভারতীয় শিল্প-কলার একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ফার্গুসান্ সাহেব স্থাপত্য কলাও ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্যের তুলনামূলক বিচারে কোনটি অধিকতর সুন্দর বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"Were twenty persons asked which of these two temples is the more beautiful, a large majority would, I think, give their vote in favour of the more modern one, which is rich and exhuberant in ornament to an extent not easily conceived by one not familiar with the usual forms of Hindu Architecture.......I prefer infinitely the former, but I believe that nine tenths of of those that go over the building prefer the latter."

একটি স্তম্ভের কারুকার্য

সুতরাং কোনটি বেশী ভালো, এ বিচার আমাদের মতো আনাড়ীদের না করাই ভালো।

বাকী আর তিনটি মন্দিরের একটি হ'ল 'চৌমুখীজীর'র ত্রিতল মন্দির। এ মন্দিরের মর্ম্মর স্তম্ভগুলির ও উৎকীর্ণ মূর্ত্তি কয়েকটি স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্য শিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়টি 'শান্তিনাথজী'র মন্দির, আর তৃতীয়টি বাচ্ছাশাহী মন্দির। এ ছাড়া দিগম্বর জৈনদেরও একটি মন্দির আছে। কিন্তু, শেষোক্ত গুলির মধ্যে স্থাপত্য কলা বা ভাস্কর্য্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ নিদর্শন পাইনি।

অচলগড়

দিলবারা মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে যেন আমাদের আশা আর মিটছিল না। কিন্তু শিল্পীর মূর্ত্তকল্পনার সেই মর্ম্মর-স্বর্গ ছেড়ে আমাদের আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসতেই হল। গাইড স্মরণ করিয়ে দিলে ৬টার ঘণ্টা পড়ে গেছে। আমাদের এতক্ষণ সেদিকে কোনও খেয়ালই ছিল না।

মন্দিরের বাইরে পা দিতেই নবনীতা বললে—তৃষ্ণা পেয়েছে। জল খাবো।

তাকে ধমক দিয়ে তৃষ্ণা ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। এই পাহাড়ের মন্দির-চত্বরে জল কোথা পাবো?

গাইড বললে—খুব ভাল জল পাওয়া যায়। একটু অপেক্ষা করুন, এখনি এনে দিচ্ছি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি বড় পিতলের গ্লাস ভর্ত্তি জল নিয়ে এল সে। পার্ব্বত্য কূপের সুশীতল পানীয়। খুকুকে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান করতে দেখে আমরা সকলেই পিপাসা বোধ করলুম।

একে একে সকলকেই গাইড আমাদের জলদানে তৃপ্ত ক'রে বখ্‌শিসের মাত্রাটা বাড়িয়ে নিলে।

আমরা দ্বার-রক্ষীর নিকট গিয়ে আমাদের গচ্ছিত সমস্ত চর্ম্ম সম্পদ যে-যার বুঝে ফেরত নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

মন্দিরের নির্গমন পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পৌছে দেখি, একটি চমৎকার চা'য়ের আড্ডা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের চা-চাতকদের গতি সেখানে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরের প্রবেশপথে এটির অস্তিত্ব কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কারণ, মন্দিরের আগমন-নির্গমের পথ দু'টি ভিন্ন। মন্দিরের মধ্যে দেখা হয়েছিল যাঁদের সঙ্গে সেই পার্শী পুরুষ ও মহিলার দল এবং কয়েকজন গুজরাটি সহযাত্রী সেখানে ইতিমধ্যে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল।

চা পানের অবসরক্ষণে তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় হল। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর এবং কলকাতার অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। নোয়াখালি ত্রিপুরা চাঁদপুরের খবর তখন সারাভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার ১৬ই আগষ্ট ও ২৬শে অক্টোবরের হাঙ্গামাও তাঁদের কাণে পৌঁছেছে। তাঁদের সঙ্গে অল্প আলোচনায় বুঝলাম বাংলাদেশের বুকে যে মর্ম্মন্তুদ আঘাত বেজেছে, তার গুরুবেদনার রক্তাক্ত তরঙ্গ সুদূর রাজপুতানার এই প্রত্যন্ত সীমার মানুষগুলিকেও বিচলিত করে তুলেছে। অখণ্ড ভারতের এই আত্মিক যোগ, এই অন্তরের ঐক্যের আন্তরিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলুম। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠলো—

"...ইঙ্গিতে এনেছ বহে তুমি—
খণ্ড নহে এ ভারত, অখণ্ড এ মানবের মহাজন্মভূমি!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত মিথ্যারে করেছে বরণীয়,

জাতিধর্ম্ম নহে তার আপনার সত্য পরিচয়,
প্রাণের অন্তর্লোকে মানুষ কোথাও ভিন্ন নয়।
ভিন্ন জাতি—ভিন্ন ভাষা—ভিন্ন বর্ণ—বাহিরের রূপ ;
মানুষের দেশ নহে মৃত্তিকার তলে খণ্ড ক্ষুদ্র মণ্ডুকের কূপ !"

আমরা বহুদিন দেশছাড়া। বললুম—হালের খবর সঠিক জানিনা। আপনাদের মতোই সংবাদপত্র থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি তাই আমাদের পুঁজি। তবে ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু আছে। তারই সঠিক বিবরণ তাঁদের কিছু কিছু শোনালুম।

সমস্ত শ্রোতার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় আরক্তিম হয়ে উঠতে দেখেছি। অসীম সহানুভূতি ও সমবেদনা ফুটে উঠেছিল তাদের বিস্মিত ও বিস্ফারিত চোখে।

আমাদের গাড়ী এসে হয়ত অপেক্ষা করছে ভেবে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ঘনঘন হর্ণ দিয়ে বাসওয়ালারা যাত্রীদের ডাক দিচ্ছিল। তারাও ছুটোছুটি করে এসে যে যার সব বাসে উঠে পড়লো। ওদের বাস ছেড়ে দিলে। মেয়েরা হেসে রুমাল নেড়ে বাসের জানালা থেকে বিদায় জানালে। ছেলেরা হাত নেড়ে জানালে—চললুম।

যাত্রী নিয়ে সেদিন দিলবারায় দুখানি বাস এসেছিল। দুখানিই বেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়ীর তখনও দেখা নেই।

যাঁরা পায়ে হেঁটে এসেছিলেন তাঁরা পদব্রজেই রওনা হলেন। পড়ে রইলুম শুধু আমরা। অর্থাৎ আমাদের দল এবং আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত, তাঁদের বৃদ্ধা জননী এবং দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশু !

সন্ধ্যা দ্রুত এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ের উপর হঠাৎ ঝপ ক'রে অন্ধকার হয়ে যায় ! এদিকের পথে আলো নেই। আবুশহরের সীমানা পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক আছে, তারপর অন্ধকার ; শ্রীমতী গুপ্ত ফেরবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিশু দুটির খাবার সময় হচ্ছে, এখনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। রাত্রে এই খোলা পার্ব্বত্য পথে ঠাণ্ডা লেগে যাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বললেন—মা বুড়োমানুষ, উনি থাকুন আপনাদের সঙ্গে গাড়ীতে যাবেন। আমি আর উনি ছেলেদের নিয়ে হেঁটে চলে যাই।

বললুম—পাহাড়ী পথ প্রায় দেড় মাইল দু'মাইল হবে। ছেলেদের কোলে নিয়ে এতটা রাস্তা হাঁটতে পারবেন কি ? কষ্ট হবে যে !

শ্রীযুক্ত গুপ্ত হেসে বললেন—"সেদিন সানসেট্ পয়েন্টে হেঁটে গিয়ে হেঁটে ফিরে ওঁর সাহস বেড়ে গেছে। এখন পথচলার প্রতিযোগিতায় উনি আপনাদের সকলকে হারিয়ে দিতে পারবেন।"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন—দেড়মাইল দু'মাইল অনায়াসে যেতে পারবো এ বিশ্বাস নিজের উপর আছে—বলতে বলতে ছোট বাচ্ছাটিকে নবনীতার হেপাজত থেকে কোলে তুলে নিলেন এবং তারই মাত্র বৎসরাধিক কালের অগ্রজ বড় শিশুটিকে স্বামীর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত অগ্রসর হলেন।

যতক্ষণ দেখা যায় আমরা সবিস্ময়ে এই দুঃসাহসী তরুণ যাত্রী দম্পতির দিকে চেয়েছিলুম।

একটা পথের বাঁকে তাঁরা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফিরে দেখি সেখানে আমরা শুধু একা। মন্দিরপথ ইতিমধ্যেই একেবারে নিস্তব্ধনির্জ্জন হয়ে পড়েছে।

আমাদের গাড়ীর তখনও কোনও চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। বললুম

পথ প্রদর্শিকা

—চলো, এখানে এভাবে অপেক্ষা করা আর নিরাপদ নয়। এখনি অন্ধকার নেমে আসবে। অল্পদূর গেলেই আমরা 'সিরোহী বাস সার্ভিস্ কোম্পানীর মোটর ষ্টেশন পাবো। সেখানে গিয়ে আবু মোটর সার্ভিস-ওয়ালাদের ফোন্ করে দিইগে গাড়ী পাঠাবার জন্য।

মহা উৎসাহে আমরা সবাই অগ্রসর হলুম। মিনিট পনেরের মধ্যেই সিরোহী বাস্ ষ্টেশনে এসে পড়া গেল।

যাক্ ! নিশ্চিন্ত। এইবার একটা ব্যবস্থা হবে। আমাদের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না ক'রে এঁদের একখানা গাড়ী নিয়েই চলে যাওয়া যাবে।

ক্রমশঃ
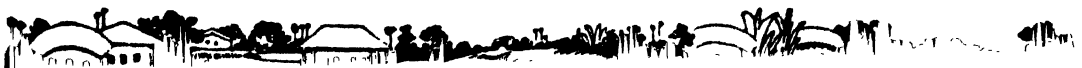
খয়রাগড়ের পূরাকীর্ত্তি

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

"সাহেব ভার্গব ঋষিনে কহাথা হাম্ সরযূকা উত্তরফ চলে যানেসে সহর উলট যায়গা। লেকিন উনোনে যব পৌঁছা সহর খাড়া রহে গৈ। ইধারকা 'চণ্ডাল' হাঁসনে সুরু কিয়া। তব ঋষিজীনে কহা চেলাকো মেরে আশ্রম পর কুছ্ ছোড়কর আয়াহৈ। চেলা আকে দেখা লোটা পড়া হায়। লোটা লেকে চেলা যব নদীপর পৌঁছা, আর সহর তমাম উলট গেয়া।" (অর্থাৎ সাহেব—ভার্গব ঋষি বলিয়াছিলেন যে তিনি সরযূর পারে পৌঁছিবার পর পাপের ভারে সহর উল্টাইয়া যাইবে। পাষণ্ড প্রকৃতির নাগরিকরা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ভার্গব তখন তাহার জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমার মনে হয়

খয়রাগড়ের সূর্যমূর্তি

আমি কোন বস্তু ফেলিয়া আসিয়াছি। শিষ্য আসিয়া দেখিল যে, তাহার ঘটি আসনে পড়িয়া আছে। ঘটি লইয়া শিষ্য সরযূর পরপারে পৌঁছিলে পর নগর ভূমিসাৎ হইল।) খয়রাগড় বালিয়া জেলার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম। ঋষি ভার্গবের জন্মস্থান। সম্মুখে খরস্রোতা সরযূ প্রবাহিতা। দিগ্বলয়ে রংয়ের ক্ষীণ রেখা। প্রভাতের তরুণ তপন তখন চক্রবালের উপর উঠেন নাই। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত যব, গম ও অড়হর ক্ষেত। দূরে নদীবক্ষে বালুচর, সুষুপ্তিমগ্ন অতিকায় জীবের ন্যায় দৃশ্যমান।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর তখনও পূর্ণবেগে চলিতেছে। সমরকালীন অতি কষ্টলব্ধ ছুটী যাপন করিবার জন্য, গাঙ্গেয় প্রদেশের একান্তে অবস্থিত, অর্দ্ধলুপ্ত সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে আসিয়াছিলাম। জাতির উত্থান, প্রগতি ও পতনের সহিত, সমতলে পা ফেলিয়া জাতীয় কৃষ্টি চলে। যখন শৌর্য্যসম্পন্ন জাতি, বৈদেশিক শত্রু হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া, স্বরাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত করে, তখন দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নতির চরম সীমায় নীত হয়। সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগরী, অর্থশালী বণিক সম্প্রদায়, সুশিক্ষিত নাগরিক, জাতির বৈভবের পরিচয় প্রদান করে। ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থিতিকালে, প্রাচীন কোশল, মগধ, অনুগঙ্গা, প্রয়াগ, অন্তর্বেদী, অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র,

খয়রাগড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গণ্ডকশালা

ঠিক এই কারণে সুদৃশ্য নগরীসমূহে সুশোভিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পুণ্যতোয়া সরযূর পূর্ব্বতীরে এই নগরীর অবস্থিতি ছিল। সাধারণ অনুসন্ধানে ইহার যে ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। আত্মবিস্মৃত জাতি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় ও দর্শনের আলোচনায় মগ্ন হইয়া, অসার সংসারের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সুতরাং এই মহাজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা আয়াসসাধ্য নহে। সেইজন্য, ভারতের ইতিহাসবেত্তাগণ পাথুরে ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়াছেন। কারণ কাব্য, পুরাণ বর্ণিত অলিক উপাখ্যানসমূহের উপর বিস্মৃতপ্রায় জাতীয় ইতিহাসকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কল্পনার উদ্দাম বেগ ইহার পবিত্রতা

নষ্ট করে। সেইজন্য মৃন্ময় পাত্র, পাষাণ লিপি, মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি ইতিহাসের উপকরণ।

খয়রাগড়ের যে ভাগ এখন সরযূর তীরে অবস্থিত সেই স্থল এখন নদীগর্ভ হইতে একুশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। খরস্রোতা নদীর স্বচ্ছন্দ গতি ইহার তটভূমি প্রতি বৎসর গ্রাস করিতেছে। তাহার ফলে ভূগর্ভস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নদী তীরে দৃষ্ট হয়। হর্ম্ম্যরাজির ধ্বংসাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী, কূপ, গণ্ডকশালা, প্রভৃতি নদীর স্রোতে মানবদৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সর্ব্ব নিম্ন স্তরে, মৌর্য্য যুগের কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল পালিশযুক্ত মৃৎপাত্রের খণ্ড প্রমাণ করে যে, এই নগরের ভিত্তি প্রাক-মৌর্য্যকালে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও মৌর্য্যকালে বোধহয় হইয়াছিল। তাহার পর ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইহা বর্ত্তমান ছিল।

এই গতি পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে। গঙ্গার পলি মাটিতে উৎপ ভূমি বর্ষার স্ফীত ফেনিল জলরাশির উদ্দাম বেগ বাধা প্রদা করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই। সেইজন্য, ইহার বক্ষে অবস্থিত বহু নগর ও নগরীর অকস্মাৎ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগরী এক রাত্রেই ধরণীর বক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। নদ ও নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু বহু বন্দর বিত্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। গাঙ্গেয় প্রদেশের বিভিন্ন নদী সমূহের মধ্যে পদ্মার ন্যায় খরস্রোতা এবং দামোদরের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নদী, সরযূর ন্যায় একটিও নাই। ইহার প্রধান কারণ যে, গতিবেগধৌত বালুকণা ও মৃত্তিকারাশি ইহার গর্ভকে ভরাইয়া দেয়। সুতরাং অর্দ্ধপূর্ণ গর্ভে প্রতিহত হইয়া ইহার বারিরাশি নূতন নূতন পন্থা অনুসন্ধান করিতে বাধ্য

শুঙ্গ যুগে নির্ম্মিত মৃৎপাত্রের চক্র, শুষ্কপ্রায় সরযূ গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কুষাণ যুগের শেষার্দ্ধে কিংবা গুপ্ত যুগের প্রথমাংশে নির্ম্মিত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাচীন খয়রাগড়ের সুরুচির পরিচয় দেয়। ইহা ব্যতীত প্রাকার সদৃশ খয়রাগড়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত, মৃৎপাত্রের খণ্ড গুপ্তযুগের বৈভবের পরিচায়ক। সরযূর তীর দিয়া অর্দ্ধ মাইল গমনের পর আমরা একস্থলে নীত হইয়াছিলাম, যেখানে পর্ব্বত প্রমাণ প্রায় ২১ ফিটউচ্চ, পশুর কঙ্কাল রাশি দৃষ্টিগোচর হইল। অনুমিত হয় সহরের একান্তে অবস্থিত এই অংশ অধিবাসীগণ কর্তৃক 'মশান' রূপে ব্যবহৃত হইত এবং বৎসরের পর বৎসর এই স্থলে মৃত জন্তুর মৃতদেহ ফেলিয়া যাইত। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইবার পর, মধ্যযুগে ক্ষীয়মান সহরের একাংশ বোধহয় ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ ১৮ ফিট মাটির উপরে দুই সারি ইটের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে ধ্বংসাবশেষের অন্য স্থলে অবস্থিত বিভিন্ন হর্ম্ম্যরাজির ন্যায়, এই অংশ অধিককাল বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে অট্টালিকা শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর দৃষ্ট হইত।

সরযূ গর্ভ হইতে খয়রাগড়ের ধ্বংসাবশেষ

মুসলমান যুগের কোনও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই। অতীতের কোন সময়ে এই সহরবাসীদের ভাগ্যে প্রলয় বিষাণ একবার বাজিয়াছিল। সহরের অবস্থানকালে সরযূ নদী পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেন, হঠাৎ কোন কারণে, হয়ত প্রাবৃটের কোন অত্যধিক বারিপাতে, বিক্ষুব্ধ হৃদয় সরযূর তরঙ্গমালা নূতন

হয়। ঠিক এই কারণে অতীতের কোন অজ্ঞাত দিনে ক্রুদ্ধ সরযূর তরঙ্গমালা ইহার পশ্চিমভাগের খাত পরিত্যাগ করিয়া, ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আর একটি প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে। ফলে প্রাচীন নগরটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায় এবং মধ্যভাগে প্রচণ্ড নদী প্রবাহিত হইতে থাকে; তাহারই জন্য নগরীর উত্তরাংশ এখন গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত ভাগলপুর নামক গণ্ডগ্রাম হিসাবে পরিচিত। অপরার্দ্ধ বালিয়া জেলার খয়রাগড় নামে খ্যাত। সরযূর পরিত্যক্ত গর্ভে এখন কৃষক কুলের যব, গম, ডাল উৎপন্ন হয়। যে সকল অংশ বর্ষায় প্লাবিত হইয়া যায় সেই সকল অংশে ধান্য জন্মায়। তাহার অনতিদূরে শ্যামশস্যাচ্ছাদিত ক্ষেত্রসমূহ, বোধহয় প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। খনন ব্যতীত ইহার উদ্ধার অসম্ভব।

বিস্মৃত। যদি সরযূর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার দ্বারা গ্রাসিত হইবার পূর্ব্বে ইহার খনন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে হয়ত প্রাচীন মগধের প্রাদেশিক কৃষ্টির অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে তুর্তিপারের কাঁসার বাসন যুক্তপ্রদেশের একটি মহামূল্য বস্তু ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাগড়ার শিল্পগুলির ন্যায় ইহাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মোরাদাবাদ জেলায় নির্ম্মিত বাসন জনপ্রিয় হইবার পূর্ব্বে তুর্তিপারের শিল্প সম্ভার খরস্রোতা সরযূর সাহায্যে, নৌকা দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। যন্ত্র যুগে যন্ত্র দানব কেবল মানুষগুলোকে পশুত্বে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের আহার্য্যও কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মিত বস্তু মানবীয় শ্রমে উৎপন্ন বস্তু অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রিত হয়। ঊনবিংশশতাব্দীর ভারতবর্ষীয়গণ স্বদেশী শিল্পের মূল্য বুঝিতেন না। তাহার ফলে তুর্তিপারের অন্নহীন, বস্ত্রহীন কাঁসারী কুল, সমাজতন্ত্রবাদী হইয়া দেশউদ্ধারে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে।

মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে ইষ্টকপ্রাকার— খয়রাগড়, বালিয়া

খয়রাগড়ের সূর্য্যমূর্ত্তিটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া ধরিলে অত্যুক্তি হইবে না। সূর্য্যপূজা আর্য্যাবর্ত্তে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋকবেদে সূর্য্যদেবের বহুল উল্লেখ আছে কিন্তু তখন সূর্য্যমূর্ত্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। বৈদিক আর্য্যেরা বোধহয় সূর্য্যগ্রহের উপাসনা করিতেন; হয়ত বৈদিক সভ্যতার শেষ যুগে চক্রাকার পিত্তল অথবা স্বর্ণখণ্ড দেবালয়ে পূজিত হইত। অনুমিত হয় যে খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ...

সম্ভবতঃ শকস্থান হইতে সূর্য্যমূর্ত্তি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণে এবং শিল্পশাস্ত্রে ইহার বেশ উল্লেখ আছে। ইহার পূজা শাকদ্বীপী নামক এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ হারজফেল্ডের মতে শাকস্থানের বর্ত্তমান নাম 'সিস্তান'। সর্ব্ব প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি পুণা জেলার অন্তর্গত ভাজা নামক গিরিগুহায় খোদিত হইয়াছিল। অনন্তগুম্ফা ও লাহুলের সূর্য্যমূর্ত্তিও উল্লেখযোগ্য। ভারতে কুষাণ অধিকারের সময় ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ক্রমাবর্ত্তনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। প্রায় চারিশত বৎসর বিভিন্ন যবন জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকিবার পর উত্তরপথে এক নবযুগ সূচিত হইয়াছিল। পুরাণে আমরা যে সব মূর্ত্তির বিবরণ পাঠ করি, সে সকল তখন লিখিত হয় নাই। সুতরাং কুষাণ যুগের মূর্ত্তিতত্ত্ব পুরাণের মূর্ত্তিতত্ত্ব হইতে বিভিন্ন। এই মহাসত্যের প্রথম প্রমাণ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাগোড রাজ্যের অন্তর্গত ভূমারার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত করেন (Siva temple at Bhumara M.A. S. I. no I6) রাজঘাটে প্রাপ্ত ১৫৭ গুপ্তাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর অবতার মূর্ত্তি বিশ্লেষণ করিবার সময় ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ত্তমান লেখক দেন। (Journal of the G. N. J. Research Institute, vol. iii, pp, 1-9.) খয়রাগড়ের মূর্ত্তিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান।

ইহা একটি দণ্ডায়মান সূর্য্যমূর্ত্তি। চুণারের বেলেপাথরে খোদিত; ভাস্করের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি অনন্যসাধারণ মনোহর দেবমূর্ত্তি; সর্ব্ব অবয়বে কৈশরের কমনীয়তা রূপকারের দক্ষতা অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহার পরিচ্ছদ উত্তরাপথবাসীর ন্যায়। মস্তকে করণ্ডমুকুট, কয়েকগুচ্ছ কেশ গণ্ডের দুইপার্শ্বে দিয়া স্কন্ধদেশে ক্রীড়া করিতেছে। দীর্ঘউন্নত নাসা। গলদেশে রত্নমালা। মূর্ত্তির দুই হস্তে সমৃণালপদ্ম। চরণ দুইটি পাদুকায় আচ্ছাদিত। দুই পার্শ্বে দণ্ডী এবং পিঙ্গল। নানা কারণে মূর্ত্তিটি গুপ্ত যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথম ইহার তক্ষণ রীতি। দ্বিতীয় ইহার 'কাক পক্ষের' ন্যায় কেশের ব্যবস্থা আমাদের ভারতকলাভবনে রক্ষিত কার্ত্তিকেয় এবং গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ এবং সারনাথে রক্ষিত অর্দ্ধভগ্ন মৈত্রেয় মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপূর্ব্ব লালিত্য এবং ভাবের অনবদ্য অভিব্যক্তি গুপ্ত যুগের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিভাবের প্রভাব আমাদের দেশীয় শিল্প সমূহে যে রূপাকার

বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেগতিক দেখে সান্ত্বনা বললে—'বেশ তো এত আপত্তি যখন, আপনার ঘরে না হয় না-ই নিলে গেলাম। কিন্তু ঝুলসোনার শোবার ব্যবস্থা করে দিন একটু"

"ঝুলসোনা! ওই কুকুরের নাম না কি"

"হ্যাঁ। বলুন কোথায় রাখি একে"

"পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে পারবে স্বচ্ছন্দে"

"বেচারা!"

ঝুলুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গোসাইজি বললেন, "গোয়ালের কোণে খড়ও আছে কিছু। খাসা থাকবে। আপনাদের ঘরে ঢুকে গুঁতোগুঁতি করার চেয়ে আরামে থাকবে। কি আপদ"

ঝুলুর লোমে হাত বুলিয়ে একটু আবদারের সুরে সান্ত্বনা শেষ চেষ্টা করলে আর একবার।

"একা থাকা অভ্যেস নেই, কাঁদবে হয়তো"

"কাঁদুক। গোয়াল ঘর থেকে ওর কান্না শোনা যাবে না"

"আমাদের ঘরের মেঝেতে যদি শোয়াই?"

"না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। ফদকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে ওটাকে গোয়ালঘরে রেখে আসুক গিয়ে। আর আপনি অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নাম সই করে' তবে শুতে যাবেন"

কমানো বাতিটা উসকে দিয়ে সুশোভনের দিকে চেয়ে গোসাইজি ফদকাকে ডাকতে গেলেন।

"দেখ সান্ত্বনা, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার স্বামীর নাম আমি জাল করতে পারব না। সীমা অতিক্রম করছে"

"বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্দ্ধাঙ্গিনীর আশা করি স্বামীর নামে নিজেকে চালাবার অধিকার আছে, অর্দ্ধেক অধিকার অন্তত থাকা উচিত আইনত"

"নিশ্চয়"

"খাতাটা কোথা—"

"এই যে। তবে আমি আর এক কাজ করলেও পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে' লিখে দিতে পারি যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না"

"দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি"

খাতাটা খুলে সান্ত্বনা লিখতে লাগল।

"ব্রজেশ্বর দে তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর—বাস"

"নামের পর উইদিন ব্র্যাকেট লেখ কংগ্রেস কর্ম্মী। না লিখলে ভয়ানক কাণ্ড করবে"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে।

"রুম নম্বরের ঘরে কি লিখি? নম্বর তো জানি না"

"চেপে যাও"

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল না। কলমটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই ঝুঁকে অ্যাডমিশন রেজিষ্টারটি পর্য্যবেক্ষণ করলেন। তারপর সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "এই ঘরে লিখুন—টু। আপনাদের রুম নম্বর টু"

সুশোভন কলমটি তুলে ভালমানুষের মতো 'টু' লিখলে, তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হাসলে একটু।

"ওরে ফদকা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে গোয়ালে রেখে আয়। কামড়াবে না তো"

"না ঝুনু ভারী লক্ষ্মী। আহা বেচারীকে কোথায় পাঠাচ্ছেন নির্ব্বাসনে"

বলা বাহুল্য সান্ত্বনার ঈষৎ আনুনাসিক আবদারমাখা এই অনুযোগে গোসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ফদকা এসে ঝুনুকে নিয়ে চলে গেল। গোসাইজি ধূমাঙ্কিত হ্যারিকেনটি সুশোভনের দিকে তুলে ধরে' বললেন, "এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা। এটা নিয়ে যান, কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশী নেই। আপনারা ওঠেন কটায় ?"

"আজ বোধহয় দেরি হবে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত আছি কি না"

"শুয়ে পড়ুন তাহলে, আর দেরি করবেন না"

হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের রুম নম্বর 'টু'টি গঠনশিল্পের একটি অদ্ভুত নিদর্শন বলে' মনে হল সুশোভনের। ঘরটি সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে দুজন লোকের পক্ষে পাশাপাশি ঢোকা অসম্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ ঘলঘলি বিশেষ। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই বৃহদাকৃতি এত আসবাবপত্র সমাবিষ্ট হয়েছে যে মেজে বলে' কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা খাট আলমারি ড্রেসিং-টেবল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো জায়গা। সম্ভবত আসবাবপত্রগুলি খণ্ডীকৃত অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে তারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মেজের অধিকাংশ স্থানই দখল করে' আছে জগদ্দল একটি ছাপ্পর খাট। মজবুত কাঁটাল কাঠের তৈরি। খাটের উপর আছে একটি গদি, গদির উপর একটি পাংশুবর্ণের চাদর। গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে কি—তা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উটের পিঠের মতো উঁচু উঁচু ঢিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে ছবি ছিল। ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে নেওয়া দেব-দেবী মূর্ত্তি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত-ফ্রেমে-বাঁধানো অন্য আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য—রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

সুশোভন এবং সান্ত্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল দু'জনেই। সুশোভন বলে উঠল—"বাপ্ স্ শুতে এসেও নিস্তার নেই। শিয়রের কাছে ওই দুর্ব্বাসা তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি সর্ব্বনাশ"

"শুনুন" সান্ত্বনা বললে, "গোসাইজি শুয়ে পড়লেই আপনি নেমে যান আস্তে আস্তে। যে ঘরটায় আমরা খেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দিন কোনক্রমে। আশা করি আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না"

"তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ সান্ত্বনা, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদি গড়ায়, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াবে কিন্তু"

"কি যে বলেন! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসছেই বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাতা উলটে দেখতেই বা যাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু জানতে পারলে কি ভাববেন"

"কি আবার ভাববেন, আমাদের কাণ্ড শুনে বড় জোর হাসবেন একটু"

"দেখ ঠিক তো"

"এটা ঠিক যে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন"

সান্ত্বনা ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে সুশোভনের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "আশা করি অনাতা দেবীও বুঝবেন"

"অনীতা ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঃ নিশ্চয়ই সমস্ত শোনবার পর বুঝবে বই কি"

"বাস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপার গড়ালেই বা"

সুশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না।

"কিন্তু ওই দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিটি—ওই জগঝম্প না কি নাম ভদ্রলোকের—"

"সদারঙ্গবাবু ? ওর জন্যে ভাবনা নেই। এর পর দেখা হলে সব খুলে বলব ওঁকে। খুশী হবেন, ভারী আমুদে লোক—"

"আমার কিন্তু দেখে মনে হল, উনি ঠিক সেই জাতীয়

বেকুব অথচ মহাপুরুষ লোক যাঁরা অস্থানে অকারণে অকার্য্য করে' অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ 'অ' এর অনুপ্রাস আরও অনুসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ্ঞ। তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং অনীতার বাপের বাড়ির লোকেদের চেনেন। মনে হচ্ছে…"

"অনীতার বাপের বাড়ির লোকদের?"

সান্ত্বনার অধরে মৃদু একটা হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল।

"তা চিনলেই বা ক্ষতি কি। ওর জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সদারঙ্গবাবু সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না? সে ভার আমার উপর রইল"

"তোমার জন্যেই আমার চিন্তা" সুশোভন বললে।

"চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে"—হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা—"আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন একটু গোসাইজি শুলেন কি না। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, একটু হাত পা ছড়াতে পারলে বাঁচি"

কেবল সুশোভন এবং সান্ত্বনাই যে সদারঙ্গবিহারী-লালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোসাইজিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাল। কি মনে হওয়াতে তালাটা খুললেন আবার। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। না, মোটরবাইকের কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়াল ঘর থেকে ঝুনুর করুণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে এল না। কপাট বন্ধ করে' পুনরায় তালা লাগালেন এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠক-খানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির গোছাটি নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোয়ার ঘরে।

৯

সুশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোসাইজি উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল দেওয়ার শব্দও পাওয়া গেল।

"ভদ্রলোক শুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে"—কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে এইটুকু জানিয়ে সুশোভন নীচে নেমে গেল। সান্ত্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। কাপড় চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় না তার। যে সুটকেসটি সুশোভন বয়ে এনেছিল সেটি ফস্কক দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তার থেকে কাপড় ব্লাউজ প্রভৃতি বার করে' পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া-গুলি অর্থাৎ সেমিজের বোতাম-খোলা-জাতীয় কাজগুলি সবে শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে শব্দ হল। এক লাফে সে একটা আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে সুশোভনবাবু"

"হ্যাঁ। আসব ভেতরে?"

"না। আসবেন মানে?"

"গত্যন্তর নেই"

"থামুন একটু তাহলে"

"বেশ"

"গত্যন্তর নেই মানে? বুঝতে পারলাম না"

"যে ঘরে আমরা খেয়েছিলাম সে ঘরে শোওয়া যাবে না"

"কি যে বলেন"—সান্ত্বনার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হল যেন—"এর মধ্যেই কি করে' বুঝলেন যে শোওয়া যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয় নি এখনও। চেষ্টা করে' দেখুন ঠিক ঘুমুতে পারবেন"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করবার 'স্কোপ' নেই। গোসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বালিশের তলায়"

"ওমা, তাই না কি? মুসকিল হল তো। কোথায় শোবেন তাহলে"

"তাই তো ভাবছি"

"করতেই হবে যা হোক একটা ব্যবস্থা। এ ঘরে তো আসা চলবে না"

"কপাটটা খুলি একটু? একটু—"

"না"

"কথা কইবার সুবিধে হত। আর কিছু নয়"

"কথা ক'য়ে কাটাবেন না কি সারারাত"

"একটু খুলি কি বল। চোখ বুজে থাকছি না হয়। সামান্য একটু খুলতে আপত্তি কি"

"না, না যতক্ষণ না বলি খুলবেন না। দাঁড়ান না একটু। [illegible]"

"উঃ কি যন্ত্রণা"

অস্ফুটকণ্ঠে বললে সুশোভন।

"সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বসুন না, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় যদি"

"কতক্ষণ"

"মিনিট পাঁচেক"

"ঠিক করব কি করে', আমার হাত ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে"

"তাহলে এক থেকে পাঁচশ' পর্য্যন্ত গুণুন বসে বসে"

"বল কি। ছেলেবেলায় উদ্দালকের গল্প শুনেছিলাম, তাই করলে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত"

"কি যে ছেলে মানুষি করছেন। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখুন"

"মাথা আমার ঠিকই আছে, তার জন্যে ভাবনা নেই"

"তাহলে অমন করছেন কেন, সিঁড়িতে বসুন গিয়ে"

"কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটা জোরে"

"সিঁড়ির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু। একটু থামুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি তারপর আসবেন"

"গোঁসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে' এক দুই গুণে যাচ্ছি, কি ভাববেন তিনি"

"ঢেউ দেখেই নৌকা ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে"

"নৌকাডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো করছি সকাল থেকে"

বিরক্ত হয়ে সুশোভন সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। সিঁড়ির উপর বসে' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বেচারা। নৈশ-সমীরণ বাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্ব্বদিকে ভেসে যেত তাহলে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো দেখা হত তার। কোলকাতায় তার বাড়ীর সিঁড়িতে বসে' অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছিল।

......সিঁড়িতে বসে' বসে' সুশোভনের বাঁ পাটায় ঝাল ধরে' গেল। একটু চটেই উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণেও শোয়া হয় নি? হোক মেয়ে মানুষ......বিছানায় শুতে ত দেরী হবে......আশ্চর্য্য কাণ্ড! উঠে গিয়ে দুয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা মারতেও ভয় করছিল। গোঁসাইজি যদি উঠে পড়েন। সান্ত্বনার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করতেই—

"থামুন, হয় নি এখনও। বসুন না গিয়ে আর একটু—"

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি, তোমার যখন হবে বোলো"

"অত শব্দ কিসের" পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন করলে সে—"কি হল"

"আমি বিছানায় উঠছি। স্প্রিং দেওয়া গদি, তারই শব্দ"

'বাসন্তী শব্দ? বাবা!"

"বাসন্তী শব্দ মানে"

"বি-এ পাশ করেছ, স্প্রিং মানে বসন্ত জান না!"

"আসুন আপনি"

সান্ত্বনা বিছানার উপর বসেছিল। চুলটি আঁচড়ে সাদা শান্তিপুরে শাড়িটি পরে' বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। একটু সানুকম্প হাসি হেসে ডাগর চোখের দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে সে। সুশোভনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হল শিল্প-সমালোচকের কৌতূহল। বিছানার একপ্রান্তে অনাহূতই বসল গিয়ে সে।

"কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে"

"তা হয়তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতে আসেন নি আশা করি"

"না, না, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই তোমায় মানিয়েছে ভালো। তোমার প্রসাধন-রুচি সরল হলেও শিল্পীজনোচিত—"

"সমস্ত দিনের এত দুর্গতির পরও আপনার রসবোধ অক্লান্ত আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"

"বেশ তো ঘুমোও না, মানা করছে কে। সাদা শাড়িটা হঠাৎ ভাল লেগে গেল তাই বললাম। অনীতা কখখনো সাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রং ছাড়া পছন্দই হয় না তার। সেদিন একখানা শাড়ি কিনেছে মেরুন রংয়ের, সোনালি জরির পাড়-বসানো। জমকালো ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে

যাবে বলে দু'খানা শাড়ি নিয়েছে সবগুলোই রঙীণ, আর কোনটাই ফিকে রং নয়—"

সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ঘাড়টা কাত করলে একটু।

"একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। অনীতা যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তার এত মাথা ঘামিয়ে শাড়ি পছন্দ করা যে এমন ভাবে মাঠে মারা গেছে তা বোধহয় বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না"

সুশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উসখুস করে' নড়ে' চড়ে' বসল সে।

"আমাকে কি তাহলে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঝুনুর সঙ্গে শুতে হবে?"

"তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে—"

সুশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে অভিনিবেশ সহকারে সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুই এই ঘরের মেজেতে যদি একটু গড়িয়ে নি—

—কি যে বলেন—"

"আচ্ছা, এ কি কুসংস্কার তোমাদের! আমি তোমাকে 'কারে' লিফ্‌ট্‌ দিলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেজেতে শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আশ্চর্য্য! তোমার খাটের উপর পা তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমানায় যাব না"

"যা হয় না—হতে পারে না—তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন"

"কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ায় তো হয় শুনেছি"

"এটা রাশিয়া নয়, বাংলা দেশ"

"ও"

সুশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। মাথার কাপড় সরে' গেছে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"আচ্ছা, চললাম তাহলে—"

"বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে খব কষ্ট হচ্ছে আমার—"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে—"

"কি করব বলুন উপায় নেই। সমাজে বাস করি যখন, লোকাচার মেনে চলতেই হবে"

"এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টা খানেক বড় জোর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেই আমার—"

"না মাপ করুন সুশোভনবাবু। একবার এই করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই। আপনার তো মনে থাকা উচিত"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। বুঝেছি। আচ্ছা যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ—ঠিক। কি বিপদ—আচ্ছা চলি—"

(ক্রমশঃ)

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

রূপসীর রূপ দেহের প্রদীপে
গরবের শিখা জ্বলে,
তারি উত্তাপে প্রেমের পাঁপড়ি
শুকায় চিত্ত তলে।

আর রূপহীনা রহিয়া অজানা
মৌন মিনতি গানে
প্রেমের পূজায় প্রাণের দেউলে
প্রিয়তমে টেনে আনে।

বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

যে যুগল প্রতিভার প্রোজ্জ্বল আলোকে বিশ্বসভায় বিশ্বমানবের সম্মুখে দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অবজ্ঞাত ভারতের প্রদীপ্ত মহিমা প্রভাসিত হইয়াছে, তাহার একটির কথা বিগত পৌষ মাসে "ভারতবর্ষে" লিখিয়া লেখনী ধন্য করিয়াছিলাম; আজ অপরটির বেদীমূলে শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহ ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিবার মানস করিয়াছি। আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রের নিচোলে যে বিজয়িনী নারীর বহুবর্ণরঞ্জিত সুশোভন প্রতিকৃতি শোভিত হইয়াছে, আমি আজ সেই মহীয়সী বিজয়লক্ষ্মীর কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি। জওহরলালজীর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, প্রয়াগতীর্থ-সন্নিকটস্থিত এই জনপদটিতে প্রতিভা ঠাকুরাণী অকৃপণ করে সর্ব্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্রের মত নিঃস্ব-রিক্তহস্তে বিদায় লইয়াছিলেন। নতুবা এক পরিবার মধ্যে, এক পিতামাতার অঙ্কে এই দিগ্বিজয়িনী প্রতিভাধিকারিণী পুত্র কন্যা, জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মী সম্ভব হইল কিরূপে?

"ভাই" জওহর ও বিজয়লক্ষ্মীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেকখানি। সেই দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ বালক জওহর একটি ভ্রাতার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল; বারো বছর পরে ভাই না আসিয়া ভগ্নীর আগমনে জওহর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। জনৈক ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছিলেন যে, এ তো ভালই হইল জওহর। তোমার ভাই হইলে তোমার পিতার ঐশ্বর্য্যের ভাগীদার হইত, তোমার ভাগ কমিয়া যাইত। ভগ্নী হওয়ায় পণ্ডিত মতিলালের ধনৈশ্বর্য্যের তুমিই একচ্ছত্রাধিপতি রহিলে। বারো বছরের বালক যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই কথাগুলির মধ্যে আজিকার বিশ্ব-চিত্তজয়ী জওহরলালের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। জওহর বলিয়াছিলেন, আমি ধনৈশ্বর্য্যের লোভ রাখি না! আমি একা! ভাই হইলে আমার কেমন সঙ্গী হইত! ডাক্তার আত্মসংশোধন করিয়া বলিলেন, তোমার সুন্দর বোনটিও তোমার সঙ্গী হইবে।

এই ভবিষ্যবাণী সার্থক হইয়াছে। শুধু যে বাল্যে খেলায়, কৈশোরে বিদ্যাশিক্ষায় সঙ্গিনী হইয়াছিল তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে, ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়েও "ভাই" জওহরের যোগ্য সঙ্গিনীরূপে বিজয়লক্ষ্মী আজ পৃথিবীর সুধী সমাজের শ্রদ্ধার্জন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল যখন বৃটিশের বদ্ধকরপুটের মধ্য হইতে শাসনরশ্মি গ্রহণের সাধনায় সমাহিত, ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী তখন আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববিধান-ভবনে বিশ্বের বিড়ম্বিত, চিরজীবন বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত নির্য্যাতীত মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিতপ্রাণ। অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একদা এক সৌম্যদর্শন তেজঃপুঞ্জ কলেবর ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতের উদার অত্যুদার হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া অন্ধ পৃথিবীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন, আর অৰ্দ্ধশতাব্দী পরে এই সেদিন সেই আমেরিকাতেই নিপীড়িত ও নিগৃহীত কৃষ্ণকায় মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুমধুরভাষিণী ভারতনারী স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে যে আলোড়ন উদ্বেলিত করিলেন, তাহার তুলনা বিশ্বপ্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তনের প্রলয় যুগে বিশ্বেও বিরল। পৃথিবী ভারতবর্ষকে বৃটিশের চশমার সাহায্যে দেখিতেই অভ্যস্ত; বৃটিশের প্রচারিত সত্যই বাইবেল, বেদ ও কোরাণ বলিয়া গৃহীত হইত; ভারত ও ভারতবাসীর হিতার্থ বৃটিশ, অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষাদানার্থ বৃটিশ, অধঃপতিত ভারতবাসীর উন্নয়নকল্পে বৃটিশ বিষম গুরুভার বহন করিয়া পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতেছে, পৃথিবী এই সংবাদই জ্ঞাত ছিল। বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর অভিভাষণ শেষে পৃথিবী যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই বৃটিশের ও আফ্রিকার বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতবর্ষকে জয়মাল্য দিয়া স্বস্তি অনুভব করিল।

পণ্ডিত মতিলাল পুত্র কন্যাদের বিলাতী শিক্ষা দিয়াছিলেন। গান্ধী-যুগের পূর্ব্বে ভারতের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজে ইহা কৌলীন্যের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত। বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর মুখেও শুনিয়াছি, বাল্যকালেও ভুল ইংরাজী শিখিলে অথবা উচ্চারণে দোষ ঘটিলে পিতার নিকট পুত্র কন্যার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। ঐশ্বর্য্য-পালিত, বিলাসে লালিত মতিলালের পুত্র কন্যা যে বৃটিশের জেলের মধ্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিবে, নেয়ার-দড়ি বয়ন করিবে, কয়েদীর কদন্ন খাইয়া জীবনধারণ করিবে, সেকালে ইহা ছিল কল্পনারও অতীত। বিষ্ণুর চরণোত্থিত হইয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলু ভেদ করিয়া হরজটায় নৃত্য করিয়া হিমালয় শিখর হইতে ভাব-জাহ্নবীর ভীমপ্রবাহ ভীমগর্জ্জনে যেদিন ধরণীতল প্লাবিত করিল, সেদিন তাহাতে কেবল পুত্র-কন্যাই ভাসিয়া গেল না, মতিলালের মত পিতাও সে পুণ্য সলিলোচ্ছ্বাসে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত ভাসিয়া গেলেন।

নেহেরু বংশ কাশ্মীর হইতে সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের যশস্বী সপ্রু পরিবারও কাশ্মীরাগত; যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী যোয়ার পণ্ডিত বংশও ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতবংশ কুলে শীলে সম্পদে ও সমৃদ্ধিতে নেহেরু বংশেরই সমতুল্য। মতিলাল এই পণ্ডিত পরিবারের রণজিৎ সুন্দরকে জামাতৃ নির্ব্বাচন করিয়া সুন্দরী স্বরূপার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রণজিৎ ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থ ও যশঃ কতখানি অর্জ্জন করিয়াছিলেন জানি না, তবে ভারতের স্বাধীনতা রণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া অকালে আত্মদান করিয়া রণমৃত্যুর গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ত চোখের উপরেই দেখিয়াছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামে, জওহরজায়া কমলা অকালে আত্মাহুতি দিয়া জওহরের গৃহ শূন্য

করিয়াছিলেন, সুন্দর, সুরূপ রণজিৎও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া ভরা যৌবনেই বিজয়লক্ষ্মীর জীবন তরণীর ভরাডুবি ঘটাইলেন। তিনটি কন্যা লইয়া বিজয়লক্ষ্মী বৈধব্য বরণ করিলেন। সংসার বন্ধনটুকু ছিন্ন হইল, বিজয়লক্ষ্মীর রাজনীতিতেই আত্ম নিমগন হইল।

১৯১৯ সাল হইতে ভারতে গান্ধীযুগ আরম্ভ। গান্ধীযুগ-প্রবর্ত্তিত অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ত্যাগ ও ক্লেশ বরণই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে। শুধু স্বীকৃত হইয়াছে বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকে, তাই আদৃত বলিলাম। আদৃত না হইলে কি উৎসাহে উল্লাসের প্লাবন আনিতে পারিত? আদৃত না হইলে কি আনন্দে হাসিমুখে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অন্ধকারার দিকে অগণিত নরনারীর অসংখ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত? আদৃত না হইলে কি একমাত্র সন্তান জননীকে ফেলিয়া, পতি প্রিয়তমা পত্নীকে ছাড়িয়া, পিতা পুত্রকন্যা ফেলিয়া তীর্থযাত্রা করিত? কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করিবেই। রণজিৎ পণ্ডিতের মত সুখী ধনী পরিবারের যুবাপুরুষ বন্ধকারার কষ্ট যত হাসিমুখেই বরণ করিয়া লউক না কেন, দেহ ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিফলিত হইল। রণজিৎ সুন্দর তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত শ্যালকের মত এক কারাগারে একত্র অবস্থান করিয়াও কারা-ক্লেশকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া বিজয়গর্ব্বে আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না; স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইল এবং শেষ বার, কারাগার হইতে যে ব্যাধি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই অকাল বিয়োগ ঘটিল। রণজিৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ·দেরাদুন কারাভ্যন্তরে বসিয়া প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিনী কাব্যের ইংরাজী ও সহজ হিন্দী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শৌর্য্যের ও বীর্য্যের লীলাক্ষেত্র ভারতে রণমৃতের মরণ নাই, রণজিতও মৃত্যুঞ্জয়ী।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর প্রতিভার প্রকাশ্য পরিচয় ১৯৩৭ সালে ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সময়েই সাধারণের গোচরীভূত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ত্যাগী সজ্জন লইয়াই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে, অকস্মাৎ কাণাঘুষায় বিজয়লক্ষ্মীর নামও শুনা গেল। অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কংগ্রেস বরাবর যোদ্ধ্‌জনোচিত কাঠিন্যের আদর্শ রক্ষা করিয়াছে; মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে অনিচ্ছুক বৃটিশ গভর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে বাধাহীনতার সর্ত্ত আদায় করিয়া লইয়া তবে গভর্ণমেণ্ট গঠনে সম্মত হইয়াছে, সেই কঠিন কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় কোমলাঙ্গী নারীর স্থান হইতে পারে বলিয়া অনেকে ভাবিতেও পারেন নাই; কিন্তু যাঁহারা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নীতির মর্ম্মার্থ জানিতেন এবং নেহেরু পরিবারের পরিচয় অবগত ছিলেন তাঁহারা অবিশ্বাসের কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বিজয়লক্ষ্মী স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পরিচালনায় যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর কালের প্রলয়ের পরে পুনরায় প্রদেশে যখন গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব হইল তখন পূর্ব্বাধিকৃত আসন খানিতে এই লক্ষ্মী প্রতিমারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল।

গান্ধীজী ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার স্বাধীনতার অভিযানে তিনি গৃহিণী গৃহমুচাত্তে-গণকেও আহ্বান দিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। মানুষের সংসার যেমন নারী ও পুরুষের সহযোগিতার ফলেই সুগঠিত হয়, মানুষের বৃহত্তর সংসার দেশকেও তিনি উভয়ের সহায়তাতেই গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাই চাহিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সরোজিনী দেবীকে পাইয়াছি, বিজয়লক্ষ্মীকে পাইয়াছি; কমলা নেহেরুকেও পাইয়াছিলাম। আমি একবার শ্রীমতী সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কবিকুঞ্জ হইতে কঠিন রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িলেন কেমন করিয়া? উত্তরটি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্য বলিয়াই এ কথা এখানে বলিতে উদ্যত হইলাম। সরোজিনী বলিলেন, কি জানি, ঠিক বুঝিতে পারি না। তবে এইটুকু মনে আছে গান্ধীজী যখন নিপীড়িত মনুষ্যত্বের জন্য অশ্রু মোচন করিলেন, আমার মধ্যেকার মনুষ্যত্ব বোধ হয় কাঁদিয়াছিল; নির্য্যাতীত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে গান্ধীজী যখন শঙ্খধ্বনি করিলেন, আমার অন্তরের সদ্যজাগ্রত মনুষ্যত্ব বুঝি বা তূর্য্যনাদে মাতিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, বৃটিশের কারাগারে শুইয়া আছি। বিজয়লক্ষ্মীর উত্তর আরও মধুর।

"বাবা ভাইকে (বিজয়লক্ষ্মী জওহরলালকে দাদা বলেন কি-না জানি না, আমাদের সঙ্গে আলাপে 'ভাই' 'ভাই'-ই ত শুনি!) ও আমাদের একই রকম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম শিক্ষা মানুষ হইবার; দ্বিতীয় শিক্ষা পৌরুষ অর্জ্জনের। কাজেই দেশের পুরুষ সব যখন কারাভ্যন্তরে তখন নারীর অন্তরমধ্যে আহত পৌরুষ গর্জ্জন করিয়া বলিত, দেশ ত তোরও, তুইও ত দেশের! তবে? এই 'তবে'র উত্তর কমলা-বৌদি ভালই দিয়াছেন, আমরাও দিতে চেষ্টা করিয়াছি। চমক ভাঙ্গিতে দেখি, নইনী জেলে। নইনী বাড়ীর কাছে, চেনা যায়গা। বেশ আনন্দ। ভারতবর্ষে জেলের বাহিরে ও ভিতরে পার্থক্যই বা কতটুকু যে জেল যাইতে ভয় হইবে? সমস্ত ভারতবর্ষই ত জেলখানা। বৃটিশের বিরুদ্ধে একটি সত্য কথা বলিয়াও যখন অব্যাহতি নাই, তখন জেলের ভিতরে থাকাও যা, বাহিরে থাকাও ত তাই।"

যুদ্ধাবসানে বিশ্ববিধান ভবনানুষ্ঠানের (UNO) পূর্ব্বে স্যানফ্রান্সিস্-কোতে একদা বিশ্বরাষ্ট্রসম্মিলন হইয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী তখন কন্যা দ্বিতার শিক্ষাব্যবস্থাব্যপদেশে আমেরিকায় ছিলেন। সম্মিলনে বিপ্লবী-বিদ্রোহী বিজয়লক্ষ্মীর প্রবেশাধিকার ছিল না, তিনি তাঁহার বাস-ভবনে অথবা নিকটস্থ হলে বা উদ্যানে ভারতবর্ষ বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বিশ্বরাষ্ট্র সম্মিলনের শ্বেতাঙ্গ উদ্যোক্তারা নাকি তাহাতে বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলেন। সম্মিলনে আমন্ত্রিত দেশ-নেতৃবর্গের অনেকে নাকি রাষ্ট্রসম্মিলনের গুরুগম্ভীর আলোচনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকায়া (বৃটিশের চোখে কৃষ্ণ বৈ কি! পরাধীন মানুষমাত্রই 'ব্ল্যাকি'! ভারতবাসীর চোখে, বিজয়া বসরায় গোলাব) নারীর চুটকি শুনিতে ছুটিত। বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন, বৃটিশ ভারতবর্ষকে কারাগারে পরিণত করিয়াছিল। আমরা সে কারাগার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছি। "কারাগার" শব্দটি বৃটিশের মরমে বড় দাগা দিয়াছিল। একটি বিজয়-লক্ষ্মীর প্রতিপক্ষরূপে ভারত হইতে, ইংলণ্ড হইতে, ধনজনসমৃদ্ধ এক বিরাট

শক্তিশালী প্রচারক বাহিনী আমেরিকা পর্যটনে প্রেরণ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়লক্ষ্মীর মুখে শুনিয়াছি ঐ কারাগার-শব্দটি বিলোপ করিতে ন্যূনাধিক নবহ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন বাহুল্য ঐ 'সামান্য' কয়টি টাকা গৌরী সেনের আবাস ভারতবর্ষই দিয়াছিল !

ইত্যবসরে ভারতবর্ষে ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। যুদ্ধকালে বিশ্ববাসীকে জাতিবর্ণনির্বিচারে চতুর্বর্গ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবে যে কয় মহারথী মহাসমারোহে স্বর্ণমুখলেখনীমুখে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই একজন দিগ্বিজয় কুক্ষীগত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতবর্ষীয় নরনারীর বসবাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক অপরূপ আইন রচনা করিলেন। এক কথায় আইনটির রূপ এই: ধরুন, যেন, কলিকাতার চৌরঙ্গী, থিয়েটার রোড, মিডলটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবর্ষীয় নরনারীর প্রবেশ নিষেধ করা হইল ! ভারতবর্ষীয়গণ বর্ণবৈষম্যমূলক আইনটির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন ; ভারতবর্ষেও জনমত অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল ; দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নরনারী লাঞ্ছিত মর্য্যাদাবিক্ষুব্ধ হইয়া আইন অমান্য করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। স্মাট্‌স ও তাঁহার স্ববর্ণ ও স্বজাতীয়গণ কৈফিয়ৎ দিলেন, কেন হে বাপু, শ্যামবাজার রহিয়াছে, রাজাবাজার রহিয়াছে, পার্শিবাগান কলাবাগান রহিয়াছে সেইখানে থাকগে না ! চৌরঙ্গী পাড়ায় আসিয়া, যে চমৎকার তোমাদের গাত্র বর্ণ—আমাদের চক্ষু পীড়া ঘটাও কেন ! আইনটি এতই কদর্য্য ও গ্লানিকর যে, স্মাটসের জ্ঞাতিবর্গ পরিচালিত তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেণ্টও এতখানি ঔদ্ধত্য বেবাক্ বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, প্রতিবাদ করিয়া এবং আরও কিছু কিছু করিয়া ভারতবর্ষের মান রাখিয়াছিলেন। ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিধান ভবনে সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। তারপর, বিশ্বসনদ রচয়িতৃগণের মধ্যে অকৃত্রিম ভারতবন্ধু চার্চ্চিলের উচ্চাসন থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল প্রকাশ্যে বিশ্ববিধান ভবন (UNO) সম্পর্কে ভারতের আস্থা ও নিষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিলেন। চার্চ্চিলগোষ্ঠির শাঠ্য যত শঙ্কাপ্রদই হৌক, আমেরিকা, ফ্রান্স—বিশেষ করিয়া রাশিয়ার চোখে ধূলি নিক্ষেপ যে সহজ নহে তাহা ত সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারি। বোধ করি পণ্ডিতজীরও সেই কারণেই গভীর আস্থা ; এবং ভাবিতেও আনন্দ হয় যে বিশ্ববিধান ভবন এই বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে সওয়াল করিতে যাইবে কে ? প্রতিদ্বন্দ্বী স্মাটস্‌ ও তৎসমাসীত পুত্র কলত্র চার্চ্চিল এণ্ড কোং আন্‌লিমিটেড্। ১৯৪৬ পূর্ব্বকালে হইলে "যে খুশী সে যাক্ তুমি খিঁচুড়ি যে খুশী সে খাক্" (স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষমা করিবেন) কিন্তু যে ভারত আজ বিশ্বসভায় যোগ্যাসন গ্রহণে উদ্যত তাহার মর্য্যাদা রক্ষার প্রশ্ন আজ সর্ব্বাধিক ও সর্ব্বাগ্রগণ্য। নির্ব্বাচনের ভার জওহরলালের। "ভাই" জওহর ভগিনী বিজয়লক্ষ্মীর ললাটে ভারতের জয়টীকা পরাইলেন। সহোদরা বলিয়া নহে, যোগ্যতার প্রশ্নও যথেষ্ট নহে, নবীন ভারতে বৃটিশ-বর্ণিত অবলার স্থান নির্দ্দেশ করিবার শুভক্ষণে জওহরলাল ভারতের মর্ম্মবাণীকেই মূর্ত্তি দান করিলেন। বিশ্বের দরবারে বিচার, বিশাল বিশ্বের বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়ন অনন্য-সাধারণ রূপগুণযুতা নারীর পানে নিবদ্ধ হইল। ভারতবর্ষীয় পুরাণের কাহিনী আর একবার প্রাণবন্ত হইল। শান্তশীলা গৃহলক্ষ্মী বিজয়লক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। জয় অনিবার্য্য, বিজয়িনী বিশ্ববিজয় করিলেন।

বাগ্মীতার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন দেখি না ; রাজনৈতিক জ্ঞান বুদ্ধির তারিফ করারও দরকার নাই ; লিপিচাতুর্য্যের সুখ্যাতিও অনাবশ্যক ; কিন্তু সভান্তে যে আচরণ পৃথিবীর রাষ্ট্র নায়ক সমাজকে মোহিত ও অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, সেই ঘটনাটির উল্লেখ না করিলে এই ভুবনমোহিনী নারীর পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমার শ্রীমতী পাঠিকার স্মরণ আছে, বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতবর্ষের জয় ও স্মাট্‌সের পরাজয় ঘটে। দম্ভোল্লাসে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেও দোষাবহ হইত না ; চার্চ্চিল বা স্মাট্‌স হইলে তাহাই করিতেন ; কিন্তু ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জয় পরাজয়কে অনিত্য পদবাচ্য করিয়াছে ; ভারত শিক্ষা দিয়াছে, কর্ম্ম মানুষের, ফলাফল তাহার নহে—ঈশ্বরের ! তাই বিজয়িনী তন্মুহূর্ত্তে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের কর প্রত্যাশায় কর প্রসারণ করিয়া বলিতে পারিলেন, আমরা (ভারতবর্ষ) আপনার সৌহার্দ্দ্য যাচ্ঞা করি।

যে পুণ্যভূমিতে গীতার উদ্ভব সেই পুণ্য পবিত্র ভারতবর্ষের মানুষই পরাজিত প্রতিপক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে। গল্পে পড়িয়াছি, দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাট উত্তর ভারত জয় করিয়া শতদ্রুতীরে রাজা পুরুকে বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকটে কিরূপ আচরণ আশা করেন ? পুরু উত্তর দিয়াছিলেন, রাজার প্রতি রাজার আচরণ।

বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীও সেদিন বিশ্ববিধান ভবনে বীরের প্রতি বীর-নারীর যোগ্য ব্যবহারই করিয়াছিলেন।

মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞাবসানে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় সতেরো নম্বর ইয়র্ক রোডে চা খাইতেছি, বিজয়িনী বলিলেন, আমার বড় ইচ্ছা রাশিয়ায় যাই, কিন্তু "ভাই" রাজী হইয়াছেন এবং বিশ্ববাসীও জানিয়াছে নবীন ও স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-দূতের মুকুটখানি বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর শিরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। বিরাট সোভিয়েট, বিশ্বের বিস্ময় সোভিয়েট, ধরিত্রীর ত্রাস সোভিয়েট কিন্তু ভারতের সহিত তাহার নিষ্কলুষ সৌহার্দ্দ ! স্যান-ফ্রান্সিস্কোয় এই বিজয়লক্ষ্মীই সেই সূক্ষ্ম স্বর্ণ হারগাছি রচনা করিয়াছিলেন, আজ সেই সুবর্ণ রাখী দিয়া ভারত সোভিয়েট-রাশিয়াকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবার ভার সেই বিজয়লক্ষ্মীর উপরই অর্পিত হইল। ভারতবর্ষ আজ আর একবার লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভিনব ও প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইল।

ধন্য ভারত !
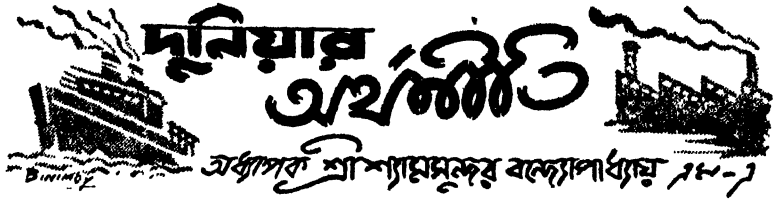
মন্বন্তরের মুখে

ভারতবর্ষে আবার দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরের পর দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন যখন তাঁহাদের রিপোর্ট রচনা করেন, তখন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে পঞ্চাশী মন্বন্তরই ভারতের শেষ দুর্ভিক্ষ এবং ইহার পর আর কখনো দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতসরকারকে কোন কমিশন বসাইতে হইবে না। বেশী দিন নয়, মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের এই আশা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের নানাস্থানে এখন যে প্রচণ্ড অন্নাভাব দেখা দিয়াছে তাহাকে দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর বলা চলে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর অন্নের দিক হইতে দেশ একদিনের জন্যও স্বচ্ছল হয় নাই, হইলে ৪ টাকা মণের চাউল রেশন এলাকায় অনায়াসে ১৬ টাকা মণদরে বিক্রীত হইতে পারিত না। তাছাড়া যেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ ভারতবাসীর দৈনিক ২৬০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য খাওয়া দরকার, সেখানে এতদিন ভারতবাসী মাথাপিছু ঊর্দ্ধপক্ষে ১২০০ ক্যালোরীযুক্ত ১২ আউন্স খাদ্যশস্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দৈনিক এই ১২ আউন্স খাদ্যবরাদ্দ বজায় রাখাও ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না এবং ইতিমধ্যেই মাদ্রাজাদি কয়েকটি প্রদেশে দৈনিক খাদ্যবরাদ্দ ১২ আউন্সের স্থলে ১০ আউন্সে নামিয়া আসিয়াছে এবং বাঙ্গলায়ও এই ১০ আউন্স বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইতেছে। মাদ্রাজের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ সুরু হইবার কথা সরকারীসূত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে। বাঙ্গলায়, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার খাদ্যপরিস্থিতিও অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন যুদ্ধোত্তর মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকার সমস্যার যুগ। দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের আজ জীবিকার্জ্জনের খুব অল্প পথই খোলা আছে। এ সময় চাউলের দর প্রতি মণ ফরিদপুরে ৩১।০ আনা, সন্দীপে ২৮ টাকা, বরিশালে ৩০ টাকা ও মাণিকগঞ্জে ৩০ টাকা।* ইউনাইটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে জুন মাসের শেষে প্রতি মণ চাউলের দর উত্তর বাখরগঞ্জে ৩২ টাকা, চট্টগ্রামে ৩০ টাকা (সাতকানিয়ার ন্যায় কোন কোন স্থানে ৪০ টাকা), ফরিদপুরে ৩৬ টাকা ও পাবনার মফঃস্বল অঞ্চলে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিহারের অবস্থাও শোচনীয়, বিহারে চাউলের দর মণ প্রতি ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। সুতরাং অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা চলে যে, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে অর্দ্ধমৃত ভারতবাসী এই বর্দ্ধিত অন্নমূল্যের চাপে ক্রমেই সামগ্রিক এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতে পুনরায় যে এই গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের উদ্ভব হইল, ইহার কারণ দেশের খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতির জন্য দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন ভারত সরকারকে যে সব মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছিলেন, ভারত সরকার সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। দেশে এখনও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই এবং বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া ভারত সরকার যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য হাতে মজুত করিতে পারেন নাই। ভারতসরকারের এই অকৃতকার্য্যতার কারণ অবশ্য বিদেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের অভাব এবং এদেশে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা। এ ছাড়া প্রকৃতিও যে ভারতের প্রতি সদয় নয়, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ধান ও গম গাছের শীষে একপ্রকার রোগ দেখা দেওয়ায় (Rust) ফলে এ বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন ফসল নষ্ট হওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোক বাড়ে, কাজেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাওয়া দরকার। এ বৎসর সিন্ধু পাঞ্জাব ও উড়িষ্যায় সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে, ভারতের বাকী সব প্রদেশে (ইহার মধ্যে স্বভাবতঃ স্বচ্ছল মধ্যপ্রদেশও আছে) ঘাটতির জন্য বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীরই প্রয়োজন। মোটের উপর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাঙ্গালোরে প্রদত্ত এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, ভারতে এবার ৪৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য ঘাটতি হইবে। এবৎসর (১৯৪৬-৪৭) ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা শস্য উৎপাদনের নিম্নের তালিকা হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে :—

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৫-৪৬ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা উৎপাদন
ধান	২,৬৩,৫৪,০০০ টন	২,৭২,৮৬,০০০ টন	২,৭০,৯৩,০০০ টন
গম	৮৯,০০,০০০ টন	৮০,০০,০০০ টন	১,০০,৫৪,০০০ টন
বাজরা	৮৯,৪০,০০০ টন	৯৩,০০,০০০ টন	৯৪,৮৩,০০০ টন

আসন্ন এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভারতবর্ষকে যে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও গম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এদিক হইতে ভারতবর্ষের একমাত্র আশা সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের সাহায্য। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধের জন্য ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের বেশী খাদ্যশস্য ভারতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। মে ও জুন মাসে যদি আরও এক লক্ষ টন আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও খাদ্যবোর্ডের প্রতিশ্রুতির অর্দ্ধাংশের কিছু বেশী খাদ্যশস্য মাত্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে।

* অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫শে জুন, ১৯৪৭।

এই অবস্থা নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নৌ-ধর্মঘটের ফলেও ভারতের আমদানী ব্যবস্থা কিছুটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল এখনও মিটে নাই এবং এই দেশ হইতে ভারতে এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী হইতে পারিতেছে না। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে বৎসরে গড়ে ১৫ লক্ষ টন চাউল যোগাইত, যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মদেশের কৃষিব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা এখনও কিয়দংশে বজায় আছে বলিয়া ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে তেমন বেশী খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির জন্য ব্রহ্মে চাউলের দর এমনি বেশী, সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মসরকার চাউল বেচিয়া শতকরা ১৫ টাকা হারে মুনাফা লুটিতেছেন। এইরূপ নানা কারণে ব্রহ্মদেশ হইতে এখন একমণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ১৭ টাকা খরচ পড়িতেছে; ইন্দোনেশিয়া হইতে অনুরূপ পরিমাণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ব্যয় হইতেছে ১২৸৹ আনা।

ভারতের অন্তর্বর্ত্তী সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত, দেশের খাদ্যব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁহাদের আগ্রহশীল হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ এই দুই বৎসরে সরবরাহকৃত খাদ্যশস্যে সরকারী সাহায্য বাবদ তাঁহারা ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া জনস্বার্থরক্ষার আগ্রহই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যবৃন্দ ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ হইলে কি হয়, যাঁহাদের হাতে দেশে খাদ্যবণ্টনের ভার তাহাদের অযোগ্যতা (কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তি) বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুঃসময়ে খাদ্যবিভাগের এইরূপ ত্রুটিসমূহ কঠোরহস্তে সংশোধন করা অত্যাবশ্যক। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের করুণ অভিজ্ঞতার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের চরম খাদ্যসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে দুর্নীতিশীল দেশবাসী বা সরকারী কর্ম্মচারীদের শায়েস্তা করিতেই হইবে, অন্যথায় আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে এদেশে অগণ্য বুভুক্ষুর মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে না।

ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকীস্থানের অর্থনৈতিক বনিয়াদ

কংগ্রেস এবং লীগ কর্ত্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩রা জুনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ উপস্থিত পাকীস্থান ও হিন্দুস্থানে (ভারতীয় ইউনিয়ন) বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে ভারতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে রাষ্ট্র দুইটির আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া সারা দেশে বিরাট জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অবশ্য তুলনায় হিন্দুস্থান যে সমৃদ্ধতর রাষ্ট্র হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে হিন্দুস্থানের সহিত পাকীস্থানের তুলনাই চলিতে পারে না, তবে প্রস্তাবিত পাকীস্থানে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের সুযোগ আছে যথেষ্ট এবং ভারতের বিখ্যাত দুইটি বন্দর চট্টগ্রাম ও করাচী এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লীগদল যেরূপ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল, তাহাতে বিলাতী মূলধনে এই রাষ্ট্রে কিছু কিছু শিল্পাদি গড়িয়া উঠাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু পাকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া খাদ্যশস্যের দিক হইতে পাকীস্থান অনেকটা স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট লইয়া তো পাকীস্থানীরা ইতিমধ্যেই হৈ চৈ সুরু করিয়া দিয়াছেন। তবে কৃষিজাত পণ্যের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হইলেও খনিজ সম্পদের দিক হইতে পাকীস্থানের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি "হিন্দুস্থান ও পাকীস্থান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য" (Basic facts relating to Hindusthan and Pakisthan) শীর্ষক একখানি পুস্তিকায় উভয় রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ বিড়লার এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ না হইতে পারে, ইহাতে কিছু কিছু সংখ্যাতত্ত্বগত ভুল ও থাকা সম্ভব, তবে দায়িত্বশীল অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত এই বিবরণী উপেক্ষার বস্তু নয়। এই বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রস্তাবিত পাকীস্থান এলাকার আর্থিক বনিয়াদ মোটেই দৃঢ় নয় এবং এই বনিয়াদ সত্যসত্যই যুগোপযোগী দৃঢ় করিয়া তুলিতে বিপুল অর্থব্যয়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে। অবশ্য লোক সংখ্যা এবং কৃষি সমৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে, রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থা ভাল হইলে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ হইবে না। কৃষিজীবী ভারতের দুর্গতি তাহার লোক বাহুল্যের জন্য, পাকিস্থানে ভূমি হিসাবে লোকসংখ্যা হিন্দুস্থানের তুলনায় এমনি অনেক কম। তাছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা সুস্থ, সবল ও কর্মঠ; কৃষিশ্রমিক বা শিল্পশ্রমিক, দুই হিসাবেই তাহারা গড়পড়তা ভারতবাসীর তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। জনবিরল অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিগত আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইউরোপেরই কৃষিজীবী দেশ ডেনমার্কের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা বা জীবনযাপনের মান মোটেই হীন নয়। যাহাহউক, মোটের উপর যাঁহারা এখনো অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন এবং যাঁহারা আশা করেন যে, অনতি-বিলম্বে পাকীস্থানী কর্ত্তৃপক্ষ দারুণ আর্থিক অনটনের জন্য পাকীস্থানকে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করিয়া অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবেন, মিঃ বিড়লার নিম্নলিখিত হিসাব পড়িয়া তাঁহারা আশান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শিল্প অঞ্চল (১৯৩৯—৪০)

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
কাপড়ের কল	৩৮০	৯
পাটকল	১০৮	—
চিনির কল	১৫৬	১০
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা	১৮	—
সিমেন্টের কারখানা	১৬	৩
কাগজের কল	১৬	—
কাঁচ কল	৭৭	-

ব্যবসা ও পেশাগত আয় (টাকায়)

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
খনি ইত্যাদি	৯,৪১,৪৭,৬২৪	২,৩৫,৪০,৮৮০
বস্ত্রশিল্প	৪৪,৮৬,৮১,৮৬০	২,৭২,১৮,২২৩
ধাতু ও ধাতব পণ্য	৬,৫২,৪৪,৮৩৫	১,৮৬,৩৩,৯৭৪
গৃহ নির্ম্মাণ ও বিবিধ পণ্য তৈয়ারী	৭,৮৬,৬৭,৪৬২	১,৯১,৭৩,২৭৩
বণ্টন ও যোগাযোগ	১০৪,৬৩,৫৪,৪৭২	১৮,৪৭,৪৬,৭২১
অর্থ ব্যবস্থা (Finance)	২০,৬২,১১,৫১৯	৩,৮৮,০৭,৪৭২

কৃষি ও খাদ্য সম্পদ

কাঁচা পাট	৯, ৮৩, ৫১৯ একর	১৪, ০৩, ৭০০ একর
কাঁচা তুলা	১, ৩৭, ৭০, ০০০ একর	১৬, ৩০, ০০০ একর
চা	৬, ৪১, ২৪৩ একর	৯৬, ৬৫৭ একর
ধান	১, ৭২, ২৯, ০০০ টন	৫৩, ৭৬, ০০০ টন
গম	৪১, ৯৯, ৭৪০ টন	২৭, ৮৫, ২৬০ টন
চীনা বাদাম	২২, ৭৪, ০০০ টন	নগণ্য

খনিজ সম্পদ

কয়লা	২, ৫০, ৭৯, ৮০২ টন	১, ৯৮, ৪৭৬ টন
পেট্রোল	৬, ৫৯, ৬৮, ৯৫১ গ্যালন	২, ১১, ১৩, ৪২০ গ্যালন
ক্রোমাইট	৫, ১ ৯৪ টন	—
তামা	২, ৮৮, ০৭৬ টন	—
লৌহ	১৪, ২১, ৭০১ টন	—
ম্যাঙ্গানিজ	৭, ৬৬, ৩৪১ টন	—
অভ্র	১, ০৮, ৮৩৪ হন্দর	—

যোগাযোগ

(১) রেলপথ		
দৈর্ঘ্য	২৫, ৯৭০ মাইল	১৪, ৫৪২ মাইল
মূলধন	৬২৪° ৬৮ কোটি টাকা	২৩৩° ৮১ কোটি টাকা
(২) রাজপথ	২, ৪৮, ৬০৫ মাইল	৪৯, ৮৬৩ মাইল
সম্ভাব্য জলশক্তি	১৩,৪৩,০০০ কিলোওয়াট	২৮,৪৭,০০০ কিলোওয়াট

রাজস্বের হিসাব

প্রাদেশিক		
আয়	১৪৩°৩৮ কোটি টাকা	৪৪°৭৯ কোটি টাকা
ব্যয়	১৪২°২৭ কোটি টাকা	৪৯°৪৭ কোটি টাকা
উদ্বৃত্ত (+), ঘাটতি (—)	+১°১১ কোটি টাকা	—৪°৬৮ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয়		
আয়	২৭৭°২১ কোটি টাকা	৮২°৯৫ কোটি টাকা
ব্যয়	৩৮৯°৩২ কোটি টাকা	১১৬°২৯ কোটি টাকা
উদ্বৃত্ত (+),ঘাটতি (—)	—১১২°১১ কোটি টাক	—৩৩°৩৪ কোটি টাকা

গ্রামাঞ্চলের একটি সমস্যা

শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল। শিল্পবাণিজ্যের দিক হইতে প্রস্তাবিত হিন্দুবাঙ্গলা কিছুটা সমৃদ্ধ হইলেও খাদ্যশস্য এবং জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে মুসলিম বাঙ্গলার অবস্থা যে অধিকতর আশাপ্রদ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য সমগ্রভাবেই বাঙ্গলা খাদ্যশস্যের হিসাবে ঘাটতি প্রদেশ এবং মুসলিম বঙ্গও যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তাহাতে এই নূতন রাষ্ট্রের পক্ষে হিন্দুমুসলমান সকল অধিবাসীকে প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যশস্য যোগান সম্ভব নয়।

হিন্দুবাঙ্গলা বা পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইলে এই অঞ্চলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার এবং ভূমির উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির তথা কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধনের একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা অবলম্বনে অকারণ বিলম্ব বহু-সম্ভাবনাময় পশ্চিম বঙ্গবাসীর আত্মহত্যারই সমতুল হইবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রধান অনুপূরক হইল পশ্চিমবাঙ্গলার নদনদীগুলির সংস্কার। সকলেই জানেন দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে পশ্চিমবাঙ্গলায় ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং বহু কারখানা চালাইবার উপযোগী ৩ লক্ষ কিলোয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। এছাড়া নদীটির সংস্কার হইলে উপর্য্যুপরি বন্যা প্রতিরুদ্ধ হইবার সহিত নদীপথে অবাধ নৌকা চলাচলের ব্যবস্থ হওয়ায় দামোদরের পার্শ্ববর্ত্তী বন্দরগুলির উন্নতি হইবে ও গ্রামবাসীদের প্রভূত সুবিধা হইবে। এইভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে লক্ষ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্যই রক্ষা পাইবে। শুধু দামোদর, অজয় ময়ূরাক্ষী বা দারকেশ্বরের ন্যায় অপেক্ষাকৃত বড় নদী নয়, সরস্বতী, যমুনা প্রভৃতি ছোট ও মাঝারি নদীর সংস্কারের আবশ্যকতাও এখন অত্যধিক। এইসব নদী যে মজিয়া যাইয়া অসংখ্য গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়াইতেছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলির উৎপাদিকাশক্তি কমাইয়া দিতেছে, রেলওয়ে ও জেলাবোর্ডের পরিকল্পনাহীন সেতু-গুলিই তাহার প্রধান কারণ। প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করা বা সংস্কার করা দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষের আশু-কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। এই ধরণের সেতু নির্ম্মাণে সামান্য কয়েকটি টাকা বাঁচাইবার জন্য কিরূপ মারাত্মক অবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিতেছি। ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় পদ্মা নামে একটি মাঝারি ধরণের নদী আছে। নদীটি চারঘাটে যমুনার সঙ্গে মিলিয়াছে। চারঘাট হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণে চাতরা পর্য্যন্ত নদীটি কমপক্ষে ৪২৫ ফুট চওড়া, কিন্তু জেলাবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ খাসপুর-মছলন্দপুর রাস্তায় দক্ষিণ-চাতরায় যে সেতুটি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেটি মাত্র ৭৫ ফুট এবং এই সেতুটির মাঝে আবার তিন ফুট চওড়া দুটি থাম গাঁথা হইয়াছে। এই সেতু হইতে আরও ৪ মাইল দক্ষিণে কলসুর গ্রামের পাশে মছলন্দপুর-খোলাপোতা রাস্তায় মগরায় আর যে একটি সেতু আছে সেটি মাত্র

২০ ফুট লম্বা। বলা বাহুল্য সেতুবন্ধনের সময় খরচ বাঁচাইবার জন্ত কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবে নদী বাঁধিবার যে পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে নদীটি একেবারে মরিয়া যাইতেছে এবং বর্ষার কয়েকটি দিন ছাড়া নদীর স্থির জল সারা বৎসর কচুরীপানার স্তূপে বোঝাই থাকে। বর্ষার দিনগুলিতেও কচুরি পানা এমন কিছু সরিয়া যায় না যাহাতে নৌকা চালান চলে। এই ধরণের নদীর উপর এভাবে সেতু বাঁধা না হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির স্বাস্থ্য ও জমির উৎপাদিকাশক্তি যে অনেক বাড়িতে পারিত, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এইসব নদীতে স্রোত থাকিলে কচুরী পানা জমিতে পাইত না, রীতিমত নৌকা চলাচলের ফলে মাল ও যাত্রী আসা যাওয়া করিতে পারিত, ম্যালেরিয়ার উৎপাত কমার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের অধিবাসীদের অনেকটা সুখসুবিধা এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হইত। একটু বাহিরের জমিতে জলসেচের বা শস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাতেও সেক্ষেত্রে এই নদী অবশ্যই প্রভূত সহায়তা করিত। ১-৭-৪৭

দেশীয় রাজ্য ও গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

২৮শে এপ্রিল গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন বসিলে, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য সর্বপ্রথম গণ-পরিষদে যোগদান করে। বরোদা, কোচিন, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ১৬ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। এই ১৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১ জন নির্বাচিত ও মাত্র ৫ জন মনোনীত। ইহার পরে ছোট বড় করিয়া আরও অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য একে একে গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগদান করিল না তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণার পর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অপর কয়েকটি রহস্তজনকভাবে চুপ করিয়া রহিল।

প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র অর্দ্ধেকের কম লইয়া নরেন্দ্রমণ্ডল। তাহা হইলেও নরেন্দ্রমণ্ডলের অনেকেই গণ-পরিষদে যোগদান করায় এবং অনেকে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভূপালের নবাবের পক্ষে আর নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার পদে থাকা সম্ভব হইল না। তিনি গণ-পরিষদে যোগদান সমর্থন করিলেন না। তিনি নিজে আশা করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিলেই ভূপালকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তাই তিনি চ্যান্সেলারের পদে ইস্তফা দিলেন।

ভূপালের দেখাদেখি ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিল। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এক ঘোষণায় বলিলেন—১৫ই আগষ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ১৫ই আগষ্ট হইতেই ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণ যেন ইহাতে মহারাজাকে সমর্থন করেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার জন্ত মহারাজা যে কোনও অবস্থার সম্মুখীন হইতে বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

১২ই জুন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরও এক ফার্মানে ঘোষণা করিলেন যে—হায়দরাবাদ হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোনও গণ-পরিষদে যোগদান করিবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের উপর হইতে তাঁহাদের সার্বভৌমত্বের অবসান হইবে, তখন হায়দরাবাদ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই সময় নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকে। যে সব দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সমালোচনা করিয়া উক্ত অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয়—কোনও দেশীয় রাজ্যের রাজা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেন না, অধিকন্ত তাঁহার রাজ্যের প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিবেন। তাঁহার এইরূপ কার্যে বাধাপ্রদান করিতেই হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিলে সার্বভৌম ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপরেই আসিবে, তখন নৃপতিগণকে প্রজাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে অবস্থান করিতে হইবে।

হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্কল্প করিলে হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থ হায়দরাবাদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু নিজাম বাহাদুর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৬ই জুন হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। ইহাতে নিজাম বাহাদুর স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্কল্প করিয়া যে ফার্মান প্রকাশ করেন তাহার সমালোচনা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—নিজাম বাহাদুর জনসাধারণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া এবং জনমত গ্রহণ না করিয়াই এই ফার্মান প্রকাশ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিলে ষ্টেট কংগ্রেস সর্বপ্রকারে বাধাদান করিবে।

ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত পট্টমথানু পিল্লাই ও ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জানাইলেন,—ত্রিবাঙ্কুর যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তাহা হইলে প্রজা-সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে। আমরা ইহার জন্য ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইব। আমাদের এই অহিংস আন্দোলন দমন করিতে গবর্ণমেণ্ট যত কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, আমরা কিছুতেই দমিব না।

১৫ই জুন হইতে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন বসে তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বলা হয়—কোন দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, সেই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা আদৌ স্বীকার করা হইবে না। কোন বিদেশী শক্তি উহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে তাহা বন্ধুত্ব-বিরোধী কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

গণ-পরিষদ ও উহার বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য স্যার এন, গোপাল-স্বামী আয়েঙ্গার, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল স্যার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কোচিনের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার আর, কে, সন্মুখম্ চেট্টি, মিঃ কে, এম, মুন্সী, ডাঃ আম্বেদকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, উহাদের স্বাধীনতা ঘোষণার শাসনতান্ত্রিক বা আইন-সম্মত কোনও অধিকার নাই। মহাত্মা গান্ধীও কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে দেশীয় রাজ্যের এই অসঙ্গত দাবীর কথা উত্থাপন করিলেন। ১৬ই জুন নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় তিনি বলিলেন—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ফলেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের ভারতকে আরও বিভক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও একটিতে যোগদান করা উচিত। ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ যে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। কোনও দেশীয় রাজ্যের পক্ষেই এরূপ মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বর্তমানে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। নৃপতিবৃন্দ যদি সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তবে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। পরদিন পুনরায় গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—ত্রিবাঙ্কুরে গণ-ভোট গ্রহণ করা হইলে জনসাধারণ সকলেই স্যার রামস্বামী আয়ারের স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুরের বিরুদ্ধেই ভোট দিবে। ১৫ই জুন তারিখে ত্রিবাঙ্কুরের এক প্রতিনিধি দল মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা তাঁহাকে জানান যে, ত্রিবাঙ্কুরে জনমতের কণ্ঠরোধের চেষ্টা ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের এক জনসভায় পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়া ৩৫জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গান্ধীজী এই দিন প্রার্থনা সভায় বলেন—স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের স্বাধীনতা ঘোষণার কোনও মূল্য নাই, ইহা ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। বর্তমানে ইহা কল্পনাতীত।

দেশীয় রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের বিষয় লইয়া, দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণ ও দেশের নেতৃবৃন্দ যখন এইভাবে আলোচনা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন যে, মন্ত্রিমিশনের ১২ই মের স্মারকলিপিতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কোনও নির্দ্ধারিত নীতির কথা বলা হয় নাই। পাকিস্থান কি হিন্দুস্থান একটি গণ-পরিষদে তাহাদিগকে যোগ দিতে হইবে ইহা ঠিক নহে। আমার মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে, কারণ তাহাদের সে অধিকার রহিয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় ১৮নং অনুচ্ছেদে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়, ১৯৪৬ সালের ১২ই মে তারিখের স্মারকপত্রে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে নীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বলবৎ থাকিবে।

১২ই মে তারিখের উক্ত স্মারকলিপিতে নির্দেশ থাকে যে, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিবে, তাহা না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহারা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইবে।

উক্ত নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন হওয়ার কোন কথাই ইহার মধ্যে নাই। তাহাদের যাহা করিবার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই করিতে হইবে। মিঃ জিন্না কিন্তু ভেদ-নীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভারতকে আরও খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিলেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে সবল পাকিস্থান রাষ্ট্রের আশা তিনি পোষণ করিতেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহা না হইয়া এক "কীটদষ্ট" ক্ষুদ্র পাকিস্থান তাঁহার হস্তগত হয়। মিঃ জিন্না দেখিলেন, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইলে উহা আরও সবল হইয়া উঠিবে। তাই তিনি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীন হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে ভেদনীতির চালও চালা যাইবে।

তাই যে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করায় কংগ্রেস তাহা অস্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন, মিঃ জিন্না সেই ত্রিবাঙ্কুরকে স্বাধীন স্বীকার করিয়া তাহার সহিত চুক্তি করিতে অগ্রসর হইলেন। মিঃ জিন্না হয়ত ভাবিলেন, একটা হিন্দু দেশীয় রাজ্য ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করান গেল। মিঃ জিন্না ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে যে আলোচনা হয়, ২১শে জুন ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম হইতে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয়—মিঃ জিন্না ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাহাতে পাকিস্থান ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র স্থাপিত হইলেই ত্রিবাঙ্কুরের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে ও পরস্পরের মধ্যে সুবিধামূলক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে মিঃ জিন্না স্বীকৃত হইয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ইনেসপেকটর জেনারেল অব পুলিশ খানবাহাদুর আব্দুল করিম সাহেবকে পাকিস্থান ডোমিনিয়নের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছে। এই চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা দ্বারা ত্রিবাঙ্কুর

পাকিস্থান হইতে চাউল এবং পাকিস্থান বন্দর করাচীর মধ্য দিয়া মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল পাইবে, আর ত্রিবাঙ্কুর পাকিস্থান রাজ্যে চা, মশলা, নারিকেল প্রভৃতির বাজার পাইবে।

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে যুক্তি দেখান যে, ত্রিবাঙ্কুর কোনও দিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিজিত হয় নাই। বৃটিশের সহিত ত্রিবাঙ্কুরের সন্ধি একটা স্বেচ্ছামূলক মাত্র। অথচ বাটলার কমিটির রিপোর্ট, যাহাকে প্রায় সকল দেশীয় রাজ্যই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন দেশীয় রাজ্যগুলির সংস্পর্শে আসে তখন উহারা কেহই স্বাধীন ছিল না। উহাদের অনেককে অপরের অধীনতা হইতে উদ্ধার করা হয়, বাকীগুলিকে সৃষ্টি করা হয়।

যাহাই হউক, ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান যিনি ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এতখানি আগ্রহান্বিত, তিনি কিন্তু আসলে বৃটিশ ভারত, মাদ্রাজের অধিবাসী। ইনি পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তা ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমানে ইনি ভারতীয় ঐক্যের বিঘ্নসৃষ্টিকারী মিঃ জিন্নার সহিত হাত মিলাইয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে থাকিবার জন্য যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন, রাজ্যের প্রজারা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বেচ্ছাচারী মহারাজাকে এ বিষয়ে মোটেই সমর্থন করিবেন না। তাঁহারা ইহার জন্য যে কোনও রূপ দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত, একথা জানাইয়া দিয়াছেন। আর হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণা অথবা পাকিস্থান রাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাঁহার রাজ্যের শতকরা ৮৯জন হিন্দু। ইহাদের মিলিত দাবীর বিরুদ্ধে নিজামের টিকিয়া থাকা অসম্ভব। মধ্য ভারতে অবস্থিত ভূপাল রাজ্যেও অধিকাংশ প্রজাই হিন্দু। এই জাগ্রত প্রজাসাধারণ ভূপালের নবাবের স্বেচ্ছাচারিতায় সায় না দিয়া তাহারাই তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ভারতের সংহতি ও মর্যাদার বিঘ্নসৃষ্টি না করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির আশু কর্তব্য হইল—বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও একটিতে অবিলম্বে যোগদান করা। ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, ভূপাল ছাড়া আরও কয়েকটা দেশীয় রাজ্য রহিয়াছে, তাহারা কোন গণ-পরিষদে যোগদান করিবে কিনা এখনও কোন মতামত জ্ঞাপন করে নাই। যাহা হউক, তবে এখন পর্যন্ত ইহা ঠিক হইয়াছে যে মাত্র এই কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতের প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের অধিকাংশই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিবেই।

৩০।৬।৪৭

অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ফসলবিহীন অসহায় মাঠে বকের পালক ঝরে,
অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে।
নীরবতাভরা নির্জ্জন নদী নির্জ্জীব নিশ্চল
উতলা উদাস সমীরণে দোলে সবুজ পত্রদল ;
পাশবিকতার ধূম্রকুণ্ডলী গাঁয়ে ওঠে অবিরত
কে জানে কখন জ্বলিবে বহ্নি দুরাশার প্রলোভনে
হিংসার আবাহনে !

হৃদয় হরিণ ভ্রমিয়াছে হোথা প্রতিদিন নির্ভয়ে,
মৃন্ময়ী মার জীবন সূর্য্যোদয়ে।
সে মাতা আমার মরণের কোলে আশ্রয় নিয়ে রয়,
ধূলি আবর্ত্তে মানব যাত্রী পদে পদে পায় ভয় ;
সংঘাত-ঘেরা রৌদ্র-জ্যোছনা মুখরিত দিনরাত,
মরু সভ্যতা ভুলায় কুবাণে পরাণ হরণ করি
নির্ম্মমরূপ ধরি।

যেথায় শুনেছি জনকলরব মিলনের মোহানায়
স্নেহের কুটীরে প্রীতি আর মমতায়,
ছায়া ফেলে ফেলে মনের ভাবনা চলে চারিদিক চেয়ে,
আমার জীবন-গোধুলি বেলার মেঘভাঙা পথ বেয়ে।
মসজিদ আর দেউলের চূড়া দেখা যায় তরু শিরে,
সরিষা ক্ষেতের পাশে গ্রামখানি তেপান্তরের পারে
পাগ্‌লা নদীর ধারে।

চিত্ত আমার সরসীর সম ছিল একদিন গাঁয়ে,
প্রথম প্রণাম পরায়েছি ওর পায়ে।
কত পার্ব্বণ উৎসব ফুল সমাহিত বীথিকায়,
কোথায় গিয়েছে মানবতা ওর মানুষের গীতিকায়' !
বিস্মৃত কত পলাশী যুগের প্রেতায়িত ইতিকথা
শ্যামা বনানীর অঞ্চলে ঢাকা পোড়ো ভিটাদের মাঝে
মাটির স্বপন রাজে।

আমাদের গ্রামের পাখী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোকিলের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙিত। কাক কি মোরগের ডাকে নয়। প্রভাত হইবার বহুপূর্ব্বে কোকিল, পাপিয়া এবং অন্যান্য পক্ষীর সুদীর্ঘ সুমধুর কনসার্ট চলিতে থাকিত। আমাদের গ্রামে মুসলমান নাই, কুনুর নদীর পারে মোরগের ডাক ক্বচিৎ শোনা যাইত। কাক দূর গ্রাম হইতে ভোর বেলাতেই আসিত বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বেই বিহগকুলের ঐক্যতান আরম্ভ হইত।

কাক রূপহীন এবং তাহার কণ্ঠ কর্কশ, কিন্তু তাহাদের সহিত যেমন দহরম মহরম, এমন আর কোনো পক্ষীর সঙ্গে নয়—তাহারা প্রায় গৃহ পরিজনেরই মত। যাহাদের ঘরে যুগে যুগে পিকরাজ পালিত হইতেছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা তো চলে না। আমার উহাদিগকে চিরদিনই ভাল লাগে—পরিণত বয়সেও সে প্রীতি কমে নাই। একবার বর্দ্ধমান ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে একটী বাড়ীতে রাত্রি কাটাই, সমস্ত দেবদারু বৃক্ষগুলি সন্ধ্যায় অসংখ্য কাকের সমাগমে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। জ্যোৎস্না রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, কাকগুলি ততই ডাকিতে লাগিল—কাকের ডাক যে এত মিষ্ট হইতে পারে তাহা কখনো ভাবিতে পারি নাই।

> "আজ পেরেছি জান্‌তে আমি সন্দেহ নাই আর,
> কোকিল কেন কাকের গৃহে কণ্ঠ সাধে তার?
> কোকিল নহি—কিন্তু ভরে আনন্দেতে বুক,
> কাকের বাসায় একটী ছোট রাত্রি জাগার সুখ।"

আমাদের বাড়ীতে চার পাঁচটী কাক নিয়মিত আসিত, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিত—এখনো থাকে এবং দল বৃদ্ধিই হইয়াছে।

আমার শৈশবে আমাদের পরিচারিকা 'মানদা'—'সোনার কেউও' 'কাগা' মামা ও 'বগা' মামার গল্প বলিয়া কাক ও বকের প্রতি একটা অহেতুকী ভালবাসা আনিয়া দিয়াছিল। 'সুয্যি' মামা ও 'চাঁদা' মামার পরই ঐ দুটী পাখীর সঙ্গে আত্মীয়তা। বকের সম্বন্ধে রসিকতা করিয়া সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন—

> "দেখছি আমি হে বক তুমি
> চাঁদের চেয়ে ভালই দাদা।
> শুক্লপক্ষ একটা চাঁদের
> দুটী পক্ষ তোমার সাদা" (অনূদিত)

বলাকা দলের একসঙ্গে মাঠে অবতরণ ও সন্ধ্যায় শুভ্র যূথিকার মালার মত একসঙ্গে উর্দ্ধাকাশে প্রয়াণ বড়ই সুন্দর। আমাদের গ্রামে একটা তেঁতুলগাছে অসংখ্য বক বাস করিত, গাছটী সাদা করিয়া রাখিত, কেহ বিরক্ত কি হিংসা করিত না।

আমাদের গ্রামে কোকিল ও পাপিয়ার সংখ্যা খুব বেশী, পাপিয়াও কোকিলের ন্যায় বাসা বাঁধে না—ছাতার পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে।

> "পাপিয়া কি গাইতে পারে
> রচতে হলে বাসা?"

বৈশাখের শেষে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমে কাক ও ছাতারের বাসা হইতে কোকিল ও পাপিয়া সংগ্রহ করার চেষ্টা অনেকে করিত।

শালিক, ঘুঁটকে, ফিঙা, দোয়েল, বুলবুলি, চড়াই, মুনিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ঘুরিত। অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও আমাদের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটী শালিককে 'আহার' অন্বেষণ করিতে দেখিতাম—

> "এত বাদল—তবু সাঁঝে
> একটী শালিক চরে,
> নিশ্চয় ওর আছেই আছে
> খোটেল ছেলে ঘরে।
> ছোট্ট ছেলে রাগে,
> বক্‌তে বুকে বাজে।
> জননী তার তাই এসেছে
> 'আহার' নেবার তরে।'

'গোলা পায়রা' প্রত্যেক বাড়ীতে আসিত এবং বাসা করিত। ছানাগুলি একটু বড় হইলেই বড় পায়রাদের সঙ্গে খুব অহঙ্কার করিয়া সোহাগে ঘাড় উঁচু করিয়া 'বকম' 'বকম' করিবার চেষ্টা করিত, যেন বলিতে চায়—

> "দেখ আমার বাপ বকে না
> সোহাগ করে মা,
> দুনিয়াতে কাউকে আমি
> কেয়ার করি না?'

হলুদ পাখী 'বউ কথা কও' গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী ছিল না, মাঝে মাঝে আসিত। হলুদ পাখী সম্বন্ধে গ্রাম্য গল্প আছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার বিবাহের পাকা কথাবার্ত্তা হয়, গায়েহলুদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়—কন্যা মনোদুঃখে পাখী হইয়া গেল এবং—'কৃষ্টের পোকা হোক', 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে বালক মনে ব্যথা পাইতাম। নীলকণ্ঠের গানে আছে—

> "কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়?
> মা যশোদার কি সুখ বলো?
> নন্দ কেঁদে অন্ধ হলো,
> দেবকীর যে যাতনা
> দেব কি তায় পরিচয়?"

কতকগুলি পাখী অকারণে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ছিল—যেমন দাঁড়কাক, গোচিল, ঘুঘু, কালপেঁচা। ঘুঘু অতি নিরীহ পক্ষী, কিন্তু ঘুঘুকে গ্রামবাসী ভাল চক্ষে দেখে না—'ভিটায় ঘুঘু চরা' একটা গালাগালি। ঘুঘুকে বাড়ীর কাছে বাসা বাঁধিতে দেয় না, 'ঘুঘুর বাসা' মানে দুষ্ট ও অনিষ্টকারীর আড্ডা। এই অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বোধহয় কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সুদূর অতীত যুগে এই পক্ষীদের সম্বন্ধে গল্প রচনা করিয়াছিলেন: শাশুড়ী ও বৌ থাকিত, বৌএর নাম 'চিতু', চিতুকে ছাতু কুটিতে দিয়াছিল, কোটা হইলে শাশুড়ী মাপিয়া দেখিল কাঠা পূর্ণ হয় নাই, খালি আছে, তাই রাগিয়া তার গালে চপেটাঘাত করিল, চিতু মারা গেল। শাশুড়ী পরে দেখিল, কাঠা পূর্ণ হইয়াছে, ভুল তাহারই। শোকে অনুতাপে সে ঘুঘু হইয়া উড়িয়া গেল, আর বনে বনে ডাকিতে লাগিল—

'ওঠো চিতু, কাঠা পূ পূ পূ।'

ঘুঘুর সুরটী বিষাদমাখা বটে।

শৈশবে একটী শরাহত বন্য কপোতকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তার রাঙা আঁখি দুটীর ম্লান চাহনী আমাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, এখনো ভুলিতে পারি নাই—

"দিনু গায়ে হাত বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
পিয়ে মরণের কাল হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি'
তার সে চাহনী যে কথাটী হায় করে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাই না খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।"

টাকশোনা (নীলকণ্ঠ) ও শঙ্খচিল পল্লীবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করে; গোচিল বেচারীর দুর্ভাগ্য—লোকে বলে,

'শঙ্খ চিলের ঘটি বাটী
গোচিলকে কুড়ুলে কাটি'

লক্ষ্মী পেঁচা আদর পায়, লক্ষ্মীর বাহন; কিন্তু কালপেঁচা ঘৃণা ও ভয়ের বস্তু। দাঁড়কাক যমের দূত।

'মাণিকজোড়' পাখী দুটিতে এক সঙ্গে ওড়ে, ডাঙ্গাতে এক সঙ্গে চরে, কখনো কাছ ছাড়া হয় না—এক সঙ্গে দুইজনকে সর্ব্বদা দেখিলেই তাই লোকে বলে "যেন মাণিক জোড়'। 'শামখোল' মাণিক জোড়ের মতই, তবে তাদের চেয়ে কিছু বড় এবং দেখিতে তত সুন্দর নয়। তিতির পাখী গ্রামে অনেক। লোকে বলিত—

"তিতির পাখী বলছে ডেকে
ফকির হ তুই ফকির হ"

এ অঞ্চলে ফকিরেরা এ পাখী বেশী পোষে বলিয়াই বোধ হয় এই জনশ্রুতি।

কাঠঠোকরা পাখী দেখিতে ভাল, বাগানে ও বনে থাকে, প্রখর মধ্যাহ্নে তাহাদের শব্দ বনের নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে এবং দুপুরকে রহস্যময় ও ভীতিময় করে—তাই ছেলেরা বলে

"ঠিক দুপুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।"

বাবুই পাখী গ্রামের তাল গাছের শাখায় সুন্দর বাসা বানায়, কিন্তু বর্ষার বৃষ্টি ধারায় তাহারা নীড়ের বাহিরে থাকিয়া ভিজে, বোধ হয় 'ধারাস্নান' ভালবাসে। কথায় বলে "ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে'। টুনটুনি পাখী বিচিত্র রঙের বিভিন্ন জাতীয়—ছোট ছোট সুন্দর নরম বাসাগুলি ছোট গাছের শাখাতে নির্ম্মাণ করে। তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ।

বনটিয়া কখনো কখনো দল বাঁধিয়া আসিত। তবে সেগুলি ছোট, মধ্যে মধ্যে বড় টিয়া পাখীও দেখা যাইত তবে তাহারা আগন্তুক মাত্র। হরিয়াল পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে, আমাদের গ্রামে শিকার নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিতে আসিত না। শিকারী (শ্যেন) পাখী পায়রা এবং হাঁস প্রায়ই মারিত। মুসলমান ফকিরেরা শিকারী পাখী পোষে এবং তার দ্বারা বক ও ঘুঘু প্রভৃতি ধরে।

জলচর পক্ষীর মধ্যে, ডাকপাখী, বুনো হাঁস, মাছরাঙা, খঞ্জন, কাদাখোঁচা, টিটিভ দেখিতাম। 'বেনেবুড়ি' ডুবিয়া মাছ ধরে, ছোট ছেলেরা "বেনেবুড়ি বেনেবুড়ী আমার হয়ে একটা ডুব দে" বলিত আর সে ডুব দিত। ছেলেদের কথায় নয়, নিজের দরকারে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া ঐরূপ অনুরোধ করিতে থাকায় মনে হইত, এত অনুরোধ আর এড়াইতে পারিল না। টিটিভের ডাক ডাকাতির অগ্রদূত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। জলাভূমিতে আলো দেখিলে ঐ পাখীগুলি গ্রামের দিকে ছুটিয়া আসে—তীক্ষ্ণ ডাকে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙাইয়া দেয়—সজাগ করে। গ্রামবাসী সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রাজু ঘোষ নামে এক গোপ যুবক বহুবিধ পক্ষী পুষিত—সে গ্রামের পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ছিল—পাখীদের সম্বন্ধে সে অনেক সত্যমিথ্যা বলিত এবং তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারে এই ভান করিত।

পক্ষীজাতির মধ্যে অনেকে দেবদেবীর বাহন, তাহারা মানবের হিত করে এবং ভবিষ্যৎদর্শী এই সব লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী তাহাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়া তুলিত। তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল। গ্রামের বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি-গুলি তাহাদের গৃহ ছিল, পল্লীকে তাহারা শব্দময়ী ও সঙ্গীতময়ী করিয়া রাখিত।

আমার মাতৃদেবী টিয়া ময়না পুষিতে ভালবাসিতেন। একটী টিয়া পাখী সুন্দর বুলি বলিত। ২।৩ বৎসর পর সেটী মারা যায়, মা নিজে হাতে তুলসীতলে তার সমাধি দেন—আমি সজল নয়নে তাঁর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কত দিন হইল কিন্তু মনে হইতেছে যেন সেদিনকার ঘটনা। কাশ্মীর হইতে তিনি বহু খরচ ও ক্লেশ করিয়া ২।৩ বার টিয়া পাখী আনিয়াছিলেন, দুটী পাখীই অনেক দিন ছিল—আমি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

"তোমরা ছিলে কাশ্মীরেতে
জাফ্রাণেরি ক্ষেতে,
নিত্য রঙিণ ফুল পরাগে
রইতো বাতাস মেতে।

কমল যখন ফুটতো "মানসজলে"—বলে
লাগ্‌তো ফুলের গন্ধ জলে স্থলে,
রাঙা আপেল বাগান ভরা
ডাকতো কাছে যেতে।
নিশাদ বাগে পীয়ার চেখে
ফুটতো মধুর বোল,
আঙুর বনে অলস হয়ে
লতায় খেতে দোল।
'ঝিলাম নদীর দুকূল করি আলা
উড়তে নদীর মরকতের মালা
লাগতো ভাল স্নিগ্ধ উজল
নীল আকাশের কোল।"

যখন অজয়ে ঢল নামিত, জলচর স্থলচর পাখীর এক বিরাট বহর অজয় ও কুনুরের বুক ছাইয়া ফেলিত। চারিদিকে রাঙা জল, তাহার উপর ভাসমান শুভ্র ফেনের স্তবক, তাহাতে অসংখ্য পোকা মাকড়- জলের গভীর কলকলের সহিত বিহগদলের সম্মিলিত ধ্বনি বরষাে এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিত—'অতি ভৈরব হরষেই বর্ষার আগম হইত।

বর্ষার এত ফড়িঙ, পোকা, তৃণগুল্ম সবই যেন নবজাত পক্ষীশাবক গণকে পুষ্ট করিবার জন্ত। ভগবানের দান অকুণ্ঠিত—তাহাদে আহার মুখের কাছে যেন পঁহুছাইয়া দিতেন।

প্রতি ঋতুতে কত বিভিন্ন কত বিচিত্র পক্ষী গ্রামে আসিত—তা লিখিয়াছিলাম—

'এত পাখী আসে যায় সহি এত ঝক্কি,
যদি পথ ভুলে আসে সে গরুড় পক্ষী।
সে পাখার হাওয়া রে
যদি যায় পাওয়া রে,
মোরা, থাকি শুধু তার আশা পথ লক্ষি'।

নব বঙ্গ ও তাহার সীমান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

অখণ্ড বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন করা সাব্যস্ত হইয়াছে। শীঘ্রই সীমানির্দ্ধারণ কমিটী উভয় প্রদেশের সীমান্ত পাকাপাকি হিসাবে স্থির করিয়া দিবে। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের যে সকল অংশে হিন্দু কিম্বা জাতীয়তাবাদী জনসাধারণের সংখ্যা বেশী সেই সকল ভূখণ্ড লইয়া নূতন বঙ্গ গঠিত হইবে। কিন্তু বাংলা দেশের এমন অনেক অংশ আছে যেখানে হিন্দু মুসলমানের বাস পাশাপাশি, এমন কি একই গ্রামে এপাড়া ওপাড়ায় স্মরণাতীত কাল হইতে সুখে শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। রোগে, শোকে, বন্যা-ঝঞ্ঝা কিম্বা মহামারীতে গ্রামের কৃষক দেউল কিম্বা মসজিদে একইভাবে অভয় প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের সংঘাতে মনান্তর যে না হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু এক গ্রামের লোক পাশের গ্রামে "বিদেশী" গণ্য হইবে এমন উদ্ভট কল্পনা কেহ করে নাই; আজ মুসলিম লীগের অপপ্রচারে এবং "যুদ্ধং দেহি" রবে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। একই জাতির মধ্যে সীমাহীন ফাটল আজ দেখা দিয়াছে। চলার পথ হইয়াছে বিপরীতমুখী। জাতিগঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হয়তো সকল বিভেদ ও পার্থক্য একদিন একই ভাবপ্রবাহে সম্মিলিত হইবে। সেই ভাবী শুভদিনের অপেক্ষায় প্রেমের সহিত আজ "ভাই ভাই" "ঠাঁই ঠাঁই" হইতে পারিলেই মঙ্গল।

দুই প্রদেশের সীমারেখা যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক সংস্থান, নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত হওয়াই বিধেয়। সমতল ভূমির উপর আঁকা বাঁকা সীমানা হইলে পরস্পর উভয় রাষ্ট্রেই খবরদারী খুব ব্যয়বহুল ও অসুবিধাজনক হইবে। নদ নদী নালা কিম্বা পর্ব্বত সীমানায় না থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুর আক্রমণে বাধা দেওয়া কিম্বা সামরিক সৈন্য বাহিনী পরিচালনা ও গুপ্ত খবর সংগ্রহ বন্ধ করা কষ্টদায়ক; শান্তির সময় বাধা নিষেধ কিম্বা শুল্ক ফাঁকি দিয়া অবৈধ আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চালান সুবিধা। অনেকের ধারণা বর্ত্তমানের যান্ত্রিক যুদ্ধে নদী আর বাধা নহে। রুঢ়প্রদেশ দখলের সময় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর পরপার হইতে বিধ্বস্ত জার্ম্মান যান্ত্রিক বাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ কিম্বা জলপ্লাবিত হলাণ্ডের রণভূমি অথবা ওডার নদীর পশ্চিম তীরে পলায়নপর জার্ম্মান যান্ত্রিক বাহিনীর শেষ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা স্মরণ করিলে যান্ত্রিক যুদ্ধে নদ-নদীর সুবিধা ও অসুবিধা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ভারত ও নববঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা একই হওয়ায় এই সীমান্ত নির্দ্ধারণের গুরুত্ব অনেক বেশী হইয়াছে। প্রান্তদেশ ও সীমান্তে সাম্প্রদায়িক শক্তির বসতি স্থাপন করিতে দেওয়া অসঙ্গত। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ থাকিলে "পঞ্চম বাহিনী" উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা; গত যুদ্ধে দেখা গিয়াছে "পঞ্চম বাহিনীর" গোপন যুদ্ধের ফলাফল সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের জয় পরাজয় অপেক্ষা কম উল্লেখযোগ্য নহে। লোক সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত ভূখণ্ড যাহাতে অপর পক্ষের হস্তগত না হয় তাহা ও দেখা দরকার। বর্ত্তমান ব্রিটীশ বাংলার আয়তন ৭৭৪৪২ বর্গ মাইল, অমুসলমান জনসাধারণের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন। কিন্তু জমির অব্যূঢ় মালিকানা স্বত্ব হিন্দুদের শতকরা ৭০ ভাগ অপেক্ষাও অনেক বেশী।

সৌহার্দ্দ ও প্রীতির সহিত পৃথক হইলে ভবিষ্যতে পরস্পরের মানসিক বৈরুব্য না বাড়িয়া সন্তোষ ও সহানুভূতি জাগ্রত হইবে এই আশায় হিন্দু জনসাধারণের ন্যায্য দাবী সরেজমিনে হাজির করাই ভাল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাংলা দেশের অনেক জায়গায় হিন্দু মুসলমানের বাস এমন ভাবে মিলিত যে সীমারেখা স্থির করা দুঃসাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রেই দুই পক্ষ আপোষক্রমে লোক বিনিময় না করিলে সংহতিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। উপরন্তু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এমন উৎকট ব্যাধি হইয়া উঠিয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালির ঘটনা পুনরাবৃত্তি সর্ব্বদাই সম্ভব। মাৎস্যন্যায়ের ভয়ে বহু হিন্দু যে পৈত্রিক ভদ্রাসন, ঘর বাড়ী, পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় বঙ্গে চলিয়া আসিবে ইহা কল্পনাতীত নহে। এই সকল গৃহচ্যুত নরনারীকে পুনরায় যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় এইরূপ ভূগণ্ড হাতে থাকা প্রয়োজন।

বাংলা দেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে নজর করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে সীমানার চতুঃপার্শের প্রাকৃতিক দান, উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের খণ্ডগিরি এবং পূর্ব্বে গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। এই সকল পাহাড় পর্ব্বতবিনির্গত ক্ষীরতোয়া গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, আত্রেয়ী, দামোদর, অজয় ও গোমতী এবং ইহাদের সহস্র শাখাপ্রশাখায় বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ। বহুশত বৎসরের অবহেলায় আমাদের সমুদয় নদনদী হাজামজা হইয়া বাংলা ও বাঙ্গালীর সুখ ও স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিকোন বর্ত্তমান নদ নদীর দুরবস্থা দেখিয়া সঙ্কীর্ণ হওয়া সঙ্গত নহে, বরং যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক দানকে কেন্দ্র করিয়াই যাহাতে নববঙ্গ গঠিত হয় তজ্জন্য অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই কথা বলিবার সময় পূর্ব্ববঙ্গের দাবী ও আমাদের স্মরণে আছে। দুই বঙ্গেরই ভবিষ্যৎ সুখ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে নদী শাসন হওয়া দরকার হইবে। বর্ষার জলরাশি নদনদীর উৎপত্তিস্থলে উপযুক্ত ভাবে নির্ম্মিত জলাধারে রক্ষিত হইয়া জলসেচ প্রণালীতে সমস্ত বৎসর বিতরণ সম্ভব হইলেই কৃষি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যবসা বাণিজ্যের পত্তন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপজাত লভ্য হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি আমাদের যুগোপযোগী বর্ত্তমান সভ্যতার মান উন্নয়নে সাহায্য করিবে।

সরকারী শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব মোটেই না থাকায় গত ১৭৫ একশত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে নদনদীর উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কার হয় নাই, শিক্ষিত দেশবাসী ও চিন্তাহীন ভাবে সহরাভিমুখী হওয়ায় নদনদীর সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আন্দোলন হয় নাই, ফলে অধিকাংশ নদনদী হাজামজা হইয়া খাল বিলে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা জলপ্লাবনের প্রাবল্যে নদীর খাতই পাল্টাইয়া গিয়াছে, ভূকম্পনে নদীর খাত উচ্চ হইয়া যাওয়ায় স্রোত, উপস্রোত ও জলধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ; উত্তরবঙ্গে ত্রিস্রোতা ছোট ও বড় সকল নদীকে জল সরবরাহ করিত। জলপ্লাবনে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়, ত্রিস্রোতার খাত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হওয়ায় নূতন নদী সৃষ্টি করিয়াছে ; ফলে ত্রিস্রোতা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্ভরশীল নদনদী মজিয়া যাওয়ায় উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের আবহাওয়াই বদলাইয়া গিয়াছে। ধনধান্যে ভরা বরেন্দ্র ভূমির অবস্থা শোচনীয়, ম্যালেরিয়া ও মহামারীর তাণ্ডবে জনসাধারণ সন্ত্রস্ত। মধ্য বঙ্গের অবস্থাও তদ্রূপ। ভাগীরথী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, মধুমতী প্রভৃতি নদনদী শুষ্ক হওয়ায় মধ্য বঙ্গের স্বাস্থ্য অত্যন্ত হীন। এইরূপ অবস্থায় স্বাধীন নববঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের স্রষ্টাদের নদনদী শাসন হইবে প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার বিপুল জলরাশি বিফলে বহিয়া যাইতে না দিয়া পূর্ব্বোক্ত নদনদীর খাতের মধ্যে প্রবহমান হইলে পুনরায় উভয় বঙ্গই সুখ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই উভয় কারণেই বঙ্গ ভঙ্গের সময় নদনদীকে প্রাকৃতিক সীমানা ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

সীমানা ধার্য্য করিবার সময় ভৌগলিক কারণ ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাস, গাথা নৃতত্ত্ব অবগত হওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গের পলিয়া, রাজবংশী কৈবর্ত্ত ; মধ্যবঙ্গের পোদ, বাগদী, নমশূদ্র এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, টিপরা প্রভৃতি জাতি অত্যন্ত অনগ্রসর। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে নমশূদ্র জাতি শিক্ষা দীক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর বলিয়া অপেক্ষাকৃত সংহত ও শক্তিশালী ; তথাচ নোয়াখালীতে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা স্মরণ করিলে অনগ্রসর জাতির পাকিস্থানে অবস্থান ভীতিপ্রদ। হিন্দুসমাজের সত্যিকার আসল "শক্তি" এই কৃষকসম্প্রদায় পাকিস্থানী "নেকড়ে"র খপ্পরে পড়িলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর নিস্পৃহতা ও দূরে থাকার নীতির জন্য এবং প্রতিবেশী মুসলমান-সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংযম, বিপরীত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মধ্যে বসবাস করিয়া এই সকল নিরীহ কৃষকসম্প্রদায়ের ২।১টী পরিবার প্রতিদিনই মুসলমান হইতে বাধ্য হইতেছে। সামান্য কারণেই একঘরে ও "হুঁকা তামাক" বন্ধ,কিম্বা সামাজিক দণ্ড এঁদের মধ্যে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হঠাৎ পদস্খলিতা, বিপদগামিনী নারী কিম্বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার "সাতঘাট" ঘুরিয়া "বৈষ্ণব" হওয়ার চেয়ে মুসলমান হইয়া গৃহ পরিবার এবং আশ্রয় পাওয়া অনেক সুবিধাজনক। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর হীন দৃষ্টির জন্য এই সকল সম্প্রদায়ের বহুল ক্ষতি হইয়াছে। এখন দৃষ্টিচক্রের আবর্ত্তন হইলে ও রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন পাকিস্থানী হিন্দুসমাজ আক্রমণশীল মৌলভীদের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কিনা বিবেচ্য বিষয়, কাজেই বঙ্গ ভঙ্গের সহিত অত্যধিক লোকবিনিময় করিতেই হইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের সাম্প্রতিক নাটকীয় দুর্ঘটনাসমূহ অদূর সম্ভাব্য লোক বিনিময় সমর্থন করে, অন্যথায় হিন্দুকেই চলিয়া আসিতে হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা কিন্তু বিপরীত। এখানকার চাকমা, টিপরা প্রভৃতি জাতীয় লোকদের স্বগোত্রীয় নরনারীরা স্বাধীন ত্রিপুরা ও কাছাড় অঞ্চলে বসবাস করে। ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারেও নৈকট্য বন্ধনে আবদ্ধ, কাজেই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আসাম ও স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ অন্য কারণেও উজ্জ্বল, এই অঞ্চলের দুই ধারেই পেট্রোলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বাস হয় এখানেও পেট্রোল আছে, তুলা ও কাঠের জন্য পাকিস্থান এই অঞ্চল

পাইতে ব্যগ্র হইবে। আসাম সরকার মারফৎ ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের এই অঞ্চলের ভার লওয়া দরকার। পরে প্রতি বিভাগের সীমানা, আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হইল।

ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীনতম উপনিবেশ হইল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি। আর্য্যগণের আগমনের পরে ঐতিহাসিক যুগে এতদঞ্চলের রাষ্ট্রের নাম হইয়াছিল বরেন্দ্রভূমি। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কিম্বা বরেন্দ্রভূমি পালরাজাগণের নানা কীর্ত্তি, রামপালের রামাবতী, লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতী, অশেষ স্মৃতিবিজড়িত গৌড় নগরী, বিদ্রোহী ভীম ও দিব্যকের জন্মভূমি, রাজা গণেশের জন্মস্থান, রাজা কংসনারায়ণের তাহিরপুর, রাণীভবানীর নাটোর, দার্শনিক ও বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ সনাতনের জন্মস্থান রামকেলী, দাসনরোত্তমের খেতুর, বহু যুদ্ধের স্নায়ুকেন্দ্র ও স্মৃতি-বিজড়িত মহানন্দা, আত্রেয়ী ও করতোয়া প্রভৃতি নদনদী বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নববঙ্গের জয়যাত্রার সহিত বাঙ্গালী এই পুরাকীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইতে অশক্ত। এই সকল পবিত্র স্থান ও পুণ্যতোয়া নদীর কিয়দংশ যাহাতে নূতন বঙ্গের অধিকারভুক্ত হয় তাহার জন্য প্রবল আন্দোলন এখন হইতে সুরু হওয়া দরকার। উত্তর-বঙ্গের নদনদীর বেশীর ভাগ হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। কেবলমাত্র মহানন্দা গোদাগাড়ীর নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে, নিম্ন বরেন্দ্রভূমিতে কয়েকটী নদী আড়াআড়ি পদ্মা হইতে উত্থিত হইয়া পদ্মা কিম্বা যমুনায় পতিত হইয়াছে। কাজেই কোন একটা নদী অবলম্বন করিয়া সীমারেখা করার অসুবিধা আছে, উত্তর বঙ্গের যে অঞ্চলে (বরেন্দ্রীর মাঠে) একই নদীতে সীমানা টানা যায় না—সেখানকার উচ্চতা সমুদ্র গর্ভ হইতে প্রায় সর্ব্বত্রই কম বেশী সমান, কাজেই নদী দ্বারা সোজা রেখা বর্ত্তমানে পাওয়া অসুবিধা হইলেও পুরাতন খাত উদ্ধার করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করা সহজেই সম্ভব। ইহাতে একাধারে সীমানা ও জলসেচ প্রণালী দুইই সম্ভব হইবে। আত্রেয়ীর পূর্ব্বতটে বালুরঘাট সহর ও মহকুমা হিন্দু-প্রধান, কাজেই আত্রেয়ী * নদীকে সীমানা করা হইলে একটী হিন্দুপ্রধান অংশ হারাইতে হয়। সেই জন্য যদি আত্রেয়ীর সমান্তরাল শাখা নদীকে (ইহার নামও যমুনা) পূর্ব্ব সীমানা ধরা যায়, ইহাতে দিনাজপুর জেলার মুসলমান প্রধান অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই যমুনা রাজসাহী জেলার নওগাঁর নীচে আত্রাই ষ্টেসনের নিকটে আত্রাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। পরে আত্রাই নদীর উজান ধরিয়া মান্দা থানার নিকটে শিব নদীতে পড়িয়া নওহাটার নিকটে বারানই নদীতে আসা যায়। এই নওহাট্টা রাজসাহী নগরীর উপকণ্ঠ। তদনন্তর পদ্মার উজান বহিয়া মালদহের নীচে গঙ্গায় আসিলে জাতীয়তাবাদী উত্তর পশ্চিম বঙ্গের সীমানা পাওয়া যায়। + এই সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত কতিপয় পুণ্যশ্লোক নদনদী ও কয়েকটী প্রাচীন কৃষ্টির ধ্বংসোন্মুখ তীর্থক্ষেত্র, ভাবী ভাবধারার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা। এই অঞ্চলের মধ্যে কয়েক জায়গায় মুসলমান অধ্যুষিত স্থান আছে। নিরবচ্ছিন্নতা ও নৈকট্যজনিত স্থানগুলি দরকার। এই সকল অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী যদি জাতীয় বঙ্গে থাকিতে অসম্মত হয় তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া পাকিস্থান অঞ্চলের হিন্দুদের সহিত লোক বিনিময় করা সঙ্গত। লোক বিনিময় কষ্টসাধ্য হইলেও রাষ্ট্রের সংহতি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা বিদূরিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইবেই হইবে। ১৯৪১ সালের লোক গণনা রাজনৈতিক চাতুর্য্যপূর্ণ বলিয়া সন্দেহ হয়। রাজসাহী জেলার লোকসংখ্যা ১৯৩১ সালের লোক গণনায় ৪.৬% ভাগ হ্রাস পায়, কিন্তু ১৯৪১ সালের লোক গণনায় উক্ত হ্রাস বন্ধ হইয়া ১৩'৭% বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ সাল অপেক্ষা মুসলমান বাড়তির হার অনুপাতে বেশী বলিয়া, অথচ রাজসাহীর স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বলিয়া এই বাড়তি রাজনৈতিক চালবাজী মনে হয়।

দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী—প্রধানতঃ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের এখানে বাস। সামাজিক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সমসমাজ প্রতিষ্ঠা ও নির্ব্বিচারে লোকশিক্ষার প্রচার হইলে এতদঞ্চল শক্তিশালী জনপদে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। ত্রিস্রোতা শাসিত হইলে সস্তাবিদ্যুতশক্তিতে সমস্ত অঞ্চলে ব্যবসার পত্তনে অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

রংপুর—রংপুর মুসলমানপ্রধান জেলা। হিন্দুর মধ্যেও অনগ্রসর রাজবংশী ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিই বেশী। কোচবিহারের সংলগ্ন ডিমলাও হাতীবাঁধা হিন্দুপ্রধান, ইহার সহিত প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত ডোমার ও কালীগঞ্জ থানা নববঙ্গে আসিতে পারে। শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর অমুসলমান রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণী রক্ষার জন্য এই অংশকে হিন্দুবঙ্গে আনা দরকার। এই এলাকার নিম্নেও সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বহু রাজবংশীর বাস, তাহাদের ভবিষ্যৎ আশা ও আশ্রয় হইবে এতদঞ্চল।

দিনাজপুর—মুসলমানপ্রধান ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, পার্ব্বতীপুর, ফুলবাড়ী ও চিরিরবন্দরের পূর্ব্বাংশ এবং খানসামা থানার পূর্ব্বাংশ যমুনা নদীর পূর্ব্বধারে থাকায় যমুনা নদী সীমান্ত হইলে অবশিষ্ট দিনাজপুর জেলায় অমুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। থানা হিসাবে দেখিলে এই জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে কয়েকটী থানায় মুসলমান আধিক্য আছে। কিন্তু এই থানাগুলি হিন্দু অঞ্চল পরিবেষ্টিত এবং অন্যান্য হিন্দুজনপদের সান্নিধ্যজনিত নববঙ্গে থাকা দরকার। নূতন দিনাজপুর জেলায় অমুসলমানের সংখ্যা ৫৩%জন হইবে।

মালদহ ও রাজসাহী—সামান্য ন্যূনতাবশতঃ মালদহ জেলা মুসলমান প্রধান। মুসলিম প্রধান কয়েকটী থানা হিন্দুপ্রধান মালদহ ও বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত ; বাকী কয়েকটী থানা মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মধ্যস্থলে সংযোগ সেতুরূপে থাকায় হিন্দুবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বাতিল করা সম্ভব নহে। নববঙ্গের উত্তর দক্ষিণের যোগাযোগ এবং একমাত্র রেল লাইন লালগোলা ও গোদাগাড়ী ঘাট এই সীমান্তে স্থিত বলিয়া গোটা মালদহ জেলাকেই নববঙ্গে আনয়ন দরকার। মুসলিম জনসাধারণের জাতীয়

* আত্রেয়ীর বর্ত্তমান নাম আত্রাই।

+ সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরবঙ্গের সীমানা অনুরূপ হওয়া উচিৎ বলিয়া স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

নববঙ্গে অবস্থান আপত্তিমূলক হইলে ২।৩ লক্ষ জনবিনিময় করিলেই এতদঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হয়। যাঁহারা মালদহের মহানন্দা নদীকে পূর্ব্বসীমান্ত করিতে চাহেন তাঁহারা দিনাজপুরের বালুরঘাট অঞ্চলের সহিত মালদহের সীমান্ত রক্ষা করিবেন কিরূপে? কাজেই পূর্ব্বোল্লিখিত যমুনা, আত্রেয়ী, শিবনদী, বারানই, বড়ল এবং পদ্মা উত্তর বঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা হওয়া সঙ্গত। এই সীমানার মধ্যে বরেন্দ্রভুক্তির কয়েকটী ঐতিহাসিক জনপদের কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া স্বাধীন জনসাধারণের তীর্থস্থানরূপে ভাবী কর্ম্মীদের প্রেরণা দিবে সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার নদনদীর কথা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অনগ্রসর জাতির অবস্থা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তর বঙ্গের ত্রিস্রোতার ন্যায় মধ্যবঙ্গের নদনদী পদ্মার জলেই পুষ্ট থাকিত, ব্রহ্মপুত্রের গতি পশ্চিমাভিমুখী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা বিগতযৌবনা, শাখা প্রশাখাও কাজেই মৃতা। অপর কারণ পদ্মার পাড় উঁচু হইয়া যাওয়ায় নদীর খাত মৃত্তিকায় জমিয়া গিয়া জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দুই এক বছরে ঘটে নাই, শত শত বৎসরের মধ্যে কোন সংস্কার না হওয়ায় পলি জমিয়া কিম্বা চর পড়িয়া নদীর গতি বদলাইয়া গিয়াছে, ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সহজেই পলিপূর্ণ হইয়া মজিয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নদনদী সবই মৃতকল্প। গোবরা বলিয়া একটা পুরাতন নদী রাণাঘাট লালগোলা রেল লাইনের পূর্ব্বদিকে অনেকটা সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহিনী হইয়া শুটী নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া নওয়াদা থানার সমীপবর্ত্তী পাটকাবাড়ীর নিকটে জলঙ্গী নদীতে পড়িয়াছে। এই গোবরা নদীর উত্তর পাড়ে মুসলমান আধিক্য অত্যন্ত বেশী। গোবরাকে সীমান্ত ধরিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার হিসাব নিম্ন তপশীলে বর্ণিত হইল। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে সান্নিধ্য, নৈকট্য ও নিরবচ্ছিন্নতার জন্ম জঙ্গীপুর মহকুমার কয়েকটী থানা ধরা হইয়াছে।

	আয়তন		মুসলমান	অমুসলমান
কান্দী মহকুমা	৪৫৪	বর্গ মাইল	১৪৭৯০৯	২০৭৩৭০
জঙ্গীপুর মহকুমা	৪৩৪	„	২৩৮৩৮৮	১৭৩২৩৩
জিয়াগঞ্জ থানা	২০	„	২৬৮৫	২০৪৬২
নবগ্রাম থানা	১১৮	„	২২৪২৯	৩৪১৯২
বহরমপুর টাউন ও থানা	১২৬	„	৪২৭৭৭	৬৭১৯৭
বেলডাঙ্গা	১৪৩	„	৭৭৩০০	৩৭৩৩৪
নওয়াদা (শুটী নদীর নিম্নাংশ)	৪৩	„	১৬১৪৭	১১৫৭৮
লালবাগ থানা (গোবরার নিম্নাংশ)*	১৮	„	১০০০০	১০০০০
ভগবান গোলা (গোবরার নিম্নাংশ)*	৩৯	„	২১৪৩২	৪৯৪৩
লালগোলা (গোবরার নিম্নাংশ)*	৪২	„	২৬৬০৮	৮৭২৩
	১৪৩৭		৬০৫৬৭৫	৬০,৫০২ ৯

নদীয়া—গোবরা নদী মুর্শিদাবাদ জেলায় জলঙ্গীতে পড়িয়াছে, ভৈরব নদ মুর্শিদাবাদের দমকল থানার নিকটে জলঙ্গী নদীকে আড়াআড়ি ভেদ করিয়া নদীয়া জেলাকে প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। এই জেলায় ভৈরবের নিম্নাংশ হিন্দুপ্রধান এবং উত্তরাংশ মুসলমানপ্রধান। নিম্নে আয়তন ও লোকসংখ্যা দেখান হইল।

	আয়তন	মুসলমান	অমুসলমান
রাণাঘাট মহকুমা	৫৪১	১১৯৯৫৬	১৪৬১৮৪
সদর মহকুমা	৫৬২	১৫৩২০৪	১৮৭৭৭৯
তেহাট্টা থানা	১৭৫	৫২৬৬৭	৩৯৯০২
সহর সমেত মেহেরপুর থানা (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৭০	২২০০০	২৪০০০
করিমপুর (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৮২	৩৯০০০	১১০০০
কৃষ্ণগঞ্জ থানা	৫৮	১৫০৭৫	১৯৩২৫
ডামুর হুদা (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৫৯	১৭০০০	১৭৫০০
	১৫৪৬	৪১৮৮৭২	৪৪৫৩৯—

যশোহর—মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ভৈরব নদকে লম্বালম্বি ভেদ করিয়া মাজদিয়া ষ্টেশনের নিকটে যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, যশোহর জেলায় একই নদী কপোতাক্ষ নামে পরিচিত, মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে কপোতাক্ষও বঙ্গদেশে ধন্য। যশোহর মুসলমানপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের সহিত অভয়নগর, শালিখা, কালিয়া, নড়াইল এবং নবগঙ্গা নদী বিচ্ছিন্ন লোহাগড় থানার লোকসংখ্যা একত্র করিলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, ১৯৩১ সালে যশোহর জেলা ক্ষয়িষ্ণু ছিল, লোকসংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল, যশোহরের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া ও মহামারীর তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস না পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ৯.৪ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই লোকগণনায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, এই অঞ্চল পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুপ্রধান ২৪ পরগণার ও খুলনার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এবং জাতীয় বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় রাজনৈতিক কারণেও জাতীয় বঙ্গে থাকা দরকার; মুসলমানদের আপত্তি থাকিলে লোক বিনিময় প্রথায় উত্তর যশোহরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের এতদঞ্চলে আনয়ন করিলে সংহতি বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

	আয়তন	মুসলমান	অমুলসমান
বনগ্রাম মহকুমা	৬৪৯	১৬৬৫১৪	১০৩৫৬৮
ঝিকরগাছা থানা (কপোতাক্ষ নদীর দক্ষিণাংশ)	৭৯	৩০৫৩২	১৩০১৪
কেশবপুর থানা	১০০	৪৯৩২২	২৭৭৫৪
অভয় নগর "	৯৫	৩০৫০৫	৩৯৭৪৩
নড়াইল "	১৪৮	৪৮০৯৩	৬২৫৯০
কালিয়া "	১১৮	৬১৫৩৫	৬১৬৩৪
শালিখা "	৮৮	২৩৮৯৩	২২৪১০
লোহাগড় থানা (নবগঙ্গার দক্ষিণাংশ)	সংখ্যা জানা নাই		
	১২৭৭	৩০৭৩৯৪	৩৩০৭২৩

* থানার উপরে হিন্দুই সংখ্যাগুরু, কাজেই থানার বহির্ভাগে বিচ্ছিন্ন অংশে উপরের সংখ্যা হইতে মুসলমান বেশী হওয়ায় [illegible]

ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ—ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ, রাজৈর, কলকিনী ও মাদারীপুর থানার পশ্চিমাংশ (আড়িয়ল খাঁর পশ্চিমে) হিন্দুপ্রধান অঞ্চল। ইহার সহিত বাখরগঞ্জের গৌড়নদী থানা, উজীরপুরথানা, বাবুগঞ্জ থানার অংশ বিশেষ, বরিশাল কোতোয়ালীর অংশবিশেষ, নলচিঠি সহর সহ নলচিঠি থানার অংশ বিশেষ, স্বরূপকাঠি থানা, বানরিপাড়া থানা এবং নাজিরপুর থানা এই সকল জায়গার স্বাভাবিক পূর্ব্ব সীমানা আড়িয়াল খাঁ, পাণ্ডব, বিশখালী, কাচা, ধলেশ্বর নদী, সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের আয়তন ও সীমানা দেওয়া হইল। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্ত দুই জেলার বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সহিত যশোহর জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের অংশগুলি যোগ দিয়া দুইটী বিভিন্ন জেলা হইতে পারে। এই অঞ্চলের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫৭।

গোপালগঞ্জ	৬৭২ বর্গ মাইল	২৬৮২৩৩	৩৪৮৭৭৯
রাজৈর থানা	৮৭ "	৫৭৭৩৮	৬০৪৫৯
মাদারীপুর ও কলকিনী (আড়িয়ল খাঁর নিম্নাংশ)	সংখ্যা ঠিক হদিশ জানা নেই		
হিন্দু প্রধান বাখরগঞ্জ	৭০০	৫৬০৫৭৯	৫৭৭৫৬৩
	১৪৪৯	৮৮৬৫৫০	৯৮৬৮০১

বঙ্গ দেশের লোকসংখ্যা, আয়তন, জাতীয় বঙ্গ ও পাকিস্থানের হিসাব ও আলাদা তপশীলে দেখান হইল, জাতীয় বঙ্গের আয়তন দাঁড়াইতেছে ৪৪৭৪৬ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের হিসাব বাদ দিলে দাঁড়ায় ৩৯৭৩৯ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গের মাত্র ৫৪.৮৫ ভাগ ভূখণ্ড জাতীয় বঙ্গে পড়ে। ইহার ভিতর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩০০০০ বর্গ মাইলেরও কম। বর্ত্তমান হিন্দুর অধিকৃত সম্পত্তির অপেক্ষা এই পরিমাণ অনেক কম। জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, খুলনা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের লঘু বসতি ও পাহাড় পর্ব্বত অরণ্যসঙ্কুল অনুর্ব্বর স্থান বিবেচনায় হিন্দুবঙ্গের এই পরিকল্পনা আপোষ ও শান্তির পরিচায়ক। ভাই ভাই বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় এক পক্ষের দাবী সহজ না হইলে আপোষমূলক মনোভাবের প্রকাশ হৃদয় স্পর্শ করে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন বঙ্গে হিন্দুর বাস হইবে ৬৯·৩% এবং মুসলমান থাকিবে ৩০·৭%। পাকিস্থানে মুসলমানের বাস হইবে ৭৩% এবং অমুসলমান থাকিবে শতকরা ২৭। নিম্নে তপশীলে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।*

* প্রবন্ধ প্রেসে যাওয়ার পরে কলিকাতা পৌরসভার মেয়র কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় ব অনেকটা অনুরূপ।

		মুসলমান	অমুসলমান	আয়তন
অখণ্ড বাংলা		৩৩০০৫৪৩৪	২৭৩০১০৯১	৭৭৪৪২
৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী নববঙ্গ	প্রেসিডেন্সী বিভাগ	২১০৭৩৫২	৩৩৭২২৫২	৮৫০১
	বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪২৯৫০০	৮৮৫৭৮৬৯	১৪১৩৫
	রাজসাহী বিভাগ	২৬০৫৮৫	১৪৫৮৭৫৭	৪২৪২
	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭২৭০	২৩৯৭৬১	৫০০৭
		৩৮০৪৭০৭	১৩৯২৮৬৩৯	৩১৮৮৫
বাউণ্ডারী কমিশনের নিকটে উত্থাপিত পরিকল্পনা	নদীয়া জেলা হইতে	৪১৮৮৭২	৪৪৫৩৯০	১৫৪৬
	মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে	৬৫৬৭৫	৬০৫০২৯	১৪৩৭
	যশোহর হইতে	৩০৭৩৯৪	৩৩০৭২৩	১২৭৭
	রাজসাহী হইতে	৩০৪২৮৬	১৭৭৩৫৬	১১৪৪
	দিনাজপুর হইতে	৮০৬৫৪৮	৮৮৬৯৪৬	৩৪৯২
	রংপুর হইতে	১৮২২৪১	১৮০৫৬৩	৫০২
	বরিশাল হইতে	৫৬০৫৭৯	৫৭৭৫৬৩	৭০৩
	ফরিদপুর হইতে	৩২৫৯৭১	৪০৯২৩৮	৭৫৯
	মালদহ হইতে	৬৯৯৯৪৫	৫৩২৬৭৩	২০০৪
		৪২১১৫১১	৪১৪৫৪৮১	১২৮৬১
প্রস্তাবিত নববঙ্গ		৮০১৬২১৮	১৮০৭৪১২০	৪৪৭৪৬
প্রস্তাবিত পাকিস্থান		২৪৯৮৯২১৬	৯২২৬৯৭১	৩১৮৭৬
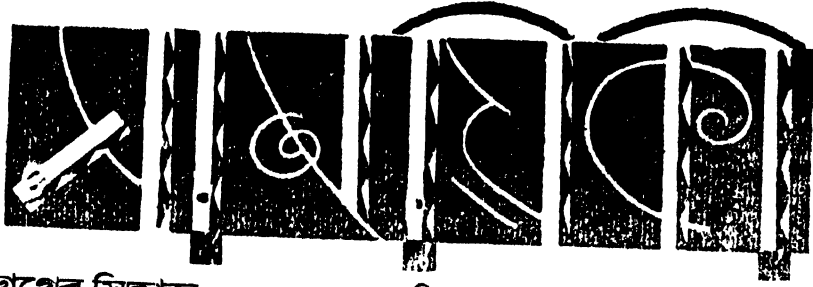
বাঙ্গালা বিভাগের সিদ্ধান্ত—

গত ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ বাঙ্গালা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের সদস্যগণ মিলিত হইয়া বাঙ্গালা বিভাগের

ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফটো—শ্রীতারক দাস

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ জন ও বিপক্ষে ২১ জন সদস্য ভোট দেন। পক্ষে ৫৮ জনের মধ্যে ৪৯ জন কংগ্রেস দলের, ৪ জন এংলো ইণ্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, ২ জন কম্যুনিষ্ট ও ১ জন স্বতন্ত্র দলভুক্ত ছিলেন। বিপক্ষের ২১ জন সদস্যই মুসলেম লীগ দলভুক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের সদস্যগণ মিলিত হইয়া বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য গ্রহণ করেন—পক্ষে ১০৬ জন ও বিপক্ষে ৩৫ জন সদস্য ভোট দেন—পক্ষের ১০৬ জনের মধ্যে ১০০ মুসলেম লীগ, ৫ জন তপশীলী ও ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান। বিপক্ষের ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জন কংগ্রেস দলের ও ১ জন কম্যুনিষ্ট। পক্ষের ৫ জন তপশীলী সদস্য ছিলেন—(১) দ্বারিকানাথ বারোরী মন্ত্রী (২) নগেন্দ্রনাথ রায় মন্ত্রী (৩) ভোলানাথ বিশ্বাস পার্লামেণ্টার সেক্রেটারী (৪) হারাণচন্দ্র বর্ম্মণ পার্লামেণ্টারী (৫) গয়ানাথ বিশ্বাস মৈমনসিংহ। উভয় দল মিলিত হইয়া সভা করিলে বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ৯০ জনও বিপক্ষে ১২৬ জন সদস্য ভোট দেন—৩ জন কম্যুনিষ্ট নিরপেক্ষ ছিলেন।

হরিদ্বারে জহরলাল ও গান্ধী—

গত ২১শে জুন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভোরে মোটরযোগে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া হরিদ্বার গিয়াছিলেন ও রাত্রি ৯টায় উভয়ে মোটরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গা ভয়ে ভীত ৩৫ হাজার লোক হরিদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজি সকলকে পশুবলের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

নূতন ভারত শাসন আইন—

বিলাতের মন্ত্রিসভা যে নূতন ভারত শাসন আইন রচনা করেন, সে বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত জানিবার জন্য উক্ত বিল ১লা জুলাই বড়লাটের নিকট প্রেরিত

হইয়াছিল। বড়লাট তাহা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দেখিতে দেন। ৩রা জুলাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার পেটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, সার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ কে-এম-মুন্সী ও সার বি-এন-রাও বড়লাটের সহিত মিলিত হইয়া আইনের সংশোধন সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁও স্বতন্ত্রভাবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিমত জানাইয়াছেন। ৪ঠা জুলাই ঐ আইনের খসড়া বিলাতের কমন্স মহাসভায় উপস্থিত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রিসভা—

গভর্ণর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে ১১জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা সংযুক্ত বাঙ্গালার পুরাতন মন্ত্রিসভার সহিত একযোগে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কাজ করিবেন। ১১জনের মধ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বর্ত্তমানে আমেরিকায় আছেন, তিনি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ডাঃ ঘোষ প্রথমে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্যতম মন্ত্রী স্থির করিয়াছিলেন—শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রী হইতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার স্থানে কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ নিযুক্ত হইয়াছেন। নিম্নে ৯জনের নাম ও কে কোন বিভাগে কাজ করিবেন, তাহা দেওয়া হইল—(১) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র ও আবগারী (২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (তাহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা) অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (৩) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—শিক্ষা, সেচ ও জল সরবরাহ (৪) ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম (৫) শ্রীরাধানাথ দাস—বেসামরিক সরবরাহ (৬) শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—বিচার ও ব্যবস্থা (৭) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—কৃষি, বন ও মৎস্যের চাষ (৮) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব ও জেল (৯) শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়—সমবায়, সাহায্যকার্য্য ও পূর্ত্ত।

পশ্চিম-বঙ্গের নূতন মন্ত্রীগণ—কার্যভার গ্রহণের পর (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্মণ এবং শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা　　ফটো—শ্রীতারক দাস

সম্মেলন নিষিদ্ধ—

বাঙ্গালা বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের অধিবাসীরা গত ২২শে জুন রাণাঘাটে সকলে সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নসিরুদ্দীন ও রাণাঘাটের মহকুমা হাকিম মিঃ ইয়াকুব আলি খাঁ সম্মিলনের

পূর্ব্ব দিন এক আদেশ জারি করিয়া সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য—হিন্দুগণই সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়—

পূর্ব্ব কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রায় বিনা বাধায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কালীপদবাবু দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন।

নেতাজীর অগ্রজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে ভোটদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

এম-এল-এ দণ্ডিত—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খাঁ বাহাদুর ফরিদ আহমদ চৌধুরী ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করার অভিযোগে আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। টাকা না দিলে আরও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার ম্যানেজার আবদুল গণিও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভারত বিভাগের কার্য্যারম্ভ—

গত ১২ই জুন হইতে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কমিটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ও সর্দ্দার আবদার রব নিস্তার উক্ত কমিটীর সদস্য হইয়াছেন।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের নেতা—

নব গঠিত হিন্দুপ্রধান পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশে ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব অমুসলমান দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি—

বিলাতের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্ ভারতের সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা উভয় স্থানেই সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীতে নেতৃত্ব করিবেন।

বর্ধমানাধিপতি কর্তৃক মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিদের সভায় বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে ভোটের ফলাফল ঘোষণা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

মিলন প্রচেষ্টা—

ভারতে নূতন রাজনীতিক অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একত্র মিলিত হইবে—উভয় প্রতিষ্ঠানই শ্রমিকদের কল্যাণ চেষ্টায় নিযুক্ত। সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারাও নিজেদের দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কংগ্রেসে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিবেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও শ্রীযুত জয়প্রকাশনারায়ণ উক্ত দলের প্রধান কর্ম্মী।

পশ্চিম পাঞ্জাব ও গণ-পরিষদ—

পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নলিখিত ১৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) মিঃ এম-এ-জিন্না, (২) মিঃ আবদুর রব নিস্তার (৩) রাজা গজনফর আলি (৪) মামদোতের খাঁ ইফতিকার খান (৫) মালিক

[illegible] খাঁ নুন (৬) মিয়া মমতাজ দৌলতানা (৭) মিয়া ইফতিকারুদ্দীন (৮) বেগম সাহ নওয়াজ (৯) সর্দ্দার সৌকত হায়াৎ খান (১০) চৌধুরী নাজির মহম্মদ খান (১১) শেখ কেরামৎ আলি (১২) ডাঃ ওমর হায়াৎ খাঁ—১২জনই মুসলমান। শিখদল হইতে নিম্নলিখিত ২জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার উজ্জল সিং (২) জ্ঞানী কর্ত্তার সিং।

পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের সমস্যা—

সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ চৈথরাম গিদোয়ানির উদ্যোগে শীঘ্রই দিল্লীতে পাকিস্থান অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক সভায় তাঁহাদের দাবী-সমূহ স্থির করা হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ এবং পাকিস্থান হইতে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ সম্মেলনে

বঙ্গ বিভাগ দিবসে ব্যবস্থা পরিষদ ভবনের প্রবেশ পথে উৎসুক জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

যোগদান করিবা নূতন ভিত্তিতে কংগ্রেসের কার্য্য করিবার জন্ম নূতন নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্ম সকল উপায়ের কথাই সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

পূর্ব্ব পাঞ্জাব গণ-পরিষদ—

পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত ১২জন সদস্য গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার বলদেব সিং (২) সর্দ্দার গুরুমুখ সিং মুসাফির (কংগ্রেস) (৩) বকসী সার টেকচাঁদ (কংগ্রেস) (৪) দেওয়ান চমনলাল (কংগ্রেস) (৫) চৌধুরী রণবীর সিং (কংগ্রেস) (৬) পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব (কংগ্রেস) (৭) অধ্যাপক যশোবন্ত রাও (কংগ্রেস) (৮) মিঃ বিক্রমলাল সোহনী (কংগ্রেস) (৯) মহবুব এলাহি (লীগ) (১০) মহম্মদ আক্রম (লীগ) (১১) সুফী আবদুল হাসি খাঁ (লীগ) (১২) মৌলনা দাউদ গজনভী (লীগ)।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ—

দিল্লীতে বড়লাটের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কাউন্সিলের সভায় সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের কথা আলোচিত হইতেছে। সভায় কংগ্রেস পক্ষে সর্দ্দার পেটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মুসলেম লীগ পক্ষে মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি ছাড়াও দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং, প্রধান সেনাপতি লর্ড অচিনলেক ও উড়িষ্যার গভর্ণর সার চন্দুলাল ত্রিবেদী উপস্থিত থাকিতেছেন। সার

চন্দ্রলাল গত যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ভারতীয় সৈন্যদলের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। ১৫ই আগষ্ট হইতে যাহাতে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান পৃথক সৈন্যদল রাখিতে পারে, কমিটী তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রাক্কালে লীগ সদস্যদের মধ্যে মিঃ সুরাবর্দ্দী ফটো—শ্রীপান্না সেন

ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু—

ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনসংস্থাপন সমিতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্র সংঘের বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা, লণ্ডন ও ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর যুদ্ধের সময় ইরাণ, ইরাক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও ইটালীতে কাজ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বাঙ্গালা ও গণ-পরিষদ—

গত ৪ঠা জুলাই পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—কংগ্রেস হইতে ১৫জন—(১) প্রফুল্লচন্দ্র সেন (২) অরুণচন্দ্র গুহ (৩) মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (৪) পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র (৫) সতীশচন্দ্র সামন্ত (৬) বসন্তকুমার দাস (৭) সুরেশচন্দ্র মজুমদার (৮) শ্রীমতী রেণুকা রায় (৯) উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ (১০) দেবীপ্রসাদ খৈতান (১১) ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২) সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (১৩) মুকুন্দবিহারী মল্লিক (১৪) ঈশ্বরসিং গুরুং (১৫) মিঃ আর-ই-প্লাটেন। লীগ হইতে নিম্নলিখিত ৪জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) রাঘিব আসান (২) জসিমুদ্দীন আহমদ (৩) নাজিমুদ্দীন আমেদ (৪) আবদুল হামিদ।

পশ্চিম পাঞ্জাবে নেতৃত্ব—

মুসলমান প্রধান নবগঠিত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে ৫৭জন মুসলেম লীগ সদস্যের মধ্যে ৫৩জনের সম্মতিক্রমে মালিক ফিরোজ খাঁ নুনকে লীগদলের নেতা নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। পাঞ্জাব মুসলেম লীগের সভাপতি মামদোতের খাঁ ঐ নির্ব্বাচনে বিরোধিতা করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

১৫ই জুন নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় বড়লাটের ৩রা জুনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মোট ২১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ৩২ জন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। গ্রহণের পক্ষে ১৫৭ ও বিপক্ষে ২৯ জন

সমস্ত ভোট দিয়াছেন। ১৪ই জুন গান্ধীজি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সাধারণ-তন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা—

১৪ই জুলাই হইতে দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে পক্ষকালব্যাপী অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে ভারতের নূতন সাধারণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হইবে। সেজন্য গণ-পরিষদের বিভিন্ন সাব কমিটীগুলির কাজ শীঘ্র শেষ করা হইতেছে। বৃটেন ১৫ই আগষ্ট উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করার পূর্ব্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের শাসন ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবেন।

দেশবন্ধু দাশ ও আচার্য্য রায়—

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উভয় মনীষীর মৃত্যুতিথি সাড়ম্বরে পালিত

নিমতলা শ্মশান ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দেশে নাগরিকদের শ্রদ্ধা নিবেদন ফটো—কে-কে-সান্যাল

হইয়াছিল। সকালে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু দাশের ও নিমতলা শ্মশানঘাটে শ্রীযুক্ত ক্ষীতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রায়ের স্মৃতিসভা হয়। বিকালে স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট হলে এক সভায় আচার্য্য রায়ের এবং মহাবোধী

নিমতলা শ্মশান ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব ফটো—কে-কে-সান্যাল

সোসাইটি হলে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে একটি সভায় দেশবন্ধু দাশের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে রুসিয়ার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্রাট এই নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ আসফ আলি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ভারতবাসীর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা বিভাগ আরম্ভ—

২৬শে জুন হইতে বাঙ্গালাকে দুই ভাগে ভাগ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং লীগের পক্ষ হইতে মিঃ এচ-এস সুরাবর্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্ণরকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের ৫ জনকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন 'আই-সি-এস'কেও পরামর্শদাতা হিসাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে—মিঃ এন-এন রায় সি-আই-ই ও মিঃ এন-এম খাঁ।

গণ-পরিষদ ও দেশীয় রাজ্য—

দিল্লীতে ২৬শে জুন এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে মোট ৯ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। তন্মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বর্ত্তমান গণ-পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের নূতন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আইন সভার মহিলা সদস্যগণ…(বাম হইতে) শ্রীমতী বীণা দাস, মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা, মিসেস্ হাসানারা বেগম, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন ও আনওয়ারা খাতুন ফটো—শ্রীপান্না সেন

সীমান্তপ্রদেশে নূতন গভর্ণর—

লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল সার রবার্ট লকহার্ট গত ২৬শে জুন উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নূতন গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়ী গভর্ণর সার ওলাফ কেরো ২ মাসের ছুটী লইয়া কাশ্মীরে গিয়াছেন। সীমান্তের অবস্থা এখন দুর্য্যোগপূর্ণ। সীমান্ত গান্ধী দেশবাসীকে গণভোটে যোগদান করিতে নিষেধ করায় তথায় এক দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সীমান্তবাসী জাতীয়তাবাদীরা 'হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান' সমস্যায় ভোট দান করিবে না—'পাঠানীস্থান ও পাকিস্থান' সমস্যা উপস্থিত করা হইলে ভোট দিবে। এ বিষয়ে গত ২৬শে জুন বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হইল না।

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে অবস্থা—

২৫শে জুন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগ ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক ইস্তাহার পাঠাইয়া জানাইয়াছেন—তাঁহাদের বর্ত্তমানে কেবল প্রাত্যহিক শাসনসংক্রান্ত কার্য্য চালাইতে হইবে। কোন নূতন ধরণের কার্য্য 'প্রাত্যহিক ব্যাপার' বলিয়া গণ্য হইবে না। বাঙ্গালার দুইটি ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতার পৌর সভায় সান ফ্রান্সিসকোর মেয়রের ভাষণ—পার্শ্বে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ফটো—শ্রীতারক দাস

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি-আই-ই ১৪ই জুন শনিবার সকালে কলিকাতা গার্ডেনরীচে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৪ সালে আই-সি-এস হইয়া কলিকাতায় ১০ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। রংপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া তথায় তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন।

খাদ্যবরাদ্দ হ্রাস—

৩০শে জুন যে সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে সেই সপ্তাহ হইতে গভর্ণমেন্ট রেশন অঞ্চলে খাদ্যবরাদ্দ কমাইয়া দিয়াছেন—পূর্ব্বে সপ্তাহে সাধারণ লোক ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য পাইত—এখন সে স্থানে ২ সের ৩ ছটাক খাদ্য পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই লোকের উদর পূর্ণ হয় না—ভবিষ্যতে কি হইবে ?

কলিকাতার দাঙ্গা—

গত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় যে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও বন্ধ হয় নাই। জুন মাসের প্রথমে কয়েকদিন হাঙ্গামা কম ছিল বটে, কিন্তু গত ২১শে জুন হইতে হাঙ্গামা ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার শেষ কোথায় কে জানে ?

লীগ ও গণ-পরিষদ—

লীগ কর্ত্তৃপক্ষ নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত ২৯ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—(১) আবদুল্লা আল মামুদ (২) এ-এম-এ হামিদ (৩) আবুল কাসিম খাঁ (৪) এ-কে ফজলল হক (৫) ইব্রাহিম খাঁ (৬) ফজলর রহমন (৭) গিয়াসুদ্দীন পাঠান (৮) এচ-এস সুরাবর্দ্দী (৯) হামিদ-উল হক চৌধুরী (১০) ডাক্তার ইস্তিয়াক হোসেন কোরেশী (১১) এম-এ-এচ ইস্পাহানি (১২) লিয়াকৎ আলি খাঁ (১৩) ডাঃ মামুদ হোসেন (১৪) মৌলানা আবদুল্লা বাকী (১৫) খাজা নাজিমুদ্দীন (১৬) সিরাজুল ইসলাম (১৭) মৌলানা সাব্বীর আমেদ ওসমানী (১৮) খাজা সাহাবুদ্দীন (১৯) বেগম এক্রামুল্লা (২০) তামিজুদ্দীন খাঁ (২১) মফিজুদ্দীন আমেদ (২১) নুরুল আমিন (২৩) মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ (২৪) হবিবুল্লা বাহার (২৫) মহম্মদ আলি (২৬) ডাঃ এ-এম মালেক (২৭) নুর আমেদ (২৮) আজিজুদ্দীন আমেদ (২৯) ফরহৎ রেজা চৌধুরী।

রাইটার্স বিলডিংএর ক্যাবিনেট রুমে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ মহম্মদ আলি ফটো—শ্রীতারক দাস

নূতন প্রদেশ গঠন—

যুক্তপ্রদেশের মীরাট বিভাগ, আগ্রা বিভাগের আ… মথুরা ও এটা জেলা, রোহিলখণ্ড বিভাগের বিজনৌ… মোরাদাবাদ ও বাদাউন জেলা এবং গারোয়াল জেলাকে উ… প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্ন আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগের ১২টি জেলার সহিত একত্র করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। উহাই এখ… সীমান্তপ্রদেশ রূপে গণ্য হইবে।

বাঙ্গালা বিভাগে শিক্ষার অবস্থা—

এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট প্রা… ২৩০০ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও ১১৬টি কলেজ ছিল। বাঙ্গালা বিভাগের ফলে ১২০০ বিদ্যালয় পাকিস্থানে ও ৩০০ বিদ্যালয় আসাম প্রদেশে যাইবে। বাকী ৮ শত বিদ্যালয় বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকিবে। ৩৪টি কলেজ পাকিস্থানে ও ২৩টি আসামে যাইবে এবং বাকী ৫৯টি কলেজ পশ্চিম বঙ্গে থাকিবে। এ বৎসর ৬০ হাজারেরও অধিক ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে—আগামী বৎসর ৩০।৩৫ হাজারের বেশী ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্র পাওয়া যাইবে না।

কলিকাতায় পাইকারী জরিমানা—

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে সকল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার জন্য কলিকাতায়

পুলিস কমিশনার নিয়লিখিত ৭টি থানার অধিবাসীদের উপর মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৭২ হাজার, বড়বাজার ৩৮ হাজার, জোড়াসাঁকো ২৩ হাজার ৫ শত, বড়তলা ১০ হাজার, তালতলা ৮ হাজার, মুচিপাড়া ৫ হাজার ও হেয়ার ষ্ট্রীট ৫ হাজার।

সিন্ধু ও গণপরিষদ—

গত ২৬শে জুন সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ৩৩-২০ ভোটে সদস্যগণ পাকিস্থান গণপরিষদে যোগদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেসী সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন; ২ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্য নিরপেক্ষ থাকেন। ৩ জন ইউরোপীয় সদস্য ভোটে যোগদান করিতে পারেন নাই।

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন অভিমুখে লীগ সদস্যবৃন্দ ফটো—শ্রীতারক দাস

পাঞ্জাব বিভাগ—

২৩শে জুন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একযোগে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদান করিবেন না—পক্ষে ৯১ ও বিপক্ষে ৭৭ জন ভোট দেন। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সদস্যগণ স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে পাঞ্জাব প্রদেশ দুই ভাগে ভাগ করা হইবে—ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ৫০ ও বিপক্ষে ২২ জন ভোট দেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের সদস্যগণ পৃথক ভাবে মিলিত হইয়া পাঞ্জাব বিভাগের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন—পক্ষে ৬৯ জন ও বিপক্ষে ২৭ জন ভোট দেন। ২ জন ভারতীয় খৃষ্টান ও ১ জন এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য লীগের পক্ষে ভোট দেন। ৮৮ জন মুসলমানের মধ্যে ৮০ জন লীগ দলভুক্ত—৮ জন ইউনিয়ন দলভুক্ত। হিন্দু, শিখ ও তপশীলী সদস্যদের সংখ্যা ছিল মোট ৭৭।

বিভাগের পদ্ধতি—

ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান—দুই ভাগে ভাগ করিবার জন্য দিল্লীতে বিভিন্ন কমিটী বসিয়াছে ও কাজ করিতেছে। সম্পত্তি বিভাগ কালে নিয়োক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া কাজ করা হইতেছে—(১) কোন্ অঞ্চল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্য্যন্ত কত টাকা পাইয়াছেন (২) দুইটি অঞ্চলের প্রত্যেকের অধিবাসীর সংখ্যা কত (৩) প্রত্যেক নূতন রাষ্ট্রের আয়তন (৪) প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারকে কত টাকা দেয় (৫) অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটির উন্নতির জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন? ভারত বিভাগের সঙ্গে বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সমস্যাও রহিয়াছে।

বাঙ্গালা বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণ—

বাঙ্গালা বিভক্ত হওয়ায় উহার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য যে সরকারী কমিশন বসিবে তাহার সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী গত ২৩শে জুন বাঙ্গালায় একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কমিটীর সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কমিটীর অন্যান্য সদস্য হইয়াছেন—ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মোদক,

অধ্যাপক ডক্টর এস-পি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সংখ্যাবিজ্ঞান গবেষণাগারের শ্রীযুক্ত সমর রায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর চুনিলাল রায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ ঘোষ।

পূর্ব্ববঙ্গ দলের নেতা—

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ দলের কংগ্রেস সদস্যগণ গত ২৩শে জুন কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে তাঁহাদের দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩১ জন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দুকে বাস করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দলের ডেপুটী নেতা, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু প্রধান হুইপ ও শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায় সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের নেতা—

গত ২২শে জুন রবিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস সদস্যগণ কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদের দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ সদস্যদের সহিত আচার্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা ফটো—শ্রীতারক দাস

দৈনিক বসুমতীর মামলা—

গত ১০ই জানুয়ারী এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দৈনিক বসুমতী কর্তৃক প্রদত্ত ৩ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে দৈনিক বসুমতীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হইলে বিচারপতিগণ বাজেয়াপ্তির আদেশ নাকচ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বাজেয়াপ্ত করা অর্থ ফেরত দিতে বলিয়াছেন ও বাদীকে মামলার খরচ দিবার আদেশ দিয়াছেন। বিচারপতি বিশ্বাস, আক্রাম ও ব্লকের আদালতে বিচার হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বঙ্গ ও গণ-পরিষদ—

গত ৫ই জুলাই পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে—কংগ্রেস মনোনীত নিম্নলিখিত ১১জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ধীরেন্দ্র দত্ত, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত, প্রেমহরি বর্ম্ম, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, শচীন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, হরেন্দ্র শূর ও জ্ঞানেন্দ্র মজুমদার। লীগ কর্তৃক মনোনীত ৫জন তপশীল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বাকী ৪ জন—মন্ত্রী নগেন্দ্রনাথ রায়, হারাণচন্দ্র বর্ম্মণ, ডাঃ ভোলানাথ বিশ্বাস ও মন্ত্রী দ্বারিকনাথ বারোরী পরাজিত হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তা—

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দুদের নিরাপত্তা রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করিয়া নববঙ্গ সমিতির পক্ষ হইতে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে।

প্রস্তাবসমূহ কলিকাতা ১৩৯ বি রাসবিহারী এভেনিউতে অধ্যাপক পি-কে-গুহ বা ২৭ বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সফর—

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখিবার জন্য নিম্নলিখিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই উত্তর অঞ্চলের জেলা-সমূহে সফরে বাহির হইবেন—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, সুরেশচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রভাতচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমহরি বর্ম্মণ, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, সুরেশ দাশগুপ্ত, সতীন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্র দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর।

নূতন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি—

ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও বরিশালের অধিবাসীরা গোপালগঞ্জ মহকুমাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী সম্পর্কে বিবেচনার জন্য গোপালগঞ্জে যে সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া গত ৫ই জুলাই গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪টি এলাকা হইতে বহু লোক পূর্ব্বেই গোপালগঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাণাঘাটেও ঐভাবে সম্মেলন বন্ধ করা হইয়াছে।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস

নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনের অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ৫ই জুলাই বেজওয়াদায় প্রকাশ করিয়াছেন—মুসলমান নাগরিকগণকে অস্ত্র সরবরাহের গুজব সম্বন্ধে এতদিন নিজাম গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা শুনা যাইতেছিল, এতদিনে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিজাম সেনাদলে দুই লক্ষ শুধু মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইতেছে।

পণ্ডিত নেহরুর দলের পদত্যাগ—

পার্লামেন্টে ভারত শাসন সম্পর্কিত নূতন বিল উত্থাপিত হওয়ায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সদলে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সমস্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর বড়লাট পাকীস্থান ও ভারতীয় রাষ্ট্র সভার জন্য দুইটি পৃথক মন্ত্রিসভা গঠন

করিবেন ও ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সেই মন্ত্রিসভাগুলি বিভক্ত ভারতের দুইটি পৃথক দেশ শাসন করিবে।

হুগলী জেলা ব্যবসায়ী সম্মিলন—

গত ১লা জুন বিকালে হুগলী জেলার সোনাটিকরী গ্রামে হুগলী জেলা ব্যবসায়ী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা লৌহ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। রঘুনাথ বাবু তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক লীগ মন্ত্রিত্ব প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ভারতের অখণ্ড একত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে—পণ্যের বাজারে নিজেদের স্বার্থ অব্যাহত করিতেছে। ব্যবসায়ীদিগকে ঐক্যবদ্ধ সংঘশক্তির সাহায্যে লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইবে।" ভবতোষবাবু উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—"লীগ মন্ত্রিসভার নীতি ও পক্ষপাতিত্বমূলক কুশাসনের ফলে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রাখায় দেশে প্রচুর দ্রব্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে অসমর্থ। এই অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য দেশের ব্যবসায়ীদিগকে সংঘবদ্ধ হই[য়া] কাজ করিতে হইবে।" বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী-দিগকে এখন সংঘবদ্ধ হইয়া দুর্নীতি দমনে অগ্রসর হই[তে] হইবে। যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ের মধ্যে যে অনাচার প্রবে[শ] করিয়াছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে দেশ ও জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গ বিভাগের সমর্থক ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সদস্যবৃন্দ ফটো—শ্রীতারক দাস

হাওড়া ষ্টেশনে 'সিলভার এ্যারো' প্রদর্শনী সভায় গভর্ণর বারোজ ফটো—শ্রীপান্না সেন

নেপালে শাসন সংস্কার—

নেপালের মহারাজা এত দিনে প্রজাদের দাবী মানিয়া

লইয়া শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। গত ২২শে মে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে অবিলম্বে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন, বালক বালিকাদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন করিবেন এবং যথাসময়ে সরকারী হিসাবপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, তখন কি আর তাঁহার পক্ষে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত হইবে। বৃটীশ সৈন্যগণ আকিয়াব, সাণ্ডওয়ে ও কাউকপিউতে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিতেছে। কৃষকগণ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে। বিদ্রোহের ফলে ঐ অঞ্চলে এবার ধান বা অন্য কোন খাদ্য-শস্যের চাষ হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া এই অবস্থা থাকায় লোকজনের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

কলিকাতায় খাবারের দোকান বন্ধ—

কলিকাতায় আটা ও চিনি সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় সহরের খাবারের দোকানগুলিতে আটা ও চিনি সরবরাহ একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার ফলে গত ১২ই এপ্রিল হইতে সকল খাবারের দোকান বন্ধ আছে। ইহাতে খাবারের দোকানের ৬ হাজার কর্ম্মচারী বেকার হইয়াছে। চায়ের দোকানেও চিনি দেওয়া হয় না—ফলে গুড় দিয়া চা প্রস্তুত হইতেছে। বিস্কুটের কারখানাগুলিও আটার অভাবে বন্ধ হইয়াছে। প্রায় ৪ মাস এই অবস্থা চলিতেছে। আরও কতদিন চলিবে কে জানে?

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী সভায় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ফটো—শ্রীপান্না সেন

পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন কমিটী—

পশ্চিম বাঙ্গালার জন্য একটি পৃথক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গঠনের প্রস্তাব গত ৫ই জুলাই বর্দ্ধমান মেমারীতে বর্দ্ধমান বিভাগ কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের উপর প্রদত্ত হইয়াছে—শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মৌলবী আবদুস সত্তার, অতুল্য ঘোষ, রজনী প্রামাণিক. সুশীল পালিত ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরাকানে বিদ্রোহ—

ব্রহ্মদেশের আরাকান বিভাগে কিছুদিন হইতে বৃটীশ-বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। বিদ্রোহীরা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া সকল কাজ চালাইতেছে।

ছোরাভর্ত্তি পার্শ্বেল—

২৪শে মে কুমিল্লা পোষ্টাফিসে ২৪ ডজন ছোরাভর্ত্তি ২টি পার্শ্বেল ধরা পড়িয়াছে। ছোরাগুলি ওয়াজিরাবাদ হইতে এক মুসলমানের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই এইরূপ ছোরাপূর্ণ পার্শ্বেল ধরা পড়িতেছে—অথচ যাহারা পার্শ্বেল পাঠাইতেছে, তাহাদের শাস্তি দানের কোন ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না।

আসাম গভর্ণরের নীতি—

আসামের নূতন গভর্ণর সার আকবর হায়দারী আসামের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি ২৩শে মে তারিখে ধুবড়ীতে এক সভায় বলিয়াছেন—"মুসলেম লীগের পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা করাই একান্ত বাঞ্ছনীয় আসাম সরকারের অনুমতি ব্যতীত সরকারী ভূমিতে বহিরাগতদের ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকারই থাকিতে পারে না।"

পরলোকে ভূপতিনাথ মিত্র—

২৪ পরগণা পাণিহাটীর ডাক্তার ভূপতিনাথ মিত্র গত ১৬ই এপ্রিল মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী, সমবায় ব্যাঙ্ক, ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি সকল জাতি গঠন মূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সারা জীবন পরোপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

ভূপতি মিত্র

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়া রবীন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ পৈতৃক বাসভবন ক্রয় করা হইয়াছে ও বিশ্বভারতীকে তাহার ঋণ শোধের জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকা দিয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইবে—ঐ টাকার সুদে প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখককে 'ঠাকুর সাহিত্য পুরস্কার' প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভবনে একটি 'জাতীয় কলা শালা' প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় এত শীঘ্র রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে এইরূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে সেজন্য তিনি দেশবাসী সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

হুগলী জেলা সম্মিলন—

গত ৩১শে মে শনিবার হুগলী জেলায় সোনাটিকরী গ্রামে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাবের সভাপতিত্বে হুগলী জেলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় বলেন—"লোক সংখ্যার হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যা লঘিষ্ঠতা বিচার করা চলে না। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উৎকর্ষের উপর উহা নির্ভর করে।" কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা সম্মিলনীর সহিত অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সভায় বহু খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সদস্য
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

ট্রাম ধর্ম্মঘটের জের—

কলিকাতার ট্রামওয়ে কর্ম্মীরা ৮৬ দিন ধর্ম্মঘটের পর কাজে যোগদান করায় তাঁহাদের অভাব অভিযোগের বিচার ভার সরকারী ট্রাইবিউনালের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে কর্ম্মীদের নিম্নতম বেতন ৩০ টাকা স্থলে সাড়ে ৩৭ টাকা করা হইয়াছে। তাঁহারা বৎসরে এক মাসের বেতন বোনাস পাইবেন ও ধর্ম্মঘটে কাজ বন্ধের সময়ের জন্য দেড় মাসের বেতন পাইবেন। কেরাণীদেরও নিম্নতম বেতন

৭০ টাকা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা কেরাণীদের নিম্নতন বেতন ৬০ টাকা ঠিক করিয়াছিল—ট্রাইবিউনাল তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ট্রাম কর্ম্মীদের দাবী ছিল—নিম্নতন বেতন ৪০ টাকা, বৎসরে ৩ মাসের বেতন বোনাস ও ধর্ম্মঘট কালের পুরা বেতন।

বঙ্গবিভাগের সমর্থক মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জী (মধ্যে)

ফটো—জে-কে-স্যান্যাল

ভাইস-চ্যান্সেলার সম্মানিত—

গত ৩১শে মে শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক' রূপ সম্মানসূচক পদ প্রদান করা হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩০ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। দেশবাসী যোগ্য-পাত্রে সম্মান অর্পিত হইতে দেখিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

দরবার গোপালদাস—

২৫ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার জন্য গুজরাটের রাইসঙ্কন রাজ্যের স্বাধীন রাজা দরবার গোপালদাসকে গদীচ্যুত করা হইয়াছিল। গত ২৪শে মে তাঁহাকে ঐ গদী পুনরায় প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার গদীপ্রাপ্তি উৎসবে বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ বহু কংগ্রেস-নেতা উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে গোপালদাস তাঁহার রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

রঙ্গপুর কুড়িগ্রামের উকীল ও খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ১৯শে মে ৭০ বৎসর বয়সে স্বগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৬, ১৯২৯ ও ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পদে কাজ করার সময় তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষা—

ইউরোপের সকল দেশে ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত পি-এন-কৃপান ইউরোপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে টেকনলজি শিক্ষার জন্য ৪০।৫০ জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, জেকোশ্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সে তিনি ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে ঐ সকল দেশে যাইয়া কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আয়র্লণ্ডের লোক হিন্দু—

শ্রীযুত চমনলাল গত ১০ বৎসর ভারতের বাহিরে থাকিয়া বিদ্যা-চর্চ্চা করিতেছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডের লোকগণ হিন্দু—ভারতীয় পুরাণের সহিত আয়র্লণ্ডের পুরাতন কাহিনী সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। তিনি মেকসিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর প্রকাশ করিয়াছেন—কলম্বাসের বহুপূর্ব্বে ভারতীয়গণ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুই শত রকমের উৎসব সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের। তিনি ঐ অঞ্চলে বহু ভারতীয় চিত্র দেখিয়া আসিয়াছেন।

কবি প্যারিমোহন সেনগুপ্ত—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা কবি ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক প্যারিমোহন সেনগুপ্ত গত ২০শে মে কলিকাতা লালদিঘীর ধারে ট্রামে উঠিবার সময় সহসা সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া পথের উপর ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২০ দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাহার ২ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্ত্তমান। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহু কবিতা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু সকলের পক্ষেই বেদনাদায়ক।

কাচড়াপাড়ার রেল কর্মীদের এক সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের যানবাহন সচিব ডাঃ জন মাথাই

রাওয়ালপিণ্ডীর বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে বড়লাট ও বড়লাটপত্নী

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা-দলের তৃতীয় টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ড ৭ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৩৯ রাণ তোলে। কে জি ভিলজোয়েনের ৯৩, বি মিচেলের ৮০ (রাণ আউট), এবং ডি ডায়ারের ৬২ রাণ উল্লেখযোগ্য। এডরিচ ৩৫·১ ওভার বলে ৯টা মেডেন নিয়ে এবং ৯৫ রাণ দিয়ে দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৪টা উইকেট পান।

ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৪৭৮ রাণ করে। এডরিচ ১৯১ রাণ এবং ডি কম্পটন ১১৫ রাণ করেন। টাকেট ৫০ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ১৪৮ রাণ দিয়ে ৪টা উইকেট পান। প্রিমসোল পান ১২৮ রাণে ৩টে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৭ রাণ উঠে। দলের সর্ব্বোচ্চ ১১৫ রাণ করলেন ডি. নোর্স। এ-ছাড়া এ মেলভিলের ৫৯ রাণ উল্লেখযোগ্য। এবারও এডরিচের বোলিং মারাত্মক হ'ল। ২২·৪ ওভার বলে ৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৭৭ রাণ দিয়ে তিনি এবারও ৪টা উইকেট পেলেন। রাইট পেলেন ৩২ রাণে ৩টে।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তিন উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়।

ইংলণ্ডের এ জয়লাভের ব্যক্তিগত সম্মান এবং কৃতিত্ব এডরিচের। তিনি ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিষয়েই অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করেন।

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট খেলার পূর্ব্বাপর ফলাফল—১৮৮৮-১৯৪৫

প্রথম খেলার	তারিখ	ইংলণ্ড জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট
দক্ষিণ আফ্রিকায়	১৮৮৮-৯	২০	১১	১২	৪৩
ইংলণ্ডে	১৯০৭	৯	১	১১	২১
মোট		২৯	১২	২৩	৬৪

ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ—ডার্বানে ৬৫৪ (৫ উই, ১৯৩৯); দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ—৫৩০ ; ডার্বানে ১৯৩৯। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা কম রাণ—১৯০৭ সালে লিডসে ৭৬। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা কমরাণ—৩০ ; পোর্ট এলিজাবেথে, ১৮৯৬ সালে ও ৩০ রাণ বার্মিংহামে, ১৯২৪ সালে।

ফুটবল ঃ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ ক'লকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা এ বছর বন্ধ রাখা হয়েছে। পাওয়ার লীগের দু'টি বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাগান ১৭টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট ক'রে প্রথম স্থানে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল। ১৬টা খেলায় তাদের ৩১ পয়েন্ট হয়েছে। মোহনবাগান বিপক্ষকে ৬৪টা গোল দিয়ে মাত্র ৪টা গোল খেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ৩১টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো খেয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে বেনিয়াটোলা ১৫টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট ক'রে প্রথম আছে। দ্বিতীয়

স্থানে আছে সি এম সি—তারা ১৫টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট করেছে।

উত্তর ক'লকাতায় একটি ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা চলছে। দুটি ভাগে ভাগ ক'রে খেলা পরিচালনা করা হচ্ছে। 'এ' বিভাগে ৯টি দল এবং 'বি' বিভাগে ১০টি দল যোগদান করেছে। ক্যালকাটা ফুটবল লীগের কোন কোন খেলোয়াড়কে এইসব খেলায় যোগদান করতে দেখা গেছে।

অগ্রগামী ব্যায়ামাগার ঃ

মাত্র দু' বৎসর হ'ল বালীগঞ্জে "অগ্রগামী ব্যায়ামাগার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ ও যুবকগণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান এক নূতন

অগ্রগামী ব্যায়ামাগারের সভ্যগণ

উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। রাসবিহারী এভিনিউস্থ ত্রিকোণ পার্কে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে এই সুবৃহৎ ব্যায়ামাগারটি অবস্থিত। ব্যায়ামাগারে সভ্যদের কেবলমাত্র শরীর গঠনের দিকেই নজর রাখা হয় না, আত্মরক্ষামূলক এবং কার্য্যকরী শিক্ষা—যথা, মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা-লাঠি-তরোয়াল, যুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীযুক্ত বলাই চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রবীন সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃপেন গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীরগণ শিক্ষাদান করেন। গত "আগষ্ট হাঙ্গামার" সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য দ্বারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যায়ামাগার-সম্পাদক শ্রীশ্যামল দত্ত ব্যায়ামাগারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শ্রেণীর আদর্শ ব্যায়ামাগার স্থাপনের জন্য আমরা তরুণ যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করছি।

পেশাদার টেনিস ঃ

পেশাদার টেনিস খেলার প্রবর্ত্তক হলেন মহিলাদের 'ওয়ার্ল্ড টেনিস চ্যাম্পিয়ান' ফরাসী মহিলা Suzanne Lenglen। ১৯২৬ সালে সি সি পাইল কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি ৫০,০০০ ডলার পারিশ্রমিকের চুক্তিতে আমেরিকার এক ভ্রাম্যমাণ টেনিস খেলোয়াড়দলে যোগদান করেন। এই দলে অপর এক মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁর নাম মিস মেরী কে ব্রাউন। এই ভ্রাম্যমাণ টেনিস দলে ঐ সময়ের খ্যাতনামা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ভিনসেন্ট রিচার্ডস, হাওয়ার্ড কিনসে, হার্ভে, স্নোডগ্রাস এবং পল ফিরেট যোগদান করেছিলেন। এই দলটি তিন মাস ধরে দেশের প্রধান প্রধান সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে পেশাদার টেনিস খেলার প্রচার করেন।

১৯২৭ সালে আমেরিকায় রিচার্ডস এবং কিনসের নেতৃত্বে আমেরিকান পেশাদার লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বছর পুরুষদের একটি প্রতিযোগিতা হয়, রিচার্ড প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন।

এদিকে ইউরোপের টেনিস জগতে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে অনেক খেলোয়াড়ই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন Karel Kozeluh, তাঁর জুড়ী সে সময়ে কেউ ছিলেন না। এদিকে জার্মাণীর Ramon Najuch, ফ্রান্সের Albert Thomes ও Edward Burke এবং ইংলণ্ডের Major Rendell পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় জগতের তখন এক একটি ধুরন্ধর খেলোয়াড়! চেক্ খেলোয়াড় Kozeluh ১৯২৮ সালে আমেরিকার পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে রিচার্ডসের কাছে পরাজিত হন। রিচার্ডস আমেরিকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯২৯ সালে রিচার্ডসকে পরাজিত করে Kozeluh পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

পেশাদার লন টেনিস জগতে ১৯৩১ সাল স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছর দুর্দ্ধর্ষ টেনিস খেলোয়াড় উইলিয়াম টিলডেন এবং তাঁর ডবলসের সাথী ফ্রান্সিস টি হাণ্টার, আমেরিকার জে ইমেট পেরী, কালিফর্ণিয়ার রবার্ট সেলার পেশাদার শ্রেণীভুক্ত হলেন। টিলডেন তাঁর প্রথম পেশাদার খেলোয়াড় জীবনের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৯৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে ১৪০০০ হাজার দর্শক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রিচার্ডস। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে ইন-ডোর চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় টিলডেন সাতটি খেলায় রিচার্ডসের সম্মুখীন হ'ন এবং সাতটি খেলাতেই বিজয়ী হয়ে দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন। পেশাদার টেনিস খেলায় বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখালেন টিলডেন। নিউ ইয়র্কের উইলিয়াম ও' ব্রিয়েনের পরিচালনায় টিলডেন প্রতি বছর বড় বড় সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগলেন। তাঁদের এই টেনিস খেলার আয় ১৯৩১ সালে ১৮২,০০০; ১৯৩২ সালে ৮৬,০০০; ১৯৩৩ সালে ৬২,০০০; ১৯৩৪ সালে ২৪৩,০০০ এবং ১৯৩৫ সালে ১৮৮,০০০ ডলার দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৪ সালে টিলডেন জুনিয়ার এইচ এলিসওয়ার্থ ভাইন্সের সঙ্গে টেনিস খেলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁদের টেনিস দলে অনেক নামকরা পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় যোগদান করলেন। তাঁর দলের মিস জেনীসার্পকে থাওয়ার খরচা এবং ১৫০, মিসেস এথেল বার্কহার্ডটকের থাওয়া বাদ ৩০০, বার্কলে বেলকে ৫০০, ব্রুস বার্ণেসকে ২৫০ ডলার পারিশ্রমিক প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হ'ত।—ব্রিয়েন যাতায়াত এবং হোটেল খরচা নিজের পকেট থেকে দিতেন। টিলডেন এবং তাঁর মধ্যে লাভের ভাগ হ'ত আধা-আধি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর উপন্যাস "অগ্নিযুগের কথা"—১।০

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত "আমাদের খাদ্য"—॥৵০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "মহাসমরের বুকে"—৪॥০

এদ্‌ওয়াজেদ আলী প্রণীত "ইরাণ তুরাণের গল্প"—১৲

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত "ছড়া-ছড়ি"—১৸০

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রেমরাগ"—৩৲

শ্রীদুলালচন্দ্র নস্কর প্রণীত সামাজিক নাটক "সর্ব্বহারার দাবী"—১॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "অগ্নিসংস্কার প্রধূমিত বহ্নি"—৫৲

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বন্দেমাতরম্"—৩।০

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন সম্পাদিত "ডেঞ্জার সিগ্ন্যাল"—১।০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "দীপ-শিখা"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলম্বিয়া
কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিঃ
দমদম - বোম্বাই - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ঝড়ো হাওয়া ২৲

মারণ-মন্ত্র ১॥০ গঙ্গা-যমুনা ১৲

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অতীত বস্তু ২৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

আসমুদ্র ২৲

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ষোড়শী ১॥০

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

দিগ্‌ভ্রষ্ট ১॥০

লক্ষ্মীর বিবাহ ১॥০

নিশিকান্তের প্রতিশোধ ২৲

অলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নন্দিতা ১॥০

মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত

[illegible] ১॥০ মিলন ১৲

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অন্ত্যেষ্টি ২৲

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

গৌরী ১৲

নবগোপাল দাস প্রণীত

অসমাপ্ত ১॥০

মণীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রণীত

কল্পলতা ১।০

অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত গীতিকাব্য

প্রদীপ ৸০ শঙ্খ ৸০

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

তৃপ্তি ২৲ **শান্তি** ২॥০

বিপর্য্যয় ২॥০ দুষ্টগ্রহ ২৲

বংশধর ২৲ শেষপথ ২৲

কাঁটার ফুল ১॥০

পাপের ছাপ ২॥০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হাইফেন ২৲

গৌতম সেন প্রণীত

প্রিয়া ও মানসী ১॥০

কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

হামজুল্লী ২৲

অভি লোগাস ১॥০

সখের শ্রমিক ২৲

বিদ্রোহী তরুণ ১॥০

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত

মহামুহূর্ত্তে ১॥০

ঘরের বউ ২৲

পল্লীর প্রাণ ২॥০

ক্ষিতি ও পতি ২॥০

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর ১৲

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ১৲

বাঙ্গালী যোদ্ধার বিস্ময়কর কাহিনী।

ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

মোহিনী বিদ্যা ॥৶০

হিপ্‌নটিজম শিক্ষার বই।

জ্যোতির্ম্মালা দেবী প্রণীত

রক্ত-গোলাপ ১৲

বিলেত দেশটা মাটির ১৲

ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত

উৎপলা ২॥০

কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত

— শ্রেষ্ঠ গীতাবলীর ডালি —

সুরলিপি ৬॥০

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

অপরাধ-বিজ্ঞান

১ম খণ্ড—৩৲ ২য় খণ্ড—৩৲

এদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন অপরাধীদের বিস্ময়কর কথা ও কাহিনী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গল্পের মত মনোজ্ঞ করিয়া বর্ণিত। অপরাধ-তত্ত্বের এইরূপ সুনিপুণ বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে এই সর্ব্বপ্রথম।

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলঙ্কিনীর খাল ২৲

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত

মেজ বউ ১৲

বিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত

বৃন্তচ্যুত ১।০ ঘরের ডাক ২৲

সুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রণীত

পথ ও পথিক ২৲

হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিরহ-মিলন-কথা ১॥০

বনফুল প্রণীত

বাহুল্য (গল্প-গ্রন্থ) ২৲

আহবনীয় (কাব্য) ॥৶০

অঙ্গারপর্ণী (কাব্য) ১॥০

মন্ত্র-মুগ্ধ (নাটক) ১৲

সুধাকৃষ্ণ বাগচী প্রণীত

পুণ্যের জয় ১৲

বীণাপাণি দেবী প্রণীত

মেয়েদের পিকনিক

রন্ধন-শিক্ষা, পাক-প্রণালী ও খাদ্য-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ। দাম—২৲

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা

কবি ব্রাউনিংয়ের পঞ্চাশটি প্রসিদ্ধ প্রেমের কবিতার সরস অনুবাদ। ২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
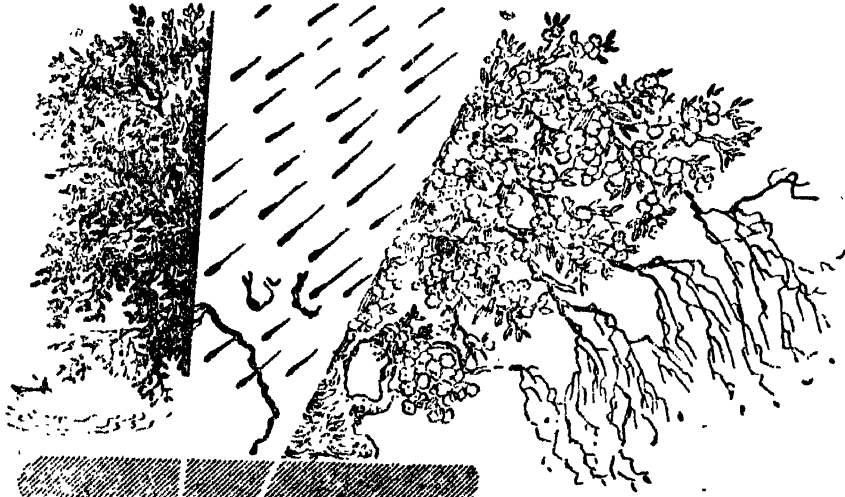
সকল ঋতুতেই...
বসন্তের আগমনে জলে, স্থলে
আকাশে লাগে প্রাণের মাতন।
জবাকুসুম বসন্তের
আনন্দোৎসবকে দ্বিগুণ করে
তোলে।
গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে আপনার
দেহ ও মনকে স্নিগ্ধ রাখতে
পারে একমাত্র জবাকুসুমই।
মেঘমেদুর বর্ষণমুখর দিনে,
শ্যামল পৃথিবী আপনার মনেও
এনে দেয় কোমলতার আবেশ।
এমন দিনে জবাকুসুমকে
আপনি কিছুতেই বাদ দিতে
পারেন না।
শীতের হাওয়ায় মিশে থাকে
ঝরা পাতার গন্ধ, শিশিরের
কোমলতা — গন্ধ বিলাসের
জন্যে সেদিনের সেরা
অবলম্বন জবাকুসুম।
জবাকুসুম
আপনার চুলের জন্য

বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তী-বাহী

মোহিনী মিল্‌স্ লিমিটেড্

(স্থাপিত—১৯০৮)

১ নং মিল — কুষ্টিয়া, (নদীয়া)
২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া

গ্রাম: খেলাঘর — ফোন: বি. বি. ৫৩০৭

ফুটবল (ব্লাডার সহ)

	৫নং	৪নং	৩নং
ডিউরেক্স "T"	২২॥০	২০৲	
আর,এ,এফ „	১৭॥০	১৫৲	১৩৲
ইমপ্রুভডেন্ট „	১৬৲	১৪৲	১২৲
ঐ মধ্যম „	১৪৲	১২৲	১০৲
ঐ সস্তা „	১২৲	১০৲	৮৲
অল্ ইণ্ডিয়া „	১৪॥০	১২॥০	১০॥০
আর্মি ম্যাচ (মেট্রিগর)	১৬৲	১৪৲	১২৲
লিগ উইনার	১৩৲	১১৲	৯৲
চ্যালেঞ্জ	১২৲	১০॥০	৮৲

প্রত্যেক বলের সঙ্গে একখানা ফুটবল খেলার নিয়মাবলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পাম্প ছোট ২৲, মাঝারী ৩৷০, বড় ৪॥০। স্বতন্ত্র ব্লাডার ৫নং ২৲, ৪নং ১৸৵০, ৩নং ১৸০। ফুটবল বুট ১২॥০ ও ১০॥০।

ফুটবল—লীগ শীল্ড খেলার ইতিহাস—মূল্য ১৲

ঘোষ এণ্ড কোং

৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রেষ্ঠ প্রসাধন হিসাবে "ওটীন" আজ সর্ব্বত্র পরিচিত, তেমনি শ্রীমতী সাধনা বসু শুধু সৌন্দর্য্যের জন্যই নহে—অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী হিসাবেও, দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।
"ওটীন" তাঁহার বক্তব্য নিম্নে দেখুন—
OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.
Sadhona Bose
Oatine
SNOW for DAY • CREAM for NIGHT

শিশুরা যখন শক্তি হারিয়ে ফেলে

ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্তিবোধ করা, আর সারাদিন অলস ও খিটখিটে হয়ে থাকা শিশুদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়। স্বাস্থ্যের যে কোথাও ব্যতিক্রম হয়েছে, এ তারই লক্ষণ।

সারাদিনের খেলাধূলায় শিশুরা খুব বেশীরকম শক্তি ক্ষয় ক'রে ফেলে। খাদ্যের পুষ্টিকারীতা থেকে তাদের ব্যয়িত শক্তির পূরণ করতে হয়।

কিন্তু আজকালকার খাদ্যে প্রায়ই আবশ্যকীয় পুষ্টিকর উপাদানের অভাব থাকে। ফলে ব্যয়িত শক্তির পূরণ হয় না আর শিশুরা অবসন্ন, ক্লান্ত, খিটখিটে হয়ে পড়ে।

ডাক্তার বলেন:—

"এ সব ক্ষেত্রে আমি হরলিক্স খেতে বলি। খাঁটি টাট্কা দুধ ছাড়া এতে আছে অতিরিক্ত শক্তি-সঞ্চারের জন্য দরকারী পুষ্টিকর উপাদান"

শিশুরা হরলিক্স খেতে ভালবাসে। রোজ তাদের হরলিক্স দিয়ে দেখুন কত তাড়াতাড়ি তারা উদ্যম ও উৎসাহে ভরপুর হয়ে ওঠে।

হরলিক্স কি

সরপূর্ণ খাঁটি গো-দুগ্ধ এবং মলটেড যব ও গমের পুষ্টিকর সারাংশ দিয়ে হরলিক্স প্রস্তুত হয়। হরলিক্স একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য—এতে স্বাভাবিক পুষ্টির প্রয়োজনানুরূপ শরীর গঠনোপযোগী এবং শক্তিদানকারী খাদ্যবস্তু যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে। হরলিক্স ষোল আনা পুষ্টিকর পানীয়।

H 712

নিয়মিতভাবে খেলে হরলিক্স আপনার শক্তি সঞ্চার করবে

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৫৪

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র

লেখ-সূচী

আমাদের নূতন ক্যাটলগের জন্য চিঠি দিন। তাতে সমস্ত বইয়ের খবর আছে

মনোজ বসুর
গণ-বিক্ষোভের অগ্নিময় উপন্যাস
আগষ্ট, ১৯৪২ ৩৷৷০

তারাশঙ্করের
দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত বিরাট বিচিত্র উপন্যাস
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ৫৲

সতীনাথ ভাদুড়ীর
যুগান্তকারী উপন্যাস (অভিনব মুদ্রণে ২য় সং)
জাগরী ৪৲

শৈলজানন্দের উপন্যাস
হে মহামরণ! ২৲
রায় চৌধুরী ২৷৷০
(সিনেমায় চিত্রায়িত)

শৈল চক্রবর্তীর
বহুবর্ণে বিচিত্র রুচিসম্মত উপহারের বই
যাদের বিয়ে হবে ৩৲
যাদের বিয়ে হল (৩য় সং) ৩৷৷০

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
জাপানী বন্দী শিবিরে ২৷০
লেখক নিজে আজাদ-হিন্দ দলে ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোমাঞ্চক অভিজ্ঞতা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মহাকাল
সুবৃহৎ অভিনব উপন্যাস। ৩৷৷০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিজয়লক্ষ্মী
অজস্র চিত্রশোভিত উপন্যাস। ২৸০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
যৌবন জলতরঙ্গ
অজস্র চিত্রশোভিত নাট্যগুচ্ছ। ১৷৷০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির
পূর্বরাগ ২৲
(সিনেমায় চিত্রায়িত)

সুধীরকুমার চৌধুরীর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
বৃহৎ বিচিত্র উপন্যাসের ১ম পর্ব ৩৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদিত
১৩৫২র সেরা গল্প ৪৲
অচিন্ত্যকুমার, আশাপূর্ণা দেবী, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র, বিভূতি মুখো, বিভূতি বন্দ্যো, মনোজ বসু, মাণিক বন্দ্যো, সরোজ রায়চৌধুরী, নবেন্দু ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের গল্প।

বনফুলের নূতন বই
আরও কয়েকটি ২৲

গোপাল ভৌমিকের
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী
প্রথম শহীদের অপরূপ জীবন-চিত্র। আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম-নিবেদন। দুষ্প্রাপ্য চিত্র। ২৲

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ২৲
বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে বিপ্লব নেতা যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় আত্মদান করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের মামা অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যে এই জীবন-কথা রচনা করেছেন। দুর্লভ ছবিতে অলঙ্কৃত

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের
যুযুৎসু জাপান ৩৲
শুধু ভ্রমণ কাহিনী নয়, জাপান সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর তথ্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হারানো সুর ৩৲
চৈতালী ঘূর্ণি ১৸০ দ্বীপান্তর ১৷৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের
তেরো নম্বর বসতি ২৷০
স্বাগতম্ ২৲ সায়াহ্ন ২৲
চেনা ও জানা ২৷৷০ পঙ্কতীর্থ ২৲
কল্লান্ত ২৲ অঙ্গরাগ ২৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
কাঠ-খড়-কেরাসিন ১৸৵০
আসমান জমিন ২৷০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ভাবীকাল ২৸০ কুড়িয়ে ছড়িয়ে ২৲

প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ২৲
ডাকিনী ১৷৷০
পরিহাস বিজল্পিতম্ (নাটক) ১৷০

বনফুলের
নঞতৎপুরুষ ৩৲
বনফুলের গল্প ২৲ দশভাণ ২৸০
ভুয়োদর্শন ৩৲

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
আশাবরী ৩৷৷০ রাজপথ ৪৲
অমলতরু ৩৲ দিকশূল ৪৷৷০
রাজপথ (নাটক) ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দিবারাত্রির কাব্য ২৸৵০
চিন্তামণি ১৸৵০
আজ-কাল-পরশুর গল্প ২৷৷০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিষের ধোঁয়া (৩য় সং) ৩৲
পঞ্চভূত ১৸০ ব্যুমেরাং ২৷৷০
গোপন কথা ২৷৷০ কালপাত্রা ১৷০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
জলে জাগে ঢেউ ২৷৷০
ভাগীরথী বহে ধীরে ২৷৷০

মনোজ বসুর
শত্রুপক্ষের মেয়ে ৩৷৷০
ভুলি নাই ২৲ সৈনিক ৩৷৷০
ওগো বধূ সুন্দরী ২৸৵০
নূতন প্রভাত ১৸০ আগুন ১৷৷০
দুঃখ নিশার শেষে ২৲
নরবাঁধ ২৲ বনমর্ম্মর ২৷৷০
পৃথিবী কাদের? ১৷৷০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সূর্য সারথি ৩৲
স্বর্ণ সীতা ২৷৷০ তিমির-তীর্থ ২৷৷০
দুঃশাসন ২৲ বীভৎস ২৲

নবেন্দু ঘোষের
কালো রক্ত ২৸০
এই সীমান্তে ২৷৷০
ডাক দিয়ে যাই (৩য় সং) ৩৲

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
একাকিনী নায়িকা ২৷৷০

অলকা মুখোপাধ্যায়ের **তোমারই ২৲**

= উপন্যাস =

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

…ক রোড (২য় সং) ৩৲

…রূপিণী ৩৲ নিশীথদীপ ২৷৹

…াদ উঠেছিল গগনে ৩৲

বুদ্ধদেব বসুর (২য় সং উপন্যাস)

…সূর্য্যস্পর্শ্যা ৩৲ সূর্য্যমুখী ২৷৹

…আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের (২য় সং উপন্যাস)

…স্রোতা ৩৲ আকাশ-কুসুম ২৷৹

প্রভাবতী দেবীর

…দয় অস্ত (২য় সং) ২৲

…ন্দু সেনগুপ্তের বিজিতা ১৷৹

…বন্ধু বেদজ্ঞ শাশ্বতী ২৷৹

অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জ্যোৎস্না ৩৲ যাত্রাসহচরী ৩৲

মাণিক ভট্টাচার্য্য

…তি ও বিভূতি (২য় সং) ২৲

…াল মিঞার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস

…ী হাওয়া ২৲

হীরেন দত্তের

…ন গ্রন্থি ২৷৹ বধূ অমিতা ২৲

…রের অভ্রছায়া ২৲

… কেন ব্যাবধান ৩৲

দেবদাস ঘোষের

… অমৃত সাধনা ২৲

(বাহির হইতেছে)

…টক রামনাথ বিশ্বাসের

…নামের বিদ্রোহী বীর

…ানন্দ বাজপেয়ী প্রণীত

…ভাকর ১৷৹

= প্রবন্ধ ও সাহিত্য =

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রণীত

তরুণের স্বপ্ন (৫ম সং) ২৷৹

নূতনের সন্ধান (৩য় সং) ২৲

Dreams of outh 4/-

Inquest of the New 3/-

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশ ও সাহিত্য (২য় সং) ২৷৹

মোহিত মজুমদারের বিচিত্র কথা ৩৷৹

উল্লাসকর দত্ত কারাজীবনী ১৷৹

নলিনীকান্ত গুপ্ত ভাবী সমাজ ২৲

নলিনী গুহ পথ ও পাথেয় ২৲

…খেশ্বর দাস ও প্যারীমোহন সেন

রাষ্ট্রপতি সুভাষ, বিপ্লবী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ৩৲

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত

বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা ২৷৹

মাইকেলের মেঘনাদ বধকাব্য ২৷৹

সারদাচরণ দত্ত

জীবনসন্ধ্যা ১৲

(ত্রিশ বৎসরের প্রবীণ শিক্ষকের অভিজ্ঞতা)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ (২সং) ১৷৹

বিজয় বানাজী

নাৎসী যুদ্ধের রীতিনীতি ২৲

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বুভুক্ষা ৩৲

মহেন্দ্র গুপ্ত মঞ্চে ও নেপথ্যে ৩৲

শৈলেন সিংহ প্রণীত

জাঁভালজা ৩৲

(লেমিজারেবের বঙ্গানুবাদ)

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের

অজানারদেশে ৸৹

(ছেলেদের এ্যাডভেঞ্চার)

=অভিনয়োপযোগী নাটক=

অমৃতলাল সেনের

যাজ্ঞসেনী (২সং) ২৲

হীরেন মুখোপাধ্যায়ের

পলাশী (২য় সং) ১৷৹

উৎপলেন্দু সেনগুপ্তের

পার্থসারথি ১৷৹ সিন্ধুগৌরব ১৷৹

গৌতম সেনের ডাক্তার ১৷৹

সুধীন্দ্র মাহার রণদাপ্রসাদ ১৸৹

ভোলানাথ কাব্যতীর্থ বৃত্রসংহার ১৷৹

যদুনাথ খাস্তগীর অভিমানিনী ১৷৹

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত অগ্নিশিখা ১৸৹

মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা ১৷৹

নিতাই ভট্টাচার্য্যের সংগ্রাম ১৷৹

মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

টিপুসুলতান (৫ম সং), উত্তরা (৪র্থ সং), মহারাজ নন্দকুমার (৪র্থ সং), চক্রধারী (২য় সং), রণজিৎ সিংহ (২য় সং), অভিযান, কঙ্কাবতীর ঘাট (৩য় সং), রায় গড়, মৃণালিনী, গঙ্গাবতরণ, স্বর্গ হতে বড়, শত বর্ষ আগে, সোনার বাংলা, কমলে কামিনী

দাম প্রত্যেকখানা ১৷৹

ছেলেদের নাটক

(স্ত্রীভূমিকা বর্জ্জিত)

কেশব সেনের

অভিমন্যু, দেশের ছেলে রাখাল রাজা, জয়পতাকা একলব্য সাবিত্রী (মেয়েদের)

দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত

ভক্তের ভগবান, ভরত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বীরবালক, সীতা (মেয়েদের)

দাম প্রত্যেকখানা ।৵৹ হিসাবে

বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত

চিতোর গৌরব ৸৹

ঘোষ ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১১৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ:
জলপাইগুড়ি
বি,বি, ২২৫৭

সারিডন
সকল যন্ত্রনার
উপশম করে

চিত্রা
তাল মিছরী
সর্দ্দি ও কাশির মহৌষধ
মেদিনীপুরের
প্রসিদ্ধ তাল গুড় হইতে প্রস্তুত
PALM SUGAR CANDY

জননীর তুষ্টি
শিশুর পুষ্টি
LILY BRAND BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO
ULTADANGA CALCUTTA
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
যুবকের তৃপ্তি
বৃদ্ধের সহায়

শশধর দত্তের উপন্যাস—দেহের ক্ষুধা—৩৲

শশধর দত্তের

রক্তাক্ত ধরণী ৩৲
সব্যসাচীর প্রত্যাবর্ত্তন ৩৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী ২॥০
আগুন ও মেয়ে ২॥০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

সাঝের প্রদীপ ২॥০
নীড় ও বিহঙ্গ ২॥০
ধূলার ধরণী ২॥০
ঢেউয়ের দোলা ২॥০
মাটির মায়া ২৲
দীপের আলো ২৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

রাহুগ্রস্ত শশী ২॥০
নব নায়িকা ২॥০
অনেক দূরে ১৲

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের

হাওয়া বদল ২৲

পূর্ণশশী দেবীর

অভিশপ্তা ১॥০

আশালতা সিংহের

সহরের মোহ ২৲

শৈলবালা ঘোষজায়ার

বিনির্ণয় ২৲
অরু ২৲
গঙ্গাপুত্র ২৲
অভিশপ্ত সাধনা ৩॥০
রঙীন ফানুস ৩৲
স্নিগ্ধা ২॥০ অবাক ২৲

যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের

সাধের কাজল ২॥০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেউলিয়ার জমা খরচ ২৲
বিয়ের ফুল (২য় সং) ২৲
স্রোতের ফুল (২য় সং) ২॥০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবনের জটিলতা ২৲
ধরাবাঁধা জীবন ১॥০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরিচিতা ৩৲
মুক্তি-মণ্ডপ ২॥০

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের

পতিতা ধরিত্রী (২য় সং) ২॥০

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি ১৲
বাবুম-বুবুম ১৲
আমার ভূত দেখা ১৲

নবকথা সিরিজ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন ধরণের এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

১। অর্থমনর্থম
২। আরামবাগ
৩। ইরাবতী
৪। ঈপ্সা
৫। উপকণ্ঠ
৬। ঊর্ণা
৭। ঋষি-মশাই
৮। "৯"কার

বিস্ময়কর গ্রন্থ। অভিনব রচনাকৌশল। ক্রাইম-নভেল নূতনতর ঘটনার সমাবেশ। প্রত্যেক উপন্যাস—মূল্য ২৲ টাকা

রহস্যরোমাঞ্চ য়্যাডভেঞ্চার সিরিজ

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস।

প্রত্যেক উপন্যাসের মূল্য ১৲ টাকা

১ মৃত্যুচক্র
২ রক্ত-পিপাসা
৩ রহস্য-বিভীষিকা
৪ গুপ্ত-চক্রান্ত
৫ সয়তান-সঙ্গিনী
৬ রোজার ঘাড়ে বোঝা
৭ মৃত্যু-প্রহেলিকা
৮ মরণের মায়াজাল
৯ শত্রু-সংঘর্ষ
১০ মৃত্যু-ষড়যন্ত্র
১১ খুনের-জের
১২ রক্ত-তাণ্ডব
১৩ মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী
১৪ পিশাচব্যাধের জাল
১৫। চীনাদস্যুর ইন্দ্রজাল
১৬। জীবন্ত-কঙ্কাল
১৭। পরীর পাহাড়
১৮ দস্যু-মায়াবী
১৯ খুনের নেশা
২০ রক্ত-লোলুপ
২১ মৃত্যুরণ
২২ নীল সাগরে রক্ত-লীলা
২৩ ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্ত
২৪ ফিক্‌কথ্ কলেম
২৫ মৃতের প্রতিশোধ
২৬। মরণযন্ত্রী
২৭। খুন ডাকাতি গুম
২৮। পিশাচিনী
২৯। দস্যুরাজ

থিন
এরারুট
BRITANNIA
THIN
ARROWROOT
BISCUITS
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নম্বরের বই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তালিকা করা যায়, সে-তালিকা যেখানেই শেষ হোক, এর প্রথম স্থান অবধারিত। আর সে-স্থান চিরস্থায়ী। এ শুধু একটা বই নয়, এ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। দাম ২৸৹

সুকুমার রায়ের অন্যান্য অমর রচনা

হ—য—ব—র—ল ২৲

পাগলা দাশু ২৷৹ ঝালাপালা ২৲

বহুরূপী—৩য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সারগর্ভ রচনা

কত জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপধারী ছিল প্রাচীন ভারত—তারই বিচিত্র ইতিবৃত্ত। জ্ঞানে গুণে শ্রীতে সম্পদে—স্বাধীন ভারত জগৎসভায় আবার শীর্ষ আসন অধিকার করবে। তার অতীতে রয়েছে সেই প্রতীতি, ভবিষ্যতে সেই সম্ভাবনা। যার অতীত এত উজ্জ্বল, তার ভবিষ্যত কখনো অন্ধকার হতে পারে না। সেই বিচিত্র অতীত এই রচনার রশ্মিপাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাংলাভাষায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' এক অভিনব সৃষ্টিকার্য। বিজ্ঞান, কাব্য ও ইতিহাসের সজীব সংমিশ্রণ। দাম ৬৲

কোনো খেদ নাই

জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মীর ভগিনী কৃষ্ণা হাতিসিংএর আত্মজীবনী। সরোজিনী নাইডুর অভিমতে 'একান্তভাবে ব্যক্তিগত হয়েও এই কাহিনী নেহেরু-পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।' পণ্ডিতজীর অভিমতে বইটি সম্বন্ধে কৃষ্ণার 'সন্তুষ্ট হবার অধিকার আছে, গর্ববোধ করাও অন্যায় নয়। কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর অভিমতে 'এতে শিল্পীর সূক্ষ্মরেখা প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।' দশখানা আলোচিত্র। দাম ৬৲

রুদ্ধকারার দিনগুলি

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রাশিয়ায় স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রতিনিধি, গত অগষ্ট আন্দোলনের সময় তাঁর কারাজীবনের রোজনামচা এই 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'। পোশাকী আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত; সহজ অনাড়ম্বর রচনা—প্রতিদিনের মনের কথা নিজের জন্য লেখা। ঘর আর বাহির কি করে এক বিশাল উদাত্ত ছন্দে বাঁধা যায়, সাংসারিক জীবনযাত্রার ধারা কী করে জাতীয় অভিযানের উত্তাল তরঙ্গে মিশে থাকে, তারই অপরূপ আলেখ্য। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সজ্জিত। উচ্চশ্রেণীর ছাপা ও বাঁধাই। দাম ৩৲

তখনকার কথা, অবনীন্দ্রনাথের বয়েস যখন তিন থেকে পাঁচ। রুপোর ঝিনুকে পদ্ম দাসীর হাতে দুধ খাওয়া থেকে রামলাল চাকরের হাতে হাতে-খড়ি পর্যন্ত। হরিণের শিঙের উপর লালঝুঁটি কাকাতুয়া; সিঁথেকাটা দাড়ি, কাবা তকমা আঁটা সমশের কোচোয়ান; গোটে ঘোড়ার ঝেহালাতে গৎবাজানো—এরকম ছবি ভিতর চার। এইরকম অসংখ্য ছবি আর ছন্দ নিয়ে ছোটোবেলার আশ্চর্য ইতিহাস। ছেলেবেলা ঘাটালি-হাতুড়ি নিয়ে কারিগরি করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের আঙুল কেটে গিয়েছিল, সেই কাটার দোষ ঘুচেছে সে-আঙুল, ছবিতে

প্রথম প্রেম

অচিন্ত্যকুমারের নিপুণ লেখনীর একটি পরিচ্ছন্ন উপন্যাস। ধূলিরুক্ষ এই পৃথিবীতে একটি যুবক আর একটি যুবতীর প্রথম প্রেম। যৌবনের প্রথম সমাগমে পৃথিবীকে যখন স্বর্গ বলে মনে হয়, দেহকে মনে হয় দেবতার আয়তন, জীবনধারণকে মনে হয় সুধাসৌন্দর্যের ইতিহাস। এ সেই প্রেম, যার শোক নেই, গ্লানি নেই, পিপাসা নেই। জীবনে নারী আসে হয়তো বহুবার, কিন্তু প্রেম আসে শুধু একবার, আর সে প্রেম প্রথম প্রেম। দাম ৩৲

মহাপূজায় অনবদ্য উপহার

শ্রীঅপূর্ব্বসুন্দর মৈত্র প্রণীত

আনন্দমঠ

(নাট্যরূপ)

ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে কি? সুললিত ছন্দে তাহাই নাটকাকারে রূপায়িত। মূল্য ১।০

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত

হরে মাঝি

ছোটদের অভিনব উপন্যাস। প্রবীণ কবির লেখনীমুখে প্রত্যেকটি অধ্যায় হইয়াছে হৃদয়গ্রাহী। চিত্রসম্পদে সমুজ্জ্বল। মূল্য ১।০

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

যাঁরা ছিলেন মহীয়সী

লোকচক্ষুর অগোচরে যে সব মহীয়সী মহিলা স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাদের কয়েকজনের কথা—গল্পের চেয়েও সুখপাঠ্য। মূল্য ১৮০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

মহাসমরের বুকে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস, সৈনিক জীবনের খুঁটিনাটি কথা লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে লেখা। যুদ্ধের বহু অপ্রকাশিত ছবি সংবলিত। মূল্য ৪॥০

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

য়্যাং-ব্যাং

আজগুবি কাহিনী ও ছড়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ। দুই রঙে ছাপা। মূল্য ১॥০

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত

রঙমহল

আধুনিক ভাবধারায় লেখা কয়েকটি একাঙ্ক নাটকের সমষ্টি। মূল্য ১৲

শ্রীবীরেন দাস প্রণীত

বুনিয়াদী শিক্ষায় (Basic Education) শিক্ষিত ছেলেরা যে সাধারণ পাঠশালায় শিক্ষিত ছেলেদের চেয়ে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত সত্য। তাহারই পটভূমিকায় রচিত অভিনব শিশু-উপন্যাস। চিত্রে ভূষিত। মূল্য ৩৲

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ছড়াছড়ি

ছেলেভুলানো ছড়ার অভি[নব] সংকলন। দুই রঙে ছাপা। মূল্য ১।

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ভোলানাথ

মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লেখা ছোটদে[র] সচিত্র উপন্যাস। মূল্য ১৲

এস্, ওয়াজেদ আলি প্রণীত

ইরাণ-তুরাণের গল্প

মনোরম গল্পের মধ্য দিয়া মোসলেম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা সরস ভাষায় ছোটদের জন্য লেখা। সুঅঙ্কিত ছবি ও চোখজুড়ান প্রচ্ছদে শোভিত। মূল্য ১৲

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত

নীল কুঠির মাঠ

ছোটদের মন নিয়ত অজানা রহস্যলোকে ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাণো নীল কুঠির রহস্য-জালের পটভূমিকায় এই উপন্যাসখানা ছোটদের জন্য লেখা। মূল্য ১৲

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর সম্পাদিত

ডেভিড কপারফিল্ড

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স-এর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের সরস ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ; কিশোরদের উপযোগী করিয়া লেখা—সচিত্র। মূল্য ৩৲

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ প্রণীত

জোয়ান অব আর্ক
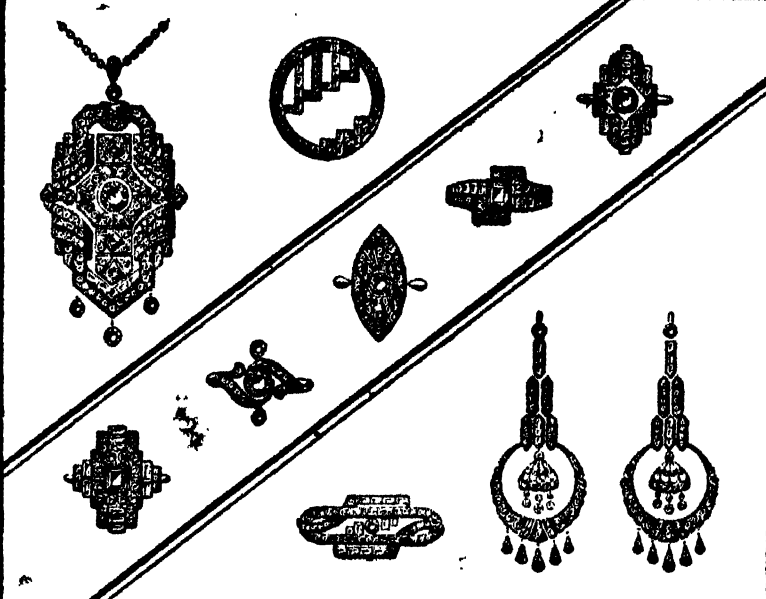
স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে উৎসর্গিত-প্রাণ ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ানের জীবনের বিচিত্র কাহিনী—ছোটদের জন্য লেখা। মূল্য ৩৲ টাকা

৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা (১২)

LIPTONS
WHITE LABEL
TEA
ONE POUND NETT
লিপটন
সিলোনের
সেরা চা

JEWELLERY
of
MODERN
DESIGN

THE
VOGUE
of
TO-DAY.

VRAJLAL & Co.,
66/3, BEADON STREET,
CALCUTTA.

রাশিয়ার চায়-নাইয়া

রাশিয়াতে চায়ের দোকানকে চায়-নাইয়া বলে। এই চায়-নাইয়াগুলো রুশদের সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। আগেকার মত ভদ্‌কা পানের রীতি আর নেই, চা-ই এখন ভদ্‌কার স্থান দখল করেছে। তাই চায়-নাইয়াতে ভীড় লেগেই থাকে এবং সেখানে সামোবারই যে একমাত্র আকর্ষণ তা বলাই বাহুল্য।

রুশদের অপরিহার্য।

রাশিয়ার অধিবাসীরা পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে খুবই ভালবাসেন। প্রতিবেশীর প্রতি এতটা অন্তরঙ্গতার নিদর্শন খুব সম্ভব অন্য কোনো জাতির মধ্যেই সম্ভব নয়। এই জন্যেই তাঁদের সামাজিক জীবনে চায়ের মূল্য খুব বেশি। উপলক্ষ যা-ই হোক না কেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনা করতে গেলেই অতিথিকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। রুশদের কাছে "সামোবার" সব সময়ই মস্ত আকর্ষণের বস্তু। "সামোবার" হলো ধাতু দিয়ে তৈরি জল ফোটাবার এবং চা ভেজাবার পাত্র বিশেষ। কাঠকয়লা দিয়ে সামোবারে জল ফোটানো হয়। রকমারি নক্সাকাটা একটি সামোবার বাড়িতে থাকা গৃহস্থ মাত্রেরই গর্বের জিনিস। রুশরা কাপের বদলে সাধারণত লম্বা গ্লাসে করে চা খেতেই ভালবাসেন। তাঁরা চা-তে দুধ ব্যবহার করেন না, তবে চিনির চল আছে। মাঝে মাঝে চিনির বদলে জ্যাম বা মধু ব্যবহার করা হয়। লেবুর রস আর "রাম্" মিশিয়ে চা খাওয়ার রেওয়াজও আছে। আমন্ত্রকরা বাড়ি থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন মত বার বার প্রচুর জল আর চা দিয়ে সামোবার ভরতি রাখা হয়। রাশিয়াতে প্রায় প্রত্যেক ট্রেন লাইনেই বিনামূল্যে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে। রুশরা চা খেতে ভালবাসেন বললে সবটা বলা হয় না,—চা না হলে তাঁদের চলেই না, আর তা-ও চাই প্রচুর পরিমাণে।

চা সার্বজনিক পানীয় ★

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

মহেন্দ্র দেখিল দস্যু কাঁদিতেছে।" ওগো স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা গুরু, আজ আমরা সকলে কাঁদিতেছি তোমার জন্য।

"নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"
'Into that heaven of Freedom
My Father! Let my country awake!"

হে মহাকবি, হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, হে পথপ্রদর্শক! ভারতের সম্মুখে সেই স্বর্গদ্বার ধীরে ধীরে খুলিতেছে, তোমার বীণা আজ নীরব কেন? কতবার কত বিপদ্-সঙ্কুল উপল-বন্ধুর পথে রজনীর অন্ধকারে তুমি পথ দেখাইয়াছ, আজ তোমার প্রজ্ঞার বর্তিকা নিভাইয়া দিয়া কোন্ অজ্ঞাত-লোকে সরিয়া রহিলে?

উপবাসে, অনশনে, কারাগারে বন্দিনী জননীর প্রতি উদ্ধত দণ্ড আপনার ললাটের 'পরে বরিয়া লইলে, হে জন্মভূমির মুক্তি-সেনানীগণ—তোমরা, যাহারা তিলে তিলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ, সেই তোমাদের—

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে!—

তোমরা, যাহারা আজ আমাদের এই মুক্তি বাহিনীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে, মৃত্যু তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শোক করিব না। তোমরা সবাই আছ, কেহ দূরে সরিয়া যাও নাই। তোমরা আমাদের মধ্যে আছ, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছ, আমাদের এই চিরায়ত জাতির মনোরাজ্যে অমর হইয়া থাকিবে।

এসো, আজ জননীকে আনিতে যাইবার আগে আমরা তাঁহাদের প্রণাম করিয়া যাই, যাঁহারা সবাই মায়ের মুক্তির অগ্রদূত, যাঁহারা আসিয়াছিলেন বিঘ্নসঙ্কুল শাণিত ক্ষুরধারার পথে, যাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মা ভৈঃ! জননীর রথের ধ্বজা ঐ যে দিগন্তে দেখা যায়! মা আসিতেছেন।" নীরব নমস্কারে ধ্যান করি তাঁদের মূর্তি—

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে—
সঙ্কট-আবর্ত মাঝে দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়ে ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন।"

জননী আজ রাহুমুক্ত, কলঙ্ক-কালিমা মুক্ত। শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্দশীর মেঘমুক্ত প্রভাতে মায়ের মুখ আজ স্নিগ্ধহাস্যে উদ্ভাসিত হইল। হে জননি, তোমায় বারংবার নমস্কার—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণীং
কমলা কমল-দল-বিহারিণীং
বাণী বিদ্যা-দায়িনীং
নমামি ত্বাং।

এই প্রণাম তোমাকে যে জানাইতে পারিলাম, ইহাতে আমাদের জন্ম সার্থক হইল, আমরা পাপমুক্ত হইলাম। জননীর বন্ধনদশা ঘুচাইতে না পারিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ মাতৃ-নির্যাতন দমনে অক্ষমতা-জনিত গভীর পাপের পসরা মাথায় লইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা আমাদের মধ্য দিয়া আজ এই একটি মুহূর্তে সর্বপাপ মুক্ত হইলেন।

জননি, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন যোগ্য হই। জাতির মঙ্গলকে আপন মঙ্গল, জাতির সম্মানকে আপন সম্মান, জাতির দুঃখকে আপন দুঃখ বলিয়া জানিবার জ্ঞান আমাদের দাও। আমাদের অনুভবকে তীক্ষ্ণ করো, আমাদের মিলনকে অচ্ছেদ্য করো। জননী আমাদের শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধিতে সংযুক্ত রাখুন। আমরা যেন ভেদবুদ্ধিকে, আত্মম্ভরিতাকে, মূঢ়ত্বকে, বিগলিত শব অপেক্ষা ঘৃণ্যতর মনে করি। জননী, আমাদের শক্তি দাও, বীর্য্য দাও, তেজ দাও,

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর-খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

বহু আয়াসে আমরা যাহা অর্জন করিলাম, বহু আয়াসে আমরা তাহা রক্ষা করিব। জননি, তোমায় রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রাণের মায়া হরণ করিয়া লও।

তোমার এই দ্বিখণ্ডিত মূর্তি—আজ কিছুতেই যেন না ভুলি—কোন্ গভীর পাপের ফল। কিছুতেই যেন না ভুলি—বিচার-মূঢ় ঔদার্য ক্লৈব্যেরই আর একটি নাম—কিছুতেই যেন না ভুলি, ক্লৈব্য কখনোই ক্ষমার যোগ্য নয়। স্বাধীনতার ইতিবৃত্তের শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, আমাদের শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে, আমাদেরি বহু শ্রমে, বুকের রক্তে অর্জিত ফলে নির্লজ্জ ইতরতায় অংশগ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে এবং আমাদেরি ধনে ধনী হইয়া আমাদিগকেই অপমানিত, নির্যাতিত করিয়াছে—বন্ধুবাক্য অবহেলা করিয়া আমরা সেই সম্প্রদায়কেই ভ্রাতৃনির্বিশেষে বুকের কাছে টানিতে চাহিয়াছি, ব্যাধি দুষ্ট অঙ্গকে অকারণ মোহে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই! তাহারি অনিবার্য্য ফলে আজ সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত, পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ

সুদূর-পরাহত হইয়া গেল। অগ্নির অক্ষরে এ কথা যেন আমাদের হৃদয়-পটে লেখা থাকে।

ধূর্ত্ততার দ্বারা যাহারা তপস্যার বিঘ্ন-দুরত্যয় পথ এড়াইয়া গিয়া আমাদেরি সাধনলব্ধ ফলের অংশভাগী হইয়া আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিল, তাহাদের খল খল অট্টহাস্যে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইব না। তাহাদের কর্মফল তাহাদিগকে পাইতেই হইবে। চালাকির দ্বারা অর্জিত এই বিষয় ভোগ একদিন তাহাদের বিষবৎ মনে হইবে। ধূর্ত্ততার ফাঁস একদিন ধূর্ত্তেরি কণ্ঠরোধ করিবে।

বিগত দশবৎসরের কুশাসনের বিভীষিকা, বিশেষ করিয়া বিগত বারোটি মাসের কুখ্যাত মারণ-তন্ত্র,—মানব ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—এ আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। পরমেশ্বর আমাদের চিনাইয়াছেন, প্রহারের দ্বারা চিনাইয়াছেন, চোখের জলে চিনাইয়াছেন, ছোরাচুরিতে, বন্দুকের গুলিতে দারুণ চেনা চিনাইয়া দিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ের স্বরূপটি আমরা মর্মান্তিকভাবে চিনিয়া লইলাম, আর কোনোদিন ভুল করিব না।

ইহার পর মেকি ঔদার্য্য এবং ভ্রাতৃত্বের স্নেহোচ্ছ্বাস উভয় দিক হইতেই মূঢ়ত্ব, আর এ মূঢ়ত্ব কখনোই ক্ষমার যোগ্য নহে। স্থির জানি জাগ্রত জনমতের উদ্যতবজ্র এই মূঢ়ত্ব ভস্মসাৎ করিবে। ন্যায়ের দণ্ড আজ জনরূপী নারায়ণ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তেজ আজ দুর্নিরীক্ষ, তাঁহার কণ্ঠস্বর গগনভেদী, তাঁহার এই অপূর্ব, অরূপ মূর্ত্তি আর কোনোদিন দেখি নাই। কোনোদিন যে দেখিয়া যাইব, এ আশা করি নাই। কোন্ পুণ্যফলে আজ এই জনরূপী নারায়ণের সাক্ষাৎ পাইলাম, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিলাম! তোমায় নমস্কার, হে জনরূপী নারায়ণ, হে জাগ্রত গণ-দেবতা, তোমায় নমস্কার, বরংবার নমস্কার

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্বঃ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

এসো আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। কাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি? আজ আমাদের ঈশ্বর, আমাদের জননী, আমাদের জন্মভূমি, আমাদের আরাধ্য দেবতা, আমাদের ভাই বন্ধু,—আজ সবাই একাকার। আজ আমরা পথে পথে প্রণাম করিয়া যাই, মৃত্তিকাকণাকে প্রণাম করিয়া যাই, মৃত্তিকাকণাকে সগৌরবে মাথায় ধরি, এ আমাদের শৃঙ্খলমুক্তা জননীরই শ্রীচরণের ধূলি!

পূর্বগগনে মেঘ অপসারিত হইল, প্রাচ্য আজ নিদ্রালোর ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ আজ গ্লানিমুক্ত। তরুণ রবি আজ প্রথম-নয়ন-সম্পাতে চাহিয়া দেখিল, এমন ভারতবর্ষ সে বিগত শতাব্দী-দশকে দেখে নাই। হে সবিতৃদেব, হে অনির্বাণ অগ্নি, তোমায় প্রণাম করি। তুমি প্রসন্ন হও, বরদান করো। বরদান করো, যেন মধুমক্ষিকার মতো অতন্দ্রিত কর্মশীলতায়, ত্যাগে আমরা তিলে তিলে মধুসঞ্চয় করিয়া আমাদের জননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারি। আর সেই মধু লুণ্ঠনপ্রয়াসে যদি কেহ আসে, আশীর্বাদ করো, মধুমক্ষিকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সুতীব্র হুলের দংশনে যেন সেই তস্করের দুরাশাকে চিরদিনের মতো জর্জরিত করিয়া ফিরাইয়া দিই।

বন্দে মাতরম

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

খুড়ো-ভাইপোর কথা আরম্ভ হল।—"তাড়া রয়েছে, সবিস্তারে বলা চলবে না।" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় ছিলেন, কবে এলেন, সাহেবকে কেমন লাগছে?" উত্তরে বললেন—

"কলকাতা ছেড়ে—লক্ষ্মীছাড়ারা আর থাকে কোথায়! কবে যে এখানে এসেছি—তা কি মনে আছে? বোধ করি জোড়া শনিবার কেটেছে। তুমি এসেছ—আমার শ্রাদ্ধটা করে দাও, আমি আর এ প্রেতোণী করতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলে—সাহেব কেমন? এ প্রশ্ন করতে নেই, সাহেবদের মন্দ বলবে কে? তারা প্যাঁজের জাত, 'মজাতে' পারে ভালো। তবে এখন আমি চললুম।"

"কোথায়? সেইটাই তো আমার আসল জিজ্ঞাস্য।"

তাহলে আমাকে মহাভারত খুলতে হয়। সময় কই? জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের শিবিরে ঢুকে পড়েছি। কারণ আছে। আমার সাঁওতাল ছেলেটি যে সঙ্গে রয়েছে। তাকে তুমি দেখে থাকবে, মাছ না হলে তার যে একদিনও চলে না—

"পাণ্ডবেরা মাছ খেতো নাকি?"

"না—মাছের কেবল চোখ বিঁধতো? তাঁরা [illegible]

ইমারতও দেখে এসেছি। সেখানে আমাদের কুলুতো না। ঝঞ্ঝাট বাড়িও না, বেশ আছি।"

"আমার কথাও যে অনেক আছে।"

"তা থাকবে বইকি। বাঙালির তা ছাড়া আর কি থাকে। ওই ত আমাদের সম্পত্তি হে। সে হবে—আচ্ছা এখন—"

"একটা কথা বলে যান,—যুধিষ্ঠিরকে পেলেন কোথা ?"

"সে এখন অনেক কথা—মহাভারতের খুদে-সংস্করণ নেই যে। যে দলে সে মিশেছে—সে তো আর ছোট জায়গা মাড়ায় না,—লাহা (Laha) কি মল্লিকদের বাড়ী বোধহয় ভজন গাইতে গিয়েছিল,—সাধু হয়েছে কিনা! ভজনখানেক লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়েছিল—প্রায় অজ্ঞান। তুলতে গিয়ে দেখি—পা ভেঙে দিয়েছে—দাঁড়াতে পারে না। নাড়াচাড়ায় একটু জ্ঞানের মত' হতেই বলে—দোহাই বাবু, আমি কিছু করিনি,—আমাকে পুলিশে দেবেন না। তারা উলটে আমার যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।"—

—"তখন বাদলকে ডেকে এনে, দুজনে ধরাধরি করে তাকে বাসায় নিয়ে যাই। হাতে কাজ ছিল না, দয়াময় জুটিয়ে দিলেন। তারপর—ডাক্তার আর সেবা। এগারো দিনে সে দাঁড়ালো। কথাবার্ত্তায় বুঝেছিলুম—লোকটা মন্দ নয়, কুসঙ্গে পড়ে কঠিন সাধন-ভজন নিয়ে আছে! এখন আর তার কিছু আটকায় না। সাধনোচিত ধামেই যাওয়া তার উচিত ছিল। কিশোরীর কাছে শুনলুম এখন এখানে সে মস্ত contractor, মাছের একচেটে কারবার। আকরগত পাপিষ্ট নয়। সুসঙ্গ পেলে এখনো বদলাতে পারে। যাক্, কোথায় আর যাবো, সেই সাধুর ডেরাতেই ঢুকে পড়েছি। বাদল—সেখানে রোজ সের দেড়েক মাছ মারছে। সে নড়বে না। তুমি কিছু মনে কোর' না। ইস্—তুমি করছো কি? সাহেবের মেজাজ এইবার বেগড়াবে, কি বিগড়ে থাকবে!"

বিনোদ চমকে গেলো,—"দিন, পায়ের ধুলো দিন। সন্ধ্যার পর দয়া করে আসবেন, আমি বড় বিপন্ন।"

"আবাগের বেটীকে স্মরণ করে যাও, কোন চিন্তা নেই। সন্ধ্যার পর দেখা হবে।"

* * *

"May I come in Sir—আসতে পারি ?"

"Certainly, 'am so very glad that you have come back—নিশ্চয়ই আসবে, আমি চায়ের order দিয়েছি।"

"ওসব আর শোনাবেন না"—বলতে বলতে বিনোদের গলা ভারি হয়ে এল, আর বলতে পারলে না।

সাহেব চঞ্চল ভাবে বললেন—"ওকি, কেন, কি হয়েছে—what is the matter, speak out doctor."

"এক বেগম নাকি সাক্ষ্য দেবেন—ও হার-ছড়াটি তাঁর—ইত্যাদি সে কথার পর আমার সর্ব্বনাশের আর বাকি কি থাকে—বিশেষ আমি যখন হার তৈরী করাবার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারব না!"

সাহেব একটু হেসে বললেন—"All rubbish, who says so?"

এসব বাজে কথা কে বলে? cheer up সে সব তো মিটে গেছে, তোমাকে সেই সুখবর দেবার জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছিলুম। Don't worry doctor—বেগম সাহেব কোনো কথাই বলবেন না।"

চা এসে গেল। "চেয়ারে বোস তো। চা খেতে খেতে কথা কওয়া যাক্। ভাবনার আর কিছু নেই। অন্য কথা হোক্"—

শুনে ডাক্তার অবাক। কথা কইতে পারলেন না। শেষ বললেন—আপনাকে ও আপনার বিশ্বাসকে খোয়াবার চিন্তা সব চেয়ে অশান্তির কারণ হ'য়ে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। লোকের বিশ্বাসই যদি গেল—তাহলে আর কি রইল আমার? এ ছাড়া আমার অন্য চিন্তা আর ছিল না Sir—জেলে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলুম—সেটাকে তত বড় করেও দেখিনি।"

সাহেব বললেন—"আমার গাফিলতিতেই এত কষ্ট পেয়েছ, নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলুম। তুমি দেখছি বড় sensitive আর nervous প্রকৃতি লোক।"

—আচ্ছা, ও কথা পরে হচ্ছে, এখন আগে তোমার খুড়োর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। চা খেতে খেতে চলুক। আমি যে কাজের জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক

ডাক্তার বললেন—ওঁকে পাওয়াটাই আমাকে আশ্চর্য্য করেছে। ওঁর অপেক্ষা যে কাজের উপযুক্ত লোক আছেন কি না সন্দেহ। ওঁকে পাওয়া আর বোঝা কিন্তু কঠিন।—ধরা দেয় না। A true saint, সত্যকার সাধু। ওকে কথা শুনে বোঝা কিন্তু বড় কঠিন—আনন্দময় ও রহস্যপ্রিয়। অমন বিশ্বাসী ও নির্ভীক সত্য বক্তা বড় মিলবে না। লোক ঠিকই পেয়েছেন। না লোভ না চিন্তা। রহস্যের আচ্ছাদনে কথা কন্, সকলে বুঝতে পারে না। অনিষ্ট সেই লোক করে, সে স্বার্থ রাখে। উনি যদি কিছু করেন তো, উপকার আর সেবা। অর্থে ওঁকে বশে আনা সম্ভব নয়। কারো সদুদ্দেশ্য বুঝলে আপনিই সাহায্য করেন।

শুনে সাহেব হাসলেন, বললেন—"হয়েছে, আর বলতে হবে না। বুঝলুম উনি ব্যবহারিক জগতের লোক নন্,—সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ভাল লোক। কিন্তু অচল।"

"ঠিক তাই সার। আপনি এ সব কথা এনে আমাকে ম্যাডামের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোথায় কেমন আছেন, আগে বলুন।"

বলছি কিন্তু শুনে রাখো—বেগম সাক্ষী দেবেন না। তোমাদের চেয়ারম্যানও হু'দিন তাঁকে বোঝাতে এসেছিলেন, সুবিধে করতে না পেরে মামলা তুলে নিয়েছেন। কোর্ট থেকেই সব মিটে গিয়েছে।" কিন্তু···

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন—"কিন্তুটা আমাকে বলতে দিলেই ভালো হয় sir—ওই একটা সামান্য হারের ছুতো নিয়ে আমাকে এত বড় বিপদে ফেলাটা কি আপনি সম্ভব বলে মনে করেন? আপনি আমাকে কি সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেই Jealousyতে কি এত বড় হাঙ্গামে কেউ যায়? আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছি না Sir, কেবল মনে হ'চ্ছে এর পশ্চাতে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে বা আছে। আমি তা বুঝতে না পেরেই বড় অশান্তি ভোগ করছি। আপনি আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাও আমি দেখিনি।"

সাহেব শুনে ডাক্তারের মুখের পানে স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন। শেষ বললেন—কেবল হার চুরির অপবাদটায় তোমার কুলুচ্ছে না দেখছি। সেটা ছোট হ'ল কিসে? আর তাতেই যদি ও-পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তো তার বেশী ওরা আর কি চায়?

"তা জানলে আমার আর অশান্তি কিসের Sir!"

সাহেব তাঁর চেয়ার ছেড়ে ওঠে এসে ডাক্তারের পি চাপড়ে হাসলেন।—"Bravo, এই জন্যেই তোমাদ খুঁজি। কাজ হয়ে গেলে এদেশে আর কেউ সে সম্ব ভাবে না। তোমাদের কিন্তু intelligent জাত ব খ্যাতি শুনতে পাই। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমাদে দেশের নামকরা বড় সহরগুলির মত তোমাদের কলকাতাতে বড় বড় গুণ্ডার দল আছে। তারা পারে না বা আবশ্য হ'লে করে না এমন কাজ নেই। টাকা নিয়ে বড় লোকে দাগ উদ্ধার বা মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধি করাও তাদে রোজগারের একটা পথ—"

বিনোদ—"কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আ তো বড়লোক নই!"

"হ্যাঁ—প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল—কিন্তু প ভেতরের কথা সব জানতে পারলুম। আমাদের কা কতটা দায়িত্বপূর্ণ জানতো? তাই যেখানে থাকতে হ সেখানকার নাড়িনক্ষত্রের সংবাদ নেবার ব্যবস্থাও স রাখতে হয়। সেই সূত্রে তোমার সম্বন্ধে সব খবর নেওয় তেমন কঠিন হয়নি। কতদূর সত্যি জানি না কি এখানকার মিলের মালিকদের ধারণা তুমি তাঁদের কর্ম্মীদে বিগড়ে দেবার চেষ্টায় আছ, তোমারি সাহায্যে তারা দ বাঁধছে। এটি চ'লে তাঁদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত লাগবে। তাই কলকাতার একটি বড় দলের সাহায্যে তাঁরা তাদের বাধা অর্থাৎ তোমাকে সরিয়ে ফেলতে চান আরও জানা গেল যে তোমাদের চেয়ারম্যানও এঁদের সং বিশেষ খাতির রাখেন, এক রকম হাতের লোকও বল যায়—তাই তোমার বিরুদ্ধে কিছু করার তেমন কোনো অসুবিধে নেই।"

বিনোদ বললে—"কোনো অন্যায় কাজ জেনে-শুনে না করলেও এই রকম একটা আভাষ আমিও পেয়েছি Sir কিন্তু আমি ভাবছি, তাদের যখন খুন করাও আটকায় না তখন শক্তটা কি—আর এতদিন করেনিই বা কেন?"

সাহেব বললে—"এঁরা অন্য উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হলে চট্ করে অতটা করতে চাননা। ওতে জানাজানি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা! আর বললুম তো—তোমাদের

আপিসের মালিক হাতে থাকায়—সব দিক দিয়েই স্থবিধে হয়ে গেছে।"

বিনোদ—"আমার অদৃষ্টে যা হয় হবে, মাণিকের কেনো ভয় নেইতো?"

"তা নেই, কিন্তু তোমাদের কারও এখানে থাকা আর উচিত বোধ হয় না। আর তুমি যে অদৃষ্টের কথা কইলে—হতে পারে তা ঠিক। কিন্তু যতক্ষণ সংসারে ও কাজে থাকা, ততক্ষণ সেটা অর্থহীন কথা। মানুষের সাধ্য-মত সাবধান হয়ে থাকতে চেষ্টা করাই উচিত। মানুষ বুদ্ধি পেয়েছে ব্যবহারের জন্য। রোগে লোক ডাক্তার খোঁজে কেন? তোমার ও কথা সর্ব্বত্যাগীর জন্য।"

"আপনার কথাই ঠিক। মাণিকের কথাই ভাবছিলুম—হঁস ছিল না—ক্ষমা করবেন। আর একটা কথাও আমাকে বিচলিত করে রেখেছে। ওই যুধিষ্ঠির লোকটাকে বুঝতে পারছি না। তার কাজ আর ব্যবহার দেখে তার সম্বন্ধে কিছু ঠিক করতে পারি না। দুয়ে মিল পাই না—। শুনেছি যে কারণেই হোক সে আমার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা সম্মান রাখে। অতটা কেবল তার মাছের কারবারের স্থবিধের জন্যে হতে পারে না—এই আমার ধারণা। তার-পর হঠাৎ একদিন তারি মুখে তার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব কথা সে আমাকে স্বেচ্ছায় শোনায়—আমি বারবার নিষেধ করলেও থামে না, তা শুনে আমি শিউরে গেছি—ভয় পেয়েছি। তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না—মহা সন্দেহে পড়ে গেছি। সে সব তো আমাকে বলবার কথা নয়, আমাকে সে বলে কেন, উদ্দেশ্য কি? তাই তার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি।"

সাহেব বললেন—"আমি ও লোকটিকে আমার দরকাবের মতই জানি। সে ওই ভয়ঙ্কর দলের একজন বিশ্বাসী এজেন্ট। তোমার সম্বন্ধে ভীষণ একটা ভারপ্রাপ্ত লোক। এমনো তো হ'তে পারে যে এ দলে থেকেও লোকটি একটু অন্য ধাতের। তোমার সংস্পর্শে এসে এত বড় গর্হিত কাজটা করতে ইতস্তত: করছে—অথচ দলের নিয়মের বিরুদ্ধে সে কথা বলতেও পারছে না তাই সময় নিচ্ছে। পরে কি করবে জানি না, তাই তোমাদের এখান থেকে সত্বর সরানই আমার উদ্দেশ্য। আর যে কদিন এখানে থাকবে মিলের কারো সঙ্গে দেখা শোনা না করাই ভাল। যুধিষ্ঠির যে দলের এজেন্ট সে দলকে সবাই ভয় করে। মিলের দিকেই আর যেওনা।"

"আপনি যখন নিষেধ করছেন—আর যাব না।"

"আচ্ছা আজ তবে ওঠা যাক্। Good night doctor."

একটা ভাঙ্গা দাঁত

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

গেল ছমাস ধরে আমার একটা পাশের দাঁত নড়ছিল, আজ সেটা পড়ে গেল। এর আগে আমার আর কোন দাঁত পড়েনি, এইটিই প্রথম, তাই মন কেমন করছে। ছত্রিশ বছরের সঙ্গীটিকে আজ আমি হারালুম!

কচি বয়সের দাঁতগুলি একটার পর একটা প্রকাশিত হয়ে স্বজন-সমাজে কি পরিমাণ কৌতূহল ও আনন্দের হিল্লোল তুলেছিল, তার কথা আমার পরিষ্কার ভাবে মনে নেই, অবশ্য মনে রাখবার মত বয়সও সেটা নয়, তবে একথাটা মনে আছে যে কচি দাঁতগুলি একটির পর একটি অন্তর্হিত হবার সময় কিন্তু আমায় যথেষ্ট লজ্জা ও দুশ্চিন্তার হাতে ফেলে গেছে। পরিপাটী ভাবে সজ্জিত দন্তরাজির মধ্যে থেকে সামনের একটা যখন পড়ে গেল, তখন লজ্জায় যেন কথা বলতে পারি না, ফাঁকটা যেন করে তার স্থপস্থিতি ঘোষণা করে আমায় মুস্কিলে ফেলেছে। যেন সুন্দর একটা হারমানিয়ামের মাঝখানের একটা রীড ভেঙ্গে গিয়ে তার স্থরের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিয়েছে, সঙ্গীতের আসরে আর সেটা উপস্থিত করা যায় না। ফোকলা হয়ে সকলকে হাসির খোরাক জুগিয়ে আমার প্রাণান্ত! তা ছাড়া আবার মহা দুশ্চিন্তা, ফাঁকা জায়গাটিতে আবার নব দন্ত দেখা দেবে কিনা। সর্খীদের পরামর্শ মত সেই ছোট সাদা ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতটিকে একটি ইঁদুরের গর্ত্তে দিয়ে তাকে তার একটি দাঁত আমাকে দিতে অনুরোধ জানিয়েছি।

ক্রমশ: কচি দাঁতগুলি একটির পর একটি অন্তর্হিত হয়েছে, এবং তাদের স্থলে উদ্গত হয়েছে একটির পর একটি করে দৃঢ় শক্ত দাঁত, যাদের দুটি পঙক্তি আজ আমার এই ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অটুটভাবে আমার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে—সেনাপতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর মত।

দাঁতের যত্ন অবশ্য আমি বরাবরই নিয়েছি, যদিও আমার দাঁত সম্পূর্ণ

রোগমুক্ত নয়। বাল্যকালের সামান্য অবহেলায় একবার দাঁত খারাপ হলে তাকে সম্পূর্ণভাবে সারান যথেষ্ট শক্ত, ঐ কথা বেশী বয়সে জেনে অনুতপ্ত হয়েছি। হয়তো সেইজন্যে আমার মাত্র এই ছত্রিশ বছর বয়সে দাঁতটা পড়ে গেল, নাহলে কে বলতে পারে, ছয়ট্টি পর্যন্ত সেটি আমার মুখ গহ্বরকে উজ্জ্বল, উচ্চারণকে সুস্পষ্ট, হাসিকে বেগবান, তথা পরিপাকশক্তিকে প্রখর করতে পারত।

এমন সুন্দর ও এত প্রয়োজনীয় যে দাঁত, তার সম্বন্ধে আমরা যে যথেষ্ট অনুরাগ দেখাই না, সে কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বেশী বয়স পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং শক্ত দন্তপঙক্তি মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধন করছে, এ সব দেশেই অসুলভ। যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের এত ব্যাকুলতা, তাদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুকে বাদ দিয়ে অপর কোনটির চেয়ে দাঁতের স্থান নীচে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রামের মত দাঁত যে মর্য্যাদা পায়নি, তার কারণ বোধ হয় ইন্দ্রিয়রা শরীরের অংশ হিসেবে জন্মলাভ করে এবং প্রচণ্ড আঘাত বা কঠিন কোন অসুখের হাতে না পড়লে শরীরের সঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, সে পঞ্চাশ বৎসরেই হোক, বা নব্বই বৎসরেই হোক; কিন্তু দাঁতের উৎপত্তি হয় জন্মলাভের পাঁচ ছমাস পরে এবং স্থিতিকালও সুদীর্ঘ নয়, প্রৌঢ়ত্ব আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটির পর একটি সরতে থাকে, বার্দ্ধক্যে একেবারে মুখবিবর শূন্য করে দিয়ে চলে যায়।

চলে যায় বলেই কি তাকে যথেষ্ট অনুরাগ দেখান হবে না, যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হবে না? দাঁত—সে কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কারুর চেয়ে মুখমণ্ডলের কম শোভা বৃদ্ধি করে, না কারুর চেয়ে কম প্রয়োজনীয়?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে কোন বিষয়ে সার্থকতা বা অসার্থকতা প্রকাশ করতে গেলে ইন্দ্রিয়দলের দশন-সহযোগিতা প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ চক্ষুর কথাই ধরা যাক। যে কোন সুন্দর দৃশ্য নয়নসমক্ষে উপস্থিত হলে সহাস্যানন দন্তরাজিকে প্রকাশিত করে প্রশংসা জানায়। যখন মৃদু আলোকিত নির্জন কক্ষে প্রণয়িনী ধীরপদে অপরের শ্রবণ এড়িয়ে দয়িতের পাশে এসে দাঁড়ায়, সে শুভমুহূর্তে চকিতকর দর্শনের পুলক দশনশ্রেণীকেই প্রকাশ করতে হয় সর্বপ্রথম; মুখে ভাষা না থাকলেও যায় আসে না, কারণ দর্শন ও দশন একসঙ্গে মিলে অনুচ্চারিত কাব্য সৃষ্টি করে। আবার যখন বেদনাকর দৃশ্য দেখে আত্মহারা হবার উপক্রম হয়, তখন দাঁতে দাঁতে চেপে কষ্ট সহ্য করতে হয়; অবমাননাকর ব্যাপার দেখে যখন রাগে শরীর জ্বলতে থাকে, তখন দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ধৈর্য্য রক্ষা করতে হয়, এবং সময় সময় জিভ কামড়ে ধরে প্রত্যুত্তরে কটুভাষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

শ্রবণেরও নয়নের মত একই অবস্থা, ছায়ানুসারী লক্ষণ ভাইটির মত দশনকে সকল সময়েই চাই। আনন্দধ্বনি এসে কানে স্পর্শ করা মাত্র শরীরের অন্য কোন অংশের আগে দন্তদাম বিকশিত হয়ে স্বাগত জানাবে। আবার দাঁতের কোন অসুস্থতায় শ্রবণ যে কতটা আর্তবোধ করে, তা তো সর্বজনগোচর ব্যাপার।

জিহ্বার তো দন্তদামের জন্যে ব্যাকুলতার সীমা নেই, সে ব্যাকুলতার তুলনা দিতে গেলে একমাত্র মায়ের পুত্রদের প্রতি স্নেহের কথা বলতে হয়। এত বড় নিবিড় আত্মীয়তা বড় একটা দেখা যায় না। নিয়ত পাশে থেকেও স্বস্তি নেই, কারণে অকারণে দাঁতগুলির বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে দেখছে, ঠিক আছে কিনা, সামান্য একটু ব্যথা হলে কি অস্থিরতা! আবার দাঁত যখন কাজ করে, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য চর্বণ করে, তখনও খাদ্যগুলোকে বিভিন্ন দাঁতের কাছে কর্তন চর্বণের জন্যে এগিয়ে দিয়ে কাজকে সহজ করে দেবার জন্যে কি চঞ্চলতা! শিশুরা যেমন ভুল করে মাতৃস্তন কামড়ে দিলে মা কিছু মনে করেন না, তেমনি দন্তদাম অন্যমনস্কতায় জিহ্বাকে কামড়ে দিলেও জিহ্বা কিছু মনে করে না, পূর্বের মত সস্নেহে তার কাজ করে যেতে থাকে, শব্দজগতের প্রায় সব কিছুই তো দাঁতের ও জিহ্বার যুক্ত অধিকারে। বাক্যের সুস্পষ্ট উচ্চারণের জন্যে দাঁতের যে কি প্রয়োজন, তা বলার দরকার হয় না। যে চিত্তমোহন ধ্বনিউচ্ছল হাসি শোনবার জন্যে মন এত চঞ্চল হয়, তার এক প্রধান উৎস তো সুন্দর দন্তপঙক্তি। তাই বেশী বয়সে যখন মুখবিবর খালি করে দিয়ে দাঁতগুলি চলে যায়, তখন মুখমণ্ডলের হয় এক মস্ত বড় দৈন্য এবং জিহ্বার ক্ষতিটা হয় সবচেয়ে মর্মান্তিক। পরমাত্মীয়বিয়োগবিধুর জিহ্বা তখন মুখাভ্যন্তরে মাথা কুটে মরতে থাকে, তার উচ্চারিত কথাগুলি তখন হয়ে দাঁড়ায় বিকৃত; যার কথা শোনবার জন্যে সহস্র লোক ব্যগ্র হয়েছে একদিন, আজ তার কাছে একটি লোকও আসে না।

নাসিকা ও ত্বকের ব্যাপারও প্রায় একই রকম। আনন্দে ও নিরানন্দে, অধিকাংশ সময়েই দাঁতের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এমন যে দাঁত, তা একটির পর একটি স্খলিত হয়ে পড়ে কপোলদ্বয়কে করবে কুঞ্চিত, অধর ও ওষ্ঠকে করবে লোল, এ কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। কৃত্রিম দন্ত পরে বা গোঁফদাড়ি রেখে তো সে অভাবটা দূর করা যায় না, হয় তো কিছুটা ঢাকা যায়, তাছাড়া কৃত্রিম দন্তটা অনেকটা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার মত, কিছুতেই ভাল করে খাপ খায় না। যতই যত্ন নিয়ে রাখা যাক না কেন, ঐকান্তিকতা পাওয়া যায় না।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী আজকাল না থাকলেও সুমুখীদের মানরক্ষার জন্যে এক আধটা পান মাঝে মাঝে খেতে হয়। তাতে অধর, ওষ্ঠ এবং তার সঙ্গে দন্তদামকে রঞ্জিত করে নিজেদের কতটা ভাল দেখায় বলা শক্ত; তবে শ্রীমতীদের, যাঁদের দাঁতগুলি ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র—তাদের মাঝে মাঝে পান খেলে মন্দ দেখায় না কিন্তু, দন্তরুচিকৌমুদী তখন জবাকুসুমসঙ্কাশ হয়ে মনকে রাঙিয়ে তোলে।

তবে তার অত্যাধিকটা ভাল নয়, তাম্বুলবিলাস মাত্রাতিরিক্তে দাঁড়ালে দাঁতগুলির যে রূপ দাঁড়ায়, তা দেখে কারুরই উৎসাহ বোধ হয় না, তা

সে দন্তদাম শ্রীমতীর কমল মুখমণ্ডলেই বিরাজ করুক, বা শ্রীমানের মুখমণ্ডলেই অবস্থান করুক।

যে যৌবন নিয়ে এত কাব্য, এত শিল্প, এত আর্ট, তার তো এক প্রধান পরিচয়ই হল সুন্দর সুদৃঢ় দাঁত। দাঁত পড়তে সুরু করলেই এই জন্যে মানুষ ভয় পায়, তার কাছে বার্ধক্য আসছে, মুখে মুখে আলাপন, চুম্বন, আদর—সমস্তকে বিপর্য্যস্ত করে দেবে দন্তহীনতা, ভাবলে ভয় আসবার কথা বইকি।

তাইতো, হোক একটা পাশের দাঁত, তাহলেও এত অসময়ে পড়ে গেল! মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কবিরা দেখছি, দাঁতকে শুধু শুধু মুক্তার পাঁতি বলেননি।

স্ত্রী-সঙ্কট

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী এম-এ

বিবাহের সাত আট দিন পরে কথা হইতেছে।

সুব্রত কি একটা কাজে শোবার ঘরে ঢুকিয়াছিল। নববধূ গীতা খাটের ওপর বসিয়া একখানা বাংলা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতেছিল, সুব্রত আসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—শোন—

সুব্রত মুখে একটু মিষ্টি হাসি টানিয়া বলিল, কি বলছো?

—মনে কিছু করবে না ত?

—না না মনে করবার কি আছে? বলোই না—

গীতা খাটের উপর পুনরায় বসিয়া বলিল, তুমি গোঁফ রাখো কেন বলো ত?

এ প্রশ্নের জন্য সুব্রত মোটেই প্রস্তুত ছিল না—কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল।

গীতার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, তোমাকে গোঁফ মোটেই মানায় না। গোল মুখে clean shaveই ভাল।

সুব্রত অনেকটা সামলাইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিয়াছে সে। এ সব প্রশ্ন উঠিবারই কথা—বিব্রত হইবার কি আছে? তবু একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, এমনি—গোঁফ ওঠা অবধি রেখেই চলেছি—বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তার পর হাসিয়া বলিল, কেন? সকলে ত ভালোই বলে। গোল মুখে সরু গোঁফের রেখা মন্দ কি!

গীতা এবার গম্ভীর হইল, কিন্তু দমিল না। সকলকে নিয়ে ত আর সংসার করবে না? আমার যা ভাল লাগে তাই করা উচিত—তবে আর ভালোবাসা কি? গোঁফওয়ালা পুরুষকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

সুব্রতের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। স্নান করিয়া সদ্য-ভিজা চুলে গীতাকে চমৎকার মানাইয়াছে। কমলালেবু রংএর সাড়ী, তার উপর ফর্সা মুখে কুমকুমের টিপ। একটা মিষ্টি গন্ধ ঘরটাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। সে কাছে সরিয়া আসিয়া গীতার একখানা হাত টানিয়া লইল।

রাগ করলে গীতা? তোমার সামান্য ভালোবাসা পেলেও যে আমি ধন্য হব। গোঁফের কথা কি বলছো? আমাকে তৈরী করবার সম্পূর্ণ ভার ত তোমার।

গীতার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখা দিল।

—তবে আজ বিকেল থেকেই—

—বেশ—তথাস্তু। হাতখানা জোরে নাড়িয়া সুব্রত হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। বন্ধুরা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিয়া আছে।

বিকেল বেলা সত্যই সে গোঁফ কামাইয়া ফেলিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া ভালো লাগিল না। কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাইতেছে। এতদিনের একটা সংস্কার—মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে গীতার হাসিভরা মুখ কল্পনা করিয়া সমস্ত দ্বিধা দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিল। দুই একদিন পরেই ঠিক হইয়া যাইবে। প্রথম প্রথম একটু অদ্ভুত লাগিবে বৈ কি! ঘর হইতে বাহির হইতেই বারান্দায় বাবার সঙ্গে দেখা। তিনিও তাহার খোঁজে এই দিকে আসিতেছিলেন। নরেশবাবু রাশভারী প্রকৃতির লোক। বেশী কথাবার্ত্তা বলেন না।

—এই যে! তোমায় খোঁজেই এলাম। তুমি এম-এ পাশ করেছো। সুবিমল কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করেছে—এই নাও। সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছ।

সুব্রত টেলিগ্রামটা লইয়া বাবাকে প্রণাম করিল। মুখ তুলিতেই নরেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

এ কি? মুখখানাকে বাঁদরের মত করে ফেলেছ দেখছি। পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না কি? না, মডার্ণ ফ্যাশন?

সুব্রত লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কি একটা বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো। পরামর্শ আছে। বলিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

এম-এ পাশের সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইল। এই উপলক্ষে বাড়ীতে বন্ধুদের একটি ভোজের ব্যবস্থাও হইল। সুব্রতের গোঁফ কামানোর আলোচনা প্রধান বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। অনেকে বলিল, রীতিমত স্ত্রৈণ। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

সুব্রত সমস্ত বিদ্রূপ হাসিমুখেই গ্রহণ করিল, বরং স্ত্রৈণ কথাটাতে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। এই ত ভালোবাসা। সে জগৎকে দেখাইবে ভালোবাসার স্বরূপ কি? সম্রাট সাজাহানকে পরাজিত করিবে সে।

রাত্রে গীতাকে সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপের কথা শুনাইয়া গর্ব্বভরে বলিল—যে যাই বলুক—আমি কাউকে কেয়ার করি না। তুমি, আমি ব্যস! তারপর একটু থামিয়া বলিল, সকলের ঈর্ষা হয়, বুঝলে গীতা? তোমাকে যে এতটা ভালোবাসি তা যেন ওদের সহ্য হয় না। আমি একশোবার স্ত্রৈণ—কার কি?

গীতা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, স্ত্রৈণ পুরুষকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে।

আরও কয়েকদিন পরে। সুব্রত কোথায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল—গীতা ঘরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, ক'দিন থেকে একটা কথা বলবো ভাবছি—

সুব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

তুমি 'আওয়ারওয়ার' ব্যবহার কর না কেন বল ত?

সুব্রতের চোখের সামনে নরেশবাবুর গুরুগম্ভীর মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। তবু একটা জবাব দিতে হইবে। বিদুষী পত্নীকে এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই। বলিল, অভ্যেস নেই কোনদিন। আর তা ছাড়া বাবা এ সব বিশেষ পছন্দ করেন না। বাধ্য হইয়া এবার পিতার উল্লেখ করিতে হইল—কেন না 'আওয়ার-ওয়ার' গোঁফ নয়, ইহা বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। এই সব বাবুয়ানী নরেশবাবুর দু' চক্ষের বিষ।

গীতা শ্লেষের সহিত বলিল, অত পিতৃভক্ত হলে পাড়াগেঁয়ে ভূতকে বিয়ে করা উচিত ছিল তোমার। ভদ্রসমাজে মিশতে হলে তাদের আদব-কায়দা শেখা উচিত। আজকাল ধোপারাও আওয়ার-ওয়ার পরে—

সুব্রতের নিকট যুক্তিগুলো অসঙ্গত মনে হইল না। সত্যই ত! তার বাবার অত্যন্ত অন্যায়। বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়া এই সব শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গেলে চলিবে কেন? গীতাকে বলিল, বাবা যা ইচ্ছে বলুক। আমি শীগগীরই আওয়ার-ওয়ার করাচ্ছি।

সুব্রতর একমাত্র ভরসাস্থল মা। মাকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল।

—আজকাল সব ছেলেই পরে মা। এটা দোষের কিছুই নয়।

মা বলিলেন, বুঝি তো সব—কিন্তু ওঁর কাছে ত যুক্তি খাটবে না। জানিস ত সবই। পরে পুত্রের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কথাটা পেড়ে দেখবো।

বিকালবেলা সুযোগমত তিনি স্বামীর নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন।

শুনিয়া নরেশবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

—তখনই বলেছিলুম, এ বিয়ের ফল ভাল হবে না। বিয়ের পর থেকে এই সব সুরু হয়েছে। ওকে তুমি শিক্ষিতা মেয়ে বল? যতো সব—

সুনীতি দেবী কহিলেন, অযথা বৌমার দোষ দিচ্ছ কেন? আজকালকার ছেলে সবাইকে ওই সব পরতে দেখেছে। বন্ধুরা হয়ত এই নিয়ে ঠাট্টা করে থাকবে।

নরেশবাবুর মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। ইচ্ছে হয়, নিজে রোজগার করে ও-সব ফ্যাশন করুক।

ইহার উপর কথা চলে না। সুনীতি দেবী আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কথাটা গীতার কানে গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা। স্বামী বেকার এ দুঃখ রাখিবার তার স্থান কোথায়? লজ্জায় অভিমানে তার চোখ দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। সুব্রতকে ডাকিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সুরে কহিল, পুরুষ মানুষ বলে আর পরিচয় দিও না। এত বড় ছেলে—এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই। এ সব লোককে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে। স্বামী না ছাই……

কথাগুলি সুব্রতের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। প্রত্যুত্তরে সে একটি কথাও বলিল না।

ইন্দ্রাণী রায় গীতার সহপাঠিনী—কলিকাতায় এক সঙ্গে আই-এ পড়িত। গীতার অন্তরঙ্গ বান্ধবী সে। অনেকদিন তার খবর পায় নাই। বিবাহের সময় সেই শেষ দেখা হইয়াছিল। হঠাৎ সেদিন ইন্দ্রাণীর একখানা চিঠি পাইয়া সে রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ইন্দ্রাণী লিখিয়াছে—

গীতা! কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য আমরা কিছুদিন হ'ল সকলে কাশীতে এসেছি। এখন এখানেই থাকা হবে। এসে অবধি নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সময় করে তোর খোঁজ করে উঠতে পারিনি, কিছু মনে করিস না। একটা মজা হয়েছে। আমি প্রাইভেটে বি-এ দেবো ঠিক করেছি। একজন প্রাইভেট টিউটরের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। কালকে সুব্রতবাবু 'ইণ্টারভিউতে' এসে হাজির! দু'জনেই অবাক। তিনি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করছিলেন, তাঁর সেই অবস্থা ভাই খুবই উপভোগ্য। যা হোক অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। সন্ধ্যার পর একটু করে তিনি পড়াবেন। অনেক ভাগ্যে জোটে ভাই—তুই যেন হিংসে করিস না।

ইন্দ্রাণী।

চিঠিখানা পড়িয়া গীতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সুব্রত এ কথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছে। টিউশনি অনেকেই করে ইহাতে লজ্জার কি আছে? বিশেষ তাহারই অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবরটা তাহাকে দিতে সুব্রতর এত সঙ্কোচ কিসের? পরশুদিন সুব্রত দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল—রাত্রে 'ক্ষিদে নেই' বলিয়া খায় নাই। অথচ পরশু দিনই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সে দেখা করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ওখান হইতেই আহার সমাধা করিয়া আসিয়াছে। সুব্রতের এতখানি সাহস দেখিয়া গীতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার বোঝাপড়া সে করিবে। সুব্রত যে তাহার উপর টেক্কা দিবে ইহা তাহার অসহ্য মনে হইল। সে চায় তাহার স্বামী তাহারই একান্ত অনুগত থাকিবে। শিক্ষিতা মেয়ে সে—নিজের স্বামীকে করায়ত্ব করিতে পারিবে না?

রাত্রে সুব্রতকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, বাবার কথায় রোজগারের দিকে মন দেওয়া হয়েছে দেখছি, ভাল! এ কথা আমাকে বল্লে কি খেয়ে ফেলতাম?

সুব্রত চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে বুঝিল ধরা পড়িয়াছে, আর গোপন করিয়া লাভ নাই। সহজভাবে কহিল, বলবার মত বিশেষ কিছুই নয়, তাই বলিনি।

তারপর একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।—রোজগার যে বাবার জন্য করছি না, এটা বোধ হয় সকলের জানা আছে।

গীতা ঝাঁঝের সহিত বলিল, আমার বন্ধুর কথা গোপন করাকে আমি দোষাবহই মনে করি। অন্য কোথাও হলে—বয়ে গেছে আমার জিজ্ঞেস করতে—

সুব্রত বলিল, অপরাধ স্বীকার করছি। ঘুম পেয়েছে, বিরক্ত না করলেই সুখী হব।

এতখানি তাচ্ছিল্য? গীতা জ্বলিয়া উঠিল।

ওঃ—আমি কথা বল্লেই আজকাল বিরক্ত লাগে। তা ত লাগবেই—সুব্রত মুচকি হাসিয়া নিঃশব্দে কথাগুলি হজম করিল। তার এই নীরব উপেক্ষা গীতাকে অধিকতর দহন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। স্বামীর সান্নিধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সুব্রতর তখন মৃদু নাসিকা গর্জ্জন শোনা যাইতেছে।

পরদিন সুব্রত রীতিমত গম্ভীর হইয়া উঠিল। গীতাও সুব্রতকে এড়াইয়া চলিল। সমস্তদিন স্বামী স্ত্রীতে একটিও কথা হইল না। বিকালে মায়ের অনুরোধে গীতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—রাত্রে সুব্রত ভাত খাইবে না পরোটা

খাইবে। উত্তরে সুব্রত বলিয়াছিল রাত্রে খাইবে না, বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণের কথায় গীতার নারব থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, ইন্দ্রাণীর বাড়ীতে বুঝি? সে কথা বল্লেই হয়, অত ঢং কেন?

সুব্রত বলিল, অত খোঁজের ত দরকার কারু দেখিনে—রাত্রে খাব না—ব্যস।

গীতা বলিল, দেখো—অত অহঙ্কার থাকলে হয়। একবার যখন কথা আরম্ভ হইয়াছে তখন আর নীরবতা চলে না। গীতা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, কালকে 'আণ্ডার-ওয়ার' কেনা হয়েছে দেখছি। এক কৌটা "কিউটিক্যুরাও" এসেছে। আজকাল সাজ-সজ্জার দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

সুব্রত উত্তরে কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর উপেক্ষায় অজ্ঞাতে গীতার চোখে জল দেখা দিল। সুব্রতকে করায়ত্ব করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প কোথায় অন্তর্হিত হইল—সে নিজেই টের পাইল না।

কয়েকদিন এইরূপ মনকষাকষি চলিল। হঠাৎ সেদিন গীতা সুব্রতকে ধরিয়া বসিল—আজ পড়াইতে যাইবার সময় সে তাহার সঙ্গে যাইবে। অনেকদিন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হয় নাই, বন্ধুর জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইত্যাদি। সুব্রত প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—না না তুমি যাবে কেন? ওঁকেই একদিন নিয়ে আসবো। তা ছাড়া ওঁরা একদিনও এলেন না, তুমি গেলে বাবা হয়ত মনে কিছু করবেন। গীতা কোনও ওজর আপত্তি শুনিল না। সে আজ যাইবেই। অগত্যা সুব্রতকে রাজী হইতে হইল।

ইন্দ্রাণী গীতাকে দেখিয়া খুব খুশী হইল। সুব্রতের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল, আজকে আমার ছুটি—বুঝলেন তো? অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়েছি সহজে ছাড়বো না।

সুব্রতও প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিল, বেশতো! যতক্ষণ ইচ্ছে বন্ধুকে আটকে রাখুন। আমি তবে একটু ঘুরে আসি।

বাঃ—বেশ লোক তো আপনি। চা না খেয়েই যাবেন? আমি আজ নিজে হাতে 'আলুর খাসিয়া কাবাব' করেছি। বাইরের ঘরে একটু বসুন, এক্ষুণি নিয়ে আসছি—বলিয়া দেহের লীলায়িত ভঙ্গী তুলিয়া ইন্দ্রাণী গীতার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে প্রস্থান করিল।

সুব্রত গিয়া বৈঠকখানায় বসিল। কিছুক্ষণ পরে গীতা ও ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিল। ইন্দ্রাণীর হাতে খাবারের থালা ও পিছনে চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। চা' ও জলযোগের পর্ব্ব একঘণ্টা ধরিয়া চলিল। ইন্দ্রাণী যেন চোখে মুখে কথা কয়। গীতা লক্ষ্য করিল, ইন্দ্রাণী পূর্ব্বাপেক্ষা প্রগলভা হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিল, বেশীর ভাগই সুব্রতর কথা। সে কি কি খাইতে ভালোবাসে—ইংরাজীতে তার কি অসাধারণ জ্ঞান, রাত্রে প্রায়ই ইন্দ্রাণী তাকে খাওয়াইয়া ছাড়ে। যেদিন পড়িতে ভাল না লাগে দু'জনে গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথার মাঝখানে সুব্রত প্রায়ই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল। ইহাও গীতার লক্ষ্য এড়াইল না।

ইন্দ্রাণীর বাড়ী হইতে গীতা যেন নতুন মানুষ হইয়া ফিরিল। সে রাত্রে হাসি-খুশীতে সে অত্যধিক উচ্ছল হইয়া উঠিল। সুব্রতের তাহা খারাপ লাগে নাই—তবু যেন কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হইল।

ইহার পর হইতে গীতার আকস্মিক পরিবর্ত্তন সুব্রতকে রীতিমত অবাক করিয়া তুলিল। নরেশবাবুর মতামত, আচার ব্যবহার পূর্ব্বে গীতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। আজকাল তাঁহার প্রশংসা গীতার মুখে লাগিয়াই আছে। শিক্ষিতা মেয়ের পটের বিবি সাজিয়া নভেল পড়াকে নরেশবাবু আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। গীতা সাবান পাউডারের ব্যবহার কমাইয়া দিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্বশুরের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। নরেশবাবু মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেন। এতদিনে বৌমার সুবুদ্ধি হইয়াছে তাহা হইলে। তিনি যা ভাবিয়াছিলেন তা নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল সুব্রত।

গীতা আজকাল তারই সাজ-সজ্জার দিকে অত্যধিক কটাক্ষ করে। দেশের যা অবস্থা—লোকে খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, তুমি কোন আক্কেলে পাউডার স্নো মাখো বলো ত?

সঙ্গে বলিত তা উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। সুব্রত বাধ্য হইয়া পাউডার ছাড়িয়া দিল। কিছুদিন হইল সে সেলুনে চুল কাটা আরম্ভ করিয়াছিল। গীতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—যেখানে দু' আনায় ভদ্রতা রক্ষা চলে, সেখানে অনর্থক ছয় আনা খরচ করে দেশের তুমি কি উপকারটা করছো? এই ছ'আনা আজকাল এক একটা ফ্যামিলির বাজার খরচ জানো?

সুব্রত লজ্জায় সে মাসে নাপিত ডাকিয়া চুল কাটিল।

কলিকাতা হইতে কি একটা কর্ম্ম উপলক্ষে সুব্রতের এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে দু'দিন থাকিবে। ছেলেটির নাম কনক—কংগ্রেসের সভ্য। দু' তিনবার জেল খাটিয়াছে। গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা—চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, সর্ব্বদা খদ্দর পরিধান করে। ছেলেটির কোনরূপ বিলাসিতা নাই। তার সরলতায় নরেশবাবু খুব খুশী হইলেন। সুব্রতর সামনে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই সব ছেলেই ত দেশের রত্ন। নিজের দেশকে যারা ভালোবাসে, বিলাসিতাকে যারা পাপ বলে গ্রহণ করে—তারাই ত ভবিষ্যত জাতি গঠনের অগ্রদূত। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক!

কনক হেঁট হইয়া নরেশবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সুব্রত সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। একটা কাজের ছুতা করিয়া সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিল।

রাত্রে গীতাও কনকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। তোমার বন্ধুটি চমৎকার! খদ্দরের ড্রেসেও কি সুন্দর মানিয়েছে—না? এ রকম simple ছেলে আমার বেশ লাগে।

সুব্রত সংক্ষেপে বলিল, হুঁ।

গীতা বলিল, 'আণ্ডার-ওয়ার' পরলে যেন ডেঁপো ডেঁপো লাগে। ও সব বিলেতী ঢং আমাদের দেশে মোটেই মানায় না—না?

সুব্রত পুনরায় কহিল—হুঁ।

গীতা উৎসাহভরে বলিয়া চলিল, তা ছাড়া দেশের যা অবস্থা—ওটাও ত বাজে খরচ। ওই পয়সায় অনেক ফ্যামিলির—

কিছুদিন হইতে গীতার অত্যধিক দেশপ্রীতিতে সুব্রতের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াই ছিল, তাহার উপর আজ বন্ধুর সামনে পিতৃদেবের দেশানুরাগ তাহাকে বেশ উত্তপ্ত করিয়া দিয়াছে। অসহিষ্ণু হইয়া সে বলিয়া উঠিল, বেশ! আণ্ডার-ওয়ার পরা কাল থেকেই ছেড়ে দেবো। কিন্তু গোঁফ আর আমি রাখবো না। তাতে বোধ হয় কোন ফ্যামিলির ক্ষতি হবে না।

অন্ধকারে গীতার চোখে মুখে চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

অস্পৃশ্যতা নাই

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

পূর্ব্বে কাহারও পয়সা হইলে সে হয় কৃপণ হইত, নয় ধর্ম্মার্থে বা প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিধ ক্রিয়া কর্ম্ম করিত। কৃপণ নিজেকে এবং পরিজনবর্গকে এত কষ্ট দেয় যে তাহাকে কেহ ঈর্ষা করে না করুণা ও ঘৃণা করে। সেকেলে বড়লোকেরা দোল দুর্গোৎসব, বিবিধ ব্রত, পুষ্করিণী খনন, প্রভৃতি করিয়া লোকের নানা উপকার সাধন করিত। বর্ত্তমানে তাহাদের বিলাসেই সকল টাকা ব্যয় হয় সাধারণের হিতের জন্য খরচ করিবার টাকা কোথায়? আরও বেশী পয়সা থাকিলে সমুদ্র তটে, পাহাড়ে বা সাঁওতাল পরগণায় বাটীর প্রয়োজন। মোটরকার রেডিও গ্রামোফোন ইত্যাদির প্রয়োজন। বর্ত্তমানে টিউবওয়েল—নলকূপ প্রভৃতি হওয়ায় লোকে নিজের জলের জন্য পুষ্করিণী কাটে না, যাহাতে আরও পাঁচ জনের উপকার হইত। টিনের ঘর হওয়ায় বার্ষিক তৃণগৃহ নির্ম্মাণকারীদিগের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। ফলত বিবিধ ইংরাজি বিলাস দেশে আসায় ভদ্রলোকেরা পূর্ব্বে ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে উপকার করিত তাহা বন্ধ হইয়াছে। মানুষের সহিত মানুষের পূর্ব্বে যে সকল মানবীয় সংস্পর্শ ঘটিত তাহা বন্ধ হইয়াছে।

এই মানবীয় সম্পর্ক কেমন করিয়া দাঙ্গার সময় লোকের রক্ষাবিধান করে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্যালকাটা কেমিক্যালের বীরেন মৈত্রের বালিগঞ্জের বাটীর একতলামাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দাঙ্গার সময় তাহারা সেখানে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। দোতালার অসমাপ্ত অংশের একটি ঘরে জন ১৫ মুসলমান রাজমিস্ত্রী বাস করিয়া বাটীর কাজ করিতেছিল। দাঙ্গার দিন হিন্দুরা ইহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করে। বীরেনবাবু তাহাদের কাতর ক্রন্দনে করুণার্দ্র হইয়া অনেক কষ্টে আক্রমণকারীগণকে প্রথমে ফিরাইয়া দেন। পরে যখন দেখিলেন তাহাদিগকে আর রাখা নিরাপদ নয়, তখন তিনি সন্ধ্যার পর সুযোগ পাইয়া কারখানার লরী আনাইয়া লোকগুলিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া

দেন। দ্বিতীয় গল্পটি আমার শোনা মাত্র। পার্ক ষ্ট্রীটের অনেক বাটী লুণ্ঠিত হইলেও এক বাঙ্গালী হিন্দু ডাক্তারের বাটী লুণ্ঠিত হয় নাই। ডাক্তারটি লোকের উপকারী ছিলেন বলিয়া সেখানকার মুসলমানরাই তাঁহার বাটী রক্ষার ব্যবস্থা করে। এইরূপে হিন্দু মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলমান হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্ব্বে আমি হিন্দু-সমাজে যে সকল অনাচার অবস্থিতির কথা বলিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন আমি সমাজে সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। সমাজে যে সকল দোষ ঢুকিয়াছে তদ্বিষয়ে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। গল্পের খরগোস ঝোপের মধ্যে মুখটি মাত্র লুকাইয়া শরীর ঢাকিয়াছি ভাবিয়া অব্যাহতি পায় নাই। এই দুর্দ্দিনে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দুই মহাপ্রভু পূর্ব্বে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের এক্ষণে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে।

দুই মহাপ্রভু:—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয়—যিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের সুলেখক, ভাগবতের শ্রদ্ধাবান পাঠক এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত—যখন আমার নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিপক্ষে দশ কথা বলিলেন, তখন সত্যই আমি বিব্রত হইয়াছিলাম, এবং কিছুকাল ধরিয়া আমার সংশয় চলিতেছিল। দাঙ্গার পর আমার সংশয় চলিয়া গিয়াছে এবং নিত্যানন্দের মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি। ভিক্ষার জন্য যে সকল বৈষ্ণব গান করিয়া বেড়ায়, তারা প্রথমে চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করে। কিন্তু তাহাদের ভক্তি ও ভালবাসার প্রধানকেন্দ্র নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ বড় দয়াল, কাঙ্গালের—পতিতের বন্ধু—এই তাহাদের গানের প্রধান ধুয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দুদিগের সংকটকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংকটেও আমাদের তাঁহারই নির্দ্দিষ্টমার্গ অনুসরণ করিতে হইবে। চৈতন্য মহাপ্রভু যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দপ্রভু তাহার প্রয়োগ দেখাইয়া ছিলেন। তিনি পতিত, তৎকালীন অস্পৃশ্য জাতিসমূহের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন—হিন্দু রাখিয়াছিলেন। রাঢ় দেশেই নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার প্রধানত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে এ জন্য হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ তত বেশী হয় নাই। পতিত জাতির প্রতি নিত্যানন্দ কত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহা বৈষ্ণব কবির এই দুই ছত্র কবিতা হইতে বুঝা যায়।

"কি কব নিত্যানন্দের জাতের পরিপাটি।
উদ্ধরণ দত্ত সোনার বেনে তার ভেলে দেয় কাটি।"

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বলেন:—

কারুণ্যে ভক্তি দাতৃত্বে চৈতন্যগুণ বর্ণনে।
অমায়া কথনে নাস্তি নিত্যানন্দ সম প্রভুঃ॥

চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—।

"মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন।" (চৈতন্য ভাগবত)

এক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ কিরূপ বর্ত্তমান কালোপযোগী তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়টি কথা লিখিব।

(১) কলিযুগে হরিনামই (ভগবানের নাম) শ্রেষ্ঠ সাধন।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(২) ভক্তিমান চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ:—
"শুচি সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নিদগ্ধ দুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকেঽপি বুধৈ শ্লাঘ্যোন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥"

(৩) "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

আমার কথা শেষ হইলে পণ্ডিত যদুনাথও স্বীকার করিলেন বর্ত্তমানকালে প্রকৃতই অস্পৃশ্যতা নাই। নীচ জাতিদিগকে পূর্ণভাবে জলাচরণীয় করা উচিত। কথা প্রসঙ্গে আরও বাহির হইল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু—প্রথম জীবনে পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়া অব্রাহ্মণোচিত আচার অবলম্বন করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি তপঃসিদ্ধ হইয়া মহাগৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। অনেক উচ্চবর্ণের লোক তাহার মন্ত্রশিষ্য। তাহার শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উচ্চবর্ণের শিষ্য বহু। তাহার নমশূদ্র শিষ্য অনেক আছে। ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শিষ্য সন্তোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাহারও উচ্চ নীচ (নমশূদ্রও তাহার মধ্যে) বহু শিষ্য হইয়াছে। নীচ জাতীয় এইসকল শিষ্যগণও উচ্চজাতীয়দিগের মত গুরুভ্রাতাগণের দ্বারা ব্যবহৃত হন।

তারাকিশোর চৌধুরী মহোদয় প্রথম বয়সে ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া নিজ পিতা কর্ত্তৃক পতিত বিবেচনায় তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র হইয়াছিলেন। ইনিও পরে কাঠিয়া বাবার শিষ্য হইয়া তপঃসিদ্ধ হন। পরে সন্তদাস বাবাজী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য।

পরমহংসদেবেরও জন্মাদি উৎসব উপলক্ষে আহারাদির সময় কোনওরূপ জাতি বিচার করা হয় না।

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বেও শ্রীপাট বাগনাপাড়ায় বৈষ্ণব উৎসব উপলক্ষে দেখিয়াছি অন্নকূট ব্যাপারে কোনওরূপ জাতিভেদ মানা হইত না। অবশ্য খুব নিষ্ঠাবান লোক কেহ কেহ ইহাতে যোগ দিতেন না।

আমাদিগকে মহাপ্রভুর পদাঙ্ক ধরিয়া সকল জাতিকেই হরিনাম (ভগবানের নাম) দিতে হইবে এবং নাম যাহারা গ্রহণ করে তাহারাই পবিত্র ভাবিতে হইবে। নতুবা নাম অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

অসংলগ্ন

শ্রীদীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(এক)

চৈত্রের দুপুর। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, টু শব্দটী পর্য্যন্ত নেই। আমার নিরালা পর্ণকুটীরে আমি নিঃসঙ্গ একা। বসে বসে শুধু ভাবছি আর লিখছি—লিখছি আর ভাবছি। হঠাৎ খুট্ করে শব্দ হ'ল। চেয়ে দেখি দ্বারপ্রান্তে একজন অপরিচিতা তরুণী। বয়স আঠার উনিশ হবে। সদ্যস্নাতা, এলায়িত কেশ, মুখমণ্ডলে প্রসাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পরণে একখানা নীল রংয়ের শাড়ী। রক্তিম অধরে মৃদু মৃদু হাসি। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীতে চঞ্চলতার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে কোন কাব্যের নায়িকা বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চেয়ে আছি তার মুখের পানে—সেও চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব, নির্ব্বাক। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি যখন—দেখি সম্মতির অপেক্ষা না করে সে আমার শত ছিন্ন নোংরা বিছানার একাংশ অধিকার করে বসে আছে। আমি একেবারে অবাক্ বনে গেছি। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময়—

—মাফ্ করবেন, আপনার সম্মতি না নিয়েই অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি।—হেসে উঠলো সে।

—এতে মাফ্ চাইবার কি আছে বলুন? সরকারী বড়কর্তার খাসকামরা যখন এটা নয়—নিছক সহায়সম্বলহীন দরিদ্রের পর্ণকুটীর—তখন সেখানে প্রসিকিউসনের প্রশ্ন নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

—ভরসা তো ওইখানে। আবার সে হেসে উঠলো।

—তা যাক্ সে সব কথা। দয়া করে আপনার পরিচয়টা—

—জানবেন বৈকি, নিশ্চয়ই জানবেন। তবে আগে আপনার তরফ থেকে কিছু—

—জানতে চান বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

—বলুন কি জানতে চান আপনি?

—সারাদিন বসে বসে কি লেখেন আপনি বলতে পারেন?

—আপনি কি করে জানলেন, আমি দিনরাত বসে বসে শুধু লিখি।

—জানি বৈকি। নিশ্চয়ই জানি। রোজ দেখি সারাদিন বসে বসে কি লেখেন, আর মাঝে মাঝে চিন্তামগ্ন হয়ে ভাবেন। আপনি কি সাহিত্যিক?

—না, মোটেই আমি সাহিত্যিক নই।

—তবে?

—তবে তেমন কিছু নয়। ওটা আমার একটা বাতিক।

—বলেন কি! সারাদিন ধরে লেখা আপনার বাতিক!

—আশ্চর্য্য হচ্ছেন নাকি?

—হচ্ছি, ভীষণ রকমের আশ্চর্য্য হচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর খানিকটা আনমনাভাবেই বলে—একটা কথা কি জানেন?

—বলুন।

—আপনাকে দেখে ঠিক আমার একযুগ আগেকার সেই সব স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে। উঃ, এখন সে সব স্বপ্ন বলেই মনে হয়। সহসা বল্‌তে বল্‌তে সে থেমে যায়। মুহূর্ত্তে তার মুখখানি বেদনায় ম্লান, অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরও তেমনি তার হতাশাব্যঞ্জক। কোন আঘাত বোধ করি সে পেয়েছে। কেমন যেন শরম ও শঙ্কায় তার চোখের আনত দৃষ্টি নুয়ে পড়ে মাটিতে। মনে হয় সে যেন তার কোন মহাসত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমিই যেন তার সে ইপ্সিত লক্ষ্য বস্তু। আমার মনেও তখন সংশয়, বিস্ময় সব একে একে জমা হচ্ছে। বুঝতে পারছি আমি।......কিন্তু থাক্ সে সব।

(দুই)

ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। ছোট বলতে মানে আমার ষোল সতের বছর বয়সের কথা বলছি। পান্না, বেণু, সুমিত্রা—এরা সবাই তখন আমার মনের মাঝে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রার কথাই বলি আগে—শোন তোমরা। ভীষণ একরোখা মেয়ে অর্থাৎ তেজস্বিনী যাকে বলে। ওঃ! সেবার আমাকে পুলিশের হাত থেকে জবর বাঁচা

বাঁচিয়েছিল, নইলে—বুঝতেই পারছ? ১৯৩০ সালের কথা বলছি। স্বদেশী ডাকাতি আর সায়েব মারার হিড়িকে দেশ তোলপাড়। ছেলেরা সব জীবন পণ করে লেগেছে দেশ উদ্ধারের কাজে। ভারতবর্ষ থেকে যেমন করেই হোক্ ইংরেজ শক্তিকে নির্ম্মূল করতে হবে। সে কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক ভাঙ্গা পণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সেই কৃচ্ছ সাধনা ধ্যান-মৌন গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের মত যেমন স্থির অটল, তেমনি শুরু গম্ভীর। আর কি! আমিও ভীড়ে গেছি ঐ দলে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন জীবনদা। পাণ্ডা কথাটাকে তোমরা তাচ্ছিল্যের সাথে হেসেই উড়িয়ে দিও না যেন। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে নায়ক। যেমন রাজপুত্রের মত দেখতে,শক্তিও তেমনি অসাধারণ। সাহসের কথা আর বলতে হবে না।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। দলের নির্ম্মল এসে খবর দিল—নীলগঞ্জের পুলিশ সুপারকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে আজকের এই সুবর্ণ সুযোগ আদৌ হাতছাড়া করা উচিত নয়। শিকারী যেমন শিকার দেখলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, জীবনদাও তেমনি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে বল্লেন—'য়েস্—তাই হবে। শঙ্কর, বি রেডী কর লাইফ এণ্ড ডেথ্। প্রবোধকে তারা যে পথে পাঠিয়েছে আমরাও আজ তাকে সেই পথে পাঠাব।'

প্রবোধ ছিল দলের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী—জীবনদা'র প্রিয় শিষ্য। ভীষণ অনুগত ছিল। অমন তাজাসোনার ছেলেটাকে ঐ ডেভিলটাই তো সেবার হলদী-পুরের ডাকাতি কেসে গুলি করেছিল। ওঃ, সে কি নৃশংস দৃশ্য। গুলিটা প্রবোধের বুকে লেগেছিল কিনা। ফিন্কি দিয়ে রক্ত ঝরছিল ক্ষত স্থান দিয়ে। একেবারে তাজা রক্ত। জীবনদা ওকে তাঁর বলিষ্ঠ দু বাহুর ওপর নিয়ে চলেছেন। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে কালো মেঘ—গুরু গুরু ডাকছে—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গ্রামের পথ। উঁচু নীচু ঢিপি জঙ্গল আর বাঁশবন। বুঝতেই পারছো ব্যাপারখানা কি। জীবনদা প্রাণপণে ছুটেছেন ওকে নিয়ে। অকস্মাৎ দিঘল গাঁয়ের বাঁকের কাছে এসে জীবনদার চলা থেমে গেল। শিশুর মত সে ঘুমিয়ে পড়েছে জীবনদার কোলে।

শ্রাবণের ধারা সুরু হয়েছে তখন জীবনদার দু চোখ বয়ে। তবে সে ঠাণ্ডা নয়—স্নেহমিশ্রিত তপ্ত অশ্রু। আমরা জীবনদার কাছে শুনেছি, প্রবোধের যাত্রাপথের শেষ কথা কয়টা নাকি ছিল—'জীবনদা, চল্লুম। আবার ফিরে এসে আমাদের কাজের শেষ দেখতে পাব তো? হ্যাঁ, আর একটা কথা। মাকে কিন্তু এসব কথ্ খোন জানিয়ো না। আঘাত সইতে পারবেন না তিনি। সারাটা জীবন ধরে শুধু তাঁকে কষ্টই দিয়ে গেলাম জীবনদা। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো—প্রবোধ ভালই আছে। শীগ্গীরই ফিরে আসবে।'

আসবে বৈ কি! আসবে। প্রবোধ আসবে। পান্না, বেণু, সুমিত্রা, নির্ম্মল—এরা সবাই একদিন আসবে। হঠাৎ বাতায়ন পথে ভেসে এলো—'আসবে বৈ কি। তারা সবাই আসবে। কিন্তু যে পথে তারা একদিন এসেছিল সে পথে নয়—নূতন পথে।'

ধ্যানমগ্ন ছিলুম এতক্ষণ। চেয়ে দেখি সমস্ত প্রকৃতিটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। শুধু নিশীথের মুক্ত আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বল জ্বল করছে, আর দূরে—বহু দূরে 'চোখ গেল' পাখার করুণ বিলাপ ধ্বনি।

(তিন)

১৯৩৮ সাল। কর্ম্মীরা সব জেল থেকে বেরিয়েছে, নতুন চিন্তা ধারা নিয়ে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো তারা অগণিত কৃষক মজুরের মাঝখানে। আমিও মিশে গেছি তাদের মাঝখানটায়। এবার আমাদের কাজের সুরু। গ্রামে ফিরেছি। সভা হবে—কৃষক সভা। হাজার হাজার কৃষক দূর দুরান্তের গ্রাম থেকে আসছে দল বেঁধে আমার বক্তৃতা শুনতে। হাতে তাদের সর্ব্বহারার লাল পতাকা। বজ্রকণ্ঠে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে—'দুনিয়ার কৃষক মজদুর এক হও' 'ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক' 'জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। সভা আরম্ভ হ'ল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি—'কৃষক ভাই সব! কেন আজ তোমাদের এই অসহায় অবস্থা। খেতে পাচ্ছ না, পরতে পাচ্ছ না, মরতে বসেছ। চালে খড় নেই—গোয়ালে গরু নেই—গোলায় ধান নেই। হাল লাঙ্গল সব মরচে ধরে গেছে। স্ত্রীপুত্রের ইজ্জৎ ঢাকবার মত এক ফালি কাপড় [illegible]

রোজ সন্ধ্যে লাগতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে—তবুও এক ফোঁটা ওষুধ পাও না। রোগে ভুগে আজ তোমরা জীর্ণ শীর্ণ অস্থিকঙ্কালসার। ছেলেমেয়েরা চোখের ওপর মরে যাচ্ছে বিনা ওষুধে। অথচ কোন প্রতীকার নেই। জমিদার মহাজনের মোটা নজরানা থেকে সুরু করে তাদের মেয়ের বিয়ের টাকা, ধূর্ত্ত আমলা গোমস্তাদের হরেক রকমের পালপার্ব্বণী যোগাড় করতে আজ বাংলার কৃষক সর্ব্বস্বান্ত। এ ছাড়া পর্ব্বতপ্রমাণ জমির খাজনা তো আছেই। ভেবে দেখতো কি সাংঘাতিক কথা। তোমাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করে যারা বড় হয়েছে তারা কেউ রাজা, কেউ জমিদার, কেউ বা মহাজন! রক্ত দিয়ে গড়া তোমাদেরই অর্থে আজ তারা বড়লোক—ধনী। দুনিয়ার সকল সুখ সুবিধার আজ তারাই একমাত্র মালিক। আর তোমরা? তোমরা তাদের দাসানুদাস—গোলাম। তোমাদের আর মানুষ হ'বার যো নেই। আর কতকাল তোমরা এই নির্ম্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করবে? ভাই সব! মিছিল করে বেরিয়ে এসো আজ তোমরা। সমস্ত অন্তর দিয়ে ব্যক্ত কর তোমাদের পুঞ্জীভূত প্রাণের গোপন বেদনা। আজ ভাষায় প্রকাশ কর তোমাদের প্রাণের দাবী। মুক্ত কণ্ঠে বল—'আমরা মানুষ। মানুষের মত বাঁচতে চাই।'

দিগন্তে আওয়াজ উঠলো: 'দুনিয়ার সর্ব্বহারা কৃষক মজুর এক হও' 'ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক'। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা আমার রোমাঞ্চ দিয়ে উঠলো তীব্র উত্তেজনায়। থর থর করে আমি তখন কাঁপছি। একেবারে বেহুস্।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে।

(চার)

পান্না বেণু সুমিত্রা জীবনদা প্রবোধ নির্ম্মল। সোনারপুর গ্রাম। মুখুজ্জেদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর। নিশীথ রাত্রে কচুতলা পেরিয়ে গোপনে খিড়কি দরজায় চুপি চুপি ডাক—'সুমি—সুমি'। বাপের সাথে পান্নার ঝগড়া—বিয়ে কোরবো না বলে। বেচারী বরের বাপের বিফল মনোরথে চলে যাওয়া। বেণুর মাতৃ-বিয়োগ—একে একে সব মনে পড়ছে। কোথায় গেল সে সব দিন। দেখা হলে চিনতে পারবে কি তারা? তন্ময় হয়ে ভাবছি কেবল। হঠাৎ আওয়াজ এলো কানে: শঙ্কর—শঙ্কর আছ নাকি! এ কি! কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। বাইরে এলাম।

—আরে নির্ম্মল যে! তুই কোথেকে?

—আবার কোথেকে—একেবারে সরকারী খাসমহল থেকে—বলে নির্ম্মল হাসতে হাসতে।

—আয়, আয়, ঘরে আয়, কতকাল পরে দেখা। কত কথা যে জমা হয়ে আছে রে ভাই। ফোয়ারার মত ফুটে বেরুতে চাচ্ছে।

নির্ম্মল বলে—খুব ডুব মেরেছিলে যা হোক। খুঁজেই পাওয়া যায় না।

—তা কি করে খোঁজ পেলে আমার?

—সে অনেক কথা।

—তারপর জীবনদা আজকাল কোথায়?

—কেন তিনি তো রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। চিঠি পেয়েছি ক'দিন আগে। কেমন যেন আল্‌গা ভাবে নির্ম্মল কথাটা বলে।

আবার সেই অপরিচিতা মেয়েটী এসে উপস্থিত।—'চিনতে পার শঙ্করদা?' মুখ টিপে হাসতে থাকে মেয়েটী। অবাক হয়ে আমি বলি—'না।'

নির্ম্মল হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—'চিনলে না ওকে? ও যে সুমিত্রা—আমাদের সুমি।' বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শঙ্কর চেয়ে থাকে সুমিত্রার পানে। তারপর বলে—'সুমিত্রা! আমাদের সুমি!' বিস্ময় উল্লাসে জ্বলতে থাকে শঙ্করের চোখ দুটী। বিশ্বাস হচ্ছে না এমনি যেন তার ভাব।

—'হ্যাঁ গো শঙ্করদা! এখনও চিনতে পারলে না বুঝি? সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তবে সাহস করে কিছু বলি নি।'—জিজ্ঞেস করে দেখ নির্ম্মলদাকে।

অমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শঙ্কর নির্ম্মলের পানে তাকায়। নির্ম্মল হাসতে হাসতে বলে—প্রথমে সুমির কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও নাছোড়বান্দা। বলে, শঙ্করদা ছাড়া আর কেউ নয়। অবশেষে আমি বল্লাম—চলো তা হলে দেখেই আসা যাক্। তারপর দেখতেই তো পেলে

শঙ্কর তখন সুজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—সত্যি ভগবান বোধ করি আমাদের নাটকীয় উপাদানে গড়েছিলেন। নইলে এমনি ভাবে আমাদের দেখা হবে—স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি।'

—আমিও কোনদিন ভাবিনি শঙ্করদা। তুমি এই নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন করে আছ। ঘটনাচক্রে আমাকে আসতে হবে কাকাবাবুর বাড়ীতে। নির্মলদা এসে জুটবে এখানে। আবার আমাদের হারানো দিনের বিচ্ছিন্ন যোগসূত্র নূতন করে যোজনা হবে—সুদূর বাংলার এই নির্জ্জন পল্লীতে।······

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসে। তবুও চলতে থাকে ওদের কথাবার্তা অবিশ্রান্ত গতিতে। যেন কত শতাব্দী ধরে মানুষের অব্যক্ত বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা এক এক করে জমা হয়েছিল ওদের মনে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত কথার বাণে আজ তা প্রকাশ পাচ্ছে। সুমিত্রা বলে চলে—আর কতকাল এই অত্যাচার নির্য্যাতন চলতে থাকবে। কবে এ কালরাত্রির শেষ হবে শঙ্করদা। আবার কবে আমরা নূতন প্রভাতের মুখ দেখতে পাব। যেদিন মানুষে মানুষে হানাহানি, স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝগড়া, বিসম্বাদ, রক্তাক্ত ধরিত্রীর পঙ্কিলতা পাপ—এ সব কিছুই থাকবে না। সব ধুয়ে মুছে যাবে। বলতে বলতে সুমিত্রার চোখে জল আসে।

—সেদিনের আর দেরী নেই বোন্। কালরাত্রি শেষ হয়ে এলো। ঐ নূতন প্রভাতের সামনে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর বেশী দূরে নয়। ভয় পাস নে যেন কোন রক্তাক্ত পথ দেখে।······এগিয়ে চল্।

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ (১)

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ নেতা উ-আউঙ্গসানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হয়। ফ্যাসিবিরোধী গণস্বাধীনতালীগের সভাপতি ও তথাকার অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ভাইস চেয়ারম্যান উ আউঙ্গসান ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর সকল সদস্য গত ১৯শে জুলাই অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এই বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের সংবাদে এশিয়ার প্রত্যেকটা দেশ শোকে মুহ্যমান। দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীর সন্তানের অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী তার হৃদয়ের অন্তস্তল হতে সহানুভূতি জানাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর স্বাধীনতালীগের সহসভাপতি থাকিন নু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আশা করি তিনি তাঁর প্রিয় নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রহ্মকে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতার স্বপ্ন-মাখা চোখ তুলে চায় মহাকাশের পানে। দিকে দিকে উঠে জয়গান। মহাকালের রথ তাদের জয়যাত্রার সহায়ক। বিশ্বের রাজনীতির সভামঞ্চে ইউরোপ চারিশত বৎসর প্রাধান্য বিস্তার করে ভেবেছে এ আসনে তাদেরই শাশ্বত অধিকার। এশিয়ার নব জাগরণে তাদের এ ভুল ভাঙছে। তবুও চেষ্টা করছে তারা নানা ভাবে এই প্রাধান্য বজায় রাখতে। কিন্তু হার মানতেই হবে তাদের, বিদায় নিতে হবে তাদের এশিয়া থেকে। এখনও ক্ষীয়মান শক্তি নিয়ে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদের সাম্রাজ্য বজায় রাখবার উদ্যমের অন্ত নেই। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ, ইন্দোচীনে ফরাসী এবং ভারত ও ব্রহ্ম দেশে ইংরাজ কোটী কোটী লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। গণদেবতার রুদ্ররোষ যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন এক নিমেষে তাদের এই খেলা ধ্বংস হবে।

বহু দরকষাকষি ও কূটনৈতিক ধাপ্পাবাজীর পর বৃটেন ভারতকে ডোমিনিয়ান শাসন মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুর্ব্বলতা সৃষ্টির প্রয়াসে ক্ষান্ত হয় নি। খণ্ডিত ভারতের একাংশে (পাকিস্থান) ঘাঁটি নির্ম্মাণের ভরসা ইংরাজ এখনও রাখে। এই ভেদনীতিই ইংরাজের চরম অস্ত্র। তবে ভারতের দিগন্ত রেখায় যে বিরাট সম্ভাবনার দ্যুতি আত্মপ্রকাশ করছে তার বিপুলছটায় একদিন সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হবে। ভারত আবার বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে।

ভারতের মত ব্রহ্ম দেশেও বৃটেন ডোমিনিয়ান শাসন ব্যবস্থা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ব্রহ্মের গণপরিষদ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম দেশের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ হলেই তার স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীন ব্রহ্ম বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকার কিংবা বৃটেনের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ব্রহ্মের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাসমরের রণ বাদ্যের

অন্তরালে। ১৯৪৪-৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ব্রহ্ম দেশের ভিতর দিয়ে ভারত সীমান্তে এসে ভারতকে উদ্ধারের জন্ম অভিযান চালাচ্ছিলেন সেই সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠে ব্রহ্মের জনগণের স্বাধীনতা লীগ। ষাট বৎসরের পরাধীনতার যবনিকা ভেদ করে এই সময় তাদের চক্ষে স্বাধীনতার আলো উদ্ভাসিত হয়, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ তারা পায়। স্বল্পকালস্থায়ী স্বাধীনতা তাদের মধ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প এনে দেয় বিদেশী শাসক বিতাড়নের কাজে। জাপানীরা ব্রহ্ম দখল করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বর্ম্মীদের ক্ষেপিয়ে তোলে, আধুনিক রণ বিদ্যায় শিক্ষিত করে। জাপানীরা ভেবেছিল যে বর্ম্মীরা ইংরাজ তাড়ালেও তাদের তাড়াবে না। কিন্তু স্বাধীনতার মুখ যারা দেখেছে তাদের কাছে সব বিদেশী শাসকই সমান—ইংরাজও তাদের কাছে যে বস্তু, জাপানীও তাই। বর্ম্মীরা তাই স্বাধীনতার সঙ্কল্প নিয়ে দলে দলে যোগ দিলে ফ্যাসী-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা-লীগে। এক তরুণ এই দলের নেতা। তিনি হলেন জেনারল আউঙ্গ সান। বাল্যকাল থেকেই আউঙ্গ সানের হৃদয়ে দেশ প্রেমের বহ্নি জ্বলে উঠে। রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ই তিনি ব্রহ্মের যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যুব আন্দোলনের প্রতিনিধি রূপে ১৯৪০ সালে তিনি রামগড় কংগ্রেসে যোগদান করেন। জাপানীদের ব্রহ্ম দখলের পূর্ব্বেই ১৯৪১ সালে এই বিপ্লবী নেতা যান টোকিওতে। সেখানে সমর বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি অল্পকালের মধ্যেই মেজর জেনারেল পদ-লাভ করেন।

জাপান থেকে ফিরে এসে আউঙ্গ সান দেখলেন জাপানীরা ইংরেজ তাড়িয়ে ব্রহ্ম অধিকার করে বসে আছে। জাপানীরা 'এসিয়া এসিয়া-বাসীদের জন্ম' শ্লোগান তুলে বর্ম্মীদের সহায়তায় ডাঃ বা-মকে প্রধান মন্ত্রী করে এক মন্ত্রিসভা গঠন করে বর্ম্মা শাসন করতে লেগেছে। আউঙ্গ-সান এই মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে মনে আশা ছিল যে জাপানীরা ব্রহ্ম দেশকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু শীঘ্রই তার ভুল ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন যে ইংরেজ ও জাপানীতে প্রভেদ নেই। তখন তিনি গোপনে গোপনে স্বেচ্ছা-বাহিনী গঠন করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালাতে লাগলেন। বর্ম্মার গ্রামাঞ্চলে জাপ সৈন্তেরা কোথাও কোন প্রকার অত্যাচার করলে এই স্বেচ্ছাবাহিনী নিষ্ঠুর ভাবে তার প্রতিশোধ নিতে লাগল। ক্রমে এই স্বেচ্ছা-বাহিনী জাপসেনাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল। এই থেকেই বর্ম্মার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল ফ্যাসী-বিরোধী জনগণের স্বাধীনতা-লীগ গড়ে ওঠে।

ব্রহ্মের জনগণ তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তির বিকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তাই তারা ধীরে ধীরে আউঙ্গ সানের স্বাধীনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত হ'ল। যুবার দলের সাথে সাথে প্রবীণের দলও এই তরুণ নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলে। আউঙ্গ-সান তখন মাত্র ত্রিংশবর্ষীয় যুবা। এই তরুণ নেতা কি করে যে ব্রহ্মের জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অমলিন দেশপ্রেমই তাঁকে এই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে। বাল্যকালেই আউঙ্গ সান ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের মহান নেতাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলালের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাধনায় যে তিনি সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হয়েছেন সমগ্র দেশের চিত্ত জয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা লীগ ব্রহ্মে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টগণও এই দলে যোগদান করে এর শক্তিবৃদ্ধি করেন।

এদিকে ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জাপানীদের কাছ থেকে ব্রহ্ম পুনরধিকার করে। ইংরাজ আবার তার শাসন কায়েমের চেষ্টায় ব্রতী হয়। অল্পকালের মধ্যেই তারা টের পায় যে ১৯৪৫ সালের ব্রহ্মের রূপ ১৯৪২ সালের থেকে অনেকখানি বদলে গেছে। এই তিন বৎসর কাল ধরে ব্রহ্মকে আধুনিক যুদ্ধের সকল প্রকার ধ্বংসকর অস্ত্রের ক্ষত-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করতে হয়েছে। ইংরেজ তাড়াবার জন্ম প্রথমে জাপানীরা দেশের যথেচ্ছ ক্ষতি সাধন করেছে। আবার জাপানী তাড়াবার জন্ম ইংরেজও ততোধিক ক্ষতি সাধন করেছে। দুই পররাজ্যলোভী শক্তির নির্ম্মম দাপটে নিরীহ দেশের এই ভাবেই সর্ব্বনাশ হয়। জাপ ও বৃটীশ অভিযানের ফলে ব্রহ্মের বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত জনগণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। বনজ, খনিজ প্রভৃতি পণ্য ও কৃষিজাত সম্পদ হারা হয়ে অন্নপূর্ণা ব্রহ্মকে হা-অন্ন হা-অন্ন করতে হয়েছে।

এহি দুর্দ্দিনে ব্রহ্ম পুনরধিকার করে ইংরাজ ১৯৪৫ সালে ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিণতি বর্ণনায় যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ করলেন ব্রহ্মবাসী তাতে আলোর তুলনায় আঁধারই দেখলে বেশী। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সেদিন একথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরাগ্নি তাঁদের শোষণ বৃত্তির দাহিকা শক্তিকে ধ্বংস করেছে। তাই ব্রহ্মে বৃটীশ শোষণ অব্যাহত রাখবার চেষ্টায় হোয়াইট পেপারে ব্রহ্মের সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিনাশ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করবার শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি জানান হল না।

ব্রহ্মে এই সময় স্বাধীনতা লীগ ছাড়া আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে মায়োচিত, দোবামা ও মহাবামা দলের নাম উল্লেখযোগ্য। মায়োচিত পার্টি গড়ে উঠে ব্রহ্মের প্রবীণ নেতা উ-স'র নেতৃত্বে, দোবামা (অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশ ব্রহ্মবাসীদের) পার্টি থাকিন-বা-সীনের নেতৃত্বে এবং মহাবামা (অর্থাৎ বৃহত্তর ব্রহ্ম) ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বে। এই সকল দল থাকলেও স্বাধীনতা লীগ যে ভাবে দেশের জনগণের উপর প্রাধান্ত বিস্তারে সমর্থ হয় এর কোনটাই তার কাছ দিয়েও যেতে পারে না। ভারতের সমগ্র দেশের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যেমন কংগ্রেস, ব্রহ্মের স্বাধীনতা লীগও তদ্রূপ।

জাপ আক্রমণকালে পলাতক গভর্ণর স্যর রেজিন্যাল্ড ডর্ম্যান স্মিথ বৃটীশ গভর্ণমেন্টের বিঘোষিত হোয়াইট-পেপারের শাসন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তিনি তার শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করলেন কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল বৃটীশ খেতাবধারী নেতা ও মায়োচিত পার্টির কয়েকজন দলত্যাগী নেতাকে নিয়ে। বর্ম্মীরা এই অপদার্থ গভর্ণরটিকে সুনজরে দেখতে পারে নি। আর তিনি যে ভাবে শাসন পরিষদ গঠন করলেন তাতে তারা মোটেই তুষ্ট হ'তে পারে নি। তারা দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু ক'রে দিলে। জাপানীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছিল। অস্ত্রের সাহায্যে সমগ্র দেশে তারা অরাজকতার সৃষ্টি করলে। আউঙ্গ সান সুযোগ বুঝে কর্ম্মক্ষেত্রে নামলেন। দিকে দিকে অরাজকতা ও ধর্ম্মঘট ব্রহ্মের শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিলে। ডর্ম্যান সাহেব তার সাম্রাজ্যবাদী প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অরাজকতা দমনে প্রবৃত্ত হলেন। বৎসরাধিক কালের চেষ্টাতেও তিনি কোন সুরাহা করতে পারলেন না। জনগণের সহযোগিতায় বঞ্চিত হয়ে ডর্ম্যান সাহেব শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন।

বৃটেনে শ্রমিক সরকার ব্রহ্মের এই অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। তারা বুঝলেন যে স্বাধীনতা লীগের সহায়তা ব্যতীত ব্রহ্মে এখন আর শাসন কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তখন তাঁরা স্বাধীনতা লীগ ও লীগের নেতা জেনারেল আউঙ্গ সানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। স্যর রেজিন্যাল্ডকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে স্যর হিউবার্ট র‍্যান্সকে গভর্ণর করে পাঠালেন। তিনি এসে জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে শাসন পরিষদ ঢেলে সাজলেন। জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সম-সাময়িক। ব্রহ্মের শাসন কার্য্যে এই সরকারের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হল। স্বাধীনতা লীগ কিন্তু তাতে তৃপ্ত হতে পারলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে তারা ঘোষণা করলেন এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে হোয়াইট-পেপার প্রত্যাহারের জন্য তারা এক চরমপত্র দিলেন।

এই দাওয়াইতে বেশ চমৎকার কাজ হল। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে ব্রহ্ম দেশের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হল। বর্ম্মীরা ইচ্ছা করলে বৃটীশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে পারে অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে। ব্রহ্মবাসীরা তাদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করলেই তাদের নিকট পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই ঘোষণায় ব্রহ্মবাসীরা আনন্দিত হল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে ব্রহ্ম প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চালালেন। এর ফলে এটলী-আউঙ্গ সান চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এতে ঠিক হল যে ব্রহ্মেও ভারতবর্ষের মত গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদ স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার শাসন কাজ চালাবেন। এই সরকার ডোমিনিয়ন সরকারের মর্য্যাদা পাবে। দোবামা ও মায়োচিত পার্টির নেতৃদ্বয় থাকিন-বা-সীন ও উ-স আলোচনাবাসে প্রতিকূল মনোভাব না দেখালেও শেষ মুহূর্ত্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরে অস্বীকৃত হলেন। তা সত্ত্বেও এটলী-আউঙ্গসান চুক্তিই কার্য্যকরী করা হল।

ভারতের ন্যায় এখানেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভেদনীতির আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। আউঙ্গ সান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করবার পর বর্ম্মী কম্যুনিষ্ট দল স্বাধীনতা লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিরোধিতা করতে থাকে। মায়োচিত ও দোবামা পার্টিও স্বাধীনতা লীগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। পরাধীন দেশে ভেদী বাহকের অভাব হয় না। এই সকল দল ছাড়াও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের পার্ব্বত্য জাতিগুলি সম্পর্কে মাইনরিটি সংরক্ষণের ধুয়া তুললেন।

বৃটীশ জাতির একটা মস্ত গুণ যে অতি সহজ সমস্যাকেও তারা অতীব জটিল করে তুলতে পারেন। বর্ম্মাতেও তারা জাতীয়তার সহজ রাস্তা ছেড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মেও ভারতের মত নানা জাতির বাস। ভারতবর্ষ যেমন জাতি হিসাবে হিন্দুদেরই দেশ, ব্রহ্মদেশও তেমনি বর্ম্মীদের। তবে ভারতের নানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত সান, কাচিন, চিন প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগুলি এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সর্ব্বোপরি ভারতের মুসলমানদের মত ব্রহ্মে রয়েছে কারেন জাতি। ভারতের মুস্লিম লীগের মতই কারেন সম্প্রদায় বৃটীশ অনুগ্রহ-পুষ্ট। তাই ব্রহ্মের আইন সভায় সংখ্যানুপাতে কারেনরা মাত্র বার জন প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী হলেও গণপরিষদে তাদের দেওয়া হয়েছে ২৪টি আসন। সান সর্দার ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি গুলির জন্য ৪৫টি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ব্রহ্মে বৃটীশের ভেদনীতি ততটা সফল হয় নি। দেখা গেছে যে পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধিগণও জেনারেল আউঙ্গ সানেরই সমর্থক। সীমান্তের অধিবাসিগণও স্বাধীন ব্রহ্মের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়।

ব্রহ্মের বড় সৌভাগ্য এই যে সেখানে পাকিস্থান সৃষ্টিকারী, বৃটীশের পদলেহনকারী প্রতিক্রিয়াশীল জিন্না নাই, হায়দরাবাদের মত প্রভুত্বপ্রয়াসী রাজন্য নাই। ব্রহ্মের জনসাধারণের পক্ষে তাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা অর্জনও তাই অনায়াসলব্ধ হবে বলেই মনে হয়। গণপরিষদের নির্ব্বাচনকালেও জনগণের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। পরিষদের ২১০টি সাধারণ আসনের মধ্যে স্বাধীনতা লীগের প্রার্থিগণ দুইশ৹টি দখল করেছেন।

গত ১০ই জুন নব-নির্ব্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন বসে। ব্রহ্মের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৬ই জুন স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং ব্রহ্মের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভাইস-চেয়ারম্যান উ আউঙ্গসান ব্রহ্মে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ব্রহ্মকে ব্রহ্মদেশীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে অভিহিত

করা হয়। ব্রহ্ম গণপরিষদের এই অধিবেশন ১০ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মের স্বাধীনতা ঘোষণার দৃঢ় ইচ্ছা জ্ঞাপন করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেই ব্রহ্মবাসীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রকটিত হয়েছে।

সমগ্র ব্রহ্ম আজ স্বাধীনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। চক্ষে তাদের স্বাধীন ব্রহ্মের স্বপ্ন, বক্ষে তাদের অসীম সাহস, মনে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। তাদের এই সঙ্কল্পের সমক্ষে বৃটেনকে নতি স্বীকার করতেই হবে। আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রহ্মে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিল কমন্স সভায় গৃহীত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ব্রহ্মবাসিগণ আজ স্বাধীনতার দ্বারে সমাগত। ভারতের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রে স্বাধীনতার নবজন্ম সার্থক হোক প্রত্যেক ভারতবাসীই তা কামনা করে।

বিশুদা

শ্রীশান্তশীল দাশ

রবিবারের বিকেল।

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলেছি রাস্তা দিয়ে। রাত পোহালেই আবার সুরু হবে সেই গতানুগতিক জীবনযাত্রা ; তাই ছুটীর দিনের শেষ সময়টা কিছু উপভোগ করে নিচ্ছি। পকেটে পয়সার অভাব, তা' না হলে আরও ভাল ক'রে উপভোগ করা যেত এই রবিবারের বিকেলটা—সিনেমা কী থিয়েটার দেখে। কিন্তু তা' যখন সম্ভব নয়, তখন বিনা পয়সায় বেড়িয়ে বেড়ান ছাড়া গতি কী ?

চলেছি রাস্তার দু'পাশের দোকানের সারি দেখতে দেখতে। কত বিচিত্র জিনিষে ভরা এই সব দোকানগুলো, আর তা'তে ভিড় করে রয়েছে কত রকমের মানুষ। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, বিচিত্র তাদের ভাবভংগী। তাদের পানে তাকালে বোঝা যায় না কে কোন শ্রেণীর মানুষ।

হঠাৎ কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠ্‌লো : অনু !

পিছনে তাকিয়ে একবার ভাল ক'রে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম। কই, কাউকে তো নজরে পড়লো না। বোধ হয় ভুল শুনেছি। এমন সময় কেই-ই বা ডাক্‌বে। আবার চল্‌তে সুরু করলুম সেই বিচিত্র জনতার মধ্য দিয়ে।

কানে আবার ডাক এল। এবার একটু জোরে : অনু, এদিকে। শব্দ অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি একটা ছোট পুরান বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে বিশুদা'। হাতে একখানা বই নিয়ে পড়ছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম দোকানের কাছে। বিশুদা'র পাশে গিয়ে জিগ্যেস করলুম : বিশুদা' কবে ফিরলেন ?

বিশুদা' খুব মনোযোগ দিয়ে বইখানার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে বল্‌লেন : দাঁড়া, সব বলছি, আর একটু বাকী আছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম তিন চার মিনিট। বিশুদা' তাঁর পড়া শেষ করে বইখানা দোকানদারকে ফেরৎ দিয়ে বল্‌লেন : চ, বেড়াতে বেড়াতে সব বলছি।

বাইরে এসে আমরা চল্‌তে সুরু করলুম। বিশুদা' বল্‌লেন : বইখানা বেশ ভাল বই রে, হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, তাই পড়ে ফেললুম। তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন : আর কেনবার মত পয়সাই বা কোথায় যে কিনে পড়বো ! এই রকম করেই···কী বলিস্ ? পড়াতো হ'লো।

জানতুম এ রোগ বিশুদা'র অনেক দিনের। এরকম করে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত বই যে বিশুদা' শেষ করেছেন তা' হয়তো গুণে শেষ করা যায় না। তাই সেকথা চাপা দিয়ে বল্‌লুম : তাতো হ'লো, কিন্তু আপনি ছাড়া পেলেন কবে ? বাড়ীর সব খবর কী ?

দাঁড়া, সব আস্তে আস্তে বলছি। অত ব্যস্ত কেন ? তারপর দু'চার পা এগিয়ে গিয়ে—বল্‌লেন : পকেটে পয়সা আছে ? চীনেবাদাম কেন্, বেশ খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আমার পকেট তো গড়ের মাঠ। বিশুদা' হাসতে লাগলেন।

ফুটপাথের পাশে এক চীনেবাদাম'ওলার কাছ থেকে চার পয়সার বাদাম কিন্‌লুন। বিশুদা'র হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বল্‌লুম : চলুন, এক জায়গায় বসা যাক্ ; বসে বসে বেশ গল্প শোনা যাবে।

না, না, চল্‌তে চল্‌তেই বেশ হবে'খন। কিন্তু বাদাম

সব আমায় দিলি। হাত পাত, দু'জনেই খেতে খেতে
করা যাবে। বিশুদা' আমার হাতে কতকগুলো বাদাম
ল দিতে দিতে বললেন: ছাড়া তো পেলুম, কিন্তু ভারি
মলে পড়ে গেছি রে।

কী মুস্কিল? আমি একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিগ্যেস
লুম।

মুস্কিল আবার কী? পয়সার অভাব। জোগাড় করা
কী করে বল্‌তো? বিশুদা' একটু হেসে আমার দিকে
কালেন। রাজ-অতিথি হয়ে ছিলুম ভালো। বিশুদা'
বার আরম্ভ করলেন। ভাবনা চিন্তে বিশেষ ছিল না।
ন্তু এখন তো আর তা চল্‌বে না! ছেলে, মেয়ে, বউ;
দের সব খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো? আর নিজেও
টা খেতে হবে।

এখন করছেন কী? আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম।

করবো আর কী; সবে তো ছাড়া পেয়েছি এই সাত
। তা যাই হোক, গাঁয়ের লোক একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করে,
ই এর মধ্যেই দুটো টুইশানি পেয়ে গেছি। গোটা
াশ টাকার মত পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দুর্দিনে এই
া টাকায় কীই-বা হবে? বিশুদা'র কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌লো
রুণ সুর।

একটু আশ্বাস দিয়ে বললুম: এই তো সবে বেরিয়েছেন;
কটু চেষ্টা করলে একটা না একটা কিছু পেয়ে
বেন নিশ্চয়ই।

যাকগে, যা হোক একটা হয়ে যাবে; ভাবলে কী আর
াব মিটবে? কী বলিস? বিশুদা'র কণ্ঠে আবার
ভাবিক স্বর ফিরে এলো। বিশুদা' বাদাম চিবুতে
গলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে আমরা পাশাপাশি চল্‌তে লাগলুম।
শুদা' আবার সুরু করলেন: কী বরাত করেই এসেছিল
লেমেয়েগুলো। আমার কাছে এসে না পেলে একদিন
ল করে খেতে, না পেলে একটু ভাল পরতে।

কথার মোড় ঘুরাবার জন্যে বললুম: বিশুদা' আপনার
লের বয়েস কত হ'ল? ছেলেই তো আপনার
, না?

না, মেয়েই এখন বড়। অবশ্য ছেলেটা বেঁচে থাকলে
ই-ই বড় হ'ত। তা', তার বয়স প্রায় চোদ্দ পনের বছর
হত বৈ কী? বিশুদা'র কণ্ঠস্বরে বেশ একটু বিষাদের
আভাস ফুটে উঠ্‌লো!

মেয়ের নাম আপনার দুর্গা, না? কতদিন আগে
তাকে দেখেছিলুম। সেটা এখন কত বড় হ'ল বিশুদা'?
আবার জিগ্যাসা করলুম।

তা' এই বার পেরিয়ে তেরয় পড়েছে। শুধু রূপে
নয়, মেয়ে আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী। বিশুদার স্বরে স্নেহ
উপচে উঠ্‌লো। এর মধ্যেই সব সংসারের কত কাজ
শিখে ফেলেছে। আমার স্ত্রীর মাঝে অসুখ করেছিল।
শুনলুম, মা আমার একাই রুগীর সেবা থেকে সুরু করে
যাবতীয় কাজকর্ম করেছিল।

মেয়েকে লেখা পড়া শেখালেন না কেন?

পয়সার অভাবে আর স্কুলে দিতে পারলুম কই? তার
পর একটু থেমে বিশুদা বললেন: তা, তার মার কাছ
থেকে যা শিখেছে, স্কুলে দিলে তার বেশী কিছু শিখ্‌তো
বলে তো আমার মনে হয় না। বাংলা তো বেশ ভালই
জানে। সংস্কৃতও কিছু কিছু শিখেছে। আমি আর
তাকে কাছে পেলুম ক'দিন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই
তো কাটলো রাজ-অতিথি হ'য়ে। বিশুদা হাসলেন।

মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো? তার কী ব্যবস্থা
করছেন? এখন থেকেই তো চেষ্টা চরিত্তির করতে হবে।

অত্যন্ত নিশ্চিন্ত স্বরে বিশুদা উত্তর দিলেন: সে ভাবনা
ভাবি না। ছেলে আমার ঠিক হ'য়ে আছে?

কী রকম? একটু উৎসুক হ'য়ে জিগ্যেস করলুম।

পাড়ায় একটা ছেলে আছে, এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে।
পাশ করে যাবে। বেশ ছেলে, মা বাপ কেউ নেই।
পিসীর কাছে মানুষ হয়েছে। অবস্থা বিশেষ ভাল
নয়; তা হোক, ছেলেটি কিন্তু সত্যিই ভালো।
এই পর্যন্ত বলে বিশুদা একটু থামলেন। দু' চারটে
বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে আবার সুরু করলেন:
জানিস্ অন্তু, ছেলেটিকে আমার ভারি ভালো লাগে।
এই বয়সেই পরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শিখেছে। যখন যে
অবস্থায় তার কাছে যাও, সে না বল্‌বে না। অবশ্য অর্থ
সাহায্য করার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু এ ছাড়া নিজের
ক্ষতি স্বীকার করেও অপরের উপকার করবে। এটা কী
মানুষের কম গুণ মনে করিস? আর এমন আশ্চর্য যে

এ সম্বন্ধে সে একটুও সচেতন নয়। পরের উপকার করছে বলে যে সে উপকার করে, তা নয়; না ক'রে সে থাকতে পারে না বলেই যেন সে ক'রে। কার বাড়ীতে রোগীর সেবা করার লোকের অভাব, কার বাড়ীতে মড়া-ফেলার লোক জুটছে না, এ সব কাজে সে যেন পা বাড়িয়েই আছে।

কিন্তু তার হাতে মেয়ে দেবেন, আর্থিক অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখবেন না, যথন জানছেন অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, একটু দ্বিধার সংগে বললুম।

জানিই তো তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু ওই একটা দোষ ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই, আমি বেশ জোর করে বল্‌তে পারি। একটু জোরের সংগেই বিশুদা বললেন। তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগলেন: কিন্তু অভাব তো মানুষের সংসারে নতুন নয়, অনু। এই আমার কাছেই বা মেয়ে কী সুখে আছে। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না, এ তো তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সেই জন্তেই তো আপনার উচিত মেয়েকে এমন ঘরে দেওয়া, যেখানে খাওয়া পরার অভাব হবে না।

মানুষের খাওয়া-পরাটাই বড় কথা হ'ল। বিশুদা একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন: তুইও এমন মুখ্যুর মত কথা বললি অনু। শুধু এই একটা দোষের জন্তে আমি এমন ছেলে হাতছাড়া করবো?

অবাক হ'য়ে বিশুদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। যে অভাবের জন্ত কিছুক্ষণ আগেও বিশুদা'র মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখেছিলুম, সেই অভাবকেই বিশুদা' এমন তাচ্ছিল্য করে উঠলেন। আশ্চর্য! জেনে শুনে মেয়েকে অভাবগ্রস্ত ছেলের হাতে তুলে দিতে একটুও দুঃখ বোধ করে না। সত্যিকারের মনুষ্যত্বের কাছে এরা সব কিছু বলি দিতে পারে। অথচ বিশুদা'র সংস্পর্শে যেই এসেছে, সেই জানে কী অপরিসীম স্নেহই না লুকিয়ে আছে ওর অন্তরে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিশুদা' আমাকে বোঝাবার সুরে বললেন: তুই একবার ভেবে দেখ অনু, যে মানুষ নিজের সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করে অপরের মংগল করতে ছোটে সে কী সাধারণ মানুষ; এমন ছেলের হাতে-পড়া যে-কোন মেয়েরই ভাগ্যের কথা। তুই যাই বলিস্ অনু, এ ছেলে আমি হাতছাড়া করবো না।

মনে মনে বুঝলুম, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা উচিত হবে না। বিরুদ্ধে বললে বিশুদা'র আদর্শে আঘাত লাগবে, আর পক্ষে বললে বিশুদা উৎসাহিত হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকতে সুরু করবেন। তাই এ প্রসংগ চাপা দিয়ে বললুম: আচ্ছা বিশুদা', আপনার সেই আগেকার কাগজের অফিসের চাকরীটা চেষ্টা করে দেখুন না?

বিশুদা' সচকিত হ'য়ে বলে উঠলেন: ভাল কথা মনে করে দিয়েছিস্ অনু, আজ সেই উদ্দেশ্তেই সহরে এসেছি। দেখ্‌তো তোর ঘড়িটায় কটা বাজলো? সাতটার সময় দেখা করার কথা আছে।

পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে বললুম: এখনো ঢের সময় আছে; এই সবে সাড়ে ছটা।

তবে আমি চললুম। বিশুদা' তাঁর গন্তব্যপথের দিকে চল্‌তে সুরু করলেন।

আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম।

মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

মধ্য ভারতের গ্রামাঞ্চলে অজস্র লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই লোক-গীতিগুলি বংশ-পরম্পরা গায়কদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই লোক-সঙ্গীতগুলি ভারতবর্ষের বৃহত্তর লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনাক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান। ভারতবর্ষের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনা ক্ষেত্রেও এই লোক-গীতিগুলির একটী বিশিষ্ট মূল্যবান স্থান রহিয়াছে। এখানে উদ্ধৃত লোক-সঙ্গীতগুলি জব্বলপুর বিভাগের গ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

দেবদেবী বিষয়ক সঙ্গীত—

শিব, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর কথা বাংলার লোক-সঙ্গীতের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। তদনুরূপ মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীতে গণপতি, চণ্ডী, শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়। পল্লী-গায়কেরা গণপতি, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীবিষয়ক সঙ্গীতগুলি সাধারণতঃ 'ভজন' সুরে গাহিয়া থাকে। এখানে এই ধরণের তিনটী লোক-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

(১) গণপতি

শ্রীগণেশ গিরজা সুবন মঙ্গল কে দাতার।
জো কারজ হম করত হৈ তুম্হারে আধার॥
অশুভ হরণ মঙ্গল করণ শ্রীগণেশজী ভগবান।
কবিতা কছু করণ চাহুঁ পরবহু অনুচর জান॥
নিজ ভরীস কছু নহীঁ নিজ করকে বিশ্বাস।
সরণ পড়ে প্রভু আপকে লাজ তুম্হারে হাম॥
জ্ঞান ধ্যান বল বুদ্ধি নহিঁ ন ধন ন দান উদার।
মো পাতক কী অপরাধ কো তুম্হি করো নিস্তার॥

(২) চণ্ডী

জগদম্বা অতি সুকুমার চণ্ড আউর মুণ্ড ঘাতনী।
ফাগ তুম্হারী কহোঁ গড় পার্ব্বতী কী বাসনী॥
রহী মাত প্রসন্ন চণ্ডী মহারাণী।
করতী সদা সহায় মোহি আপনা জন জানী॥
মুরখ মতী হৃদয় কে দেব হিরদে মে জ্ঞান।
মন সে জো গাইব তুম্হে পাবৈ সভা মে মান॥
পাবৈ সভা মে মান হার কভু ন মানে।
গাবৈ আউর বজাবৈ সদা তেরী গুণ গাবৈ॥

(৩) শঙ্কর-পার্ব্বতী

সাজে সব সিঙ্গার জহাঁ শঙ্কর জী বিরাজে।
সমাজ দেবতা বসী বহাঁ ইন্দ্রাদিক রাজে॥
মাথে পে চন্দ্রমা মহেশ জী বসে কৈলাশ।
আসন মারে ধ্যান লগাবে দেবতা করতে জহাঁ বাস॥
নন্দী পে অসবার সদা শিব ভোলা স্বামী।
গোরা করে সিঙ্গার জহাঁ কৈলাশী বাসী॥
গণেশ গোদী লয়ে পার্ব্বতী ভোলা সাথ।
গঙ্গা সঙ্গ জটো ভরী ধন্য ধন্য শম্ভুনাথ॥
ইন্দ্রমুনি সুর দেবতা ভজন করে দিন রাত।
করে তপসিয়া তপেশ্বরী ধন্য ধন্য গোরা মাত॥
উমা পার্ব্বতী সাথ জটো মে গঙ্গা রমতী।
ধন্য ধন্য ভোলানাথ সদা শিব স্বামী হে ভজতী॥
তিন লোক দাতা হ্যায় শঙ্কর ঔগড়দানী।
সৃষ্টি পালন হার হো শম্ভুজী অবনাশী॥
বিষ্ণু লগাতে ধ্যান ব্রহ্মা শিব ভজতে হরীহর।
উমা পার্ব্বতী সাথ নাথ ভোলা উনকে হ্যায় বর॥
বরদান দেতে ভক্ত কী শঙ্কর ভোলা জহান।
শরণ শঙ্করজী রহেঁ আপ দেব বরদান॥
দয়া বন্দ ভোলা হরী-সদাশঙ্কর তিরপুরারী।
হিতকারী রহে মহেশ দাস কী করো রখবারী॥

দী সঙ্গীত—

র বাউল, সাঁই গানের মত লোক-সঙ্গীত মধ্য ভারতেও াছে। এই শ্রেণীর লোক-গীতি এ দেশে 'গুরুমহিমা' গীত রচিত। সাধু, সন্ত শ্রেণীর গায়কেরা এই গানগুলির ভিতর দিয়া গুরুর গুণ ও শক্তির কথ জনসাধারণ্যে প্রচার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গুরুবাদী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

পাইলে নাম গুরু কী গা সেবী ফির করিয়ে দুজো কাম।

করিয়ে দুজো কাম গুরু মুক্তি কা দাতা।
কানন শব্দ শুনায় লগাবৈ হরি সে নাতা॥
ধ্রুব কী শব্দ শুনায় কে দেয়ো ভক্তি ভরপুর।
উত্তর দিশা সো অচল পদ হৈ তারা মঞ্জুর॥
তারা মঞ্জুর গুরু কী সেবা করিয়ে।
পাপ হোত সব ছার চরণ কমল নর অগ হিয়ে॥
মন এঁসা মল হরণ কর এসা ন দেখা কৌ আর।
জীব চরাচর সব দিখৈ বিন হোয় মৃত্যু কী হান॥
হোয় মৃত্যু কী হান গুণ কোটনী বর্ণু যাই।
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গুরু সে শিক্ষা পাই॥
মাতু পিতা গুরু সে করকে নিজ বিশ্বাস।
সো জিন পর কৃপা করেঁ সো পূজক মন কী আশ॥
পূজত মন কী আশ কভী নিন্দা মত করিয়ে।
তনক সে করো গিলান খ্যাল নারদ চিত্ত ধরিয়ে॥
নারদ জী নে ভী করী গুরু নিন্দা মন মায়।
চৌরাশী ভোগন পরো ফির গুরুনে করো সহায়॥
গুরুনে করো সহায় সদা গুরু রহে দয়ালা।
হরে মদন তন পার জগৎ সে পন্থ নিরালা॥

ঝুলন সঙ্গীত—

মধ্যভারত অঞ্চলে ঝুলন পরব সুবিখ্যাত। ঝুলনের সময়ে এ দেশের নরনারীরা 'ঝুলায়' আনন্দ উপভোগ করে। ঝুলায় ঝুলনের সময়ে পুরুষ ও মেয়েরা গান গাহিয়া থাকে। এই ঝুলন সঙ্গীতগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। ঝুলন সঙ্গীতগুলি শ্রুতিমধুর। উদাহরণ স্বরূপ একটী ঝুলন সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ভাই ঝুলন কুঞ্জন শ্যামরী শোভা বরসানে সে চলী রাধিকা।
অঞ্জন দিয়ে শৃঙ্গার সাথ সুন্দর সাগরী।
কালিন্দী তট পহুঁচ নায়ক মোহন করত ভুহার
কহে মাধুরী বতিয়া।
ঝাঁঝ মৃদঙ্গ বজত ঢোল ঢপ তবল সংগে
কান ফুকত বঁসিয়া॥
কৃষ্ণ শ্যামরী সাথ রাধিকা ঝুলন করত বিহার বাঁহিয়া।
রেশম তরক সী ঝুলা কদম কী ছাঁইয়া
ঝুলত মোহন বসিয়া॥

বিবাহের সময়ে মেয়েরা সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। বিবাহের গানগুলি অধিকাংশ স্থলেই রামসীতা অথবা শঙ্কর পার্ব্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। দোল উৎসবে 'ফাগ' গানে পল্লীকুটীরগুলি মুখরিত হইয়া উঠে। রাম নবমী ও দশেরা উৎসব উপলক্ষে রামায়ণ সঙ্গীত কুটীরে কুটীরে গীত হয়। বাংলার ভাটিয়ালী ও সারি গানের অনুরূপ লোক-সঙ্গীত মধ্যভারতে প্রচলিত আছে কিনা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই।

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭)*

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা বিলের আলোচনা কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের চিন্তার আজই অবসান। ইহার পরে পার্লিয়ামেণ্টে ভারত কথার আলোচনা আর হইবে না। ১৯০ বছরের 'কুটুম্বিতা' আজ শেষ। (আমি 'কুটুম্বিতা' শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু কেন করিলাম, সে কৈফিয়ৎ দিব না।) ১৫ই আগষ্ট ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিবে। ১৬ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ১৬ই আগষ্ট তারিখটি ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ও কলিকাতাবাসীর মনে দুঃস্বপ্ন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; তাই ১৬ই না ভাবিয়া ১৫ই আগষ্ট চিন্তা করাই ভাল। ১৬ই আগষ্ট মুস্লিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল। সেদিনের সেই বীভৎসতা ভারতবর্ষের ইতিহাস মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। অনাগত ও অনন্ত ভবিষ্যকালে নাদির, তৈমুর ও চেঙ্গিস্‌খানের ভয়াবহ স্মৃতি ১৬ই আগষ্টের তুলনায় নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ যুদ্ধে হয় জয়, না-হয় পরাজয়, অথবা সন্ধি হইয়া থাকে। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয় হইয়াছে—ভারতবর্ষের মাঝখানে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা; পরাজয়—বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগে। ভারতের স্বাধীনতার পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিবার পক্ষে যত্ন, অধ্যবসায়, নরনারী হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড—ষোড়শোপচারের ত্রুটী হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। সার্থক সাধনা গান্ধীজীর! স্বাধীন ভারতের চিত্র তিনিই আঁকিয়াছিলেন, প্রতিমা তাঁহারই গঠিত নির্ম্মিত; আবার, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তিনিই করিলেন। (ধ্যানের মূর্ত্তি প্রাণবন্ত হইলে কাহার না আনন্দ হয়; ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মপ্রদাতা ভারতের মুনি ঋষিগণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে স্বর্গে দেবতা ও মর্ত্ত্যলোকে আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত। দেবতা দেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর নয়নে আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি কই; ভাষায় আনন্দোচ্ছ্বাস কই? প্রাণময়ী প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান পূজারী নিরাশাব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিতেছেন কেন?)

(এ প্রশ্ন নিরর্থক, উত্তর আরও অনাবশ্যক।) ইংরাজ বণিক যেদিন ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন ভারতের যে দশা, যে অবস্থা ছিল, একশত নব্বই বৎসর পরে বৃটিশ যেদিন ভারত ত্যাগ করিতেছে, সেইদিন সেই অবস্থা, সেই দশার ভিতরেই নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। ১৭৫৭ ও ১৯৪৭ এ কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! ভারতবর্ষ যেদিন পরাধীনতা বরণ করিয়াছিল সেদিনের সেই শতধা বিভক্ত ভারতে—আর আজিকার বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতে পার্থক্য যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা দেখি সেদিনও ছিল অরাজকতার আরণ্য-আইনে মনুষ্যজীবন বিপর্য্যস্ত, দুর্ভিক্ষের হাহাকার, মৃত্যুর মহামহোৎসব। আজও মানুষের জীবন প্রতি পদক্ষেপে পর্য্যুদস্ত, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনারই শোভাযাত্রা, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু, দাঙ্গায় মৃত্যু, গৃহযুদ্ধে মৃত্যু, অপমৃত্যুর মহাসমারোহ। ভক্ত তুলসীদাস লিখিয়াছিলেন, মানুষ জন্মের দিনে কাঁদে, মরণের কালে মানুষ হাসে। আমি দেখিতেছি, স্বাধীনতার জন্মকালেও মানুষ কাঁদিতেছে, স্বাধীনতা যেদিন মরিয়াছিল, সেদিনও মানুষের চোখের জলই সম্বল হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পুনর্জ্জন্মের হরষিত, সুরভিত ও আলোকিত প্রভাতটির কল্পনাই কল্পে কল্পে শতাব্দীতে শতাব্দীতে যুগে যুগে মানুষ ধ্যান করিয়াছে। এই শুভ দিনটির সাধনায় কত ত্যাগ স্বীকার, কত দুঃখ-বরণ ও সর্ব্বস্ব সমর্পণ! হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ! সাধকের সাধনায় সে কি মহিমময় চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইত! লেখকের রচনায় আনন্দ মঠ উদ্ভাসিত হইয়াছিল! কবির কাব্যে "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর" এই আশ্বাসই দিত! চন্দ্রে কলঙ্ক বিন্দু আছে, থাক্; জোছনা সম্ভোগে কোনই বিঘ্ন নাই! হায়, ভারতের স্বাধীনতার কলঙ্কবিন্দু সম্পর্কে যদি ঐ কথা বলিতে পারিতাম। ভারত ভাগ্য বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে ঋষির কণ্ঠে কুইট্ ইণ্ডিয়া বজ্র নাদ করিয়াছিল, সেই চিরমধুর, চিরভাস্বর, চির স্থির কণ্ঠই আজ ম্লান ও মলিন। আলোকের প্লাবনে মেঘের অভিযান। জ্যোতিরুৎসবে নির্ব্বাপিত দীপমালা।

তবু বলিব, "আমরা ঘুচাব তোমার কলিমা"; তবু বলিব, "মাভৈঃ, আমরা নহি ত মেষ"। ভাঙ্গা ঘর নূতন করিয়া গড়িব; ভাঙ্গা প্রাণ জোড়া দিব। স্বাধীনতার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে।

> "কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
> চারিদিকে তা'র বাঁধন কেন।
> ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন"

পাষাণ খসিয়াছে, বাঁধন খসিয়াছে। আজ

> "তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
> নব নব দেশে বারতা লইয়া,
> হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
> গাহিয়া গাহিয়া গান।"

আজ, মা কি ছিলেন, সে দুর্ভাবনা ভাবিয়া লাভ নাই; মা কি হইয়াছেন,

---

* ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭, বাং ২৯এ শ্রাবণ ১৩৫৪, শুক্রবার, ২৭ রমজান; চতুর্দ্দশী। পূর্ব্বদিনের রাশি ও নক্ষত্রের তারা শুদ্ধ। জন্মে বিপ্রবর্ণ মৃতে দোষ নাস্তি।

নীজ সে কথাও অবান্তর ; মা কি হইবেন, আজিকার সেই কথা। শুধু আজ নয়, কেবল কাল নয়, অনাগত বহুকাল পর্য্যন্ত, সেই কথা, মা কি হইবেন ! আমরা সর্ব্বরত্নালঙ্কারপরিশোভিতা বালার্ক-বর্ণাভা ঐশ্বর্য্যশালিনী ভুবন-মনোমোহিনী জননীর কথা অনেক শুনিয়াছি। আবার অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী লীগপ্রাড়িতা হৃতসর্ব্বস্বা কঙ্কালমালিনী জননীকেও চাক্ষুষ করিয়াছি। দশ বৎসর —দশ বৎসর ত নয়, দশ যুগ, শ্মশানবঙ্গে শ্মশানবিহারিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি, কাঁদিয়া ধরিত্রী ভাসাইয়াছি। তাহাতে আর সাধ নাই। আমরা আজ সেই মা'কে দেখিতে চাই, সেই মা'র আরাধনা করিতে চাই, সেই মা'কে হৃদি সিংহাসনে ধ্যান-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত করিতে চাই—যে মা দশভুজে দশপ্রহরণ ধারণ করেন, যে মা শত্রুবিমর্দ্দিনী, যে মা বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, যে মা বীরেন্দ্রজননী। আজ সেই মা'র সাধনা করিব—যে মা বাহুতে বল, অন্তরে সাহস, বক্ষে অভয় মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আজ সেই মা'র পূজা করিব—যে মা কণ্ঠে সুধা, নয়নে দিব্য দীপ্তি, হস্তে [illegible]। বৎসরে কি কালের মাপ হয়? দিন গণিয়া কি দুঃখের পরিমাপ করা যায়? লীগের শাসনে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রলুপ্ত ঘটিয়াছিল ; লীগের কুচক্রান্তে শুভ্রবসনা সরোজবাসিনী বীণাপাণির 'শ্রী' অপহৃতা হইয়াছিল। বাঙ্গালী আজ আবার প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া বন্দেমাতরম্ গাহিবে ; আজ তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী দেবীর শ্বেতপদ্মটিকে লব্ধশ্রীতে শোভিত করিবে। মহাভারতের দুঃশাসন ভীষণ ছিল জানি ; ভীমসেন তাহার বক্ষঃরক্ত পান করিয়া পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়াছিল, তাহাও জানি ; বাঙ্গালী আজ লীগ দুঃশাসন কবলমুক্ত হইয়া পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি। কিন্তু আজিকার সমস্যা কত দুরূহ, পথ যে কি দুরারোহ, তাহা ভাবিতেও যে শুষ্ক হইতে । আজ বৃটিশের নিন্দাবাদের অবসর নাই ; আজ আর মুস্লিম লীগের দোষ করিবারও সময় নাই ; গভর্ণমেণ্টের পানে করুণ কাতর নয়নে চাহিয়া কালযাপন করাও চলিবে না। কে গভর্ণমেণ্ট? স্বাধীন রাষ্ট্রে গভর্ণমেণ্ট একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী ও বিভিন্ন জাতি নহে ; স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক গভর্ণমেণ্ট ! [গালি দিব কাহাকে? শূন্যে থুথু নিক্ষিপ্ত হইলে আত্মকলঙ্কই সার হইবে।]

দুইশত বর্ষের ব্যবধান যে, তাই ভুলিয়া গিয়াছি, তাই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। নইলে এই বঙ্গদেশ কি আমাদেরই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না?

এই বাঙ্গলা দেশেই না প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন? "নাহি মানে পাতশার, কেহ নাহি আঁটে তায়" সে এই আমাদের বাঙ্গালাতেই নহে কি? নরাধম মীর্জাফর খাল কাটিয়া ক্লাইভকে না আনিলে সিরাজ কি আমাদের স্বাধীনবঙ্গ রাষ্ট্রেরই অধিপতি ছিলেন না? প্রতাপ, সীতারাম, চাঁদ, কেদার কি বাঙ্গালীই ছিলেন না? পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানী কি এই স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রেরই অধিশ্বরী ছিলেন না? স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসও কোন দুর্ভিক্ষের কালিমায় কলঙ্কিত হইতে দেখি না। মন্বন্তর, মড়ক, মহামারী ত একখানি পৃষ্ঠাও কলুষিত করে নাই! অন্নের জন্ত হাহাকার, বস্ত্রের জন্ত আত্মহত্যার ইতিবৃত্ত, কই, শত্রুতেও লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই! পরন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস উল্লাসের ইতিহাস, উৎসবের রামায়ণ, পালপার্ব্বণের মহাভারত, প্রাচুর্য্যের বেদ ও পুরাণ। কোথায়, কোন্ সুদূরে ছিল সেই রাক্ষসাধিপতি দশানন লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজ্য, আর কোন্ সুদূর অযোধ্যা হইতে দশরথতনয় রামচন্দ্র সেই লঙ্কায় গিয়া অকালবোধন করিল। কে সে সংবাদ রাখিয়াছিল? আমার এই বঙ্গদেশ। অকাল বোধনকে ফলে ফুলে আলোকে উল্লাসে কে মূর্ত্ত করিয়াছিল? আমার এই বাঙ্গালী জাতি! এই হিংসাবিধ্বস্ত, পরশ্রীকাতর ভূখণ্ডে প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল কে? আমার বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্য। ভক্তের ভক্তির আবাহনে ভগবান তাঁহার বৃন্দাবন পরিহরি ভক্তকে 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্' বলিতেও পারেন, এ পরিকল্পনা কাহার? আমার বাঙ্গালী কবি জয়দেব ঠাকুরের। অপিচ স্বাধীনতার সাধনায় ভারতবাসীকে বীজমন্ত্র দিল কে? [দিল, বল বাঙ্গালী লক্ষ কোটী কণ্ঠে বল,] আনন্দমঠ স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র! "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রদ্রষ্টা বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র। তাই বাঙ্গালি, যে যেখানে আছ, যে অবস্থায় আছ, স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার দিনে একবার তিনশত কোটী কণ্ঠে বল, বন্দে মাতরম্।

(আজ বঙ্গরাষ্ট্র গড়িতে হইবে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী নির্ম্মাতা ময় দানব কি বাঙ্গলায় নাই? সে বিশাল অট্টালিকা, সুরম্য হর্ম্ম্য কে গড়িবে? আজ আর প্রদেশ শাসন নহে, যে ফাইলে ডিক্রী ডিসমিস্ করিতেই যাদু ঘোষের রথ হড় হড় গড় গড় শব্দে চলিতে থাকিবে! আজ আইন পরিষদের আতপতাপশৈত্যনিবারিত সুখাসনে বসিয়া বক্তৃতার মেঘ গর্জ্জনেই শাসন যন্ত্র তৈলসিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সাজ এই থাকিবে, এই ঠাট, এই আলবাট পোষাক বজায় থাকিবে, অথচ দেশ হইতে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ঘুচিয়া যাইবে—এ দুরাশা যদি কাহারও মনে বাসা বাঁধিয়া থাকে তবে যত শীঘ্র সে বাবুই বাসা স্থানচ্যুত হয় ততই মঙ্গল। সাধারণ মানুষ আইন জানে না, কানুন বুঝে না, কনষ্টিটিউশনের ধার ধারে না ; স্বাধীনতা বলিতে সে জানে অভাব বিমোচন ; স্বাধীনতা বলিতে সে বুঝে, প্রচুর খাদ্য, পর্য্যাপ্ত বস্ত্র ; কনষ্টিটিউশন বুঝাইতে গেলে সে বলিবে, নীরোগ দেহ, শান্তশীতল দেহ। রামরাজ্য কি—তাহার সঠিকরূপ তাহার ধারণার অতীত হইলেও এইটুকু তাহার অজানা নাই যে রামরাজ্যে মানুষ উপবাস করে না, কাপড়ের জন্ত কনট্রোলের দোকানকে তারকনাথের মন্দিরবোধে হত্যা দিতে হয় না, রামরাজ্যে চিকিৎসার অভাবে মানুষ কীট পতঙ্গবৎ যমালয়ে শোভা-যাত্রা করে না, অর্থের অভাবে আজন্ম আমরণ অশিক্ষার আজ সংস্কারের অন্ধকূপে বাস করে না। রাম রাজ্যে বর্ব্বর বালী, সুগ্রীবও রাজা রামের বন্ধুত্বের গৌরব করে ; গুহক রাজরাজেশ্বরের বক্ষালিঙ্গনে বদ্ধ হয় ; রাজা জটায়ুর চরণ বন্দনা করেন। এই মনোরম চিত্রখানি জনগণের সরল প্রাণের কোমল মৃত্তিকায় আঁকা আছে! দুঃখে, দুর্দ্দিনে, দুর্দ্দশায়, দুর্য্যোগে নিমীলিত নেত্রে বহু দিন ধরিয়া এই ছবিখানিকে তাহারা মনোকূলবিল্বদলে পূজার্চ্চনা করিয়াছে, আজ অর্জ্জিত স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণে অন্তঃস্থল হইতে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?')

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু, বিধাতা পুরুষ অন্তরালে হাসছিলেন। সিরোহী মোটর ষ্টেশনের অফিস গৃহে বড় বড় তালা ঝুলছে! সব বন্ধ। ষ্টেশন অন্ধকার।

বুঝলুম—লাষ্ট ট্রিপ অচলগড় থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। আজকের মতো এ'দের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবাই এতক্ষণ যে যার বাসায় পৌঁছে বিশ্রাম করছে।

ধ্বংসস্তুপের মধ্যে

দেবী আর কোনও বাক্যব্যয় না ক'রে নবনীতার হাত ধ'রে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

সভয়ে প্রশ্ন করলুম—তুমিও হাঁটবে নাকি?

গম্ভীর ভাবে বললেন—যেমন তোমার সুব্যবস্থা!

মাথা চুলকে বললুম—কিন্তু…

বাধা দিয়ে তিনি একটু উচ্চস্বরেই বললেন—কিন্তু, আর কি করা যেতে পারে বলো? অনির্দ্দিষ্ট গাড়ীর আশায় এখানে তো আর সারারাত অপেক্ষা করা যেতে পারেনা!

গুপ্ত সাহেবের মা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বৌমা ঠিকই বলছেন। চলো হেঁটেই যাই—

আশ্চর্য্য হ'য়ে বললুম—সেকি! আপনি বুড়োমানুষ—এতটা পথ—

বৃদ্ধা সহাস্যমুখে বললে—এক সময়ে একটানা বিশ মাইল পথ হেঁটে গেছি, একটুও ক্লান্তিবোধ করিনি। আজ বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দু'চার মাইল এখনও চলে যেতে পারি।

নবনীতা মহাউৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললে—আমিও পারি। 'দৌ-দৌ'য়ের সঙ্গে আমি পাল্লা দিয়ে হাঁটবো।

শ্রীমান আমাদের হণ্টনে অপরাজেয় একথা জানি। চেষ্টা করলে আমিও যে মাইল দেড়েক যেতে পারবনা এমন নয়। কিন্তু, ভাবনা আমার শ্রীমতীর জন্যে। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে বেরিয়ে পদব্রজে ত্রিকোণ

…ক পর্যন্ত গিয়েই তিনি বলেন—রিক্সা ডাকো, আমি আর হাঁটতে …রছিনি, পা ব্যথা করছে। তাঁর পক্ষে…

কিন্তু দেবী ততক্ষণ অনেকটা পথ এগিয়েছেন দেখলুম। একটা …র্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সকলকে নিয়ে আমি তাঁর অনুগমন করলুম।

গোধূলির সোনার আলো …হাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ক্রমে …ন হয়ে আসছে। অস্তগামী …র্য্যের আভা নিষ্প্রভ হ'য়ে …লও তখনও একেবারে …র্চ্ছিত হয়নি। পার্ব্বত্য …টি প্রদোষ আলোকে সুস্পষ্ট …খা যাচ্ছিল। চারপাশের …কৃতিক দৃশ্য সেই প্রাক্-…ার প্রায়ান্ধকারে একটা …স্ময় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে …ছিল।

…নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথে নিঃশব্দে …ছি আমরা ক'জনে। এত … লাগছিল সেই বিদায়ী …র মধুর আবেষ্টনে আসন্ন …তের ক্রম-বিকাশ।

…রায় অর্দ্ধেকটা পথ চলে …ছি যখন আমরা, দেখি …ন থেকে হর্ণ দিতে দিতে …খানি খালি মোটর …ছে। পাশ কাটিয়ে পথের …ধারে দাঁড়ালুম। মোটর-… আমাদের সামনে দিয়ে …। একেবারে খালি …। ড্রাইভার ছাড়া আর …নেই। প্রাইভেট মোটর। …ী নয়। তবু বিপন্নের … হাত তুলে চিৎকার … থামাতে বললুম।

…লো গাড়ী। ড্রাইভারকে …দের 'ষ্ট্যাণ্ডেড্' অবস্থা … বলে আবু মোটর … ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে … জন্য সানুনয় আবেদন জানালুম এবং পাছে সে, 'নেহি হুজুর! …কি জিয়ে। ইয়েত' হাম নেহি লে'কেঙ্গে' ইত্যাদি কিছু বলে বসে, …ঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে মোটা কিছু বখশিস্ কবুলালুম।

'আইয়ে জনাব!' ড্রাইভার নেমে এসে লম্বা সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালো।…চলিয়ে হুজুর!

নসীরামের প্রস্তাবনা সঙ্গীতখানি মনে পড়ে গেল—"রূপেয়া—রূপেয়া! লুকিয়ে রেখেছো কোথায় পা?"
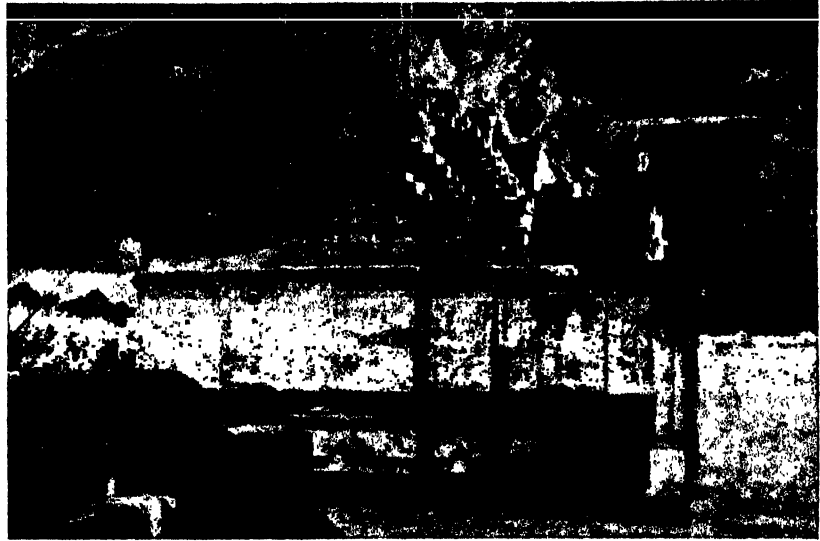
অচলেশ্বর মন্দির
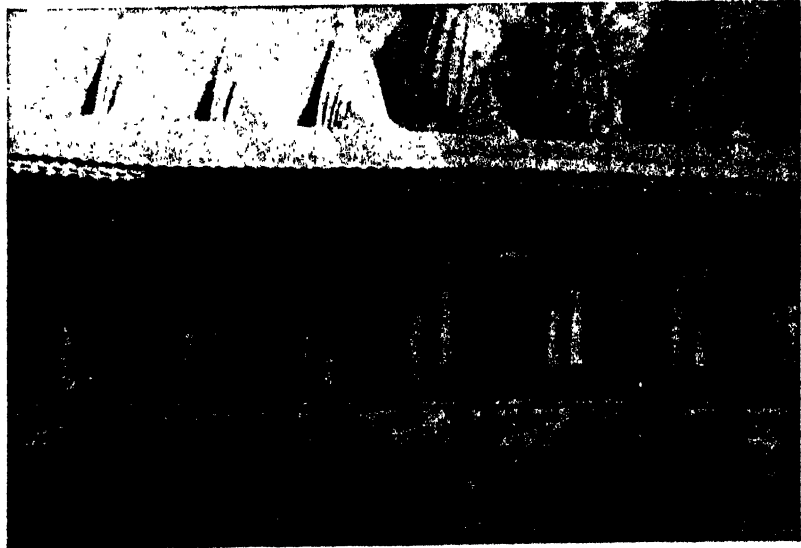
অচল গিরিশৃঙ্গের জৈনমন্দির

* * * *

আবু মোটর সার্ভিসের অফিসে পৌঁছেই একেবারে মারমুখো হ'য়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলুম। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই, ম্যানেজার

উঠে এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানালেন "আমার পাঁচজন ড্রাইভারই হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে শয্যা নিয়েছে। আপনাদের জন্ত আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। কোথাও একটা 'ঠিকে' ড্রাইভারও খুঁজে পাইনি যে গাড়ী পাঠাই। শেষে বহুকষ্টে একজন বন্ধুর প্রাইভেট গাড়ী যোগাড় ক'রে আপনাদের পাঠিয়েছি। তাই এত দেরী হয়ে গেছে! কিছু মনে করবেন না!

ম্যালেরিয়া! এই স্বাস্থ্যকর মাউণ্ট আবুর এমন চমৎকার পরিবেশের মধ্যে? একেবারে পাঁচ পাঁচটা ড্রাইভার একসঙ্গে একই সময়ে আক্রান্ত! কথাটা চট করে বিশ্বাস ক'রতে পারলুম না! এতটা মিথ্যে খুব বড় এক-খামচা নুনের সঙ্গেও গেলা চলে না।

মন্দির-পার্শ্বে

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠলুম! শেষটা কি ম্যালেরিয়া নিয়ে যাব? জিজ্ঞাসা করলুম—এখানেও ম্যালেরিয়া আছে নাকি? আপনি বলেন কি? ম্যালেরিয়াত' আমাদের বাংলা দেশেরই একচেটে!

পণ্ডিতজী একটু ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন—আগে ছিলনা। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বড্ড হ'চ্ছে। তবে শহরে নয়। দেহাতে। আপনাদের কোনও ভয় নেই। ড্রাইভাররা সবাই শহরের বাইরে থাকে কিনা—স্নান করে লেকের এই স্রোতহীন রুদ্ধ পচা জলে, মশারি খাটিয়ে শোয়না—

আর কথা না বাড়িয়ে উপরে চলে গেলুম। বলে এলুম—কাল আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাবো। সিরোহী মোটর সার্ভিসের সঙ্গে গাড়ীর ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনি শুধু ওদের অফিসে আমাদের পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। আমরা ৩টে নাগাদ বেরুবো। এঁদেরই পাঠানো গাড়ীর ড্রাইভারকে মোটা টাকা বখ্‌শিস্ দেওয়ার বোকামীটা তখন অনুতাপ হয়ে বুকে বিঁধছিল!

পণ্ডিতজী তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করে রাখবেন বললেন। আমরা সকলে 'এ্যাণ্টিম্যালেরিয়াল ট্যাবলেট' খেয়ে নিলুম! কি জানি বাবা! ম্যালেরিয়াকে বিশ্বাস নেই! যদি একবার ধ'রে তাহ'লে সহজে ছাড়বে না!

পণ্ডিতজী কথা রেখেছিলেন। পরের দিন ঠিক ৩টের সময় গাড়ী এসে হাজির। গুপ্ত সাহেবের ছুটি ফুরিয়ে ছিল। তিনি সকালেই সপরিবারে মাউণ্ট আবু থেকে নেমে গেছেন। যাবার সময় আমাদের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেছিলেন। 'অচলগড়' যাওয়া হ'লনা বলে মিসেস্ গুপ্ত খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ত বললুম—আপনারাত' খুব কাছেই আছেন। পরবর্ত্তী যে কোন একটা ছুটীতে আহ্‌মেদাবাদ থেকে এসে দেখে যাবেন।

শ্রীমতী গুপ্ত হেসে বললেন—তা'ত যাবই। কিন্তু, এমন সঙ্গীতো আর ভাগ্যে জুটবে না!

সিরোহী মোটর সার্ভিস ষ্টেশনে যথাসময়ে পৌঁছে শোনা গেল তাঁদের 'কার'খানি হঠাৎ বিগড়েছে। ঐ একখানি মাত্র গাড়ীই তাঁদের সম্বল। তবে দু'খানি বাস আছে বটে। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাঁরা একখানি বাসের ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাশ সীটগুলি সব আমাদের জন্ত রিজার্ভ করে দিতে পারেন। ভাড়া মোটর গাড়ীর চেয়ে কম লাগবে—দশ টাকার পরিবর্তে সাত টাকায় হবে।

'অচলগড়' দেখতে এসে ফিরে যাবো—মোটরকার পাওয়া গেল না বলে—সে পাত্র আমি নই। সকলকে নিয়ে বাসেই রওনা হওয়া গেল। বললুম, কলকাতায় অধিকাংশ সময়ই তো আমরা বাসে ট্রামেই যাতায়াত করি, সুতরাং এখানেই বা বাসে যেতে আপত্তি কি?

সিরোহী রাজ্যের অযত্ন রক্ষিত, আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু, ধূলা, বালি ভরা অনেকখানি নোংরা পথ অতিক্রম ক'রে আমরা ইতিহাস বিশ্রুত, রাজপুত বীরত্বগাথায় গৌরবান্বিত, সিরোহীর অমর কীর্তি অচলগড়ে গিয়ে পৌঁছলুম। নবনীতা আবৃত্তি করতে সুরু করে দিলে—

"বাদশা ধরি সুরতানেরে বসায়ে নিল নিজ পাশ
কহিলা, বীর ভারত মাঝে কি দেশ 'পড়ে তব আশ?
কহিল রাজা—অচলগড় দেশের সেরা জগত পর,
সভার মাঝে পরস্পর নীরবে উঠে পরিহাস,
বাদশা কহে অচল হ'য়ে অচলগড়ে কর বাস।"

সিরোহীপতি সুলতানের এই অচলগড় দুর্গ মাউণ্ট আবুর মোটর ষ্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এখানে এখনও এমন সব অতি প্রাচীন-

কালের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চোখে পড়ে বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার পরিচয় বহন করছে।

অচলগড় দুর্গ আজ প্রায় ধরাশায়ী। সিরোহীপতিরাও কেউ সেখানে অচল হয়ে বসে নেই। ইতিহাস বলে—কোনও এক প্রামারা রাজপুত নৃপতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অচলেশ্বর মহাদেবের ভক্ত সেবক। একদা যে দুর্গ ছিল তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি ও বীর্য্যবলের বজ্রপীঠ, সেই অচলগড় আজ জীর্ণ ও ভগ্ন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবের দেউল অচলেশ্বর শিবমন্দির এখনও তার অস্তিত্ব অক্ষত রেখেছে। শিবলিঙ্গের পাশে শিবশক্তি "মীরা"দেবীর একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দির সম্মুখে একটি ধাতু নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বৃষ মহেশ বাহনের স্মৃতির সঙ্গে অহমেদপুর সুলতান মহম্মদ বেগরার নিষ্ঠুর আক্রমণের চিহ্নও বহন করছে। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলতান মহম্মদ বেগরা, আহ্‌মেদাবাদের অধীশ্বর ছিলেন। অচলগড়ের হিন্দু নৃপতিদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকতো। একবার নাকি এই দুর্দ্ধান্ত যোদ্ধা মহম্মদ বেগরা অচলগড় আক্রমণ করে তদানীন্তন হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তারপর রাজপ্রাসাদ দুর্গ ও নগর লুন্ঠন করে বহু ঐশ্বর্য্য নিয়ে আহ্‌মেদাবাদ ফেরবার মুখে এই মন্দির তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি হিন্দু মন্দিরের সম্পদের কথা জানতেন। লুঠ-লুঠ করে শেষ এই মন্দিরকে তিনি আক্রমণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন এর পেটের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে, কিন্তু ঠিক এই সময় হর-কোপানলে লক্ষ লক্ষ ভীমরুলের আক্রমণে অস্থির হয়ে সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী ফেলে রেখে তাঁকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে হয়েছিল!

অচলগড় দুর্গে

অচলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে এখানে এক পৌরাণিক কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে যে, এক সময় দ্বারকাধিপতি বলরাম কোনও উদ্ধত রাজপুতের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে হলাকর্ষণে অর্ব্বুদ পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলছিলেন! বিপন্ন রাজপুত ভক্ত ভীত হ'য়ে ইষ্টদেব অচলেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াতে মহাদেব বারাণসীর বিশ্বেশ্বর মন্দির থেকে তাঁর বাম পদ প্রসারিত করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অর্ব্বুদ পর্ব্বত চেপে ধরেছিলেন। অচলেশ্বর শিবমন্দিরে এখনও মহাদেবের সেই পদাঙ্গুষ্ঠের চিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। বহু ভক্ত দূর দূরান্তর থেকে দেবাদিদেব মহাদেবের এই পদচিহ্ন দেখতে আসে। ওঁরা বলেন—এই পদাঙ্গুলী পাহাড়ের বুকে এমন সজোরে চেপে বসেছিল যে সেখানে পৃথিবীর তলদেশ, অর্থাৎ একেবারে পাতাল পর্য্যন্ত একটি গভীর গর্ত্ত হয়ে গেছে। এই প্রবাদ সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্ত পরবর্ত্তীকালে ধারাবর্ষ নামে এক রাজা নাকি ক্রমাগত ছ'মাস ধরে দিবারাত্র অবিশ্রাম এর মধ্যে জলঢালার ব্যবস্থা করেও এ গহ্বরটি পূর্ণ করতে পারেন নি!

অচলেশ্বর শিবমন্দিরের নাটমণ্ডপ ও গর্ভ দেউলের মধ্যস্থলে একটি বিশাল তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে প্রতি বৎসর মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের সময় এখানে একটি স্বর্ণের তুলাদণ্ড ঝোলানো হ'ত এবং সিরোহীপতিরা সেই তুলাদণ্ডে ওজন হ'তেন—অপরদিকের পাল্লায় স্বর্ণ রৌপ্য মণিরত্ন অলঙ্কার আভরণ বসনভূষণ ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি রেখে। তারপর উৎসব শেষে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়া হ'ত রাজ্যের দীন দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত প্রজাদের মধ্যে।

মন্দির প্রাঙ্গণের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট দেউল আছে। তার মধ্যে পার্ব্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ইত্যাদি নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অচলেশ্বর শিবমন্দির অচলগড়ে অচল হয়ে আছে, কিন্তু অচলগড় ভেঙে পড়েছে। সেই ধ্বংস স্তূপের উপর কিছুদিন আগে মালব প্রদেশের মাণ্ডু নগরবাসী দুই ধনকুবের শ্রেষ্ঠী একটি সুন্দর জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছেন। এই জৈন মন্দিরটি দিলবারার মতো কারুকার্য্য-খচিত না হ'লেও, দেখবার মত বস্তু। অচলগড়ে রাণাকুম্ভ ও তাঁর পুত্র উদয়সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে পাহাড়ের বুকে শাঁওন-ভাদুয়ান (শ্রাবণ-ভাদ্র) নামে যুগ্ম জলাশয় আছে। শুনলুম এর জল নাকি

কখনো কমে না! যতই তোলো তবু পূর্ণ থাকে। জৈন মন্দিরটি তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর। দ্বিতল মন্দির। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চার কোণে চারটি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া আরও ১৪টি মূর্ত্তি আছে দেখলুম। গ্যাইড বললে—এগুলি সব সোনার তৈরী, ওজন প্রায় দেড় হাজার মণ! কিন্তু, যা চক্ চক্ করে তাই সোনা নয়। পরে জেনেছি এগুলি পঞ্চ ধাতুর তৈরী। এখানে আরও একটি জৈনমন্দির আছে। সেটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

অচলগড়ের অচলশীর্ষে একটি 'ঋষি গুহা' আছে। শোনা গেল সেখানে একজন বাঙালী সাধু বাস করেন। একবার গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে 'ঋষি গুহা' পাহাড়ের এত উঁচু এক চুড়োর উপর যে সেখানে গিয়ে ওঠা এ বয়সে একেবারে অসম্ভব!

আবু পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া গুরুশিখরের উপর একটি শিবের মন্দির আছে। আমার মনে হল নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি প্রমথ জাতীয় শিবানুচর ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সেখানে ইচ্ছামত যাতায়াত করা বোধ করি সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার!

শোনা গেল, প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ের শোভা নিরীক্ষণের জন্য এখানেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-লাভাতুর কোনো কোনো দুঃসাহসিক প্রেমিকেরা প্রায়ই আসেন। তাঁদের রাত্রিবাসের সুবিধার জন্য নিকটস্থ পার্ব্বত্য গ্রাম 'উরিয়া'রে একটি সরকারী ডাকবাঙলা আছে। এখানে এসে যারা একবার উদয়াচলের পূর্ব্ব দিগন্তে উষার সেই অপরূপ আবির্ভাব দেখে যান তাঁরা নাকি জীবনে আর সে অপূর্ব্ব দৃশ্য কখনো ভুলতে পারেন না!

বিগত যৌবনের বিলুপ্ত সামর্থ্য স্মরণ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমরা অচলেশ্বর শিবালয় থেকে বেরিয়ে এলুম। কেবলই মনে হ'তে লাগলো—হায়, বছর পঁয়ত্রিশ আগেও যদি এখানে আসতে পারতুম! সেদিন পঁচিশ বৎসরের সেই দুর্দ্ধর্ষ যুবক নিশ্চয়ই সূর্য্যোদয় না দেখে ফিরতো না! মেবারাধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা কুম্ভ যিনি চিতোর গড়ে তাঁর বিখ্যাত "বিজয় স্তম্ভ" নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, সিরোহী পতির এই অচলগড় তিনি আক্রমণ ক'রে অধিকার করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল পাই ১৪৩৩ খৃঃ অব্দ থেকে ১৪৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। টড সাহেব তাঁর রাজস্থানে বলেছেন রাণাকুম্ভ যখন অচলগড় জয় করেন তখনই এর প্রায় ভগ্নদশা। তিনি এই দুর্গের শোভা ও সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হন যে বহু অর্থব্যয়ে অচলগড়ের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন বা পুনর্নির্ম্মাণ করেন তিনি।

রাণাকুম্ভের নির্ম্মিত ধনাগার, শস্যভাণ্ডার, অস্ত্রাগার প্রভৃতিও আজ ধ্বংসাবশেষ মাত্র! অশ্বমণ্ডলের যে রাণীর জন্য তিনি এখানে সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন আজ তা শুধু ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ। অচলগড়ের কোনও দিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে আসছে কিনা লক্ষ্য রাখবার জন্য তিনি অচলগড়ে বিশেষ করে একটি উচ্চ প্রহরীমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। সেটি এখনও সম্পূর্ণ ভূতলশায়ী হয়নি। রাণাকুম্ভের নাম উৎকীর্ণ করা আছে এই শিলামঞ্চের গায়ে। রাণীর মহলের দু-একখানি ঘর এবং উপরে উঠবার সিঁড়িটি এখনও অক্ষত আছে। আমরা এর সর্ব্বোচ্চ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে একখানি ছবি তুলিয়েছি। অচলগড়ের ভিত্তিমূলে পর্ব্বতগর্ভে একটি দ্বিতল গুহা আছে। গাইড বললে, পুণ্যশ্লোক মহারাজা হরিশ্চন্দ্র এখানে বাস করতেন!...তখন মন এমনই ভারাক্রান্ত যে এই আশ্চর্য্য কথার প্রতিবাদও মুখ দিয়ে বেরুল না!

মন্দাকিনী তীরে পাষাণ মহিষত্রয় ও আমরা

অচলগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সজল চক্ষে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। নিকটেই একটি চতুর্দ্দিক পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো প্রকাণ্ড সরোবর চখে পড়ল। জলশুকিয়ে অর্দ্ধেকের অধিক তলা বেরিয়ে পড়েছে। অর্দ্ধেকটায় এখনও একটু জল আছে। কাদাগোলা নোংরা সে জল। চারপাশের বাঁধানো পাথরের সিঁড়ির একদিক একেবারে ভেঙে ধ্বসে পড়েছে। আর একদিকও প্রায় যায় যায় অবস্থা! যেটুকু আছে তা থেকে বোঝা যায় একসময় এ কি মনোহর সরোবর ছিল। চারপাশের উঁচু পাথরের পাড়ে আগাগোড়া কারুকার্য্য করা লতাপাতা উৎকীর্ণ রয়েছে। 'গাইড' বললে এ সরোবরের নাম—'মন্দাকিনী'

কুণ্ড ! বুঝলুম আজ এ স্বর্গের মন্দাকিনীকে ব্যঙ্গ করলেও, এর অতীত গৌরবের যুগে এ ছিল একদা সার্থকনাম্নী সরসী। এর জল সেদিন ভাগীরথীর স্থায় পুণ্যোদক বলেই গণ্য হত। এই মন্দাকিনী তীরের একদিকে পাশাপাশি তিনটি প্রমাণ আকারের পাথরে গড়া মহিষ রয়েছে। মহিষ ত্রয়ের পশ্চাতে ধনুঃশর হাতে প্রামারা রাজ আদিপালের

মন্দির দ্বার

কটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সেটি এখন ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। ...ইডের মুখে গল্প শুনলুম তিনটি অপদেবতা বা দানব নিত্য রাত্রে ...গোপনে মহিষের মূর্ত্তি ধারণ করে এসে এই সরোবরের সমস্ত জল ...ষণ ক'রে সরোবরটিকে কর্দ্দমাক্ত করে রেখে যেত। নৃপতি ...দিপাল ক্রুদ্ধ হয়ে একদা রাত্রে উঠে এসে একটি বাণেই একসঙ্গে ...ই তিনটি মহিষরূপী দানবকে গেঁথে ফেলে বধ করেছিলেন।

আমাদের গাইডটি একটি রাজপুত তরুণী। জাতে গোয়ালিনী। দেখতে সুন্দরী, কথাগুলিও ভারী মিষ্টি! তাকে এত ভাললেগেছিল যে আমরা তার একটি ছবি তুলে নিয়েছি। অচলগড়ের গাইডরা সবাই মেয়ে। তাব'লে এটাকে যেন মণিপুরী রাজকন্যার রাজ্য মনে

মন্দির সম্মুখের বৃষ

না-করেন কেউ। পুরুষ যথেষ্ট আছে। কিন্তু পথপ্রদর্শকের সহজ কাজ করে তারা নিজেদের পৌরুষকে অসম্মান করে না।

ইতিহাস বলে অচলগড় দুর্গ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রামার-রাজ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। আমরা আজ কিঞ্চিদধিক একহাজার বছর পরে গিয়ে দেখলুম শুধু তার ভগ্ন জীর্ণ চূর্ণ ও বিধ্বস্ত কঙ্কাল।

(ক্রমশঃ)

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

মৌন মুখর অন্তরেতে
কল্পলোকের কণিকা
ছড়িয়ে দিল চপল হাতে
দীপ্ত আলোর কণিকা।

স্বরগের প্রেম মাটির বুকেতে
নামে নিরালায় চুপে
আকাশেরে তার প্রণাম জানায়
কর্ম আরতি ধূপে।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিন্তু ভোনাকে এড়াবার ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন তাকে এড়ানো গেল না।

গোষ্ঠাষ্টমী তিথি। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোচারণে গিয়েছিলেন, তাই একে উপলক্ষ করে ইস্কুলের হেড্‌ মাষ্টারেরা গোচারণ বন্ধ করে দিলেন। একটার সময় ঢন্‌ ঢন্‌ করে ছুটির ঘণ্টা বাজতেই ছেলের দল হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে রঞ্জু, কোত্থেকে ভোনা এসে পাকড়াও করলে।

—কি রে, খুব মাতব্বর হয়ে গেছিস যে। আজকাল তো তোকে দেখতেই পাওয়া যায় না।

—ছাড়ো, বাড়ি যাব।

—বাড়ি যাবি! ওঃ—একেবারে গুড্‌ বয়—বাড়ি গিয়ে দুধ-ভাত খাবে। নেঃ—অত ভালো ছেলে হতে হবে না। চল, মেলায় চল।

—মেলায়?

—হ্যাঁ—গোষ্ঠের মেলায়। অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি রে? আমরা সবাই যাচ্ছি, চল।

রঞ্জু বিব্রত হয়ে বললে, তা হলে বাড়ি থেকে মা-কে বলে আসি।

—কথা শোনো—এর জন্যে আবার মা-কে বলতে হবে। রাখ, রাখ—অত ভালো ছেলে না হলেও চলবে। চল, দল বেঁধে যাচ্ছি, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

গোষ্ঠের মেলা! রঞ্জুর মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। গোষ্ঠের মেলার নাম শুনেছে সে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। শুনেছে মস্ত বড় মেলা। নাগরদোলা আসে, টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ আসে, নানা রঙের খেলনা আসে, আর আসে বড় বড় আড়াইসেরী কদমা। গত বছর মেলা-ফিরতি মানুষ দেখেছে রঞ্জু, মনে হয়েছে মস্ত বড় একটা উৎসবের আনন্দ থেকে ফাঁকি পড়ল সে—বাদ পড়ে গেল।

—খুব দেরী করবি না তো?

—না, না, তুই চল্‌ না। ভয় নেই, হারিয়ে যাবি না। আঁচল-চাপা ছেলেকে আবার মার কোলে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেব—দেখে নিস।

কথাটা বলে গালের পাশ দিয়ে জিভ বার করে ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে অবজ্ঞার হাসি হাসলে ভোনা।

খাঁদু বাঁকা মন্তব্য করলে, কেন ওকে টানাটানি করছিস? বাড়িতে ওর দুধ-ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আর একজন বললে, আমাদের সঙ্গে গেলে বাড়িতে ও পিট্টি খাবে।

হঠাৎ পৌরুষে ঘা লেগে গেল রঞ্জুর: বেশ তো, চল্‌ না। আমি কি কাউকে ভয় করি না কি? কণ্ঠস্বরটা এতক্ষণে বেশ তেজোদৃপ্ত শোনালো তার।

খুশি হয়ে ভোনা তার পিঠ চাপড়ে দিলে: সাবাস, এই তো চাই। এখন থেকেই মরদের মতো হয়ে উঠতে হবে—বুঝলি? অত তুতুপুতু করলে কি চলে?

পরমোৎসাহে পায়ের তালি মারা চটি জোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভোনা চলতে সুরু করে দিলে। চলার তালে তালে হাতীর পায়ের মতো শব্দ উঠতে লাগল। তারপর বিকট ভঙ্গিতে যাত্রার দলের জুড়িদের মতো কানে হাত দিয়ে তারস্বরে থিয়েটারের গান ধরলে একটা:

"কালো পাখাটা মোরে
কেন করে এত জ্বালা—আ—তন—"

ট্রী-প্যারেরির মতো সেইটেই মার্চিং সং। নেতাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে ছেলের দলও অগ্রসর হল।

গোষ্ঠের মেলা ঠিক শহরের মাঝখানে বসে না। বসে শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে—সাহানগর বলে একটা গ্রামে। ইস্কুলের ওপারে রেলের লাইন, সেই রেলের লাইন পেরুলে মাঠ সুরু। ধান হয় না, পোড়ো পতিত জমি। মাঠ ছাড়িয়ে একটা মজা নদী, তার পাশে

ভাগাড়—শকুন, গিন্নী শকুন, আর টেলিগ্রামের তারে তারে শঙ্খচিল। তারপরে বড় রাস্তা, বাগান, পুরোনো আমলে সাহেবদের ভাঙা-চুরো একটা জংলা কবরখানা। বেশির ভাগ কবরের জীর্ণ দশা, মার্বেল ফলকের ওপরে লেখাগুলো কালো আর ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। শুধু শ্লেট পাথরের গায়ে একটা স্মারকলিপি জল জল করছে: 'পিটার হপ্‌কিন্স—জন্মিলা ১৮৩২ সনে, লাভ করিলা যীশুর শান্তিময় ক্রোড় ১১ই মার্চ ১৮৮৫ সনে'। সেই সঙ্গে একটুকরা কবিতার লাইন: "পিতার অপার প্রেম সকল সংসারে।"

এই কবরখানার ওপারেই সাহানগর গ্রাম। আর এখানে এসে পৌঁছুতেই যেন বহুদূরে সমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া গেল—মেলার কল্লোল। অতীত মৃত্যুর স্তব্ধ বিষণ্ণ রূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রঞ্জুর মনটা যখন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন দূর থেকে ওই মেলার কলধ্বনি যেন হঠাৎ তাকে খুশি করে তুলল।

সারাটা পথ অজস্র বখামি করতে করতে এসেছে ভোনা। নানা সুরে নানা রকম গান গেয়েছে, মুখভঙ্গি করেছে, আগে আগে যে সমস্ত লোক মেলায় চলেছিল তাদের ভেংচিয়েছে এবং পা থেকে চটি জোড়াকে সব সময়ে দশ হাত করে এগিয়ে রেখেছে। একবার তার এক পাটি আর একজনের গায়ে লেগেছিল, সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই ভোনা দলবল নিয়ে একেবারে তেড়ে গেল। লোকটা বিড় বিড় করে বললে, অসভ্য বানরের দল।

ভোনা জবাব দিলে, তাই তো তোমায় ডাকি দাদা হনুমান!

সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য ছেলেরা সুর ধরলে, দাদা হনুমান ওগো, দাদা হনুমান!

নিজের সম্মান রাখবার জন্যে লোকটা আর বাক্যব্যয় করলে না। বেগে পা চালিয়ে দিলে। পেছন থেকে খাঁদু ডাক দিয়ে বললে, রাগ করে চললে দাদা, নিতান্তই চললে? তা হলে বাড়ি গিয়ে চারটি বেশি করে ভাত খেয়ো—কেমন?

রঞ্জুর এতক্ষণে অনুতাপ হচ্ছিল। ভারী বিশ্রী লাগছে, অত্যন্ত আত্মগ্লানি বোধ হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় এদের সঙ্গে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে। ওদিকে খাঁদু আবার একটা বিড়ি ধরিয়েছে, পরমানন্দে মুখটাকে বিকৃত করে ধোঁয়া ছাড়ছে। রঞ্জুর ভয় করতে লাগল। যদি চেনা জানা কেউ দেখতে পায়, যদি বাড়ি গিয়ে বলে দেয়—তাহলে, তাহলে তার পরের অবস্থাটা কল্পনাও করা চলে না।

অন্যান্য পথচারীরা বাঁকা দৃষ্টিতে বারে বারে এদের দিকে তাকাচ্ছে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই দলটির ওপরে কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়। একজন তো পরিষ্কার বললে, এই বয়েসেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে, কী চমৎকার ছেলে তৈরী হচ্ছে সব!

ঝড়াং করে হাবুল জবাব দিলে, খাই তো খাই, কারু বাপের পয়সায় খাই?

সঙ্গে সঙ্গে ভোনা সুর করে 'অঙ্গদের রায়বার' বলতে সুরু করলে: "মোর বাপ কি তোর বাপকে বেঁধেছিল ল্যাজে?"

খাঁদু আরো একটু রদান দিলে: "এতগুলি রাবণ মধ্যে কোন্‌টি তোমার পিতা?"

যে মন্তব্য করেছিল সে চুপ হয়ে গেল।

সমস্ত পথটা যেন যমযন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। এক একবার ভাবছিল ফিরে চলে যায়, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। এরই মধ্যে খাঁদু আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, এই, বিড়ি খাবি?

—না।

—না না। কেউ টের পাবে না।

—না ভাই।

—ওঃ—একেবারে ভালো ছেলে!

ভোনা ইংরেজি করে ছড়া কাটলে:

Jim is a good dog
Every day he catches a frog—

ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু কবরখানা ছাড়াতেই যখন মেলার কোলাহলটা কানে গেল তখন রঞ্জু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সমুদ্রের ডাক—অজানা, অপরিচয়ের দূর সমুদ্র। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই সেখানে। সেখানে নাগরদোলা ঘুরছে, সেখানে টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ, সেখানে চারপেয়ে মানুষ আর ছ'পেয়ে গোরু, সেখানে রঙীণ বেলুন আর আড়াই সেরী কদমা এতটা পথ ভাঙা এতক্ষণে সার্থক হয়েছে।

দলটা মেলায় এসে ঢুকল। সত্যিই মস্ত বড় মেলা। নতুন একটা শহর দেখেছে রঞ্জু—দেখেছে অনেক মানুষ। কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষকে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে রইল রঞ্জু।

ভোনা হ্যাঁচকা টান দিলে একটা। বললে, অমন বাঙালের মতো হাঁ করে আছিস কী? চলে আয়। মেলায় কেনাকাটা করতে হবে না?

—কেনাকাটা! কিন্তু বাড়ি থেকে তো পয়সা আনিনি।

—দুর গাধা!—ভোনা জিভ্ বের করে চোখ উল্টে ভঙ্গি করলে একটা: মেলায় জিনিস কিনতে এলে আবার পয়সা লাগে নাকি?

—পয়সা লাগে না?—এ একটা নতুন খবর শোনা গেল। রঞ্জু আশ্চর্য হয়ে বললে, পয়সা লাগে না? তা হলে বিনি-পয়সায় দেয় নাকি?

—হুঁঃ—বিনি-পয়সায় দেবে? তোর শ্বশুর কিনা সব। ভোনা এবার সত্যি সত্যি ভেংচে দিলে।

—তা হলে কিনবি কী করে?

—হাতের জোরে।

—হাতের জোরে? সে আবার কী?

—আঃ—এই বাঙালকে নিয়ে তো ভারী জ্বালাতনে পড়লাম। চলে আয় না, দেখতেই পাবি সব—ভোনা রঞ্জুকে টেনে নিয়ে চলল।

বেশি দুর যেতে হল না—সামনেই একটা বড় মণিহারী দোকান। তালা চাবি, ছুরি কাঁচি থেকে সুরু করে সাবান তেল, স্প্রিংয়ের মোটর, চুলের রেশমি ফিতে, জাপানী পুতুল—সব কিছুর বিপুল সমারোহ। দোকানে ভয়ঙ্কর ভিড়। দু তিনজন লোক একসঙ্গে জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না।

ভোনা বললে, চল, এখানেই দেখা যাক।

দোকানের সামনে ভোনা বসল তার দলবল নিয়ে। এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর দর জিজ্ঞাসা করে।

—এই সাবানটা কত?

—তিন আনা।

—ছয় পয়সায় হবে না?

—না।

—ওই রেলগাড়ির দাম কত?

—বারো আনা।

—ছ আনায় দেবেন?

—না।

—সাড়ে ছ' আনা?

—কেন অকারণে বকাচ্ছ খোকা? নিতে হয় নইলে চলে যাও।

—খালি খালি খদ্দেরকে অপমান করলেন ... চাই না আপনার দোকানে কিনতে। চল্ খাঁদু—বীরত্বসূচক ভঙ্গি করে ভোনা উঠে দাঁড়ালো।

দোকানদার বললে, যত সব বখাটে ছোকরা!

ভোনা শাসিয়ে উঠল: শাট্ আপ্! আপনি অ... গার্জেন নন।

দোকানদার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পর পর পাঁচ সাতখানা দোকান। একটা ... কিনল না ভোনা, খালি দরাদরি করলে, দোকা... সঙ্গে ঝগড়া করলে। রঞ্জুর একেবারেই ভালো ... না; লজ্জায় অপমানে তার মাথা যেন মাটির সঙ্গে ... যাচ্ছিল। এরা সবাই তো তাকে ওদের মতোই ভাবছে! তবু দলের সঙ্গে ঘুরছিল যন্ত্রের মতো ভাবছিল বাড়ি গিয়ে মা-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেওয়...

খানিক পরে ভোনাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে বললে, আর নয় খাঁদু, কী বলিস?

খাঁদু বললে, হ্যাঁ—মন্দ হয়নি।

মেলার ভিড়টা ছাড়িয়ে দলটা এবারে চ... একেবারে গো-হাটার কাছে। এখানে লোক ... কয়েকটা ছোট ছোট চালার নীচে জনকয়েক লো... নিয়ে দরাদরি করছে। দাঁত পরীক্ষা করছে, শিং ... ল্যাজ তুলে তুলে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা ... গোবর আর ধুলোর একটা মিশ্রিত গন্ধ বাতাসে।

এইখানে একটা বড় বট গাছের ছায়ার নীচে এসে বসল। ভোনা বললে, নে এবার, বার কর সব

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওদের পকেট থেকে আসছে ছুরি, সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, এমন কি ... খেলনা পর্যন্ত। সব একসঙ্গে জড়ো করা হল। রঞ্জু

চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

চোখ টিপে জিভ বের করে হাসল ভোনা।

—কেমন পরিষ্কার হাতের কাজ দেখলি তো? কোনো ব্যাটা টের পায়নি।

রঞ্জুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল, গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গলা থেকে অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতো একটা স্বর বেরুল: তোমরা চুরি করেছ?

—আঃ গাধা, অমন করে চেঁচাস না। এ চুরি নয়, এর নাম হাতসাফাই। তুই একটা হাঁদা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়েছিলি বটে, কিন্তু তোরও ভাগ আছে। নে খাঁদু, হিসেব কর—

রঞ্জুর এবারে বাকশক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে যেন প্রাণপণ বলে কে তার জিভটাকে টেনে ধরছে গলার ভেতর, একটা অপরিসীম ভয়ে চারদিকের পৃথিবীটা তার কাছে বারে বারে একটা ঝাপ্‌সা কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

—পাঁচ—

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জু। ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছে না। পা কাঁপছে তার, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়বার মতো একটা অবিচ্ছিন্ন আর অস্বস্তিকর অনুভূতি। তীব্র তৃষ্ণায় তালুর শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিলতে গেলেও যেন গলার ভেতরে খচ খচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে।

জামার পকেটে খস খস করছে একখানা সাবান আর একটা সুতোর গুটি। আজকের লুটের মাল, ভোনা ঠকায়নি, ভাগ দিয়েছে। পথে আসতে আসতে যতবার একটা চৌকীদার আর পাহারাওলার মুখ চোখে পড়েছে তার ততবার চমকে চমকে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। চুরির অংশ নিয়েছে সে—সে চোর। আর সেই অপরাধের স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে তার মুখে, জ্বল জ্বল করছে, ঝক মক করছে। যে দেখবে সেই মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে—সে চোর।

বাতাসে ছুটো চুল মুখে এসে উড়ে পড়তেই অকারণে শিউরে উঠল রঞ্জু। মনে পড়ল একবার একটা অদ্ভুত আর বিশ্রী পোকা দেখেছিল সে। পোকাটা বারান্দার ওপর দিয়ে কিলবিল করে চলে যাচ্ছিল, আর চলার সঙ্গে সঙ্গে এঁকে যাচ্ছিল আলোর একটা নীলাভ উজ্জ্বল রেখা। মনে হল তার কপালের ওপরে ওই রকম একটা কুৎসিৎ পোকা যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, আর ক্লেদাক্ত উজ্জ্বল হরফে সেখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে: চোর—চোর—

পকেট থেকে সাবান আর গুলি সুতোর গুটিটা সে বের করে আনল, তারপর সোজা ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাশের অন্ধকার বাগানটার ভেতরে। এইবারে সে নিশ্চিন্ত—এইবারে মনের ওপর থেকে ভারটা নেমে গেছে তার। শুধু চুরি করে আজ সাবানটার একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল তার ছুটি আঙুলে, জুড়ে রইল তার জামার পকেটটাকে।

জীবনের অনেক মিষ্টি গন্ধের পেছনেই ওই চুরি আর অপরাধের ইতিহাস—এ অভিজ্ঞতার সময় তখনো তার আসেনি।

খাতার পাতায় হিসেবটা আবার গোলমাল হয়ে যায়। ছিঁড়ে যাচ্ছে ধারাবাহিকতা—পেছনের কালো পর্দার ওপরে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের মতো এলোমেলো ছবি ফুটে উঠছে। কত চেনা পথ, কত ঘর-বাড়ি, কত আশ্চর্য ঘটনা, আজকে নিশ্চিহ্নভাবে ভুলে গেছে রঞ্জু, কেউ মনে করিয়ে দিলেও মনে পড়ে না। কিন্তু কবে—কোন ছেলেবেলার নীল রঙের একটা ছোট পাখি এসে রঞ্জুর জানালার ওপরে বসেছিল; ছোট ঘাড়টি বাড়িয়ে কৌতূহলভরা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল এক মুহূর্ত, তারপর লাল ঠোঁট ছুটো একটু ফাঁক করে একটা ছোট্ট মিষ্টি ডাক দিয়ে আবার উড়ে চলে গিয়েছিল—পরিষ্কার মনে আছে সেটা। পাখিটার স্বচ্ছন্দ বসবার ভঙ্গি, তার সবুজ চোখে দুষ্টুমি-ভরা জিজ্ঞাসা—এ ভোলবার নয়, কোনোদিন ভুলবে না রঞ্জু।

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফেরবার কতদিন পরে? তিন মাস? ছ মাস? ছ সপ্তাহ? আরো কি ঘটেছিল এই সময়ের মধ্যে? এই চুরির প্রতিক্রিয়া কতদিন মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল? হিসেব মেলে না। সমস্ত

হিসেব তলিয়ে যায় বজ্রের মতো আকাশ-ফাটানো একটা উন্মত্ত গর্জনে।

—"বন্দে মাতরম্—"

—"মহাত্মা গান্ধী কী জয়—"

উনিশ শো তিরিশ সাল।

উত্তরাপথের গিরি দুর্গ আর দক্ষিণের নীল সমুদ্র উন্মথিত করে উচ্চারিত হল সংকল্প বাক্য:

"আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদক দ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী। দিকে দিকে রুদ্র ধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই একটি নাম। ভারতবর্ষের মূর্তিমান প্রাণপুরুষ যাত্রা করলেন ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের অগ্রচর হয়ে। আর-উইনের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্ত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন: "মেরা এক কদমসে সারে হিন্দোস্তান উথাল্ পাথাল্ হো জায়গা—"

নিরুত্তাপ প্রশান্ত কণ্ঠ—স্পর্ধা নেই, অহমিকা নেই। কিন্তু ওই একটি কথাই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল্-পাথাল্ হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সে কি ভোলবার দিন। ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরোধ করে দাও ল্যাঙ্কাসায়ার আর ম্যাঞ্চেষ্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও সৌখান বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানের লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর করে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয়-উষ্ণীষ পরে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠো।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিলিতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। রঞ্জু একদিন বাবাকে দেখেছিল এমনি করে কাপড় পোড়াতে, কিন্তু সেদিন যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাকে একটা পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড়ো করে তাতে আগুন ধরানো হয়েছে, তার ধোঁয়াতে এক মাইল দূরে থেকেও কাশতে কাশতে দম আটকে আসছে লোকের। দেশি বিলিতী মদের বোতল চুরমার হয়ে রাস্তায় গড়াচ্ছে।

কী আশ্চর্য দিন—কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা।

আর একটা তিরিশ সালের কথা মনে আছে রঞ্জুর। তেরশো তিরিশ সাল। ফেঁপে উঠেছিল আত্রাই—ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর। আজ উনিশ শো তিরিশ সালে আর এক বন্যা দেখল রঞ্জু। প্রকৃতির কূল ভাঙা বান নয়—বাঁধভাঙা জীবন-বন্যা। সে বন্যা উত্তর বঙ্গকে ভাসিয়েছিল, এ ভাসিয়ে দিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে। মাঠ-ঘাট গ্রাম-গ্রামান্ত—কোনো কিছু বাকী রইল না।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন ঊর্ধ গগনে মাদল বেজেছে, নিচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণ দলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে "ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল করে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ। কোন্ নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল: জুতি-মার্কা হ্যায়, খাও গে? একখানা বিলিতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল, নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। স্টেশনের সামান্য কুলি পর্যন্ত শাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণাবোধ করলে, বললে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি, রঞ্জুও পারল না। বেশ পরিষ্কার মনে আছে। দশটা বাজতে না বাজতেই

বাঁধা নিয়মে ভাত খেয়ে রওনা হয়েছিল ইস্কুলের দিকে। কিন্তু খানিকদূর এগোতেই বাধা পড়ে গেল। দলবল নিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো ভোনা।

হ্যাঁ—সেই ভোনা। সেই মার্বেল আর বাঘবন্দী চ্যাম্পিয়ান, হাত সাফাইয়ে বিশারদ, সুশ্রী কদর্য আলোচনায় মুখ খোলা সেই ভোনা। আজ সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে তার। মাথায় খদ্দরের টুপি, বুকে ব্যাজ, হাতে পতাকা। শুধু ভোনা নয়, কালী, খাঁদু, পূর্ণ—সবাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রঞ্জু ?

—ইস্কুলে।

ভোনার দলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর অনুকম্পার রেখা।

—শেম্! শেম্!

—ধিক্।

—লজ্জা হয় না ?

নেতার মতো উদাত্ত উদার ভঙ্গিতে ভোনা তুলে ধরল পতাকাটা : এখনো ইংরেজির মোহ ? এখনো গোলাম-খানায় ঢুকতে চাস ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

লজ্জায়, অপরাধ বোধে সংকুচিত হয়ে উঠল রঞ্জু : কী করব তবে ?

—আমাদের সঙ্গে চলে আয়।

—কোথায় যেতে হবে ?

—ইস্কুলে পিকেটিং করতে।

ওরা রঞ্জুকে ডাকলে বটে কিন্তু রঞ্জুর জন্যে আর অপেক্ষা করলে না। মুহূর্তে ড্রিলের ভঙ্গিতে ভোনা অ্যাবাউট টার্ণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে গেল। বেশ জোরে জোরে বার কয়েক পা ঠুকে ভোনা গান ধরলে :

"মোরে সোনেকি হিন্দুস্তান,
তু হামারা দিল্‌কা রোশ্‌না
তু হামারা জান—"

তার পরেই গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওরা। উৎসাহে, উল্লাসে ওদের চোখ মুখ ঝলমল করছে, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটা কঠিন সংকল্পের নির্ভুল ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওদের সর্বদেহে। উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেশনের কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় থেকে শুরু করে ভোনা, পূর্ণ, কালী, খাঁদু পর্যন্ত, কিছু আর অবশিষ্ট নেই—কেউ বাদ নেই আর। বন্দেমাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমা বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে ?

রঞ্জু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়িঘর—কোনো কিছুর আজ যেন আলাদা কোনো রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোনো রকমের। আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে—ধরেছে একটিমাত্র রঙ—ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ করে একটা গম্ভীর মধুর সুরের রেশ অনুঝঙ্কৃত হচ্ছে : বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

স্মৃতির মধ্যে চমক দিয়ে উঠল একটি নাম : অবিনাশ বাবু ! আজ এতদিন পরে রঞ্জু চিনতে পারল যেন অবিনাশ বাবুকে, যেন এতদিন পরে তার কাছে এই অবারিত রৌদ্র ধারার মতো প্রত্যক্ষ আর দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যেকটি কথা। একটা আকস্মিক আত্ম-চৈতন্যের বিস্ময়ে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে উঠল রঞ্জুর :

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়—"

এই তো স্বদেশ—এতদিন পরে এই তো স্বদেশ তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই যমুনা, এই গঙ্গানদীর ওপার আজ থেকে আমাদেরই তো অধিকার, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে তাদের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ আর বইবে না। আমরা জেগেছি, আমরা জাগব। আজ এই মুহূর্তটির জন্যে বেঁচে থাকা উচিত ছিল অবিনাশবাবুর, আজ এই মুহূর্তে তাঁর দেখে যাওয়া উচিত ছিল তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

রঞ্জু দু'হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলে একবার—যেন তার ঘুম ভেঙেছে। তারপর নিজের ভেতরে কিছু একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে জোর পায়ে ইস্কুলের দিকে এগিয়ে গেল সে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার ভূমি-ব্যবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্ত্তী অবস্থা

নিশ্চয়তার পর জমিদাররা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুস্থির হইয়া বুঝিতে পারিলেন, যে পরিমাণ রাজস্ব অর্থাৎ ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা হিসাবেও প্রজার নিকট যত টাকা আদায় হওয়া সম্ভব, এগারো ভাগের দশ ভাগ। তাঁহারা ইংরাজের ন্যায় জবরদস্তি টাকা আদায় করিতে পারেন না, অধিকাংশ প্রজার নিকট বৃদ্ধি করিতে পারেন না, অথচ যথাকালে রাজস্ব দিতে না সূর্য্যাস্ত আইনে তাঁহাদের জমিদারী "লাটে উঠিয়া" থাকে, প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়। এই দুরবস্থার মধ্যে বহু জমিদারী হস্তান্তর হইতে থাকে। কোনও কোনও দেয় রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ছেন এবং খাজনা বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বহুবিধ উপঢৌকন প্রবর্তন করিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানিয়া পর অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর সাধারণ জমিদারদিগের দুঃসময় এবং বহু নূতন জমিদার জলবুদ্বুদের মত উঠিয়া অল্পকালের জনসমুদ্রে মিশিয়াছেন। যদি হিসাব লওয়া যায় দেখা যাইবে, কয়েকটী জমিদার বংশপরম্পরায় ইংরাজের নিকট ইজারা লওয়া ভোগ করিতেছেন এবং পুরাতন স্থলে অজ্ঞাতকুলশীল বহু জমিদার আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভূমি স্বত্বে জমিদার ও প্রজা

রাজ যখন বাদশাহ বা নবাব সরকার হইতে জমিদারী বা রী গ্রহণ করে তখন প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি নাই। আদায়ী খাজনার কতকাংশ নিজেরা রাখিয়া বাকীটা সরকারে জমা দিবার ব্যবস্থা হয়। ইংরাজের সমসাময়িক অপর রদিগেরও সহিত অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে যে সকল টকা বিলি হইত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি কাটিয়া চাষের উপযোগী যাইত, অথবা নূতন জরিপে জমির পরিমাণ বেশী বলিয়া বুঝিতে যাইত, সেই সকল ক্ষেত্রে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়া, ইংরাজই অথবা অপর জমিদারই হউক, নিজেদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরও প্রজা ও চাষের অভাব, দেশের মধ্যে নানা অশান্তি, যে সকল উপায়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার কোনটাই প্রয়োগ করার সুবিধা হয় নাই। অবস্থা কতকটা শান্ত হইলে জমিদাররা দের আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রীতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

যখন সতর্ক জমিদাররা প্রজার ন্যায্য বা অন্যায্য দাবীতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, তখন প্রজারা অলস থাকেন নাই। বিশেষতঃ বহু প্রজা নিজ চেষ্টায় আর্থিক উন্নতি করিয়া নিজেরাই প্রচুর জমির মালিক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জমিদারদিগের অত্যাচার ও দাবীর ফাঁক সবই জানা ছিল। সুতরাং প্রজার শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে এবং প্রজা ক্রমে ক্রমে কেবল যে জমিতে অধিকতর স্বত্ববান হইতে থাকেন তাহা নহে, জমিদারের পক্ষে খাজনা ছাড়া যে সকল দাবী থাকিত, তাহাও ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসে। ১৮৮৫ সালের ভূমি রাজস্ব আইন এ বিষয়ে একরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। তাহার পরও যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রজার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজা সন্তুষ্টমনে কৃষিকার্য্য করিয়া কতক পরিমাণে জমির উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছেন।

অবনতির পথে

জমিদার ও প্রজার মধ্যে এই সময় একটা বিরুদ্ধভাব উপস্থিত হইয়াছিল। জমিদারদিগকে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান দেখিয়া ইংরাজ তখন প্রজাকে জমিদারের বিপক্ষে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। জমিদারগণও নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আইন প্রভৃতির সাহায্যে জমি খাস করিতে বা প্রজা বদল করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু রাজশক্তি ক্রমশঃ প্রজার পক্ষে সাহায্য করায়, উপঢৌকন অথবা "আবওয়াব" প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া মকররি মৌরসী অথবা স্থিতিবান প্রজাস্বত্ব প্রভৃতি বিক্রয় করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া প্রজা ক্রত জমি হস্তান্তর করিতে থাকে। জমিদারের খাজনা বাকী, সাংসারিক দায় প্রভৃতি মিটাইতে জমি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিক্রীত হইয়া বহু মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিতে থাকে। তাহা ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে জমির বণ্টন চলিতে থাকে। এই অবস্থায় আসিয়া বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য ভূমি সমস্যা আসিয়া দেখা দেয় এবং সেই সমস্যা এখন এত গুরুতর হইয়াছে যে নূতন পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর কৃষি তথা অন্ন সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে।

জমির বিভাগ

বাঙ্গালার জমির আয়তন ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ একর বা ৭২,৩৮১ বর্গমাইল তন্মধ্যে ২ কোটী ৮৯ লক্ষ একরে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। ১,০২,০০০ জমিদারী রাজস্ব দিয়া থাকে, আর ৫১ হাজার জমিদারী নিষ্কর। ইহাদের অধীনে ২৭ লক্ষ জমা বা প্রজা বিলি আছে। জমিতে সাক্ষাৎ স্বত্ববান রায়তের সংখ্যা ১ কোটী ৭২ লক্ষ এবং তাহাদের প্রজা ৪৮ লক্ষ। রায়তের নিজস্ব জমায় ২ কোটী ৮০ লক্ষ একর এবং তাহাদের কোর্ফা প্রজার অধীনে ৩১ লক্ষ একর জমি আছে।

ভূম্যধিকারী ও তৎস্থানীয় বড় জমার অধিকারীর অধীনে ১ কোটী ৫২ লক্ষ একর জমি আছে।

জমির অত্যধিক ভাগ হইয়া যাওয়ায় প্রতি রায়তের গড়ে ১°৯ একর এবং তৎঅধীনস্থ প্রজার অধীনে গড়ে °৬৪ একর করিয়া জমি ভাগে পড়িয়াছে। এত অজস্র টুকরা হইয়া যাওয়ায় মোট জমি ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ একরের মধ্যে ৩ কোটী ১১ লক্ষ একর রায়তের হাতে আছে অর্থাৎ বর্ত্তমানে রায়তরাই শতকরা ৬৭ ভাগ জমির অধিকারী; বাকী ৩৩ ভাগ জমি জমিদার ও বড় ভূম্যধিকারীর হাতে রহিয়াছে।

কুফল

জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় চাষ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। অথচ জমিতে প্রজার ও জমিদারের ব্যক্তিগত যে স্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহাতে কাহাকেও উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া সাধারণ বাঙ্গালীর জমি ছাড়াও শিল্প হইতে যে আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় জমির উপস্বত্ব হইতে অনেকেরই সংসার খরচের কতকাংশ সঙ্কুলান হইয়া থাকে। এক সীমানার অন্তর্গত বড় জমি বেশী পরিমাণ পাইবার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা ধনী জমিদার, যোতদার বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের গড়ে কাহারও ১৫°২ একরের অধিক জমি নাই। ইহার মধ্যে কতটা খাস ও কতটা প্রজাবিলি তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা হাজার হাজার বিঘার মালিক বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদেরও খাসে হয়ত খুব বেশী জমি নাই। যদিই বা কাহারও থাকে, তাহা নানাস্থানে ছড়াইয়া টুকরা টুকরা হইয়া আছে।

জমির প্রকৃত মালিক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার কালে মহা বিতণ্ডা উঠিয়াছিল, জমির মালিক কে? নবাব বাদশাহ বা তৎস্থলাভিষিক্ত ইংরাজ—না, জমিদার? তখন স্থির হয়, রাজা রাজস্ব দাবী করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত জমির মালিক, জমিদার। সেই হইতে জমিদার এক হিসাবে মহা মাননীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন; অবশ্য ইহা মুসলমানদিগের আমল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন জমিদার নির্দ্দিষ্ট খাজনায় জমি দখল করিয়া আছেন, প্রজার খাজনা অনেক ক্ষেত্রে নবাবী আমল হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রজা নানারূপ স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া প্রকৃতপক্ষে জমির মালিক হইয়া আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে বাঙ্গালার ৭২,৩৮১ বর্গমাইল জমির মধ্যে ৬১,৪৬০ বর্গ মাইল অর্থাৎ শতকরা ৮৪°৯ ভাগ পড়ে। ইহার বাহিরে যে জমি পড়ে তাহা খাস মহল ও ঠিকা জমা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা আছে। খাস মহলে মোট জমির ৭°৯ ও অস্থায়ী ব্যবস্থার অন্তর্গত শতকরা ৭°২ ভাগ জমি পড়ে। সুতরাং জমির উন্নতি করিয়া বাঙ্গালার মঙ্গল করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যে জমি পড়ে, তাহারও উন্নতি প্রয়োজন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ

বাঙ্গালার জমির উন্নতির কথা বলিলেই জমিদারী কাড়িয়া লওয়া, চিরস্থায়ী প্রথার উচ্ছেদের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। এ বিষয়ে কয়েকটা অসুবিধা আছে, সেদিক সংক্ষেপে আলোচনা করা অবান্তর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য জমির অধিকাংশই রায়তের অধীনে; তন্মধ্যে প্রায় সবই চাষী প্রজা। তাহার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমন কি নবাবী আমল হইতে বহু যোতজমার খাজনা হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হইলেই এই সকল প্রজার নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লওয়া খুব সহজ হইবে না এবং খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে না। তাহা ছাড়া জমি কাড়িয়া লইলেই বা কি হইবে? চাষী প্রজাকে জমি না দিলে এত চাষ করিবার ব্যবস্থা নাই; উপরন্তু প্রজার স্বত্ব কাড়িয়া লওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। মোট কথা, একবার গভর্ণমেণ্ট সমস্ত জমির মালিক না হইলে, খাজনা বৃদ্ধি করায় ঘোরতর আপত্তি ও আইনঘটিত নানা অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে।

জমিদারের স্বত্ব কাড়িয়া লইলেও প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী জমি পাওয়া যাইবে না। যিনি ভূম্যধিকারী তিনি জীবন ধারণের জন্য জমি ন্যায্য মূল্যে রাখিতে চাহিলে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বেদখল করা ন্যায়ানুমোদিত নয়। যদি কেবল জমিদারী স্বত্ব লইলে সারা বাঙ্গালায় প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হইতে পারিত।

তাহার পর মধ্যস্বত্বভোগীর কথা। গভর্ণমেণ্ট ও কৃষক-প্রজার মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগী জন্মিয়াছে। তাহাদের উচ্ছেদ করিলে প্রজার নিকট যে টাকা আদায় হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহাদের উচ্ছেদ করার পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু দেশের মধ্যে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে যে পরিকল্পনা আলোচনা করা যাইতেছে, তাহাতে এই সকল লোকের সহিত বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই। এক সময় ইঁহারা ন্যায্য মূল্যে উপরিতম মালিকের নিকট স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন; পরে নানাপ্রকার দায়ে পড়িয়া সামান্য স্বার্থ রাখিয়া হস্তান্তরিত করিয়াছেন। যে খাজনা হাতে রাখিয়া ইহারা স্বত্ব হস্তান্তর করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকজনের হয়ত সংসার প্রতিপালন করা চলে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা হইতে সংসার খরচের কতকাংশ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। জমির উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাজের চক্ষে ইঁহাদের স্থান অতি নীচে। কিন্তু কাহারও স্বার্থহানি করিতে হইলে, কাহারও জীবনযাত্রার পন্থা রোধ করিতে হইলে, তাহাকে অন্য পথ দেখাইয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের কাজ; বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট যখন কাহারও সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা করে। কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ না করিয়া সম্পত্তি দখল করিবার জন্য সমাজে চোর ডাকাত পরস্বাপহারীর অন্ত নাই। কোনও সুপরিকল্পিত কার্য্যসূচী স্থির না করিয়া এত বিরাট পরিবর্ত্তনের জন্য অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা বুঝিয়া দেখা দরকার। এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের

ংখ্যা ধরিলে প্রায় এক কোটীর নিকট দাঁড়ায়। সুতরাং য়র উপজীবিকার কোনও কথা চিন্তা না করিয়া স্বত্ব দখল করিতে ঘোরতর আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলেও বলিতে কালক্রমে এই মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস করিতেই হইবে। ক ভাবে তাহা করা যায়, তাহার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

পথের সন্ধান

ও জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব লোপ করিতে গেলে—যদি গভর্ণমেণ্ট পসারতে সমস্ত সম্পত্তি দখল না করে—গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বহু ঋণ করিতে হইবে। যদি ঋণ করিয়া বাঙ্গালার মঙ্গল হয়, করা দরকার। কিন্তু তাহাতে বহু সময় লাগিবে, বহু অর্থের হইবে এবং এই অনিশ্চিত পরীক্ষাকালে কৃষির গুরুতর ক্ষতি সম্ভাবনা। সুতরাং যদি পরীক্ষাই প্রয়োজন হয়, কোনও একটী জেলার অংশ লইয়া পরীক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঃ বসিয়া কাল হরণের সময় নাই। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ওয়ায়, বড় করিয়া চাষ করা চলে না। জমির উন্নতি করিতে, ক্ত, উন্নত প্রণালীর চাষে বহু ব্যয় পড়িয়া যায়, সুতরাং সাধারণ পক্ষে তাহাতে অসুবিধা হয়। এরূপ অবস্থায় অন্ততঃ এক থা জমির মালিকদের স্বত্বের অংশ মানিয়া লইয়া সংহত ভাবে বার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। কত জমি চাষ করিতে কত ব্যয় পড়ে, তাহার ধারণা সকলেরই আছে। যাহার জমির যত অংশ, তাহার নিকট সেই ব্যয় লইয়া, ট্রাক্টর প্রভৃতির সাহায্যে চাষ করিলে, মোট ব্যয় খুব কম পড়িবে, অথচ চাষের ফলন বেশী হইবে। যে সকল প্রজা রায়ত চাষ করেন, তাহাদের মজুরির হার অনুসারে, তাহারা ফসল বা নগদ মজুরি দাবী করিবে। সমস্ত ফসলের বণ্টন জমির অংশে মালিকের স্বত্বের অনুপাতে হইবে। প্রথমে অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য পাকা দলিল করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বন্দ্ব কলহ হইলে, মালিককে তাঁহার অংশের জমির জন্য স্থানীয় খাজনার হার অনুযায়ী নগদ টাকা দেওয়া হইবে, কিন্তু জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। এই জমির মালিকদের মধ্যে যাঁহারা মধ্যস্বত্ব ভোগী নিম্ন হইতে ক্রমে উপর দিকে ধীরে ধীরে তাহাদের স্বত্ব বিশ বা পঁচিশগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলে, কাহারও পক্ষে বিশেষ ভার বলিয়া মনে হইবে না। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই দেখা যাইবে, গভর্ণমেণ্ট যে মালিকদের খেসারত দিয়া সরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারই ত্রাসে অপসৃত হইয়াছেন।

জমি ও ফলন সম্বন্ধে পরিকল্পনা যাহাই চলিতে থাকুক, বাঙ্গালার এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সময় জমিদারী উচ্ছেদ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান প্রভৃতি কাজে লাগাইতে বহু সময় যাইবে। কিন্তু বাঙ্গালাকে বাঁচাইতে হইলে একলপ্তে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কৃষি না করিলে বাঙ্গালার পক্ষে অন্নের জন্য পরনির্ভরতা বাড়িয়াই যাইবে। সে অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বিদ্রোহী বঙ্কিম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তখনও আঁধার ছিল ; অরণ্যে বিপদাপন্ন পথ
পথের সর্পিল গতি, ক্রূর ফণা সর্প ভয়ঙ্কর
সঙ্কীর্ণ গহ্বর হ'তে অতর্কিত-হীন দংশনের
অপেক্ষায় রহিয়াছে বিষদন্তে প্রচ্ছন্ন প্রদাহ।
তখনও আঁধার ছিল—শ্মশানের ধূমায়িত রেখা
মর্ম্মে আকাশ তলে রেখে গেছে কলঙ্কের ছায়া।
জাতির কলঙ্ক নহে, শাসনের অপকীর্ত্তি গাথা
ঙ্কালে কঙ্কালে গাঁথা, নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পরিহাস—
পরিহাস বাঙালীর, পরিহাস আত্মবিস্মৃতের।
খনও আঁধার ছিল, মনে মনে অন্তরে বাহিরে
াঁধারে নিশ্চিহ্ন পথ সে পথের দিশারী কে হবে?

। আঁধার বিদারিয়া প্রসারিত দিব্যদৃষ্টি তলে
ষি বঙ্কিমের ধ্যানে জাগিয়া উঠিল সত্য পথ,
য়ের মন্দির চূড়া উদ্ভাসিত বালার্ক কিরণে
থা দিল সেই দিন, জাতির সে পরম প্রভাতে
ার মঙ্গল শঙ্খে সে আঁধার মিলাইল দূরে
নন্দ মঠের সৃষ্টি সেই দিন নিরানন্দ দেশে।
ও সন্তানের কণ্ঠে মাতৃ মন্ত্র জাগিল সেদিন,
াদপি গরীয়সী জন্মভূমি—দেবী আসনে
। হয়ে দেখা দিল, বঙ্কিমের তুলির লিখনে
চিত্র স্বপ্নের আশা, ধ্যানের সকল বাণী তাঁর
চিহ্ন গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ ;

দীর্ঘ দিন গত তবু—বিদ্রোহের সে মহতী বাণী,
বাঙালীর মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনি তোলে আবেগে গভীর ;
সে বিদ্রোহ সন্তানের, মঠ রক্ষী বৈষ্ণবী সেনার
সে নিষ্ঠা—জাগ্রত মনে সঞ্চারিত ভবনে ভবনে।

অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন দাস জীবনের
গ্লানি ও বিক্ষোভে ভরা ক্ষুধার্ত্ত সে আত্মার বিদ্রোহ—
বঙ্কিমের মাতৃ পূজা ; 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র তার ;
সে মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্র— দীক্ষা দিতে সমগ্র জাতিরে
এক সূত্রে গাঁথিবারে ছিন্ন ভিন্ন বাঙালী সন্তানে
আনিলেন নব যুগ,—সে যুগের প্রদীপ্ত আলোকে
আমরা চিনেছি পথ, বুঝিয়াছি সঙ্কল্প তাঁহার ;
নিষ্ফল হয়নি তাঁর মাতৃপূজা, মন্ত্র আহুতির,
গৃহে গৃহে জ্বলিতেছে আহিতাগ্নিসম বহ্নিমান।

সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ—দেশ ধর্ম্ম—মুক্তির সাধনা,
মৃত্তিকার লোভে নহে, দেশেরে দেবতা জ্ঞান করি
আনন্দ মঠের সেনা মুক্তিজ্ঞানী সন্তানের দল
নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমে জাগাইল প্রথম বিদ্রোহ!
—সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের,—
অন্ধকার মোচনের তরে নব প্রভাতের উদ্বোধন ;
সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের, বন্ধন-মুক্তির মন্ত্র গুরু,
তাঁহারি উদ্দেশে কবি যুগে যুগে জানাবে প্রণতি।

বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জাতির বিচারকর্তা ইতিহাস এবং জাতীয় ইতিহাসের বিচার হয় মহাকালের প্রচ্ছদপটে। তবু আমরা যদি বর্ত্তমানেই ইতিহাস বিচার করিতে চাই তাহা হইলে প্রদীপের তলদেশ হইতে কিছু দূরে সরিয়া আসিতে হইবে।

বাঙ্গলা মাতার ক্রোড়ে জন্ম ও প্রথম শিক্ষা লাভ করিলেও আমি শেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতবর্ষেরও বাহিরে। তাহার পর কর্ম্মব্যপদেশে আমি চিরপ্রবাসী, প্রদীপের তলদেশের কিছু দূরে—যদিও সে দূরত্ব দেশকে দুর্ব্বোধ্য বা দুর্জ্ঞেয় করিয়া তুলিবার মত বিষম নহে। অনতিদূর হইতে দেখা যদি ভুল হয় তাহা ব্যতিক্রম হইবে, নিয়ম নহে।

আর প্রবাসীর প্রেমবিচ্ছেদ ব্যথারসে সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া স্বদেশকে আরো ভাল আরো ঠিক করিয়া বুঝিবার অবকাশ দেয়। বাল্য ও কৈশোরের সে বাংলা দেশকে কখনো এত সুন্দর অথচ অসহায়, মধুর অথচ মরণোন্মুখ, সম্ভাবনাময় অথচ সশঙ্কিত বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। মৃত্তিকার সে অনাদৃতা অথচ মহীয়সী মাতার আহ্বান প্রতিটী প্রবাসী বৎসরের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছেদকে অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। সে জন্যই কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর পরাজয় বা পশ্চাদপসরণ সহ্য হয় না। আজ একটী বিষয়ে বাঙ্গালীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ দুয়েরই প্রতি বাঙ্গালী সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ইহার মধ্যে যদি নিজেদের দোষদর্শন বা সমালোচনা থাকে তাহা প্রেম-প্রসূত, অতএব আপনাদের মার্জ্জনীয়।

প্রধানতঃ বাঙ্গালী চাকুরীজীবী। একদা রাজশক্তির প্রসার ও প্রচার কার্য্যে সেই বিদ্যা তাহাকে দূর প্রদেশে ও দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে। রাজকর্ম্মের বিরাট্ মহীরুহের ছায়াতলে বহু-বাঙ্গালী সুশীতল ও বংশ-পরম্পরা ক্রমিক নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই আশ্রয়স্থল বাঙ্গালীর পক্ষে বহুক্ষেত্রে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ঊষা বাঙ্গালী চাকুরীজীবীর জীবিকার্জ্জনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলাম,—বাংলা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশ পথেই পরীক্ষায় বিফল হইয়া হটিয়া আসিতেছে। সওদাগরী অফিসে মাদ্রাজী পাইলে কেহ বাঙ্গালী চায় না, সরকারী অফিসে জাতিবর্ণ বিশেষে যে স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্র অবশিষ্ট আছে তাহাতেও বাঙ্গালী পরীক্ষায় পরাজিত। সরকারী বহু চাকুরীর প্রবেশ পথে পরীক্ষা আছে; সেখানে বাঙ্গালী ছাত্র সুবিধা করিতে পারে না কেন? উদাহরণ স্বরূপ দেখুন আই-পি পরীক্ষা। ইহা নামে নিখিল ভারত প্রতিযোগিতা হইলে ও কার্য্যত পরীক্ষাটির বেলায় প্রাদেশিক ভাগে বিভক্ত, যদিও সেক্রেটারী অব ষ্টেট চাকুরীর মালিক। বাংলাদেশের সিভিল লিষ্ট খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন বহু অবাঙ্গালী বাংলাদেশে "ডমিসাইল্ড" হিসাবে পরীক্ষা দিয়া বাঙ্গালী ছাত্রকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে বাংলাদেশের পুলিশ কর্ম্মক্ষেত্রে রাজত্ব করিতেছেন।

কেহ বলিতে পারে, ভালই হইয়াছে। আমরা চাকুরীজীবী হওয়ার কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া অর্থকর ক্ষেত্রে, শিল্পে বাণিজ্যে ও উৎপাদিকা-শক্তিবিশিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। চাকুরীর চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হই নাই, সে চেষ্টায় পরাজিত হইতেছি। পরাজিতের সংখ্যা বহু, চাকুরীর বাহিরের ক্ষেত্রে সচেষ্ট বাঙ্গালীর সংখ্যা কম; সফলের সংখ্যা আরও কম। ছয় কোটী লোকের দেশে অন্যান্য ক্ষেত্রে চেষ্টা করিতেছেন এমন লোক বাদ দিয়াও পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সফল কয়েকশত ছাত্র প্রতি বৎসর দেখাইতে পারা আমাদের পক্ষে উচিত ছিল। আমরা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া যেন আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। এইরূপ আত্মপ্রসাদ আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে।

অন্যপক্ষে আমরা চাকুরীজীবী বলিয়া এবং চাকুরীক্ষেত্রে অন্যপ্রদেশের লোকদিকের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছি বলিয়া ঈর্ষা এবং অপবাদ অর্জ্জন করিয়াছি। বাঙ্গালী বিদ্বেষের মূলে বহুলতঃ এই কারণ; অথচ ইহা আমাদিগকে আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান দিতেছে না। এ বৃক্ষে পুষ্প শুকাইয়া যাইতেছে; কিন্তু কণ্টকভাগী হইয়া রহিয়াছি আমরা এখনো।

শ্রীযুক্ত ভারত সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা আয়ুষ্মতী আই সি-এস চাকুরী দেবীর কথা ধরা যাক্। তাহার পাণিপ্রার্থী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রতি বৎসর কম হইত না এবং তাহার মধ্যে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ প্রায় সকলেই থাকিতেন। কিন্তু সফল যাহারা হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা অতি কম। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজনের নাম প্রতি বৎসর পরীক্ষার পর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৪২ এই তের বৎসরে মোট ৩৬ জন বাঙ্গালী—হিন্দু মুসলমান প্রবাসী ও বাঙ্গালাদেশের অধিবাসী মিলিয়া—এই তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি বৎসরে প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা তিনজনেরও কম। এই তের বৎসরে মাত্র ছয়জন বাঙ্গালী আই-সি-এস পরীক্ষায় ভারতবর্ষ হইতে সফল হইয়াছেন। তাহারও অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিনজন প্রবাসী বাঙ্গালী। বিলাতের আই সি এস পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের দুরবস্থা সামান্য একটু কম, তাহার প্রধান কারণ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নততর হওয়ায় বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষার দোষগুলি খানিকটা শুধরাইয়া যায়; দ্বিতীয়ত সেখানে পরীক্ষায় প্রস্তুত করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাহাতে বাঙ্গালী অন্য প্রদেশীয়ের সঙ্গে সমান শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

গত ১৯৩০ সন হইতে এই পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে শুধু যে আমরা জীবিকা অর্জ্জনের একটী বৃহৎ ক্ষেত্র হারাইয়াছি তাহা নহে; বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রধান শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা থাকিলেন অবাঙ্গালী, আমাদের অক্ষমতা ও অগৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া।

কেন্দ্রীয় সরকারের কেরাণী চাকুরীও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা দিয়া পাইতে হয় এবং ইহাতেও চাকুরী-সর্ব্বস্ব বলিয়া অপখ্যাত আমাদের ব্যর্থতা আই-সি-এস অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। পাঁচ বৎসরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরীক্ষার ফল হিসাব করিয়া দেখা গেল যে গড়পড়তা প্রতি বৎসরে মাত্র তিনজন করিয়া বাঙ্গালী প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন।

ফিনান্স, মিলিটারী একাউন্টস, রেলওয়ে, কাষ্টমস ও পোষ্টাল বিভাগের যে কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষা একসঙ্গে হয় তাহাতে চার বৎসরের ফল হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বৎসরে গড়পড়তা মাত্র ছয় জন করিয়া বাঙ্গালী—প্রবাসী বাঙ্গালী ও ইহার মধ্যে আছে—প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই ছয়জনের মধ্যেও অনেকে চাকুরী প্রাপ্তিতে সফল হইবার মত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

এই যদি আমাদের অবস্থা তাহা হইলে আমাদিগকে সত্বর প্রতীকার করিতে হইবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় প্রথম যৌবন; সে সময়ে এতগুলি বাঙ্গালী যদি বৎসর বৎসর পরাজয়ের লজ্জা গ্লানি ও বিষময় ব্যর্থতা ভোগ করে, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি ও কোথায়? আমাদের আশাস্থলদিগকে নৈরাশ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য আমাদেরই।

নিখিল ভারত প্রতিযোগিতাগুলিতে বাঙ্গালীর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হিসাবে অনেকে মৌখিক পরীক্ষার অজুহাত দেখান। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষই মৌখিক পরীক্ষায় বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে কম নম্বর দেয়। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য ত নহেই, বরং এই অভিযোগের দোহাই দিয়া আমাদের গুরুতর একটী ত্রুটী ঢাকিয়া যাইতেছি। মৌখিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক প্রসার, চরিত্রের বিকাশ প্রভৃতি গুণাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরীক্ষা করা হয়। বাঙ্গালী ছাত্র বহুক্ষেত্রেই জীবনে এই সম্ভবত প্রথম সাহেবী পোষাক পরিয়া পরীক্ষকদের সামনে আসে। তাঁহাদের নাম, মর্য্যাদা ও বাঙ্গালী-কর্ণে-অনভ্যস্ত ইংরেজী ভাষণ মাথা ঘুরাইয়া দেয়। তাহার উপর অনভ্যাসের কোঁটা সুট টাই কলার মোজা সর্ব্বাঙ্গে চড় চড় করিতে থাকে। আত্মপ্রত্যয় প্রতিটী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়। ফেডারাল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব্ব একজন সদস্য গল্প বলিয়াছিলেন যে আই-সি-এস পরীক্ষার একটী বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে টাই বিভ্রাটে বিপন্ন দেখিয়া তাহাকে আগে সে সমস্যা সমাধান করিয়া পরে প্রশ্নোত্তর দিতে সময় দিয়াছিলেন। অন্য পরীক্ষকদিগের এই মন্দ সাহেব যশঃপ্রার্থীর সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল এবং ইহারই বা মানসিক দুরবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোট কথা আমাদিগকে চৌকস হইতে হইবে। সুট যখন পরিতে হইবে অথবা যখন যে পোষাকে রণক্ষেত্রে যাইতে হইবে তাহাতে কোনও খুঁত থাকিবে না; ইংরেজী যখন বলিতে যাইবে তখন স্বদেশী বেংলিশ (Benglish) না বলিয়া শুদ্ধ ইংরেজী সাবলীল ভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ ছন্দে ও স্বরে বলিব। যে পরীক্ষায় যাহা চায় তাহার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইব এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কলিকাতাতেও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার্থী তৈয়ারী করার জন্য রীতিমত কার্য্যকর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অর্ব্বাচীন বাঙ্গালী কিশোর যদি পরশুরাম—ভণিত নিখুঁত আদর্শ তরুণীর সন্ধান করে যে হইবে বল্লরী বাড়ুয্যের মত রূপসী, মিসেস্ চৌবের মত সাহসী, জিগীষা দেবীর মত লেখিকা, লোটী রায়ের মত গাইয়ে ...ইত্যাদি তবে জীবনসংগ্রামে রত বাঙ্গালী যুবকই বা কেন নিখুঁত ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিবে না—যাহাতে স্বয়ংবর সভায় সে দেখাইতে পারে যে পোষাকে সে নিউইয়র্কের নাগরিক, বুদ্ধিতে এথেল ম্যানিন, মনঃসমীক্ষায় পেলম্যান, আধুনিক জগতের জ্ঞানে এনসাই-ক্লোপিডিয়া?

আমাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী করিতে হইবে। একটী বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত পুঁথিগত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সে বিষয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরী করিয়াও বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীগণ প্রশ্নটী ভিন্ন ভাবে দেওয়া থাকিলেই হয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্ব্ব প্রস্তুত ছাঁচে ঢালিয়া দিয়া আসে, না হয় রূপান্তরের নিষ্ফল চেষ্টায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যায়। খুব সহজ একটা প্রশ্ন করুন "তোমার বয়স কত" উত্তর আসিবে "আমি ১৯২৫ সনের শেষ ভাগে জন্মিয়াছি।" Direct অর্থাৎ সোজাসুজি দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাবে আমরা বিদ্যার সারাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি না, অর্জ্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাইতে পারি না, কোথায় যে তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও বুঝিয়া উঠি না। শুধু ভাসা ভাসা উচ্ছ্বাস, শুধু অবাস্তব প্রকাশ, শুধু সময় চলিয়া গেলে হা হুতাশ ইহাই হয় পরিণতি। জীবনের বালুবেলায় "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।" ছাত্রাবস্থার মধ্যভাগে ভলান্টিয়ার বা সভাশোভন শ্রোতা, শেষভাগে চাকুরী পরীক্ষার্থী, পরে আইনছাত্র এবং শেষে বেকার আইনজীবী বা ক্রমাগত দরখাস্ত লেখক—এই অনিবার্য্য ধিক্কারজনক ভাগ্য হইতে বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঁচাইতে হইবে। সে আমাদের নিকট অনেক কিছু দাবী ও আশা করিতে পারে; আপনাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে শুধু তাহাদিগের নহে, সমগ্র জাতির কথা ভাবিয়া।

বর্ত্তমানে চারিদিকে "প্ল্যানিং" এর যুগ চলিতেছে। আপনাদিগকে ও প্রথমে নকসা করিয়া লইতে হইবে—কোন্ ছাত্র কোন্ পথের উপযোগী, কোন বিদ্যার অধিকারী। শ্রেণীবিভাগ করিয়া ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ও যোগ্য

পথের জন্য। অঙ্কশাস্ত্রে পরীক্ষায় নম্বর উঠে বলিয়াই যে অঙ্কে প্রীতি ও আস্থাহীনকে অঙ্ক লইতে হইবে তাহা ঠিক নয়। যাহার দৃষ্টি শ্রমশিল্পের দিকে তাহাকে সাধারণ পথে এম, এ বা অনার্স পড়াইয়া শুধু সময়, অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট। যে চাকুরীজীবী হইবে তাহার দৃষ্টি থাকুক শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার চাকুরী পরীক্ষার অতীত প্রশ্নগুলি ও বর্ত্তমান পাঠ্যের উপর। উপনিষদ্ বলেন আত্মানং বিদ্ধি; আপনারাও ছাত্রগণকে সময় থাকিতেই সে মন্ত্রে দীক্ষা দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পরিচিত পৃথিবী হইতে অজ্ঞাত অকরুণ নিখিলভারত প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে প্রস্তুত না করিয়াই আমাদিগের ছাত্রগণকে পাঠান বা যাইতে দেওয়ার ফলে সকলের প্রতিই ঘোর অবিচার হয়। যাহার ভবিষ্যৎ ইহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে, যে আত্মীয় স্বজন ইহার জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া অর্থব্যয় করিতেছেন এবং যে শিক্ষায়তনের ছাপ লইয়া ছাত্রগণ যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার হইতেছে। বাংলা গল্প উপন্যাসে সর্ব্বদাই দেখি বাঙ্গালী কন্যার পিতা কন্যাকে আই-সি-এসের বধূ হইবার জন্য শিক্ষা বাল্যকাল হইতে দিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী অভিভাবক ও বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় পুত্রকে আই-সি-এস অথবা অন্যান্য জীবিকার্জ্জনের জন্য বাল্যকাল হইতে প্রস্তুত করিবেন না কেন?

চালাকী করিয়া কোন কঠিন কার্য্যে সফল হওয়া যায় না। একথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে আমরা সম্প্রতি লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িতেছি, ভাবিতেছি যে উপর চালাকী করিয়া, বাহাড়ম্বর দিয়া পরের সহায়তা না লইয়া ধারেই কাজ সারিয়া লইব। কিন্তু এ ভাবে কখনও কেহ সফল হইতে পারে না। প্রতিভার মূলে প্রধানত পরিশ্রম, কেবল প্রেরণা নহে। পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞের যুগ চলিতেছে; ভাসা ভাসা প্রয়াসের উপর নির্ভর করিয়া আমরা লক্ষ্যস্থল তীর হইতে দূরেই ভাসিয়া যাইতেছি, যেখানে ভাগ্যের পবন টানিয়া লইয়া যায়; দাঁড়ের উপর জোর দিয়া তরী তীরের অভীষ্ট স্থানে ভিড়াইতে পারিতেছি না। এই দোষ বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ছাত্রাবস্থা হইতেই ইহাকে আমূল উৎপাটন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিলে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে সাফল্যের আশা নাই। যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার। বরমালা বায়ুপথে উড়িয়া আসিবে না; তাহা বীর্য্যশুল্কে অর্জ্জন করিতে হয়।

অধুনা—বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে সৈন্যদলে পদস্থ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের জন্য একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাতে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্য, কর্ম্মতৎপরতা, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক বিকাশের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়। আপনারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিবরণীতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এদেশেও কোন কোন সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের জন্য সেই পন্থারই অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বাঙ্গালী ছাত্রের বর্ত্তমানে এমন কোন সম্বল নাই যাহাতে এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। চাণক্য-কথিত পুস্তকস্থাপিতা বিদ্যা পুস্তকেই রহিয়া যায় বর্ত্তমানে, কিন্তু বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, কর্ম্মতৎপরতা ও বিভিন্ন দিকে মানসিক বিকাশ ও আমাদের ছাত্রদের হয় না।

আমি কিন্তু আশাহীন নহি। বিগত মহাযুদ্ধের সংঘাতে তরুণ বাঙ্গালী বহির্জ্জগতের সঙ্গে মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার তাসের কেল্লা, অলস স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নানা কার্য্যকরী অর্থকরী পথে সে উৎসাহ দেখাইয়াছে, যোগ্যতা ও জয়লাভ করিয়াছে। নবজীবনের আহ্বান তাহাকে আকাশযুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পুরোভাগে আনিয়া দিয়াছে। সামরিক চিকিৎসা বিভাগে, স্থলসেনার ও নৌসেনার উচ্চ কর্ম্মচারী বিভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী কুঞ্জকুটীর ও কাব্যলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতকে জানিতে, অনাস্বাদিতকে আস্বাদ করিতে, মৃত্যু ও জীবনের সহিত বীরের মত পরিচয় করিতে চাহিয়াছে। এই সাহস ও উৎসাহ, এই প্রেরণা ও প্রাণ প্রাচুর্য্যকে যদি আমরা উপযুক্ত ভাবে বিকাশ ও বিস্তারের শিক্ষা ও সুযোগ না দিই তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইব ও মাতৃভূমির ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। কাজেই এই আমাদের শুভক্ষণ, এই সুবর্ণ সুযোগ, যে সময় তরুণ বাংলাকে যথা যোগ্য পথে নিয়োজিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। আমাদের পিছনে পড়িয়া আছে বহু বিস্তীর্ণ ব্যর্থতার ইতিহাস, কিন্তু সম্মুখে থাকুক বহুমুখী সাফল্যের সম্ভাবনা; সে সম্ভাবনাকে দিকে দিকে সত্যে—জাগ্রত সংশয়হীন সত্যে—পরিণত করিবার প্রশস্ত সময় এই। আজ নবোদ্বুদ্ধ যে চেতনা মহাসমরের পটভূমিকায় রূপ নিয়াছে বাংলা দেশের বহু অতীত কাহিনীর ন্যায় ইহাও যেন উৎসাহ ও পথ প্রদর্শনের অভাবে অকালে লুপ্ত না হইয়া যায়। সে জন্যই আমাদের শিক্ষা রীতি ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে—যাহাতে শুধু চাকুরীর নহে, মহা জীবনের পরীক্ষায়ও আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্থলদের আসন বহু উচ্চে ও সম্মানজনক স্থান লাভ করে। তবেই সার্থক হইবে বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষাসমরে যোগদান।

গ্রামের লোকজন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রামে দরিদ্র ও অলস লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু অভাব তাহাদিগকে নিরানন্দ করিতে পারিত না—কেহ নিতান্ত অবেলায় বহু কষ্টে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিতেছে কিন্তু গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে—

"গাছতলাতে রেঁধে খাবি
শাক চচ্চড়ি ওল ভাতে।"

অধিকাংশের প্রার্থনা ছিল—

"চাইনে কো মা রাজা হতে
দুবেলা যেন পাই আঁচাতে।"

দাবা পাশার ছক সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকিত, তাস খেলা গান বাজনা লাগিয়াই আছে—দুঃখে তাহাদের একান্ত গা-সহা ছিল, মোটেই কাতর করিতে পারিত না।

অনেকে নিষ্কর্ম্মা ছিল, কিন্তু গ্রামের তাহারাই প্রকৃত কর্ম্মী। সকলের কাজ তাহারাই করিত। মেলা, অষ্টপ্রহর প্রভৃতি উৎসবে তাহারাই অগ্রণী।

বরযাত্রী যায় তারাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকায় তারা,
নষ্টচন্দ্রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় রাত্রি সারা।
রাত দুকুরে ডাক্‌লে পরে লম্ফ দিয়ে তারাই আসে,
সম্পদেতে সুখের সুখী, মুক্ত প্রাণে তারাই হাসে।
গ্রামবাসীদের বিপদ হলে তারাই আগে কোমর বাঁধে,
গ্রামের মৃত গঙ্গা লভে চড়ে কেবল তাদের কাঁধে।
গ্রামে গ্রামে হে ভগবান অকেজো দল এমনি দিয়ো,
তারাই গ্রামের গৌরব যে—আমার পরম বন্দনীয়।

নোটন ঘোষ ছিল এ দলের কর্ত্তা, তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

নাহি কাজ তার নাহি অবসর বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি,
সারা গ্রামখান্ খুঁজে দেখ আর মিলিবে না তার জুড়ি।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা— করিছে চড়ুই ভাতি,
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা, নোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে চাকর চাহি নে তার,
সব কাজ তার নোটন করিবে কাছে রবে অনিবার।
সে তোমার চির বাধা চাকর, করে না কিছুরি আশা,
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবে না ভালবাসা।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয় না পয়সা হাতে,
লক্ষ্মীছাড়ার কোনো খেদ নাই কোনো দুখ নাই তাতে।
নাহিক অভাব তেমনি স্বভাব না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কামনা—হৃদয় কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

নোটন সমস্ত জীবন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিজয়া দশমীর দিন মারা যায়—যে চিরজীবন আনন্দ দিয়াছে তাহাকে আনন্দময়ী সঙ্গেই যেন লইয়া গেলেন।

শ্রীমান ঘোষাল ছিলেন খুব আমুদে লোক—

প্রতি মাঠে প্রতি ঘাটে গ্রামের প্রতি গাছে,
আজও বুঝি তাহার পায়ের ধুলার চিনে আছে।
দেখা দিত পাঠশালে সে কচিৎ কভু আসি,
সোহাগের পানকৌড়ি যেন উঠ্‌তো হঠাৎ ভাসি।
গাইত যখন হাত তুলে সে সংকীর্ত্তনের দলে,
গান শুনে তার গ্রামের বুড়া ভাস্‌তো আঁখিজলে।
ভবন ভরা পোষ্য এখন সেই তো তাদের আশা,
পাপিয়া কি গাইতে পারে রচ্‌তে হলে বাসা?
সারা দিবস পেটে খুঁটে সন্ধ্যাবেলা হায়,
এখনো যে খিন্নপদে লোচন পাটে যায়।
ক্ষণেক তরে হাসে নাচে তেমনি গাহে গান,
নিশার হিমে জাগে যেন মানস কুসুম ম্লান।
'নীলকণ্ঠের' যাত্রা যদি দুকোশ দূরে হয়,
সবার অগ্রে তাহার সেথা না গেলেই তো নয়।

তাঁহার আমোদ অফুরন্ত ছিল। পৌষলা প্রভৃতিতে তিনিই রাঁধিতেন। দাশুরায় ও নীলকণ্ঠের নূতন গান তিনিই আমদানী করিতেন—নূতন নূতন সুর আয়ত্ত করিতেন। "এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে" অহিভূষণের এই গানটি প্রথমে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। বাউল ও 'খেপার' গান কত জানিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার বাড়ীতেই সর্ব্বদাই ঢোল তব্‌লা খোল বাজিত। হাসিতে ও হাসাইতেই তিনি যেন জন্মিয়াছিলেন। দারিদ্র্য তাঁহার নিকট আসিয়া অপ্রতিভ হইত। এই শ্রেণীর সদানন্দ লোককে দেখিলে সত্যই মনে হয়—

"কে দিল মানবরূপ 'উস্রী' প্রপাত কে?"

হংস খেয়ারী—গ্রামের উত্তর প্রান্তে তাহার বাড়ী ছিল। সে কুনুর নদীতে খেয়া দিত। একটী পা খোঁড়া ছিল কিন্তু নৌকায় খেয়া দিতে উঠিলেই পা ঠিক হইয়া যাইত। সাঁতার সে খুব ভাল দিতে পারিত। আমি ছাত্রাবস্থায় কাটোয়া "প্রসূনে"র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় "হংস খেয়ারী"র নামে একটী কবিতা লিখি—অনেকের উহা ভাল লাগে এবং হংস খেয়ারী শুনিয়া খুব খুশী হয়।

তরুলতার রাঙা ফুলে চালটী আছে ঢেকে,
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটী গায়ে মেখে,
নদীর কাল জল,
করলে টলমল,
হাঁসগুলি তার হেলে দুলে ডাঙায় আসে বেঁকে।

২

দুপাট ডোঙায় সারা দিবস যাত্রী করে পার
আটটী জনের বেশী সে যে নেয় না কভু ভার,
ঝিঙ্গে কচু পুঁই
ভাবে কোথা থুই,
হাটের লোকে আঁজুল আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।

৩

মামলা মোকর্দ্দমা এবং ধরার কোলাহল,
চায়না সে যে শুনতে—বিনা নদীর কলকল।
শুধু গঙ্গাস্নানে
যায় কাটোয়া পানে,
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।

বার তাহাকে জমিদার সাক্ষী মানিয়াছিলেন কিন্তু আদালতে ঢুকিতে এত কাঁপিতে লাগিল যে, তাহাকে আর সাক্ষী দিতে হইল না—সে কথা স্মরণ করিলেই গঙ্গা মায়িকে উদ্দেশে প্রণাম করিত।

শ্রীশচন্দ্র বকসী—তাহাকে লোকে ছিক বলিয়া ডাকিত, বড়ই আড়রে ামুদে ছিল। শ্রীমানের সহপাঠী। দুই বৎসর 'কটকে' আত্মীয়ের ় পড়িতে গিয়া উপেক্ষা ও অনাদরে তাহার মন খারাপ হয়—মন সরিল না।

বড় ডাং পিটা ছেলে
সদাই বেড়াত খেলে,
চাহিত না কিছু অজয়ের বুকে
সাঁতারিতে শুধু পেলে।
গাছে খেলি লুকোচুরি,
মাঠেতে উড়াত ঘুড়ি,
নাচিতে গাহিতে দেশেতে তাহার
জুড়ি আর নাহি মেলে।

ার সে কটক হইতে যখন ফিরিল, মুখে হাসি নাই—সর্ব্বদা আনমনা বসিয়া থাকিত, সময় সময় অসংলগ্ন কথা বলিত—

বনের পাপিয়াটীরে
এমন করিল কে রে?
ভুলাইয়া গান ভাঙি পাখা দুটী
বনে দিয়ে গেল ফিরে?
ঝরে পড়ে গেছে তার সাথীদল
সেই শুধু হেথা রয়েছে কেবল,

শেষ হেমন্ত শেফালি গুচ্ছে
মলিন কুসুম খানি।

শেষ বয়সে তিনি কৈশোরের আনন্দের দিনের কথা বলিতেন—বটগাছে দোল খাইবার স্থানটী দেখাইতেন—

ফুলে ভরা চাক ময়ূরপঙ্খী
বুকে লয়ে দীপ রাশি,
মাতায়ে দুকূল দীপালীর রাতে
সে যে গিয়াছিল ভাসি।
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার,
আছে শুধু ধুম পোড়া সলিতার,
আঁধার তরণী লেগেছে আজিকে
আঁধার ঘাটেতে আসি।

ব্রজ তাঁত—সে জাতিতে বাগ্দী ছিল, কিন্তু বস্ত্র বোনাই তার ব্যবসা—এক সময়ে তাহার কাপড়ের খুব খ্যাতি ছিল—হাট হইতে তাহার কাপড় ফিরিত না—উচ্চ মূল্যে বিকাইত—বিলাতী বস্ত্র আসিয়া তাহার ব্যবসা নষ্ট করিয়া দিল—

ভেঙ্গে গেছে পাঁচখানা তাঁত, সাধের মাকুশালা,
এক পাশেতে পড়ে আছে নিজের হাতের থালা।
বুনতে হয় যে কাপড় তাকে বর্ষে দু চার জোড়া,
পরে শুধু প্রণয়ী তার গ্রামের দুজন বুড়া।

রসিক বাগ্দী—সে বড় সাহসী ও বিশ্বাসী ছিল, সর্ব্বদা সাধু ভাষায় কথা বলিত। মাছ ধরাই তাহার পেশা। অত্যন্ত অলস বলিয়া মজুর খাটিত না, কিন্তু সব কাজ ভালই জানিত। মাছ ধরা সম্বন্ধে তাহার অগাধ জ্ঞান। সত্য মিথ্যা কত তথ্যই জানিত। মাছের নূতন নূতন টোপের আবিষ্কার করিত। ছেলেদিকে মাছধরা শিখাইত, তাহাদের ছিপ্ বড়শী সংগ্রহ করিয়া দিত। সমস্ত রাত্রি মাছ ধরিত এবং ভুত পেত্নীর অসংখ্য গল্প বলিত।

দীর্ঘ তাহার সবল শরীর, আয়ত বক্ষ তার,
দেখিলেই ঠিক মনে হ'ত যেন ডাকাতের সর্দ্দার।
বাহু দুটী তার কত দিনে রেতে পর উপকার তরে,
ঠেলেছে হেলায় বন্যার বারি ভীষণ তুফানে ঝড়ে।
হরি আছে সেই চালাইবে দিন বলিত যখন দুখে
কি মহিমাময় দৃঢ়তার জ্যোতি জাগিত তাহার মুখে।
কত দিন হল গিয়াছে রসিক তবু কুসুরের তীরে
এখনো তোমরা দেখিতে পাইবে ভাঙা তার আড়াটিরে।
ভাসানের জল এখনো তেমনি আসে সে আড়ার কাছে,
দেখে শুধু সেথা নাহি একজন আর সবই পড়ে আছে।

অখিল মাঝি—অজয়ে 'খানা ঘাটে' সে খেয়া দিত। দুখানা বড় নৌকা তাহার ছিল। তাহার পিতা 'হরে মাঝি' বিখ্যাত নৌদস্যু ছিল। অখিল সরলপ্রাণ ধার্ম্মিক শান্ত-শিষ্ট লোক ছিল।

চাঁদ দেখে তারে প্রণমে
সম্ভাষে জাগে রবি,
সবাকার আগে জাগে সে
প্রগাঢ় শান্তি লভি।
ধরে পাড়ি আর গাহে গান
হরি কারও ধার ধারি নে
কাহারো মন্দে থাকি নে ক আমি
কাহারো হিংসা করি নে।

তার বাড়ী 'নয়নতারা' ফুলে সুসজ্জিত থাকিত। গ্রামের গৌরব যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ সে কখনো করিত না এবং কেহ করিলে বড় কষ্ট পাইত। উজানি মেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিত এবং বড় দলের যাত্রা না হইলে সে ম্রিয়মাণ হইত।

গোলাম মেটে—বড় শান্তিপ্রিয় লোক ছিল—ভাল বারুই ছিল সে। তাহার একমাত্র কন্যা ও জামাতা লইয়া আনন্দে থাকিত—সংসারে তার আর কেহ ছিল না।

আশার রেখা জাগলো বুড়ার বুকে
বেলা শেষের রৌদ্রটুকুর মত।

সংসারে আবার মন দিল, কিন্তু মেয়েটী মারা যাওয়ায় সে বড় কাতর হইল।

তুলতে নারে আর সে কোদাল খানি
থাকে বুড়া মুখটী করে ভার,
উঠ্‌লো না আর রইলো তেমনি পড়ে
আধেক গড়া গোহালখানি তার।

রাধানাথ ঘোষাল—আমি তার বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অত্যন্ত হাস্যরসিক লোক ছিলেন—সর্ব্বদা দাবা ও পাশা খেলায় মগ্ন থাকিতেন। তাহার বহু সঙ্গী ও শিষ্য ছিল।

নারাণ বায়েন—তাহাকে আমি থুরথুরে বুড়া দেখিয়াছিলাম। উচ্চদরের বাদ্যকর ছিল—বিবাহে ও সব উৎসবেই তাহার বাদ্য আগে যাইত এবং দেশজোড়া সুখ্যাতি লাভ করিত। পাখোয়াজী বলিয়াও তাহার নাম ছিল। তাহার পুত্র ও নাতিরা সে সবের কোন মর্য্যাদাই বুঝিত না—পাখোয়াজের খোলে তামাক রাখিত—বাঁশী লইয়া নাতিরা খেলা করিত। নারাণের হতভম্ব ভাব তার গুণজ্ঞ গ্রামবাসীকে কাতর করিত। সে মধ্যে মধ্যে তাহার বালিশে আপন মনে বাদ্যযন্ত্রের তান দিত, বোধ হয় আনন্দ ও জয় গৌরবের দিন মনে পড়িত।

অশ্বিনী—যৌবনেই মারা যায়, একখানি ঘর প্রস্তুত করিতেছিল—উহার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অশ্বিনী মারা যায়—যখনি ঐ ঘর দেখিতাম আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত—

কাঁদে ও দেয়াল ভাঙ্গা, ভাঙ্গা তার বাটিকা,
ও যেন আধেক লিখা বিষাদের নাটিকা।
এক মেটে প্রতিমা ও রেখে গেছে পূজারী,
হৃদয়ের সব সাধ দিয়ে গেছে উজারি।
যত কথা যত ব্যথা যায় নি সে বলিয়া,
ও দেয়াল বলে যেন পাটে পাটে গলিয়া।
যত আশা ভালবাসা রেখে গেল বাসাতে
আজি তাহা ফুটে বন মর্ম্মর ভাষাতে।

মানদা—তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে
ছিলে যেন পিসী মাসী,
তুমি আমাদের 'ধাত্রীপান্না'
আমাদের 'শ্যামা' দাসী।
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর,
গৃহ কাজে রত নাহি অবসর,
সুদীর্ঘ তব জীবন গোঁড়ালে
আমাদিকে ভালবাসি।

২

তোমার যত্ন, তব শুশ্রূষা
আজ বুকে করে ভিড়,
জননীর পরিচারিকা যে তুমি
অর্দ্ধ শতাব্দীর।
যাতে হাত দিতে তাই পরিপাটী,
তক্‌তকে সব—ঝরঝরে বাটী,
সবই নির্ম্মল, স্নিগ্ধ কান্তি
মোদের গৃহশ্রীর।

৩

তোমার চিতায় গড়িতাম মঠ
থাকিলে প্রচুর ধন,
দাসীর শ্রাদ্ধে 'দান সাগরের'
করিতাম আয়োজন।
তোমার স্নেহের হ'ত প্রতিদান
যোগ্য তোমার দেওয়া হ'ত মান,
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ
শ্রদ্ধাই নিবেদন।

মানদা অত্যন্ত সাহসী স্ত্রীলোক ছিল—তাহার মা সড়কী করিয়া বনশূক মারিয়াছিল, দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল।

আমি গ্রামের যাঁহারা কর্ত্তা, যাঁহারা গৌরবের—তাহাদের কথ লিখি নাই। আমার এ রেখাচিত্র তাঁহাদিগকে সম্যক মর্য্যাদা দিতে পারিবে না।

মৃত-জীবন

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

ল ষ্টেশনের কাছেই গাঁয়ের ছোট ডাকঘর। বিকেলবেলা
নাদি সেখানেই গিয়েছিল। কলকাতা থেকে কতকগুলো
রকারী কাগজপত্র আসবার কথা। তারই খোঁজে কদিন
রে সে একবার করে এখানটা ঘুরে যায়। ফেরার পথে
রকারী দিঘীটার ধারে প্রকাণ্ড জাম গাছটার ছায়ায় বসা
কদল লোককে সে অন্যমনস্কভাবে প্রায় অতিক্রম করেই
সছিল। হঠাৎ একটা বিকৃতকণ্ঠ পেছন থেকে আহ্বান
রলে—বাবু!

ফিরে তাকাতেই একটা জীবন্ত কঙ্কালের সাথে
খোমুখি হয়ে গেল। অনাদির সামনে হাতটা মেলে ধরে
। একটা পত্রহীন শুকনো গাছের মত নিশ্চল হয়ে
ড়িয়েছিল। কোটরাগত ছুটো চোখের দৃষ্টি কিছুটা
—কিছুটা বা ভিক্ষার মিনতিতে করুণ। অনাদি
বারে গাছের ছায়ায় জমায়েৎ ছোট দলটার দিকে
কাল। মেয়ে, পুরুষ, শিশু—সকলেরই এই অবস্থা।
াই অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার পানে। দৃষ্টিতে
দের কিছুটা যেন আশা, কিন্তু ভরসা বিশেষ কিছু নেই।

অনাদি প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে এসেছ তোমরা সব?

যেন কথাবলার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই তেমন—এমনি
রে লোকটা বললে—কত জায়গায় ঘুরলাম বাবু পোড়া
টের জন্যে—কিছু মেলে না।···বিকৃতভাবে দাঁতগুলো
কবার সে বের করলে। হাসবার, না কাঁদবার ভঙ্গি
টা বোঝা গেল না। বললে—তারপর এইখেনে এলুম।···
তটা সে সর্বক্ষণ তেমনিই প্রসারিত করে রইল—যেন
ই তার স্বাভাবিক অবস্থা।

অনাদি বললে—তা এখেনেই বা কী সুবিধে হবে বলো!
গাঁয়ে কে তোমাদের খেতে দেবে? কেউ না হয় দু'
কটা পয়সা ফেলে দিয়ে গেল, কিন্তু তাতে তো আর পেট
বে না।

ততক্ষণে দলের ভেতর থেকে আর একটা লোক উঠে
স কাছে দাঁড়িয়েছে। সে স্পষ্টই কান্নার সুরে বললে—
করি বাবু? কোথা যাই?

অনাদি বললে—আমাকে কী করতে বলো?

কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বললে—বন্দুক নেই আপনার
কাছে—পিস্তল? মেরে ফেলতে পারেন না আমাদিকে?

অনাদি বললে—এ গাঁয়ে একমাত্র অতুল চক্রবর্তী
তোমাদের উপায় করতে পারে। তাঁর কাছে টাকা
আছে—বন্দুকও আছে।

—আমরা তো তাঁর বাড়ী চিনি নে।

—চেনো না তো আমি কী করব?—ভ্রূ দুটাকে ঈষৎ
কুঞ্চিত করে অনাদি বিরক্তি প্রকাশ করলে। অবশেষে
বললে—আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি।
কিন্তু সেখানে গিয়ে যেন আবার আমার নাম কোরো
না বাপু!

দূর থেকে অনাদি অতুল চক্রবর্তীর বাড়ীটা দেখিয়ে
দিলে। তারা সেদিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক
দিয়ে অনাদি বললে—খুব তো এগিয়ে চললে। কিন্তু
দরোয়ান কি তোমাদের ঢুকতে দেবে ভেবেছ? গলাধাক্কা
দিয়ে বিদেয় করবে।

—তা'হলে!—লোকগুলো হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আমি তার কী করতে পারি?—অনাদির ভ্রূ দুটী
আবার একটু কুঞ্চিত হল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ নীরবতার পর
বলিল—আচ্ছা, তোমরা দাঁড়াও এখানে। আমিই যাচ্ছি।

কলকাতায় অতুলবাবুর মস্ত মদের ব্যবসা। ছেলেরাই
সব দেখাশোনা করছে। অতুলবাবু শেষ বয়সে দেশের
বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দীর্ঘ-জীবনে সুখ-সুবিধা
সব কিছুই পেয়েছেন তিনি। ইদানীং চিন্তা ভাবনা তার
ইহজীবন অতিক্রম করে পরজীবনের পানে ধাওয়া করেছে।
বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারটায় ঝাঁকিয়ে বসে তিনি বিকেল-
বেলার চা পান করছিলেন, এমনি সময় অনাদি গিয়ে প্রবেশ
করল। অতুলবাবু গোঁফজোড়ার ফাঁকে অল্প একটুখানি
হেসে বললেন—অনাদির খবর কী? শুনলুম খুব নাকি
সভা-সমিতি করছ। তোমাদের বয়সে অমন পাগলামি
আমরাও করেছি হে।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অনাদি বললে—আসবার বেলা দেখলুম আপনার বাগানের দক্ষিণদিকে একটা নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ওখানে কী হবে?

দামী শালটাকে কোলের ওপর আর একটু টেনে নিয়ে অতুলবাবু বললেন—আমার সমাধি মন্দির তৈরী হচ্ছে ওখানে। মরে গেলে ছেলেরা কী করবে কী জানি! তাই নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি!

আশ্চর্য্য হয়ে অনাদি বললে—মস্ত জায়গা নিয়ে ভিৎ গাথা হয়েছে দেখলুম। প্রকাণ্ড বাড়ী হবে তাহ'লে। আমি তো ভেবেছিলাম ধর্ম্মশালা-টালা কিছু তৈরী করছেন দুঃখাদের জন্যে।

—ধর্ম্মশালা না হলেও ধর্ম্মস্থান হবে বৈ কী! রাধাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা করে যাবো ওখানে। তা খরচা তোমার গিয়ে অনেকটাই পড়বে, বুঝলে অনাদি।

—কিন্তু একটা সমাধি মন্দিরের জন্যে অতখানি জায়গা—

—কেন নয় শুনি। বেঁচে থেকে এত জায়গার অধিকারী, আর মরার পর অতটুকু জায়গা অধিকার করতে পারবো না? মৃত্যুর পর সবাই যে আমায় অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে দেবে সে আমি হতে দেবো না। আমার একটা প্রতিকৃতি তৈরী করবার জন্যে পাচ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছি। কিন্তু একটা বড় সমস্যায় পড়ে গেছি হে।

—অগুন্তি টাকা আছে, তার আবার সমস্যা কিসের? অনাদি কথাটা বলে অতুলবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অতুলবাবু খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব করলেন—সমস্যা আর কিছুই নয়, ভাবছি যে কোনো একজন নামজাদা শিল্পীকে দিয়ে আমার একটা অয়েলপেন্‌টিং (oilpainting) করিয়ে নেবো—না, কোনো বিখ্যাত ভাস্করকে ফরমাস দেবো আমার পাথরের মূর্ত্তি তৈরী করতে।

অনাদি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। জীবিত থেকে ইনি বহু মানুষের জীর্ণ বুকের ওপর অত্যাচারের যে সিংহাসন স্থাপনা করেছেন মৃত্যুর পরও তা থেকে অবতরণ করতে চাইছেন না কিছুতেই। মরে গিয়েও বেঁচে থাকবার স্বপ্ন দেখছেন ইনি; তাই যারা বেঁচে থেকেও মরে আছে তাদের কথা এঁকে শোনানো নিষ্ফল। উঠে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে—আমি চলি, শিল্পী আর ভাস্কর কাউকেই বাদ দিয়ে কাজ নেই।—বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে এলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অপেক্ষমান বুভুক্ষুদের (প্রেতমূর্ত্তির মত বীভৎস দেখাচ্ছিল। অনাদি এসে দাঁড়াতে বললে—কিছু হল না।

একটী নারী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল। কে একটী শিশু কাঁদতে লাগল ক্ষীণস্বরে।

—কী হবে তবে বাবু? কী করব আমরা?

—একটা কাজ করতে পারবে?—অনাদি দাঁড়াল। অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল তার চো তারাদুটো।—আজ রাতে দল বেঁধে চড়াও হতে প অতুল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে? ডাকাতি করতে পার আমি তোমাদের লাঠি দেবো—অস্ত্র দেবো—পথ দেবো।

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অনাদির দিকে টু-শব্দটী করলে না।

—কেমন পারবে?

—না বাবু না; আমরা গরীব কিষাণ, চোর ডাক নই।

অনাদির চোখের আগুন এক মুহূর্ত্তে নিভে গেল নিস্তেজকণ্ঠে সে বললে—তা হলে আমি আর কী কর পারি!

—আপনি দয়া করে আর একবার যান। ও বুঝিয়ে বলুন।

মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনাদি তারপর সহসা অদ্ভুতভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের অতুলবাবু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুচোখে আবার আগু জ্বলে উঠল।

অনাদিকে ফিরে আসতে দেখে অতুলবাবু একটু বিস্মি হলেন, বললেন—ব্যাপার কী? আবার কী মনে করে?

সোজাভাবে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে—আপনার কাছে কিছু চাইতে এসেছি।

—কী? সমিতির চাঁদা? আমি তো তোমায় অনেকবার নিষেধ করে দিয়েছি। ও-সব ছেলেমানুষির মধ্যে আমায় পাবে না।

—আমি চাঁদা চাইতে আসি নি।

—তবে? কী চাইতে এসেছো তবে?

অতুলবাবুর দিকে আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনাদি পরিষ্কার কণ্ঠে বললে—আপনার ...

স্বরাজ ও সংগঠন

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ

আজ ভারতের স্বরাজের আশা জাগিয়াছে। কিন্তু আলো ও আঁধারের খেলার মত এ আশার সঙ্গে আশঙ্কার যোগও কম নহে। আলো আঁধারের সম্মিলন প্রভাতে ও প্রদোষে প্রায় সমভাবেই ঘটিয়া থাকে, এক সূচনা করে আলোকময় দিনের, অন্যটি অন্ধকারময় রজনীকে আনাইয়া আনে। আজ আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বে আমরা কোন্ দশায় উপনীত হইব জানি না, সন্দেহের দোলায় কত দিন দোল খাইব, তাহাও বলিতে পারি না। যদি আশা ফলবতী হয়, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনা যদি সিদ্ধি মণ্ডিত হয়, তাহা হইলেও বলিব—ইংরাজের দয়াদত্ত স্বরাজ যে মূর্ত্তিতে আজ ভারতে দেখা দিবে, তাহা প্রকৃত স্বরাজ নহে, অতঃপর প্রকৃত স্বরাজ অর্জ্জন করিতে হইবে। স্বরাজ দানলভ্য সামগ্রী নহে, অধিকার করিবার বস্তু।

১৯০৫ সাল হইতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনুগামী জনসঙ্ঘ মাতৃভূমির পরাধীনতা-নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, অহিংসার আশ্রয়ে কারাবরণ করিয়াছেন ও সর্ব্বস্ব বলি দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—এই আত্মত্যাগ—তপস্যা বিশেষ; তপস্যার ফলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হৃদয়ে এমন কোন প্রেরণা দিন বা তাঁহারই সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছায় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিকে এমন ঘোরাল করিয়া তুলুন, যাহাতে স্বরাজ-ফলটি আমাদের করতলগত হয়; অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এরূপ চিন্তা যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে, তাঁহারা মুখে না বলিলেও অন্তরে বুঝিতেছেন যে,—অহিংস সাধনা স্বরাজ-অর্জ্জনের পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে। এই জন্যই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাত্রে ঘর্ম্মোদ্রেক হইতেছে না। একমাত্র নেতাজী ইহা উপলব্ধি করিয়া যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের প্রভুদিগের একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন নেতাজীর অমর কীর্ত্তি। হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি এই বাহিনীতে উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ভারতের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘনীয় কি হইতে পারে? সে সংগ্রামে সফলতা লাভ হয় নাই সত্য, কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় ত' আজকার কথা নহে। আট শত বৎসর ব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ—জয় পরাজয় ও পরস্পরের প্রতি বৈরিতা হইতে যে বিদ্বেষ-হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা আজাদী হিন্দ্ ফৌজের অমৃতময় সংগঠনে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ভাবী সাফল্যের সোপান প্রস্তুত হইতেছিল। আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের মুসলমান সেনাপতির যেদিন দণ্ডাদেশ হয়, তৎপরবর্ত্তী দুইটি দিনে হিন্দু মুসলিম মিলিত ধর্ম্মঘটের প্রভাবে শ্বেতাঙ্গ-নরনারীদের হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। একদিন দুইদিনের মিলনেই কলিকাতা ও ম[illegible]নীতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতেই বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, হিন্দু মুসলমান মিলন ভারতের শুভদিন সূচনা করিলেও ব্রিটিশ শাসনের কালরাত্রি ডাকিয়া আনিবে। এ মিলন কি ব্রিটিশ সহ্য করিতে পারে? তাই পরমপূজ্য চার্চ্চিল সাহেব প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ লীগ নেতার সহিত ষড়যন্ত্র রচনা করিতেছিলেন বহুদিন হইতে। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ১৯৩৫ সালে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বিধান রচনা করা হয়, তাহাতেই এই চক্রান্তের বীজ লুপ্ত ছিল। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ স্পষ্ট করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। * যতদিন না স্বরাজের টোপ ফেলা হইয়াছিল, ততদিন মুসলিম-লীগের গাত্র উত্তপ্ত হয় নাই। কূটনীতির বড়িশায় স্বরাজ টোপ এমন ভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইল, যাহাতে লীগভুক্ত মুসলিমগণ উত্তেজিত এবং কংগ্রেসকে প্রলুব্ধ করা হইল। উভয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে স্বরাজ টোপ এখনও ঝুলিতেছে—কিন্তু এই টোপ গিলিবার পূর্ব্বেই এক সম্প্রদায় অপরের মাংস-শোণিত ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল—এখন স্বরাজ—"ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ" বড় ব্যবধানে পড়িল! আজ মুসলিম লীগ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হাতে ক্রীড়া পুত্তলী শুধু নহে—তাহাদের জয়পতাকা বহনের স্তম্ভ স্বরূপ।

শাশ্বত বিশ্ব ধর্ম্মের অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি—কুসংস্কার হিন্দুকে দাসত্বলভ মনোবৃত্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আজ মনে হয়—প্রগতিপন্থী মুসলমানগণ ত' ঐ সকল কুসংস্কারের ধার ধারেন না, অথচ ব্রিটিশ গোলামীর উপর এত অনুরক্ত কেন? শুধু ব্রিটিশের পদতলে পড়িয়া থাকা নহে, তাহাদের ইঙ্গিতে মুক্তিকামী প্রতিবেশী-দিগকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করিতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নারীধর্ষণ, শিশু হত্যা, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিপ্রদান—তদুপরি বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরীকরণ—ইহা যে কোন্ ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করে—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম! ইহার বাহিরে 'ধর্ম্ম' নামক কোন বস্তু আছে কি? বিশ্ব ধর্ম্মের শাশ্বতরূপ যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা

* In November 1934, General Sir Henry Page-Croft said: If the white paper goes through, our rule ceases. And India will pass permanently under the control of Hindus dominated by Brahmanism. Inevitably the precepts of Christianity will have to make way for Hindu ascendancy.

হয়,—লীগপন্থীদের ধর্ম্মের মস্মস্থান কোন্‌টি? 'নমাজ' মাত্র করিলে বা ভগবানের নামে মাটীতে মাথা ঠেকাইলেই যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ শাসনে নমাজকারী চোর ডাকাতের শাস্তি প্রদান হইত কেন?

বাঙ্গলার বুকের উপর যে বীভৎস তাণ্ডব চলিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম হইবে ইহাই যে,—হয় প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানগণ লীগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেন, না হয়, সমগ্র মুসলিম সমাজ অধঃপাতের নিম্নস্তরে ডুবিয়া যাইবে।

সেকালের রাজগণ রাজ্য লুণ্ঠন করিতেন শুনা যায় বটে, কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অত্যাচারের কাহিনী অতি বিরল। শিবাজী মহারাজের সম্মুখে এক সময়ে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে এক সুন্দরী রমণী উপস্থিতা হইয়াছিলেন, শিবাজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া সম্মানিত ও যথাস্থানে প্রেরিত করিয়াছিলেন।

আজ ব্রিটিশের কূটনীতিতে ভুলিয়া মুসলমানগণ হিন্দু ধ্বংস করিতে যতই উদ্যোগী হউন না কেন,—একটা জাতিকে নিঃশেষ করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ মুসলমানগণ নিজ রাজত্বকালেও যে জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই—আজ পরকীয় বুদ্ধি পরিচালিত পরাধীন মুসলিম সেই জাতিকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবে,—ইহা স্বপ্নমাত্র!

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার জ্যোতিঃ যাহাদের উপাস্য—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—ইহা যাহাদের নিত্য পাঠ্য—তাহাদের সাময়িক অবসাদ আসিলেও ধ্বংস হইতে পারে না। আচার নিয়ম-নিষ্ঠা কুসংস্কার নহে, আত্মলাভের উপায় মাত্র, এই বোধ বিরহিত হইতেই হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের স্বরাজ 'স্বেন রাজতে'—আত্ম বোধকে কেন্দ্র করিয়া পুনরুত্থান। আমাদের সংগঠন—আত্মানুভূতির মধুরতা সর্ব্বত্র সঞ্চারণ। কাপুরুষতা, ভীরুতা, অবসাদ বিদূরিত করিয়া তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও উৎসাহের উৎস বিকাশ করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্ম কখনও কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেয় নাই। এই ধর্ম্মের সেবা করিয়াই প্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ, বাজীরাও, প্রভৃতি বীরবৃন্দ পরাধীনতার যুগেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিত হইয়াই নেতাজীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবং।

স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি॥ অষ্টম অঃ।৩৪৬

যে রাজা দস্যুতা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যকারী ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে সে সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রজাদিগের বিদ্বেষের পাত্র হয়। রাজা নিজের মিত্রত্ব লাভের জন্য বা বিপুল ধনাগমের আশায় সমস্ত জনগণের ভয়াবহ সাহসিক (Criminals) দিগকে কখনই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবে না। ৩৪৭

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে

দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে।

আত্মনশ্চ পরিত্রাণে * * * *

স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ঘ্নন্ ধর্ম্মেণ ন দুষ্যতি॥ মনু, ৮ম অঃ ৩৪৮।৩৪৯

যেখানে ধর্ম্মের উপর আঘাত আসে—সেখানে দ্বিজাতিগণও শস্ত্র ধারণ করিবে। দ্বিজাতি এবং সমস্ত বর্ণের উপর কালকৃত বিপ্লব (ব্যাপক অত্যাচার) ঘটিলে—রাজা না থাকিলে বা রাজা নিজ কর্ত্তব্য না করিলে ব্রাহ্মণও আত্মত্রাণার্থ, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ্য রক্ষার্থ (আততায়ীকে) হিংসা করিলে দোষভাগী হইবে না। এই স্থানে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—"রাজার ব্যতিক্রম ঘটিলে এবং যুদ্ধ আরব্ধ হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষেও শস্ত্র গ্রহণীয়। সেইরাজ্যে রাজাই রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রতি ব্যক্তিকে আটকাইতে পারেন না, এমন কতকগুলি দুরাত্মা থাকিতে পারে, যাহারা বলবান্ রাজপুরুষকেও পীড়া দেয়, কিন্তু শস্ত্রধারীদের ভয় করে, এ জন্য সর্ব্বকালের জন্যই শস্ত্র ধারণ করা উচিত। (সার্ব্বকালিকং শস্ত্রধারণং যুক্তম্।) শুধু গ্রহণ নহে, শুধু ভয় দেখাইবার জন্য নহে, হিংসা পর্য্যন্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, পরের আক্রমণের জন্য এ বিধান নহে—কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য।

সমস্ত হিন্দুর মধ্যে আজ হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা বুঝাইয়া দিতে হইবে। আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিলেও অহিংসাধর্ম্মের হানি হয় না। 'নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন। প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি।' ঐ ঐ ৩৫১

আততায়ীকে বধ করিলে বধকর্ত্তার কোনও দোষ হয় না। প্রকাশ্য ভাবেই হউক বা অপ্রকাশ্যভাবে হউক,—সেস্থলে ক্রোধের অধিদেবতা ক্রোধকেই প্রাপ্ত হ'ন। এজন্য বধকারীর দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত বা অধর্ম্ম কিছুই হয় না। হিন্দু কখনও অপরকে আক্রমণ করিতে দেশান্তরে যায় নাই, নিজ ধর্ম্মের বোঝা জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপায় নাই, এবং আজও সে তাহা করে না বলিয়া সেই সুযোগ অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ হিন্দুকে জগতে দেখাইতে হইবে—পরকে আক্রমণ না করিলেও পরের আক্রমণকে সে ব্যর্থ করিতে পারে, ইহাই সংগঠনের প্রয়োজন।

এই সংগঠনকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রধানভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হিন্দু সমাজ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের চির-উপাসক। এই ধর্ম্মের প্রাণ হইল—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এবং দেহ হইল অর্থনীতি। অধ্যাত্ম-বাদ ও অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়াই আজও হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এক একটি হিন্দু সংহতি (communism)কে জাগাইয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের সমাজের সমস্ত অবয়বগুলি আজ উপেক্ষিত হইয়াছে; সমাজের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিত যাহারা, তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কুম্ভকার মাটীর পাত্র যোগাইত—সেখানে আসিয়াছে বৈদেশিক এলুমিনিয়ামের পাত্র; গোপ ঘৃত দুগ্ধ সরবরাহ করিত—তাহার স্থানে আসিয়াছে বনস্পতি ঘৃত ও বহুবিধ মলটেড মিল্ক; আমাদের বস্ত্রশিল্প তন্তুবায় সংহতির হস্তে ছিল, আজ বৈদেশিক যন্ত্র-পঙ্ক মধ্যে সে শিল্প নিমগ্ন হইতে বসিয়াছে। তৈলকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার,—

বেণুজীবী এ সকলকেই আহার দিতে হইবে। এই আহার দিবার সুসমঞ্জস বিধানই আমাদের হিন্দুদিগের সামাজিক সংগঠন। যদিও আজ চতুর্দ্দিকে দেবমন্দির খুলিবার ও পরস্পর পানভোজনাদির প্রবর্ত্তন হিন্দু-সংগঠনের উপায় বলিয়া শুনা যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে দেড়শত বৎসরের শিক্ষাগ্রহণের ফল। মাহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—

In my opinion, the idea that interdining or intermarryiny is necessary for national growth, is a superstition borrowed from the west. Eating is a process just as vital as the other sanitary necessities of life. (young India "Caste-system") আমার মতে—সহভোজন ও সহবিবাহ দ্বারা জাতীয়তা বৃদ্ধি পায়, ইহা পাশ্চাত্য দেশের ধার করা ভ্রান্তধারণা। ভোজন—স্নান শৌচাদির মতই জীবনধারণের অতি-প্রয়োজনীয় (ব্যক্তিগত) ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— "ভারতবর্ষ ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই মর্য্যাদাদান করিয়াছে এবং সে মর্য্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈতৃক কর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে সুলভতম তাহা পালনেই তাহার গৌরব, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।

* * * * *

ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দি দাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রাখা হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতে মানুষে মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে। বড়দের অনাত্মীয়তাব ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে,—সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সহজ কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পর আর কোন অগৌরব নাই। রামের বাড়ীতে শ্যামের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থির নিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু শ্যামের যদি এমন পাগলামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, রামের বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত এবং সেই বৃথা চেষ্টায় সে বারবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। ('মর্য্যাদা')

বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়, এইজন্য য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ বহির্ভূত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি, কোনো আপত্তি করি নাই। (স্বদেশী সমাজ)

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সামাজিক সংগঠন ছিল বিশ্বের আদর্শ। আজ চাষীর চাষ নাই, কৈবর্ত্তের হাতে নৌ-বিদ্যা নাই, বাগ্‌দি নমঃশূদ্রাদির হাতে লাঠি সড়্‌কী নাই, চর্ম্মের ব্যবসা চর্ম্মকারের শিক্ষা নাই, সকলকেই আমরা 'বাবু' করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। দেশের জমি পরহস্তগত, শস্য ফলফুল পরকীয় হস্তে তুলিয়া দিয়াছি—নৌকার মাঝি ও সারেঙ্গের কাজ অধিকাংশই আমাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিজেদের চিরন্তন মর্য্যাদার অমর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি। এক্ষণে প্রয়োজন—পুনঃ সংগঠন। ভারতের প্রত্যেক হিন্দু তাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় বাবদে হিসাব করিয়া দেখিতে চেষ্টা করুন,—ভারতের অর্থ হিন্দুর অর্থ—আমাদের নিজজনের হাতে অধিক পরিমাণে যায় কি না।

> শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
> মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ। (মনু ১১শ অঃ)

সমর্থ ব্যক্তি পরজনকে দান করিতেছেন, অথচ স্বজন দুঃখে প্রাণধারণ করিতেছে, সে দান আপাতমধুর পরিণামবিষময় ধর্ম্মাভাসমাত্র, ধর্ম্ম নহে।

দেশের কোটি কোটি টাকা আজ বিদেশে যাইতেছে তাহার আকর্ষণও স্বজনগণের মধ্যে সম্বরণ করাই হইল এখন দেশের প্রধান উপায়।

পণ্ডীচেরী আশ্রম

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

আশ্রম বলতেই সাধারণত লোক মনে করে ইহ-বিমুখ, কর্ম্মবিহীন ধ্যান, মৌনী, বৈরাগী এবং সন্ন্যাসীর আস্তানা। শতকরা নিরানব্বই জনের এ ধারণার মাঝে আমার চিন্তাধারাও ছিল লুকিয়ে। কিন্তু পণ্ডিচেরীর পথে যেদিন চর্ম্মচক্ষু নিয়ে এসে দাঁড়ালাম, সেদিন আমার সমস্ত কল্পনা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ফিরলো বাস্তব সত্যের রূঢ় প্রকাশে। আশ্রমের প্রচলিত সংজ্ঞা আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। দেখলাম এ আশ্রমের বৃহত্তর ও পৃথক সংজ্ঞা। বিভিন্নমুখী বিপুল কর্ম-প্রবাহের যে স্রোত এখানে প্রবহমান, তারই সামান্তে দাঁড়িয়ে তারই প্রাণস্পন্দন অনুভব করা কর্ম্মকল্পনা নয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "মহামানবের সাগর তীর" যেন সার্থকরূপী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ আশ্রমের প্রতিকক্ষে।

রকমারী জাতের সমাবেশে পণ্ডিচেরীর আশ্রম আজ পৃথিবীর তীর্থে পরিণত হয়েছে। এ উন্মুক্ত সাগর সঙ্গমে ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা-বর্ণের মানব-নদী এসে মিলিত হয়েছে কোন্ এক মহাসাধনার মহাক্ষণকে স্মরণীয় করবে বলে কে জানে।

এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র কর্ম কোলাহল নেই। মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির যে নীরব নিপুণ ছন্দে ভোরের কুসুম ফোটে, পূর্ব্বাকাশে সূর্য ওঠে, নদী বয়ে চলে—এখানকার সকল কাজও যেন সে উদার অনন্ত নিবিড় ছন্দে বাঁধা। সংসারে অবশ্য কর্ম ও কর্মময় প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। কিন্তু এ আশ্রমের যথেষ্ট বৈশিষ্ট রয়েছে বলেই এ সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের ঊর্দ্ধে। এখানকার কর্মানুষ্ঠান অন্যান্য কর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সর্বত্র সাধক সাধকারা বিভিন্ন বিভাগে নীরবে আপন আপন কাজ স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন করে চলেছে। এখানে কেবল কাজের জন্য কাজ, কেউ আকাঙ্ক্ষা করে না; সকলেই এখানে কাজ করে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের উপায় হিসাবে। তারা কর্মকে গ্রহণ করছে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও পূর্ণযোগের এক বিশিষ্ট অঙ্গ কর্মযোগ হিসাবে। কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্দ্ধর পার্থকে উপলক্ষ করে যে যোগের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আজও অবহেলিত অথচ যার সাধনা ও সিদ্ধি ভিন্ন মানবজাতির ও মানবজীবনের মূল সমস্যা সমাধানের অন্য পথ নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি—আশ্রম বলতে লোকে যা ভাবে, কর্ম-বিমুখ, মানবসমাজত্যাগী, সাধু সন্ন্যাসীর আখড়া—এ তা মোটেই নয়। কর্মপ্রবণ বাস্তব পৃথিবীরই মতো এখানে রয়েছে আশ্রমের তাঁতশালা, কামারশালা, রুটির কারখানা, গোশালা, ছাপাখানা, বই বাঁধানোর কারখানা, ছেলেমেয়েদের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক রুচিসঙ্গত বিদ্যালয়, আর আশ্রমের বিরাট সুন্দর পাঠাগার। এখানে রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, গায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার—বিখ্যাত, স্বনামখ্যাত, অখ্যাত, এমনি কতো প্রতিভা। এ যেন একটা স্বতন্ত্র আত্মনির্ভরশীল রাজ্য। মানুষের একমাত্র পরিচয় এখানে মানুষ। রিয়ালিটি বা বাস্তববাদের এত সম্পূর্ণ চেহারা আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না। আশ্রমবাসীদের মর্যাদা ডিগ্রীর তৌল বা পরিমাণে নয়—আপন সত্তা-[illegible] বিকাশে। তাই জ্ঞানের সীমা কোথাও এর দিগন্ত এঁকে দেয় না। পণ্ডিচেরী আশ্রমে জাতি, ধর্ম্ম, দেশবিদেশের সংস্কারজনিত কোন ভেদের প্রাচীর নেই,—ধনী দরিদ্র একই পথে মানুষের অধিকারে উন্নতমস্তকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে,—পৃথিবীতে এ উদাহরণ অসাধারণ!

আরো উল্লেখযোগ্য—এখানকার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও জীবন জগদাতীত ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি নয়; কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির ভেতর দিয়ে পরম সত্যসুন্দরকে—কল্যাণময় ভগবানকে—সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে জীবনে ও জগতে প্রতিষ্ঠা করাই এখানকার উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"Life is the altar, works our offering, the transcendental will is the Deity" এই কারণেই দেখি এখানে প্রত্যেকটি কাজের প্রতি, জীবনের প্রতিটি ঘটনার প্রতি কি জলন্ত জাগ্রত দৃষ্টি; তাতে জীবনের এবং কাজের কোথাও কোন খুঁত, কিছুমাত্র অপূর্ণতা না থাকে। তারা কাজকে মনে করে জীবনের প্রকাশ, তাই কাজের পরিপূর্ণতার জন্য তাদের এত যত্ন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে নারীজীবনের যে স্বচ্ছন্দ মুক্তির জোয়ার, সারা ভারতবর্ষের কোথাও সে পবিত্র সহজ জীবন যাপনের স্রোতস্বতী নেই, একথা প্রত্যেক দর্শনকাঙ্ক্ষী মানুষই এখানে এসে স্বীকার করে থাকে। মেয়েদের অন্তর জীবন ও বহির্জীবন বিকাশের এমন সর্বাঙ্গীণ সুযোগ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। পৃথিবীর অপরাপর দেশে নারীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতার যে সব বিবরণ শোনা যায় কোথাও তা নির্মল নয়; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর নয়। এখানে বাইরের কোন আইন-কানুন, বিধিবিধান বা উপদেশদান নেই। কিন্তু তবুও অন্যখানে হাজারো উপদেশ বিধি বিধান ও বক্তৃতায় যা সম্ভব হয়নি, আপন অন্তর তপস্যায় এখানে তা সার্থক হয়েছে নির্বিরোধে। প্রশ্ন জাগে—"কি করে এ সম্ভব হ'ল এখানে।" মনের মধ্যেই উত্তর পাই—"তারা যে মানব জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শকে আপনার

কলিকাতার আশেপাশে বাসগৃহ সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলাদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত হওয়ায় উভয় অংশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে তীব্র ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই আতঙ্কজনিত দুর্ভাবনায় পূর্ব্ববাঙ্গলার সহস্র সহস্র হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসস্থান পরিত্যাগ করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে বলিয়াই মনে হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কতকগুলি লোক এইভাবে পলাইয়া আসিবার সুযোগ পাইলেও বহু হিন্দুকে পূর্ব্ববঙ্গে বাধ্য হইয়া থাকিয়া যাইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে লোক কমিয়া যাওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক হইতে নিঃসন্দেহে অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া ভীড় বাড়ান সমর্থন করা যায় না। তবে নীতির দিক দিয়া এই অসমর্থনের কথা তুলিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেদের এত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের পলায়নপর মনোবৃত্তিকে নিন্দা করার অর্থ তাঁহাদের একান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তোলা। এইরূপ যাঁহারা এখন পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্য না হইলেও অনেকের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে জায়গা খুঁজিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত অবস্থাপন্ন, টাকার জোরে তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই; কিন্তু এই ধরণের জনকতক বড়লোককে বাদ দিলে আর যাঁহারা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বল্প পুঁজি লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন অবশ্যই বড় করিয়া দেখিতে হইবে।

যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম বাঙ্গলায় বাসগৃহ সমস্যা দেখা দিয়াছে। জমি ও বাড়ীর দর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি এই সঙ্কটজনক অবস্থার প্রধান কারণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর গত ৮ বৎসরে দেশে যথেষ্ট লোক বাড়িয়াছে, অথচ নূতন বাড়ী ঘর বলিতে গেলে মোটেই তৈয়ারী হয় নাই। যুদ্ধকালীন অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নূতন এক ধনশালী শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ নানাকারণে জমি ও বাড়ীর চাহিদা সম্প্রতি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তদনুপাতে দরও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। ইহার উপর বাঙ্গলা ভাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা করুণ, নিরুপায় হইয়া ইঁহারা সর্ব্বস্ব বিনিময়েও মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহে উৎসুক হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের সহর ও বাসযোগ্য গ্রামগুলিতে জমি বা বাড়ীর মূল্য গত এক মাসের মধ্যেই অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি চাহিদার চাপে সম্ভব হইলেও জমি বা বাড়ীর মালিকদের চোরাবাজারী মুনাফাবৃত্তিও নিঃসন্দেহে ইহার জন্য দায়ী। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া জমি বা বাড়ীওয়ালাদের অনেকে ভাড়া, সেলামী অথবা জমির বিক্রয় মূল্য হিসাবে বেশ দু পয়সা কামাইয়া লইতেছেন। ভাড়ার জন্য কলিকাতা সহরে তবু 'রেণ্ট কণ্ট্রোলার' আছে, কিন্তু বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোন আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় অবস্থা সর্ব্বত্রই ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব্ববঙ্গীয় অসহায় আশ্রয়প্রার্থীরা তো আয়ত্তাতীত মূল্যের জন্য আশ্রয়স্থল সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মনোক্ষুণ্ণ হইতেছেনই, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের জমি বা বাড়ীর একান্ত প্রয়োজন, তাঁহাদেরও অসুবিধার সীমা থাকিতেছে না। আজকাল বাড়ী তৈয়ারীর জিনিষপত্রের অভাব এবং অগ্নিমূল্য সর্ব্বজনবিদিত, ইহার উপর জমির ব্যাপারে মুনাফাবৃত্তি এবং চোরাকারবার পুরোদমে চলিতেছে বলিয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় (বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এবং কলিকাতার আশে পাশে ২০।২৫ মাইলের মধ্যে) বাসগৃহ সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

এই সাংঘাতিক অবস্থা যে চলিতে দেওয়া যায় না, তাহা বলা নিস্প্রয়োজন। এইরূপ জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণও কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার নয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থবান ব্যক্তিগণ বা ব্যবসাদারেরা সমবেতভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর না হইলে ইহার সমাধান সত্যই আশা করা যায় না।

পশ্চিম বাঙ্গলার কর্ত্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে জমি বিক্রয় সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্ত্তন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া যে পশ্চিম বাঙ্গলায় অতঃপর যে জমি হস্তান্তরিত হইবে তাহার মূল্য যুদ্ধের আগের হিসাবে কোন ক্ষেত্রেই তিন গুণের বেশী হইতে পারিবে না (মোটামুটি খাদ্য-মূল্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া এই ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে)। এ ছাড়া সরকারের এমন এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতাদি সহরের সহরতলী অঞ্চলে বড় বড় জমির দখল লইয়া বহু সংখ্যক ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারী হইতে পারে। এই ভাবে জমি দখলের জন্য প্রচলিত ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন এ্যাক্টের বা জমি দখলের আইনের সুবিধা গভর্ণমেণ্ট অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। একসঙ্গে কাজ হইবে বলিয়া এই সব বাড়ী তৈয়ারীর খরচ অনেক কম পড়িবে এবং বিক্রয় করা হউক বা ভাড়া দেওয়া হউক, যাঁহারা বাড়ী দখল করিবেন তাঁহারা লাভবান হইবেনই। এইরূপ ব্যবস্থা যে

াভজনক তাহা ইতিপূর্ব্বেই এদেশের একাধিক 'বিল্ডিং সোসাইটি' বা ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী'র সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে। ়তরাং পশ্চিম বাঙ্গলার সরকার যদি এইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী রেন তাহাতে তাঁহাদের আর্থিক লাভ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা াছে। অবশ্য এজন্য অনেকগুলি টাকা এখনই বাহির করিতে ইবে। পশ্চিম বাঙ্গলার সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া ধনের সংস্থান অবশ্যই বড় কথা ; তবে এইরূপ লাভজনক কারবারের য়িত্ব যদি সরকার গ্রহণ করেন এবং তদুদ্দেশ্যে চার পাঁচ কোটি টাকার াপত্র বাজারে ছাড়েন, এখনকার ফাঁপাই টাকার বাজারে টাকা গ্রহে তাঁহাদের বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই রবারে লাভের হার বেশী, ঋণপত্রের জন্য সাধারণতঃ তাঁহারা যে দর হার স্থির করেন, এক্ষেত্রে সে তুলনায় সুদ অনায়াসেই একটু শী করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে অর্থবান দেশবাসী এই বিশেষ পত্রে টাকা লগ্নী করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে কারী উদ্যোগে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা ইতিহাসে নূতন ব্যাপার নয়। লা সরকারই ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাকে পূর্ব্বাঞ্চলে বাড়াইবার জন্য রূপ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ কর্পোরেশন মারফৎ াজ সরকারেরও এই ধরণের একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার া হইয়াছে। হল্যাণ্ডে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ— ১৪ বৎসরের মধ্যে যত বাড়ীঘর তৈয়ারী হইয়াছে তাহার শতকরা ভাগ হইয়াছে সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় ও যো।

সরকারী প্রচেষ্টার মূল্যও গুরুত্ব অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের বাসগৃহ ার সমাধানে অর্থবান দেশবাসীর চেষ্টাও নানাভাবে ফলপ্রসূ হইতে । যুদ্ধের আগে জমি বা বাড়ীর বাজার দর যখন অত্যন্ত নীচে তখনও কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে জমির ব্যবসা করিয়া বা একত্রে গুলি বাড়ী তৈয়ারী করিবার পর খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিয়া মুনাফাভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। এখন লোকের হাতে কিছু হইয়াছে, বাজার এখনও খুবই চড়া, এসময় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান ড় জমি সংগ্রহ করিয়া জমির উন্নতিসাধনের পর বাড়ী তৈয়ারী বা শুধু জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বেচিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে । অবশ্য এইভাবে লাভবান হওয়ার অর্থ চোরাকারবারের মুনাফা ব্যবস্থা হওয়া নয়। এভাবে জমি বা বাড়ীর মুনাফাখোরী ব্যবসা তিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক আকারে সুরু হইয়াছে, সেকথা বলা হইয়াছে। আমরা যে ব্যবসার কথা বলিতেছি তাহাতে ারদের বা অর্থবান ব্যক্তিদের আশ্রয়হীন দেশবাসীর প্রতি ুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক বা সরকারী ঋণপত্রে টাকা লে তাঁহারা যে হারে সুদ পাইয়া থাকেন, এই ব্যবসায় তদপেক্ষা বেশী মুনাফা ভোগ করিয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ার খাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্য সুদের উচ্চ হারের প্রশ্ন কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবসাটি এতই নিরাপদ যে টাকা লোকসান হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। দুচারজন বিত্তশালী ও হৃদয়বান ব্যক্তি উৎসাহ করিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিলেই এইরূপ জমি বা বাড়ী কেনা-বেচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকাল লোকে নিরুপায় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা ফেলিয়া রাখে এবং তজ্জন্য সুদ যা পায় তাহা একান্ত নগণ্য। ভাল ব্যাঙ্ক ছাড়া দেশের যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খল অর্থ-নৈতিক অবস্থায় সাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাও এখন এমন কিছু নিরাপদ নয়।

প্রকৃতপক্ষে এখনও কলিকাতার কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলে বহু বড় বড় জমি পড়িয়া আছে। এই সব জমির কতকাংশ উন্নত এবং সেগুলির দামও এখন চাহিদার চাপে কিছুটা বাড়িয়াছে, তবে অনুন্নত জমির পরিমাণই বেশী। বেশী টাকা লইয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ অনুন্নত জমির উন্নতিসাধন করা সম্ভব। এই ধরণের জমির ক্রয়-মূল্য নিশ্চয়ই কম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে জমির উন্নতি করিয়া লইলেও কিছু লাভ রাখিয়া এখনও তাঁহারা সস্তাদরেই এই জমি বিক্রয় করিতে পারেন। এই সব জমির মধ্যে খুব বড় জমি থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে জমি ভরাট করা বা জমির উন্নতি করা, ড্রেন রাস্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, এমন কি জলের কল ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা করাও একেবারে অসম্ভব নয়। বি এণ্ড এ রেলপথের মেন লাইন ও খুলনা লাইনের মধ্যে, ডায়মণ্ডহারবার ও বজবজ লাইনের মধ্যে, ই আই আর ও বি এন আর লাইনে কলিকাতার কাছাকাছি ২০।২৫ মাইলের মধ্যে এইরূপ অসংখ্য বড় জমি পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ই আই আর কর্ড লাইনে ডানকুনির জলার এবং খুলনা লাইনে হাবড়ার মাঠের কথা উল্লেখ করা যায়। এই জমিগুলি উন্নত হইলে এবং এখানে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে সেই সব বাড়ীর বাসিন্দারা অক্লেশেই দৈনিক কলিকাতায় আসিয়া চাকুরী পর্য্যন্ত করিতে পারেন। কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে ১০।১৫ মাইলের মধ্যে (রেলষ্টেশনের একটু কাছে বা বাসপথের উপর হইলে) জমির দাম অন্ততঃ পক্ষে ২০০ টাকা কাঠা, উপরোক্তভাবে জমি তৈয়ারী করিয়া লইলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লগ্নী টাকার উপর শতকরা ১২ টাকা হিসাবে মুনাফা ধরিয়াও ১০০ টাকার মধ্যে (রেলপথ হইতে একটু ভিতরে হইলে আরও সস্তায়) সমদূরত্বের প্রতি কাঠা জমি বিক্রীত হইতে পারে। এই সব জমির স্বাস্থ্য বা সুবিধা পল্লী অঞ্চলে যে সব জমি বর্ত্তমানে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহাদের তুলনায় অবশ্যই বেশী হইবে। এখন বাড়ী তৈয়ারী এক প্রচণ্ড সমস্যা, অতি কষ্টে জমি জুটাইলেও মালপত্রের অভাবে বাড়ী তৈয়ারী করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিত্তশালী কোন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিলে এবাজারে খরচ অনেক কম পড়িবে এবং কিছুটা মুনাফা রাখিয়া সেই সব বাড়ী নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কিস্তিবন্দী হারে বিক্রয় করিলে দেশের একটি স্থায়ী কল্যাণ হইবে। আইনের বাঁধন থাকিবে বলিয়া এইরূপ কারবারে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। নূতন নগর বা পল্লী গঠনের সময়

কলিকাতার আশেপাশে বাসগৃহ সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলাদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত হওয়ায় উভয় অংশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে তীব্র ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই আতঙ্কজনিত দুর্ভাবনায় পূর্ব্ববাঙ্গলার সহস্র সহস্র হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসস্থান পরিত্যাগ করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে বলিয়াই মনে হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কতকগুলি লোক এইভাবে পলাইয়া আসিবার সুযোগ পাইলেও বহু হিন্দুকে পূর্ব্ববঙ্গে বাধ্য হইয়া থাকিয়া যাইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে লোক কমিয়া যাওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক হইতে নিঃসন্দেহে অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া ভীড় বাড়ান সমর্থন করা যায় না। তবে নীতির দিক দিয়া এই অসমর্থনের কথা তুলিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেদের এত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের পলায়নপর মনোবৃত্তিকে নিন্দা করার অর্থ তাঁহাদের একান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তোলা। এইরূপ যাঁহারা এখন পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্য না হইলেও অনেকের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে জায়গা খুঁজিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত অবস্থাপন্ন, টাকার জোরে তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই ; কিন্তু এই ধরণের জনকতক বড়লোককে বাদ দিলে আর যাঁহারা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অল্পস্বল্প পুঁজি লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন অবশ্যই বড় করিয়া দেখিতে হইবে।

যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম বাঙ্গলায় বাসগৃহ সমস্যা দেখা দিয়াছে। জমি ও বাড়ীর দর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি এই সঙ্কটজনক অবস্থার প্রধান কারণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর গত ৮ বৎসরে দেশে যথেষ্ট লোক বাড়িয়াছে, অথচ নূতন বাড়ী ঘর বলিতে গেলে মোটেই তৈয়ারী হয় নাই। যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নূতন এক বিত্তশালী শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ নানাকারণে জমি ও বাড়ীর চাহিদা সম্প্রতি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তদনুপাতে মূল্যও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। ইহার উপর বাঙ্গলা ভাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইতেছেন। ইহাদের অবস্থা করুণ, নিরুপায় হইয়া ইঁহারা সর্ব্বস্ব বিনিময়েও মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহে উৎসুক হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের সহর ও বাসযোগ্য গ্রামগুলিতে জমি বা বাড়ীর মূল্য গত এক মাসের মধ্যেই অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি চাহিদার চাপে সম্ভব হইলেও জমি বা বাড়ীর মালিকদের চোরাবাজারী মুনাফাবৃত্তিও নিঃসন্দেহে ইহার জন্য দায়ী। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া জমি বা বাড়ীওয়ালাদের অনেকে ভাড়া, সেলামী অথবা জমির বিক্রয় মূল্য হিসাবে বেশ দু পয়সা কামাইয়া লইতেছেন। ভাড়ার জন্য কলিকাতা সহরে তবু 'রেণ্ট কণ্ট্রোলার' আছে, কিন্তু বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোন আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় অবস্থা সর্ব্বত্রই ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব্ববঙ্গীয় অসহায় আশ্রয়প্রার্থীরা তো আয়ত্তাতীত মূল্যের জন্য আশ্রয়স্থল সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মনোক্ষুণ্ণ হইতেছেনই, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের জমি বা বাড়ীর একান্ত প্রয়োজন, তাঁহাদেরও অসুবিধার সীমা থাকিতেছে না। আজকাল বাড়ী তৈয়ারীর জিনিষপত্রের অভাব এবং অগ্নিমূল্য সর্ব্বজনবিদিত, ইহার উপর জমির ব্যাপারে মুনাফাবৃত্তি এবং চোরাকারবার পুরোদমে চলিতেছে বলিয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় (বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এবং কলিকাতার আশে পাশে ২০।২৫ মাইলের মধ্যে) বাসগৃহ সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

এই সাংঘাতিক অবস্থা যে চলিতে দেওয়া যায় না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণও কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার নয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থবান ব্যক্তিগণ বা ব্যবসাদারেরা সমবেতভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর না হইলে ইহার সমাধান সত্যই আশা করা যায় না।

পশ্চিম বাঙ্গলার কর্ত্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে জমি বিক্রয় সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্ত্তন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া যে পশ্চিম বাঙ্গলায় অতঃপর যে জমি হস্তান্তরিত হইবে তাহার মূল্য যুদ্ধের আগের হিসাবে কোন ক্ষেত্রেই তিন গুণের বেশী হইতে পারিবে না (মোটামুটি খাদ্য-মূল্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া এই ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে)। এ ছাড়া সরকারের এমন এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতাদি সহরের সহরতলী অঞ্চলে বড় বড় জমির দখল লইয়া বহু সংখ্যক ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারী হইতে পারে। এই ভাবে জমি দখলের জন্য প্রচলিত ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন এ্যাক্টের বা জমি দখলের আইনের সুবিধা গভর্ণমেণ্ট অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। একসঙ্গে কাজ হইবে বলিয়া এই সব বাড়ী তৈয়ারীর খরচ অনেক কম পড়িবে এবং বিক্রয় করা হউক বা ভাড়া দেওয়া হউক, যাঁহারা বাড়ী দখল করিবেন তাঁহারা লাভবান হইবেনই। এইরূপ ব্যবস্থা যে

লাভজনক তাহা ইতিপূর্ব্বেই এদেশের একাধিক 'বিল্ডিং সোসাইটি' বা 'ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী'র সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম বাঙ্গলার সরকার যদি এইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করেন তাহাতে তাঁহাদের আর্থিক লাভ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এজন্য অনেকগুলি টাকা এখনই বাহির করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলার সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া মূলধনের সংস্থান অবশ্যই বড় কথা ; তবে এইরূপ লাভজনক কারবারের দায়িত্ব যদি সরকার গ্রহণ করেন এবং তদুদ্দেশ্যে চার পাঁচ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়েন, এখনকার ফাঁপাই টাকার বাজারে টাকা সংগ্রহে তাঁহাদের বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কারবারে লাভের হার বেশী, ঋণপত্রের জন্য সাধারণতঃ তাঁহারা যে সুদের হার স্থির করেন, এক্ষেত্রে সে তুলনায় সুদ অনায়াসেই একটু বেশী করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে অর্থবান দেশবাসী এই বিশেষ ঋণপত্রে টাকা লগ্নী করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সরকারী উদ্যোগে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা ইতিহাসে নূতন ব্যাপার নয়। বাঙ্গলা সরকারই ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাকে পূর্ব্বাঞ্চলে বাড়াইবার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ কর্পোরেশন মারফৎ মাদ্রাজ সরকারেরও এই ধরণের একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হল্যাণ্ডে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ— এই ১৪ বৎসরের মধ্যে যত বাড়ীঘর তৈয়ারী হইয়াছে তাহার শতকরা ৪৮ ভাগ হইয়াছে সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ও সাহায্যে।

সরকারী প্রচেষ্টার মূল্য ও গুরুত্ব অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের বাসগৃহ সমস্যার সমাধানে অর্থবান দেশবাসীর চেষ্টাও নানাভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে। যুদ্ধের আগে জমি বা বাড়ীর বাজার দর যখন অত্যন্ত নীচে ছিল, তখনও কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে জমির ব্যবসা করিয়া বা একত্রে কতকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিবার পর খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট মুনাফাভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। এখন লোকের হাতে কিছু টাকা হইয়াছে, বাজার এখনও খুবই চড়া, এসময় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বড় বড় জমি সংগ্রহ করিয়া জমির উন্নতিসাধনের পর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বা শুধু জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বেচিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। অবশ্য এইভাবে লাভবান হওয়ার অর্থ চোরাকারবারের মুনাফা-বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া নয়। এভাবে জমি বা বাড়ীর মুনাফাখোরী ব্যবসা যে ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক আকারে সুরু হইয়াছে, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। আমরা যে ব্যবসার কথা বলিতেছি তাহাতে ব্যবসাদারদের বা অর্থবান ব্যক্তিদের আশ্রয়হীন দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক বা সরকারী ঋণপত্রে টাকা খাটাইলে তাঁহারা যে হারে সুদ পাইয়া থাকেন, এই ব্যবসায় তদপেক্ষা কিছুটা বেশী মুনাফা ভোগ করিয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। টাকা মার যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্য সুদের উচ্চ হারের প্রশ্ন উঠে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবসাটি এতই নিরাপদ যে ইহাতে লোকসান হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। দুচারজন বিত্তশালী ও হৃদয়বান ব্যক্তি উৎসাহ করিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিলেই এইরূপ জমি বা বাড়ী কেনা-বেচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকাল লোকে নিরুপায় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা ফেলিয়া রাখে এবং তজ্জন্য সুদ যা পায় তাহা একান্ত নগণ্য। ভাল ব্যাঙ্ক ছাড়া দেশের যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খল অর্থ-নৈতিক অবস্থায় সাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাও এখন এমন কিছু নিরাপদ নয়।

প্রকৃতপক্ষে এখনও কলিকাতার কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলে বহু বড় বড় জমি পড়িয়া আছে। এই সব জমির কতকাংশ উন্নত এবং সেগুলির দামও এখন চাহিদার চাপে কিছুটা বাড়িয়াছে, তবে অনুন্নত জমির পরিমাণই বেশী। বেশী টাকা লইয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ অনুন্নত জমির উন্নতিসাধন করা সম্ভব। এই ধরণের জমির ক্রয়-মূল্য নিশ্চয়ই কম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে জমির উন্নতি করিয়া লইলেও কিছু লাভ রাখিয়া এখনও তাহারা সস্তাদরেই এই জমি বিক্রয় করিতে পারেন। এই সব জমির মধ্যে খুব বড় জমি থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে জমি ভরাট করা বা জমির উন্নতি করা, ড্রেন রাস্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, এমন কি জলের কল ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা করাও একেবারে অসম্ভব নয়। বি এণ্ড এ রেলপথের মেন লাইন ও খুলনা লাইনের মধ্যে, ডায়মণ্ডহারবার ও বজবজ লাইনের মধ্যে, ই আই আর ও বি এন আর লাইনে কলিকাতার কাছাকাছি ২০।২৫ মাইলের মধ্যে এইরূপ অসংখ্য বড় জমি পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ই আই আর কর্ড লাইনে ডানকুনির জলার এবং খুলনা লাইনে হাবড়ার মাঠের কথা উল্লেখ করা যায়। এই জমিগুলি উন্নত হইলে এবং এখানে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে সেই সব বাড়ীর বাসিন্দারা অক্লেশেই দৈনিক কলিকাতায় আসিয়া চাকুরী পর্য্যন্ত করিতে পারেন। কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে ১০।১৫ মাইলের মধ্যে (রেলষ্টেশনের একটু কাছে বা বাসপথের উপর হইলে) জমির দাম অন্ততঃ পক্ষে ২৫০ টাকা কাঠা, উপরোক্তভাবে জমি তৈয়ারী করিয়া লইলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লগ্নী টাকার উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে মুনাফা ধরিয়াও ১০০ টাকার মধ্যে (রেলপথ হইতে একটু ভিতরে হইলে আরও সস্তায়) সমদূরত্বের প্রতি কাঠা জমি বিক্রীত হইতে পারে। এই সব জমির স্বাস্থ্য বা সুবিধা পল্লী অঞ্চলে যে সব জমি বর্ত্তমানে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহাদের তুলনায় অবশ্যই বেশী হইবে। এখন বাড়ী তৈয়ারী এক প্রচণ্ড সমস্যা, অতি কষ্টে জমি জুটাইলেও মালপত্রের অভাবে বাড়ী তৈয়ারী করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিত্তশালী কোন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিলে এবাজারে খরচ অনেক কম পড়িবে এবং কিছুটা মুনাফা রাখিয়া সেই সব বাড়ী নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কিস্তিবন্দী হারে বিক্রয় করিলে দেশের একটি স্থায়ী কল্যাণ হইবে। আইনের বাঁধন থাকিবে বলিয়া এইরূপ কারবারে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। নূতন নগর বা পল্লী গঠনের সময় স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য রক্ষার যে স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব, পুরাতন গ্রাম

বা সহরে সেই সম্ভাবনা নাই বলিলে চলে। এদিক হইতেও বড় বড় জমিতে যে বাড়ীগুলি বা রাস্তাঘাট তৈয়ারী হইবে সেগুলি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর কোন পরিকল্পনা অনুসারে অনায়াসেই হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিতে এই নগর পরিকল্পনা বা টাউন প্ল্যানিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। অবশ্য এখন ক্রমেই পশ্চিম বঙ্গে বাসগৃহ সমস্যা এত জটিল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে যে, যে সব প্রতিষ্ঠান সরকার সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া (অর্থাৎ নিজেদের পকেট ভর্ত্তি যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না, দুর্গত দেশবাসীর দুঃখের পানে চাহিয়াই যাহারা লাভের হিসাব করিবেন) এইরূপ জমি বা বাড়ীর কারবার সুরু করিবেন, তাহাদের প্রচুর টাকা লইয়া নামিতে হইবে। এখনকার অবস্থায় অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা না লইয়া এইরূপ কাজ আরম্ভ করা চলে না। তবে আশার কথা এই যে মুদ্রা সম্প্রসারণের যুগ শেষ হইয়া আসিলেও ফাঁপাই টাকার যুগ এখনও চলিতেছে এবং লোকের হাতে এখনও বাড়তি টাকা আছে বলিয়া উপযুক্ত ও দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা এইরূপ বড় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হইলে এখন কিছুদিন অন্ততঃ মূলধনের অভাব হইবে না। পশ্চিম বঙ্গে বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই লোকায়ত্ত সরকারের উচিত নিজ চেষ্টায় বর্ত্তমান বাসগৃহ সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানের ব্যবস্থা করা। এই কর্ত্তব্যপালনে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহের অভাব হইবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। জমি ও বাড়ী কেনাবেচার ব্যাপারে অবাঞ্ছিত মুনাফাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তন করা তাহাদের জনসাধারণের সেবা করিবার আগ্রহের অন্যতম পরিচয় হইবে সন্দেহ নাই। এছাড়া উপরিউক্ত নীতিতে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি জমি ও বাড়ী কেনাবেচার কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, পশ্চিম বঙ্গীয় মন্ত্রী-সভা সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে সব দিক হইতে সাহায্য না করিয়া পারেন না। এজন্য গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী দুষ্প্রাপ্য মালপত্র ন্যায্য দামে সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 'ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট' অনুসারে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বড় বড় পতিত বা অনুন্নত জমি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সকল প্রকার সাহায্যই আশা করা যায়।

নারী-ধর্ম

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল বাচস্পতি এম-এ, পিএচ্-ডি

বনবাসকালে রাম চিত্রকূটে বাস করিয়া নানাপ্রকার কর্ম দ্বারা এমন চরিত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন যাহা অদ্ভুত।

কিন্তু পরে বুঝিলেন—এখানে আমি আছি সকলে জানিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগমের সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া সেখানকার মুনিদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত দুই ভাই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে অত্রিমুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। তাঁহার আসার কথা শুনিয়া মুনি বড় আনন্দিত হইলেন। প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য তিনি পুলকিত শরীরে বাহিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া রামও ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। মুনি রামকে বুকে লইলেন, এবং দুই ভাইকে প্রেমাশ্রু দ্বারা স্নান করাইয়া দিলেন। রামের শরীরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুটী জুড়াইয়া গেল। তিনি সীতাসহ রাম লক্ষ্মণকে সাদরে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাদিগকে বসাইয়া পরম জ্ঞানী মুনিশ্রেষ্ঠ রামকে অনেক শ্লোকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল শ্যামসুন্দর। তুমি শংকরবন্দিত, ব্রহ্মাদি দেব দ্বারা পূজিত। তুমি ইচ্ছাময় ও ত্রিগুণাতীত। তোমার চরণকমলে ভক্তি দাও। আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণ কখনো ত্যাগ না করে।

সুশীলা বিনয়ী সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রণাম করিলেন। সীতাকে পাইয়া অনসূয়া দেবীর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। তিনি সীতাকে নিকটে বসাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনসূয়া সীতাকে এমন সুন্দর বসনভূষণ পরাইলেন যাহা নিত্য নূতন ও অমল থাকে। তিনি সীতাকে নারী ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

হে রাজকুমারী, শোনো। বাপ, মা, ভাই, হিতকারীরা যাহা দিতে পারে, তাহার সীমা আছে, কিন্তু হে বৈদেহী, স্বামী অমিত দাতা, তাঁহার দানের সীমা নাই। যে সেই স্বামীর সেবা না করে, সে অধম। ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী এই চারিটীর পরীক্ষা হয় আপদকালেই। বৃদ্ধ, রুগ্ন, মূর্খ, ধনহীন, অন্ধ, বধির, ক্রোধী, অতি দরিদ্র, এই প্রকার স্বামীর অপমান করিলে নারী যমালয়ে অশেষ কষ্ট পায়। স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম ও একমাত্র ব্রত কায়মনোবাক্যে পতির চরণে ভক্তি রাখা। জগতে চারি প্রকার পতিব্রতা স্ত্রী আছে—উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। ইহাদের কথা পুরাণশাস্ত্র বলিতেছি, মন দিয়া শোনো।

উত্তম পতিব্রতা স্ত্রীর মনে স্বপ্নেও এই ভাব থাকে যে, জগতে আর অন্য পুরুষ নাই। মধ্যম পতিব্রতা পরের স্বামীকে নিজ ভাই বা পুত্রের মত দেখে। ধর্ম বিচার করিয়া ও বুঝিয়া যে কুলে থাকে সে নিকৃষ্ট। আর কেহ যা সুযোগ না পাইয়া বা ভয়ে কুলে থাকিয়া যায়। তাহাকে জগতে অধম নারী বলিয়া জানিও। যে স্ত্রী স্বামীর সহিত ছলনা করে ও পরের স্বামীর সহিত প্রেম করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে বাস করে। ক্ষণিকের সুখের জন্য যে শতকোটী জন্মের দুঃখ বুঝিতে পারে না, তাহার সমান মন্দ আর কে আছে? যে স্ত্রী পতিব্রতা ধর্ম অকপটে পালন করে, সে বিনাশ্রমে মোক্ষ পায়। যে স্বামী-বিমুখ, সে পর-জন্মে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়।

শোনো, সীতা! তোমার নাম স্মরণ করিয়া নারীরা পতিব্রতা ধর্ম পালন করিবে। তুমি রামের প্রাণপ্রিয়া। সংসারের হিতের জন্য আমি এই কথা বলিলাম।

অনসূয়ার উপদেশ শুনিয়া সীতা অতিশয় প্রীতি পাইলেন, এবং সাদরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

চিত্রশিল্পে মহিলার সাধনা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় চতুঃষষ্ঠি কলা (বিদ্যা)র মধ্যে চিত্রকলা অন্যতম। ঋষি বাৎসায়ন ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে মহিলারা অনেকে সঙ্গীতকলার ন্যায় চিত্রকলারও বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে, সখী বিশাখা শ্রীরাধাকে শ্যামের মূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইতেছেন। এমনও আছে যে শ্রীমতী নিজেও শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের পট আঁকিয়া উষাকে দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। গুহায় এবং বৌদ্ধমন্দিরে অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র এখনো বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সে যুগে মহিলারা নিজেদের গৃহপ্রাচীরে নানা চিত্র অঙ্কন দ্বারা গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, ঘটের উপরেও নানাপ্রকারের চিত্র অঙ্কন করিতেন। মোগলযুগে হারেমের মহিলাদের মধ্যেও চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। সম্রাট দুহিতা জেব-উন্নিসা সুকণ্ঠী এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী উভয়রূপেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের চিত্রকুশলতার বিষয় জগদ্বিখ্যাত।

তুষার-শিখর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরাজের আগমনের সময়ে এদেশে আল্পনা, মৃৎপাত্রের উপ চিত্রাঙ্কন, সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য প্রভৃতিতে বঙ্গ মহিলাদের বিশেষ দক্ষতা দে যাইত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটিতে থাকায় পুরুষদে ন্যায় মহিলাদেরও পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। চারুক অনাদৃত হইতে থাকে।
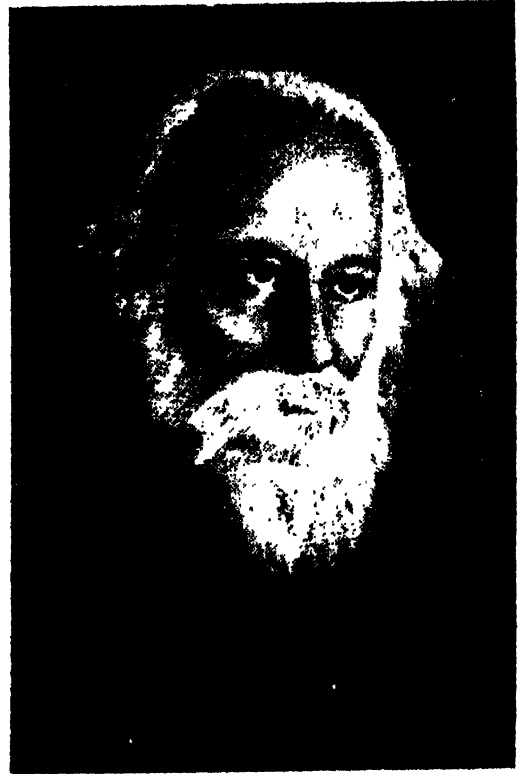
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পুনরায় পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রকলা দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই সম্পর্কে সুনয়নী দেবী, সুখলত রাও, অমৃত গায়গিল এবং শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি।

বর্ত্তমানে শিল্পবিদ্যালয়সমূহে ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানের গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে এবং শান্তি নিকেতনের কলাভবনে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের অন্যান্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যে

আগ্রহ দেখা যাইতেছে। শিক্ষালয়ের বাহিরেও পুরনারীরা কেহ কেহ চিত্রকলার অনুশীলনে রত রহিয়াছেন।

আজকাল নানাস্থানে যে সকল শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মহিলা শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রাবলী ক্রমশঃই চিত্ররসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এবার কলিকাতায় 'একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্' অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে বিশ জনেরও অধিক মহিলা-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের প্রদর্শিত চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০ হইবে। মহিলা শিল্পীরা ছয়টি পারিতোষিকেরও অধিকারিণী হইয়াছেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মহিলা অঙ্কিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য এবৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র—"বুদ্ধের গৃহত্যাগ"। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই জলরঙা চিত্রখানি অনবদ্য হইয়াছে। এই মহিলাশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ছাত্রী। অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে অপূর্ব্ব বর্ণ-সমাবেশ করিতে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর মত সুদক্ষ শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতি অনুগামীদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আর কেহ গুরুর শিক্ষায় এরূপ ভাবে বর্ণ সুষমাকে যে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বিশিষ্ট শিল্পীরা সকলেই চিত্র খানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বুদ্ধের মুখে বিষাদ ও সঙ্কল্পের ভাব উভয়ই একসঙ্গে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা গোপা দেবীর মুখ সুষমামণ্ডিত। তিনি শিশুপুত্র সহ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনের পরম বিপদক্ষণ যে সমাগত সে বিষয়ে তাঁহার কোনই ধারণা নাই। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রখানি শিল্পীর গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রদর্শনীতে এই মহিলাশিল্পীর অঙ্কিত আরও পাঁচখানি চিত্র—"গাঁয়ের বৈঠক", "অভিসারিকা", "কর্ণবধ", "রবীন্দ্রনাথ" এবং "শিল্পীর পুত্র" স্থান পাইয়াছিল। সেগুলিও চিত্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী মৈমনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং তদীয় একমাত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী। এই অভিজাত পরিবারের শিক্ষা ও সঙ্গীতানুরাগ ভারত-বিখ্যাত। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে অতি বিরল। বীরেন্দ্রবাবুও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই গুণী পরিবারের মধ্যে যে একজন সুদক্ষ মহিলা শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ইহা অতি আনন্দেরই বিষয় বলিতে হইবে। আশা করা যায়, ইঁহার আদর্শে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ঘটিবে।

অতি অল্প বয়স হইতেই চিত্রকলার প্রতি ইন্দিরা দেবীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপীয় মহিলার নিকট ইনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমশঃ একাগ্র সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে,

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায়চৌধুরাণী

উপযুক্ত শিক্ষাগুরুদের সযত্ন শিক্ষায় ইনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিত্র এবং প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা লাভ করেন। খ্যাতনামা প্রতিকৃতি-চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু ইঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। জলরঙ্ ও তৈলরঙ্ উভয় প্রকারের চিত্র অঙ্কনেই এই মহিলা-শিল্পী সমান অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর সংখ্যা শতাধিক হইবে। শিল্পীর ভবনকে একটি স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সম্প্রতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জের ভবনে যাইয়া এই মহিলা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্যে শিল্পী স্বীয় পুত্র এবং শ্রীঅরবিন্দের যে দুইখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া তিনি "শ্রীঅরবিন্দ" চিত্রখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

রাসলীলা

মাতৃস্নেহধারায় স্নাত স্বীয় পুত্রের চিত্রখানিও অনবদ্য হইয়াছে। স্বীয় কন্যা ও 'একটি মহিলা' চিত্র দুইখানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহু চিত্রই নয়নানন্দকর। "পাহাড়ী ঝরণা" চিত্রখানি অতি মনোরম। স্থান নির্ব্বাচনে শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। জলের ধার ও চারিদিকের বর্ণসুষমা অতি সুন্দর। "তুষার শিখর" চিত্রে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভ রশ্মি সমগ্র দৃশ্যকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রখানিতে শিল্পীর সাধনা সার্থক হইয়াছে। "পাগলা ঝোরা" চিত্রের বর্ণসমাবেশ অতি সুন্দর এবং শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক।

"নিভৃত পল্লী" এবং "বৃদ্ধা লামা" চিত্র দুইখানি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। পল্লীর শান্ত সমাহিত ভাব দর্শককে মুগ্ধ করে। জপযন্ত্র হস্তে বৃদ্ধা লামা ভগবান তথাগতের নাম জপ করিতেছেন। মুখের ভাবে অন্তরের ভক্তি সুপরিস্ফুট। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অতি সুন্দর।

পৌরাণিক চিত্রসমূহের মধ্যে "রাসলীলা", "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ", "কৈলাসে হরপার্ব্বতী", "মন্থরা কৈকেয়ী", "শ্রীকৃষ্ণের মং যাত্রা", "মানভঞ্জন" প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথ দুইখানির মত এত বড় আকারের জলরঙা চিত্র সাধারণতঃ দেখা য না। শিল্পীর সাহস ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। "রাস-লীলা"র আক ৫´×৩´ ফুট হইবে। অপরটিও প্রায় অনুরূপ আকারের। "রাস-লীল চিত্রে দ্বাদশটি মূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মুখে স্বর্গীয় সুষমা গোপীদের ভাবে ও ভঙ্গীতে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। কদম্ব বৃক্ষসং সমগ্র চিত্রখানি অতি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত। "শ্রীরামচন্দ্রের বিদা গ্রহণ" চিত্রখানি দর্শকের অন্তরে করুণ ভাবের উদ্রেক করে। পুত্রে বিদায়-ব্যথা মহারাজ দশরথের আননে অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে;

শিল্পীর পুত্র

সঙ্কল্পে অটল শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভাব যথাযথ হইয়াছে। সীতা ও লক্ষ্মণ করুণ বদনে দণ্ডায়মান। চিত্রখানির সম্মুখে দর্শকদের কিছুক্ষণ না থামিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শিল্পীর শ্রম সার্থক হইয়াছে। অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রগুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে ও বর্ণসুষমায় সুন্দর।

মহিলা শিল্পীর চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকখানির স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতে তাঁহার একাগ্র শিল্প-সাধনার গৌরব অতি সামান্যও বৃদ্ধি পাইবে কিনা জানি না। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে যদি একজন বঙ্গমহিলারও চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে [illegible]

মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি—(ইরাক)

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

আমরা অবশ্য পাকীস্থানী রাজনীতিতে মজিয়া যাইতে বসিয়াছি। ভারতবর্ষে ইস্‌লামীয় রাজনীতি যে ভাবেই হউক দানা বাঁধিতেছে, কিন্তু খাঁটি ইসলামের দেশে কি হইতেছে? সম্ভবত ইরাকবাসীরা ঐস্‌লামিক রাজনীতিতে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাই তাহাদের রাজনীতিকে আজ নূতন করিয়া ঢালাই করিতেছে। বেচারী অটোমান সাম্রাজ্যের কবল মুক্ত হইয়াও নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিলনা। অটোমান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল; সেই ভাঙ্গা টুক্‌রা লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্য প্রাচ্যের ইমারৎ গড়িয়া উঠিল। অর্থাৎ কড়ার কইমাছ যেন ছিট্‌কাইয়া একেবারে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়িল। ইহার পরের অবস্থা ইরাকে কি হইল তাহা সম্পূর্ণ এখানে বলিবার অবকাশ না থাকিলেও কিছুটা আভাষ রাখিয়া যাওয়া ভাল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি ইরাক্‌কে একেবারে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। ইরাক প্রকৃতির নিকট হইতে তেলের তহবিলদারী পাইয়া অবধি বিপদে পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নব্যবিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের নয়া কূটনীতি ইরাকের সমাজ-জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। সামাজিক জীবনে এমন দেখা যায় যে লোকে তেল দিয়া সন্তুষ্টি আদায় করে, কিন্তু রাষ্ট্রিক জীবনে ইহার ঠিক উল্টো—তেল দিয়া লাভ নাই বরং অ-লাভ, বাণিজ্য কলহ সার হইয়' ওঠে। ইরাকের তাহাই হইল। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তেল যোগাইয়াও সাম্রাজ্যবাদীর মনের নাগাল পায় নাই। মসুল, কিরকুক ও খানাকিন এই তিনটি স্থান জুড়িয়া ইরাকের তৈল সম্পদ রহিয়াছে। থাকিলে কি হইবে তাহা ইরাকের ভোগে লাগিবার নহে। তাহা ভোগ করিতেছে **Iraq Petroleum Company.**

এইবার আমরা কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া একেবারে সাপের গর্ত্তে হাত দিয়াছি। **Iraq Petroleum Company**র নিজের রসে এতটা উদর-স্ফীতি হয় নাই। ইরাকের তেল শোষণ করিতে আসিয়া অন্তকেও তাহার অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বছরের জন্য **Iraq Petroleum Company** ইরাকের তৈল উত্তোলন, নিকাশন ও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা পায়। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ যাহা **'Transferred Territories'** নামে পরিচিত তাহাই শুধু **Iraq Petroleum Compauy**র তৈল চুক্তি সর্ত্তের বাহিরে রহিল।

Iraq Petroleum Company অনেকটা নৈবেদ্যর কলার মত সবার ওপরে স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। চারটি গ্রুপ এই কোম্পানির স্তম্ভস্বরূপ। এর দুটি স্তম্ভ (গ্রুপ) খুব জোয়ালো অর্থাৎ ব্রিটিশ স্থিত স্বার্থ। আর দুটি স্তম্ভ (গ্রুপ) অ-ব্রিটিশ স্থিত স্বার্থ। ব্রিটিশ স্থিত স্বার্থের অংশ হইল (১) **The Anglo Iran Oil Company** (২) **The Royal Dutch Shell** আর অপর যাহারা তাহারা হইল—'সাতটি আমেরিকান ও সাতষট্টিটি ফরাসী কোম্পানি। এর মধ্যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশ ব্রিটিশের হাতে, পঁচিশ ভাগ আমেরিকা ও ফরাসীর হাতে—ইহার অর্থ এই যে কোম্পানির হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ব্রিটিশই রহিয়া গেল। ইহার সঙ্গে যোগ হইল—অনেকটা মণিকাঞ্চন সংযোগের মত—সাম্রাজ্যরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই সব মিলিয়া ব্রিটিশের মধ্যপ্রাচ্য কূটনীতি ও রাজনীতি এক বিশেষ কলেবর ধারণ করিয়াছে এবং তাহা বহুল পরিমাণে ইরাকের রাজনৈতিক জীবন-যাত্রাকে রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ত্তমান ইরাকের রাজনীতি এই রাহুস্পর্শদোষ এড়াইবারই প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এড়ানো কি এতই সহজ? সহজ নয় বলিয়াই ইরাকে আজ বিভিন্ন শক্তির খেলা চলিতেছে। নুরীসৈয়দ ও সালেজাব্বর যে রাজনৈতিক ব্লক গঠন করিয়াছেন তাহাই প্রতিপক্ষেরা কহিতেছে যে, ব্রিটিশের তাঁবেদার, ব্রিটিশ স্বার্থের রাজনৈতিক রূপ। পক্ষান্তরে এই ব্লকবিরোধী দল আখ্যা পাইতেছেন কম্যুনিষ্ট বলিয়া—অর্থাৎ ইহার পিছনে রুশ শক্তির প্রভাব রহিয়াছে। ইহারা সাধারণত **National Liberation Party** বলিয়া পরিচিত। আর একটি দল রহিয়াছে তাহারা নিজেদের **Liberal** বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন তফিক্‌ সুয়েদি।

এই **Liberal** দলের আসল সমর্থক হইল ব্যবসাদারগোষ্ঠী। ইরাকের খেজুর ও বার্লির ব্যবসায় উপর কোন একটি ব্রিটিশ বণিক প্রতিষ্ঠানের এক-চেটিয়া অধিকার পাইবার পর হইতে ইহাদের টনক নড়িয়াছে। এই দল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এবং তা শুধু নয়, মার্কিণদের সঙ্গে ব্যবসায় করিবার জন্য ইহারা উৎসুক। ব্যবসা করিতে গিয়া শুধু মাত্র একটি খরিদ্দার থাকিবে ও শুধু মাত্র একজনার নিকট হইতে সব কলকব্জা কিনিতে হইবে—এমন দস্তখত ইহারা দিতে রাজী নহেন। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে মার্কিণদেরও শুভাগমন তথায় ঘটিয়াছে। বিশ্ব বাণিজ্যের কারবারী ব্রিটিশ ও মার্কিণ তথায় জুটিয়াছে ও বিশ্ব রাজনীতির কারবারী ব্রিটিশ, মার্কিণ ও রাশিয়া তথায় দলগত প্রভুত্ব ছড়াইবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। এই রাজনীতির যোল্লায় পড়িয়া বেচারী ইরাক ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে।

গত নভেম্বর মাসে যে মন্ত্রীসভা নূরীসৈয়দ গঠন করেন তাতে **Liberal** এবং **National Democratic Party** যোগদান করে। তবে এই যোগদান-কাযাটি একেবারেই সর্ত্তাধীন। কেননা ইতিপূর্ব্বে উমারী মন্ত্রিসভা কোন রাজনৈতিক দল—যাহারা মন্ত্রিসভার বিরোধী—তাহাদের কোন স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেয় নাই। তার ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ বিভিন্ন দলের মধ্যে চরমে ওঠে। নূরী মন্ত্রিসভা এই জাতীয় নীতির পরিপোষক নয় বলিয়াই **Liberal** দল ও **National Democratic** দল ইহার সহযোগিতা করে। **National**

Democratic Partyর বর্ত্তমান নেতৃত্ব কামিল চাদারজি ও মহম্মদ হাদিদ-এর হাতে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দলের প্রচার-কার্য্য হইতে মনে হইতেছে যে ইরাক জাতির রাজনীতির ধর্ম্ম কি তাহার সন্ধান এই দলটি পাইয়াছে। ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা, সবার সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন বৈদেশিক নীতি, আরব সংহতি : জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার : শিল্প প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের অধিকার : ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জমি বিতরণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তবে National Democratic দলকে নুরী ও সালে জাব্বর পরিচালিত ব্লকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিতেছে; যে সকল প্রগতিশীল দল আজ ইরাকের কাজ করিতেছে তাহারা সবাই একযোগে কহিতেছে যে, ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির নিপাত হউক। কেননা এই চুক্তির ধারা অনুসারে যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বর্ণনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশরা ভোগ করিতেছে তাহা আজ ইরাকী জনসাধারণের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে। এই দুঃখ নিবারণকল্পে কোন আন্দোলন চালাইবার পক্ষে নুরী-জাব্বর পরিচালিত রাজনৈতিক ব্লকই বড় বাধা। তাহারা ব্রিটিশ স্বিতস্বার্থের পাহারাদার এবং এদের প্রভাব ইরাকের সত্তরটি জিলার শতকরা আশী ভাগ সামন্ত নেতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রগতিশীল দলগুলি বাগদাদ, মসুল, কিরকুক ও বসরা-র নাগরিক অধিবাসীদের উপর তাহাদের প্রভাববিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আসল চাবিকাঠি এখনও সামন্ত নেতা শেখদের হাতে। ইরাকের সমাজ জীবনের যে আলোড়ন তাহা মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে-ই শুরু হইয়াছে। এই সামন্ত শেখেরা আজও নুরী-জব্বর পরিচালিত রাজনৈতিক ব্লকের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই ব্লকের মূলনীতি রূপ ভীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এবং এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অনেকখানি ইন্ধন জোগাইতেছে। কেহ কেহ এইরূপ মত পোষণ করেন যে National Democratic, National Union, ও People's Party এদের কেউই সত্যিকারের প্রগতিশীল দল নয়, এরা সবাই সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকামী মাত্র। কোন নব্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী ইহারা করেন না। অথচ একই আদর্শের ওপর ভিত্তি করিয়া যে তিনটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ হইল নেতৃত্বের লড়াই; তবে একথা সত্য যে নুরী জব্বর পরিচালিত ব্লক হইতে ইহারা অনেকখানি বামপন্থী বা Liberal দল হইতেও ইহারা বামপন্থী; কিন্তু ব্রিটিশ প্রভাব আজ নুরী-জব্বর পরিচালিত ব্লকের মারফৎ এমনভাবে ইরাকের সমাজের ওপর চাপিয়া বসিয়াছে যে তাহাকে সরাইতে গেলে সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। বস্তুত ইরাকে আজ তাহাই ঘটিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাটাইতেছে।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতে ১৯০ বৎসরব্যাপী বৃটিশ শাসনের অবসান হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি ইংরাজ বণিকদল বাণিজ্য ব্যাপদেশে আসিয়া ভারতের সহিত সর্বপ্রথম যোগ স্থাপন করে। এই সময়ে ভারতের ধনরত্ন ও শিল্পসম্ভারের সন্ধান পাইয়া ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহারা স্থানে স্থানে কুঠী নির্মাণ করিয়া ব্যবসা করিতে থাকে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলে, কূটনীতিতে চতুর ইংরাজই সকলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

ইংরাজ কুঠী নির্মাণ হইতে সম্পত্তি ক্রয় এবং সম্পত্তি ক্রয় করিতে করিতে দেশজয়ও সুরু করিয়া দেয়। পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত করিয়া শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। তারপর ইংরাজ খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যগুলি জয় করিতে করিতে প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হয় এবং শাসনের নামে শোষণ করিতে করিতে ভারতকে যেমন একদিকে দারিদ্র্যের শেষ পর্য্যায়ে নামাইল, অপর দিকে ঠিক তেমনি নিজের দেশ ইংলণ্ডকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে তুলিয়া দিল।

ইংরাজের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। তখন হইতে বহুদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শ ছিল, আবেদন নিবেদনের দ্বারা বৃটিশের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করা। পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র কেশরী তিলক তাঁহার "কেশরী" পত্রিকায় নির্ভীকভাবে স্বাদেশিকতা প্রচারের ফলে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের কারণে দেশে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ তথা প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু এই সময় হইতে কংগ্রেসে "গরম" ও "নরম" দল হিসাবে দুইটি দল হইল এবং অনেক দিন পর্যন্ত দল দুইটি পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ অর্থ ও লোকবল দিয়া বৃটিশকে সাহায্য করে, কিন্তু যুদ্ধান্তে ইহার পরিবর্তে কোনও সুবিধা না পাইয়া ভারতের

ভাগ্যে যখন রাউলাট আইন আসিল, তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া দেখা দিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে জাতীয় ভাবের যেন এক প্রবল বন্যা বহিয়া গেল। তখন হইতে মহাত্মা গান্ধী বারে বারে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশকে এমন একস্থানে আগাইয়া আনিলেন যাহার ফলে বৃটিশ ভেদনীতির কারণে নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট মুসলিমলীগরূপ প্রতিক্রিয়াশীল দল থাকা সত্ত্বেও ভারতে সাম্রাজ্য রক্ষায় সন্দিহান হইয়া পড়িল। বৃটিশ জেল, ফাঁসি ও গুলির ব্যবস্থা করিয়াও ভারতের মুক্তিপাগল অহিংস সত্যাগ্রহীদের দমন করিতে পারিল না। ইঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শাসক ও শোষক বৃটিশের নিকটে কেবলই স্বাধীনতার দাবী জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস চরমপত্র হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে "ভারত ছাড়" দাবী জানাইল। কঠোর ও নির্মম হস্তে বৃটিশ ভারতবাসীকে এবারেও দমন করিতে থাকিলেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে তাহাকে ভারত ছাড়িতেই হইবে।

এই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও ভারতের বাহিরে একটি অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেন্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি শক্তিশালী সেনাদল গঠন করিয়া ভারতের মুক্তির জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে আসিয়া বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপরে আঘাত হানিলেন।

বৃটিশের তখন উভয় সঙ্কট অবস্থা। একদিকে সে বিশ্বযুদ্ধের সহিত জড়িত, অপর দিকে ভারতের ভিতরে বাহিরে ভারতীয়দের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইল। যাহা হউক ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিলে রাশিয়া ও আমেরিকার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টও যুদ্ধে জয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশের হাতে বন্দী হইল। কিন্তু এই বন্দী আজাদ হিন্দ্ সেনাদের মুক্তি দাবী করিয়া সমগ্র ভারতে আবার এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। এই সময়ে বোম্বাইএ ভারতীয় নৌ-সেনারাও বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে এত বড় নাবিক-বিদ্রোহ ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। ভারতের জাতীয় নেতারাও তখন কারাপ্রাচীর হইতে জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশে একটা তুমুল আলোড়ন। রণক্লান্ত ও ক্ষীয়মান বৃটিশ ইহা দেখিয়া যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে নিজেই ভারতের সহিত একটা আপোষ করিবার জন্য আগাইয়া আসিল।

এই সময়ে গ্রেট বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হওয়ায় মন্ত্রীসভার চার্চিলপন্থী রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং শ্রমিকদল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই শ্রমিক মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিলাতে প্রথম ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রীসভা শীঘ্রই ভারতে এক মন্ত্রীমিশন প্রেরণ করিবেন। ভারতকে দ্রুত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করাই হইবে তাঁহাদের কাজ।

বৃটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আসিবার কয়েকদিন পূর্বে ১৫ই মার্চ তারিখে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্লী পুনরায় জানাইলেন—ভারতবর্ষকে শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করিবার জন্যই আমার সহকর্মীগণ ভারতে যাইতেছেন। বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে ভারতীয়গণই তাহা স্থির করিবেন। ভারতবাসী সত্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ইহাও আমরা মনে করি যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার রহিয়াছে এবং যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

ইহার পর ২৩শে মার্চ মন্ত্রীমিশন আসিলেন, কংগ্রেস, লীগ ও মিশনের মধ্যে আলোচনা বৈঠক বসিল। কিন্তু লীগের পাকিস্থানী জিদ্ লইয়া শেষ পর্যন্ত সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে ১৬ই মে মন্ত্রীমিশন লীগের সার্বভৌম পাকিস্থান অস্বীকার করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটি নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন।

কংগ্রেস অনেক বিবেচনার পর মিশন পরিকল্পনার গণ-পরিষদ ও অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট গঠন উভয় প্রস্তাবই মানিয়া লয়। কিন্তু লীগ প্রথমে উল্লাসের সহিত মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও শেষে উহা বর্জন করে এবং ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম লইয়া সমস্ত ভারত ব্যাপিয়াই লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমানও শিখ জনসাধারণ অকারণে প্রাণ দিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও কিছু ফল হইল না দেখিয়া লীগ কংগ্রেসকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া বড়লাটের অনুমতিতে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টে যোগদান করিল, কিন্তু গণ-পরিষদে যোগদান করিল না। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী করিল লীগকে গণ-পরিষদেও যোগদান করিতে হইবে নতুবা তাহাকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট ত্যাগ করিতেই হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের দাবীতে লীগ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিয়োগ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিবেই। ভারতের নেতৃবর্গ বৃটিশের ভারত ত্যাগের একটা নির্দিষ্ট সময় জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিলেন।

বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন, কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া ৩রা জুন তারিখে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে ঘোষণা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুনের স্থলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ত্যাগের কথা বলিলেও বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবসহ ভারত-বিভাগের প্রস্তাব করিলেন। বৃটিশ ভারতত্যাগকালে ভারতশাসনে তাহাদের ভেদনীতির সহায়ক মুসলিম লীগকে তাহাদের দাবী হইতে বঞ্চিত করিল না। লীগের পাকিস্থান বা ভারত বিভাগের অসঙ্গত দাবীকেও শেষ পর্যন্ত তাহারা মানিয়া লইল। বড়লাট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্লী হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্টের বহু সদস্য পর্যন্ত

খণ্ডিত ভারতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেও অখণ্ড-ভারতের জন্য তেমন সাহসের সহিত কাজ করিতে পারিলেন না। লীগ বিনা যুদ্ধে, বিনা প্রাণবিনিময়ে কংগ্রেসের সঙ্গ স্বাধীনতা হইতে পাকিস্থানী জিদ ধরিয়া "ক্ষুদ্র ও বিকলাঙ্গ" হইলেও পাকিস্থান আদায় করিয়া লইল। অবশ্য কংগ্রেস তাহার ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের গৃহীত প্রস্তাব—দেশের অনিচ্ছুক অংশকে জোর করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে না রাখার সিদ্ধান্ত, অনুযায়ীই শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ভারতেই সম্মত হয়।

দেশের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আজ বিশেষ দুঃখের কারণ থাকিলেও, ইংরাজ যে ভারত ত্যাগ করিল এইটাই বড় কথা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে সমগ্র ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড পড়িয়াছে। এই ভূখণ্ড পৃথিবীর বহুশক্তিশালী দেশের আয়তনের তুলনায় অনেক বৃহৎ। এই অংশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদও কোন স্বাধীন দেশের তুলনায় মোটেই নগণ্য নহে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার কৃষি ও শিল্পপ্রসারের সকল রকম সম্ভাবনাই রহিয়াছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারত, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইল এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য বলিয়া গণ্য হইল। এই ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টের মর্যাদা সম্পর্কে ১০ই জুলাই তারিখে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলেন—"ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ষ্ট্যাটুটে (১৯৩১) ডোমিনিয়ন শব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় বলিয়া বলা হইয়াছে।" অতএব বৃটিশ কমনওয়েলথের শুধু সদস্য পদের মোহ ত্যাগ করিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী দেরী হইবে না বলিয়া মনে হয়।

ভারত আজ স্বাধীন। ভারতের এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল শহীদ বৃটিশের শত অত্যাচার ও শাস্তিকে হাসিমুখে বরণ করিয়া জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, যে সকল নেতা বৃটিশের হাতে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন এবং সর্বোপরি আমাদের যে মহান্ নেতা মহাত্মা-গান্ধী, যাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিল, তাঁহারা চিরনমস্য; বর্তমান ও ভাবীযুগের দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শিখ রমণী—সদাকৌর

শ্রীমতী অমিয়া বসু এম-এ, বি-টি

বর্তমানকালে আমাদের দেশে নারীজাগরণের তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। নারী পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার দাবী করে। সমাজে গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রে, পৌরকার্য্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কি সমরাঙ্গনে ভারতীয় নারী তাহার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। ভারতীয় নারী আজ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধি, দৌত্য কার্য্যেও নারীর আসন উচ্চ।

ভারতের অতীত কাহিনীতে নারীর উচ্চ স্থান, বীরত্ব, বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। রাজপুত বীরাঙ্গনাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, দেশ ও স্বধর্মের জন্য আত্ম-বলিদান আজও আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। রাণী দুর্গাবতী, চন্দ্রাবতী, যোধবাঈ প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়। মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবন গঠনের প্রধান উপাদান ছিল তাঁহার পুণ্যবতী মাতা জিজাবাঈর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রচর্চ্চা। মারাঠা ইতিহাসের অহল্যাবাঈ, তারাবাঈ এবং সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা ঝাঁন্সির রাণীর স্মৃতি ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শুধু রাজপুত ও মারাঠা জাতির ইতিহাসে ভারতীয় নারীর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নহে, শিখ জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অনেক বিদুষী ও মহীয়সী নারীর পরিচয় পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে মহারাজ রণজিৎসিংহের শশ্রুমাতা সদাকৌরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুরু নানক ছিলেন শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল—"গুরুই ঈশ্বর, ঈশ্বরই গুরু।" তাঁহার তিরোধানের পর ক্রমান্বয়ে শিখ সম্প্রদায় এই মূলমন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল। দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দসিংহ শিখ-জাতিকে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন। কিন্তু শিখদের রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। বান্দার মৃত্যুর পর এমন কেহ শক্তিশালী ছিল না যে—সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। শিখজাতি বারটী মিসল্ বা দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের নায়ক একটী রাজত্ব শাসন করিতেন। মিসলদের মধ্যে ভাঙ্গি মিসল, কানিহা মিসল, রামঘরিয়া মিসল, সুকারচকিয়া মিসল উল্লেখযোগ্য। এই মিসলগুলির ভিতর পরস্পরে আত্মকলহ চলিতেছিল। অবশেষে সুকারচকিয়া মিসলের নায়ক মহাসিংহের পুত্র রণজিৎসিংহ আপনার শক্তি বলে অন্যান্য মিসলের অধীন রাজ্যখণ্ডগুলি অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অসামান্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একটী বিশাল স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপন করেন।

রণজিৎসিংহের মাতা ছিলেন ঝিন্দরাজা গজপৎ সিংহের কন্যা। কানিহা মিসলের অধিপতি জয়সিংহের পুত্র গুরুবক্সসিংহের স্ত্রী ছিলেন সদাকৌর। এই সময় সুকারচকিয়া ও কানিহা মিসলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। বাতালার যুদ্ধে গুরুবক্সসিংহ নিহত হন। এই বাতালার যুদ্ধ হইতেই কানিহা মিসলের পতন আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কানিহা মিসলের অধিপতি জয়সিংহ তাঁহার দুই পুত্র তারাসিংহ

ও জয়মলসিংকে লইয়া পাঠানকোটে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ সদাকৌর সুকৌশলে সন্নাল নামক স্থানে নগ্নপদে পলায়ন করেন। অতঃপর কাটোচের সংসারচন্দ কানিহা মিস্‌লের অন্তর্গত কাঙ্‌রা আক্রমণ করেন। তিন বৎসর যাবৎ সংসারচন্দ্রের সহিত কানিহা মিস্‌লের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই সময় বিচক্ষণা সদাকৌর অনন্যোপায় হইয়া সুকারচকিয়া মিস্‌লের সাহায্য পাইবার আশাতে মহাসিংহের নাবালক পুত্র রণজিৎসিংহের সহিত তাঁহার কন্যা মহাতবকৌরের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই বিবাহ প্রস্তাবের আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল যে সুকারচকিয়া দলের সাহায্য লইয়া জয়সিংহের মৃত্যুর পর সদাকৌর কানিহা দলের নায়িকা হইবেন। মহাসিংহের মৃত্যুর পর ১৭৯৮ খৃঃ সদাকৌরের কন্যা মহাতব কৌরের সহিত রণজিৎসিংহের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। পিতার মৃত্যুর সময় রণজিৎসিংহ বার বৎসরের বালক ছিলেন। শাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ, ফলে তাঁহার মাতা এবং পিতার মন্ত্রী লক্ষপৎরায় নাবালকের নামে শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু সদাকৌর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও কূটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া তদানীন্তন সমাজে পরিচিতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই পরামর্শানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত। এস্থলে রণজিৎসিংহের রাজ্যশাসনের প্রথমাবস্থার সহিত সম্রাট আকবরের রাজ্যশাসনের প্রথমাবস্থা তুলনা করা যাইতে পারে। শাসনের ভার তাঁহার গৃহশিক্ষক বৈরাম খাঁ ও ধাত্রীমাতা মহামাঙ্গার উপর ন্যস্ত ছিল। আকবর সাবালক হইয়া বহুকষ্টে তাঁহাদের হাত হইতে রাজকার্য্যভার নিজে গ্রহণ করিলেন। রণজিৎসিংহও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর তাঁহার মাতা, লক্ষপৎ রায় ও শশ্রুমাতা সদাকৌরের নিকট হইতে শাসনভার নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত রাজকার্য্যশাসন তাঁহার শশ্রুমাতার পরামর্শানুসারে চলিত। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ার ফলে সদাকৌর তাঁহার কানিহা মিস্‌লের রাজ্যখণ্ড হইতে বঞ্চিতা হইয়া জামাতা কর্ত্তৃক বন্দিনী হইলেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সদাকৌরই রণজিৎসিংহের উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবার একমাত্র সোপান ছিলেন।

রণজিৎসিংহের লাহোর অধিকার তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্ত্তি। লাহোর অভিযানে তিনি তাঁহার শশ্রুমাতার পরামর্শ ও বুদ্ধিকৌশলের জন্য কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তদানীন্তন লাহোরের শাসক চেৎসিংহ প্রভৃতি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। লাহোরের জনসাধারণ শাসকগণের স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হইয়া রণজিৎসিংহকে লাহোর অধিকার করিয়া অত্যাচারী শাসকগণের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিল। কানিহা মিস্‌লের নায়িকা সদাকৌরকেও লাহোরবাসীগণ এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করে। রণজিৎসিংহ তখন রামনগরে ছিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। কারণ তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাব-শিখস্থান স্থাপন করা। অতঃপর তিনি বাতালায় তাঁহার শশ্রুমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাহোর অভিযানের বিষয় পরামর্শ করেন।

উভয়েই একমত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হন। রণজিৎসিংহও সদাকৌর তাঁহাদের নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত লাহোর অভিযানের জন্য সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর এই মিলিত সৈন্যবাহিনী রণজিৎসিংহ ও সদাকৌরের নেতৃত্বে অমৃতসর অভিমুখে অগ্রসর হইল। অমৃতসর হইতে রণজিৎসিংহ একাই লাহোরে গমন করিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে লাহোর নগরীমধ্যে প্রবেশ করেন। একমাত্র চেৎসিংহ রণজিৎসিংহের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া দুর্গমধ্য হইতে রণজিৎসিংহকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রণজিৎসিংহ দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময় সদাকৌর রণজিৎসিংহকে দুর্গ অবরোধ হইতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। সদাকৌর বলিয়া পাঠাইলেন যে চেৎসিংহ দুর্গমধ্যে খাদ্যাভাব ও বহির্জ্জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করিবেন। অতএব দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য রণজিৎসিংহের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। রণজিৎসিংহ দুর্গ অবরোধ করিলেন না। সদাকৌরের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইল। অচিরেই চেৎসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন। লাহোর রণজিৎসিংহের করতলগত হইল। ১৮১৪ খৃঃ রণজিৎসিংহের প্রস্তাবিত কাশ্মীর অভিযানের সময় মহারাজা লাহোরে মুখামচাঁদ এবং সদাকৌরের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কিন্তু মুখমচাঁদের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তখন কাশ্মীর অভিযান স্থগিত রহিল। ভাঙ্গি মিস্‌লের কেন্দ্র অমৃতসর জয় করিবার জন্য সদাকৌর রণজিতের সঙ্গে অমৃতসর যাত্রা করেন। অচিরেই মহারাজা অমৃতসর দখল করিলেন।

ইতিমধ্যে সদাকৌরের কন্যা রণজিৎসিংহের অন্যতম মহিষী মহাতবকৌর অপুত্রক থাকাতে সদাকৌরের সংশয় হইল যে জামাতার উপর তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। অতএব তিনি চক্রান্ত করিয়া প্রচার করিলেন যে তাঁহার কন্যা গর্ভবতী। রণজিৎসিংহ লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাতব কৌরের দুইটী যমজ সন্তান জন্মিয়াছে এই সংবাদ সদাকৌর রণজিৎসিংহের নিকট প্রেরণ করেন। চতুর রণজিৎসিংহ জানিতেন যে এই সন্তান মহাতবকৌরের গর্ভজাত নহে। সদাকৌর শের সিংহ ও তারাসিংহ নামক দুটী শিশুপুত্রকে ক্রয় করিয়া নিজের কন্যার গর্ভস্থ সন্তান বলিয়া প্রচার করিলেন। রণজিৎসিংহও এই শিশু দুইটীকে ঔরসজাত পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পর রণজিৎসিংহের সঙ্গে সদাকৌরের মনোমালিন্যের সূচনা হয়। রণজিৎসিংহ কানিহা মিস্‌লের অন্তর্ভুক্ত কান্দারায় যাইয়া সর্দ্দারগণের নিকট হইতে নজর আদায় করিতে লাগিলেন। জামাতার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সদাকৌর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। অতঃপর মহারাজা সদাকৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাতালাতে গমন করেন। তথায় রণজিৎসিংহ মৃগয়া করিবার অছিলাতে মাসাধিককাল অবস্থান করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাতালা এবং সদাকৌরের অন্যান্য সম্পত্তির উপর তাঁহার লোলুপদৃষ্টি ছিল এবং কি করিয়া তাঁহার সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবেন সেই বিষয়ে ফন্দি আঁটিতেছিলেন। এদিকে শের সিংহ বয়োপ্রাপ্তির

সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্ম পিতামাতার নিকট একটী পৃথক্ জায়গীর দাবী করিতেছিলেন এবং পিতা রণজিৎসিংহও পুত্রকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন। রণজিৎসিংহের গূঢ় মনোভাব ছিল যে সদাকৌর তাঁহার কানিহা মিস্‌লের রাজ্যখণ্ড হইতে সেরসিংহকে জায়গীর প্রদান করিলে অদূর ভবিষ্যতে তিনি সমস্ত কানিহা মিস্‌লের সম্পত্তি গ্রাস করিতে পারিবেন। মহারাজা কানিহা মিস্‌লের সম্পত্তি হইতে সেরসিংহকে জায়গীর প্রদান করিবার জন্ম সদাকৌরকে অনুরোধ করেন। সদাকৌর জামাতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলিয়া পাঠান যে সেরসিংহকে জায়গীর প্রদান করা রণজিৎসিংহের কর্ত্তব্য। রণজিৎসিংহের চতুরতায় সদাকৌর ও মহাতবকৌরের সহিত সেরসিংহের মনোমালিন্স উপস্থিত হয়। রণজিৎসিংহের এই কূট চক্রান্তের সহায়ক ছিল সদাকৌরের এক পুরাতন ভৃত্য খানি খানসামা। এই খানসামার সাহায্যে রণজিৎসিংহ সদাকৌরের সহিত তাঁহার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য বৈশাখ সিংহের সহিতও মনোমালিন্স উপস্থিত করেন। অতঃপর এই মনোমালিন্সের সুযোগ লইয়া রণজিৎসিংহ ১৮২০ সনে সদাকৌরকে যুবরাজদের জন্ম পৃথক্ জায়গীর দিবার জন্ম কড়া হুকুম জারী করেন। তেজস্বিনী সদাকৌর ...হার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই বলিয়া শাসান যে, তিনি শতদ্রু ...ার হইয়া ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন এবং তাঁহার ওয়াডনি ...ম্পত্তি ইংরাজদের উপর ন্যস্ত করিবেন। রণজিৎসিংহ এই উত্তর ...াইয়া ভীত হইলেন। এক বিনীত পত্রে শশ্রুমাতার মার্জ্জনা এবং ...াহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। জামাতার ...ই পত্র পাইয়া শশ্রুমাতার হৃদয় বিগলিত হইল। সাহাদারাতে ...াকৌর ও রণজিৎসিংহের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই সদাকৌরের ...ল হইল। স্বার্থান্ধ ও চতুর রণজিৎসিংহ শশ্রুমাতাকে অসহায় ...বস্থায় পাইয়া বলপূর্ব্বক রাজকুমারদ্বয়ের জন্ম জায়গীরদান পত্র ...দিতে বাধ্য করিলেন। মহারাজা অতঃপর সদাকৌরকে দুর্গাভ্যন্তরে ...ান্তরিত করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে সদাকৌর গুরু অর্জ্জুনের ...ধিক্ষেত্র দর্শন করিবার ভাণ করিয়া দুর্গের পশ্চিমদ্বার দিয়া একটী ...গাড়ীতে সন্তর্পণে অতি দ্রুতবেগে তাঁহার রাজধানীর দিকে পলায়ন ...রলেন। রণজিৎসিংহ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ অন্যতম যুবরাজ ...কসিংহকে সদাকৌরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম প্রেরণ করেন। ...রিয়ানের পথে সদাকৌর গ্রেপ্তার হইলেন। রাজপ্রাসাদে সদাকৌর ...নী হইলেন। এদিকে মিশর দেওয়ানচন্দকে সদাকৌরের সমস্ত ...র ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্ম প্রেরণ করা হয়। সদা...রের সঞ্চিত মূল্যবান রত্নাদি মুখরিয়ানের দুর্গে রক্ষিত ছিল। সদা...রের একজন ক্রীতদাসী কর্ত্তৃক বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দেওয়ানচন্দ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দেওয়ান চন্দের সামরিক শক্তি ...হইল। উল্লিখিত ধনরত্নাদি হস্তগত করিবার জন্ম দেওয়ান চন্দ ...নব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মুখারিয়ানের দুর্গের কেল্লাদারকে সমর্পণ করিবার জন্ম সদাকৌরকে তাঁহার এক স্বাক্ষরিত পত্র দিবার ...ব করেন এবং সদাকৌর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে ভবিষ্যতে ...াহাকে অনাহারে মরিতে হইবে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন। ...কৌরকে খাদ্যসামগ্রীর জন্ম দৈনিক দশ টাকা ভাতা দেওয়া ...। সদাকৌর প্রথমে এই প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া দুদিন পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে অনন্যোপায় হইয়া প্রস্তাবিত অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দেওয়ানচন্দ স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া সহজেই মুখারিয়ান দুর্গ অধিকার করিলেন। (১) মুখারিয়ানের দুর্গপতনের সঙ্গে সঙ্গেই কাণিহা মিস্‌লের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। অতঃপর সৈন্সপরিবেষ্টিতা সদাকৌরকে লাহোর দুর্গাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সদাকৌর বন্দিনী অবস্থায় রহিলেন।

ত্রিশ বছর পাঞ্জাব রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া পরিশেষে সদাকৌর কারাকক্ষের অন্তরালে জীবনলীলা শেষ করিলেন। ইহাই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। সদাকৌর ও রণজিৎসিংহের প্রকৃতিগত অনেক সামঞ্জস্য ছিল। সদাকৌর বুদ্ধিমতী কূটরাজনীতিজ্ঞ উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী ও প্রভুত্বপ্রিয় রমণী ছিলেন। রণজিৎসিংহও তাঁহারই মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রভুত্বপ্রিয় ছিলেন। একথা সত্য উভয়েই চাহিয়াছিলেন সাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতে, একে অন্যকে তাহার অভীষ্ট কার্য্যের অন্তরায় মনে করিতেন। সুতরাং উভয় জনের অন্তঃস্থলে একটী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ করিতেন। এমতাবস্থায় রণজিৎসিংহ ও সদাকৌরের একই রাজত্ব মধ্যে নির্ব্বিবাদে বাস করা সম্ভবপর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রণজিৎসিংহ তাঁহার শাসন কালের প্রারম্ভে সদাকৌরের সহযোগ ও পরামর্শানুসারে রাজত্ব বিস্তারে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে ক্রমে রাজত্ব সুবিস্তৃত হইলে সিংহাসনে নিরাপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রণজিৎসিংহ শশ্রুমাতার অতীত কার্য্যাবলী বিস্মৃত হইলেন। মহারাজ রাজকার্য্যে স্বার্থপর ও অর্থলোভী ছিলেন। সদাকৌরের সঞ্চিত প্রচুর ধনরত্ন ও বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড হস্তগত করাই রণজিৎসিংহের কাম্য ছিল। এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ম আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা কৃতজ্ঞতা সমস্তই বিসর্জ্জন দিলেন। সদাকৌরের প্রতি মহারাজার নিষ্ঠুর আচরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কথিত আছে সদাকৌর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম জামাতার বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ঘটনার প্রকৃতরূপ তদন্ত না করিয়া, সত্যানুসন্ধান না করিয়া জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সদাকৌরকে দোষী সাব্যস্ত করা অবিচার, নীতি ও আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে। যুবরাজদ্বয়ের জন্ম রণজিৎসিংহ সদাকৌরকে সম্পত্তি দানের দলিল সম্পাদন করিতে দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিলে সদাকৌরের আত্মরক্ষার জন্ম ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করা দূষণীয় বা বে-আইনী হয় নাই। রণজিৎসিংহ সদাকৌরকে তাঁহার অভীষ্ট সাধনের অন্তরায় মনে করিলে তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে সসম্মানে অপসারিত করিতে পারিতেন। তাহার প্রতি এতাদৃশ লাঞ্ছনা ও প্রতারণা কোনমতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। সদাকৌরের জীবন কাহিনী বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। শিখজাতির মধ্যে তাহার মত রাজনীতিজ্ঞ, তেজস্বিনী রমণীর দৃষ্টান্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (২)

(১) সদাকৌরের ধন রত্নাদি বাজেয়াপ্ত হইলে, তন্মধ্যে ৬০,০০০ হাজার টাকার একটি মূল্যবান নেক্‌লেস্ ছিল।

(২) এই প্রবন্ধের অধিকাংশ তথ্য নিম্নলিখিত পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে :—

Cunnighw's—"History of tho Siks"
L. Griffin's —"Punjab Rajas,"
Syad Muhammad Latiff's—"History of tho Punjab"
Dr. N. Singha'—Ranjit Singh,

ভীমপলশ্রী

বনফুল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে আবার। তারপর হেসে বললে—"তখন আর এখনে কিন্তু তফাত আছে অনেক। এখন আমি তুমি এবং ব্রজেশ্বরবাবু ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই"

"কেন অনীতার ?"

"হ্যাঁ অনীতারও অবশ্য আছে"

"দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। আপনি যুক্তির অবতারণা করে' স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি যদি শুধু সেমিজ পরে হ্যারিসন রোড দিয়ে হেঁটে যাই কার কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের মুখ বন্ধ হবে না তাতে"

"সত্যি যদি সাহস করে যাও, আমার মনে হয় না এ নিয়ে খুব একটা আন্দোলন করবে লোকে—"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে বললে—"আপনার শোবার কষ্ট হল তার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। আর ওই মেজেতে শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি ? ওর চেয়ে গোয়াল ঘরে শোয়া ঢের ভাল।"

সুশোভন ঘরের চার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"আমার বিশ্বাস এখানে শুলে একটু ঘুম হত। একটা 'রাগ' আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোনের দিকটায়"

"'রাগ' আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো নিয়ে আপনি গোয়ালেই যান, সেখানেও বেশ ঘুমুতে পারবেন"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু শব্দটব্দ শুনে গোঁসাইজি যদি উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে খুকুর কাছে দেখে ভাববেন কি"

"কি আবার ভাববেন"

"একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন যে গোঁসাইজির চক্ষে আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেলছি তাহলে দুজনকেই এই রাত্রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। অ্যাডমিশন রেজিষ্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে' নাম সই করেছি। আর সেই ভদ্রলোক—গুম্ফ গোবিন্দ না কি যেন—"

"সদারঙ্গ বিহারীলাল ?"

"হ্যাঁ, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে' জেনে গেছেন। জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাছে যে এর কি জবাবদিহি করব জানি না"

"সে আমি করব। আপনাকে করতে হবে অনীতা দেবীর কাছে"

সুশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

"ব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ দুজনের সম্বন্ধে যদি আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনে না করে তাহলে আমার মেজেতে শোয়াটাও ওরা আশা করি অনুমোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে একাজ করেছি তা বোঝবার মতো সহৃদয়তা ওদের নেই ? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে আর ছাপ্পর খাটের তলায় পা চালিয়ে শোয়াটা যে আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না ? নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে জখমও হয়ে পড়তে পারি ; হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা।"

সান্ত্বনা মুচকি মুচকি হাসছিল।

"উনি অবশ্য কিছু মনে করবেন না।"

"বাস তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর ঝক্কি আমি সামলাব।"

"উনিও মোটেই কানপাতলা লোক নন। তাছাড়া আমার যাতে কষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না।"

"আমিও করি না। অনাতাকে আমি যত ভালবাসি এত বোধহয় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বাসে না। সত্যি বলছি বড্ড ভালবাসি। যাক বালিশ আর 'র‍্যাগ' দাও, তাহলে চেষ্টা করে দেখি ঘুম হয় কি না—"

"কপাটে খিল দিন"

খিল দিতে গিয়ে সুশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি ভাঙা।

"ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা পাশ ফিরে শুল।

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ—কি"

"ঘুমুচ্ছেন ?"

"কেন"

ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল সুশোভন।

"কিছু মনে করবেন না, জানালাটা যদি খুলে দেন দয়া করে'। আমি শোবার সময় খুলতে ভুলে গেছি"

"জানলা খুলে কি হবে! হু হু করে' হিম ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাও না কি"

"সব জানালা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা দরকার"

"ঘরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন"

"জানালা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে আমার। খুলে দিন লক্ষ্মীটি"

"ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাঁড়াও উঠি আগে। রীতিমত কসরৎ করতে হবে। এই ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে মাথাটা বার করাই মুস্কিল, তারপর আলমারির তলা থেকে হাতটা—"

জানালা খুলে মিনিট দুই পরে সুশোভন আবার মেঝের উপর এসে বসল, অস্ফুটস্বরে গজগজ করতে করতে হাত থেকে ধুলো ঝাড়লে, তারপর নিজের ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গলিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মনে হল সান্ত্বনা নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে 'ধন্যবাদ' না কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার, সান্ত্বনার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে ঝুনুর করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না—চলেইছে একটানা—।

"সুশোভনবাবু"

"কি"

"শুনতে পাচ্ছেন ? মরে যাই মাণিক আমার"

"আমাকে বলছ ?"

"ঝুনুর ডাক শুনতে পাচ্ছেন না ? আহা বেচারী"

"কই না"

"পাচ্ছেন না ? ওই যে"

"ও প্যাঁচা ডাকছে"

"কি যে বলেন। ঝুনু কাঁদছে। আহা, কি যে করি"

"জানলাটা বন্ধ করে' দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে"

"না, না। বেচারী সমস্ত রাত ওই রকম করে কাঁদবে, আর আমরা চুপচাপ শুয়ে থাকব এখানে—"

সুশোভন উঠে বসল।

"ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে বল। ও চেঁচাবেই। কুকুরের স্বভাবই ওই"

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে—লক্ষ্মীছাড়া কুকুর।

"উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে আসতেন"

"আমি 'উনি' হলে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আমার শিরদাঁড়া এমন জখম হত না"

"সুশোভনবাবু, উঠুন, যান লক্ষ্মীটি"

"যেতাম। কিন্তু যাবার উপায় নেই"

"কেন, এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে যেতে চাইছিলেন"

"চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না। আমি হলপ করে বলতে পারি এখন ওই খিড়কি দুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে যাওয়া যাদুকর পি, সি, সরকারের পক্ষেও অসম্ভব"

"কেন বড়জোর খিল দেওয়া আছে—"

"দেখ যে লোক বৈঠকখানায় ডবল তালা লাগাতে পারে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে"

"শুনুন, আহা কি কান্নাটাই কাঁদছে বেচারী। ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি দয়া হচ্ছে না একটু—"

"ওর নাম বোবা জানোয়ার!"

"আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না শুনে স্থির থাকতে পারব না"

সুশোভনকে উঠতে হল। জুতো পরে জামা গায়ে দিয়ে বারান্দা থেকে কমানো লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে নেবে গেল সে। নাবতে নাবতে তার মনে হল—অনাত্মার কুকুরের সখ নেই, আর যাই থাক! উঃ—! (ক্রমশঃ)

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পুনর্বসতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

মহাত্মা গান্ধী বিহারের উন্নয়ন-সচিব ডাঃ মামুদের আমন্ত্রণে সেখানকার মুসলমানদের সেবার জন্য ২রা মার্চ তারিখে পূর্ব-বাঙ্গলায় তাঁহার ঐতিহাসিক পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ গ্রাম হাইমচর ত্যাগ করিয়া বিহার চলিয়া যান। তাঁহার পূর্ববঙ্গ ত্যাগের সংবাদে বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের অভয় দিয়া তিনি পূর্বদিন প্রার্থনা সভায় বলিয়াছিলেন—আগামীকাল আমি বিহার যাইতেছি, কিন্তু অল্প কিছুদিন মাত্র সেখানে অবস্থান করিয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিব। এখন যে সকল উপদ্রুত গ্রামগুলিতে যাইতে পারিলাম না, ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গ্রামে যাইবার চেষ্টা করিব। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ত্যাগ করিব না। আমার অসমাপ্ত কার্য আমার সঙ্গীদের উপর দিয়াই আমি বিহার যাইতেছি।

মহাত্মা গান্ধী বিহারে গেলেন, কিন্তু সেখান হইতে আবার তাঁহার ডাক পড়িল নয়াদিল্লীতে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুপরিবর্তনের কারণে তিনি সেখানে বহুদিন আটকাইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সময়ে উপদ্রুত নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার আরব্ধ ও অসমাপ্ত কার্যকে কি ভাবে যোগ্যতার সহিত চালাইয়া যান এই প্রবন্ধে মূলত তাহারই কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য শান্তির বাণী লইয়া তাঁহার দোভাষী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও সটহ্যাণ্ড লেখক পরশুরামকে মাত্র সঙ্গী করিয়া সমস্ত দলবল ছাড়িয়া কাজিরখিল হইতে শ্রীরামপুর অভিমুখে রওনা হন এবং ঐ দিন তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার দলের অন্যান্য সকলেও এক এক জন করিয়া এক একটি উপদ্রুত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িলেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তেরা তখন চারিদিকে অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের আস্ফালন ও শাসানী মোটে কমে নাই। গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম গন্ধ নাই। যাহারা কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহারা আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে। উপদ্রুত গ্রামসমূহের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মীরা প্রকৃত অহিংস বীরের ন্যায় এক একজন করিয়া ঐ সকল গ্রামে গিয়া ক্যাম্প স্থাপন করিলেন অর্থাৎ কোনও একটি পোড়ো বাড়ীতে গিয়া একা একা বাস করিতে লাগিলেন। কর্মীদের মধ্যে মহিলারা পর্যন্ত রহিলেন। কর্মীদের এই সৎসাহস দেখিয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর অভয় প্রচার ও গ্রাম পর্যটনের ফলে উপদ্রুত গ্রামবাসীরা আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ক্রমে ক্রমে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন হইতে কর্মীরা ঠিক একভাবেই সেবা ও পুনর্বসতির কাজ চালাইয়া আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহারা বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক ও কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকিলেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় গান্ধী-ক্যাম্পের ২৩টি কেন্দ্রে প্রায় ৫০ জন কর্মী কাজ করিতেছেন। নিম্নে গান্ধী ক্যাম্প ও কেন্দ্রসমূহ এবং ঐ সকলের পরিচালকদের নাম দেওয়া হইল :—

কাজিরখিল ক্যাম্প (ইহা গান্ধী ক্যাম্পের হেড কোয়াটার)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ভোলানাথ সরকার (দিনলিপি সম্পাদন ও মুদ্রণ) চারু চৌধুরী, অরুণাংশু দে, রবীন্দ্রশংকর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভৌমিক (পরিচালনা ও অফিস) রঞ্জনকুমার দত্ত (হিসাব)

জগদীশচন্দ্র সুর (ক্যাশ) যতীন্দ্র দে (গুদাম) মণি চক্রবর্তী, আভা গান্ধী (চরখা-নির্মাণশালা ও বিদ্যালয়) বিজয় দাশগুপ্ত, শাহারাও (যন্ত্রশালা) অমলেশ চৌধুরী (বনিয়াদি বিদ্যালয়) যোগেন্দ্রনাথ দাস (চিকিৎসা) প্রিয়নাথ মজুমদার (পাকশালা) বিধুভূষণ দাশগুপ্ত (অনুসন্ধান)

কেন্দ্র সমূহ—চণ্ডীপুর—সৌরীন্দ্র বসু ; চাঙ্গীর গাঁও - বিশ্বেশ্বর দাস ; কেরোআ—ভূপালচন্দ্র কর্মকার, দালাল বাজার কর্ণেল জীবন সিং, ও হরিপদ মালাকার, বামনী—জীবনকৃষ্ণ সাহা, চররাহিতা অন্নদাচরণ কুণ্ডু (মুটু) সীরন্দী— আমতুস সালাম, সুষমা পাল ; নন্দিপুর—অজিত সিংহ, কেথুরী—রেড্ডাপল্লী সত্যনারায়ণম্ ; পানিয়ালা অমৃতলাল চ্যাটার্জি, মুরাইম—জ্ঞানেন্দ্র মাল, মহম্মদপুর— বীরেন্দ্রনাথ গুহ, পাল্লা— যতীশ চক্রবর্তী, পাঁচগাঁও—অজিতকুমার দে, জগৎপুর- দেবেন্দ্র সরকার, ভাটিয়ালপুর—প্যারেলালজী, চন্দ্রশেখর ভৌমিক, গোপাইরবাগ— বিশ্বরঞ্জন সেন ও নারায়ণকেশব বৈদ্য, রামদেবপুর- কানু গান্ধী ; পারকোট- সাধনেন্দ্র মিত্র ও প্রভুদাস প্যাটেল, আটখোরা—মুরলীধর জানা, কমলা রায়, নন্দনপুর—খগেন্দ্রনাথ জানা, হাইমচর—মদন চট্টোপাধ্যায় ও বনমালী ঘোষ। *

এক একটি কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রামকে লইয়া কাজ করিতেছে। অতএব কম করিয়াও প্রায় দুইশত গ্রামে কর্মীরা সেবা ও পুনর্বসতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সতীশবাবু কর্মীদের জন্য "শান্তি মিশন দিনলিপি"তে সকল কর্মীদের কাজ ও কর্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্যে একটা নিবিড় যোগ রাখিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ৪ মাসকাল নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থান করিয়া হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য মানবতার আবেদন লইয়া যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কর্মীরা তাহাই কার্যকর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি আনয়ন এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদিগকে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষা করার দায়িত্ব বুঝান, ভয়ভীতদের ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় না করিতে বলা এবং প্রকৃত নির্ভীক করিয়া তোলা, হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা দূর করা, গ্রাম পরিচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা দূরীকরণ ও দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে কুটীর শিল্পের প্রবর্তন—এই সকলই ছিল নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর কার্যসূচী। কর্মীরা মহাত্মাজীর এই সকল দুরূহ কাজগুলিকে সফল করিবারই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দুমুসলমান পুনর্মিলনের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে পথ অবলম্বন করেন কর্মীরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহারা বন্ধুর ভাব লইয়া সকল মুসলমানের সহিতই মেলামেশা করিতেছেন। সতীশবাবু দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বরাবরই কর্মীদের উপদেশ দিয়া আসিতেছেন— সাধারণতঃ সকল মুসলমানই ভাল এই বোধ ও বিশ্বাস লইয়া উহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে। অবসর সময়ে তাহাদের সহিত মিশিবে এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়া আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবে। হিতকাজের দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। মুসলমানদেরও নানা দুঃখ, শোক ও তাপ আছে; সহানুভূতির মনোভাব লইয়া মিশিলে মিলনের দরজা খুলিবেই। অহিংসার পরাজয় নাই, বিশ্বাস করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া সতীশবাবু কর্মীদের আরও বলেন—গ্রামের যুবক ও বালকদের লইয়া গ্রামের কাজে ও খেলাধূলায় তাহাদের সহিত মিশিবে। কারণ যুবক ও শিশুদের মন অনেকটা সরল এবং তাহারাও সাধারণত মিশুক।

কর্মীরা এইভাবেই কাজ করিতেছেন, ফলে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে যে অমিলের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির ভয়ভীতদের নির্ভীক করিবার জন্য এই কথাই শুধু বলেন, ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিবেন না। আপনারা ভয় ত্যাগ করুন, তাহা হইলেই আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করা হবে।

গান্ধীক্যাম্পের কর্মীরাও নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ভয়পীড়িতদের মধ্যে এই কথাটাই প্রচার করিতেছেন। সতীশবাবু দিনের পর দিন দিনলিপিতেও ইহাই বলিতেছেন। এইরূপ প্রচারের ফলে ভয়ভীতদের মধ্যে অনেকেই নির্ভয় হইতেছেন এবং সৎসাহস ফিরিয়া পাইতেছেন। নিম্নে এরূপ সৎসাহসের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ফিরিয়া গ্রামবাসীরা সমবায় প্রথায় কাজ করিতেছে। মেয়েরাও তাই। একদিন সকালে মেয়েরা রামধুন গাহিয়া কাজে যাইতেছে, এমন সময়ে পথের ধারে দাঁড়াইয়া কয়েকজন মুসলমান মেয়ে তাহাদের বলিল—তোদের ধিক্, তোরা এই সেদিন না কল্‌মা পড়ে মুসলমান হলি, আজ আবার রামনাম করছিস্।

উত্তরে তাহারা নির্ভীকভাবে বলিল- হাঁ রামনামই আমরা করব। তখন ভয়ে মুসলমান হয়েছিলুম। কিন্তু আর ভয় নেই, ভয় আর করবও না। এখন আর একবার মুসলমান করতে আসিস্। আমরা অহিংস থেকে মরব, কিন্তু তবুও আর ঐ রকম নতি স্বীকার করব না।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া মুসলমান মেয়েরা হতবাক্ হইয়া গেল এবং চুপে চুপে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থানকালে মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে জাতিভেদপ্রথার কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার উপস্থিতির সময়েই নোয়াখালিতে অনেকস্থলে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সহ ভোজনের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। সতীশবাবু ও গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মীরা হিন্দুধর্মের এই পুরাতন ব্যাধি লোপ করিয়া বর্ণ, অবর্ণ ভুলিয়া একটিমাত্র হিন্দুধর্মের জন্য সচেষ্ট হইলেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে সহ-ভোজ চলিতে লাগিল। কিন্তু কর্মীরা দেখিলেন—গলিত ব্যাধির

---

* সম্প্রতি ভাটপাড়া, রায়পুর ও দশঘরিয়ায় ৩টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং দু' একটি কেন্দ্রে পরিচালকরাও বদলী হইয়াছেন।

মত এই জাতিভেদ কতকগুলি লোককে ভীষণভাবে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। হাঙ্গামায় যাহারা একদিন হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তাহারা হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের পূর্বের জাতি খুঁজিয়া বাহির করিতেছে এবং হিন্দুর অপরাপর জাতির সহিত একত্র ভোজনে নারাজ হইতেছে। এই কারণে সতীশবাবু কর্মীদের নির্দেশ দিলেন—এই ব্যাধি লোপ করিবার জন্য গ্রামে প্রত্যহ অন্ততঃ একটি করিয়া সহভোজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ী হইতে চাল ডাল প্রভৃতি আনিবে, তাহা হইলে কাহার পক্ষে ইহা ব্যয়সাপেক্ষ হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি ভ্রমণের সময়ে সেখানকার পুকুরের জল দূষিত দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন—জল এত দূষিত যে ইহাতে হাত দিতেও ঘৃণা বোধ হয়। লোকে যে পুকুরের জল খায়, সেই জলেই অন্যান্য সকল প্রকার কাজও করে, ফলে জল দূষিত হয়।

সতীশবাবু নোয়াখালিতে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য টিউব-ওয়েল বসান ও পুকুরের মধ্যে ফিলটার কূপের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পুকুরের মধ্যে ফিলটার কূপের ব্যবস্থাটি সস্তা এবং এইটাই তিনি গ্রামে গ্রামে চালু করিলেন। এই কূপ সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপে পুকুরের মধ্যে বসান হয়:—

৪খানা ১০ ফুটী করগেট পাশাপাশি জুড়িয়া, পরে উহাকে গোল করিয়া একটি ঢোলে পরিণত করা হয় এবং ভিতরে লোহার ফ্রেম দিলে উহা শক্ত হয়। এই ঢোল পুকুরের মধ্যে বসাইয়া প্রথমে জল শুষ্ক করিয়া পরে আবশ্যকমত মাটী খনন করা হয়। জলের নীচে এইরূপ মাটী খনন করাকে কেজুন বোরিং বলে (caisson boring)। তারপর বাঁশের ফ্রেমে দরমার দ্বারা তৈরী একটি ঢোল উহার ভিতর বসাইয়া টিনের ঢোলটিকে তুলিয়া লওয়া হয়। এই দরমার ঢোল দেওয়ার উদ্দেশ্য পাশের মাটি আসিয়া যাহাতে গর্তটি ভরাট হইয়া না যায়। ইহার পরে উহার মধ্যে ফিলটার কূপটি বসান হয়। ৩৪ জন লোক একদিনে এইরূপ কূপ খনন করিয়া একটি ফিল্টার বসাইয়া দিতে পারে।

কর্মীরা গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রামবাসীদের লইয়া গ্রামের রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পুকুরের পানা ও বনজঙ্গল সাফ করিতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সহযোগিতা না করিলেও তাঁহারা গ্রাম পরিষ্কারের কাজ ছাড়িতেছেন না। তাঁহারা নিজেরাই সাধ্যমত খাটিয়া যাইতেছেন। একদিনের সংবাদে জানা যায়—শ্রীযুক্ত কানু গান্ধী তাঁহার কেন্দ্রে একটি গ্রামের রাস্তা নির্মাণের জন্য গ্রামবাসীদের শ্রমসাহায্য চাহিলেন, কিন্তু কেহই কাজে আসিল না। অবশেষে তিনি নিজেই মাটি কাটিয়া রাস্তাটি মেরামত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা একাই কাজ করিলেন। এমন সময়ে রাস্তার উপরে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উহা দেখিতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত কানুগান্ধীকে ঐভাবে পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার কাজ ছাড়িলেন না। শেষ পর্যন্ত যাহারা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও কাজে যোগ দিল।

কর্মীরা যেখানে সহানুভূতি পাইতেছেন না সেখানে ঠিক এইভাবেই পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই কাজ করিয়া যাইতেছেন।

গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য সতীশবাবু কিছুদিন হইতে স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদিগকে কন্‌ট্রোল দামে চাউল বা খয়রাতি বস্ত্র বিতরণ করা হইবে তাহাদিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলে, প্রত্যেক বাড়ীর একজনকে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কি ১॥ ঘণ্টা করিয়া সুলভ মূল্যের প্রতিদান হিসাবে গ্রামের মঙ্গলের জন্য রাস্তা মেরামত, পানা তোলা, জঙ্গল সাফ প্রভৃতি যে কোনও একটি কাজ করিতে হইবে। এইভাবেও কিছু কিছু করিয়া গ্রাম পরিষ্কারের কাজ চলিতেছে।

কর্মীরা গ্রামবাসীদের নৈতিক উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা করিতেছেন। কোনও অসৎপন্থা অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতেছেন। এ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের লোভ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে চণ্ডীপুরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বসু একবার অনশন করেন। ইহাতে ফল ভালই দেখা দেয়।

অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য কোন কোন কেন্দ্রে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কাজিরখিল ও আতাকোরায় দুইটি বনিয়াদি বিদ্যালয় চলিতেছে। শ্রীযুক্ত কানুগান্ধী তাঁহার কেন্দ্রে ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একটি ব্রতচারী নৃত্যের দল গঠন করিয়াছেন। সর্দার জীবন সিং তাঁহার কর্মকেন্দ্র দালালবাজারে ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত খেলার ছলে তাহাদিগকে দিয়া সংকল্প গ্রহণের অনুষ্ঠান করান। বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি জাতীয় পতাকা উড়াইয়া উহার চারিদিকে ছেলেমেয়েরা বসিয়া যায়। তারপর একসঙ্গে সকলে উচ্চারণ করে—"এই ভূমি আমার মাতৃভূমি। এই ভূমি আমি ছাড়িব না ও ধর্মপালন করিব। মৃত্যু আসিলে আজ এখন যেমন বসিয়াছি এমনি বসিয়া বসিয়া মৃত্যু লইব। ভয় ছাড়িব ও হাতিয়ার ধরিব না।"

সকল কেন্দ্রে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে রোগীর সেবা চলিতেছে। কাজিরখিলে একটি সস্তা ঔষধালয়ও খোলা হইয়াছে। এখানে প্রতি-দিনই রোগীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। সকলকেই আপন ভাবিয়া সেবা করা হইতেছে।

প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান ব্যতীত কর্মীরা মাঝে মাঝে সভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। সভায় পুনর্বসতি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা ও দিন-লিপি পাঠ করা হয়। কর্মীরা গ্রামবাসীদের বিভিন্ন কুটীর শিল্পের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইয়া দেন। প্রদর্শনীতে সূতা কাটাও দেখান হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবীর উদ্যোগে মাঝে মাঝে মেয়েদের লইয়াও সভার আয়োজন হইয়া থাকে। সভায় মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

নোয়াখালি জেলায় নারিকেল অজস্ররূপে ফলে। নোয়াখালিবাসীরা এই নারিকেল কেবল রপ্তানি করিয়াই কিছুমাত্র আয় করিয়া থাকে। সতীশবাবু দেখিলেন এই নারিকেল দ্বারাই নোয়াখালিকে সম্পদশালী করা যায়। তাই তিনি নারিকেলের তৈল, শাঁস, খোল ও ছোবড়া লইয়া নারিকেল শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য পথ দেখাইয়া দিলেন। ছোবড়া হইতে রশি, পাপোশ, জাজিম কয়া, নারিকেলের মালা হইতে পেয়ালা মায় হাতল, খুরা, বোতাম ও হুকার খোল প্রস্তুত হইতে

লাগিল। কাজিরখিল ক্যাম্পে এই সকলের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করিবার জন্য কর্মীরা গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচলন করিয়াছেন এবং কেন্দ্র হইতে গ্রামবাসীদের সুতা-কাটা শিক্ষা দিতেছেন। কেন্দ্রগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্য কাজিরখিলে চরকা ও উহার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নবাগত শিক্ষার্থীদিগকেও এখানে চরকা নির্মাণ ও সুতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কোন কোন কেন্দ্রে তুলার চাষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের চাষও চলিতেছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে সতীশবাবু যে সকল সাম্প্রদায়িক অপরাধের গুরুত্ব রহিয়াছে, যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং যাহা তিনি প্রমাণ করাইতে পারিবেন, এইরূপ ঘটনা সকল পুলিশকে জানাইতে থাকেন এবং তাঁহার সম্পাদিত শান্তি-মিশন দিনলিপিতেও প্রকাশ করিতে থাকেন। জুলাই মাসের অর্দ্ধেক সময় পর্যন্ত তিনি হত্যা, লুণ্ঠন, চুরী, গৃহদাহ, স্ত্রীলোকের শ্লীলতানাশ ও শ্লীলতানাশের চেষ্টা, ধমকানী ও শাসানী, বয়কট, জোরপূর্বক জমির ধান কাটিয়া লওয়া প্রভৃতি প্রায় সাড়ে চারিশত অপরাধমূলক ঘটনার কথা পুলিশকে জানান। পুলিশ বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কচিৎ দুএকটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিকারের জন্য আগাইয়া আসেন নাই। সতীশবাবু জুলাইএর শেষ দিক হইতে দিনলিপিতে এই অপরাধমূলক ঘটনা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন, তবে কর্তৃপক্ষকে ইহা পূর্বের ন্যায়ই জানান হইতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহাতে কিছু না করিলেও কর্মীরা তাঁহাদের কর্তব্য হিসাবেই এই সকল অপরাধের কথা পুলিশকে জানাইয়া আসিতেছেন।

কর্মীরা এইভাবে সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। মাঝে এপ্রিল মাসে অত্যাচারীদের অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়া যায়। সতীশবাবু এই সব ঘটনা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে তিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার উত্তরে জানান—যাহা দেখিতেছি তাহাতে হয় নোয়াখালির হিন্দুদের ঐ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা মুসলমানদের ধর্মান্ধতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করা উচিত তাহা স্থির করিবেন।

কর্মীরা স্থির করিলেন, পলায়ন অথবা মৃত্যু এই দুইটির মধ্যে আমরা মৃত্যুকেই বরণ করিতে প্রস্তুত। নোয়াখালির মাটি ছাড়িব না। মরিতে হয় এইখানেই মরিব, তবুও নিজেদের কর্তব্য ত্যাগ করিব না।

মানুষ আপন কর্তব্যে স্থির থাকিয়া কতখানি নির্ভীক হইলে তবে এমন কথা বলিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন। কর্মীদের এই যে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা ও কর্তব্যে নিষ্ঠা ইহা সত্যই অপূর্ব ও বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

এই সকল কর্মী তাঁহাদের সকল কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আজ ১০ মাসকাল ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সেবা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত নির্বিশেষে সকলের নিকটেই বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুমুসলমান যদি মহাত্মা গান্ধী তথা কর্মীদের এই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তবেই পূর্ববাঙ্গলার এই দুইটি জেলা তাহাদের কৃত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া আবার সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং এখানকার হিন্দুমুসলমান মৈত্রী সংক্রামিত হইয়া ক্রমে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ছড়াইয়া পড়িবে, ফলে পূর্ববাঙ্গলায় পাকিস্থান আগমনে সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায় আজ যে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও একটা সমাধা হইবে।

শহীদ ক্ষুদিরাম

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কে বাজাল ওই প্রলয় বিষাণ জীবনের জয়গান—
প্রাণের যজ্ঞে প্রথম আহুতি—বিপ্লব অভিযান!
পরাধীনতার কঠিন পীড়নে কাঁদে অন্তর যার—
সেই ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াল নির্ব্বিকার!
বিদ্রোহী প্রাণে জ্বলিয়া উঠিল রক্ত-বহ্নি-শিখা
আপন রক্তে আঁকিল ললাটে দীপ্ত বিজয়-টীকা—
"স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা, স্বাধীন স্বপ্ন যার—
আমার দেশেতে বাঁচিবার আছে আমাদেরই অধিকার!"
দিকে দিকে তারি লেলিহান শিখা জ্বলিছে বজ্রানল—
কত প্রাণ দিল বলিদান শুধু ভাঙিবারে শৃঙ্খল!
কত বীর মাতা আশীষ দিয়াছে কাহিনী রচিয়া যার—
তারই স্মৃতি আজো জাতির জীবনে আরতির সম্ভার!
তুমি নাই আজ, চ'লে গেছ দূর মরণ-সিন্ধু পার—
তবুও গরজে মাভৈঃ মন্ত্রে জীবনের ঝঙ্কার!
সাত্ত্বিক, তব নেভেনি' আগুন—দৃপ্ত শিখাটি তার—
মরণ-বিজয়ী বিপ্লবী বীর—লহ গো নমস্কার।

ক্ষুদিরাম চিত্র—লক্ষ্মী দাস
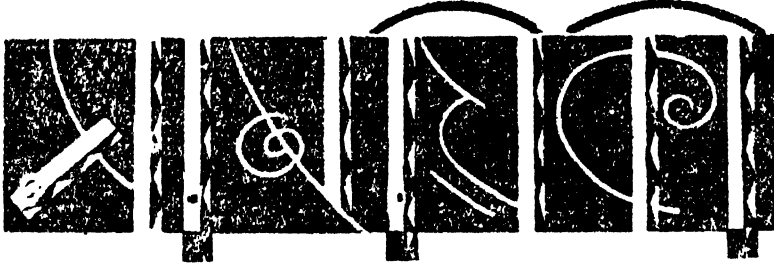
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিল। ঐ দিন বহু বৎসর পরে ভারত আবার স্বাধীনতা লাভ করিল। গত ৬০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস যে সংগ্রাম করিয়াছে, আজ তাহা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে—এ জন্ম যাঁহারা সংগ্রামে যোগদান করিয়া নানা-প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন ও জীবনাহুতি দিয়াছেন, আজ স্বাধীনতা লাভের শুভক্ষণে আমরা তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমরা নিরানন্দ—কারণ জাতীয়তা-বিরোধী ভারতীয় মুসলেম লীগের আন্দোলনের ফলে আজ ভারত হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুইটি স্বতন্ত্র দেশে বিভক্ত হইয়াছে। হয় ত এই বিভাগ স্থায়ী হইবে না, কিন্তু তথাপি আজ যে সকল হিন্দুকে মুসলমান প্রধান অঞ্চল অর্থাৎ পাকিস্থানে থাকিতে হইল—তাঁহাদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা জানাই যেন আমরা আমাদের বিজয়োৎসবের মধ্যে তাঁহাদের কথা ভুলিয়া না যাই। ভগবান না করুন, যদি তাঁহারা নির্য্যাতিত হন, আমরা যেন তাঁহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হই। নচেৎ আমাদের এই স্বাধীনতা লাভ অসার ও নিরর্থক হইবে।

পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু—

বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুর মনোভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমাদের জনৈক কথা-সাহিত্যিক বন্ধু কুমিল্লা হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"১৫ই আগষ্ট আগাইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তির দিন আসন্ন। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ভারতবর্ষ উন্মুখ, চঞ্চল। আনন্দোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু আজ অজানা আশঙ্কায় দিন গণিতেছে। আজ তাহার জন্ম সৃষ্টি হইবে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার নূতন শৃঙ্খল। আজ সে স্বাধীন ভারতের কেহ নয়, ভারতের গৌরবের স্মৃতি-বিজড়িত জাতীয়-পতাকা তাহার কাছে বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতীক মাত্র। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার তাহার নাই। চন্দ্রতারকা-লাঞ্ছিত লীগ পতাকাকে রাষ্ট্রপতাকার সম্মান দিতে হইবে—তাহাকে করিতে হইবে অকুণ্ঠচিত্তে অভিবাদন—জয়ধ্বনি করিতে হইবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। যে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু ভারতের স্বাধীনতার জন্ম স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আজ ভারতের স্বাধীনতার দিনে তাহার কপালেই বিধাতা আঁকিয়া দিলেন সকলের চেয়ে বেশী দুঃখ—পরাজয়ের ও নিরাশার অপরিসীম গ্লানি। আপনাদের ঈর্ষা করি—ভারতের স্বাধীনতার আপনারা অংশভাগী। আপনাদের আনন্দ ও গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাউক, এই প্রার্থনা করি। তবুও এই অনুরোধ জানাই, আপনাদের আনন্দোৎসবের মধ্যে স্মরণ করিবেন, এই দুর্ভাগা পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুদের—যাহাদের দুঃখ ও ত্যাগের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা ক্রীত হইয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম সদস্য চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী নূতন পশ্চিম

চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী

বঙ্গের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি সালেম জেলার সদরে উকীল ছিলেন—গত ২৭ বৎসর কাল তিনি একান্তভাবে নিজেকে দেশের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, ঐকান্তিকতা, নির্ভীকতা ও নিষ্ঠা আজ তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মান দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা যেন তাঁহার নেতৃত্বে নূতন জীবন লাভ করিতে পারে, ইহাই আজ আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার কৃতী সন্তান, স্বনামধন্য নেতা ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেস ভুক্ত না হইলেও কংগ্রেস যে আজ তাঁহার যোগ্যতা ও শক্তির সমাদর করিয়াছে, তাহা শুধু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নহে, বাঙ্গালার পক্ষেও সম্মানের এবং গৌরবের বিষয়। মহাসভা দেশের বহু জাতীয় ভাবাপন্ন নেতাকে গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে—আজ কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদকে গ্রহণ করায় কংগ্রেসেরও উদারতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই উচ্চপদে আসীন থাকিয়া সমগ্র ভারতের ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার সেবা করিয়া ধন্য হইবেন।

সংস্কৃত শিক্ষা ও নূতন শিক্ষামন্ত্রী—

নিখিলবঙ্গ পণ্ডিত সমাজ হইতে গত ২৩শে জুলাই বাঙ্গালার নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতিকে কলিকাতা আর্য্যসমাজ হলে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইলে শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন—সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করা সম্ভব না হইলেও সংস্কৃত পঠন, পাঠন, গবেষণা ও আলোচনার ব্যাপক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। বিচারপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বক্তৃতা

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা নেতা ও দেশসেবক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৫ই আগষ্ট হইতে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এখন দেশের কল্যাণের জন্ম

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে আছেন; তাঁহাকে বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রি-সভারও অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এখনও ফিরিতে না পারায় সে পদে কাজ করিতে পারেন

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

নাই। তাঁহার হয়ত ফিরিতে বিলম্ব হইবে, সেজন্ত তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর হইয়া কাজ করিবেন। বাঙ্গালী বিধানচন্দ্রের এই অসামান্ত সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে চিকিৎস ক্ষেত্র হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহ কথাই এই সুদিনে বার বার মনে পড়িতেছে। বিধানচ যুক্তপ্রদেশে বাস করিলে বাঙ্গালী একজন সুচিকিৎস হারাইবে বটে, কিন্তু বিধানচন্দ্রের এই গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে। বিধানচন্দ্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্ম্মশক্তি অবশ্য তাঁহাকে তাঁহার নূতন কাজে সাফল্য লাভে সম করিবে।

দমদম বিমান ঘাটীতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ফটো—ডি-রতন

দেবনারায়ণ সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা ৩১ শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ কিশোর আলেখ্য সম্মেলনের উদ্যোগে গত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যায় শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুলের অমৃতলাল হলে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। কবি শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া দেবনারায়ণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২০শে ও ২১শে আষাঢ় নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা, দমদম—২০নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে

বয়েজ ওন হোমের বিরাট হলঘরে নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর বক্তৃতার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মঙ্গলাচরণ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু উদ্বোধন করেন ও মূল সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন; দর্শন শাখায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করেন ও নবদ্বীপ নিবাস পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সভাপতিত্ব করেন, কাব্য শাখার কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক উদ্বোধন করেন ও ব্যারিষ্টার কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন ও শেষে কীর্ত্তন শাখার শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই, বিশেষ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির নায়ক শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিক বৈষ্ণবের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সমাগত সুধীবৃন্দ ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সুধীবৃন্দ (১ম দিবস) ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

রামচন্দ্রপুরে নূতন প্রতিষ্ঠান—

মানভূম জেলার মোরাদী ডাকঘরের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে 'মহাত্মা নিবারণচন্দ্র আদর্শ বিদ্যালয়' ও 'স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ বিদ্যার্থী ভবন' নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করার সকল ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থী ভবন গৃহ প্রস্তুত

হইতেছে, গৃহ সম্পূর্ণ হইলে বহু ছাত্র তথায় থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। স্বামী অসীমানন্দ (পূর্ব্বনাম অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ এবং প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। গ্রামে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন খুবই বেশী; তাহা ছাড়া যে দুই মহাপুরুষের নামে প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের নামকরণ করা হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কাজেই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সকল প্রকারে পূর্ণাঙ্গ হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়, সে বিষয়ে সকলের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

করেন। সম্মেলনে স্থানীয় বহু কবি ও সাহিত্যিকের লে পঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কথা-সাহিত্যি শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহার অভিভাষণে নাটোর মহকুম গৌরবময় ইতিহাস ও স্থানীয় সাহিত্যিকদিগের ক বিবৃত করিয়াছিলেন।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা—

ক্যান্সার রোগ সহজে আরাম হয় না এবং তাহা চিকিৎসাও ব্যয়-বহুল। ঐ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্য এ দেশে দিন দিন বাড়িতেছে। সে জন্য কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে উহার চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। তথায় পর্য্যপ্ত স্থান নাই বলিয়া

ভাঙ্গী কলোনীতে মহাত্মাজীর দর্শন আশায় লেডী মাউণ্টব্যাটন

নাটোর লিডার ক্লাব—

গত ১১ই জুন রাজসাহী জেলার নাটোর সহরে স্থানীয় লিডার ক্লাবের বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য

সম্প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি স্বতন্ত্র ক্যান্সার (কর্কট রোগ) চিকিৎসা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। এ বিষয়ে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে। আশা করি, অর্থাভাবে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিলম্ব ঘটিবে না।

খাজা নাজিমুদ্দীন নেতা নির্ব্বাচিত—

গত ৫ই আগষ্ট পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের লীগ দলের

পরিষদ-সদস্যদের এক সভায় বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীকে ৭৫—৩৯ ভোটে পরাজিত করিয়া খাজা নাজিমুদ্দীন দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ আই-আই-চুন্দ্রীগড় সভাপতিত্ব করেন। এখন খাজা সাহেবই পূর্ব্ববঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী হইবেন।

নেতাজী সুভাষ রোড—

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ৫ই আগষ্টের সাধারণ সভায় কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত পথটির (উহা এখন ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট, চার্ণক প্লেস ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট নামে পরিচিত) নেতাজী সুভাষ রোড নামকরণ করা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ ও মুসলেম লীগ দলও প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াছেন।

প্রেস কনফারেন্সে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্পর্কে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর ভাষণ ফটো—ডি-রতন

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের দায়িত্ব—

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের কি দায়িত্ব থাকিবে সে বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও গত ২রা আগষ্ট নয়া-দিল্লীতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ঐক্যবদ্ধ ভারতই পৃথিবীর জাতি সংঘে আপনার যোগ্য আসন লাভ করিতে পারে ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। এই গুরুতর কর্মভার গ্রহণের যোগ্যতা দেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই। এই জন্যই কংগ্রেসের দায়িত্ব আজ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক। জনসাধারণের সমর্থনে গঠিত রাজনৈতিক দল না থাকিলে স্থায়ী শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট হইতে পারে না। এজন্যও আজ কংগ্রেসের দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ

গত ৩রা আগষ্ট করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মিলনে রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন—ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ-ভাবে চেষ্টা করিয়া যাইবে। ভারতের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকিতে ও সম্মানজনকভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে দেশান্তর গমন করিতে হইবে। অন্য কারণে দেশান্তর

গমন উচিত হইবে না। যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করিবে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিবে। পাকিস্তানেও কংগ্রেস পূর্ব্বের মতই কাজ করিয়া যাইবে।

ক্যানেডার উচ্চপদস্থ বিভাগীয় কর্মীগণ ও পণ্ডিত জহরলাল

নূতন গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণর—

১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতের দুইটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের কাজ করিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—গভর্ণর জেনারেল—লর্ড মাউণ্টব্যেটেন। মাদ্রাজের গভর্ণর—সার আর্চিবল্ড নাই। বোম্বায়ের গভর্ণর—সার ডেভিড কলভিনি। আসামের গভর্ণর—সার আকবর হায়দারি। পশ্চিম বঙ্গ—শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি। পূর্ব্ব পাঞ্জাব—সার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকোয়াসা। বিহার—শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম। উড়িষ্যা—ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু। যুক্তপ্রদেশ—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ডাক্তার রায় এখন আমেরিকায় আছেন—তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশে গভর্ণরের কাজ করিবেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে—গভর্ণর জেনারেল—মিঃ এম-এ-জিন্না। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্ণর—সার ফ্রান্সিস মুডি। সিন্ধুর গভর্ণর—মিঃ গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর—স্যার জর্জ্জ কানিংহাম। পূর্ব্ব বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফেড্রারিক বুর্ণ। শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকোয়াসা বর্ত্তমানে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি, ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু—যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এখন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অন্যতম সচিব। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম সিন্ধুর খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা।

পাকিস্তান গণপরিষদে শ্রীহট্ট সদস্য—

গত ২রা আগষ্ট শ্রীহট্ট হইতে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টবাসীরা অধিক ভোটের দ্বারা উক্ত জেলাকে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—মিঃ আবদুল হামিদ, আবদুল মতিন চৌধুরী ও অক্ষয়কুমার দাস। ১১ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন—

অক্ষয়কুমার দাস, রমেশচন্দ্র দাস ও যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, ভোটে যোগদান করেন। ৭ জন সদস্য কলিকাতায় ছিলেন, যথা সময়ে শিলঙ্-য়ে যাইতে পারেন নাই।

সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন—

সিন্ধু দেশের মুসলেম লীগ মিঃ এম-এ-খুরোকে দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। কাজেই তিনি সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী হইবেন। খুরোর জীবন-কাহিনী অসাধারণ।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শাল ভাইকাউণ্ট মণ্টগোমারী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—

এই সংখ্যায় অন্যত্র 'শহীদ ক্ষুদিরাম' শীর্ষক যে গান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রচনা ও তাহাতে সুর যোজনা করিবার সময় রচয়িতা—লালগোলার রাজা, আমাদের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে শয্যাশায়ী। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তিনি সত্বর সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হউন।

ছাড়পত্র ও মুদ্রা সমস্যা—

দিল্লীতে স্থির হইয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান যে কোন দেশ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রবেশের জন্য কোন পাসপোর্ট বা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে না। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে ১৯৪৮ সালের ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একই মুদ্রা চালু থাকিবে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর নাগাদ পাকিস্থানে স্বতন্ত্র কারেন্সি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুইটি দেশের মধ্যে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চলিবে। একচেটিয়া অধিকার বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ থাকিবে। এই সকল প্রস্তাবে উভয় রাষ্ট্রই সম্মত হইয়াছেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ হেনরী গ্রেডী ও পণ্ডিত নেহরু

পশ্চিম বঙ্গে নূতন নিয়োগ—

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ভাবে কর্ম্মী নিয়োগ করিয়াছেন—(১) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ এস-সেন আই-সি-এস (২) রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য—মিঃ এস-ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস (৩) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ এস-এন-রায় আই-সি-এস (৪) স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ আর-গুপ্ত আই-সি-এস (৫) অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস-কে-মুখার্জ্জি আই-সি-এস (৬) বিচার ও আইন বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ বি-কে-গুহ আই-সি-এস (৭) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ এস-কে-গুপ্ত আই-সি-এস (৮) কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম-কে-কৃপালনী আই-সি-এস (৯) শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে-সি-বসাক আই-সি-এস (১০) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস-কে-চ্যাটার্জ্জি আই-সি-এস (১১) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মিঃ এ-ডি-খান আই-সি-এস (১২) গভর্ণরের সেক্রেটারী মিঃ বি-এন-চক্রবর্ত্তী আই-সি-এস (১৩) কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার—মিঃ এস-কে-দে আই-সি-এস (১৪) প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ কে-কে-হাজরা আই-সি-এস (১৫) গঠনতন্ত্র, নির্ব্বাচন ও মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী মিঃ এস-বি-বাপাত আই-সি-এস (১৬) বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার

মিঃ বি-বি-সরকার আই-সি-এস (১৭) অন্যান্য জেলার কমিশনার মিঃ জে-এন-তালুকদার আই-সি-এস (বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলা সমূহ ছাড়া জলপাইগুড়ি অন্যান্য সকল জেলার বিভাগীয় সদর বলিয়া গণ্য হইবে।) (১৮) সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিঃ বি-কে-আচার্য্য আই-সি-এস (১৯) কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ এন-কে-রায়চৌধুরী আই-সি-এস (২০) কলিকাতার এডিসনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি-পি-আই-বৈদ্যনাথম্ আই-সি-এস (২১) কলিকাতার স্পেশাল ল্যাণ্ড একুইজিসন কলেক্টার মিঃ বি-এন-মিত্র আই-সি-এস (২২) শ্রমিক ক্ষতি পূরণ ও কৃষি আয়কর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ এস-কে-সেন আই-সি-এস (২৩) ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আর-কে-মিত্র আই-সি-এস (২৪) হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ আর-এ-এস-ষ্ট্র্যাসি আই-সি-এস (২৫) হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি-এ-বোরোনহা বি-সি-এস (২৬) বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস-এন-মিত্র আই-সি-এস (২৭) বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার অধিক্রম মজুমদার বি-সি-এস (২৮) বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন জি-রায় বি-সি-এস (২৯) খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি-সি-এস (৩০) মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ-কে-ঘোষ আই-সি-এস (৩১) জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ আর-কে-রায় আই-সি-এস (৩২) দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার মিঃ বি-জি-ক্রীক আই-সি-এস (৩৩) ২৪ পরগণার জেলা জজ মিঃ এস-এন-গুহ-রায় আই-সি-এস (৩৪) হাওড়ার জেলা জজ মিঃ এ-এস-রায় আই-সি-এস (৩৫) হুগলীর জেলা জজ মিঃ এস-কে-হালদার আই-সি-এস।

উভয় বাঙ্গলায় রাষ্ট্রভাষা বাঙ্গলা—

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে ৭ই জুলাই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক চাপে আজ সোনার বাঙ্গালা বিভক্ত। বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব বিপন্ন। বঙ্গভাষার গতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কায় বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি সমগ্র বাঙ্গালা ভাষাভাষী নরনারীকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও স্ফুরণ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ ও যত্নবান হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। এই সমিতি আশা করেন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার বাহনে তাঁহাদের শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং দুইটি প্রদেশের যাবতীয় রাষ্ট্র কার্য্যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইবার দাবী করিবেন। এই ভাষার বন্ধনের দ্বারাই সাত কোটি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অখণ্ডতা ও সৌহার্দ্দ্য রক্ষিত হইবে। এই সমিতি বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকগণকে ও কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরূপ জনমত সৃষ্টির জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে।

গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী

৺গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৪শে এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা

লাভ করিয়া অনাড়ম্বর শান্ত ও সন্তুষ্ট জীবন যাপন করিতেন ও শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোন্নগর পাঠচক্র ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল।

কাশীধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবাসস্থান—

খৃষ্টাব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু কাশীধামে দুই মাস য়াছিলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের ভিটায় অবস্থান বং তপন মিশ্রের গৃহে াতেন এবং সন্নিকটস্থ বসিয়া সনাতন বৃন্দাবন প্রকটের ান করিয়াছিলেন। বটবৃক্ষতল বর্ত্তমানে র মন্দিরের সন্নিকটে তন্য বট) মহল নামে এই স্থানটি বেনারস বোর্ডের দখলে। াতিষচন্দ্র ঘোষ ও াপালদাস আগরওলা ায় সে স্থানে একটি হইয়াছে ও রাস্তার রাড" হইয়াছে। সম্প্রতি রায় খগেন্দ্রনাথ জ্যোতিষবাবু ও চকদিঘির শ্রীলীলামোহন কাশীধামে গমন করিয়া বেনারস মিউনিসি- নিকট হইতে স্থানটি "স্থান উদ্ধার সমিতিকে" ঞ্জুর করাইয়াছিলেন। তাঁহারা ২রা আগষ্ট লীটোলা স্কুলে চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর মেটার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা লীদের চিত্ত গৌরাঙ্গ-স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রকাশ মহাশয় স্থানীয় তি হইয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব শীপ্রবাস স্থান প্রকট করিবার জন্য অর্থাদি র্ত্তব্য। ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডে সম্পাদকের তথ্য পাওয়া যাইবে।

রতের মন্ত্রিসভা—

সদস্যগণকে লইয়া নূতন স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রী—পররাষ্ট্র বিভাগ (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল —দেশীয় রাজ্য, স্বরাষ্ট্র, সংবাদ ও বেতার বিভাগ (৩) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খাদ্য ও কৃষি (৪) সর্দ্দার বলদেব সিং—দেশরক্ষা (৫) আর-কে-সন্মুখম্ চেটি—অর্থ (৬) ডক্টর বি-আর-আম্বেদকর—আইন (৭) ডক্টর জন মাথাই—রেল (৮) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—শিল্প ও সরবরাহ
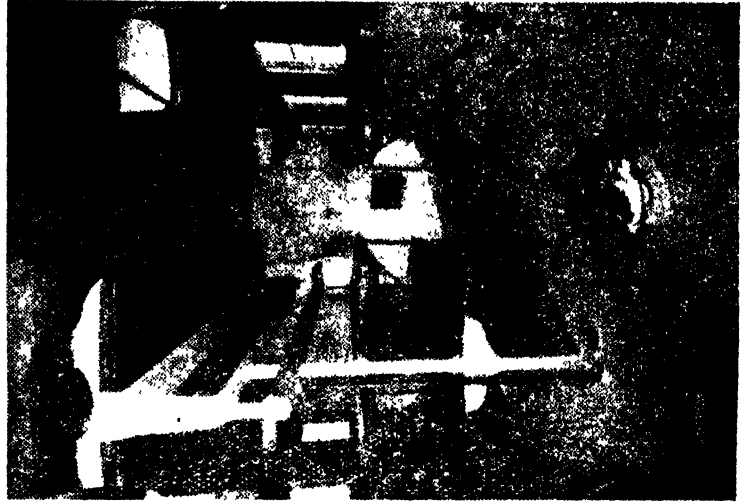
সিলভার এ্যারো—নূতন পরিকল্পনায় যুদ্ধপরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ট্রেণ

(৯) মিঃ সি-এচ-ভাবা—বাণিজ্য (১০) মিঃ এন-ডি-গ্যাডগিল—পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ (১১) রফি আমেদ কিদোয়াই—চলাচল (১২) রাজকুমারী অমৃত কাউর—স্বাস্থ্য (১৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা (১৪) মিঃ জগজীবন রাম—শ্রম।

চট্টগ্রামে ভীষণ বন্যা—

চট্টগ্রাম বিভাগে ভীষণ বন্যার ফলে সমগ্র বিভাগের তিন পঞ্চমাংশ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা, পটিয়া, বোয়ালখালি, সাতকানিয়া, কাঞ্চনা, খেমসা ও আলোদিঘার ক্ষতি সাংঘাতিক। কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ৫ সহস্র গৃহের চিহ্ন-মাত্রও নাই। শুধু পটিয়ার বাজারে ৩ হাজার লোক আশ্রয় লইয়া আছে। চক্রশালা গ্রামে দেড় হাজার আশ্রয়-প্রার্থী সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংক্রামক পীড়া

দেখা দিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও অধিক হইবে।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ গত ২০শে আষাঢ় সন্ধ্যায় সম্মিলন স্থানে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক সভায় বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি
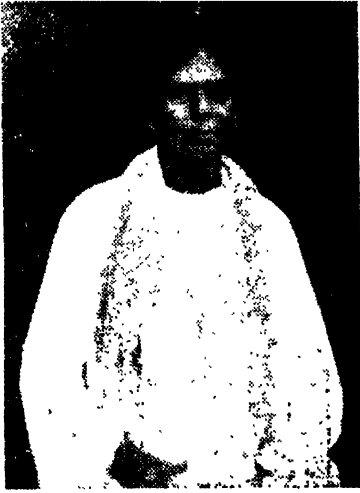
কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিককে সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমুদরঞ্জন আত্মভোলা মানুষ, স্তুতি-নিন্দার তিনি বাহিরে। তিনি মনের আনন্দে যে কাব্য রচনা করেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সর্ব্বোপরি তিনি পল্লীবাসী। কাজেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে কবির সুদীর্ঘ কর্ম্মময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা—

পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নলিখিতরূপ জাতীয় পতাকা স্থির হইয়াছে—পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হইবে—৩ ও ২। দণ্ডের সন্নিহিত অংশে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তৃত শ্বেতাংশ থাকিবে ও উহা সমগ্র পতাকার এক চতুর্থাংশ হইবে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ গাঢ় সবুজ বর্ণের হইবে ও সবুজের মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র ও একটি পঞ্চমুখী তারকা থাকিবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

১৩ই আগষ্ট মস্কৌতে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোভিয়েট রুশিয়ার প্রথম স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের দূতের কাজ লইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শদাতা মন্ত্রী মিঃ এ-ভি-পাই, সেক্রেটারী মিঃ প্রেমকৃষ্ণ, সাংস্কৃতিক অফিসার ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষাল, প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ টি-এন কৌল ও পাবলিক রিলেসন্স অফিসার কুমারী চন্দ্রলেখা পণ্ডিতও তথায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতি
পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি—

১১ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্থান গণপরিষদের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিঃ এম-এ-জিন্না গণপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরিষদে অস্থায়ী সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি হইয়া মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন যে, গভর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও যে কোন প্রকারেই হউক জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে নিরাপদ রাখা। আজ যে ব্যাপক উৎকোচ ও দুর্নীতি চলিতেছে উহা দমন করা হইবে। চোরা-কারবার ও আত্মীয়পোষণ বন্ধ হইবে। দরিদ্র জনসমাজের কল্যাণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। যিনি যে কোন

ধর্ম্মেই বিশ্বাসী হন না কেন বা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন না কেন, তাহার সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। উপলক্ষে প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।

তারকেশ্বর হিন্দু মহাসভার বিগত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অধিবেশন কালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জ্জি ও এন সি চাটার্জ্জি

ফটো—তারক দাস

উত্তর কলিকাতার নববর্ষ উৎসবের সভায় বঙ্গভারত সভাপতি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

ফটো—জে-কে সান্যাল

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর সম্বর্দ্ধনা—

গত ৩রা শ্রাবণ খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন তাহার প্রীতিকামী বন্ধুগণ সকলে তাঁহাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা এই

নেতাজী সুভাষ রোড—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৩ই আগষ্টের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে হ্যারিসন রোড হইতে হেয়ার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত (ক্লাইব ষ্ট্রীট, চার্চ্চপ্লেস ও ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট) রাস্তার নাম 'নেতাজী সুভাষ রোড' করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লী যাওয়ায় তাঁহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু ঐ বিভাগের প্রথমারম্ভ হইতে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, দিল্লী, নাগপুর, লাহোর, আগ্রা, বোম্বাই, পাটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন।

তারকেশ্বরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে বিপুল জনতার একাংশ
ফটো—তারক দাস

নিখিল ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ দিন নয়া দিল্লীতে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যে যে নূতন নূতন সৃষ্টি ও ভাবধারার প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার সহিত সর্ব্ব প্রদেশের সাহিত্যিকদের সম্যক পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আমরাও এরূপ একটি সম্মেলনের প্রয়োজন স্বীকার করি।

সম্মেলন বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। ইহার কার্য্যকরী সমিতিতে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি আছেন দিল্লী প্রবাসী শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ মহাশয়। তিনি আমাদিগকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে বহু সাহিত্যিকের ঠিকানা না-জানা থাকায় সম্মেলন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে পারেন নাই। সম্মেলনে যোগদান করিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহারা যদি ১নং ওল্ড মিল রোড, নিউ দিল্লী এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত দাশের সহিত পত্রালাপ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালী সাহিত্যের জন্য যে সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা যেন বাঙ্গালী পায়, সে বিষয়ে সাহিত্যিকগণকে অবহিত হইতে শ্রীযুক্ত দাশ অনুরোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী ৯ই আগষ্ট শনিবার সকালে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে আসিয়াছিলেন। ২ দিন বিশ্রামের পর তাঁহার নোয়াখালি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধির ফলে তিনি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী পরিদর্শন করেন ও স্থির করেন যে তিনি কয়েক দিন কলিকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এক পল্লীতে বাস করিবেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী গান্ধীজির সহিত একই গৃহে বাস করিয়া গান্ধীজির এই কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্মত হন। তাঁহারা বেলিয়াঘাটায় নবাব আবদুল গণিরপরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতেছেন।

সীমা কমিশনের রায়—

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব রাত্রি হইতে কলিকাতায় হিন্দুমুসলমানের মিলিত শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। মুসলমানগণ দলে দলে পথে বাহির হইয়া হিন্দুদের সহিত স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে ও নিজেরাও উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছে। বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ্, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ, মহাত্মা গান্ধীর জয়, আল্লা হো আকবর প্রভৃতি রবে বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে কলিকাতা সহর মুখরিত হয়। শুক্র, শনি ও রবি তিনদিন ধরিয়া অবিরাম সে উৎসব চলে। সোমবার মুসলমানপর্ব্ব ঈদ উপলক্ষে হিন্দুরাও মুসলমানদের উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ করিয়াছে। সেই আনন্দের মধ্যে ১৮ই জুন সকালে সীমা কমিশনের রায় প্রকাশিত হয়। ভাগাভাগির সময় কোন বিচারকই উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।

কাজেই হয় ত কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই। তথাপি বলিতে হয়, সীমা কমিশনের সভাপতি সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে রায় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। তিনি বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—বাঙ্গালা—পূর্ব্ববঙ্গ পাইয়াছে—পুরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহি বিভাগের রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহি ও পাবনা জেলা সম্পূর্ণভাবে ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের সম্পূর্ণ খুলনা জেলা। পশ্চিম বঙ্গ পাইয়াছে—পুরা বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগের পুরা জেলা—কলিকাতা,২৪পরগণা ও মুর্শিদাবাদ এবং রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং জেলা। তাহার পর নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি ৫টি জেলা ভাগ করিয়া উভয় দেশকে কিছু অংশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নদীয়া জেলার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে—খোকসা, কুমারখালি, কুষ্টিয়া, মীরপুর, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাংনা, দামুর হুদা, চুয়াডাঙ্গা,জীবননগর ও মেহেরপুর থানা এবং দৌলতপুর থানার মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব্বাংশ। যশোহর জেলার মধ্যে মাত্র বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা দুইটি পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে ও বাকী সকল অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে—রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোষমাণ্ডি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ থানা এবং বালুরঘাট থানায় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রেল লাইনের পশ্চিমের অংশ। দিনাজপুরের বাকী অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার মাত্র তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানা ও কুচবিহার রাজ্যের দক্ষিণের কিছু অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে—বাকী সমগ্র জেলা পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে। মালদহ জেলার গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভুলাঘাট থানা পূর্ব্ববঙ্গে ও বাকী অংশ পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার ৪টি থানা—পাথরকান্দী, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ ও বদরপুর—আসাম প্রদেশের মধ্যে আছে—জেলার বাকী সকল অংশ পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আসাম প্রদেশের আর কোন অংশ পূর্ব্ববঙ্গে আসে নাই।

সীমা কমিশনের নির্দ্দেশমত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে গিয়াছে—পুরা মুলতান ও রাওলপিণ্ডি বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা ও শিয়ালকোট জেলা। পূর্ব্ব পাঞ্জাব পাইয়াছে—পুরা জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা। লাহোর বিভাগের গুরুদাসপুর ও লাহোর জেলা উভয় দেশের মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

বেদনা বিহ্বল কাঁপে বেণুবন দূর,
কাঁদে দুখে ভাগীরথী সকরুণ সুর।
যৌবনপীড়িতা কাঁদে আঁখি তারা ম্লান,
এলোমেলো সব যেন ছন্দহারা গান।
নির্ম্মম নিষাদ ক্ষিপ্ত বিচ্ছেদের বান
প্রতিপলে হৃদয়েরে করে শতখান।
রক্তাক্ত পরাণ পাখী আর্ত্তনাদ করে,
অলক্ষ্যে শোণিত বিন্দু নিঃশেষিয়া ঝরে।
সার্থকতা নাহি নামে ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া,—
স্বামী পরিত্যক্তা নারী, অদৃষ্টের ক্রিয়া!

হতাশার অশ্রুভারে লবণ জলধি,
গোপনে গরজে বক্ষে ক্ষোভে নিরবধি।
আস্বাদিত জীবনের সুধা স্মৃতি ভার,
রচিয়াছে তার লাগি ক্রূর কারাগার।
আশার পূরবী মৌন পথহারা সুর,
প্রিয়ের সন্ধানে লাগি গেছে চলি দূর।
দৈন্যের অভাব তিক্ত প্রচুরের মাঝে,
অন্তরে দংশন করে নিত্য প্রতি কাজে!
বিচ্যুতা লতিকা দুঃখে লোটে ধরাতল'—
ব্যর্থকাম পূজারিণী আঁখি ছল ছল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকান ও বৃটিশ টেনিস খেলা ঃ

আমেরিকান ন্যাশনাল লন টেনিস টুর্ণামেন্টের আউট-ডোর প্রতিযোগিতা ১৮৮১ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। আর ডি সিয়ার্স ১৮৮১-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সাত বছর সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে রেকর্ড করেন। এর পর উইলিয়াম টি টিলডেন ১৯২০-২৫ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ছ'বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ পান। এবং তাছাড়া ১৯২৯ সালেও তিনি চ্যাম্পিয়ান হ'ন। মেয়েদের সিঙ্গলস টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮৮৭ সাল থেকে। পুরুষদের ডবলসের খেলা ১৮৮১ সালে এবং মেয়েদের ১৮৯০ সালে প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুরুষদের ইন-ডোর ডবলস ও সিঙ্গলসের খেলা ১৯০০ সালে এবং মেয়েদের সিঙ্গলস ১৯০৭ সাল এবং ডবসের খেলা ১৯০৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকান টেনিস 'Rankings' এ পুরুষদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন আর ডি সিয়ার্স ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত। এর পর উইলিয়ম টি টিলডেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯২০-২৯সাল পর্য্যন্ত পুরুষদের সিঙ্গলস 'Rankings' তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

মেয়েদের 'Rankings' তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। ঐ বছর মেরী কে ব্রাউনী শীর্ষস্থান লাভ করেন। 'আমেরিকান লন টেনিস এসোঃ চ্যাম্পিয়ানস' প্রতিযোগিতায় মহিলা এবং পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলস যথাক্রমে ১৯১৭ এবং ১৯২৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। 'ইলিংস মেন'স সিঙ্গলস ও ডবলস চ্যাম্পিয়ানস' খেলার সূচনা হয়েছে যথাক্রমে ১৮৭৭ এবং ১৮৭৯ সাল থেকে। প্রথম কয়েক বছর ইংরেজ টেনিস খেলোয়াড়দেরই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল কিন্তু পরে পৃথিবীর সকল দেশের টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য এই প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত হয়। মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলসের খেলা যথাক্রমে ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালে প্রথম আরম্ভ হয়।

ডেভিস কাপ ঃ

লন টেনিস জগতে 'ডেভিস্ কাপ'এর নাম সারা পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় Hon. Dwight Filley Davis তাঁর নামে এই 'ডেভিস কাপ' দান করেন। ইউ এস সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতি-যোগিতায় ডেভিস দু'বার রাণার্স আপ্ হয়েছিলেন এবং এইচ ওয়ার্ডের জুটিতে তিনবার ডবলস বিজয়ী হন। ১৯২০ সালে তিনি ইউ এস ক্যাবিনটে যুদ্ধের সেক্রেটারী হন। ১৯২৯ সালে ফিলিপাইনের গভর্ণরের পদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে ৬৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। প্রথম কয়েক বছর ইংলণ্ড এবং আমেরিকা, মাত্র এই দুটি দেশের খেলোয়াড়রা 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ক্রমশঃ যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৮ সালে ৩৪টি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। গড়পড়তায় প্রতি বারে ২৫টি দেশ আন্তর্জাতিক 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৫-১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪০-১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। আমেরিকা ১৯০৪, ১৯১২ এবং ১৯১৯ সালে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম বছর, ১৯০০ সালে আমেরিকা ৫-০ গেমে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে

পরাজিত করে। এ পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে আমেরিকা ১৩ বার, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—৫ বার, গ্রেট বৃটেন—৪ বার, অষ্ট্রেলিয়া—৭ বার, ফ্রান্স—৬বার। পর্য্যায়ক্রমে ডেভিস কাপ পেয়েছে সব থেকে বেশী আমেরিকা ৭ (১৯২০—১৯২৬), তারপর ফ্রান্স—৬ (১৯২৭—১৯৩২), অষ্ট্রেলিয়া—৫ (১৯০৭—১৯১১), গ্রেট বৃটেন—৪ (১৯৩৩—১৯৩৬), বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—৪ (১৯০৩—১৯০৬)।

হুইটম্যান কাপ ঃ

পুরুষদের আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা বলতে যেমন 'ডেভিস কাপ' তেমনি মেয়েদের 'হুইটম্যান কাপ'। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব ন্যাশনাল সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মিসেস লাজেস চেটচিক্‌স হুইটম্যান এই মনোরম কাপটি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের বাৎসরিক টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দান করেন।

শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় ঃ

মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে মিসেস হেলেন উইলস মুডী পৃথিবীর টেনিস মহলে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে শীর্ষ স্থান অধিকার করে থাকবেন। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন টেনিস খেলায় যোগদান করে তিনি যে রেকর্ড করে গেছেন তা অতিক্রম করা খুব সহজ নয়।

পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকারী ডোনাল্ড বাজের নাম টেনিস জগত থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। বাজ টেনিস খেলায় যে সব রেকর্ড ক'রে গেছেন তা ভাঙতে অনেক দিন লাগবে। তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে ভাইন্সের সঙ্গে খেলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ, ফ্রেড পেরী, ভাইন্স অষ্টিন, কোসে, ব্রমউইচ, পুনসেক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ১৭৫ ও ১৮৪

ইংলণ্ড ঃ ৩১৭ (৭ উইঃ ডিক্লে) ও ৪৭ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে যথাক্রমে ১০ উইকেট এবং ৭ উইকেটে পরাজিত করে।

২৬শে জুলাই লিডসে ২০,০০০ হাজার দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়লাভ ক'রে খেলা আরম্ভ করে। খেলার সূচনা শুভ হ'ল না, দলের মাত্র এক রানে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম উইকেট পড়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের মোট ১৭৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। দলের উল্লেখযোগ্য রান করলেন বি মিচেল ৫৩ এবং ডি নোর্স ৫১। ইংলণ্ডের বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন বাটলার ও এডরিচ। বাটলার ২৮ ওভার বল ক'রে ১৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৩৪ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেলেন। এডরিচ পেলেন ৩টে উইকেট ১৭ ওভার বল করে ৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৪৬ রান দিয়ে। কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড প্রথম দিনের খেলার শেষে প্রথম ইনিংসে ৫৩ রান ক'রে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড সারা দিনব্যাপী ব্যাট ক'রে ঐ দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ৩১৭ রান তুলে। এল হাটন ১০০, সি ওয়াসব্রুক ৭৫ এবং ডবলউ এডরিচ ৪৩ রান ক'বে আউট হ'ন।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলণ্ড আর ব্যাট না ক'রে প্রথম ইনিংসের উইকেটে ৩১৭ রানের উপরে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের থেকে ১৪২ রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। এবারও খেলার সূচনা ভাল হ'ল না। দলের ৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ল। দ্বিতীয় উইকেট পড়ল ১৬ রানে। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা অনেকখানি আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় স্কোর বোর্ডে দেখা যায় ৩ উইকেটে তাদের ১০৩ রান উঠেছে। ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটন মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরের বল এক হাত দিয়ে চমৎকার লুফে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক এ মেলভীলীকে আউট করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৪ রানে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ করলেন ডি নোর্স ৫৭। ১৪০ মিনিট খেলে ৮টা বাউণ্ডারী ক'রে তিনি মোট রান তুলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে দ্বিতীয় ইনিংসে এই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইংলণ্ডের বোলার বাটলার এবং ক্র্যানষ্টোনের বোলিং সাফল্যের জন্য।

ক্র্যানষ্টোন দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ চারটে উইকেট পেয়েছিলেন ৬টা বল ক'রে কোন রান না দিয়ে। তিনি সর্ব্বসমেত ৭ ওভার বল ক'রে ৩টে মেডেন পান এবং বিপক্ষকে মাত্র ১২টা রান করতে দেন। বাটলার ২৪ ওভার বল ক'রে মেডেন পান ৯টা আর ৩২ রান দিয়ে উইকেট পান ৩টে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন ২৬টা বল ক'রে মাত্র ১২ রান দিয়ে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৩ রান তোলার জন্য ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ৪০ মিনিট খেলার পর কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড ৪৭ রান তুলে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ১০ উইকেটে জিতে যায়।

পৃথিবীর ক্রিকেট রেকর্ড ঃ

১৯০৬ সালে ইংলণ্ড এবং সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (Tom Hayward) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৬১ ইনিংসে ৩,৫১৮ রানের পৃথিবীব্যাপী রেকর্ড দীর্ঘ ৪১ বৎসর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যে ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল আজ ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় বিল এডরিচ তা অতিক্রম ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছেন বলে সকলেই আশা করছেন। এ বছরের ক্রিকেট মরসুমে এডরিচ ২৬ ইনিংসের খেলায় ইতিমধ্যে ২,৩১৫ রান তুলে ফেলেছেন। বাকি ১,২০৪ রান তুলে নতুন রেকর্ড করতে তাঁর হাতে এখনও প্রায় ৫।৬ সপ্তাহ রয়েছে। পৃথিবীর ক্রিকেট মহল উদগ্রীব হয়ে তাঁর খেলার দিকে চেয়ে আছে।

জো লুই ঃ

পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা জো লুইকে হারিয়ে কেউ আর পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপের সম্মান তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারছেন না। নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে জো লুইকে বহু মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গেই লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত অপরাজিত হয়ে আছেন। নিজ সম্মান রক্ষার জন্য তিনি আর কতদিন এই ভাবে লড়াই করবেন তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে গলফ ক্রীড়ারত জো লুই খুব তাড়াতাড়িই উত্তর দেন 'Just three more fights and then I quit in 1948 if I am still undefeated.

পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ঃ

মস্কো রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, রাশিয়ার 'Strong man' Grigori Novak পৃথিবীর ভারোত্তলন ইতিহাসে আর একটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি দীর্ঘাকৃতি ভারোত্তলন বীর ৩০৬ পাউণ্ড ১০ আউন্স দু'হাতে মিলিটারী প্রেসে উত্তোলন ক'রে পৃথিবীর পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

*   *   *   *

আমারিকার Cynthia Thompson জর্জ্জটাউনে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলায় মহিলাদের ১০০ গজ দৌড় ১০.৮ মিনিটে শেষ করে ১৯৪৪ সালে হলাণ্ডের F. C. Blankers koen কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ডের সঙ্গে সমান ক'রেছেন।

বৃটিশ রেকর্ড ঃ

গ্লাসগো রেঞ্জার্স বার্ষিক স্পোর্টসে এ্যালেন প্যাটারসন (বৃটেন) এবং ভিসি (আমেরিকা) উভয়েই ৬ ফিট ৭½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে আধ ইঞ্চির ব্যবধানে পূর্ব্বের 'বৃটিশ হাইজাম্প' রেকর্ড ভেঙ্গেছেন।

*   *   *   *

উইমেনস এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় মিস এম লুকাস ১১৯ ফিট ৯ ইঞ্চি দূরত্বে 'ডিসকাস থ্রো' ক'রে গত বৎসরে প্রতিষ্ঠিত নিজের ১১৭ ফিট ৫ ইঞ্চির বৃটিশ মহিলা রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

*   *   *   *

হার্ডল রেসে ২০ মিটার দূরত্ব মিস এস গার্ডনার ১১৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "টিকটিকি ও চড়াই"—২৲
শ্রীঅশোককুমার মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "সবই যখন অন্ধকার"—১৲
শ্রীরাজমোহন নাথ-সম্পাদিত "সোণাধনের গীত"—৮০
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা অনূদিত "গীতা-বোধ"—১৲
শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীশ্রীশনি-পূজা ও কথা"—৵১০
অনিলচন্দ্র রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অনুপমাদি"—১॥০
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রণীত "বৃটীশ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিল কেন ?"—i০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আর. এইচ. শ্রীমানী ... ২০৭২ বর্ষ

এভারেস্ট ফিল্মস্ লিমিটেডের
'ঝড়ের পর' বাণীচিত্র হইতে

হেমন্ত মুখার্জি

যে রয় হিয়ার মাঝে
হে বিজয়ী বীর } GE 7083

বিমলভূষণ

বহু যুগের ওপার হ'তে
আজি ঝড়ের রাতে তোমার } GE 7084

আনন্দ সেন মুখার্জি

তোমারে স্মরিয়া আজো
মোর স্বপনের গগনে } GF 7085 আধুনিক

কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ

আজো তো আমার
নাই বা রইলে কাছে } GE 7086 আধুনিক

শ্রীমতী ঝর্ণা দেবী

মিলনের ফুলহার
কাছে এসে হায় } GE 7087 আধুনিক

ক্ষিতীশ বসু এবং সম্প্রদায়

বাৎসরিক শ্রাদ্ধ
১ম ও ২য় খণ্ড } GE 7088 রঙ্গ-গীতি

☆

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিঃ
দমদম - বোম্বাই - মাদ্রাজ
দিল্লী - লাহোর

CVK 28

স্বাদ ভালো হলে সবই ভালো!

হাড় সুগঠিত করতে এবং শরীরকে শক্তিশালী করে তুলতে যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার শতকরা ৯৫ ভাগই আপনি বোর্নভিটাতে পাবেন। তা' ছাড়া বোর্নভিটা অতি সুস্বাদু এবং পরিপাকের সহায়ক। সহজে হজম হয়, তাই বিশেষ ক'রে গর্ভাবস্থায় ও রোগভোগের পর এ খুব উপকারী।

যদি ঠিকমতো না পান তবে আমাদের লিখুন:

ক্যাডবেরি-ফ্রাই (এক্সপোর্ট) লিঃ; (ডিপার্টমেন্ট—) পোস্ট বক্স ১৪১৭ - বোম্বাই

বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তী-বাহী

মোহিনী মিল্‌স্ লিমিটেড্

(স্থাপিত—১৯০৮)

১ নং মিল | ২ নং মিল
কুষ্টিয়া, (নদীয়া) বেলঘরিয়া (২৪পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্ট্‌স
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়াবাজার, নদীয়া

গ্রাম : খেলাঘর | ফোন : বি, বি, ৫০

ফুটবল (ব্লাডার সহ)

	৫নং	৪নং	৩নং
ডিউরেক্স "T"	২২॥০	২০	
আর, এ, এফ, "	১৭॥০	১৫	১৩॥
ইমপ্রুভেন্ট "	১৬	১৪	১২
ঐ মধ্যম "	১৪	১২	১০
ঐ সস্তা "	১২	১০	৮
অল ইণ্ডিয়া "	১৪॥০	১২॥০	১০॥০
আর্মি ম্যাচ (মেগ্রিগর)	১৬	১৪	১২
লিগ উইনার	১৩	১১	৯
চ্যালেঞ্জ	১২	১০॥০	৮

প্রত্যেক বলের সঙ্গে একখানা ফুটবলখেলার নিয়মাবলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পাম্প ছোট ২, মাঝারী ৩॥০, বড় ৪॥০। স্বতন্ত্র ব্লাডার ৫নং ২, ৪নং ১৮/০, ৩নং ১৮০। ফুটবল বুট ১২॥০ ও ১০॥০।

ফুটবল—লীগ শীল্ড খেলার ইতিহাস—মূল্য ১

ঘোষ এণ্ড কোং
৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

"গিনি হাউস"

গিনি সোনার গহনার
—একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—
সুনিপুন গঠন ও আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইনের স্রষ্টা

ভারতের অন্যতম অলঙ্কার নির্ম্মাতা।

১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৫৫ কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৯০ | গ্রাম : "গিনিহোস"

আমাদের কোথাও ব্রাঞ্চ নাই

it to all my friends.
Oatine
SNOW for DAY

HIND
On the day of Independence
GREETINGS

THE COW IN INDIA

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৫৪

লেখ-সূচী

চিত্র সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র

লেখ-সূচী

শশধর দত্তের উপন্যাস—**দেহের ক্ষুধা**—৩৲

শশধর দত্তের

রক্তাক্ত ধরণী	৩৲
সব্যসাচীর প্রত্যাবর্ত্তন	৩৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী	২৷৷০
আগুন ও মেয়ে	২৷৷০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

সাধের প্রদীপ	২৷৷০
নীড় ও বিহঙ্গ	২৷৷০
পূজার ধরণী	২৷৷০
ঢেউয়ের দোলা	২৷৷০
মাটির মায়া	২৲
দীপের আলো	২৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

রাহুগ্রস্ত শশী	২৷৷০
নব নায়িকা	২৷৷০
অনেক দূরে	১৲

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের

হাওয়া বদল	২৲

পূর্ণশশী দেবীর

অভিশপ্তা	১৷৷০

আশালতা সিংহের

সহরের মোহ	২৲

শৈলবালা ঘোষজায়ার

বিনির্ণয়	২৲
অরু	২৲
গঙ্গাপুত্র	২৲
অভিশপ্ত সাধনা	৩৷৷০
রঙীন ফানুস	৩৲
শিপ্রা ২৷৷০ অবাক	২৲

যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের

সাধের কাজল	২৷৷০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেউলিয়ার জমা খরচ	২৲
বিয়ের ফুল (২য় সং)	২৲
স্রোতের ফুল (২য় সং)	২৷৷০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবনের জটিলতা	২৲
ধরাবাঁধা জীবন	১৷৷০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরিচিতা	৩৲
মুক্তি-মণ্ডপ	[illegible]

পশুপতি ভট্টাচার্য্যের

পতিতা ধরিত্রী	[illegible]

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি	১৲
বাবুম-বুবুম	১৲
আমার ভূত দেখা	১৲

নবকথা সিরিজ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অদ্ভুত ধরণের এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

১। [illegible]মনর্থম
২। আরামবাগ
৩। ইরাবলী
৪। ঈপ্সা
৫। নীলকণ্ঠ
৬। উর্ণী
৭। ঋষি-মশাই
৮। "১"কার

চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ। অভিনব রচনাকৌশল। অভিনব নূতনতর ঘটনার সমাবেশ।

প্রত্যেক উপন্যাস—মূল্য ২৲ টাকা

রহস্যরোমাঞ্চ য়্যাডভেঞ্চার সিরিজ

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস।

প্রত্যেক উপন্যাসের মূল্য ১৲ টাকা

১। মৃত্যুচক্র
২। রক্ত-পিপাসা
৩। রহস্য-বিভীষিকা
৪। গুপ্ত-চক্রান্ত
৫। শয়তান-সঙ্গিনী
৬। রোজার ঘাড়ে বোঝা
৭। মৃত্যু-প্রহেলিকা
৮। মরণের মায়াজাল
৯। শত্রু-সংঘর্ষ
১০। মৃত্যু-ষড়যন্ত্র
১১। খুনের-জের
১২। রক্ত-তাণ্ডব
১৩। মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী
১৪। পিশাচব্যাধের জাল
১৫। চীনাদস্যুর [illegible]
১৬। জীবন্ত-কঙ্কাল
১৭। পরীর পাহাড়
১৮। দস্যু-মায়াবী
১৯। খুনের নেশা
২০। রক্ত-লোলুপ
২১। মৃত্যুরণ
২২। নীল সাগরে রক্ত-লীলা
২৩। ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্ত
২৪। ফিক্‌কথ্‌ কলম
২৫। মৃতের প্রতিশোধ
২৬। মরণজয়ী
২৭। খুন ডাকাতি গুম
২৮। পিশাচিনী
২৯। দস্যুরাজ

স্নানযাত্রা

পৃথিবীর কোনো দেশের লোক বোধহয় আমাদের মতো স্নানপ্রিয় নয়। কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট
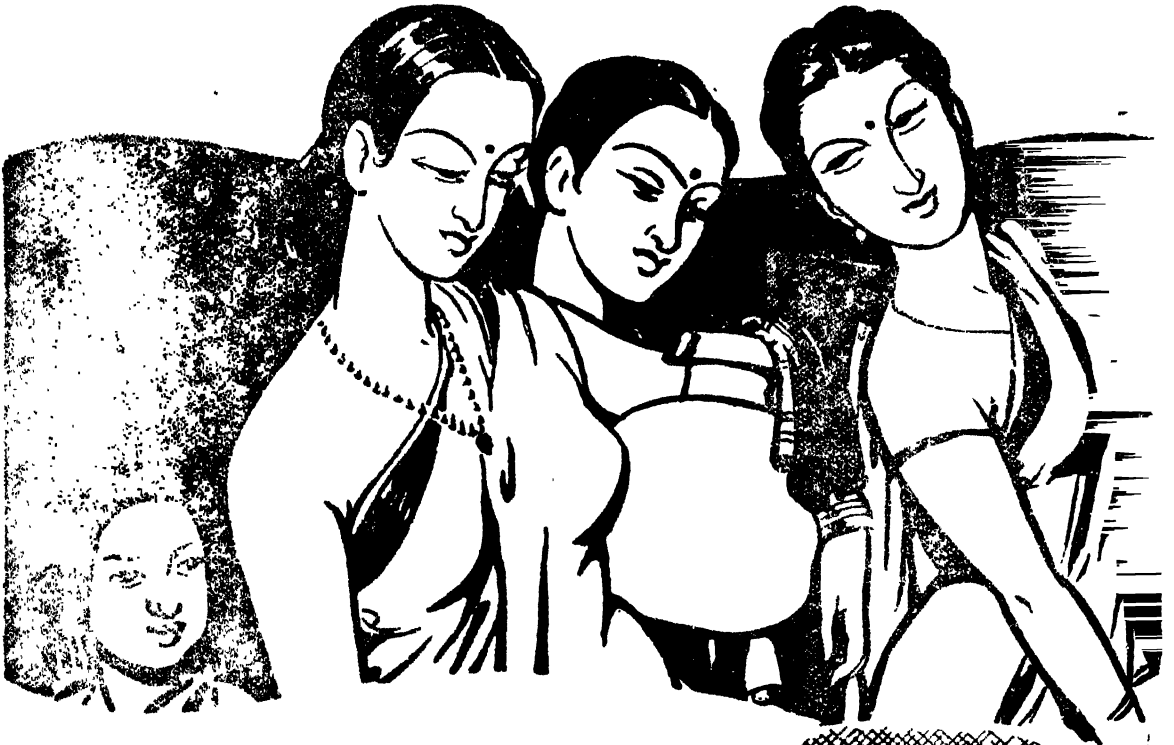
একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও একদিন সুষ্ঠুভাবে স্নান করতে না পারলে সেদিন আমাদের মন অতৃপ্তিতে ভরে থাকে। স্নানের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। এত গুণের তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।

সোল সেলিং এজেন্টস :

SRK 5

সোল সেলিং এজেন্ট— ওরিএন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিঃ, ৬৬ এ & বি, প্রতাপাদিত্য রোড

ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নিষ্ফল

জানাইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

নারীর— স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমে ও অন্যান্য জটিল উপসর্গে ফ্রা মে পিলস একমাত্র নির্দ্দোষ স্পেশাল মহৌষধ মূল্য ৩॥০। আমকালীনবার স্ত্রী-পুরুষের আবশ্যকীয় সমস্ত ঔষধ আমার কাছে পাওয়া যায় ইহা সম্বন্ধে সন ১৩৪০ হইতে ১৩৫২ পর্য্যন্ত "ভারতবর্ষ" "বসুমতী" "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকার আমার বড় বিজ্ঞাপন দেখিবেন। বহু কারণে বড় বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ আছে। বিনামূল্যে তালিকা পাঠান হয়।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhaduri** (sexologist)
Zaimandi, Muttra, U. P.

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পৃথিবী বিখ্যাত ওলার হ্রদের
খাঁটী

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান এবং যাবতীয় চক্ষুরোগের স্বভাবজ মহৌষধ। ড্রাম শিশি ২৲। ৩ শিশি ৫॥০। ৬ শিশি ১১৲। ডাকমাশুল পৃথক। ডজন ২২৲ টাকা, মাশুল ফ্রি।

ডি, পি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৬-এ-৩৪, শিবপুর রোড, শিবপুর হাওড়া (বেঙ্গল)

নাগরী প্রচারিণী সভা
হিন্দীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করছেন
যুদ্ধোত্তর দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীদেবেশ দাশ আই-সি-এস'এর

ইয়োরোপা

"ইয়োরোপ দর্শন সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু 'ইয়োরোপা' প'ড়ে মনে হয়েছে মনশ্চক্ষে দেখেছি"— **পরশুরাম (প্রবাসী)**

"An outstanding contribution to Bengali literature—
HINDUSTHAN STANDARD.

"শ্রেষ্ঠ রস সৃষ্টি পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছে"—যুগান্তর দাম—তিন টাকা

প্রকাশক:—**বিশ্বভারতী**—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৬০খানি চিত্রযুক্ত যৌন-বিজ্ঞানের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

এলো যবে যৌবন

কম বয়সের ছেলেমেয়েদের এ বই বিক্রয় হয় না।

দাম্পত্য-জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সমস্যার সমাধান, আধুনিক মতবাদ, স্ত্রী-ব্যাধির প্রতিকার, যৌবনে জানবার সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, জীবনকে দীর্ঘ ও সুখী করবার কৌশল প্রভৃতি তথ্যে ভরা। বিজ্ঞাপনে সব লেখা চলে না। দাম ২॥০

রতিশাস্ত্র নরনারীর সৃষ্টিতত্ত্ব, লক্ষণ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু তথ্যপূর্ণ—ফটোশোভিত। দাম ১৷৹

স্বামী-স্ত্রী—২।০

স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ এই গ্রন্থ নববধূকে দিন. অদূর ভবিষ্যতে সে হবে মা—মাতার শিক্ষায় আদর্শে সন্তান হবে মানুষ। তাই শিশুশিক্ষা, শিশুপালন, স্বামিসেবা, ভালবাসা, ধাত্রীবিদ্যা, হিসাব, রন্ধন, কারুকার্য্য, গীতবাদ্য প্রভৃতি শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ উপহার দিয়ে আদর্শ সংসার গড়ে তুলুন।

গুপ্তগ্রহ—যুবক-যুবতীর একান্ত পাঠ্য গ্রন্থ—২।০

১০৯খানি বিস্ময়কর চিত্র সম্বলিত

যৌবন পথে

যৌন বিজ্ঞান মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লইয়া ১৮শ সংস্করণ। নরনারীর সকল সমস্যা, তথ্য ও আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ। বিবাহের আগে ও পরে এই বই পড়া একান্ত প্রয়োজন। ছবির এলবাম সহ। দাম ৭॥০

আশায় বাঁধে ঘর নব প্রকাশিত উপন্যাস। জীবনে এল ঝড়—নারীর আশায় বাঁধা ঘর ভেঙ্গে পড়ল...তাকে নামতে হ'ল পথে। সংসারের আবর্ত্তের মাঝে নিজের সত্তা বজায় রেখে কেমন ক'রে সে বাঁচল তারই আনন্দ-অশ্রু-উজ্জ্বল কাহিনী আবেগতপ্ত ভাষায় পেয়েছে রূপ। দাম—১৷৹

মায়ার বাঁধন বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাত সমন্বয়ে শাণিত ভাষায়, বলিষ্ঠ ভাবধারায় আর নূতন দৃষ্টিভংগীতে লেখা ১৷৹

শতজীবনী অতীতে ফেলে আসা সাধু-মহাপুরুষ ও আদর্শ ব্যক্তির ১০৮টি জীবনী পড়ে ধন্য হোন। ফটো যুক্ত দুই খণ্ড—২৷৹

সৌখীন পাকপ্রণালী (১৬শ সংস্করণ) চপ, কাটলেট থেকে নিরামিষ ও মাছ-মাংস ডিমের সব রান্না, সব মিষ্টান্ন প্রভৃতি ৫০০ রকমের মুখরোচক রান্নার বই। দাম—২৲

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ (সামাজিক নাটক) ১॥০

নবপ্রকাশিত বুককাঁপান দু' রঙা ছাপা রহস্যপূর্ণ ডিটেকটিভ—
রহস্য...রোমাঞ্চপূর্ণ...নিঃশ্বাস চেপে পড়তে হবে। প্রত্যেকটি পৃথক গল্প।

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল—১।০ **কাঠের ড্রাগন**—১।০
মুখোস যখন খুলে গেল—১।০ **সীমান্তের বন্ধু**—১।০
বজ্র ভৈরবের মন্ত্র—১।০ **হত্যা যাদের নেশা**—১।০

উপন্যাস, গল্প, রোমাঞ্চ, শিশু-সাহিত্য, উপহার গ্রন্থ প্রভৃতি সব বই ভবানীপুরের দোকানে প্রচুর আছে

সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স
১২৭ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬: ফোন ৮৫৩ বি,বি,

বঙ্গদর্শন

শ্রীঔষধালয় লিমিটেড
শ্রী
প্রতিষ্ঠানের ঔষধগুলি শাস্ত্রনির্দিষ্ট মাত্রায় ও প্রথায় অভিজ্ঞ রাসায়নিক ও ভেষজবিশারদ-গণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ায় সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য
সর্ব্বরোগে মকরধ্বজ
যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে সারিবাদ্যরিষ্ট
সর্দ্দি কাসি ইত্যাদিতে চ্যবনপ্রাশ
শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং যাবতীয় স্ত্রীরোগে অশোকারিষ্ট
যাবতীয় ক্ষয়রোগে দ্রাক্ষারিষ্ট সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার্য্য টনিক
মূল্যতালিকা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্যে লিখুন—
৪৩৮ • রসা রোড (সাউথ) টালিগঞ্জ • কালিকাতা

অনুপমা কেমিক্যাল : কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

যাঁরা এতে লিখেছেন তাঁদের কয়েকজন—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত
শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীঅশোক শাস্ত্রী
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
শ্রীসুকুমার দে সরকার
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বনফুল
মিঃ ওয়াজেদ আলি
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
শ্রীবিমল ঘোষ
যাদুকর ভাদুড়ী
শ্রীশৈলেন নল্লিক

কাগজের নৌকা

এতে আছে ছেলেমেয়েরা যা চায় সব। কিছু ই—রকমারি গল্প, কবিতা, ছড়া, নক্সা, প্রবন্ধ, ম্যাজিক ইত্যাদি। **এর প্রধান আকর্ষণ ছোটদের উপযোগী দুটি বড় রোমাঞ্চকর ও স্বাদেশিকতাপূর্ণ উপন্যাস।** তা' ছাড়া **তিন রঙে ছাপা দেশের বরেণ্য নেতাদের ছবি।** এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই পুজোর বাজারে এ পর্য্যন্ত বের হয়নি। দেখলেই পড়তে ইচ্ছা করবে।

সম্পাদনা। শ্রীসুধীন্দ্র মৈত্র

— পূজার আনন্দে উপহার —

শরতের ফুল (অপূর্ব্ব গল্পসম্ভার) ২॥০

ইউনিভার্সাল বুক সিণ্ডিকেট,—২, কলেজ স্কোয়ার, কালিকাতা

ভারত বিখ্যাত রাজবৈদ্য
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম. এ. আবিষ্কৃত

সর্ব্বপ্রকার জ্বর, রক্তদুষ্টি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডু, কামলা, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও যকৃতের দোষ অজীর্ণ, পিত্তশূল ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বহু-রোগনাশক মহৌষধ।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য পুস্তিকা চাহিয়া পাঠান।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন
১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন: বি. বি. ৪০৩৯

দ্রাক্ষারিষ্ট

নানি কাশ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও ক্ষয়জনিত যে কোন রোগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

অশোকারিষ্ট

জটিল স্ত্রীরোগের শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। প্রত্যেকটীর মূল্য ২॥০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ক্রয় করিবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

রামনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন
১১২নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা—৬

(সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক)

প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী ব্যাখ্যাত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

১০ম স্কন্ধের ২৯ খণ্ড

(রাসলীলার পরবর্ত্তী ৩৪শ অধ্যায় হইতে)

এইমাত্র প্রকাশিত হইল। গ্রাহক মহোদয়গণ সত্বর হউন, ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ, শ্রীধরটীকা, ১০মে অতিরিক্ত বৈষ্ণবতোষণীটীকা ও শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী নামে বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা আছে। বর্ত্তমানে অদ্বৈতবংশাবতংশ প্রভুপাদ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী মহাশয় ৩৪শ অধ্যায় হইতে ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১—৯ম স্কন্ধ ও ১১-১২শ স্কন্ধ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ১০ম স্কন্ধের ২৯শ খণ্ড বাহির হইয়াছে। আর কয়েক খণ্ড হইলেই ১০ম স্কন্ধ সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য প্রতি খণ্ড গ্রাহক পক্ষে ১।০, সাধারণ পক্ষে ১৷৷০। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল, অন্বয়, অনুবাদ, শ্রীধর টীকা ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সহ অতি উপাদেয় গ্রন্থ। পড়িলেই মুগ্ধ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সকল তত্ত্বই ইহাতে বুঝান আছে। মূল্য ৩৷৷০।

পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত

চণ্ডীর ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ। বড় অক্ষরে মূল, টীকা, অনুবাদ, অর্গল, কীলক, চণ্ডীপূজা, রাত্রিসূক্ত, দেবীসূক্ত, শাপোদ্ধার প্রভৃতি বহু অতিরিক্ত বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ছাপা কাগজ চমৎকার, সুন্দর প্রচ্ছদপট মূল্য—২৲

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেদের রোমাঞ্চকর ডিটেক্টিভ উপন্যাস।

খেলোয়াড়

এইমাত্র বাহির হইল। শোভন প্রচ্ছদপট মূল্য—১।০

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাসের

কলিকাতায় শান্তিস্থাপনে গান্ধিজী

মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্ম-বহুল ও ঘটনাবহুল জীবনের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়ের সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত বিবরণ।

বহু ফটো চিত্র শোভিত মূল্য—২৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—হরিহর লাইব্রেরী

২৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবী প্রণীত

ভারত মুক্তি সাধক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ও

অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা

ভারতের ও বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনাদর্শের সুনিপুণ বিশ্লেষণ। প্রবাসীর আকারে ৩০০ পৃষ্ঠারও অধিক লেখা, ভারত নেতাদের বহু পুনর্মুদ্রিত [illegible]। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা ভারতের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি যাবতীয় আন্দো[লনের] প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুস্তকখানি অপরি[হার্য]।

বোর্ড ও কাপড়ে [illegible] বাঁধাই মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীশান্তা দেবীর নিকট [illegible], রাজা [illegible] রোড কলিকাতা— এবং মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমস্ত পুস্তকালয়।

উপরোক্ত ঠিকানায় পাইবেন শ্রীশান্তা দেবীর

১। অলখ ঝোরা। (বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) মূল্য

২। দুহিতা। উপন্যাস।

৩। সিঁথির সিঁদুর (তৃতীয় সংস্করণ) ১

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীসীতা দেবীর

১। ক্ষণিকের অতিথি (উপন্যাস) ২

শান্তা দেবী ও সীতা দেবী প্রণীত

সচিত্র সাত রাজার ধন (ছেলেদের গল্প) ১।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডি-লিট্ প্রণীত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

সদ্যপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড। মূল্য ৫৲ টাকা

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (২য় খণ্ড) ৫৲

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১ম খণ্ড) ৫৲

পরিবর্দ্ধিত ও আমূল পরিমার্জ্জিত হইয়া ১ম খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ মহালয়ার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে

প্রথম সংস্করণ পাঁচ মাসেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল।

নবেন্দু ঘোষের

পোস্ট-মর্টেম

'ডাক দিয়ে যাই'-এর লেখকের রসোত্তীর্ণ অধুনাতন গল্পগ্রন্থ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর' ইত্যাদি সাময়িক পত্রে উচ্চপ্রশংসিত। একটাকা বারো আনা।

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ১০৯২, লেক রোড, কলিকাতা ২

লিপটন
বললেই
ইয়েলো
চা
JAKOOJA BRAND
FINEST DUST TEA
LIPTON'S
FINEST DUST TEA
PACKED BY LIPTON
JAKOOJA
LTK-132J

রেডিয়ম
নারিকেল তৈল
গভর্ণমেণ্ট টেস্ট হাউসের পরীক্ষার বিবরণ—
"ইহা সুবাসিত
বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল"
সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট
গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউস
RADIUM
COCOANUT

উচ্চপ্রশংসিত নাটকসমূহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

সাজাহান ২৲, চন্দ্রগুপ্ত ১৷৷০,
রাণাপ্রতাপ ১৷৷০, দুর্গাদাস ২৲,
বঙ্গনারী ১৲, সিংহল-বিজয় ১৷৷০,
মেবার পতন ১৷৷০, পুনর্জ্জন্ম ৷৷০,
পরপারে ২৲, সোরাব-রুস্তম ৷৷০

গিরিশচন্দ্র ঘোষের

প্রফুল্ল ১৷৷০, বিল্বমঙ্গলঠাকুর ১৷৷০,
শঙ্করাচার্য্য ১৲, নল-দময়ন্তী ১৷৷০,
আলাদিন ৷০, দক্ষযজ্ঞ ১৲

অমৃতলাল বসুর

খাস দখল ১৲, বন্দে মাতরম্ ৷৵০,
বিজয়-বসন্ত১৲,ব্যাপিকা বিদায় ৸০

অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

মা ২৲, মন্ত্রশক্তি ২৲, পোষ্যপুত্র ২৲

যামিনীমোহন করের

মিটমাট ৸০, বক-ধার্ম্মিক ১৲,
প্রহেলিকা ৸০, বন্ধুর বিয়ে ৷০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

আলমগীর ২৲, আলিবাবা ৷৷০,
ভীষ্ম ১৷০, চাঁদবিবি১৲, পদ্মিনী ১৷০,
আহেরিয়া ১৲

মনোমোহন রায়ের—রিজিয়া ১৷৷০

নূতন নাটক প্রকাশিত হইল

বিরাজ-বৌ ২৷০

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস "বিরাজ-বৌ"এর নাট্যরূপ প্রকাশিত হইল। রূপদান করিয়াছেন জনপ্রিয় কথাশিল্পী কানাই বসু। সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনায় নূতন করিয়া লেখা নবতম নাটক। নাটকখানির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে মূল উপন্যাসের সুরটি অক্ষুণ্ণ আছে। পাঠ করিলে শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠেরই আনন্দ পাওয়া যায় এই নাটকখানিতে। নাটকীয় চরিত্রের স্ফুরণে, নাট্য পরিস্থিতির সৃজনে ও সংলাপে ইহা একখানি অনবদ্য নাটক। সৌখীন সমাজে অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে অন্যান্য নাটক

রামের সুমতি ১৷৷০, কাশীনাথ ২৲,
বিন্দুর ছেলে ১৷৷০, বিজয়া ১৷৷০,
ষোড়শী ১৷৷০, রমা ১৷৷০,
অনুপমার প্রেম ১৷৷০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—কালিন্দী ১৷৷০

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বেজায় রগড় ৷০, গুরুঠাকুর ৷০,
ভূতের বিয়ে ৷০, দুর্গা-শ্রীকৃষ্ণ ১

সিরাজদ্দৌলা ১৸০, ধাত্রীপান্না ১৷৷০,
ভারতবর্ষ ১৷০, তটিনীর বিচার ১.০,
রাষ্ট্র-বিপ্লব ১৷৷০, মাটির মায়া ১৷৷০,
হর-পার্ব্বতী ১০, নাগের হোম ১৷০,
সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১০

রবীন্দ্রনাথ রায়ের

বভ্রুবাহন ১৲, বিষ্ণুমায়া ১৲,
মোগল-মসনদ ১৲

রমেশ গোস্বামীর—বিদ্যাপতি ১৷০,
কেদাররায়২৲, বিদ্রোহীবাঙ্গালী১৲

সৎপ্রাপ্ত বক্সীর

ভোলা মাষ্টার ১৷৷০, খুনী ১৷৷০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের

মানময়ী গার্লস্ স্কুল ১৲

নিশিকান্ত বসু রায়ের

বঙ্গেবর্গী ১৷৷০, দেবলাদেবী ১৷৷০,
পথের শেষে ১৷৷০

মনোমোহন গোস্বামীর

পৃথ্বীরাজ ১৲, সমাজ ১৲,
বিধির বিধান ১৷০

বটকৃষ্ণ রায়ের

পাকচক্র ৷৷০, পঞ্চমাঙ্ক ৷৷০,

আশ্বিন—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

(১)

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। মুসলমান দেশ শাসন করিতেছিল। সেদিন তাহারা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচিত, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের দুর্বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ ভীষণতম অত্যাচারে দেশে নোয়াখালির সৃষ্টি করিত না বটে, কিন্তু অত্যাচার ছিল। দেশে তৃতীয় পক্ষ বলিতে কেহ ছিল না। তথাপি দেশ যেন একটা অনবচ্ছিন্ন রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্য দিয়াই পথ চলিতেছিল। বাঙ্গালার লোভনীয় সম্পদ দেশ বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই রাজপদও নিরাপদ ছিল না। এমন কি গৌড়ের স্বর্ণ-সিংহাসনের মাণিক্যদ্যুতি, রাজভৃত্য—পুর-রক্ষক হাবসিগণকেও উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজাবরোধের শুদ্ধান্তঃকক্ষে রাজমুণ্ড লইয়া তাহারা যেন গেণ্ডুয়া খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিল। ইহার বিষাক্ত প্রভাব রাজধানী হইতে দূরে বহু পল্লীর দুর্দিন দেহেও এক সংক্রামক বিষের সৃষ্টি করিয়াছিল। উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত রাজকর্মচারিগণ অধিকাংশই ছিল—কুশাসক, নিষ্ঠুর শোষক, দুর্নীতিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অলস, বিলাসী, ব্যভিচারী। ইহারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। সদাচার পালনে, চিরাচরিত ধর্ম্মাচরণেও ইহারা বাধা দিত। মন্দির লুণ্ঠন করিত, দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিত, গোপনে,ভজন ভাস্কর্য্যান্বিত দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই উপকরণে মসজিদ নির্ম্মাণ করিত। সুন্দরী যুবতী হিন্দু নারী শান্তিতে সংসার করিতে পারিত না। দেশের সর্ব্বত্র একটা আতঙ্ক, একটা অনিশ্চয়তা, একটা জড়াজড়িত বিকৃত ভাব। বিধর্ম্মী—প্রায় বহুলাংশে বর্ব্বর কুশাসকের দুঃশাসনশাসিত সে কালের বাঙ্গালার এক দিকের ইহাই সংক্ষিপ্ত চিত্র।

অন্যদিকে সমাজ দেহও সুস্থ ছিল না। সমাজের

শীর্ষস্থানীয়গণের মধ্যে এক পক্ষ,—পদস্থ রাজকর্মচারী-গণের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন পূর্ব্বক অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও ঘৃণ্য বিলাস ব্যসনে জীবন যাপনই মাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিত। অপর পক্ষ অপ-প্রয়োজিত অসহযোগের কূর্ম্মাবরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গ লুক্কায়িত রাখিয়া এক দুর্গন্ধ পঙ্কিল বদ্ধজলায় জাতির শেষ-শয্যা রচনা করিতেছিল। অর্থহীন আচারের কঙ্কালালিঙ্গনে দেহ ক্ষত-বিক্ষত, নাস্তিক্য-বুদ্ধি প্রণোদিত নীরস বিদ্যাচর্চ্চার মিথ্যা দম্ভে মস্তিষ্ক বায়ুগ্রস্ত, অথচ অসহনীয় পাণ্ডিত্যের অন্ত নাই। কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইলেও, তাহার নিম্নাবরণ যেমন অরক্ষিত, কোমল ও অনায়াসচ্ছেদ্য, সমাজের নিম্নস্তরের অবস্থা ঠিক তদনুরূপ ছিল। সমাজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ধমনী ছিল না। সমগ্র দেহে শোণিত সঞ্চালনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ দিন দিন শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল। শাসক ও সমাজ এই দুই দিকের নিপীড়নে এবং রাজজাতির লাভের তুচ্ছ প্রলোভনে সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী হয় নির্ব্বংশ হইতেছিল, অথবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছিল। এমনই দিনেই শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

বিটপচ্যুত পুষ্পরাশি কোন সুদক্ষ হস্তের সুনিপুণ গ্রন্থনে যেমন মনোহর মাল্যদামে রূপান্তরিত হয়, তেমনই বাহিরের দুর্দ্দান্ত সংঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সমাজ বন্ধনহীন, পথহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট বাঙ্গালা, মহাপ্রভুর প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইয়া একটা জাতিরূপে বিকাশলাভ করিল। সেন রাজত্ব অবসানের পর হইতে তিন শত বৎসরের পরাধীনতার প্লাবনে বাঙ্গালী জাতি হারাইয়াছিল। জাতির মোহ ছিল, কিন্তু জাতিত্বও ছিল না, জাতীয়তাও ছিল না। মহাপ্রভুর কণ্ঠোদ্গীত মানবতার উদাত্ত আহ্বান বাঙ্গালায় নবযুগ আনিয়া দিল। তাঁহার মানব দুঃখে বিগলিত অশ্রু ধারায় শতাব্দী সঞ্চিত জঞ্জালস্তূপ কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার প্রেম মন্ত্রে উজ্জীবিত জাতির জড়িমা কলুষ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার করুণা-রসায়ন বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত করিল। মহাপ্রভুর পদরেণুপবিত্র বাঙ্গালার শ্যামসমতলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। বাঙ্গালী বিস্ময়-নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিল—অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপ্রাকৃত প্রেম, অপার্থিব করুণা, অলৌকিক রূপ এক অপরূপ লাবণ্য-বল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সঙ্গে তাঁহার অভিন্ন হৃদয় সুযোগ্য সহযোগী অক্রোধ-পরমানন্দ প্রেমোদ্দাম শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া তাঁহাদের ঘেরিয়া দাঁড়াইল, রাজপুত্র ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ করিল, পণ্ডিতের বিদ্যাভিমান গেল, অমাত্যশালা রাজবল্লভ পথের ভিখারী হইল; অধম-পতিত-দুর্গত, চরিত্র-মহাত্ম্যে সর্ব্বজন-বন্দনীয় হইয়া উঠিল। ব্যক্তির সে কি আত্মোন্নতি, জাতির সে কি অভ্যুদয়। বিধর্ম্মী প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমাজের সে কি প্রভাব! শৈব শাক্ত সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম সংস্কারে অবহিত হইলেন। গ্রামে গ্রামে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বিষ্ণু মন্দির, শিব মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিষ্ঠাদি ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠানে সমাজের অধিনেতা স্বীকার ও জাতির সেবায় পরস্পর পরস্পরের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের অনুগতগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চরিত্রে ও সদাচারে নরনারীকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। মনুষ্যত্ব সমাদৃত হইল, সজ্জন মাত্রেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পূজা পাইতে লাগিল। সম্প্রদায়ে বৈদ্য প্রাধান্য থাকায় এবং কুল-ধর্ম্মানুসারে জীবিকার্জ্জনে গৌরববোধ জাগ্রত হওয়ায় বৈদ্যগণ ভবরোগের সঙ্গে দেহরোগ নিবারণেও মনোনিবেশ করিলেন। এক কথায় দেহে ও মনে বাঙ্গালা নূতনরূপে গড়িয়া উঠিল। অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হওয়ায় ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালা নিষ্কলুষ অন্তরে যুক্তকরে তাঁহার অন্তর দেবতার উদ্দেশে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে বন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিল—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালার জন্মগত। স্মরণাতীত কাল হইতে স্বাধীনতার সাধনায় বাঙ্গালী দুশ্চর তপস্যা করিয়া আসিতেছে। যাহারা বলে, সপ্তদশ তুরস্ক অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, তাহারা মিথ্যা কথা বলে। বাঙ্গালা জয় করিতে তুর্কীদের বহুদিন লাগিয়াছিল। সেন

ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে তাহারই কিয়দংশ সুবিকশিত হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে, গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূপাতিত করিয়াছে, তথাপি প্রহ্লাদ কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করে নাই। শত প্রলোভনে—এমন কি মৃত্যুভয়েও তাঁহার বিবেক বিচলিত হয় নাই। ইহা কবি-কল্পিত কাহিনী মাত্র নহে, জগতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ইহা সত্য। যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, হৃদয়ে ভগবানের অপ্রমেয় প্রেমের দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই আচরণ যে স্বতঃসিদ্ধ, ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে সেদিন আর একবার এই সত্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। পশুর অপেক্ষাও হিংস্র, ধর্মান্ধ পিশাচের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত হইয়া মৃতকল্প অবস্থাতেও তাঁহার অমৃতময়ী নিষ্ঠা জীবন্ত ও জলন্ত ছিল।

(২)

মহাপ্রভু তিরোহিত হইলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও একে একে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। সে ত্যাগ, সে তপস্যা, সে নিষ্ঠা, সে প্রেম আধারের অভাবে ধীরে ধীরে বিলীন হইতে লাগিল। সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিল। আবার সেই সিংহাসন-লাভের ষড়যন্ত্র, ক্ষমতাস্পৃহা, অর্থলোভ, বিলাস লালসা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, জাতির জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালার স্মৃতিভ্রংশ হইল। আকাশ জুড়িয়া দুর্যোগের ঘনঘটা, গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকার বাঙ্গালাকে আবৃত করিয়া ফেলিল। যে রণদুর্মদ জাতির অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয় বৈজয়ন্তী বাঙ্গালার সান্ধ্যগগনে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, নিশি দ্বিপ্রহরে তাহা অস্তাচলমূলে ঢলিয়া পড়িল। এক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বণিকজাতি রজনীর অন্ধকারে পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গালার রাজদণ্ড অপহরণ করিল। কয়েকজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, বিদেশী বিশ্বাসঘাতকের সহায় হইল। একদিন তুর্কী প্রথমে দিল্লী জয় করিয়া বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল, আজ বিদেশী, বিশ্বাসঘাতক বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীও জয় করিয়া লইল। বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকের দল সারা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াফেলিল।

এ জাতির আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের উন্নততর সাহিত্য ছিল, দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছি[illegible] সুশিক্ষিত সুনিয়ন্ত্রিত যোদ্ধৃদল এবং সুপ্রখর মারণাস্ত্র ছি[illegible] আর সেই সঙ্গে তথাকথিত সুসভ্য পরিচ্ছদে ইহা[illegible] বহিরাবরণ যেমন ছিল সুপরিচ্ছন্ন, অন্তরে ছিল তেম[illegible] সাধারণের দুরধিগম্য অপরিসীম ধূর্ত্ততা। সুদীর্ঘ সাত [illegible] বৎসরের চেষ্টায় মুসলমান যাহা করিতে পারে নাই, মা[illegible] শতাব্দীর শাসনেই ইহারা তাহাতে সফলকাম হইল। ইহা বাঙ্গালার তথা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে প্রা[illegible] অনায়াসেই জীর্ণ করিয়া তুলিল। কেমন করিয়া জানি ন[illegible] আমাদের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, উহারা সর্ব্বপ্রকারে উচ্চ এবং আমরা উহাদের তুলনায় সর্ব্ব বিষয়েই হীন আমরা আহারে বিহারে, পোষাকে আসাকে, চলনে বলনে সর্ব্বরকমে তাহাদের অনুকরণ করিতে লাগিলাম। এদিকে বণিকের কৌশলপূর্ণ শোষণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাঙ্গালা অধিকার করিল। অজ্ঞ জনসাধারণ ইহাই বিধিনির্দিষ্ট নিয়তি মনে করিয়া অকালে যমভবনে যাত্রা সুরু করিয়া দিল। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

তাহার পর কেমন করিয়া কি ঘটিল, সেকথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ, বাঙ্গালার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বাঙ্গালীর আন্দোলনে সারা ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ, সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য, অরবিন্দ, বৃটিশের অমানুষিক নির্য্যাতনে পরাধীনতার দাবদাহে, হৃদয়ের অসহনীয় জ্বালায় ভারতের পথপ্রদর্শক বাঙ্গালীর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ, ফাঁসি, নির্ব্বাসন, কারাবরণ, সুসভ্য বৃটিশের স্বরূপ প্রকাশ, বীভৎস নিপীড়ন যেন চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অকস্মাৎ ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন গান্ধীজী।

কবে গান্ধীর মন্ত্রপ্রাপ্তি, কে তাঁহার দীক্ষাদাতা, কোথায় তাঁহার সাধনভূমি, সিদ্ধিক্ষেত্র, সে সমস্ত আলোচনা না করিয়াও একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে ভাবজগতে মহাত্মাজী শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীমহাপ্রভু যে ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ, মহাত্মাজী সেই ভাবপ্রবাহেরই ধারক, বাহক ও প্রচারক। আধার ভারতীয় এবং আধেয়ও ভারতীয় না হইলে সমগ্র ভারত গান্ধীজীর ভাবে এমন করিয়া মাতিয়া উঠিত না। পৌরাণিক প্রহ্লাদের সাধনাই মহাত্মাজীর জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যে সাধনা মহাপ্রভুর করুণায় ব্যক্তির জীবনে সার্থক হইয়াছিল, সত্যসন্ধ মহাত্মাজী তাহা জাতীয়-জীবনে—ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাধনায় প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সদল-সংকীর্তনে নবদ্বীপের কাজি বিজয়ে যে ভাবের অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়াছি, মহাত্মাজীর বহু আন্দোলনে—বিশেষ ডাণ্ডী অভিযানে তাহাকেই শতশাখ বনস্পতিরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। কৃশকায় কৃপাণকর মহামানব—ভারতের অর্দ্ধনগ্ন ফকির যষ্টিমাত্র সম্বল লইয়া লবণ সত্যাগ্রহের জন্য একাকী পথে বাহির হইয়াছেন। পশ্চাতে আতঙ্কিত আত্মীয়স্বজন, সর্বহারা অশ্রুশ্রাবী সবরমতীর অনুগতগণ, দক্ষিণে কৌতূহলী দর্শকের ছদ্মবেশে সিংহাসন-গ্রহণের জন্য ওৎ পাতিয়া উপবিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বামে ভারতের ধীরবুদ্ধি নরমপন্থী হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টাগণ, আর সম্মুখে পৃথিবীর অন্যতর গণনীয় শক্তি বৃটিশ, তাহার সর্ববিধ মারণাস্ত্র ও কুটিল চক্রান্ত জাল বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। গান্ধীজীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পথে পদক্ষেপ করিলেন; অকস্মাৎ এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই কৃশতনু কৌপীনসম্বল সন্ন্যাসীর পদভরে আসমুদ্র ভারত উদ্বেলিত হইল। এক, দুই, তিন,—ঘরছাড়া পথিকের পদশব্দে ভারতের জনহীন পথ মুখর হইয়া উঠিল—শুধু কি একবার—গঙ্গাসিন্ধুনাদে হিমাদ্রির উপত্যকা হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বার বার আমরা এই আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গান্ধীজী রাজনীতিকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দেশে এইকালে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। ভারতে যাঁহারাই রাজনীতি চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঋষিকল্প মনীষী। প্রাচীন ভারতে ঋষিরাই রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। অর্ব্বাচীনকালেও চাণক্য, হরিষেণ, গর্গদেব, ভবদেব ভট্ট, এমন কি হলায়ুধ পর্য্যন্ত সেই ধারাই প্রবহমান ছিল। মহাত্মাজীর বৈশিষ্ট্য রাজনীতিকে তিনি সত্য ও অহিংসার অভিনব শ্রীসৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন। সত্য ও অহিংসা—এক কথায় প্রেমই তাঁহার রাজনীতির প্রাণ। পশ্চিমের ক্ষাত্রবীর্য্যে প্রমত্ত পরস্বলোলুপ বণিকজাতি, নব নব আণবিক সংহারাস্ত্রের আবিষ্কারে যখন সমগ্র পৃথিবীকে ত্রস্ত ও চকিত করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের এই মহামানব—নবযুগপ্রবর্ত্তক এই ঋষি তখনো আপন ধর্ম্মে অবিচলিত আস্থা প্রকাশ বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করিতেছেন।

হিংসার পরিবর্ত্তে প্রতিহিংসা—মুণ্ডের বদলে মুণ্ডের যাহাদের মূলমন্ত্র, গান্ধীর মহিমা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম না। কিন্তু তাহারা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন পৃথিবী হইতে হিংসা পাপ দূরীভূত না হইলে মানবের ক নাই এবং প্রতিহিংসা এই পাপ দূরীকরণের উপায় ন কি ইংরোপে, কি ভারতবর্ষে, কি অন্যদেশে মানুষ পশুর স্তরে নামিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিবলে পশুরও অধম হইয়া এই পশুত্ব অপগত না হইলে মানবের মোক্ষ লা উপায় কি?

ভগবান আছেন এ কথা যেমন সত্য, তাঁহাকে জানিলে মানবের মঙ্গল নাই, একথাও তেমনই স মহাপ্রভু বলিয়াছেন প্রেম লাভ করিতে হইলে ভগবা সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। প্রভু, সখা, প্রাণপতি—অধিকার ও রুচি অনুসারে, ইহার যে এ একটী ভাব গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও, তোমার অবশ্যম্ভাবী। বিস্তীর্ণ মানব সমাজ এই ভা সাধনক্ষেত্র। মানুষকে যে সম্বন্ধের ডোরে, প্রীতির বাঁ বাঁধিতে পারিল না, সে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থা করিবে কিরূপে? জীব ভগবানের নিত্যদাস এই জ্ঞ তাহার সেবা করিতে হইবে। প্রেম ভিন্ন এই জ্ঞানে উদয় হয় না। যে প্রেমহীন—যাহার জীবে দয়া না ভগবানের নামে রুচি নাই, বিশ্বের আপনার জন—বৈ জ্ঞানে সর্ব্বমানবের সেবায় যাহার স্পৃহা নাই, তাহা তো মানব নামে অভিহিত করিতে পারি না। জীবে দ নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন—মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই ম মহাত্মাজী নূতন করিয়া প্রচার করিতেছেন। মহা যুগোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গ ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনার ভারতীয় ধারার কথা উল্লেখ করিতে পারি। অন্তরের যে নিষ্ঠা, যে পবি মধুর দৃষ্টিভঙ্গী ও আকুল আবেগ লইয়া মানব ভগবানে উপাসনা করে, সেই নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও আবেগ য দেশের, জাতির, তথা মানবের উপাসনায় প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তি সাধনা জাতির জীবনে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলেই পৃথিবী কল্যাণ হইবে।

যে শিক্ষায় ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির—ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সমন্বয় ঘটে না, তাহা শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে, কুশিক্ষা। আবার যে শিক্ষায় ইউরোপের সর্ব্বনাশা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে, যে শিক্ষায় জাতি অথবা সম্প্রদায়কে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহাও বিষবৎ পরিহরণীয়। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত যে জাতিকে জীবন গঠনের জন্য বর্ণপরিচয় হইতে পাঠ সুরু করিতে হইবে, জাতীয়তাবাদ, অথবা মানবতাবাদ, কোন্ বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ আছে। কোন বিষয় লেখনীমুখে প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু তাহা জীবনে আচরণে সমস্যা আছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহীর করণীয়ের পার্থক্য আছে। এইরূপ অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল ধর্ম্মেরই সাধন পদ্ধতি আছে, জীবনে তাহার আচরণ করিতে হয় এবং আচরণে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে কাহাক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সঙ্কট সৃষ্টি করে। গান্ধী প্রবর্তিত অহিংসাও এইরূপ একটী ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম সবলের ধর্ম্ম। যথোপযুক্ত মনোবল না থাকিলে এ ধর্ম্মের আচরণে বিপদ ঘটিতে পারে। আর ভগবদ্ বিশ্বাস না থাকিলে এ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভেরও কোনই আশা নাই। বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের দিনে এ ধর্ম্ম হয়তো মানুষের মনঃপূত হইবে না। মহাত্মাজীর তিরোধানের পর হয়তো এ ধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য অবনতও হইতে পারে, এমন কি বাহ্য দৃষ্টিতে হয়তো ইহার বিলুপ্তির আশঙ্কাও দেখা দিবে। তথাপি একথা ধ্রুব সত্য যে, ইহাই অমৃত, ইহার বিনাশ নাই। এই ধর্ম্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, বিশ্বমানবের চরম ও পরমতম ধর্ম্ম। পৃথিবীর অধিকাংশ মানবকে একদিন এই ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ধর্ম্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবনে সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই তিনি অন্তরের অন্তস্তলে নোয়াখালি পরিক্রমণের প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। নোয়াখালির ঘটনা যেমন ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব, মহাত্মাজীর নোয়াখালি পর্য্যটনও তেমনই ইতিহাসের অজ্ঞাত। ইহাপেক্ষা হিংস্র শ্বাপদ-সমাকুল ভয়াল অরণ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ অতিশয় অনায়াসসাধ্য ছিল। নোয়াখালীর উৎপীড়িত আর্ত্তের ব্যথিত হাহাকার তাঁহাকে এতই বিচলিত করিয়াছিল, যিনি বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসের নিয়ামক, বুঝিবা তাঁহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র রচনার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অজ্ঞাতসারেই নোয়াখালি আসিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় গান্ধীজীর জীবনেতিহাসে নোয়াখালিই শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়।

পরিপূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করা সহজ কথা নহে। তাঁহার রূপও সর্ব্বত্র নয়নাভিরাম নহে। সত্য আবির্ভূত হইয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানব ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, আবার অনেকেই তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রকাশে বাধা দিয়াছে, এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি পুরাতন। মহাত্মাজী যে দিন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন—প্রকাশ্য দিবালোকে বিঘ্নবহুল রাজপথে দাঁড়াইয়া এই কটিবাসপরিহিত কর্ম্মযোগী যে দিন সুস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি, সেদিন তাঁহাকে গ্রহণের অসংখ্য বাধার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা ছিল বৃটিশভীতি। তাঁহারই যাদুদণ্ড প্রভাবে সে ভীতি অতি দ্রুত অপসারিত হইতেছিল, আজ তিনিই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছেন। আশা করি অপরাপর যত বাধা, অনতিবিলম্বে সেই সমস্তও নিশ্চিহ্ন হইবে এবং এইবার আমরা তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিব। গান্ধীজীর বাণী—ভারতেরই মর্ম্মবাণী। এই বাণী পৃথিবীর সর্ব্বমানবের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠুক, শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি পৃথিবী হইতে হিংসা বিদূরিত হউক। মহাত্মাজীর সাধের সাধনা সার্থকতা লাভ করুক।

শ্যামার দিকে চেয়ে বল্লে—গিন্নিমা কুষ্ঠী দেখিয়েছিলেন দুষ্ট শনির দৃষ্টি পড়েছে, আচাযি্যি ঠাকুর বল্লেন, ডাইনীতে চোখ দিয়েছে, তা না হলে আর অমন্ রাজপুত্তুরের মত ছেলে—

মুচকি হেসে বিমলি বলে—ডাইনীই বটে, তবে সেটা সেজবাবুর পেছনে, বামে যোগিনী, অমন্ রূপসী বিদুষী বউ, দুধে আলতা রং, দুর্গা পিতিমের মত চেহারা, তারও রং কালি করালি। প্রথমটিত ঐ রকমেই গেল—পেঁচোয় পেয়ে, ষাট্ ষাট্ বাছারে—এটাকেও বিষে শুষে খাচ্চে!

লক্ষ্মী চটে ওঠে—বড্ড নিন্দুক তুমি মাসী, বড়ঘরের মান ইজ্জত রেখে কথা বলতে পারো না—কাজ কি বাপু

এমন ঘুমকাতুরে নেশাখোর লোক দেখি নি বাপু বাপের জন্মে

কথায়। দেখেছিস্ ত শ্যামা, ছেলের ভাতের সময় সে কি ঘটা, সাত দিন ধরে খেয়ে পেটের ব্যথায় মরি।

তা আর দেখিনি দিদি, বড় বাড়ীর বড় কাণ্ড কি সুন্দর মানিয়েছিল হারটায়। ছেলেটাকে দেখলে কিন্তু কান্না পায় দিদি, কি কষ্টটাই না পাচ্চে।

বিমলি ছাড়বার পাত্রী নয়, ফোড়ন দেয়—শাশুড়ী মাগীও তেমনি, সারাদিনই বউএর পেছনে খিটি খিটি, ছেলে যে বারমুখো তা আর নজরে পড়ে না, ভাবটা বউ কেন বাঁধতে পারে না ছেলেকে।

রাসমণি তার চার্জের ছেলেটিকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে এগিয়ে আসে, আঁচল খুলে একখিলি জরদা-দেওয়া পান দেয় বিমলিকে, জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ মাসী, কি হয়েছে গা সেজবাবুর ছেলের।

আর সবাই কলকাতার পোড় খাওয়া, চোখ্ টেপা-টিপি করে। বিমলি মুখ ঘুরিয়ে বলে—থাম্ ছুঁড়ি, নিজের চরকায় তেল দে, কতদিন গাঁ ছেড়ে এসেছিস্, গলা টিপলে দুধ বেরোয়—

শ্যামা হেসে বলে—ভজহরি এখন বেশ সেরেছে—বেশ ভাল পান তো, গিন্নীর ডাবর থেকে সরিয়েছিস্ বুঝি—

হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওপরের দিকে তাকায়, ছোট্ট ছেলের সমস্ত শেষ শক্তি নিংড়ে নিয়ে গলা ফাটানো সে কী করুণ কান্না। তার সাথে কান্নাভেজা মিহি গলায়—মর, মর তুইও জুড়ো, আমিও জুড়োই। সঙ্গে সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠী শাশুড়ীর ভারিক্কি ধমক্—রোগা ছেলের গায়ে হাত—এমন্ রাক্ষুসী মাকেও বলিহারি, কি অপয়া বউই নিয়ে এসেছিলাম সংসারে, জ্বালিয়ে খেলে, ঝাড়ু মারি নেকাপড়া শেখা মেয়েকে।

ঘাগী বিমলিও চুপ মেরে যায়, শুধু থেকে থেকে বলে—ষাট্ ষাট্ বাছারে।

চুপি চুপি শ্যামাকে বলে—বৌটাও ফুঁপিয়ে কাঁদচে না? শুনতে পাচ্চিস্? হে মা তারা, মেয়েজাতের কি সোয়ার!

হঠাৎ দামী মোটরের হর্ণে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। ট্যালবট্ হাঁকিয়ে সেজবাবু নৈশ অভিযানে বেরিয়ে গেলেন, গন্ধ ছড়িয়ে। শ্যামা বলে—সেজবাবুর মোটর, ঐ যে রোগা ছেলে কোলে সেজ বউও জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে, সেজবাবুর বিকেলে বেরুনোর সময় মোটরের হর্ণ শুনলেই ওর বারন্দায় এসে দাঁড়ানো চাই।

রাসমণি হাঁ করে চেয়ে দেখে—দুটো কঠিন চকমকির যেন ঠোকাঠুকি, আর ছেলেটা—কি নলি নলি হাত পা, প্যাকাটির মত সরু, সাদা ফ্যাকাশে চেহারা, চোখের পাতায় পাতায় ঘা—ধুকছে।

পাঁচবাড়ীর কর্তা গিন্নী, ছেলেমেয়ে, বউ ঝির মুখ-রোচক খবর নেওয়া দেওয়ার আসর আর জমল না। না জমল গল্প ছোকরা চাকরগুলোর সঙ্গে, শুধু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী শ্যামা ও বাড়ীর খাস্ খানসামা রামুর সঙ্গে কি

যেন ইসারা করে বল্লে হেলে দুলে। রাসমণি 'থ' হয়ে বসে রইল, কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

রাসমণি 'থ' হয়ে বসে রইলো

শ্যামা ফিরে এসে ঠেলা দিয়ে বল্লে—এই রাসমণি। আবার কার ধ্যানে বসলি লো, মেঘ জমেছে আকাশে, সবাই চল্ল যে।

চমক্ ভেঙে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। একটা অজানা শিশুর একটানা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে ভাসচে।

পোয়াটাক্ দূরেই তার মনিব বাড়ী গিয়েই ছেলেটাকে নামিয়ে সে গিন্নীমাকে বল্লে—বড্ড শরীরটা খারাপ লাগছে মা।

একটু সাবধানে থাকিস্ বাছা এ সময়ে, তা বাড়ী যাবি ত যা—সকালেই আসিস, কিন্তু শুয়ে থাকিসনি যেন। একটু আচার নিয়ে যাস্ বুঝলি? ভাল লাগবে মুখে। বলেই পাশের বড় ননদকে বল্লেন—শুনেছো ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বাড়ীর এ ছেলেটাও বুঝি বাঁচে না, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। হরিনামের মালা মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুরঝি চুপ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। রাসমণির বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে লাগল—তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল বাসার দিকে। বাসায় গিয়ে নিজের দাওয়ায় বসে হাঁফাতে লাগল।

ভজহরি তখনও ফেরেনি। মনে মনে সে মানত করে—ভজহরি আর যেন না আসে। দূরে সন্ধ্যা-নিভে-আসা আলোর শেষ রেশ বড়বাড়ীর তিনতলার দেওয়ালে রক্ত রাঙা। অশরীরী কিছু যেন একটা ঘটছে সেখানে, বুঝতে পারছে না রাসমণি। নীল আলো জ্বলে উঠল, চকচকে একখানা বড় মোটর এসে দাঁড়াল, হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীর সরকার গোসাইজী নামলেন—হ্যাট্‌কোটপরা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে। হাতে ওষুধে যন্ত্রে ভরা ব্যাগ। শুধু মিত্তির বাড়ী ছাড়া সবকটা বাড়ীতেই সাঁঝের শাঁখ বেজে উঠল। রাসমণি আকুল হয়ে মানত করে—গেরস্তর কল্যাণ হোক্, ছেলেটিকে ভালো করে দাও ঠাকুর। চোখের সামনে ফুটে ওঠে একটা রুগ্ন শিশুর ব্যথাকাতর ডাগর চোখের অসহায় দৃষ্টি, পাশে সারা বিশ্বের অবিশ্বাস ও হতাশ নিয়ে তারি বয়সী অতি বড় রূপসী একটি শুকনো মায়ের মুখ, চোখে মুখে জলের রেখা।

এক বছর আগে বানের রাতের কথা রাসমণি কোন দিন ভুলতে পারে না। সেদিন আকাশের কি ভেঙে পড়া কাতরতা! মত্ত সাগরের উন্মত্ত নর্ত্তনের মাঝে দুর্দ্দম দোলায় দুলতে দুলতে রুদ্ধ অভিশাপের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে এগিয়ে এসেছিলেন মরণের দেবতা—সে কী রূপ, ধবধবে, বিরাট—মাথাটা গুলিয়ে যায় যেন—ভাবতেই পারে না, সব কিছু খুইয়ে, সব কিছু হারিয়ে যে এখনও বেঁচে, আর তাও ওই হিংস্র নখর সহরে—উঃ, না ছেলেটা কাঁদছে না?

হারাণী সেদিন সত্যই রেগেছিল। মানুষটার কি আক্কেল, জোয়ান্ মরদ, জ্বরে ও আমাশায় ভুগে কঙ্কালসার, তিনদিন উপোসের পর না খাওয়া না দাওয়া ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে চল্লেন কিনা ভিনগাঁয়ে কীর্ত্তনের আসরে। কীর্ত্তনের নামে লোকটা যেন পাগল হয়ে যেত। সত্যিই তার মত খোল-বাজিয়ে ও তল্লাটে আর কেউ ছিল না। খোল যখন বোল দিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, তখন মনে হোত দুহাত তুলে জয় গোবিন্দ বলে হেমকান্তি গৌরতনু নদের নিমাই নেমে এল।

বুকটা মুচড়ে উঠল রাসমণির—জাত বোষ্টমের মেয়ে সে—গৌরবিনোদ বাবাজীর আখড়ায় এক জমাটী কীর্ত্তনের

আসরেই তার প্রথম রসের কলি ফুটেছিল। তার বয়সই বা কতো, সবে সতেরো, ছিপছিপে তন্বী, গদাইএর বেটা ভীম তখন ভীমই ছিল বটে—সুন্দর সুঠাম চেহারা, ঢল ঢল স্বাস্থ্য ও যৌবন। বুড়ো বাবাজী দেখে শুনে বলেছিলেন —রাধারাণী কৃপা করলেন দেখছি, গৌর হে সবই তোমার কৃপা।

চুপ করে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। কালো অন্ধকার—দেখা যায় না কিছু—ঐত কাঁদচে না। টস্ টস্ করে জল পড়ে চোখ বেয়ে তার।

কী দিনই গেছে, ভীমের দরাজবুক, জোয়ানদিন, সবল পেশী, মুখর ভালবাসা—আর আজ, ভজহরির মত মনে ও দেহে রুগ্ন ক্লেদাক্ত মানুষগুলো—গা যেন গুলিয়ে ওঠে তার। হঠাৎ আঁতকে ওঠে সে—বিমলির কথা মনে পড়ে—ওই রকম রুগ্ন ছেলে যদি তার কোলে এসে থাকে—না, না, কিছুতেই পারবে না সে।

মোটে ছবছর আগের কথা, বাড়বাড়ন্ত ঘর, ক্ষেত-খামার, জোৎজমি—গোয়ালভরা গাই বলদ—কোলভরা ছেলে—ছেলে! তার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে, শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে ওঠে গা। তারপর অজন্মা, দেনা, রোগ, মহাজন, ডিক্রী, ক্রোক, যুদ্ধ, মন্বন্তর, বান—বান—ভেসে—সব ডুবে গেল। জিনিষ থেকে মানুষ অবধি, মনুষ্যত্ব থেকে সতীত্ব পর্য্যন্ত, ছেদ পড়লো প্রাণের ধারায়—সে বেঁচে থাকে আজো—আশ্চর্য্য!

সারাদিন পরে ঝড়বৃষ্টি মাথায় দুর্য্যোগঘন ভর রাতে যখন ভীম বাড়ী ফিরেছিল তখন রাত অনেকটা এগিয়ে-ছিল। রেড়ির পিদিমটা গিছল নিভে—কোলের ছেলেটা মায়ের শুকনো বুকে দুধ না পেয়ে এলিয়ে পড়েছে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে। বাইরে আকাশে বাতাসে জলে সে কী মাত'-মাতি মিতালী! ভীমের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রাসমণির তপ্ত রাগটা গিছল জুড়িয়ে, মুখের 'রা' সে কাড়েনি! অমুখর মৌন অভিমানে শুয়ে পড়েছিল স্বামীর পাশে।

ভীম ভেবেছিল—নাঃ বড্ড রেগেছে আজ, রাগবারই কথা। শুধু তার গায়ে হাতটা রেখেছিল সে।

ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল রাসমণি।

শেষ রাতে সে কী জলের তোড়, বাইরে কি গোঁ গোঁ শব্দ; 'ওঠ ওঠ' ভীম বলে—বান নেমেছে।

চালের উপর উঠেছিল তারা পুঁটলিপাটলা নিয়ে চারদিকে অথই জলের রাজত্ব।

চালটা ছিটকে চলল্ বানের স্রোতে, অন্ধকারে লাগল একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা। কোলের ছেলেটা জলে পড়ল টাল সামলাতে না পেরে।

'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাসমণি।

'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাসমণি

নাড়ী ছেঁড়া প্রথম সন্তান—উঃ মাগো! শির শির করে ওঠে গা।

তাকে ধরতে গিয়ে ভীমও গেল তলিয়ে মহা-বরষার রাঙা জলে।

হায় ভগবান, সত্যই কি তুমি ছিলে, না আজও আছো।

একটা জোর কান্নার শব্দে বর্তমানে ফিরে এলো রাসমণি—কাঁদচে, কে, কারা কেন কাঁদচে? এবারে আর ভুল নেই, ঠিক শুনেছে সে, আশ্চর্য্য ভেতর থেকে ভজহরির নাকের ডাকও বেশ শোনা যাচ্চে। মা, মাগো! অসহ্য—পেটের নাড়ীগুলোও বুঝি মোচড় দিচ্চে—বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্চে—এতদিনের সব কিছু অশুচি অজাত—

থাকতে পারলে না রাসমণি, বেরিয়ে পড়ল দৌড়ে বস্তি বেয়ে রাসবিহারী এ্যাভিনিউর দিকে। পার্কের পাশে

বড়বাড়ীর তিনতলার নীল আলোটা কিছু পরে নিভে গেছে, শুধু একটা গুমরে ওঠা চাপা কান্নার সুর—খোকা, খোকারে, মাণিক্ আমার।

রাসমণি এগিয়ে চলল—নিশিতে পাওয়া স্তিমিত। ঢং ঢং করে তিনটে বাজল—তীরবেগে একটা মোটর ছুটে গেল—নেশাজড়িত কণ্ঠে সেজবাবুর গলা—হটে হট্ যাও—।

রাসমণি কিন্তু আর ফিরল না।

সহজ শিক্ষা

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সহিত আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেরও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। সুতরাং একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে রেডিও, এরোপ্লেন ও এ্যাটম বোমএর পূর্ববর্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান যুগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

অধুনা আমাদের জীবনের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সহজ ছন্দে চলিতে না পারিলে, গণতান্ত্রিক সমাজের জনসাধারণের নিকট আমাদের ইট, কাঠ, টেবিল, চেয়ার অধ্যুষিত এই বিরাট শিক্ষাসৌধ শুধু বিস্ময়ের নহে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। অগ্রগামী দেশের নেতারা তাঁহাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছেন।

সুখের বিষয় এই যে হিমাদ্রির তুষারশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া আমাদের গৃহেও আজ নূতন যুগের আহ্বান বাণী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা এখন এক যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। এই পরিবর্তন অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপার নহে। গতিশীল জগতে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতনকে বরণ করা চলিবে না। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এখন আর কোনও বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির সহিত আপনা হইতেই সখ্যতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের মায়ামন্ত্রে, আমাদের একান্ত অজ্ঞাতসারেই এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। তাই জনসাধারণের মধ্যে সহজ উপায়ে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কবির ভাষায় আমাদের শিক্ষার বাহন এতদিন চারি ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ীতে চড়িয়া প্রশস্ত রাজপথ কাঁপাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। গাড়ীর পিছনে উর্দ্দীপরা তকমাধারি সহিস্ ক্রমাগত হাঁকিয়াছে, হট্ যাও, হট্ যাও। ভীত, সন্ত্রস্ত, পথচারি মূঢ় বিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিরাট শিক্ষা শকট গলি ঘুঁজির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার গৌরবেই জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইহাদের শিক্ষার সহজ ও সুবোধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শিক্ষা বাঁধাধরা স্কুল, কলেজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক পথে চলিবে না। ইহা জনসাধারণের সারা আবেষ্টনের মধ্যে কর্মক্লান্ত জীবনের শুভ অবসরে মুক্তি আপন প্রাণধারায় সিক্ত হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তবে কি সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান তাঁহাদের সুমহান, কক্ষচ্যুত হইয়া বাজারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে? আমরা বলিব, ক্ষতি কি? সক্রেটিস্ দর্শনশাস্ত্র স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া মানব সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞানকে স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরীর নিভৃত প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া বারোয়ারীর আটচালায়, ক্লাবে, পাঠশালায় ও বৈঠকখানায় হাজির করিয়াছে।

পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিলে চলিবে না। স্কলার ও জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে জনসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ; পণ্ডিত বা স্কলার শতকরা ১০ জনও নহেন। স্কলার একটি বা দুইটি বিষয়ে জানিতে চাহেন অনেক, কিন্তু অনেক বিষয়ে বুঝিবেন কম। অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সাধারণ জনসাধারণ সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের অল্প কিছু জানিতে চাহেন এবং বুঝিবার অনুভূতি শিক্ষিতের অপেক্ষা কম নহে। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে এই সহজাত অনুভূতিকেই "অশিক্ষিতপটুত্ব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই "পটুত্বের" সুযোগ লইয়া বয়স্ক জনসাধারণের **informal education** এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমান যুগে যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু একাদশ, চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিলেই সব শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইল—একথা মনে করা ভুল। 'Education is a life long process' এই তত্ত্বকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শিক্ষার ধারা জনসাধারণের সামাজিক জীবনধারার সহিত একস্রোতে মিলিত করিতে হইবে। "for the great majority learning is a social activity." সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিরক্ষরগণের শিক্ষা

অভাব নহে বলিয়া সমাজের নিকট ইহার জন্ত কোনও কৈফিয়ৎ দিবারও প্রয়োজন নাই।

বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক জনশিক্ষার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ। সামাজিক আচার ব্যবহারের পার্থক্যই এই প্রভেদের কারণ। কিন্তু ইহার মূলনীতি সর্ব্বত্র এক। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা সিলেবাস থাকিবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যসূচক ভীতিপ্রদ নামের উল্লেখ থাকিবে না। যে কোনও সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ আলোচনা চলিতে পারে। মাতৃভাষাই এই আলাপের বাহন হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলা চলে :—

সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সামান্ত সেলাইএর বুননের সারির মধ্যে বীজগণিত ও অঙ্কশাস্ত্রের বহু তথ্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজ কোনও বিজ্ঞানবিদ বা শিক্ষাবিদ পণ্ডিতের চোখে এই সেলাইএর সাইকোলজি, মেথড্ ও educational value ধরা পড়ে নাই। তাই যখন সেলাই নিপুণা কোনও শ্রীমতী অপরার স্কার্ফের প্যাটার্ণের সুখ্যাতি করেন, তখন দ্বিতীয়া প্রথমাকে মাত্র প্যাটার্ণটি বুনিবার কৌশল দেখাইয়া দেন। প্রথমার বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না : প্যাটার্ণটি তথনই তুলিয়া যেলেন। কিন্তু এই সামান্ত জিনিষের এডুকেসন্তাল ভ্যালু ধরা পড়িলে কি বিভীষিকার সৃষ্টি হইতে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সেলাই তখন 'এডুকেশন্তাল নিটিং'এ পরিণত হইবে। দ্বিতীয়া তখন প্রথমাকে বলিবেন,—প্যাটার্ণটি ভাল ভাবে শিখিতে হইলে তোমাকে মিস কাঞ্চিলালের মডার্ণ ন্যাশনাল আর্ট একাডেমির ইভনিং ক্লাসে যোগদান করিতে হইবে। সেখানে পুরাপুরি বারটি লেকচার শুনিতে হইবে : তিনটি লেকচার সেলাই শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, তিনটি মনস্তত্ত্বের, চারটি সেলাইএর বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, একটি অঙ্কন ও আর মাত্র একটি হাতে কলমে সেলাই। শেষেরটিতে ফেল করিলে কোনও অসুবিধা নাই—কেবল নম্বর যোগ হইবে না। প্রথমবার সমস্ত উৎসাহ, আগ্রহ উবিয়া যাইবে।

ধরুন, ক্লাবের রেডিওটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী একজন মেকানিক আসিয়া যন্ত্রটি ঠিক করিয়া দিল। উপস্থিত সভ্যগণ স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রশ্ন শুরু করিলেন :—কি গোলযোগ হইয়াছিল? আপনি কি করিলেন আর? মেকানিকের উত্তর অতি সংক্ষেপ : সব কথা বুঝিতে গেলে প্রতি রবিবারে আমাদের ক্লাসে এ্যাটেণ্ড্ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্ত্তাদের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত কৌতূহল নিস্তেজ হইয়া যাইবে।

উৎসুক জনসাধারণ ক্লাসে যোগদান করিতে চাহেন না। তাহারা তৎক্ষণাৎ রেডিও সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহে। এই সুযোগে বলা চলিত—রেডিও-যাদুকর ডাঃ মিত্রকে একবার আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনুন না কেন? তিনি এ সম্বন্ধে খুব ভাল গল্প বলিতে পারেন। বলা বাহুল্য এই যাদুকর হইবেন একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। বিশেষজ্ঞের মুখে বক্তব্য বিষয় গল্পে ও হাস্য কৌতুকের ভিতর দিয়া ক্লাবের আবহাওয়াকে মুখর করিয়া রাখিবে। কেননা, যিনি যে বিষয়টি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছেন তিনিই সেই বিষয়টি লইয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারেন।

দরিদ্র পল্লীর—বিশেষতঃ শ্রমিক অঞ্চলের সাধারণ পবিত্র হোটেল, চায়ের দোকান ও অরোরা রেস্তোরাঁগুলির নোংরামি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। পৌরসভা ও কর্ত্তৃপক্ষ এগুলি পরিহার করিয়া চলিবার নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু চায়ের দোকান ও হোটেলগুলির আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই যে অপরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকাংশে দায়ী সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। শতছিন্ন, মলিন অয়েলক্লথ আবৃত ভাঙ্গা টেবিলের উপর নোংরা পেয়ালায় চা পরিবেশন করিলে, পরিবেশক ও ভোক্তা উভয়েরই হাত হইতে দু এক ঝলক চা টেবিলের উপর ক্রমাগত পড়িতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উপর চা-পানরত ভদ্রলোকদের কনুইএর গুঁতার আকস্মিকতাও আছে।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে শাদা ধব্‌ধবে টেবলক্লথের উপর পরিষ্কার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিলে সকলেই পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। খোলা মেঝের উপর উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু মেঝের উপর কার্পেট বা অন্য কোনও আস্তরণ বিছান থাকিলে সকলেই সতর্ক হইবেন। এইরূপে জনসাধারণের informal শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল ফল হইবে।

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখিতে ভালবাসি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন মানবের আদর্শবাদকে রূপ, রস ও গন্ধে প্রাণবন্ত করিয়া আসিয়াছে। ভাবী ভারতের জন-শিক্ষার স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে। অনেকে ইহা নিছক স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু স্বপ্নও সত্য হয়। বন্ধুবর শ্রীঅশোককুমার, শ্রীচারুলাল এবং সমপর্যায়ভুক্ত আরও কয়েকজন visionary একটি ক্লাব গড়িয়া তুলিয়াছেন। সেখানে চা পান ও জলযোগের ব্যবস্থাও আছে। কোনওরূপ colour (collar ?) bar নাই। উদ্যোক্তারা কেহ পরিচারক, কেহ waiter রূপে সকলের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহকোণে রেডিও হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে। চাপানরত কোনও অতিথি হয়ত তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মনে হয় যেন সবই একরকম, কিন্তু ভাই, যাই বল, বেশ কসরৎ আছে—মন্দ লাগেনা।' এই শুভ মুহূর্ত্তটিতে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোককুমার নহে,—সঙ্গীতজ্ঞ অশোককুমার তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে তিনি বলিতে সুরু করিয়াছেন যে ভূপালীর খেয়ালে পাঁচটি সুর লাগিয়াছে,—সাতটি লাগে নাই এবং এই সব কারণেই সাধারণে যাহাকে কসরৎ অর্থাৎ সাধনা বলে তাহার প্রয়োজন হয়। হয়ত আপনার আনন্দেই ও শ্রোতাদের আনন্দ দিবার জন্যই তিনি ভূপালীর আরোহণটিও গাহিয়া দেখাইবেন—সা রা গা পা ধা র্সা।

ওদিকে আর এক টেবিলে সাহিত্যিক চারুলাল তখন সিনেমায় অভিনীত চণ্ডীদাসের সমালোচনার তুমুল তর্ককোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন এক সময়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের উঁচু পর্দ্দায় সুর ধরিয়াছেন। মুগ্ধ শ্রোতারা শুনিতেছে— সবার উপর মানুষ সত্য,

তাহার উপরে নাই।

আধুনিক শিক্ষা ও বনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীউষাপতি ঘটক

আজকাল ভারতের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও তাহাদের অধীন স্কুল ও কলেজে যে ধরণের কল্পনাপ্রধান (Subjective) শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে, তাহা ছাত্রগণের কল্পনা-শক্তি বিকাশে সাহায্য করে। সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যালয়ে এবং কলকারখানায় ইহার খানিকটা কাজে লাগে। কিন্তু সমাজ-জীবনের বিভিন্ন-স্তরে—বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঠিক সে ধরণের নয়। আধুনিক শিক্ষা মধ্য-বিত্ত ও দরিদ্র অভিভাবকগণের নিকট ভার স্বরূপ।

বস্তুতঃ, আধুনিক শিক্ষার শেষে ছাত্রের জীবনে আসে অবসাদ—তখন "যেন তেন প্রকারেণ" জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিতে যাইয়া শিক্ষিতগণ বিষম সঙ্কটে পড়ে। সামান্য কেরাণী হইয়া জীবন যাপন করা বাঞ্ছনীয় নয়; অথচ নানা কারণে এই সামান্য কেরাণীগিরিও অনেকের ভাগ্যে জুটে না। অথচ এইরূপ শিক্ষা অর্জ্জনের ঘটা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই শিক্ষার ফলে শিশুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একটী কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সে বিশুদ্ধ বায়ু, রৌদ্রতাপ ও আলোক হইতে বঞ্চিত হয়। এই শিক্ষা শিশুমনের সব বৃত্তিকে বিকশিত করিতে না পারিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিদ্যাপীঠের অবরোধের মধ্যে থাকিয়া তাহার মানসিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়। নীরস পাঠ্য-পুস্তকের হিজিবিজি অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া তাহার মন কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র পাঠাভ্যাসে অবহেলা করে—আর শিক্ষকগণ যাহাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হন, তাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ না করিয়াও জীবন-যুদ্ধে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে।

আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রকার কল্পনাপ্রধান শিক্ষার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ ও মহাপুরুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়া তিনি বলিতেছেন,—"জ্ঞান দুই প্রকার;—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ; কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না।"

আধুনিক শিক্ষায় মস্তিষ্কের কাজটাই হয় বেশী; কিন্তু শরীর ও মনের সমান বিকাশ না হইলে, শিক্ষার্থীর জীবন নানাভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই কারণেই বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী কোন শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা ও সময়োপযোগী।

যুদ্ধের পূর্ব্বে যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, কলকারখানা ও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে চাহিদার একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া বালকের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা হইত। এই সব দেশে নূতন নূতন শিক্ষানবিশদল শিল্পপ্রসারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিত। এইরূপে উল্লিখিত দেশসমূহ নানা দিকে সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ শিক্ষার পর ছাত্রগণকে কলকারখানায় পাঠানো হইত; সেখানে শিক্ষার্থিগণ কারখানা চালানো কাজের মোটামুটি একপ্রকার ধারণা করিয়া লইত—তাহা ছাড়া প্রাথমিক যন্ত্রপাতি (Elementary Tools) ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিত। কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইত ইহার ঠিক পরেই। রুশিয়ায় লেনিন প্রবর্ত্তিত পলিটেকনিক শিক্ষা অনেকটা এই ধরণের।

কিন্তু রুশিয়ার ন্যায় সমাজতন্ত্র যতদিন না এদেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন এই প্রকার শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যত বাড়িতে থাকিবে, ততই বেকার-সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে কলকারখানার প্রসার তেমন নাই,—শীঘ্রই যে নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার ও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ইউরোপের শিল্পশিক্ষা এখন আমাদের দেশের উপযোগী নহে। পরে ঐরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে।

এদিকে যুদ্ধশেষে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিতেছে; যুদ্ধের সময় যেরূপ ধরণের কার্য্যপদ্ধতির প্রয়োজন ছিল, আজ আর তাহার তেমন চাহিদা নাই। রণক্লান্ত সেনাগণকে ও যুদ্ধকালীন কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে জীবিকা অর্জ্জনের নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর বেকারগণের মধ্যে যাহারা কোনপ্রকার শিল্পকার্য্যে দক্ষ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী অপর কোন শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই, তাহারা যদি ধৈর্য্যধারণ করিয়া কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার ফল ও নেহাত মন্দ হইবে না।

আমাদের মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধির আদর্শ অনুসরণে ওয়ার্দ্ধাতে যে বনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষার অনেকখানি অভাব পূরণ করিতে পারে। এই শিক্ষা কুটিরশিল্পাশ্রয়ী; তবুও ইহা এমনভাবে পরিকল্পিত যাহাতে ইহা ভবিষ্যতে কোন কোন যন্ত্র-শিল্পেরও পরিপূরক (Supplement) হইয়া উঠিবে। ইহাতে শরীর ও মনের সমান বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা (General Education) দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী

করিয়া তোলা। ইহার অপর উদ্দেশ্য হইল,—শিক্ষাগ্রহণকালে শিক্ষার্থীকে কতকটা স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়; কিন্তু এই শিক্ষার জন্য তাহাদের বিশেষ কিছুই ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। বনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রগণ শিক্ষাগ্রহণকালে যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিবে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের লাভ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগৃহীত হইবে। এইরূপ স্থলে শিক্ষকের দায়িত্ব বড় সামান্য নহে।

এই শিক্ষা সাত বৎসর বয়সে আরব্ধ হইয়া সাত বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। মাতৃভাষাই হইবে এই শিক্ষার বাহন। কোন বিশিষ্ট শিল্পকে আশ্রয় করিয়া এই শিক্ষা অগ্রসর হইবে; অর্থাৎ যে শিল্পকে মনোনয়ন করা হইবে, তাহাকে কেন্দ্রস্থ করিয়া অন্যান্য মানসিক শিক্ষাকে এই শিক্ষার অধীন করিতে হইবে। নির্ব্বাচিত শিল্প-বিদ্যাটি (craft) নিয়ম অনুসারে শেখানো হইবে। বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বহন করিতে হইবে রাষ্ট্রকে; শিল্পদ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহারের দায়িত্ব এবং উহার উদ্বৃত্তাংশ বিশ্বের বাজারে বিক্রয়ের গুরুভার রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। ইহাই হইল মোটামুটি পরিকল্পনা। সব পরিকল্পনাতেই কিছু না কিছু দোষ থাকিতে পারে। বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও অভ্রান্ত বলা যায় না; তবে কার্য্যক্ষেত্রে ইহার অনেক দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে—শিশুর আবেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অন্যান্য শিক্ষাকে এই প্রধান শিল্প শিক্ষার অধীন করা বাঞ্ছনীয়। ইহার অর্থ এই যে—যদি কেহ বস্ত্র-বয়ন-শিল্প শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করে,—তাহা হইলে তাহাকে বয়নের উপাদান তুলা, তাহার আবিষ্কারের ইতিহাস, কৃষি-পদ্ধতি, বিস্তার ও পৃথিবীর যে সব কেন্দ্রে তুলা পাওয়া যায়, তাহা জানিতে হইবে। তুলার বীজের কথা জানিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য বীজের কথা জানিতে পারিবে। যে আবহাওয়ায় ও যে মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার কথাও স্বাভাবিক ভাবে জানা যাইতে পারে। এই প্রকারে সে ভূগোল, ইতিহাস ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবে তাহার মূল্য অনেকখানি। এই শিক্ষায় বিষয়বস্তুর কোন অংশ কণ্ঠস্থ করিবার প্রয়োজন নাই।

তুলা পরিষ্কার করা শিক্ষাকালে মানব-ইতিহাসে এই জন্য যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও যে যে পদ্ধতি কার্য্যকরী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানাও অপরিহার্য্য। বস্ত্র বয়নকালে সে ওজন, মাপ ও সময়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এ পর্য্যন্ত বস্ত্র বয়নের জন্য যতপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যবহার-পদ্ধতিও তাহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। যে যন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করা হয়, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করাও স্বাভাবিক। এইভাবে প্রতি পদে পদে তাহার যেমন জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, তেমনি অন্যান্য জ্ঞানের সহিত তাহার নবলব্ধ জ্ঞান সম্মিলিত হইতে থাকিবে। এইপ্রকারে তাহার ব্যক্তিত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা বর্দ্ধিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সমালোচনা

মহাত্মা গান্ধি-প্রবর্ত্তিত বনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উঠিয়াছে। আচার্য্য কৃপালনী তাহার "Gandhiji's Latest fad" (Basic Education)—শীর্ষক পুস্তিকায় এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলে সমগ্র শিক্ষাটাই ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। রুশিয়ার পলিটেকনিক শিক্ষার ন্যায় ইহা সমাজদেহের অঙ্গীভূত। রাষ্ট্র বা সমাজের নির্লিপ্ততা এ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবে। আমরা একে একে সমস্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়; এই সময়ে শিশু বা বালক যাহা উৎপাদন করিবে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইবে; কিন্তু, ইহার ফলে কি শিশু শিশু-শ্রমিকে (Child Labour) পরিণত হইতেছে না? এখন সমাজতন্ত্রবাদিগণ এই ব্যবস্থা সমর্থন করিবে কি? কিন্তু, কার্ল মার্কস এই শিশু-শ্রমিক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—যে স্থলে বড় বড় কলকারখানার অস্তিত্ব রহিয়াছে,—সে ক্ষেত্রে শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করার মূলে নিছক সদিচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করাও যদি সম্ভবপর হয়—তাহাও সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যাইবে।*

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—শিশু বা বালক-বালিকার শিল্পকার্য্য হইতে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগৃহীত হইবে কি না। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গিয়াছে—একটী ছাত্র যদি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া চরথায় সূতা কাটে, তাহা হইলে সে মাসে এক টাকা হইতে দেড় টাকা (যুদ্ধ-পূর্ব্ব হার) পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। একজন শিক্ষকের মাহিনা কমপক্ষে ২০৲ টাকা ধরিলে এই ব্যবস্থায় তিনি ২০।২৫ জন ছাত্র লইয়া ক্লাস চালাইয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষকের মাহিনা ভারতে ১০।১১ টাকা ধরা হইয়াছিল। ইহাই ভারতে সাধারণ (Average) শিক্ষকের উপার্জ্জন মনে করিয়া, এই নূতন পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষকের মাহিনা উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। একজনের জীবিকা হিসাবে এই পারিশ্রমিক যুদ্ধের পূর্ব্বে গৃহীত হইতে পারিত, কিন্তু সমগ্র দেশ যতক্ষণ না রুশিয়ার আদর্শে সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কোন

* "It is necessary to indicate the age below which children should not be permitted to labour, A general prohibition of child labour is inconsistent with the existence of large industry and therefore can be nothing more than a good intention. And even if the introduction of such a prohibition were possible it would be a reactionary measure."—Latest Fad p. 66.

শিক্ষকের পক্ষে এইপ্রকার সামান্ত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অসম্ভব। অন্তথা, শিক্ষকগণকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একদিক হইতে সমাজের সহিত সম্পর্কশূন্ত হইয়া থাকিতে হয়। ইহা ঠিক স্বাভাবিক জীবন নহে। তাহা ছাড়া ভারতে কোন যুগেই সন্ন্যাসজীবন কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। যে কেহ স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস-জীবনযাপনে অধিকারী ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষকের পারিশ্রমিকের হার এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহা তাহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিবে।

অনেকে হয়তো বলিবেন যে, আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে, সামান্য আয়ে চলিয়া যায়। ২০৲ টাকা সেখানে সামান্ত নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় সর্ব্বত্র একরূপ অবস্থা নহে। তাহা ছাড়া যাঁহারা জাতিগঠন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের পারিশ্রমিক সামান্ত হইলে উপযুক্ত শিক্ষক এস্থলে আকৃষ্ট হইবে না। যে যুগে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার চেষ্টাই হইতেছে—সে যুগে ভারতের শিক্ষকগণ কেন অত সামান্য মাহিনায় জাতিগঠন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহা বুঝি না।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে—পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্তায় এদেশে যদি ব্যাপকভাবে কলকারখানার প্রবর্ত্তন হয় তাহা হইলে কুটিরশিল্পাশ্রয়ী বনিয়াদী শিক্ষার আবশ্যকতা কি? তখন গ্রামে গ্রামে চরখায় সূতা কাটা, সূত্রধরের কাজ শেখা, বই-বাঁধানো, কাগজ-তৈয়ারী, কার্ডবোর্ড প্রস্তুত করা প্রভৃতি শিখিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হয় যে—রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় যে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে—তাহাও গ্রামস্থ ছোট ছোট শিল্প-বিদ্যালয়ে। তাহা ব্যতীত, ১৮ বৎসর বয়স না হইলে সে দেশে কোন শ্রমিককে কলকারখানার কাজে নিযুক্ত করা হয় না। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে,—যদি কোন বালক কলকারখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করে, ভবিষ্যৎ জীবনে যে সে শিক্ষা কোন কাজে লাগিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। এদিকে যুদ্ধ শেষে আমাদের দেশে যখন কলকারখানার প্রসারে বিলম্ব আছে—তখন শিশুগণের পক্ষে কোন শিল্প শিক্ষা করা মন্দ কি? ভবিষ্যতে যদি এদেশে যন্ত্রশিল্প ব্যাপক-ভাবে প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলেও এই সব বনিয়াদী শিক্ষার অধীন বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন কমিবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে—বিদ্যালয়গুলি হইতে যে বিপুল শিল্প-সম্ভার উৎপন্ন হইবে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ভারত এখনও প্রয়োজনমত শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ নয়; সুতরাং যদি কোন নূতন শিল্প-পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের নূতন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা কি জাতি বা সমাজের দিক হইতে লাভজনক নহে? ইহার ফলে এদেশে বিদেশী কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পজগতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে কি না। যন্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা ত' আছেই; অধিকন্তু, ইহা কি কুটীরশিল্পীর (যাহারা বনিয়াদী শিক্ষা পাইবে না) উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না? ইহার উত্তরে বলা যায়,—ভারতে শিল্প সামগ্রীর চাহিদা সামান্ত নহে। ভারতকে যখন প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকার বিদেশের কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিতে হয়, তখন যে কোন উপায়ে ভারতে শিল্প সম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; নূতন শিল্পপ্রচেষ্টা কোন বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে না। প্রথম অবস্থায় শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের উৎপন্ন সামগ্রীগুলি এদেশের কুটীর-শিল্পজাত বা বিদেশের যন্ত্র-শিল্পজাত সামগ্রীসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে না সত্য; কিন্তু, পরে যখন শিল্পসম্ভার বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে—তখনই সমস্যার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হইতে পারে। এক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষাকে রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব থাকিবে সরকারের। সরকারকে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমাইয়া স্বদেশী দ্রব্যের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। শিল্পসম্ভার ক্রয়ের, বিক্রয়ের এবং ব্যবহারের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হন—কিম্বা যদি আমদানী বা রপ্তানী শুল্ক কমিয়া যাইবার অজুহাতে এই ব্যবস্থা অচল বলিয়া বাতিল করিতে চাহেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় নাই। যেখানে মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—জাতিকে অবৈতনিক শিক্ষাদান—সেখানে কোন সরকারই এই সুচিন্তিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা জানি—ইতিমধ্যেই ভারতে অনেক প্রদেশে এই বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কংগ্রেস প্রভাবান্বিত প্রদেশগুলিতে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। আমরাও বনিয়াদীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার কামনা করি।

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

শতদলে ঘেরা কুসুমের মাটি
নীরবে বক্ষে বয়

সৌরভ তার চপল মলয়
অক্লেশে করে জয়।

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১

অবিশ্রান্ত বর্ষণে আর জোলো-হাওয়ায় আকাশ বাতাস যেন ভারি হইয়া আছে। নদীর দুইকূল ভরিয়া গৈরিকজল উপছিয়া পড়িয়া পাক খাইয়া ফেনাইয়া ছুটিতেছে। অবিশ্রাম ধারাপাতের বিরাম নাই। বর্ষণধৌত বৃক্ষগুলির সতেজ সবুজপত্রে দিনশেষের ক্ষীণ রক্তিম যেন শেষ সঙ্গীতের করুণ সুরটির মত জড়াইয়া আছে। স্কুল বিল্ডিংয়ের সকল দুয়ারগুলি বন্ধ হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইয়া হেড চাপরাশী রামরতিয়া দ্বারবানকে গেট্ বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়া এই মাত্র চলিয়া গেল।

হোষ্টেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া নবাগতা তরুণী শিক্ষয়িত্রীদ্বয় কি যে গল্প করিতেছে শোনা যায় না, তবে তাহাদের উচ্ছ্বসিত মিষ্টি হাসির আওয়াজ এখানেও ভাসিয়া আসিতেছে।

আপনার শ্রান্ত দেহখানি ইজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া মিসেস সিং (স্কুলের লেডি প্রিন্সিপ্যাল) আপনার ড্রইংরুমে বসিয়া বাহিরে নদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শীর্ণমুখের রুক্ষতা কখন অপসারিত হইয়াছে কে জানে, সারামুখে একটি করুণ বিষাদের ম্লানিমা জড়াইয়া আছে। বেণীবদ্ধ রুক্ষ কেশের দুই একটি গুচ্ছ বাঁধনভ্রষ্ট হইয়া মুখে চোখে উড়িয়া পড়িতেছে। উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সুখলতা বসিয়াছিলেন। শূন্য নির্জ্জন গৃহ। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে তিনি একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। উপরে ষ্টাডিরুমে তাঁহার পালিতা কন্যা রেবা পড়িতেছে। স্কুলের সেকেণ্ড টীচার তাহাকে পড়াইতেছেন। দূরে আউট-হাউসে ও বাবুর্চ্চিখানায় তাঁহার দাসী ভৃত্যগণ জটলা করিতেছে, তাহাদের কণ্ঠস্বর এখানে আসিয়া পৌছায় না। তাঁহার গৃহে সূচী পতনের শব্দটুকুও বুঝি শোনা যায়। যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এই ভয়ে তাঁহার গৃহে ও স্কুলে সবাই ত্রস্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ক্রোধের উন্মত্ততা যে ভয়ানক, তাহা সুখলতা নিজেও জানেন, যেন কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত, উড়াইয়া ছিঁড়িয়া ভাঙিয়া ভাসাইয়া আপনার শ্রান্তিভারে আপনি কখন স্তব্ধ হইয়া যান। কষ্টকর আত্মগ্লানি মনকে নিপীড়িত করে। কিন্তু যে নির্জ্জন বর্ষণাচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যায় আপনার বসিবার ঘরে বসি কর্ম্মহীন অবসরের এই ক্ষণটুকুকে সহসা সুখলতার মনে প্রশ্নের উদয় হয়। কেন? বর্ষার অবিচ্ছিন্ন ধারাপাত করুণ রাগিণী তাঁহার সুপ্ত মনের চেতনায় অকস্মাৎ রুক্ষ আবরণ খসিয়া পড়িয়া যায়। বর্ষার বারিপাতের উদাস বাউল রাগিণী ইহা বড়ই বিস্ময়কর। মানবের মন সুখের মুহূর্ত্তে উদ্বেল করিয়া তোলে, আবার দুঃখের ক্ষ অভিভূত করিয়া দেয়। আপনার মনের অবস্থা বিশেষে হৃ যেন নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। স্মৃতি আসিয়া বর্ত্তমানে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া গিয়াছে। চক্ষুর উপরে বাহুমূল আচ্ছাদন করিয়া সুখলতা অর্দ্ধশয়ান অবস্থা বসিয়া ভাবিতেছিলেন। ধীরে ধীরে ছায়াচিত্রের মত তাঁহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আজ হইতে কতবৎসর পূর্ব্বের সে জীবন? যখন তরুণী সুখলতা ফিজিক্স অনার্স লইয়া চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে?

২

১৯১৯ সাল। মহাযুদ্ধ তখন শেষ হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধিপত্রে চুক্তি স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত রাজ্যচ্যুত কাইজার হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মরণাহত জার্ম্মানী পাশবদ্ধ অজগরের মত একধারে পড়িয়া আছে, তাহার ফুঁসিবার অনুমতিটুকু পর্য্যন্ত নাই। অসহায় জনগণ চাহিয়া আছে কালিমাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে।

বিজেতা ব্রিটিশের উল্লাসধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিতেছে। কি গৌরবপূর্ণ স্তুতি সে কি তাহার উল্লাস! অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ভারত সে উল্লাসধ্বনিতে সুর মিলাইতেছে, কিন্তু ব্যর্থ আশাহত ক্ষীণ করুণ সেই সুর।

সেই তেমনি দিনে সুখলতা কলেজে পড়িত। অনাগত ভবিষ্যতের রঙীণ স্বপ্নে বিভোর তরুণী সুখলতা দেশ বা

কালের চিন্তা তখন করিত না—ভাবিত কেবল আপন ভবিষ্যত!

প্রফেসারগণের মন্তব্য কানে যাইত Her future is very bright. Highly intelligent girl—ইত্যাদি।

মুগ্ধ ভক্ত ছাত্র ও সহপাঠিগণের সরব ও নীরব স্তুতি। সহপাঠিগণের ঈর্ষা ও প্রশংসা তাহার দিবারাত্রকে যেন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহস্থঘরের কন্যা সে। পিতা মার্চেন্ট অফিসে সামান্য চাকুরে। বড় ভাইটি আই-এ ফেল করিয়া একটি চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অপর ভাই ও বোনটি নিতান্ত ছোট, স্কুলে পড়িতেছে। তাহাদের মাঝে অসাধারণ হইয়া যেন সুখলতা আসিয়াছিল। যেমন তাহার রূপ, তেমনি তাহার বুদ্ধি। পিতামাতা বোধ করি সেইজন্য তাহাকে অধিক স্নেহ যত্ন করিতেন এবং হয়ত প্রশ্রয়ও দিতেন। ভ্রাতা ভগ্নাগণও তাহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। সুখলতা জীবনে কোনও দিন সেকেণ্ড হয় নাই। একে একে প্রতিক্লাশে অজস্র পারিতোষিক লাভ করিয়া ফার্ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ম্যাট্রিকে যখন সে stand করিয়া প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে স্থান পাইল তখন তাহার আশা, কল্পনা সীমা ছাড়াইয়া ছুটিয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের আশা ও আনন্দের সীমা নাই।

আই-এস্‌সিতে সুখলতা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ফিজিক্স অনার্স লইয়া বি-এস-সি পড়িতে সুরু করিল। সায়েন্স তাহার ভাল লাগে। তাই ম্যাট্রিকে অঙ্ক শাস্ত্রে উচ্চ নম্বর পাইয়া সে আই-এস সি পড়িতে মনস্থ করে। তখনকার দিনে সায়েন্সে মেয়ের সংখ্যা থাকিত নগণ্য। বিশেষ করিয়া সেইজন্য সুখলতা সায়ান্স লইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে পদার্থ বিজ্ঞান যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সৃষ্টির এক বিশাল রহস্য যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। কত নূতন তথ্য ইহার অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এক একজন মণীষী তাঁহার আজীবনব্যাপী সাধন দ্বারা এক একটি রহস্যের দুয়ার খুলিয়াছেন। অনুমানকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আজীবনব্যাপী জ্ঞানপিপাসাকে কথঞ্চিত পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

সাধারণ মানব তাহার সুবিধা, তাহার শুভফল গ্রহণ করে, কিন্তু সুযোগদাতাগণকে দিনান্তে একবার স্মরণ করিতেও ভুলিয়া যায়। তা যাক্। সেই সাধকগণ নিন্দা সুখ্যাতিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আপন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। একের পর আর একজন আসিয়া আরব্ধ কর্ম্মকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক রহস্য, এই আলোকতত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য লোকচক্ষে আনিয়া ধরিয়াছেন। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎজ, ব্রাঁলি, স্যার জগদীশ, অলিভার, লজ, সংখ্যাতীত নীরব সাধক মণীষীগণ। পড়িতে পড়িতে সুখলতার মনে হয় আমিও ওই রকম হইব। গবেষণা করিব, নূতন বৈদ্যুতিক শক্তির তথ্য আবিষ্কার করিব। হায় রে, আশা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ তরুণ জীবন। একাগ্রচিত্তে গভীর অভিনিবেশে সুখলতা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির প্রতিভায় প্রফেসারগণও বিস্মিত হইলেন। সকল ছাত্র ছাত্রী অনুমান করিতে লাগিল যে এবারও প্রতিযোগিতায় সুখলতা প্রথম হইবে। আঃ, সেই সকল দিনগুলি!

৩

সকলের আনন্দ ভনন্দন কোলাহল উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইতে সেদিন বেশ একটু বিলম্ব হইয়াছিল। এম-এস সি ক্লাসের প্রথম দিন। সুখলতা আসিয়া যখন ট্রাম ধরিল তখনও তাহার মাথাটা যেন গরম হইয়া আছে। আনন্দে সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ। অবশেষে প্রথম হইয়াছে? তাহার ছাত্রজীবনের সকল কামনা। সেইদিনই রজতের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। সে সময়টা ট্রামে অত্যন্ত ভীড়। আনন্দ পরিপূর্ণ আপনচিন্তায় নিমগ্ন সুখলতা। অত লক্ষ্য না করিয়াই এই ট্রামে উঠিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া যখন দেখিল ভীড়—স্থান নাই, তখন ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াছে, নামিতে পারিল না। সুখলতা একপাশে দাঁড়াইল। একটু পরেই রজত তাহাকে ডাকিয়াছিল, কথাগুলো, যেন এখনও কানে আসিয়া বাজে, "আপনি যদি কষ্ট করে একটু এগিয়ে আসতে পারেন তবে এখানে একটু জায়গা হতে পারবে।" অপরিচিতের আহ্বানে বিরক্ত সুখলতা মুখ তুলিয়া আহ্বানকারীর পানে চাহিতেই তাহার মন যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুবেশ সুদর্শন রজত হাসিভরা আগ্রহপূর্ণ আঁখি তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে।

সুখলতা ধন্যবাদ জানাইয়া কোনক্রমে অগ্রসর হইয়া গেল। বসিবার স্থান দিয়া রজত নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিল "Congratulations" বিজ্ঞান কলেজের দুর্লভছাত্রী আপনি। আপনাকে আনন্দ জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।

সুখলতার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোনও মতে কহিল "বহু ধন্যবাদ।"

রজত তাহার নিজের পরিচয় দিল তাহার নাম রজত রায়। সম্প্রতি সে বিজ্ঞান কলেজে electro magnetic theoryর পার্টটাইম লেকচারার।

এতক্ষণে সুখলতা সাগ্রহদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "আপনি? আপনি আমায় আনন্দ জানাচ্ছেন? আপনার মত এম-এসসির রেজাল্ট, ইউনিভার্সিটির কেরিয়ার। সে আমাদের মত যে কোনও ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কামনার বস্তু।"

আপনি এখন বসু বিজ্ঞানমন্দিরে উদ্ভিদবিজ্ঞান রিসার্চ করছেন শুনেছিলুম। আচ্ছা আপনি দুটো ডিফারেণ্ট সাবজেক্টে কি করে রেকর্ড রেখে ফাষ্ট হলেন?

সুখলতার উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে রজত হাসিল। মৃদু হাস্যধ্বনি এখনও যেন কর্ণে ধ্বনিত হয়। রজত উত্তরে বলিয়াছিল "তাহলে গুণগ্রাহী হিসাবে আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। হ্যাঁ উপস্থিত আমি রিসার্চ বন্ধ করে কলেজে পার্ট-টাইম কাজ করছি এবং ফাইন্যান্স সার্ভিসের জন্য তৈরি হচ্ছি। কাজেই এখন ভাবি—যে বিদ্যাকে জীবনে সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারলুম না, তাতে ফাষ্ট সেকেণ্ড হওয়াটা অর্থহীন।"

সুখলতা বুঝিল তাহার প্রশংসা ইহার কোনও গোপন ব্যথায় ঘা দিয়াছে। অপ্রতিভ হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

রজত প্রসঙ্গটি সহজ করিয়া কহিল "জানেন? বাড়ীর লোকেরা যখন দেখলেন যে দুটো সাবজেক্টে প্রথম হলুম, তখন তাঁদের ইচ্ছা হল যে দেখা যাক ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে ছেলেটা ফার্ষ্ট হতে পারে কিনা। তাঁদের ইচ্ছাপূর্ণ করতে গিয়ে আমার ইচ্ছা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেল। অর্থাৎ কিনা আদর্শপুত্র হতে চেষ্টা করলাম।" বলিয়া সে হাসিল। এবারকার হাসিতে আনন্দের উচ্ছলতা নাই, ব্যথিত হাসি। সুখলতা সহানুভূতির দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়াছিল।

তাহার পর কলেজে, ক্লাশে, করিডোরে, দৃষ্টি বিনিময়, হাসি, দুই চারিটি বাক্য বিনিময়। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইতে লাগিল। সেই সব দিনগুলি? বাহিরে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। মেঘভারে সমস্ত আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসিয়া নদীর এপার হইতে ওপার যেন অনাবৃত করিয়া দিতেছে। মিসেস সিং আপনার অজ্ঞাতসারেই চোখের উপর হাত ঢাকা দিলেন। সে সুখস্বপ্নে মনটা নিবিড়ভাবে ডুবিয়া গিয়াছে তাহা যেন এমনি ভাঙ্গিয়া না যায়। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, তাহার প্রবল শব্দে পৃথিবীর আর সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বসিয়া পৃথিবীর একটি প্রাণী তাহার জীবনের বিষামৃত একাকী মোহভরে পান করিতেছে। আহা সেইসব আনন্দ পরিপূর্ণ দিনগুলি! কত আলাপে, কত আলোচনায়, কত অর্থ-হীন গুঞ্জনে, দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া চিন্তাহীন লঘু দিনগুলি যেন উড়িয়া গিয়াছে। সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই কলিকাতা নগরী—আজো কি তাহা তেমনি আছে?

তাহারপর ধীরে ধীরে একদিন উভয়ের মনের গোপন কামনা প্রকাশ হইয়া গেল। অসহ্য আনন্দব্যাকুল সেই মুহূর্ত্ত। অত্যধিক সুখাবেগে বোধকরি নয়নের অশ্রু বাধা মানে না? তাই রজতের বলিষ্ঠবাহুর বন্ধনে উত্তপ্ত বক্ষের সান্নিধ্যে সুখলতা কাঁদিয়াছিল। সেই তৃষিত ওষ্ঠের গাঢ় উষ্ণ স্পর্শ আজো যে সুখলতা অসীম ঘৃণাভরেও ভুলিতে পারে না? তাহার সমস্ত দেহ মনে আজো যে সেই নিবিড় সোহাগ স্পর্শের স্মৃতি উদ্বেল করিয়া তোলে?

যেন রঙ্গীণ স্বপ্নে সেই দিনগুলি কাটিয়াছে! ছুটির দিনে বোট্যানিক্যাল গার্ডেন ঘুরিয়াছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখনীড়ের রচনার গল্পে সময় কাটিয়াছে। আবার কলেজ আওয়ারে সাধনার সহিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। পড়াতে রজতের কি আগ্রহ কি উৎসাহ। অথচ মনোনিবেশে সুখলতা পড়িতেছিল। ষ্টেট্ স্কলারশিপ সে লইবেই। কে জানে—তাহার জীবনেও মাদাম কুরী বা ইভাঙ্গ কুরীর ন্যায় সাফল্য আসিবে কিনা?

৪

রজত ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়াছে কয়মাস। আসিয়াই কলেজে অস্থায়ী কর্ম্মটি গ্রহণ করিয়াছিল। রজত ফেল

করিয়াছিল viva voceতে। অন্যান্য বিষয়ে উচ্চনম্বর পাইয়াও সে ব্যর্থ হইয়াছে। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। রজতের মনেও আঘাতটা একটু বেশীরকম বাজিয়া তাহাকে এই পরীক্ষায় সফল হইতে দৃঢ়কাম করিয়া তুলিল।

রজত কলেজের চাকুরী ছাড়িল। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী।

সুখলতা বলিয়াছিল "এক্সপেরিমেন্টের সময় তোমার অভাবটা আমাকে বেশী লাগবে। তা হোক, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কর।"

রজত বলিয়াছিল "তোমায় ছেড়ে যেতে কষ্ট কি রকম হবে সেটা তুমি নিজেকে দিয়ে অনুভব করছ বোধহয়। তবু কর্ত্তব্য আগে। আমি না থাকলে তোমার এক্সপেরিমেন্ট, একাগ্রতায় আরো ভাল হবে। আর তা ছাড়া সু, তোমাকে শীঘ্র কাছে পেতে হলে আমার তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তো প্রয়োজন ?"

সুখলতা ও রজতের পিতামাতার নিকট তাহাদের প্রণয়ের বার্ত্তা অবিদিত ছিল না। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে সুখলতা এম-এসসি পাশ করিলেই ইহাদের বিবাহ হইবে। ইহারাও সেকথা জানিত।

সুখলতা গভীর বিশ্বাসের সহিত ভাবিত, রজত তাহার স্বামী। তাহার কুমারী হৃদয়ের প্রথম প্রণয় একান্তভাবে রজতকে নির্ভর করিয়া বাড়িতেছিল। রজতের প্রতি চাহিলে তাহার হৃদয় গভীর আনন্দরসে সিক্ত হইয়া যাইত। তাহার হৃদয় যেন চিরন্তন রজতের মঙ্গল কামনা করিত। ইহা তাহার নারীত্বের স্ফুরণ। নারীর নারীত্ব, শুধু প্রেম, শুধু স্নেহ দিয়া পরিপূর্ণ। অন্ধ আবেগে ভরা।

প্রেমের পূজায় জ্ঞান বিদ্যা যুক্তি তর্ক অর্থহীন। সে পূজার নির্ম্মাল্য ভক্তি ও ভালবাসা। তরুণী সুখলতা তাহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়খানি নিঃশেষে রজতকে সমর্পণ করিয়াছিল।

সুন্দরী সুখলতার স্তাবক ভক্ত মিলিয়াছিল প্রচুর। তাহার একনিষ্ঠ হৃদয় কাহারোও পানে চাহিয়া দেখে নাই।

ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া গেল। সুখলতার একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নের বিরাম নাই।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠায় দিন কাটিতে লাগিল। খবর বাহির হইলে জানা গেল। সুখলতা উচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছে। কি সে আনন্দভরা দিন। আনন্দ অভিনন্দন আশীর্ব্বাদ প্রশংসার স্রোতের বিরাম ছিল না। তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত আশা সফল হইয়াছে। সে স্কলারসিপ পাইবে। তাহার পর বিবাহ ও দুইজনে মিলিয়া বিলাত যাইবে। তাহাদের স্বপ্ন দিয়া রচিত ইংল্যাণ্ড।

রজত তখন দিল্লীতে। তাহাকে সব খবর দিয়া সুখলতা পত্র দিল।

উত্তরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ জানাইয়া প্রথমে টেলিগ্রাম ও পরে পত্র আসিল। বহু আনন্দ জানাইয়া আশায় দিয়া যে পত্র আসিল তাহার শেষদিকে রজত লিখিয়াছিল। "সু, এবার তুমি ইংল্যাণ্ডে যাবে। যে মাটিতে তুমি আছ সেই মাটিতে আমিও রয়েছি। এ দূরত্ব বোধ হয় না, কেন না ট্রেণে চড়লেই তো তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাবো। কিন্তু তুমি বহু দূরে যাবে মনে করলে মনটা অস্থির হয়। তা হক, আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তুমি তোমার শিক্ষা সমাপ্ত কর ও সুখী হও।"

মাতা একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন "জানিস সুখ, তোর শাশুড়ীর আর তর সইছে না—সে আমাকেও যেমন তাড়া দিচ্ছে তেমনি নিজেও বরণডালা সাজাতে বসে গেছে।"

সুখলতা সলজ্জ হাস্যে কহিল "তোমারও তো তাতে কম উৎসাহ নেই মা ?"

মা বলিলেন "তা সত্যি বলতে কি, আমার ইচ্ছেও কম নয়। মেয়ে বড় হলে কি কম চিন্তা ? তবে তোমার মত মেয়ে ভাগ্যে পেয়েছিলাম, তাই আজ পাত্রপক্ষ বিয়ের জন্যে নিজে থেকে সাধছে। মা গর্ব্বভরে হাসিলেন।

সুখলতা হাসিল, বলিল "কিন্তু ওঁরাও খুব ভাল মা, কেন না ওঁদের ছেলে তো মেয়ের চাইতে খাটো নয়।"

মা ব্যস্ত কণ্ঠে কহিলেন "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার রজতের মত পাত্র বহু ভাগ্যে বহু আরাধনায় মেলে। সে কথা একশো বার। না রে আমি ঠাট্টা করছিলুম। তবে রজতের বাপ মা বিয়ের জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। এই কদিনে পাকাপাকি করে বোধ হয় অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করবেন।"

সুখলতা নীরবে শুনিল। গভীর সুখাবেশে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রজত ? তাহার রজত

এইবার নিকটতম হইবে। তাহাদের হৃদয় বহুদিন এক হইয়াছে, এইবার সামাজিক বাঁধন তাহাকে দৃঢ় করিবে—স্থাপিত করিবে লোকচক্ষে। হেমন্তের এক কুহেলী আবৃত সন্ধ্যা অপেক্ষা করিয়া আছে তাহাদের জন্য। তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবে তাহা সার্থক হইবে। তাহার পর জায়া, জননী, গৃহিণী। কিন্তু ? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—জননী হইবার পূর্ব্বে সে নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক হইবে। বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক। তাহার জীবনের চরম কামনা। মনের তৌলদণ্ডে ওজন করিলে একদিকে রজত, একদিকে বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা।

বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে। রজতও গিয়াছিল। তাহার পর সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ইউরোপ ভ্রমণ সারিয়া দেশে ফিরিবে। কি সে সুখের দিন! কি সে আনন্দময় জীবন!

প্রফেসারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্ঞাতব্য তথ্য জানিয়া লইয়া এ্যাপ্লাই করিল। D. P. I. এর সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিল। হায় নিজের মৃত্যুশয্যা আপন হস্তে রচিত করিয়াছিল সেইদিন।

ইতিমধ্যে পরীক্ষা শেষে রজত দেশে ফিরিল। রজতের মাতা ভগ্নী তাহাদের বাটি আসিতে লাগিলেন। পিতায় পিতায় গোপনে পরামর্শ হইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দুই বাটির মাতাদ্বয় কাপড় জামা গহনার অর্ডার লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

আর রজত ? হাসি খুশী কোলাহলের ফাঁকে তাহাকে নির্জ্জনে দেখিলেই মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া গাহিত "ওগো প্রিয়া, নিতি আসি তব দ্বারে"… …

আরক্ত হইয়া লজ্জিত কণ্ঠে সুখলতা বলিত, "আঃ কেউ শুনতে পাবে যে ?"

"শুনতে পেলেই বা ? তুমি কি আমার প্রিয়া নও ?" রজতের মৃদু কণ্ঠে কৌতুক উচ্ছল হইয়া উঠিত।

"তাই বলে চেঁচিয়ে"……লজ্জায় সুখলতার বাক্য অর্দ্ধ পথে থামিয়া যাইত। বলিত "নাম করে ডাকতে পার না যেন ?"

আবেগবিহ্বল অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে চাহিয়া রজত বলিত "নাম ? ওই একটাই তো তোমার নাম ? প্রিয়া, প্রিয়া, আমার চিরকালের অন্তহীন জীবনের একমাত্র প্রিয়া।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

'দেহ মনের' গঠন ও উৎকর্ষ সাধন

ডাঃ শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-বি

প্রসবকালে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সাধারণতঃ সে ক্রন্দন করে। এই প্রথায় সে প্রথম শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিবার অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ফুলটী (placenta) জঠর হইতে পৃথক হওয়ায় অম্লজান বাষ্পের অভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ বহিস্থ শীতল বায়ু চর্ম্মে লাগিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রক্রিয়া করে।

জীবনের প্রারম্ভ মুহূর্ত্ত হইতেই এই দেহের অভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা আমরা উপলব্ধি করি, উহা আমাদিগের উপর সারাজীবনই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

এই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের পর হইতেই দেহের কার্য্যের বিকাশ ক্রমন্তরে ঘটিয়া ক্রমে শিশুটী পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে দেহের মধ্যে ও বাহিরে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন, গঠন ও সংবর্দ্ধন ঘটে। অবশ্য প্রয়োজনীয় মনের গঠনও দেহের গঠনের ন্যায় ক্রমস্তরে গড়িয়া উঠে। জীবনের অন্ত হইলেই উহাকে মৃত্যু বলে। শ্বাসপ্রশ্বাস মৃতের থাকে না। মনের সত্ত্বা আর জীবনের লক্ষণও অপসারিত হয়। শিশুকাল হইতে পূর্ণযৌবনাবস্থায় পৌছাইবার কাল অবধি দেহ ও মনের সংবর্দ্ধন হইতে থাকে। দেহের পরিবর্ত্তন অবশ্য সারাজীবনই চলিতে থাকে।

অতি শিশুকালে ক্ষুধা পাইলে শিশু ক্রন্দনরূপে ঐ বেদনা ব্যক্ত করে। ক্রমে ক্ষুধা ও মলমূত্রত্যাগ ও অস্বচ্ছন্দতা ইত্যাদির অনুভূতি হয়। ক্রন্দন ও তৎসহ হস্তপদাদি অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রমে পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে ক্ষুধার লিপ্সা, আনন্দে হাস্ত দর্শনের অভিলাষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের পরিলক্ষণ পরিস্ফুটিত হয়। ক্রমে প্রয়োজন হেতু বাসনা, উহা হইতে অনুভূত সুখের লিপ্সা, বেদনায় বিরক্তি ও আপত্তি প্রকাশ করে।

বাসনা কল্পনায় পরিণত হয়। কল্পনাকে সফল করিতে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম চিন্তা ও কার্য্য কৌশল অবলম্বন করে। কাজেই দেখা যায়, শরীর ও মন স্তরে স্তরে উভয়েই উভয়কে উৎকর্ষের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব অবধি দেহ কেবল গঠন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে। মনটি চাঞ্চল্যপরিপূর্ণ থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে মনটি অধিক চঞ্চল হয়—তাহার কারণ দেহে নানাপ্রকার কার্য্য হইতে থাকে, উহা মনটিকে অজানা সুখের পথে পরিধাবিত করে। এই পরিধাবন অবশ্য স্বাভাবিক হইলেও, বিভিন্ন ব্যক্তির ও নরনারীর মধ্যে বহু পার্থক্যের লক্ষণ দেখা যায়। দেহের এতদবস্থায় একমাত্র গঠন-মূলক কার্য্য সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হইলেও শিক্ষা সংযম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠনমূলকের সাথে আবার ধ্বংসমূলক কার্য্যের সূচনা আরম্ভ হয়। দেহের গঠনমূলক কার্য্য পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থা অবধি সংসাধিত হওয়াই নীতি, এই অনুযায়ী ধ্বংসমূলক কার্য্য অপরিমিত হইলে দেহের পূর্ণ গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মনটি যৌবনের প্রারম্ভ কাল হইতে সুখপ্রিয়, অভিলাষী ও অনুসন্ধিৎসুতার পরিচয় দেয়, উহাও প্রয়োজনের দায়ে। দেহের পূর্ণ গঠনের পরে মনের চাঞ্চল্য স্থিরীভূত হয়, তাই পূর্ণপ্রাপ্ত বয়স হইতে প্রৌঢ়কালের মধ্যেই স্থির চিন্তাশক্তির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্দ্ধক্য অবধি স্থির ধীর বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ হইলেও, দেহের কার্য্য যখন ক্রমে অধোমার্গে ধাবিত হয় তখন স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি কমিতে থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে বার্দ্ধক্যকাল অবধি মানসিক শক্তির বিকাশ অধিকতর হয় বলিয়া যৌবনের প্রারম্ভজীবনের কার্য্যকরণ অবস্থার উপর ভবিষ্যত জীবনে মানসিক স্ফুরণ নির্ভর করে। প্রবৃত্তি মার্গের পরিবর্ত্তন ও দেহের বিকার এই জীবনের পিচ্ছিল সঙ্গম স্থলে অসংযত বা সংযত ভাবে চলার উপর নির্ভর করে।(১) প্রাকৃতিক, স্বভাবীয় প্রাণিকুলের কার্য্যাবলী সুবুদ্ধিমান মানব ঘৃণাসহকারে বর্জ্জন অভিলাষে জ্ঞানকল্পিত দেববাঞ্ছিত নিয়ম-কানুন পালনে সমর্থ হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।(১) ধর্ম্মের সমর্থন অতি নিম্নতর প্রাণীদিগের মধ্যেও বিচার করিলে বর্ত্তমান দেখা যায়। মানব স্বভাবের নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া পাশবিক যে হিংস্রভাবের উদয় হয়—উহাকে দমন করিবার জন্ম ধর্ম্মনীতি গঠন করেন। ধর্ম্মনীতি, সমাজ ও শাসন নীতির ভিত্তিস্থাপন করে। সমাজ ও শাসননীতি গঠন করিবার উদ্দেশে পাপতত্ত্বের উদয় হয়। পাপতত্ত্ব, অবাঞ্ছনীয় পশুভাবের বিরোধ আনিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। পাপশূন্য হইতে হইলে সংযম শিক্ষা প্রয়োজন। মানব বিচার ও শিক্ষার দ্বারা পশুভাব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কি একেবারে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য উপেক্ষা করিতে পারে? ইহাই সমাজ শিক্ষার সমস্যা। স্বভাবের স্ফুরণ বজায় রাখিয়া সংযম, মানব সমাজের ইহাই লক্ষ্য। বিভিন্ন সমাজ তাহাদের শিক্ষা, ধর্ম্ম, দীক্ষা আবহমান কালের প্রচলন অনুযায়ী চলে ও ক্রমে চেষ্টা ও যত্ন অনুযায়ী ক্রমস্তরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়।

হিন্দু সমাজের, উচ্চ ধর্ম্ম ও সমাজনীতিগুলি জগৎ মধ্যে আদর্শ হইলেও উহাদের পূর্ণ বিকাশ কোনও জাতির মধ্যে এখন দেখা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় মণীষীগণের মধ্যে অনেকেই উহা সুপ্রথা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও উহার নীতি এত কঠোর যে অপর কোন জাতি উহা গ্রহণ করিয়া পালন করিতে অক্ষম।(২) হিন্দুরাও এখন উহা পালন করিতে অক্ষম। কোনও ভাষা প্রচলন অভাবে লুপ্তপ্রায় হইলে যেমন উহার চর্চ্চায় সুফল ও সুযশ পাওয়া কঠিন হয় সেইরূপ আমাদিগেরও ধর্ম্ম আলোচনা সুফলপ্রদায়িনী বলিয়া এখন আর মনে হয় না।(৩)

হিন্দুদিগের ধর্ম্মসাধনপ্রণালী কেবল কুসংস্কারপূর্ণ কঠোর সমাজ-নীতি বা নিয়মস্তরের কুসংস্কারপূর্ণ পূজাপাঠ ভাবিলেই চলিবে না। ধর্ম্ম-সাধনপ্রণালীর দ্বারা দেহ ও মনের গঠন হয়। উহা স্বভাবিক নিয়মের পন্থায়। সাধনে দেহের অপেক্ষা মনের শক্তি ও ঈশ্বর জ্ঞানের অধিক বিকাশ হয়।(৪) যৌন ব্যাধিই অধিকতর দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক। হিন্দুপদ্ধতি উহার প্রতিবন্ধক। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া স্নায়ুগুলিকে সচেতন করিয়া দেহের কার্য্য কমাইয়া ও বিশ্রাম দিয়া মনের একাগ্র চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়।(৫) ধর্ম্মপন্থার সাধন করিলে উহার চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ পথই যোগসাধন মার্গ।(৬) যোগ সাধনায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ বুঝা যায়।(৩) ইহাই দেহের নিরাময় শক্তি অর্জ্জন ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির পন্থা। মনের স্থৈর্য্য ও শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। যোগসাধনই একমাত্র দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থা।(৬)

মানব জগতে বিজেতা হয়—মনের শক্তি প্রভাবে(২) শারীরিক বলে সর্ব্বদা আধুনিক যুগে উহা সম্ভব হয় না। আত্মসংযম না করিলে সমাজ ও শাসন বিশৃঙ্খল ব্যক্তিকে সমাজে বাস করিতে দিবে না(১)। মানব নিজ সংযম শক্তির প্রভাবে সমাজে স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিয়া, নিজস্বাধীনতা ও সম্মান অর্জ্জন করেন। যিনি যত সংযত, শক্তিসম্পন্ন ও পরহিতৈষী, সভ্য সমাজ তাঁহার তত সমাদর করে। সভ্যতার চরম শীর্ষে কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ—যাহার দ্বারা মানব পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য বৈষয়িক জগৎ মানে না বলিয়া সভ্য হিন্দু জাতিও কি তাহাদের আদিম সভ্যতা ত্যাগ করিবে? অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে কি হিংসা নীতি টিকিবে।' হিন্দুর গভীর মাঙ্গলিক নীতিমূলক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ধরিয়া—দেহমনের গঠন করিলে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে নীতির প্রভাব প্রকাশ পাইবে(১)।

যোগ সাধনায় দেহের উপর মনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা জন্মে, ক্রমে—মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়—উহা হইতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হেতু দেহ ও মন উভয়েই স্বীয় অধীনস্থ হয়। অধীনস্থ দেহ ও মন—সংযম সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারে। সংযমই মনের অলৌকিক শক্তির কারণ।(৪)

বাল্যকাল হইতে শারীরিক পরিশ্রম করিলে অবশ্যই দেহের গঠন নিরাময় হয় ও সুস্থকায় হওয়া যায়।(৩) শ্রমজীবীদিগের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।(৭) ছাত্রদিগের যৌবনের

প্রারম্ভকালে কঠোর ব্যায়াম চর্চা আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রাপ্ত যৌবনে যদি সম্ভব হয় ক্রমশঃরে লঘু ব্যায়াম হিতকর এবং উহাতে বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরণে বাধা দেয় না। শিশুকাল হইতে কঠোর ব্যায়ামে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণে বাধা পাইতে পারে। অধিক ও কঠোর ব্যায়াম, সারা জীবন একাধারে চালান সম্ভব নহে। মস্তিষ্কের চালনা করিয়া যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাদের অবশ্যই মধ্য বয়সের পরে ব্যায়াম চর্চ্চা ছাড়িতে হয় ও ছাড়িলে যকৃৎ ও উদরের প্রক্রিয়া উত্তমভাবে না হওয়ায়—বাত, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়।(২) অধিক পরিশ্রম করিলে, তদনুরূপ পুষ্টিকর আহার ও বিশ্রাম না করিলে দেহের ক্ষয় ও মনের দৌর্ব্বল্য অবশ্যই আসে। কঠোর ব্যায়ামে পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। পরাধীনতার পেষণে মধ্যবিত্ত লোক আজ প্রায় নিরন্ন। পুষ্টিকর আহার ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক এতদুভয়ের অধিক পরিশ্রমই ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। অলস ব্যক্তির অধিক মানসিক পরিশ্রমে শরীর সুস্থ রাখা সম্ভবপর হয়। দ্রুত ভ্রমণাদি লঘু ব্যায়ামের প্রয়োজন। অধিক মানসিক চিন্তার পর মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন। অধিক চিন্তায় চিত্তবিকারগ্রস্ত হয়, তাই উদ্বেগ, অনিদ্রাদি হইতে উদরের ও স্নায়বিক ব্যাধি কখনও কখনও হৃদযন্ত্র ও ধমনীগুলিতে বিকৃতি লক্ষণ ঘটিয়া অধিক রক্তের চাপজনিত ব্যাধি আদির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যোগসাধন মার্গে কিন্তু দেহ ও মনের একাধারে উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই পন্থায় ইচ্ছা অনুযায়ী দেহ ও মনের শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা যায়, ও তদধিক বিশ্রাম উপভোগ করা যায়।

শিক্ষা পাইলে অনেকের পক্ষেই যোগসাধনা করা সম্ভব হয়। নিত্য অল্পক্ষণ সাধন করিলে শরীর ও মনের যথেষ্ট মঙ্গল হয়। বিষয়টি গোপনীয় রাখা যে ঠিক দোষণীয় তাহাও বলা চলে না। কারণ শিল্প পণ্য প্রস্তুত প্রণালী, ব্যবসার গূঢ়তত্ত্ব ইত্যাদি যদি গোপন রাখা ন্যায্য হয়, তবে এই তত্ত্বোৎকর্ষক পরাবিদ্যার গোপনতা দোষনীয় ?

তবে বিদ্যাটি লুপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

References :

(1) The Journal of the Indian Medical Association, Calcutta Vol XIII no 3 Page 77 (Dec 1943)

(2) The Journal of Ayurveda, Cal Vol III Pages, 98, 306,375 ; Vol XV Page 46, 287 (1936 39)

(3) The chikitsa Jagat, Calcutta, Vol XV no 7 Page 147 (May 1944) Baisakh Bs 1351

(4) The Indian Medical Record Calcutta Vol LXIII no 4 Page 101 ; no 8, P 199 (1944)

(5) The Health, Madras, Vol XXI no 5 Page 98 (May 1943)

(6) The Bharatvarsha, Calcutta Vol XXXII no 1 Page 57 (Asarh Bs 1351)

(7) The Calcutta Municipal Gazette, Cal Vol XLI no 10, Page 298 ; (27th Jounary 1945)

পথ

"ভাস্কর"

১

এ স্থানটা এতদিন ছিল একটা শালবন।

কিছুদিন হইতে এ স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বড় একটা রাস্তা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বড় বড় গাছ কাটিয়া সরাইয়া ফেলা হইতেছে। উঁচু নীচু স্থানগুলিকে কাটিয়া ও মাটি ভরিয়া সমান করা হইতেছে। বহু দূর হইতে লরী বোঝাই ইট, খোয়া, পাথরকুচি আরও কত কি আসিতেছে। গোটা দুই প্রকাণ্ড রোলার এক স্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এক দল ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়র ও অন্যান্য কর্মচারী সর্বদা ঘোরাফেরা করিতেছে।

যেখানে পথ ছিল না, সেখানে পথ হইতেছে। যেখানে কখনও কোন মানুষ যাতায়াত করে নাই, সেখানে বহু লোক যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। অজ্ঞাত স্থানটি সহসা অতিকায় হইয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। নির্জন বনস্থল কলরবমুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এপাশে ওপাশে কয়েকটি তাঁবু পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বাস করেন কয়েকটি কর্মচারী, আর মজুত থাকে নানাপ্রকার কাগজপত্র আর যন্ত্রপাতি। কয়েকটি টিউব-ওয়েল বসান হইয়াছে প্রয়োজনীয় জলের জন্য।

প্রকৃত পরিশ্রমের কাজ যাহারা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে আছে পুরুষ, আছে নারী, আছে বালকবালিকা। ইট বহা, মাটি কাটা, জল

তোলা, গাছ কাটা, রোলার টানা প্রভৃতি কত রকমের কত কাজ। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু পুরুষ ও বহু নারী মিলিয়া নিজেদের শরীরের সকল শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে এই পথ। এই পথে নরনারী গমন করিবে, বালক-বালিকা গমন করিবে, গরুর গাড়ী, রিকশ, মোটর গাড়ী চলিবে। কত দ্রব্য দূর হইতে দূরান্তরে যাইবে এই পথের উপর দিয়া। কেহ যাইবে ধীরে, কেহ যাইবে দ্রুতগতিতে। কেহ যাইবে নিকটে, কেহ যাইবে দূরে। কত অপরিচিতের সঙ্গে কত অপরিচিতের সাক্ষাৎ হইবে ক্ষণেকের জন্য। এই পথ বাহিয়া কেহ যাইবে আনন্দের গান গাহিতে গাহিতে, আবার কেহ যাইবে করুণ বিলাপ করিতে করিতে। এই পৃথিবীর, এই সমাজের কত সুখ, কত দুঃখ বহিয়া যাইবে, ভাসিয়া যাইবে এই পথের বুকের উপর দিয়া।

এই নূতন পথের কাজে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আছে একটি ক্ষুদ্র পরিবার—রামু, রামুর মাতা, আর রামুর স্ত্রী শোভা। রামুর শরীরটা যেন মানুষের শরীর নয়, কাল পাথরের মূর্তি যেন। নিকষ কাল পেশী-বহুল সুস্থ সবল যৌবনদীপ্ত দেহখানির দিকে যাহারই দৃষ্টি পড়ে সেই তাকাইয়া থাকে। কাজ করে অসুরের মত। তাহারই মত অন্য শ্রমিকেরা যে কাজ করে একদিনে, রামু তাহা শেষ করে একবেলায়। বেশী কাজ করিতে পারে বলিয়া তাহার আয়ও বেশী। পুত্রের দিকে চাহিয়া মাতার বুক আনন্দে ভরিয়া ওঠে। স্বামীর দিকে চাহিয়া শোভার মন গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়। রামুর মনিবরা তাহাকে ভালবাসে, সহকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, হয়তো মনে মনে একটু হিংসাও করে।

পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামুদের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে থাকে। দিনের পর দিন ক্রমশ যেমন প্রশস্ত পথটির স্বকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি রামুদের কুটীরখানিও ক্রমশ শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। গৃহখানি বেশ ভাল করিয়া পুনর্নির্মিত হইয়াছে। চারিদিকে একটা বেড়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ফুল গাছও রোপণ করা হইয়াছে। প্রকৃতির শোভা, কুটিরের শোভা একত্রিত হইয়া শোভার সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। নূতন পথ হইতে বেশী দূরে নয়। ছোট একটি পল্লী। প্রায় সকলেই এই পথে কোন না কোন কাজ করে। সকলেরই অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু স্বচ্ছল হইয়াছে। তবু রামুই যেন এদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী।

শোভার কুটীরের শোভা বর্ধন করিতে নূতন অতিথির আগমন-সম্ভাবনা হইয়াছে। রামুর উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে। শোভা কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। রামুর মা আনন্দে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া পুত্রবধূর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একটা আশা, একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ বাতাসে কুটীরখানির অন্তর ও বাহির ভরিয়া উঠিয়াছে।

২

সেদিন মাতা ও বধূ সারাদিন ধরিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়া নানাবিধ আহার্য প্রস্তুত করিয়াছে। স্থানীয় রীতি অনুসারে আজ তাহারা এবং তাহার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা একত্র বসিয়া প্রীতিভোজন করিবে, আর অনাগত মানুষটিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিবে।

রামু কর্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিল একটু যেন বিষণ্ণমুখে। সে নিজে যথাসাধ্য তাহার বিষণ্ণতা ও অবসাদ চাপিয়া রাখিল। শোভা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও সে জানাইল, ও কিছু না। এমনি।

ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র উৎসব শেষ হইয়াছে। রামুকে একান্তে পাইয়াই শোভা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে তোমার?

বিশেষ কিছু না। শরীরটা তেমন ভাল নাই।

শোভা রামুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত গরম। সে বলিল, একি গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

হাঁ, জ্বর হয়েছে।

ইহার পরের সংবাদে নূতনত্ব কিছু নাই। কয়েক দিন খুব জ্বর হইল। ক্রমশ জ্বর কমিল, কিন্তু ছাড়িল না। অল্প গায়ে লইয়াই কাজ করিতে গেল। শরীরের পেশীগুলি যতদিন সহ্য করিতে পারিল, ততদিন কোনমতে কাজ চলিতে লাগিল। যখন অসুখ আরো বাঁকিয়া বসিল, তখন একদিন একখানি ইটের লরীতে বসিয়া সুদূর সহর হইতে একশিশি ঔষধ লইয়া আসিল। কিছুদিন চিকিৎসার প্রহসন চলিল। রামুর মা নিকটস্থ মন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে একটি মাদুলী আনিয়া উহার

হাতে বাঁধিয়া দিল। নিয়তি হাসিতে লাগিলেন। পাথরে কোঁদা নিকষ কাল অসুরের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে শীর্ণ হইতে লাগিল। বধূ উদ্বেগে আকুল হইয়া অসহায়ভাবে তথাকথিত করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের মিনতি জানাইল।

করুণাময় করুণা করিলেন না।

একদিন মাতা ও বধূর শত অনুনয় উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে গিয়া হঠাৎ রক্তবমি করিয়া পথের মাঝখানে একটি বালির ঝুড়ি সমেত পড়িয়া গেল রামু। আর উঠিল না।

মাতা আসিয়া উন্মাদিনীর মত পথের মাঝখানে "বাবা আমার" বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কুটীরে ফিরিয়া দেখিল, পাড়ার কতকগুলি মেয়ে পুরুষ জড় হইয়াছে তাহাদের আঙিনায়—গৃহের মধ্যে শোনা যাইতেছে নবাগত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন। আর মাতা! তিনি একটু পরে কাঁদিলেও কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।

৩

ইহার পরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া কাটিবার কথা, ঠিক তেমনি করিয়াই কাটিয়াছে। সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে, শাশুড়ী ও পুত্রবধূ কোন মতে তাহা দিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে, শিশুটিকে পালন করিয়াছে। রামুর মা পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। তাহার কথায় কাজে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে। ক্রমশ লোকে তাহাকে 'পাগলী' আখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামুর এক বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা সে শোভাকে বিবাহ করে। বহুদিন শোভা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু বন্ধু তথাপি বন্ধুত্ব অস্বীকার করে নাই। অভাবে অভিযোগে, অসুখে বিসুখে সর্বদাই সে প্রকৃত বন্ধুর মতই ব্যবহার করিয়াছে। শাশুড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা, শিশুর ভবিষ্যৎ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শোভা বিবাহে মত দিয়াছে। সর্ত এই যে বন্ধুকে রামুর বাড়ীতে আসিয়াই বাস করিতে হইবে এবং রামুর মাকেও 'মা' মনে করিতে হইবে। বন্ধু একসঙ্গে মাতা, বধূ ও পুত্র লাভ করিতে সানন্দে স্বীকার করিয়াছে। বিবাহের দিনও শোভা রামুর জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছে, বন্ধু সান্ত্বনা দিয়াছে, রাগ করে নাই। কুলীর বন্ধু তো।

রামুর মার অবস্থা ক্রমশই যেন খারাপ হইতে লাগিল। এখন প্রায় কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে। শোভা ও তাহার স্বামী অনেক কষ্টেই তাহাকে আগলাইয়া রাখে। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্নানাহারের কথাও মনে থাকে না। মাঝে মাঝে নূতন রাস্তার মাঝখানে, ঠিক যেখানটায় রামু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানটায় বসিয়া পড়ে, "বাবা আমার" বলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। এই সময়ে পথে যে সব গাড়ী চলে, কোনটি একটু থামিয়া যায়, কোনটি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, কোনটি হইতে কেহ হয়তো একটু 'আহা' বলিয়া সমবেদনা জানায়, কেহ বা দু একটা পয়সা ছুড়িয়া দিয়া যায়। যে সব গাড়ী সর্বদা এই পথে যাতায়াত করে, তাহারা এই পাগলীকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রাণের গভীরতম প্রদেশের যে ব্যথা তাহাকে আজ পাগল করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ইহাদের মনেও উদাস সহানুভূতি জাগে।

৪

সেদিন গাড়ীর খুব ভীড়। এই প্রকাণ্ড রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অসংখ্য গাড়ী—মোটর গাড়ী, লরী, মোটর বাস। সাইকেল, সাইকেল-রিকশ ও গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীরও অভাব নাই। নিকটেই কোথায় একটা মেলা বসিয়াছে। তাই এত যাত্রীসমাগম। বিবিধ পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া এবং বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ জনমণ্ডলী বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অগণিত যানবাহন।

পাগলী তাহার অভ্যাসমত রামুর শ্মশানতীর্থ সেই রাস্তার ঠিক সেইখানটায় আসিয়া আজও বসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে একা নয়। কোলে তাহার নাতি—রামুর পুত্র। কোন ফাঁকে শোভার অলক্ষিতে তাহার নয়নের মণিটি কোলে করিয়া পাগলী চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। রাস্তায় প্রায় সব গাড়ীগুলিই পাগলীকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

একবার একখানি লরী একখানি রিকশাকে বাঁচাইতে গিয়া একেবারে আসিয়া পড়িল পাগলীর গায়ের উপর।

যথাসাধ্য ব্রেক কষিয়াও গাড়ীর গতি রোধ করা গেল না। প্রকাণ্ড চাকার তলায় পড়িয়া পাগলী ও তাহার নাতির দেহ নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল।

পুত্রকে বাড়ীতে না দেখিয়া শোভা ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার পাশে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা বিহ্বল হইয়া গেল। প্রাণ দিয়া তাহার স্বামী যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই পথের যাত্রীর উল্লাস সমারোহে তাহার প্রিয়তম পুত্রের সমাধি রচিত হইল, এটা ভগবানের কোন্ জাতীয় পরিহাস, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শোভা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

শ্রীকালিদাস রায়

অনুপমার প্রেম

যে সমাজে এগারো বারো বছরের মধ্যেই বালিকাদের বিবাহ হইয়া যাইত—সে সমাজের কথা লইয়া নরনারীর প্রেমের উপন্যাস লিখিতে হইলে সধবার কিংবা বিধবার অবৈধ প্রেমই দেখাইতে হইত। আর কুমারীর প্রেম দেখাইতে হইলে হৃদয়-বিনিময় দেখানোর সুবিধা হইত না—অনুপমার মত যুবক বিশেষের প্রতি একতরফা অনুরাগ দেখানো চলিত। শরৎচন্দ্র এইরূপ প্রেমের অস্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিয়া এগারো বছরের অনুপমাকে রাশি রাশি নভেল পড়াইয়াছেন এবং তাহাকে ধনীর আদুরী দুলালী করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—রাশি রাশি নভেল পড়িয়া এগারো বছরের অনুপমা কুড়ি বছরের মেয়ের মত পাকা হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজেই নিজের পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিল। সমগ্র গল্পটি অনুপমার এই অপরাধের দণ্ড বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য শরৎচন্দ্রকে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অনেক আয়োজনই করিতে হইয়াছে।

১। সুরেশের মত গুণবান ছেলে—যে বি-এ পরীক্ষায় (অবশ্য কোন বিষয়ের অনার্সে) প্রথম স্থান অধিকার করে, দেখাইতে হইয়াছে সেও মাতা পিতার অবাধ্য হইয়া বিবাহের দিন সকলকে বিশেষতঃ একটি সরলা বালিকার অদৃষ্ট বিপন্ন করিয়া পলায়ন করিতেছে।

২। বর বিবাহের রাত্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে অন্যের সহিত কন্যার সেই রাত্রেই বিবাহ দিতে হইবে নতুবা জাতিচ্যুতি হইবে—এইরূপ একটা কুসংস্কার সেকালে প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া অনেক গল্প কাহিনী সেকালে বিরচিত হইত। সুরেশের অভাবে পাত্রানুসন্ধান অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অনুপমার জন্য গ্রামে কিংবা নিকটস্থ গ্রামে একজন যে কোন বিবাহার্থী যুবক পাওয়া গেল না, শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। অনুপমার পিতা সুরেশের পিতাকে ২ হাজার টাকা দিতে রাজী ছিলেন—এজন্য তাঁহার দশ হাজার টাকা দিতেও আপত্তি হইত না। দশ হাজার টাকার লোভেও কোন যুবকের পিতা বিবাহ দিতে রাজী হ'ন নাই—ইহা অস্বাভাবিক মনে হইবে। তাহাতে অনুপমার অবিবেচনার দণ্ড হয় না। কাজেই একজন কালরোগ-গ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে অনুপমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে।

৩। অল্প বয়সে অনুপমার বৈধব্য ঘটানো হইয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মাতা পিতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

৪। অনুপমার পিতার উইল গোপন করা হইয়াছে।

৫। অনুপমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একটি পিশাচ করিয়া তোলা হইয়াছে। অনুপমা চন্দ্রনাথবাবুর একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী, সে বিধবা পুত্রহীনা, চন্দ্রনাথবাবুর বিষয় সম্পত্তিতে তাহার দাবি-দাওয়া নাই—সে পরিচারিকার মত পরিশ্রম করিয়া ভ্রাতৃ সংসারে একবেলা অন্নগ্রহণ করে, এইরূপ ক্ষেত্রে অনুপমার নির্য্যাতন হইবার কথা নয়। যে শরৎচন্দ্র রামের সুমতিতে নারায়ণীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তিনিই চন্দ্রনাথ-বাবুর স্ত্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা অথবা অনুজার মত স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিতা অনুপমাকে সে নারী নিজের সংসারে সহ্য করিতে পারিল না। এ সমস্ত অনুপমার দণ্ডবিধানের আয়োজন ছাড়া কিছুই নয়।

৬। অনুপমার পিতা যখন অনুপমার বিধবা বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন তখন অনুপমাকেই তাঁহার বিরোধিনী করা হইয়াছে—ইহা স্বাভাবিক হইলেও তাহার অধিকতর দণ্ডের সম্মুখীন করার জন্যই এ প্রস্তাবের প্রত্যাখানের অবতারণা করা হইয়াছে।

৭। যে ললিতকে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের যুবকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—যে ললিত মদ্যপায়ী, কুসঙ্গে আসক্ত, অমিতব্যয়ী, যে ললিতকে জেলে পাঠাইবার জন্য অনুপমাই সহায়তা করিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত তাহার হাতেই সমর্পণ করিয়া শরৎচন্দ্র অনুপমার চরম দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

অনুপমা যে ভুল করিয়াছিল—সে ভুলের দণ্ড আছে বটে, কিন্তু এত বেশী দণ্ডের ভার গল্পের আর্ট সহ্য করিতে পারে না। নভেলপড়া প্রেমোন্মাদিনী বালিকা অনুপমার চরিত্র বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একভাবে অপ্রকৃতিস্থ। বিবাহের পর হইতে আর একভাবে অপ্রকৃতিস্থ। তাহার

চরিত্রের প্রকৃতিস্থতা ক্ষণকালের জন্ম আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে—যখন সে বলিয়াছে—"বাবা আমায় রক্ষা কর।"

কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। এই প্রকৃতিস্থ অবস্থার আবেদন পিতা শোনেন নাই বলিয়া সে বিধবা হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তাহার অন্তর্গূঢ় অভিমানকে প্রকাশ করিল। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন অভিমানিনী অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল—তখন জাত গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষু কর্ণ বন্ধ ক'রে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারো চোখ ফুটেছে—আমিও ভালোরূপ প্রতিশোধ নেব।

কিন্তু প্রতিশোধ কাহার উপর? আত্মনিগ্রহের দ্বারা নিজের দণ্ডই ঘনীভূত করা। অনুপমা নিজেকেই নিজে দণ্ডিত করিল সব চেয়ে বেশি।

শরৎচন্দ্র পরিহাস-রসিকতার গল্পটির আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত গল্পটিকে ভাবগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার শেষ বক্তব্য দাঁড়াইয়াছে—যে ভালবাসে না, ভালবাসিতে জানে না—সে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া Gilchrist বৃত্তি পাইলেও তাহাকে হৃদয় দান করা চলে না, কিন্তু যে মূর্খ, অমিতব্যয়ী, জেল খাটে, মদ খায় সেও যদি ভালবাসে তবু তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করা চলে। নিজের চেয়ে এ জগতে যাহার বড় কিছু নাই সে ভালবাসার অযোগ্য—যে নিজেকে ভুলিতে পারে সে যত পাষণ্ডই হোক সে ভালবাসার যোগ্য। মরীচিকার পিছে ছুটিলে নিরপরাধা মৃগীরও কি সর্ব্বনাশ হয় না? সোনার হরিণের লোভে মহীয়সী সীতার দণ্ডের কি অবধি ছিল?

কাশীনাথ

কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা, কাঁচা লেখা। কাশীনাথ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের লোক—এই অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র লইয়া তিনি গল্পটি আরম্ভ করিয়াছেন। যুবজনসুলভ Sex-appeal এই চরিত্র হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে। কাশীনাথ চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকার (Heredity) ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের সহায়তা লইয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ তাহার চরিত্রে একটা ঔদাস্য ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই ঔদাস্য প্রেমের পরিপন্থী, শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র যে যুগের কাহিনী রচনা করিয়াছেন—সে যুগে কৌলীন্তের প্রতাপ পুরাদমে বিদ্যমান। জমিদার তাহার একমাত্র কন্যাকেও অনাথ কুলীন যুবকের হাতে দান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। সংস্কৃত শিক্ষাই সে যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান শিক্ষা-রূপে গণ্য। অথচ এদিকে পল্লীগ্রামের ছোট জমিদারের কাছারির ম্যানেজার বি-এ পাশ-করা কোটপ্যাণ্ট-পরা যুবক। উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক শেষ সময়ের চিত্র এইখানি তাহা ধরিবার উপায় নাই। যে সময়ের কথাই হউক—সে সময়ের আবেষ্টনী ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। চতুষ্পাঠী ও জমিদার গৃহের আবেষ্টনীও এ চিত্রে ফুটে নাই। নায়িকা কমলাকেও শেষ পর্য্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রে পরিণত করা হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত কিন্তু কাশীনাথেই হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য এবং নারীচরিত্রের সক্রিয়তা ও প্রাধান্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একটা বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য কাশীনাথেও আছে। পল্লীসমাজের রমার পূর্ব্বাভাষ কমলায় আছে। রমা ও কমলা একার্থক। পুরুষ চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের রচনার একটা টেকনিকেরই অঙ্গ। ইহাতে তাহাও আছে। "অহেরিব গতি প্রেম:"—প্রেমের গতি ঋজুপথ ধরিয়া নয়, কুটিল পথ ধরিয়া। শরৎচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে ইহাই দেখাইয়াছেন। কাশীনাথেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। তবে প্রেমপথের কৌটিল্য এতবেশি দূর চলিয়া গিয়াছে যে তাহাকে আবার সহজ ঋজু পথে ঘুরাইয়া আনিতে অনেক আয়োজন করিতে হইত, শরৎচন্দ্র তাহা করেন নাই। অবতরণের জন্ম যতটা সময় লাগে, অধিরোহণের সময় তাহার চেয়ে ঢের বেশি লাগে, কলা বিজ্ঞানের এই সত্য শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছেন। গোরুর গাড়ী না হইলেও ঘোড়ার গাড়ীতে দূরে চলিয়া গিয়া যেন বিমান যোগে ফিরিয়া আসা।

কমলা বিষয় সম্পদ নিজের নামে লিখাইয়া লইয়াছিল—প্রেমের সম্পর্কে বৈচিত্র্য সম্পাদনের পক্ষে প্রেমের গতি কৌটিল্যের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল। শরৎচন্দ্র এই ব্যাপারে একটু বেশী পরিমাণে Emphasis দিয়া ফেলিয়াছেন। একটা মকর্দ্দমার অবতারণা ও কাশীনাথের সাক্ষ্য দান পর্য্যন্ত যথাযথ গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তাহার পর যাহা ঘটিল—তাহা শরৎচন্দ্রের স্বভাবসংযত লেখনীর পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি। শরৎচন্দ্রের সহৃদয়া প্রেমিকারা বুকে প্রেম পোষণ করিয়া মুখে কটু-ভাষিণী। এই কটু ভাষা আঘাত করিবার জন্ম বটে, কিন্তু জীবনকে বিপন্ন করার জন্ম নয়। কাশীনাথকে আহারে বসাইয়া যখন সে শ্বশুরের অন্ন গ্রাস মুখে তুলিতেছে তখন কমলার উক্তি—

যে চিরকাল পরের খেয়ে মানুষ—এখনও যাকে পরের না খেয়ে উপোস করতে হয়, তার সত্য কথা বলবার সখই বা কেন, আর এত অহঙ্কারই বা কেন?…যে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তার তেজ শোভা পায় না। এই সকল কথা কাশীনাথের পক্ষে আত্মহত্যার প্রণোদক। তারপর কমলা কাশীনাথকে অত্যন্ত রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। কাশীনাথের বিদায়কালীন ক্ষমা, প্রেম ও সহিষ্ণুতার বাক্যগুলি তাহার চিত্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না। ইহাতে প্রেমের শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ইহার পর আর প্রেমের প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র ইহাতেই ক্ষান্ত হ'ন নাই। কোটপ্যাণ্ট-পরা বি-এ পাশ করা যুবক ম্যানেজারের সঙ্গে টুলো পণ্ডিতের জমিদারিণী পত্নী কমলার পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কথা হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা বলিল—আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিজয়বাবু—ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ মৃদু মৃদু কথা

হইল, তারপর বিজয়বাবু বাহিরে আসিলেন। তারপর আহারের সময় কমলার কটু ভাষা। তারপর রাত্রে কাশীনাথের মির খুন। সে সংবাদ শুনিয়া কমলা অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কি করিয়া এই অনর্থ ঘটিল এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল—একেবারে খুন হয়ে গেছে? এইগুলি এক সঙ্গে করিলে বুঝা যায়, বিজয় ও কমলার মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, কাশীনাথকে দৈহিক প্রহারের দ্বারা শাস্তি দিতে হইবে, যাহাতে বেশ দুই চারিদিন শয্যাগত থাকে। কিন্তু বিজয়ের আদেশেই হউক, আর গুণ্ডাদের সতর্কতার অভাবেই হউক—কাশীনাথকে এরূপ আঘাত করা হইয়াছে যাহাতে সে 'একেবারে খুন।'

ইহার ফলেই কমলার মূর্চ্ছা। কাশীনাথ লোক চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহারা শ্বশুর পরিবারেরই অনুজীবী বলিয়া নাম করে নাই এবং জ্বরের প্রকোপে কাশীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—'বল কমলা, একাজ তুমি করনি। আমি মরেও সুখ পাব না, কমলা, শুধু একবার বল, এমন কাজ তোমার দ্বারা হয়নি।"

কমলা যে প্রেমকে এতদূর অত্যাচারের ও অপমানের দ্বারা বিদায় দিল, দুই দিন অচেতন থাকিয়াই সে প্রেমকে সে একমুহূর্তে ফিরিয়া পাইতে পারে না। যদি পায় কখনও তবে তাহা সুদীর্ঘকালের দারুণ তপস্যার দ্বারা। অক্ষমের ক্ষমা ও প্রেম এক জিনিস নয়। অপ্রকৃতিস্থ কাশীনাথ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থতর—তাহার ক্ষমা লাভ করা কঠিন নয়—কিন্তু চির-উদাসীন কাশীনাথের প্রেম ফিরিয়া আসিতে পারে না। প্রেমের গতি অহির মত বটে, কিন্তু অহির দংশনে প্রেমের রক্ষা পাওয়া কঠিন।

কাশীনাথে শরৎচন্দ্র কথাশিল্পের যে মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে সে মাত্রার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভুলেন নাই।

একই সুর

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

১

"আমার বাধা দিস্ নে দ্বারী
আমি সুবল সখা রে,
প্রাণের কানু কেমন আছে
দেখ্‌ব চোখের দেখা রে।
মা যশোদার নয়নমণি,
বৃন্দাবনের কানু সে,
কেমন করে মাজ্‌ল রাজা
হৃদগগনের ভানু সে!
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু
দূর হ'তে একবার গো,
মুখের কথা কইব না রে
খোল্ রে দ্বারী, দ্বার গো।"

২

দ্বার খুলে দে দ্বার খুলে দে—
শোন্ রে দ্বারী শোন্,
স্বাধীনতার সনদ্ নিতে
এলো এ কোন্ জন?
কতই রাজা রায় বাহাদুর
আসেন নানা বেশে,
ধূলায় মলিন দেশের সেবক,
এল দুয়ার দেশে।
সে এল রে নগ্নপায়ে—
মোদের হৃদয় রাজা,
রাজপ্রাসাদে মন্ত্রীবেশে
যাদবেন্দ্র পাঁজা!

৩

বদ্‌লে গেছে দেশের হাওয়া
বদ্‌লে গেছে কাল,
দেশের প্রতিনিধির গায়ে
নাই রে দামী শাল।
রাঢ়ের রাঙা মাটীর ধূলায়
ধূসর সকল দেহ,
এই যে মায়ের বুকের পাঁজর
চিনল না হায় কেহ।
যেমন হাসে চাঁদ আকাশে
নাই রে বসন ভূষা;
পূব আকাশে রঙ্ লাগে রে—
যখন হাসে ঊষা।

৪

রাজার সভায় চিন্‌ল না তো
সেই সেকালের দ্বারী,
লাটপ্রাসাদে চিন্‌ল রে
কে এল কাণ্ডারী।
হাজার হাজার বছর পরে
সেই সে কালের সুর,
আনন্দে বুক উথ্‌লে ওঠে,
চিত্ত যে ভরপুর।
নবদ্বীপের আঙিনাতে
বৃন্দাবনের বাঁশী,
স্মরণ করি খুসির দিনে
ক্ষুদিরামের ফাঁসী।

আবিষ্কার

শ্রীসুবোধ বসু

বম্বে শহরের অপামর সাধারণ এক-জোট হইয়া আমাকে অপদস্থ করিবার জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে, এ খবরটা আগে টের পাইলে বম্বের ত্রি-সীমানা মাড়াইতাম না। ভারতের এই 'প্রবেশদ্বার'টির পাছ-দুয়ার দিয়া অতি চুপেচুপেই ভিতরে ঢুকিয়াছিলাম, কিন্তু অতি শীঘ্রই টের পাওয়া গেল, খবরটা এখানকার কাহারও কাছে গোপন থাকে নাই। বিখ্যাত ব্যক্তি হইলে অনায়াসেই মনে করিতে পারিতাম, ইহা খবরের কাগজের কুকীর্ত্তি; আমার বম্বে আসার খবরটা পূর্ব্ব হইতেই প্রচার করিয়া আমার বিরুদ্ধে নিরীহ জনতাকে উস্কাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলি আমাকে স্বভাবতই উপেক্ষা করিয়াছে; কোনও সভা-সমিতিও সম্বর্দ্ধনা জানায় নাই। তবু বম্বের জনসাধারণ অনায়াসেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি সন্ত বম্বে আসিয়াছি। আমাকে নাকাল করিবার জন্ত প্রত্যহই বিভিন্ন অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বম্বের বিভিন্ন দুর্গম স্থানের পথের নির্দ্দেশ আমার কাছ হইতেই জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথম ক'দিন ইহাতে সন্দেহ করি নাই। ভাবিয়াছি, আমার মতোই কোনো নবাগত হালে পানি না পাইয়া তৃণ আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। কিন্তু যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নতুন নতুন লোক জগতের অপরাপর লোকদের উপেক্ষা করিয়া একমাত্র আমার কাছ হইতেই পথের হদিস্ জানিবার ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল, তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা ষড়যন্ত্র বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলাম।

আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গল আবিষ্কারে লিভিংষ্টোন যে দুর্জ্জয় সাহস ও অ্যাডভেঞ্চার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সাহস এবং অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গে আমি বম্বের 'গেট্ অব্ ইণ্ডিয়া', তাজমহল হোটেল, ইয়াট ক্লাব প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়াছি এবং মিউজিয়মের সমুখের ট্রাম-টার্মিনসে পৌঁছিয়া পরিচিত স্থানে প্রত্যাগত অভিযানকারীর গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এমন সময় একটা বদ্ লোক আমার সমস্ত তৃপ্তি ও গর্ব্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিল। আশেপাশে অপেক্ষমান যাত্রীর কোনই অভাব ছিল না, কিন্তু লোকটা তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিল না। জনতার মধ্য হইতে ঠিক আমাকেই বাছিয়া লইয়া ঘাড় শক্ত করিয়া আগাইয়া আসিল। অর্থাৎ, তোমাকে ছাড়া চলিবে না। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দিতে সে প্রশ্ন করিল, 'এই ট্রামটা কি মহম্মদ আলী রোড হয়ে যাবে?'

ট্রামটা কি মহম্মদ আলী রোড হ'য়ে যাবে?

একবার প্রশ্নটা শুনুন! বম্বের ট্রাম কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে যায়, কিছুই জানি না; এমন কি, ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান আছে কিনা, না মাঝপথে মত বদ্‌লাইয়া যে কোনও দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ হই নাই। সেই আমার কাছে উপস্থিত

হইয়া মহম্মদ আলী রোডের ট্রামের খোঁজ না করিলেই কি চলিত না?

আঙুল দিয়া লোকটাকে ট্রাম-কোম্পানার উর্দি-পরা এক কর্মচারিকে দেখাইয়া দিলাম। ভাবখানা এই যে, এত কাছে ট্রামের লোক দাঁড়াইয়া থাকা সত্বেও আমার মতো ভদ্রলোককে বিরক্ত করা কেন? আশঙ্কা হইতে লাগিল, লোকটা হয়তো এইবার বলিয়া বসিবে, 'এইটুকু বলে দিলে তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যেত না।' কিন্তু দেখা গেল, মানুষটা অত খল নয়; আমাকে আর জব্দ করিবার চেষ্টা না করিয়া সে ট্রাম-কর্মচারির কাছেই আগাইয়া গেল। বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম। গত ক'দিন ধরিয়া যে সকল ব্যক্তি আমাকে শুধু গন্তব্যস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া রীতিমত জেরা করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহাদের তুলনায় ইহাকে দেবতুল্য লোক মনে হইল। ভাবিলাম, মহম্মদ আলী রোড নামে বম্বে শহরে যে একটা রাস্তা আছে, এই অমূল্য সংবাদটি নোট বইয়ে টুকিয়া রাখি।

পাঁচ দিন বম্বেতে বাস করিবার পর একটি তথ্য খুব ভালো করিয়াই শিখিয়াছি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ স্টেশনের সামনে গোলাকার পার্ক-ধরণের যে ভূখণ্ডটুকু আশে পাশে সকল নিম্নশ্রেণীর বেকার ও অলস জনতার বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'বোড়ি বন্দর'। এইটা কি করিয়া বন্দর হইল এবং কোন্ স্কেলের মাঝে ইহাকে বড়ো বলা চলে তাহা সমস্যার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন একটা সর্বজনবিদিত 'ল্যাণ্ডমার্ক' পাইয়া আমার বড় সুবিধা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ ফিটন গাড়ির চালককে ভিক্টোরিয়া টার্মিনসে পৌছাইয়া দিতে বলিলে পথ ভুল করিয়া বসিতে পারে, কিন্তু 'বোড়ি বন্দর' বলিলে কখনও ভুল করিবে না। অতএব আমি এই বোড়ি বন্দরকে অনিত্য জগতে একমাত্র নিত্য বস্তু হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও মিউজিয়মের টার্মিনস্ হইতে বোড়ি বন্দরগামী ট্রাম আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। দেদার গাড়ি দাদার যাইতেছে, কলবাদেবী বা জৈবিভলাও, তারদেও বা গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক যাইতেছে, অথচ বোড়ি বন্দরের বোর্ড একটা তেও খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া আগাইয়া গিয়া ট্রামওয়ে কর্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

লোকটা একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাইল। ভাবখানা এই যে, এটা আবার কোথাকার আনাড়িরে! অতঃপর কড়ে আঙুলটিকে কষ্টের সঙ্গে সামান্ত উঁচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া গাড়িগুলোর কোনও একটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

আর বাদানুবাদ অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি সামনে আগাইয়া গেলাম এবং সম্মুখের দোতলা ট্রামটিকে উপেক্ষা করিয়া পরের ছ্যাকরা ট্রামগাড়িটাতে চাপিয়া বসিলাম। এইটাই ইঙ্গিতের লক্ষ্য মনে হইয়াছিল, এজন্যই দোতলাকে উপেক্ষা করিয়া একতালাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বম্বের ট্রাম টার্মিনস্ হইতে কখন ছাড়িবে বা মোটেই ছাড়িবে কিনা, কিছুই ঠিক নাই। অপরিচ্ছন্ন আসনগুলি মোটেই আরামপ্রদ নয়; ট্রামের যাত্রীরাও অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। বম্বের ভদ্রলোকেরা অধিকাংশই বাস্-এ চড়েন। বাস্-এর গতিবিধি আরও রহস্যজনক মনে হওয়ায় আমি কখনও বাস্-এ চড়িতে ভরসা পাই না। কিন্তু নিরুত্তম ট্রামে অবস্তিতে সারা হইয়া স্থির করিলাম, আগামী কাল হইতেই বাস্ অভিযান শুরু করিব। এমন সময়, আমাকে নিরস্ত করিবার জন্তই যেন ঘটাং ঘটাং শব্দ করিয়া ট্রাম ছাড়িল। ল্যাণ্ডো-গাড়ির সইসের মতো পোশাক-পরা ট্রাম-ড্রাইভার হইলে উল্টা প্যাঁচ মারিয়া গাড়ি ছাড়িল।

এইবার নূতন অস্বস্তিতে তটস্থ হইয়া উঠিলাম। যাইবে তো এইটা বোড়ি বন্দর! অথবা কলবাদেবী বা খোবিত-লাওয়ের গোলক ধাঁধার মধ্যে টানিয়া লইয়া আমাকে নির্দয়ভাবে বিসর্জন দিয়া আসিবে? সারা রাত ধরিয়া মাকড়সার জালে-পড়া মাছির মতো মুক্তি পাইবার জন্ত হাত-পা ছুঁড়িয়া মরিব!

এই তো 'কালা ঘোড়া'! বম্বের পরিচিত 'ল্যাণ্ডমার্ক'-গুলির মধ্যে এই 'কালা ঘোড়া' অন্যতম। মহামহিমান্বিতা স্বর্গীয় হইলে রাস্তার মোড় অথবা পার্কের মধ্যে স্তম্ভের উপর প্রস্তরীভূতরূপে দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা জানি। কিন্তু এইখানে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোড়াকে প্রাধান্ত দেওয়ায় বম্বের 'কালা ঘোড়ার' প্রতি প্রথম হইতেই আমার সম্ভ্রম জাগ্রত হইয়াছিল। এমন মহাপুরুষ ঘোড়া দর্শনে

কে না অভিভূত হয়! এখন ইহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম, ঠিক পথেই চলিয়াছি। দিক্‌চিহ্নহীন অর্ণবের মধ্যে আমার কাছে 'কালা ঘোড়া' ধ্রুবতারার মতো মনে হইতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া উদ্বিগ্ন মাথাটাকে জানালার বাহির হইতে ভিতরে টানিয়া আনিলাম।

কয় মিনিট অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল! দেখিলাম, আমি হারাইয়া গিয়াছি! ট্রামগাড়ি আমার সঙ্গে জঘন্য প্রবঞ্চনা করিয়াছে! কালা ঘোড়া দেখাইয়া আশ্বস্ত করিয়া এখন আমাকে সম্পূর্ণ অজানা রাজ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

মিউজিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ পর্য্যন্ত রাস্তাটা আমার মুখ-চেনা। কিন্তু কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজাবাই টাওয়ার, কোথায় মহাত্মা গান্ধী রোডের বড় বড় দোকান অফিস বাড়ি, কোথায় ফ্লোরা ফাউণ্টেন? এ কোন্ দুর্গম-লোকে আসিয়া পড়িয়াছে? এই অপরিসর পথ দিয়া, রুদ্ধদ্বার অট্টালিকাশ্রেণীর গা-ঘেঁষিয়া ট্রাম-গাড়ি আমাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? চকিতে বুঝিতে পারিলাম, ভুল ট্রামে চড়িয়াছি; ট্রামের কর্ম্মচারি আমার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করিয়াছে! তবু নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পাশের যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাই হর্ণবি রোড তো?' সে লোকটা দুই সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'এটা মিণ্ট রোড।'

আর সন্দেহ রহিল না। আমাকে নাকাল করিবার ষড়যন্ত্র ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। হাঁক ডাক করিয়া তখনই ট্রাম থামাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নির্দ্দয় ট্রাম পরের ষ্টপের আগে থামিল না। আমি প্রথম সুযোগেই নামিয়া পড়িয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আরও গভীর এবং অপরিচিত অঞ্চলে গিয়া পড়িবার আগেই যে নামিয়া পড়িতে পারিয়াছি, সেইটাই বাঁচোয়া! এইবার উল্টো-মুখী ট্রামে চড়িয়া মিউজিয়মে ফিরিতে পারিব বলিয়া আশা করি—অবশ্য যদি ওদিকের ট্রামগাড়ি ইতিমধ্যেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া না থাকে।

বাঁ দিকে উচু রেলিং-ঘেরা একটা গোলাকার পার্ক। রাস্তার আলোতে ইহার সরকারী নামটা পড়িলাম—'এলফিনষ্টোন সার্কল্'। ইহার আশেপাশে মস্ত উচু উচু সব বাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও জানালাতেই আলোর আভাস নাই। যেন ইহারাও সব ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আছে। না হইলে এত বড় বড় বাড়িতে আলো জ্বলিবে না কেন? পরে অবশ্য জানিয়াছিলাম, এই-গুলি সবই অফিস বাড়ি; কিন্তু তখন তো ইহাও জানিয়াছি, মিণ্ট রোড ঘুরিয়াও ট্রাম বোড়ি বন্দর যায়।

যাহা হউক, বড় রাস্তার উপরে, এলফিনস্টোন্ সার্কেলের ঠিক উল্টা দিকে, প্রাসাদোপম একটা বিরাট দালান নজরে পড়িল। অন্ধকার রাতে জনবিরল রাস্তার উপর এই বাড়িটা প্রায় রূপকথার রাজার বাড়ির মতো স্তব্ধ ও রহস্যপূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বারবার তাকাইয়া এইটাকে কেবলই আমার ভূতুড়ে বাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ঐদিকেই আমার ট্রাম ষ্টপ্। রাস্তা পার হইয়া বাড়িটার সামনে গিয়াই দাঁড়াইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, সভ্য শহরের সঙ্গে দুর্গম অরণ্যের তফাৎ কোথায়। উভয় স্থানেই দেখিতেছি, বেমালুম পথ হারাইয়া বসা সম্ভব।

সহসা পার্থক্য-নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিল। চকিতে পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, একটি ভারতীয় নাবিক একেবারে আমার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে কি সে আমার জলে-পড়া গোছের মুখের ভাব দেখিয়া উদ্ধার করিতে আসিয়াছে? কপালকুণ্ডলার মতো সমুদ্র-অঞ্চল-প্রত্যাগত আমাকে সে-ও কি প্রশ্ন করিবে, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' শীঘ্রই সে প্রশ্ন করিল, কিন্তু প্রশ্নটি অন্যরূপ। সে বলিল, 'টাউন হল্ কোন্‌টা, বলতে পারেন?'

আমি প্রায় হিংস্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। আমার মনের যা অবস্থা তাহাতে নিজের নাম ভুলিবার উপক্রম হইয়াছি, অথচ এই লোকটা কিনা আমারই কাছে আসিয়া টাউন-হলের খোঁজ করিতেছে! বম্বেতে যে টাউন্-হল্ আছে, তাহা এই প্রথম শুনিলাম। কাজেই টাউন-হলটা বাইকুল্লা না মহালক্ষ্মীতে, মালাবার হিল-এ না প্যারেলে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুবিসর্গ ধারণাও নাই। কিন্তু রাগে গা জ্বলিয়া যাইতেছিল; সকলে এক-জোট্ হইয়া যদি আমাকে মিছিমিছি নাকাল করিবার

কাজে লিপ্ত হয়, তবে রাগ সংযত রাখিবার উপায় কি? আমিও প্রতিশোধ লইতে জানি।

বলিলাম, 'টাউন-হল? সে তো এখান থেকে বহু দূর। 'সি'-বাস্-এ করে যেতে হয়। ঐ তো একটা বাস্-স্টপ দেখা যাচ্ছে রাস্তার মোড়ে। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। আধঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বাস্ পাওয়া যাবে।'

টাউন হ'ল? সে তো এখান থেকে বহু দূর

'বলেন কি, তাই নাকি?' সে লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল। 'আমাকে বলে দিলে খুব কাছেই। চার্চ্চগেট্ স্টেশন থেকে সোজা রাস্তায়ই তো হেঁটে আসছি···'

'কত বাজে লোকে কত কথা বলে', আমি সম্ভ্রান্তভাবে বলিলাম। 'কিন্তু আমার কাছে আর নয়। স্টপে গিয়ে দাঁড়াও। বম্বের বাস্ একটা ফস্কালে সারা রাত্তিরেও আর একটা পাবে না।···'

'আপনি ঠিক জানেন তো?'

'আলবৎ।' আমি জোর দিয়া বলিলাম।

আশা করি, আমার ট্রাম দু-চার মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে।

লোকটা চলিয়া গেল, হাঁক্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইবার বাছাধন টের পাও গিয়া। বম্বের রাস্তায় কেবল আমিই নাকাল হইব, ইহা একটা কথাই নয়।

কিন্তু ট্রামের কি হইল? অন্তত পনেরো মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, কোনও ট্রামের এদিকে আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমাকে জব্দ করিবার জন্য অন্য রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া শুরু করে নাই তো? নিশ্চিন্ত হইবার জন্য অবশেষে রাস্তার মধ্যখানে আগাইয়া গিয়া সেখানে দুই জোড়া ট্রাম-লাইনই আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় একজোড়া বুটের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখি, আমার ক্ষণকাল পূর্ব্বের প্রশ্নকর্ত্তা রাস্তা পার হইয়া আবার এইদিকেই আসিতেছে।

আবার কি চায় এটা? জেরাটা বাকি রাখিয়া গিয়াছে মনে পড়ায় জেরা করিতে ফিরিয়া আসিতেছে না তো? সি-বাস্ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম কোন্ দিকে, কোন্ রাস্তা দিয়া, কোথায় যায়, এইবার হয় তো সেই প্রশ্নই করিয়া বসিবে। এমন কি, বম্বের টাউন-হলের স্থাপত্যরীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই বা মারে কে?

আক্রমণাত্মক রণনীতিই আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া আমিও প্রস্তুত হইলাম।

'সে কি মশায়, আবার ফিরে আসচেন কেন?' আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম।

আপনার পিছনের দালানটাই টাউন হ'ল কি না—

সে বলিল, 'আপনার পেছনের দালানটাই টাউন-হল কিনা, তাই অগত্যা ফিরেই আসতে হলো। ওখানে নাবিকদের জন্য একটা ক্যান্টিন খোলা হয়েচে। সাহায্য করবার জন্য 'ধন্যবাদ! নমস্তে।' বলিয়া সেই দুষ্ট লোকটা মিটিমিটি হাসিয়া আমার পিছনের রাজপ্রাসাদ-মার্কা সেই বাড়িটার ফটকের দিকে আগাইয়া গেল।

পৃথিবীর বিখ্যাত অভিযানকারীরা আবিষ্কারের জন্য বহু দুঃখ-দুর্দ্দশা ও হতাশা সহ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অর্দ্ধেকও অপমানিত হইয়াছেন তাঁহারা, এমন শুনি নাই। নিদারুণ ক্ষোভে পায়ের দিকে চাহিয়া বলিতে যাইতেছিলাম, ধরণী দ্বিধা হও, কিন্তু সমুখ দিয়া একটা খালি ট্যাক্সি যাইতে দেখিয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়া ডাকিলাম, 'ট্যাক্সি!'

গ্রামের জীবজন্তু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের গ্রামে অনেক ফুলগাছ ছিল এবং বনে বহু ফুল ফুটিত; সেই জন্য মৌমাছি ও প্রজাপতির ঝাঁক খুব বেশী দেখা যাইত। প্রতি বাড়ীতেই ২।৩ খানা মৌচাক থাকিত। আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই মৌমাছির গুঞ্জন শুনিতাম, বড় ভাল লাগিত তাই লিখিয়াছিলাম—

যখন যেখানে দেখি আমি মৌচাক,
হই আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক।
নরম সোনায় গঠিত কক্ষগুলি
দেখিয়া রাজার প্রাসাদ যাইবে ভুলি।
কবি ও শিল্পী মিলেছে ওখানে যেন
কোথা গুণীদের পরিমণ্ডল হেন?
রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা সুর,
কর্ম্মের সাথে সঙ্গীত সুমধুর।
কোথায় এমন রসিক দলের হাট?
এক সাথে কোথা এত কবি-সম্রাট?

বিবিধ বিচিত্র রঙের প্রজাপতিগুলি উড়িয়া বেড়াইত—যেন এক একটী জীবন্ত ফুল, কতই বাহার। শুনিয়াছি ডিম পাড়িয়াই প্রজাপতি মারা যায়—একবার একটী করবী গাছের পাতায় দুইটী সুন্দর ডিম ও মৃত প্রজাপতি দেখিয়া লিখিয়াছিলাম—

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটী করবী পাতে—
মণিসন্নিভ দুইটী ডিম্ব রাখি
বারেক ফিরালো মৃত্যু-আঁধার আঁখি,
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনী মরি!
শুভ মঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি
নিঃশেষ করে দিয়ে গেল যেন হৃদি।

গ্রামের মাঠে অনেক খরগোস্ থাকিত, অজয়ের ভাঙন ও বন্যা শশক দলকে প্রায় অপসারিত করিয়াছে। শৈশবে নদীর ঘাটে যাইতে প্রায়ই দুইটী শশককে দেখিতাম—

"তৃণের মূলগুলি নীরবে খেত তুলি
বসিয়া তৃণ দল মাঝে।"

এক বৎসর প্রবল বন্যা আসিল—

প্রিয় বসতি ত্যজি শশক দুটী আজি,
ভয়ে সুদূরে গেল সরি।
শুকায়ে গেল বান, তবু সে নীড় খান
শূন্য রহিল যে পড়ি।
আসিতে যেতে আমি নিয়ত চেয়ে দেখি,
তা' দিকে দেখি নাক আর,
সাঁজেতে মাঠ একা পড়িয়া থাকে ফাঁকা
আঁধার ঘন চারি ধার।

অনেক দিন পর তাহাদিগকে সেই মাঠে মৃত অবস্থায় দেখিয়া,

নিকটে গিয়া ধীরে দিলাম গায়ে হাত
সাড়া শব্দ কিছু নাই,
শান্ত বনভূমে দোঁহার মুখ চুমে
দুজনে পড়ে আছে তাই।
তা'রা কি পারে নাই ভুলিতে প্রিয় ভূমি
তাদের প্রিয় তরুলতা?
মনে কি পড়েছিল সাঁজে শ্যামল মাঠ
সে সুখ দিবসের কথা?
সেথা কি ভেসেছিল ইহার ছায়া ছবি
চারিটী ছোট আঁখি কোণে?
এই যে শ্যামলতা মায়ার বাঁধন কি
বাঁধিয়া ছিল দুটী মনে?

কুনুর নদীর তীরে ঘনবন থাকায় নানা বন্য জন্তু আসিত। শৃগাল অসংখ্য ছিল, বড়ই উৎপাত করিত। কত হাঁস, ভেড়া, ছাগল তাহারা মারিত তার ইয়ত্তা নাই। তবে দু তিন বৎসর অন্তর এক একবার 'শিয়ালমারা' দল আসিয়া শিয়াল দল প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া যাইত। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পরও ৩।৪ দিন ভয়ে শিয়াল ডাকিত না। মনে একটা অভাব ও কষ্ট অনুভব করিতাম। বানরগণও খুব উপদ্রব করিত, ত্রেতাযুগ হইতে উহা চলিয়া আসিতেছে—কাজেই সহনীয় হইয়া গিয়াছে। 'বানরমারা'র দল গ্রামে ঢুকিতে পাইত না—আমাদের গ্রাম তীর্থস্থান, এখানে বানরবধ নিষিদ্ধ। যে হেতু শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিল সেই জন্য কাঠবিড়ালও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী। সাঁওতালেরা মারিতে এলে লোকে বাধা দিত।

গ্রামে মধ্যে মধ্যে বন্যবরাহ আসিত কিন্তু গ্রামবাসীর নিকট যে অভ্যর্থনা পাইত তাহাতে তিষ্ঠানো সম্ভব হইত না। শৈশবে শুনিতাম শীতকালে মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মাত্র এক রাত্রির জন্য ব্যাঘ্র অজয়ের তীরে আসে এবং প্রণাম করিয়াই চলিয়া যায়, গ্রামে ঢুকিবার অধিকার নাই। শীতের রাত্রে 'ফেউ' ডাকিলেই আমরা বুঝিতাম আজ বাঘ ওপার হ্হতে মাকে প্রণাম করিতেছে—আমরা উহার হিংসার বাহিরে।

আমাদের গ্রামে বহু গোয়ালার বাস ছিল তাহারা অনেক উৎকৃষ্ট গাভী রাখিত। ক্ষীর দধি ছানা মাখনের জন্ম আমাদের গ্রামের নাম ডাক ছিল। এখানকার ক্ষীর ও ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই গো-পালন করিত। এক সের খাঁটি দুধের মূল্য ছিল মাত্র এক আনা এবং ঘৃত টাকায় তিন পোয়া। চাষের জন্য মহিষও ব্যবহৃত হইত। মাত্র একঘর গোয়ালা দুধের জন্য গাই-মহিষ রাখিত। গো-মাতারা দেবতার সম্মান পাইতেন, প্রত্যেক দুগ্ধবতী গাভীকে 'কপিলা' ও 'সুরভি' মনে করিতাম। সবৎসা গাভী দেখা যাত্রায় শুভ-সূচক বলে, পল্লীপথের উহা একটা বৈশিষ্ট্য।

অনেক গৃহস্থই কুকুর পুষিতেন। কেহ কেহ সখ করিয়া গ্রে-হাউণ্ড, স্পেনিয়েল প্রভৃতি মূল্যবান কুকুর আনিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বেশীদিন টিকে নাই। গ্রামের কুকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

ভুলো, ভুলো, সুখদাস, টাইগার, জো,
কত নাম, কি তাদের আদর বোঝো।
কখনো চেপেছি পিঠে, করেছি ঘোড়া,
লেজে কারো ঝুমঝুমি বেঁধেছি মোরা,
গলে দিয়েবগলস্, সহিত ঘুঙুর,
সোনামুহুজি পার হ'ত তারা এ 'কন্দুর'।

২

শিক্ষিত পরিবারে ছিল কত সখ,
মেরিছি—পড়িতে 'সেণ্ট্‌বারনার্ড ডগ'।
লণ্ঠন মুখে দিয়া টেনেছি পথে,
শিক্ষা দেবই দেব যে কোনো মতে।

হেলা করে নিজেদের শিক্ষা ও পাঠ
তাদেরে শিখাতে সে কি চেষ্টা বিরাট!

৩

সার্কাসে কুকুরের খেলা দেখে রাম—
গ্রামের কুকুরগণে দিতনা বিরাম।
সব দিকে তাহাদের হিতপিয়াসী,
পিটায়েছি করিবারে নিরামিষাশী।
চোখে তাহাদের যাহা পেতাম আভাষ,
না শিখুক, ছিল বেশ শিখিবার আশ।

৪

সাথে লয়ে কুকুর, হাতে ধনু তীর,
শত্রু ছিলাম মোরা খেঁকশিয়ালীর।
ব্যসনে ও উৎসবে, চড়ুই ভাতে,
সাথী তারা দিবসেতে, প্রহরী রাতে।
গ্রামেতে ঢুকেছি কভু রাতি দুপহর,
দু মাইল হতে শোনা যেত চেনা স্বর।

৫

তাড়াইলে সরিত না—আহা যাহারা,
আজি তা'রা ডাকিলেও দেয় না সাড়া।
তাহাদের লাগি মন ব্যথা পায় মোর,
সঙ্গী যে ছিল দ্বারে রোদ পোহানর।
যুধিষ্ঠিরের মত ভাগ্য হলে,
সঙ্গে নিতাম সেই কুকুর দলে।

কুকুরের পরই বিড়াল—তাহারা দুধ, মাছ প্রভৃতি খাইয়া গৃহস্থের বহু অনিষ্টই করিত, তবু তাহারা গ্রামে অনেক ছিল। ষষ্ঠী দেবীর বাহন বলিয়া কেহ বিড়াল মারিত না। 'দধিমুখী' বিড়াল খুব আদর পাইত—গ্রাম্য ছড়ায় আছে—

তাল, তেঁতুল, বাবলা
কি করবে দধিমুখী একলা?

এই সঙ্গে সাপের নাম ও উল্লেখ যোগ্য। গৃহপালিত না হইলেও উহারা অনেকেই গোপনে গৃহেই বাস করে, এবং সময় সময় বৃহৎ অনিষ্টও ঘটায়। এ অঞ্চলে অন্যান্য পল্লীগ্রামের ন্যায় আমাদের গ্রামেও মা মনসার খুব সম্মান—বিশেষতঃ আমাদের গ্রাম যখন "বেহুলার" পিতৃভূমি তখন মনসার বিশিষ্ট দাবী আছে! বর্ষা কালে প্রত্যেক পঞ্চমী তিথিই ভক্তির সহিত পালিত হয়। 'গোষলা' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে "ঝাঁকলাই" নামে এক প্রকার সর্প পূজিত ও রক্ষিত হয়, তাহারা থাকায় নাকি অন্য বিষধর সর্প আসিতে পায় না এবং ঐ সকল গ্রামে সর্পদংশনও হয় না! বহু গ্রামে সমারোহের সহিত 'মনসাপূজা' তখনও হইত এখনও হয়।

আমাদের গ্রামে গাঙ্গুলী বাড়ী কিন্তু মনসা পূজার দিন যে সব দ্রব্য খাওয়া নিষেধ তাহাই খাইবার ব্যবস্থা আছে। উক্ত বংশের প্রসিদ্ধ

মাণিক গাঙ্গুলী মহাশয় 'চাঁদ সদাগরে'র মত তেজস্বী শৈব ছিলেন—তিনিই বাধা নিষেধ উঠাইয়া ঐ প্রথা করিয়া গিয়াছেন ইহাই অনেকের ধারণা।

আমাদের বাড়ীতেও সাপ ধরাইতে বা মারিতে নাই; আমার মাতাঠাকুরাণী যখন বালিকা তখন তাঁহার কান্নায় মাতামহদেব একটা সাপ সাপুড়েদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া কিনাইয়া আনেন। তাই লিখিয়াছিলাম—

বাস করি মোরা পল্লীগ্রামেতে সেটা অদ্ভুত ভূমি
অবাক হইবে তার কথা শুনে তুমি,
অজয়ের তীরে তাম্বু পাতিল একদল সাপুড়িয়া
শুধু বিষধর সাপ ধরে যায় নিয়া।
আমাদের গ্রামে একটা বাড়ীতে একদা তাহারা আসি
বাজাতে লাগিল তাহাদের ভেঁপুবাঁশী।
প্রাচীন ভগ্ন প্রাচীর ফাটালে কত দিন ধরে ছিল
রূপার মতন দেহলতা তার, ফণাটি চমৎকার
ভয়ের কোথাও চিহ্ন নাহিক তার।
সূর্য্য কিরণে সেই সে শুভ্র ভয়াল কান্ত রূপ,
দেখিয়া সকলে একেবারে হলো চুপ।
সুমুখে তাহার ঝাঁপি ধরে দিল, সর্প ঢুকিল তাতে…
সাপুড়িয়াগণ নিয়ে গেল ঝাঁপি মাথে।
বাড়ীর কন্যা দশ বছরের সোনার বরণ দেহ
কাঁদিতে লাগিল, ভুলাতে পারে না কেহ।
বাবাকে বলিল সাপ ফিরে আনো, সাপ ফিরে আনো তুমি
মা যে বলিলেন আজ 'নাগ-পঞ্চমী'
তিন পুরুষের ও সাপ মোদের বাস্তু আগুলি আছে।
সে কি দেওয়া যায় সাপুড়িয়াদের কাছে?
দেহেতে তাহার দিব্যজ্যোতি—চাহিল মায়ের পানে
রোষে নয় বাবা—নিদারুণ অভিমানে।
বলিল সে যেন 'ছেড়ে যাব আমি এই সব ছেলে পুলে
সাপুড়িয়া হাতে শেষে মোরে দিলি তুলে?
মা মোর কাঁদিছে, বোনেরা কাঁদিছে, কাঁদিছে বাড়ীর ঝি,
মা বলেন কেহ এ কাজ করে কি ছিঃ।
বুঝাতে পারে না পিতা যত বলে—বুঝেও বুঝে না হায়,
যুক্তি হারায় কন্যার কান্নায়।
নিরুপায় পিতা অবশেষে গিয়া বনে সাপুড়িয়া কাছে—
সাপটী তখনো ঝাঁপিতেই ভরা আছে।
"বাপু সাপুড়িয়া লও পাঁচ টাকা সাপ দিয়ে এসো ফিরে
বাড়ীতে সবাই ভাসিতেছে আঁখি নীরে।
গোটা পরিবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলায়ে ফেলেছে চোখ
সাপের জন্য দেখিনি এমন শোক।"
সাপুড়িয়া হাসি 'বলিল' বাবুজী সাপটী পুরানো বড়
মঙ্গলকারী—অরিষ্ট নাশে দড়।
ওঝারা সকলে বলে খুব দামী, ভারী উপকারী বিষ,
ফিরে দেব—দিস্ বিশ টাকা বখ্‌সিশ্।
দশ টাকা নিয়া সাপুড়িয়া আসি সাপ পুনঃ গেল দিয়ে
কোনো দেশে তুমি এমন শুনেছ কি হে?
উল্লসিত সে বাড়ীর সকলে, শান্ত হইল ভূমি—
সার্থক হ'ল আজ নাগ-পঞ্চমী।
ভাবি কি করিয়া সর্পযজ্ঞ করিল জন্মেজয়—
কন্যা তাহার ছিলনাকো নিশ্চয়?

এই সব জীব জন্তু লইয়া আমরা এক পরিবারে যেন বাস করিতাম—বিপদ-আপদ সহরের চেয়ে বেশী ছিল মনে হয় না।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ-ডি

(১)

এই বৈষ্ণব মহাসম্মিলনের মূল সভাপতি পদে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করায় আমার যে মনোভাব হইয়াছে তাহা বৈষ্ণব-সংস্কৃতি-নির্দিষ্ট বিনয়ের দ্বারাও ঠিক প্রকাশিতব্য নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরাট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—সুতরাং এইরূপ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার মত যোগ্যতা আমার যে অতি সামান্য সে বিষয়ে আমি তীক্ষ্ণ ভাবে সচেতন। অথবা হয়ত এ ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি আমার নিজের গুণ নহে, আপনাদের স্নেহাশীর্ব্বাদমিশ্র শুভেচ্ছা। যে মহাপ্রভুর অপার, অনমুমেয় করুণায় পাপীতাপী উদ্ধার লাভ করিয়াছে ও পঙ্গু গিরিলংঘনের দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাঁহার প্রসাদ-কণা আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে এই গুরুভার বহনে শক্তি দিক্ ইহাই আমার প্রার্থনা।

কালের দুরতিক্রম্য প্রভাবে প্রায় সমস্ত ধর্ম্মই কম-বেশী আদর্শগত বিশুদ্ধি হারাইয়াছে—উহাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রেরণা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কতকগুলি বহিরঙ্গমূলক আচার—অনুষ্ঠান পালনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে কোন ধর্ম্মেরই পূর্ব্বের ন্যায় সার্ব্বভৌম প্রভাব—প্রতিপত্তি নাই। হিন্দুধর্ম্মে গীতা—উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, সর্ব্বভূতে সম-দর্শিতা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস সাধারণ

হিন্দুর অবচেতন মানসস্তরে শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকিলেও তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যুদার ক্ষমা ও বিষয়-নিস্পৃহতার আদর্শ আজ আণবিক বোমার অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ইসলাম ধর্ম্মের অধঃপতনের ইতিহাস নোয়াখালি ও পঞ্জাবের অমানুষিক বীভৎস অত্যাচারে অবিস্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শক্তি-পূজা-সাধনা রামপ্রসাদ—রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া এখনও ইহার সঞ্জীবতার পরিচয় দিতেছে; কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও শত শত হিন্দু পরিবারে ইহা যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-শুদ্ধ কর্ম্ম প্রেরণা যোগাইত, যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপূত ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন করিত, আজ তাহা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য গ্লানিবহুল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের তুলনায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রশংসনীয় ব্যতিক্রমের পর্য্যায়ভুক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত ইহার অনুরাগীদের বাস্তব জীবনে অনেকটা সতেজভাবে ক্রিয়াশীল। ইহার গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের আদর্শ ও সরল, প্রত্যক্ষ আবেদন জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। নাম-সংকীর্ত্তনের আকর্ষণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে অনুভূত—এখনও তাহাদের সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা এই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কোনও প্রাকৃতিক দৈবদুর্ব্বিপাক, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, শুভ কর্ম্মের সূচনা বা বৈরাগ্যমিশ্র ভক্তির প্রেরণা তাহাদিগকে সংকীর্ত্তনের আশ্রয়-গ্রহণে প্রণোদিত করে। এই সংকীর্ত্তনের মধ্যে পূজা-পার্ব্বণের পোষাকী দুষ্প্রাপ্যতা নাই; ইহা বিশেষ কোন তিথি, কোন সুনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা উদ্যোগ-আয়োজনের নিখুঁত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। ইহার আয়োজন অতি সামান্য; ইহার বিধি অত্যন্ত সরল; ইহা অকৃত্রিম, স্বতস্ফূর্ত্ত ভক্তিরসের সহজ বিকাশ। ইহা জপ-ধ্যান-সাধনার কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়া মানব-মনকে এক প্রত্যক্ষ উপায়ে অধ্যাত্মলোকে উন্নীত করে, ভগবদারাধনার এক অতি সহজ প্রণালী নির্দ্দেশ করে। সুরের মাধুর্য্যে, ভাবের উচ্ছ্বসিত আবেগে, বহু মনের একলক্ষ্যাভিমুখীনতায় ও পারস্পরিক প্রভাবে ইহা একটী নিবিড় ভাব-তন্ময়তার আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া এই পাপ-পঙ্কিল ধরাতলে এক স্বল্পকালস্থায়ী স্বর্গরাজ্যের বর্ণবিন্যাস করে।

(২)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠত্বের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্র-মহিমা; দ্বিতীয়তঃ অগণিত ভক্তের জীবনে ইহার আদর্শের আন্তরিক ও প্রজ্ঞাশীল অনুসরণ। চৈতন্যদেব জগতের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা-সংঘের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক—মাত্র চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তিরোভাব ঘটিয়াছে। যদিও ভক্তবৃন্দের উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তির আতিশয্যের জন্য তাঁহার জীবনীতে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তথাপি তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধ মানবিক আকর্ষণ ইহার দ্বারা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যাহারা তাঁহার অবতারত্বে আস্থাহীন, তাহারাও তাঁহার মহামানবত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। শত শত ভক্তের লেখনীতে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে যাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের অনুপম মাধুর্য্য, অসীম করুণা, বাহ্যজ্ঞানহীন ভক্তি বিহ্বলতা ও দিব্যোন্মাদ এবং অধ্যাত্ম আদর্শের অননুকরণীয় শুচিতা আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে। সুদূর অতীতকাল হইতে অতিসন্নিহিত বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কাহারও জীবনী আমাদের নিকট এত সুপরিচিত, কাহারও ব্যক্তিত্ব এত সুস্পষ্ট নহে। চৈতন্যদেবের জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা, তাঁহার মানস অবস্থার প্রত্যেকটী স্তর, তাঁহার গৌরবর্ণ দেহে ভাব-কদম্বের প্রত্যেকটী রোমাঞ্চ-শিহরণ, তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেম ও করুণার প্রতি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস, এমন কি তাঁহার কথোপকথন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটী পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-চরিতকারদের দক্ষ অঙ্কনের সাহায্যে আমাদের মানস চক্ষুর নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বালক নিমাইএর শৈশব দুরন্তপনা হইতে তাঁহার যৌবনের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রাভিমান, তার পর তাঁহার জীবনের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, তাঁহার সংসার-বন্ধনচ্ছেদের হৃদয়-গ্রাহী, করুণ কাহিনী, তাঁহার অপরূপ নৃত্যসুষমায় লীলায়িত কীর্ত্তনানন্দ, তাঁহার শেষ-জীবনের ধ্যান তন্ময়তা, ভাবাবেশ ও আনন্দ-বিভোর সংজ্ঞাহীনতা—যাহাদের চোখে দেখিয়াছি তাহাদের জীবনী অপেক্ষাও এই সমস্ত দৃশ্যগুলির সঙ্গে যেন আমাদের আরও গভীর, অন্তরঙ্গ পরিচয়। অনুপম "গৌরাঙ্গতনুলাবণী" লইয়া কত শত পদ রচিত হইয়াছে; কত অজস্র-ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা গৌরাঙ্গদেবের সাত্ত্বিক-ভাবোৎপন্ন স্বেদ-বিন্দু-মকরন্দের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের, স্নিগ্ধ, নিরভিমান আচরণের, আচণ্ডাল প্রেমবিতরণে অকৃপণ উদারতার উদ্দেশ্যে কত উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতির অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে! এ হেন মহাপুরুষ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমাদের অধ্যাত্মজীবনের একটী গভীরতম আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিয়াছে, অন্তরের একটা চিরস্থায়ী প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছে। কাজেই আধুনিক যুগেও ইহার প্রেরণা ও প্রভাব নিঃশেষিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের স্মৃতি আমাদের মনে যে পরিমাণে উজ্জ্বল থাকিবে, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মও ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের জীবনে কার্য্যকরী হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন বিষয়ে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত ও পরিকরবৃন্দ যেরূপ প্রচার-নৈপুণ্য ও সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুদ্বয় বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রেম-ধর্ম্মের প্লাবন বহাইয়া দিলেন ও বিধিবদ্ধ সমাজ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মঠ—আখড়া গড়িয়া উঠিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের জপ-আরাধনা-পদ্ধতি সুনির্দ্দিষ্ট হইল, ত্যাগ, বিনয় ও বৈরাগ্যের আদর্শে গঠিত জীবনযাত্রা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল ও সাম্প্রদায়িক সংঘবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা জীবনের নিয়ামক শক্তিরূপে অলংঘনীয় মর্য্যাদা লাভ

করিল। এই বিষয়ে বঙ্গদেশের ভক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী-গোষ্ঠীর সহযোগিতা মণি-কাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় ফলপ্রসূ ও সুষমান্বিত হইয়া উঠিল। গোস্বামীগণ এই নব-ধর্মের বেদ রচনা করিলেন, ইহার দার্শনিক ভিত্তি, ইহার স্মৃতির অনুশাসন, ইহার সাংস্কৃতিক গৌরব তাঁহাদের কর্তৃক অদ্ভুত শিল্প-সুষমাবোধ ও নির্ম্মিতি-কৌশলের সহিত গঠিত হইল। কীর্ত্তনের ভাব-গদ্‌গদ ভক্তি-বিহ্বলতা ও পদাবলীর অনুপম কাব্যসৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ইহার মাধুর্য্যরস জনসাধারণের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। চৈতন্যোত্তর সমাজে বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-মহিমায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল, ও ভক্তিশ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ পাত্র হিসাবে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব" এই যুগ্ম শব্দের সমাবেশ-নৈকট্য ভাষার মধ্যে ইহাদের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার স্থায়ী নিদর্শন-স্বরূপ স্থান লাভ করিল। চৈতন্য-ভক্ত সাধুজনের দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক-ভাবে অনুশীলিত হইয়া সমাজে এক নূতন মহিমান্বিত আদর্শকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত নব-জাগরণের যুগ। মঙ্গল-কাব্যের গতানুগতিক ধারার অনুসরণে ক্লান্ত সাহিত্যসৃষ্টি অকস্মাৎ এক নূতন ও অফুরন্ত রস-উৎসের সন্ধান পাইয়া নবজীবনের পরিপূর্ণতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—নূতন সুরের মূর্চ্ছনায়, অভিনব ভাবোন্মেষের ঐশ্বর্য্যে, উপমার বিস্ময়কর প্রাচুর্য্যে হৃদয়ানুভূতির অকৃত্রিম গভীরতায়, সৌন্দর্য্যবোধের নব-নবায়মান অভিব্যক্তিতে সাহিত্যের অর্দ্ধমৃত শুষ্কতরু ফুলে-ফলে অঙ্কুরিত হইল। ভক্তির অনিবার্য্য প্রেরণা কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিল, হৃদয়ের আলোড়ন ছন্দোবৈচিত্র্যের নূপুরশিঞ্জিতে ধ্বনিরূপ লাভ করিল, নয়নের উদ্‌গত প্রেমাশ্রু সুরভিত কুসুম-স্তবকের ন্যায় কাব্যলক্ষ্মীর পুলকিত দেহে ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের আবেগের যেটুকু কাব্যের রন্ধ্রপথে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, সেই অতিরিক্ত অংশ কবিদের দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত ইতিহাস-বোধকে জাগাইয়া তুলিল ও বাস্তব-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন-চরিত-রচনার সূত্রপাত করিল। সংস্কৃতে ও বাংলায় মহাপ্রভুর যে অসংখ্য জীবনী রচিত হইল, সেগুলিতে অলৌকিক ঐশী শক্তির স্তবস্তুতি দৃঢ়বদ্ধ তথ্য-সন্নিবেশের অধ্যাধারে নিবেদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুগ্ধ কল্পনাবিলাস ও সচেতন তথ্যানুযুক্তির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জীবন-ঘটনার প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটি, তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটনের পুংখানুপুংখ বিবরণ, তাঁহার গতিপথের নিখুঁত মানচিত্র-অঙ্কনের-প্রয়াস, তাঁহার ভ্রমণ-সঙ্গীদের বিস্তৃত পরিচয়, তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপের দিনলিপি-রচনা—এই সমস্তই এক নব বাস্তব-বোধ ও দায়িত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ সূচনা করে। সনাতন অতিরঞ্জন-প্রবণতা ও অতিপ্রাকৃতে অক্ষুণ্ন বিশ্বাস এই বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় বহিয়া গিয়াছে ও পরস্পর নিরপেক্ষ এই দুই বিপরীত ধারার একত্রাবস্থিতি যে উদ্ভট অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে; ভক্তিবিহ্বল লেখকদের সঙ্গতিবোধ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি অনুভব করে নাই।

(৩)

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম যে সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফল আরও সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক। তিনি বাঙ্গালীর মনে যে ভাবের প্লাবন বহাইয়া দিলেন তাহাতে সমাজের সনাতন শ্রেণীবিভাগ-গুলির সীমারেখা ধুইয়া মুছিয়া গেল। সকল দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যে অলৌকিক কিম্বদন্তী জড়িত থাকে, বাঙ্গালী ঐতি-হাসিক যুগে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঐন্দ্রজালিক দ্রুততার সহিত অবিশ্বাস্য পরিবর্ত্তন পরম্পরা ঘটিতে লাগিল। পাপী জগাই মাধাই চক্ষের নিমিষে শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হইল; জ্ঞানাভিমানী বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর ন্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; নরপতি প্রতাপরুদ্র এই মহাসন্ন্যাসীর চরণতলে নিজ মুকুট লুটাইয়া তাঁহার প্রসাদ-কণিকা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন; রাজনীতি-চর্চ্চায় অভিজ্ঞ, ঘোরতর বিষয়ী রূপ-সনাতন লৌকিক মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় বিভোর হইলেন; রাজ-কুমার রঘুনাথ আধুনিক যুগের বুদ্ধের ন্যায় রাজৈশ্বর্য্য ও সংসারসুখ উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। পৌরাণিক যুগের বিস্ময় আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনীত হইল; পৃথিবীর উপর স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়

"এসেছে সে এক দিন
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।"

বুদ্ধদেবের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে বাঙ্গালী কি আকর্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ-বিহারের অধ্যক্ষত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিল, অতীশ-দীপংকরকে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য হিমালয়ের অপর পারে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার উপলব্ধি আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অনুমানের কুহেলিকাচ্ছন্ন। কিন্তু চৈতন্যধর্ম্মের নিবিড় মোহ ও অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আমরা এখনও হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীতে, রক্তপ্রবাহের শিরা-উপশিরায় অনুভব করি।

অপেক্ষাকৃত নিম্ন লৌকিক স্তরেও পরিবর্ত্তনের কাহিনী কম বিস্ময়াবহ নহে। বৈষ্ণবের মঠ-আখড়ায় অধ্যাত্মসাধনার নূতন প্রণালী, শান্তিময়, বিষয়-নিঃস্পৃহ নূতন জীবনাদর্শ অনুশীলিত হইতে লাগিল—তাহার গ্রাম-প্রান্তস্থিত কুঞ্জবনে বৃন্দাবনের চিরতরুণ সরসতা ও মাধুর্য্য-রসাস্বাদের আংশিক প্রতিচ্ছায়া মায়া বিস্তার করিল; যমুনাতীরের স্মৃতিসুরভিত মলয়ানিল-স্পর্শ স্বপ্নাতুর কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিল। রাজনৈতিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগগুলিতে অত্যাচারের খররৌদ্রতাপ বাঙ্গালীর চিত্তকে যে সম্পূর্ণ ঝলসাইয়া দিতে পারে নাই তাহার মূলে এই স্নিগ্ধ শান্তিনীড়-সমূহের প্রতিষেধক শক্তির কতখানি প্রভাব তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? তাহার মন এই রসনির্ঝরে অবিরত সিক্ত থাকিত বলিয়াই বোধ হয় বিপ্লব-

ঝটিকাতাড়িত মরু-বালুকার শুষ্কতা ইহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব-কবির প্রেরণায় রসার্দ্র চিত্তভূমিতেই ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের বীজ এত সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারিয়াছিল।

প্রাকৃত জনসাধারণের মনেও অজ্ঞাতসারে এই রসধারা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। উহার নিবিড় আনন্দে বাঙ্গালীর অন্তর কাণায় কাণায় পূর্ণ; মণ্ডলীনৃত্যের ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহু যেন তাহার অধ্যাত্ম অভীপ্সার পরিমাপ ও বহির্বিকাশ। নূতন নূতন মেলা ও মহোৎসবের প্রচলন বাঙ্গালীর সামাজিক হৃদ্যতা ও অতিথি-পরায়ণতাকে নূতন আত্মবিকাশের অবসর দিল, তাহার সমাজ চেতনাকে নূতন স্ফূর্ত্তির পথে অগ্রসর করিল। এই মেলা-মহোৎসব-গুলি তাহার পরাধীনতা-পিষ্ট, অভাবক্লিষ্ট জীবনের মরুভূমিতে সরসতার নির্ঝর বহাইয়া সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামশ্রীমণ্ডিত ভূমিখণ্ড রচনা করিল। বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণের যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সার্থকতা প্রতিপাদনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবদান নিতান্ত সামান্য নহে। পৌরাণিক দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে বৈষ্ণবের রথ, স্নান, ঝুলন, রাস ও দোলযাত্রা মিলিত হইয়া বর্ষাবর্ত্তিত উৎসব-চক্রের সম্পূর্ণতা বিধান রহিল। মাতৃপূজার সম্ভ্রম-শুচিতার সহিত হোলির মত্ত আতিশয্য সংযুক্ত হইয়া ভক্তি-প্রবৃত্তির সমস্ত স্তরের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। এই নবাগত ধর্ম্ম নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের গণ্ডীভেদ করিয়া অবশ্য-পালনীয় বিধির মধ্যে নিজ স্থান করিয়া লইল। শ্রাদ্ধ-বাসরে কীর্ত্তন-গানের প্রচলন কখন আরম্ভ হইল জানি না। কিন্তু শ্রাদ্ধ বিধির মধ্যে ইহার অন্তর্ভুক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে সনাতন শাস্ত্র এই আগন্তুক ধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ধর্ম্মগুরুদের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় বাঙ্গালার তীর্থ-গৌরব অনেকটা ক্ষীণ—বাঙ্গালার খুব কম তীর্থস্থানই গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরীর মত সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শিব ও শক্তিপূজার পীঠস্থানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল প্রাদেশিক ভক্তমণ্ডলীকেই আকর্ষণ করিত। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসাদে বাঙ্গালার তীর্থস্থানের এই আপেক্ষিক অগৌরব ও অপকর্ষ অনেকটা ক্ষালিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও কৈশোরলীলা-ক্ষেত্র নবদ্বীপের মাহাত্ম্য প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিয়াছে; আর বৃন্দাবন ও পুরীর আধুনিক প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদেরই সৃষ্টি—উভয় তীর্থই চৈতন্য-দেবের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত হইয়া তাহাদের পৌরাণিক মহিমাকে নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছে। তা ছাড়া, তীর্থের মাহাত্ম্য কেবল তাহার আকর্ষণের পরিধির উপরই নির্ভর করে না, করে ইহার অনাবিল ভক্তি উদ্দীপন করার শক্তির উপর। সেই হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম সমস্ত দেশে নানা ছোট ছোট পুণ্যভূমি সৃষ্টি করিয়া পল্লীবাসীর চিত্তকে ভক্তিরসে আর্দ্র রাখিয়াছে, ধর্ম্মসাধনার প্রতি উন্মুখ করিয়াছে ও গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রাম্য তীর্থ-গুলি ঠিক যেন আমাদের মাঠের ছোট ছোট জলাশয়গুলির মত—পুকুরগুলি যেমন অনাবৃষ্টির টানের মধ্যে শুষ্কপ্রায় শস্যগুচ্ছকে জিয়াইয়া রাখে, তেমনি এই সমস্ত অনাড়ম্বর পল্লী-তীর্থগুলি তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংসারতাপক্লিষ্ট মানবের ধর্ম্মবোধকে বিলুপ্তির গ্রাস হইতে রক্ষা করে। হয়ত কোন বৃহৎ চিত্ত-শুদ্ধি দিবার ইহাদের ক্ষমতা নাই, ধর্ম্ম-সাধনার উন্নত স্তরে পৌঁছাইয়া দিবার মত সম্বল ইহাদের অনায়ত্ত; ইহারা কেবল দুর্ভিক্ষের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষার মত কোনরকমে প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, জীবনে এইরূপ পরিচর্য্যার মূল্য বড় কম নহে। আমাদের প্রতিদিনের অন্নের মধ্যে অমৃতের কণিকাবিন্দু নিহিত আছে। শীর্ণ-প্রবাহিনী ঝরণার মধ্যে ভাগীরথীর বিপুল বিস্তার ও কলুষনাশিনী পাবনী শক্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার অন্ততঃ তৃষ্ণার অঞ্জলি পূর্ণ করিবার মত উপকরণ আছে।

(৪)

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের অবদান-প্রাচুর্য্যের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বাঙ্গালার কাব্যে, দর্শনে, স্মৃতিব্যবস্থায়, লৌকিক আচার-ব্যবহারে ও ধর্ম্মসাধনায় ইহার প্রভাব গভীর ও অবিস্মরণীয়। কিন্তু অধুনা ইহার সে গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিয়াছে। আর বৈষ্ণবধর্ম্ম শক্তি-প্রাচুর্য্যের প্রেরণায় দিগ্বিজয়ে বাহির হয় না; নাস্তিক অবিশ্বাসীর চিত্তপরিবর্ত্তনের বা ভগবৎ প্রেম-বিতরণের উপযোগী প্রাণসম্পদ ইহার নাই! ইহা এখন বহির্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া নির্জ্জন গৃহকোণে অধ্যাত্ম সাধনায় রত। অনেকের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গমূলক আড়ম্বর অন্তরের ধর্ম্ম-প্রেরণাকে অভিভূত করিয়াছে—আদর্শ আত্ম-প্রচারের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। ইহাই সকল ধর্ম্মের শেষ পরিণতি—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অঙ্গার-নির্ব্বাপণ! যে কাঠে আগুন জ্বলে, যে প্রক্রিয়ায় ধর্ম্মবোধ উজ্জ্বল হয়, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার চিতাশয্যা রচনা করে—সূতিকাগারই নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানে সমাধিস্থলে পরিণত হয়। মহাকালের এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অনুযোগ বা বিদ্রোহ বৃথা। বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগেও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনা একেবারে স্তব্ধ হয় নাই। প্রেম-বিহ্বলতা ও বিষয়-বৈরাগ্যের আতিশয্য রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। উড়িষ্যার কোন কোন ঐতিহাসিক খেদ করেন যে গজপতি প্রতাপরুদ্রের আত্যন্তিক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রীতি তাঁহাকে রাজকার্য্যে উদাসীন করিয়া উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-লোপের কারণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তির—"বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতন কূলে জন্ম বটে, কিন্তু ইহা বৌদ্ধধর্ম্মে জাত দিয়াছে"—পিছনে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আজ বাঙ্গালীর যে অত্যন্ত কোমল, নমনীয় মনোবৃত্তি, ও মেরুদণ্ডহীনতা তাহার কর্ম্মশক্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাকে

মুহুর্মুহু শিথিল করিয়া দিতেছে, তাহার অপরিমিত ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহার মূলে হয়ত কিছুটা চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রভাব থাকিতে পারে। অবিরত ভাবোচ্ছ্বাসসিক্ত জলাভূমিতে দৃঢ় পাদক্ষেপের অবসর থাকে না, রাজনৈতিক সৌধনির্ম্মাণোচিত দৃঢ় ভিত্তি মিলে না। আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত জগতে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিক্ষুব্ধ বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আধুনিক যুগের উত্তরাধিকারী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ-সংশয় স্বভাবতঃই জাগে। কিন্তু এই বাস্তব অনুপযোগিতাই নীতির উৎকর্ষ বিচারে একমাত্র মানদণ্ড নহে। ইহা খুবই সম্ভব যে অহিংসা বা প্রেমধর্ম্মকে কার্য্যকরী করিতে হইলে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ইহার অনুশীলন প্রয়োজন, তাহা আমাদের শক্তির অনায়ত্ত। আততায়ীর উদ্যত অস্ত্রের নিকট শুধু বিনা প্রতিরোধে নয়, ভীতিহীন ও বিদ্বেষহীন, প্রসন্ন চিত্তে আত্মসমর্পণ মানুষের বর্ত্তমান নৈতিক পরিণতির স্তরে অসাধ্য। মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিশোধ-স্পৃহা ও জিঘাংসা জাগ্রত হইলে দৈহিক নিশ্চেষ্টতার কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। বিশেষতঃ এই অপ্রতিরোধের সঙ্গে কাপুরুষতার ভেদ-রেখা নির্দ্ধারণ করাও সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু যদি চৈতন্যদেবের ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ পূর্ণভাবে বাস্তব কার্য্যক্রমে প্রযুক্ত হইতে পারিত, তবে বোধ হয় পৃথিবীর রূপটাই বদলাইয়া যাইত। যখন আমরা মুখে কোন বৃহৎ আদর্শের দোহাই পাড়ি, তখন ভিতরে ভিতরে আমাদের সুবিধাবাদ, ভীরুতা, জয়-পরাজয়-সম্ভাবনার আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলি উহার তলে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহাকে দুর্ব্বল ও অনির্ভরযোগ্য করিয়া তোলে। এই জন্য মহান্ আদর্শ বাস্তব জীবনের পরীক্ষায় লাঞ্ছিত হয়; বার বার অকৃতকার্য্যতার নজীরে ইহাকে বাস্তব কর্ম্ম-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করা হয়। ইহার জন্য অপরাধ কেবল আদর্শের অননুসরণীয়তার নহে, অপরাধ আমাদের আদর্শের অনুসরণে আন্তরিকতার অভাবেরও।

যাহা হউক বৈষ্ণবধর্ম্ম যে এখনও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে সজীব ও সক্রিয় আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ইহার চর্চ্চা ও অনুশীলন করেন ও তাঁহাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহার আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। অঙ্গারস্তূপের মধ্যে এখনও অগ্নিশিখা সুপ্ত আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টার অনুকূল বায়ুপ্রবাহে এই নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিকে আবার প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় বৈষ্ণবতীর্থগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় বিদ্যমান—মহাপুরুষের স্মৃতিজড়িত এই স্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে, ইহাদের অতীত মহিমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। বক্তৃতা, প্রচারকার্য্য, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির দ্বারা এই সমস্ত মহাপুরুষের কীর্ত্তিকে আবার জনসাধারণের নিকট উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। রামকেলিতে রূপসনাতন, খেতুরীতে নরোত্তমদাস, ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদের স্মৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে অমৃতধারা তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন তাহার আস্বাদ আমাদের রসনাকে নূতন করিয়া উপভোগ করাইতে হইবে। সেই সমস্ত স্থানে মেলা-মহোৎসবের প্রবর্ত্তন দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা পরিবেশনের আয়োজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর ভারার্পণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি, কাব্য ও দর্শনকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হইবে। এইরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার দ্বারা এই জড়বাদ ও পশুশক্তিবাদের যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নত আদর্শকে জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে অতীতের উত্তরাধিকারকে সে ঠিক জীয়াইয়া রাখিতে পারে না। সে যেমন তাহার হৃদয়াবেগের সঞ্চয়কে, তেমনি তাহার ঐতিহ্য সম্পদকেও জীবনের পথে পথে ধূলিকণার মত ছড়াইয়া দিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার নূতন আহরণের পথ বিস্মৃতির ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়া। নদীর স্রোত যেমন তটের এক দিক ভাঙ্গে—আর এক দিক গড়ে, মানবের মানস অগ্রগতিও তেমনি এক দিকে পুরাতনকে ভোলে ও অন্যদিকে নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করে। আমরা পুরাণের যুগে গীতা-উপনিষদকে ভুলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভুলিয়াছি, রঘুনন্দনের অনুশাসনের প্রভাবে পূর্ব্বতন উদারতা ও সাম্যভাবকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, জড়বাদ ও বিজ্ঞানের যুগে প্রাচীন অধ্যাত্মবোধের সারাংশ ফেলিয়া তাহার বাহ্য আবরণটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেই জন্য আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এক কালগত যোগ ছাড়া আর কোন অস্থিমজ্জাগত সংযোগ গড়িয়া উঠে নাই। এই সর্ব্বযুগ-প্রসারী, সর্ব্বসংস্কৃতিমিলনকারী সংশ্লেষণ-শক্তির (Synthesis) অভাবেই আমাদের জীবনে আসিয়াছে অগ্রগতির পরিবর্ত্তে চক্রাবর্ত্তন। তাই যে পশুযুগকে আমরা বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, অতি আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও তাহার প্রভাব আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। তাই উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইতে কোন নির্ভরযোগ্য অবলম্বনের অভাবে আমরা পা পিছলাইয়া আবার ভূতলশায়ী হই। জানিনা মানুষ কোনদিন তাহার এই পশ্চাদপসরণপ্রবণতা জয় করিতে পারিবে কি না। তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ সাধনা এই এক-লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার প্রয়োজন। যদি এই সাধনায় কোনদিন সিদ্ধিলাভ হয়, তবে সমস্ত অতীত যুগের প্রাণশক্তি আমাদের রক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইবে, সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কৃতি আমাদের মানস ঐশ্বর্য্যও প্রসারে প্রতিফলিত হইবে ও আমরা আধুনিক যুগে বাস করিয়াও বেদ, উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্ম্মের বিচিত্র প্রেরণা ও নিগূঢ় প্রভাব আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর মধ্যে রূপায়িত করিতে পারিব।

(নিখিল-বঙ্গ-বৈষ্ণব-সাহিত্য-সম্মেলনে মূল-সভাপতির অভিভাষণ)

ছিন্নলিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

দূর থেকেই ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে: বন্দেমাতরম, বন্দে-মাতরম্। বৈশাখী বিকেলে ঈশান কোণ থেকে যখন হু হু করে একটা উন্মাদ কালো ঝড় ছুটে আসে—বয়ে নিয়ে আসে দূরের গাছপালাগুলো থেকে একটা উতরোল আর্তনাদের শব্দ, ঠিক তেম্নি ভাবেই শোনা যাচ্ছে: বন্দেমাতরম্—বন্দে—

ইস্কুলের সামনে প্রায় দুশো আড়াইশো ছাত্র। চারদিকের চারটে ফটক তারা আগলে রেখেছে, পাঁচ সাতজন করে শুয়ে আছে ফটকের সামনে। যারা ঢুকতে চাও, তাদের মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। দুটি চারটি ভালো নিরীহ ছেলে বিপন্নের মতো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে আছে একটা সুযোগ পেলেই সাঁ করে ভেতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু ওই সব গোবেচারী ভালো ছেলেদের ওপরে কড়া নজর আছে সকলের।

ওদের মধ্যে বজ্রী বলে একটা ছেলে কী করে ঢুকে পড়ল ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে। আর ঢোকবামাত্র আর কোনো কথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ইস্কুলেরদিকে। পেছন থেকে শতকণ্ঠে ধিক্কার উঠল: শেম্—শেম্—

কে একজন বলতে যাচ্ছিল, একবার বেরিয়ে আসুক না ওখান থেকে। চিরকাল তো আর ইস্কুলে বসে অ্যাল্জাব্রা কষতে পারবে না। একবারটি বেরিয়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে এক চাঁটিতে—

কিন্তু আক্রোশটা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই আর একজন কেউ মুখে একটা থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। বললে, চুপ। আমরা সত্যাগ্রহী—কোনো রকম ভায়োলেন্সের কথা আমাদের মুখে কেন, মনেও আসতে পারবে না।

একটু দূরেই ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে কালো হ্যাট্ পরে দাঁড়িয়ে আছেন হেড্ মাস্টার। তাঁর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে; চাপা আক্রোশে কোঁচকানো ক্রুদুটো চোখের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে—হঠাৎ একটা জোরালো আলো চোখে পড়লে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সেই রকম। সত্যিই তো, বড্ড বেশি জোরালো আলো পড়েছে। সদ্য রায়সাহেব হয়েছেন হেড্মাস্টার—এ আলো তাঁর সহ্য হচ্ছে না। নতুন যুগের নতুন সূর্য উঠেছে ছেলেদের রক্তের ভেতরে, হাজার হাজার চোখে সে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সূর্যকিরণের চেয়ে অতসী কাচের প্রতিফলন যে অনেক বেশি দুঃসহ একথাই বা কে অস্বীকার করবে।

বজ্রীর এই আকস্মিক সাফল্যে হেড্মাস্টার যেন অনুপ্রেরণা পেলেন একটা। হিংস্রভাবে নাচের ঠোঁটটাকে বার কয়েক চিবিয়ে নিলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এলেন ছেলেদের দিকে। আগুন-ঝরা গলার ডাক দিলেন: মৃগাঙ্ক।

ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় মৃগাঙ্ক ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ছেলে, আজ পর্যন্ত তার মুখের হাসির কেউ ব্যতিক্রম দেখেনি। মৃগাঙ্ক এক মুখ হাসি নিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি কিছু বলতে চান স্যার?

—বলতে চাই? হাঁ—বলতে চাই বই কি।—হতাশা-জর্জরিত রুদ্ধস্বরে হেড্মাস্টার বললেন, তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি।

—অন্যায় তো কিছু করিনি স্যার।

—অন্যায় করোনি!—বিকৃত ভঙ্গিতে হেড্মাস্টার বললেন: পড়াশুনো বিসর্জন দিয়ে ভারত মাতাকে মুক্ত করা হচ্ছে! তা করো—আপত্তি নেই। নিজেরা গোল্লায় যাবে যাও, কিন্তু অন্য ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন?

সত্যাগ্রহী মৃগাঙ্ক চটল না: আমরা তো আর কারুর মাথা খাইনি স্যার।

—খাওনি ?—হেড্ মাস্টার বললেন, নিজেরা ইস্কুল বয়কট করেছ করো, কিন্তু যারা আসতে চাইছে তাদের বাধা দিচ্ছ কোন্ অধিকারে ?

মৃগাঙ্ক তেমনি হাসতে লাগল : মনুষ্যত্বের অধিকারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার, আপনাকেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেটা সত্য, সেটা অন্যকে বোঝাতে সকলেরই অধিকার আছে স্যার।

—বটে !—হেড্ মাস্টারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল : খুব বড় বড় কথা শোনাচ্ছ যে! আচ্ছা বেশ, এ সম্পর্কে আমারও কতটা অধিকার আছে সেটা একবার জানানো দরকার।

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরলেন হেড্ মাস্টার। উচ্চকণ্ঠে উঠতে লাগল : বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

মিথ্যেই শাসাননি রায়সাহেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিশ! লাঠিধারী ভোজ-পুরী আর সশস্ত্র গুর্খার দল। মস্তিষ্কহীন যান্ত্রিক মানুষ—চোখে মুখে ক্লান্ত গ্লানির অপচ্ছায়া।

তরোয়াল ঘুরিয়ে উইণ্ড-মিলের সঙ্গে লড়াই করত কোন্ পাগলা লোকটা? ডন্ কুইক্সোট্। গল্পের বইতে তার ছবি দেখেছিল রঞ্জু—এবার চোখের সামনে তাকে দেখতে পেলে।

বাঙালি ডি-এস্-পি—নামটা শুনেছিল, দিগম্বর সাহা। বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়াবার মতো অস্থিসার চেহারা। আলনায় ঝোলানো জামার মতো শরীরে ঢল ঢল করছে ইউনিফর্মটা। রোগা হাঁটু আর হাড়সর্বস্ব পায়ে জুতো মোজা যেমন বেখাপ্পা, তেমনি বেমানান দেখাচ্ছে—কেন যেন "পুস্ ইন্ বুট্স"-এর গল্প মনে পড়ে যায়। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলভার, গাঁট বের করা আঙুলে সেটাকে আগলে আছেন ডি-এস্-পি; সন্দেহ হয় রিভলভার ছুঁড়বার আগেই আঙুলগুলো প্যাকাটির মতো মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে কিনা।

চেরা-গলায় ডি-এস্-পি হুঙ্কার ছাড়লেন। হার্মোনিয়ামের প্রথম আর শেষ রীড্ দুটো একসঙ্গে টিপলে যেমন একটা মিহি-মোটা বিচিত্র দ্বিস্বর বেরোয়, গলার আওয়াজটা শোনালো সেই রকম।

শাদা বাংলায় বললে পাছে ছেলেরা বুঝতে না পারে সেজন্যে দিগম্বর সাহা সাধু ভাষায় বললেন, বালকগণ, তোমরা বে-আইনি কাজ করিতেছ।

উত্তর এল : বন্দে মাতরম্—

—যদি ভালো চাও তো এখনি এখান হইতে প্রস্থান কর।

জবাব এল : মহাত্মা গান্ধী কী জয়—

—শেষবার বলিতেছি, না গেলে লাঠি চালাইবার হুকুম দান করিব। গুলিও চলিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ছেলেরা : ভারত মাতাকি জয়—

হার্মোনিয়ামের দুটো স্বর এবার চারটে হয়ে ঠিকরে বেরুল : লাঠি চার্জ।

লাঠি চলল। প্রথমে পড়ল মৃগাঙ্ক, তারপরে আরো, আরো, আরো অনেকে। দশজন পালালো, বিশজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। রক্তের ছিটে বইল স্রোত হয়ে। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। লাঠি চালাতে পারো, গুলি ছুঁড়তে পারো, কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে পারো না।

আহত ছেলেদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ফেলা হল। বাকী জনপঞ্চাশকে একটা মোটা কাছি দিয়ে কর্ডন করে নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, সেখান থেকে জেলখানাতে। ধুলো আর রক্তের রাজটীকা পরে অকম্পিত পায়ে এগিয়ে চলল ছেলেরা।

রঞ্জু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

উনিশ শো তিরিশ সালের ছবি। অজস্র, অসংখ্য।

চৌমাথার মোড়ে একটা বেঞ্চি টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিন চারটি খদ্দরের টুপি পরা ছেলে। একজন বলতে সুরু করল : বন্ধুগণ, বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচারে—

দুদিকের ভিড় সরে গেল। দারোগা ঢুকলেন বাহিনী নিয়ে।

দারোগা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করুন!

ছেলেটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। বলে চললে, নির্মম অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। আজ এই অত্যাচারের জবাব দিতে হলে—

দারোগা বললেন, নেমে আসুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এইবার উঠল দ্বিতীয়জন। দারোগা বললেন, আমি

নিষেধ করছি, আপনি এখানে কোনো কথা বলতে পারবেন না।

দ্বিতীয় বক্তা কথা বললে না, আবৃত্তি সুরু করলে :

"ওরে তুই ওঠ্ আজি,
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি"

—নেমে আসুন—ইউ আর অ্যারেস্টেড্।

তৃতীয় জন বক্তৃতা করলে না, আবৃত্তিও না—সোজা গান ধরে দিলে :

"বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—"

—আপনাকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

ছবির শেষ নেই। একটার পর আর একটা—অসংখ্য গণনাতীত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—রঞ্জু এর ভেতরে যেন দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অসহ্য উন্মাদনায় ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে মাথার শিরাশ্রেণী-গুলো, তবু কোথায় যেন বাধা পড়েছে তার। এই উন্মত্ত জীবন-স্রোতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি। নিজের ভেতরে একটা বিচিত্র একাকিত্ব—বড়বাবুর ছেলের আশৈশব-লালিত স্বাতন্ত্র্য-বোধনা তাকে সরিয়ে রেখেছে। ভরা গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে দেখেছে বন্যাকে, তার ফেনিল ভয়ঙ্কর রূপকে, কিন্তু একটি মাত্র পা এগিয়ে গিয়ে সেই প্লাবনছন্দে মাতামাতি করতে পারেনি। খোলা জানলার মধ্য দিয়ে যেমন করে দেখেছিল তিরিশ সালের বন্যাকে—ঠিক সেই রকম। কেন? রঞ্জু ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতে পারত : মনের ভেতরে যত প্রচণ্ড হয়ে তার ঝড় জেগে ওঠে, বাইরের পৃথিবী তার কাছে তত ছোট হয়ে যায়। সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোকে উগ্র প্রখর করে দিয়ে, বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তিষ্কে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থিরভাবে পায়চারী করে সে নিজের ভেতরে আস্বাদন করতে ভালবাসে বিপ্লবের আবর্তকে; আর অদ্ভুত—বাইরে সে ভীরু, সে সংশয়ী। আত্মকেন্দ্রিক—ব্যক্তি আর অনুভূতি-সর্বস্ব। এখানেও তো প্রশ্ন উঠবে—কেন? শুধু রঞ্জু নয়, রঞ্জুর মতো আরো অনেকের কাছেই হয়তো এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ থাক। সত্যিই—ছবির শেষ নেই।

একটা তোবড়ানো আল্কাত্‌রার দাগ চটে-যাওয়া বিবর্ণ ছোট সাইন বোর্ড চোখের সামনে ভেসে উঠছে এবারে। কাঁচা অসমান অক্ষরে লেখা রয়েছে : "লাইসেন্স-প্রাপ্ত দেশী মদের দোকান। ভেণ্ডার : হারানিধি পাল। সময় সকাল আটটা হইতে রাত্রি নয়টা।"

কিন্তু আটটা বাজবার আগেই ভিড় জমে গেছে সেখানে। পিকেটিং চলছে।

একজন বলছে, ভাই, দেশের বড় দুর্দিন। মদ খেয়ে দেশের আর সর্বনাশ কোরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি, নেশা ছেড়ে দাও—

দশ বারোটি ক্রেতা জটলা করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর—ধাঙড়, মেথর জাতীয় লোক। নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকও আছে দু একজন। ফিটফাট বাবুদের মদ কেনাটা এমনিতেই আড়ালে আবডালে চলে, সুতরাং আপাতত তারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নেই—রয়েছে নেপথ্যে।

কাউণ্টারে আসীন লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার হারানিধি পাল বসে আছে প্যাঁচার মতো মুখ করে। গোল গোল মস্ত চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে যেন নরখাদকের দৃষ্টি। খালি গা, গলায় সোনার হারের সঙ্গে মস্ত বড় সোনার তাবিজ বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় দোল খাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের বিপুল বপু জুড়ে নিবিড় রোমা-বলীর স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয়, অনেকটা অনুসন্ধান করলে হয়তো চামড়ার সন্ধান মিলতে পারে। সবটা মিলিয়ে মনে হতে পারে, যেন শিকারের আশায় গেড়ে বসেছে একটা ভালুক।

কোমল স্বরে হারানিধি বললে, এ আপনাদের ভারী অন্যায় বাবুমশাই। এমনভাবে যদি আপনারা গরীবের অন্ন মারেন—

পিকেটারেরা তার দিকে ফিরেও তাকালো না। তারা বলে যেতে লাগল : ভাই সব কথা শোনো। বাড়ি ফিরে যাও—

ক্রেতাদের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অভ্যস্ত নেশার সময়ে এরকম অবাঞ্ছিত বিঘ্ন ঘটাতে সে খুশি হতে পারেনি। বললে, হামাদের পয়সায় হাম্‌লোগ দারু পিব, তুম্‌হারা কেনো বাধা দিতে আসিয়েছে বাবু?

বাকী লোকগুলো বোধ হয় এই কথাটার জন্তেই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল; সরিয়ে যাও—হামরা দারু পিব—হামাদের খুশি।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ালো পিকেটারেরা।

—না, তোমরা মদ খেতে পাবে না।

লোকগুলো চেঁচামেচি করছিল বটে, কিন্তু পিকেটারদের ঠেলে কেউ এগিয়ে যায়নি। কিন্তু রক্তে রক্তে অভ্যস্ত নেশার নিয়মিত দাবী। এগোতে পারছে না, পিছোনোও অসম্ভব। মদ ছাড়া ওদের চলবে না।

হারানিধি আবার কাতরকণ্ঠে বললে,যারা লিতে চাইছে, তাদের লিতেই দিন না। কেন খালি খালি আপনারা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন বাবুমশই ?

অবস্থাটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবেই হয়তো আরো খানিকক্ষণ চলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি লোক ঘটনা স্থলে প্রবেশ করল। লম্বা খিট্‌খিটে চেহারার লোক, গায়ে বিলিতী আদ্দির ফিন্‌ফিনে পাঞ্জবী, কানে একটা সিগারেট। বড় বড় বাবরী চুল, সংপ্রতি অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল—পরিপূর্ণ লম্পটের চেহারা। লাল চোখ দুটো চরকির মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার—দুদিন ধরে নেশা করতে না পারায় আপাতত খুন চড়ে উঠেছে তার মাথায়।

দোকানের সামনে এসেই বাবরী চুল আদেশ করলে হটো—তফাৎ যাও—

পিকেটারদের ভেতরে যে উৎসাহী হয়ে সকলকে বোঝাচ্ছিল এতক্ষণ, সেই-ই জবাব দিলে। বললে, কালতো ফিরে গিয়েছিলে ভাই ব্রিজ্‌বিহারী, আজও ফিরে যাও।

—কেয়া ? ব্রিজ্‌বিহারী কদর্য একটা মুখভঙ্গি করে গাল দিলে অশ্লীল ভাষায়। বললে, নেহি জায়গা, তুম্ ক্যা করোগে শালা ?

অপমানে এক মুহূর্তের জন্তে ছেলেটির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সংযম চক্ষের পলকে আত্মস্থ করে দিলে তাকে।

—তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই, ফিরে যাও।

—কেয়া লৌট্ যাউঙ্গা ? কভি নেহি। হটো শালা লোগ্—দিল্লাগি সে কাম ন চলে গা।

—না। তোমাকে মদ কিনতে দেব না।

—হটো—ব্রিজবিহারীর চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—না।

—না ?

নক্ষত্রবেগে মাটি থেকে একখানা থান ইট তুলে নিলে ব্রিজ্‌বিহারী—বসিয়ে দিলে সজোরে। আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটি। হাতের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল, তবু সেই অবস্থায় সে বলল, আমার কথা রাখো ভাই—মদ খেয়ো না।

তখন চারদিকে কলরব উঠেছে : খুন খুন। বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেছে মদ্যপায়ীর দল, ঝরাং করে কাউণ্টারের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে হারানিধি! সবাই পালিয়েছে, শুধু পালাতে পারে নি ব্রিজ্‌বিহারী নিজে। মাটির ভেতর থেকে একটা অলক্ষ্য শৃঙ্খল যেন তার পা দুটোকে আটকে ফেলেছে সেখানে।

রঞ্জু ভুলতে পারবে না ব্রিজবিহারীর সেই মুখ। আড়ষ্ট সংকুচিত হয়ে গেছে—বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেছে একটা বাসি মড়ার মতো। ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ছাদ ভেঙে পড়বার মতো নিজের অপরাধের আকস্মিক চৈতন্যনিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ব্রিজ্‌বিহারী, ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিজ্‌বিহারী থর থর করে কাঁপতে লাগল, তারপর আহত ছেলেটির মতোই দু হাতে নিজের মাথা মুখ ঢেকে বসে পড়ল ধুলোর ওপরে। যেন চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার।

মাতাল, লম্পট ব্রিজ্‌বিহারী নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। ব্রিজ্‌বিহারী আর কোনদিন মদ খাবে না। (ক্রমশঃ)

বঙ্গ-বিভাগ ও হিন্দুধর্ম্মসংস্কৃতি সংরক্ষণ

স্বামী বেদানন্দ

খণ্ডিত বাঙ্গলাকে প্রাণপণ সংগ্রামে অখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল যাহারা, সেই বাঙ্গালী হিন্দু পুনরায় অখণ্ড বাঙ্গলাকে তীব্র সঙ্কল্প ও প্রবল আগ্রহে খণ্ডিত করিয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু কংগ্রেসী, হিন্দু মহাসভাইট, সনাতনী—সকলেই অখণ্ড বঙ্গকে খণ্ডিত করিবার সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। কেন, কী উদ্দেশ্যে? বঙ্গদেশ যখন বিভক্ত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইল তখন বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে প্রশ্ন—বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, বিভাগ তো হইল; যে উদ্দেশ্যে বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্যটী কি এবং তাহা সম্পাদন করিবার পথে করণীয় কি কি? 'ততঃ কিম্'?

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা ও কর্ম্মীগণের মনে কি আছে—জানিনা। কিন্তু হিন্দু জনতার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার মনোভাব লক্ষ্য করিতেছি। একদল ভাবিতেছেন—লীগ গভর্ণমেণ্টের দশ বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; লীগ-রাহুমুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বঙ্গে নিশ্চিন্তে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকা যাইবে। আর একদল ভাবিতেছেন—বাঙ্গালাদেশে লীগ গভর্ণমেণ্ট তো চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছিল; জাতীয়তাবাদীগণের কোনো স্থান ছিল না, ভবিষ্যতেও স্থান পাইবার আশা ছিল না। বাঙ্গলায় যতটুকু বিভাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জুড়িয়া নিতে পারিলাম, ততটুকুই লাভ; জাতীয়তাবাদের একটী ঘাঁটি বাঙ্গলাদেশে রহিল। পূর্ব্ব পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের মনে আশ্বাস—পাকিস্থানী শাসন অসহ্য হইয়া উঠিলে হিন্দুবঙ্গ বা জাতীয়তাবাদী বঙ্গে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব। যাহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু-ধর্ম্ম ও সদাচার পালন করিয়া চলেন—অবশ্য তাহাদের সংখ্যা অল্প—তেমন হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি রক্ষার একটা স্থান বাঙ্গলাদেশে রহিল। এমনিতর নানা ভাব ও ধারণা হিন্দু জনগণের মধ্যে বর্ত্তমান। যখন বঙ্গ-বিভাগের জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর কণ্ঠে সম্মিলিত দাবী উঠিয়াছিল, তখন কোন্ উদ্দেশ্যটী মূল এবং কোন্ গুলি গৌণ—ততদূর সকলে ভাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

সর্ব্বপ্রথম যখন কয়েকব্যক্তি বঙ্গ বিভাগের যৌক্তিকতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন; তৎপরে যখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন, তখন যেটাকে উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাই ছিল—বঙ্গ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্য; বিভিন্ন দলের হিন্দুগণ বিভিন্ন গৌণ উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে যোগদান করেন। বঙ্গ-বিভাগের বা বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের সেই মূল উদ্দেশ্যটী কি ছিল? সে হইতেছে—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ।

বঙ্গ-বিভাগ তো হইয়াছে; কিন্তু উহার মূল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কি? দায়িত্ব কার? হিন্দুর ধার্ম্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং হিন্দুজননেতা ও কর্ম্মীগণের উপরেই উপরোক্ত দায়িত্ব।

হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝিব? লীগ গভর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক আঘাত আক্রমণাদির কবল হইতে হিন্দুর ধার্ম্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পদ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, রীতি নীতি, আচার প্রথা, স্বার্থ, অধিকার, সম্মান রক্ষাকেই পূর্ব্বে অনেকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিত? পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের সম্বন্ধে এখনো সেই তাৎপর্য্যই খাটে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণের সম্বন্ধে তো সে কথা আর এখন প্রযোজ্য নয়। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ প্রচেষ্টার কোনো আবশ্যকতা নাই?

এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্ব্বে আমরা বিচার করিব—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এবং তাহার রক্ষণ বলিতে আমরা কি বুঝি? হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আছে দুটা দিক—(১) আদর্শ ও সাধনার দিক; এটীকে তাত্ত্বিক দিক বলা চলে। (২) শিক্ষা-দীক্ষা, আচারপ্রথা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, মন্দির বিগ্রহাদি এবং ধার্ম্মিক, সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অধিকার প্রভৃতি;—এটীকে বাস্তব দিক বলা চলে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বলিতে উক্ত দুই দিকেরই রক্ষা বুঝিতে হইবে।

উক্ত প্রত্যেক দিকটী রক্ষণের জন্য কয়েকটী ক্রিয়া পন্থা অবলম্বনীয়। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ ও সাধনার দিক রক্ষা করিতে গেলে—(১) যেটুকু হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আছে, সেটুকু কু-সংস্কারমুক্ত করিয়া দিতে হইবে; (২) যেটুকু বিলুপ্ত হইয়াছে, সেটুকুর পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; (৩) হিন্দু সমাজের যে সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ কিছু নাই, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি শিখাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাস্তব দিকটীর রক্ষার জন্য কয়েকটী পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে—(১) যেগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, (২) যেগুলি বিলুপ্তির পথে সেগুলিকে বাঁচাইতে হইবে; (৩) যেগুলি আছে, সেগুলির উপর আঘাত আক্রমণ না আসে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু হিন্দুজনতার জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা কতটুকু দেখা যায়? বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে কয়জন দৈনন্দিন উপাসনা করে? কয়জনে পর্ব্বাহাদির অনুষ্ঠান পালন করে? কয়জনে মন্দিরে যায়? কয়জনে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করে? কয়জনে সদাচারানুষ্ঠান প্রথা পালন করে? কয়জনে হিন্দুয়ানী সম্মত আহার গ্রহণ ও পরিচ্ছদ

ব্যবহার করে? কয়জনে হিন্দু আদর্শে জীবনযাপন করে? কয়জনে হিন্দুত্বের প্রতি আস্থা ও গৌরব-গর্ব্ব পোষণ করে? এভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত যারা তাহাদের অধিকাংশই তো হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যারা ভাবেন যে তারা হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা লইয়া চলিতেছেন, তাহাদেরও প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন কতকগুলি লোকাচারে ও দেশাচারে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুজনতার অবশিষ্টাংশের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কোনো আলোক অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই।

সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক:—(১) হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ আদর্শ ও সাধনার প্রচার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা। (২) হিন্দুত্বের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে শিক্ষা বিস্তার (৩) সমাজ-সংস্কার, (৪) সমাজ-সংগঠন, (৫) শুদ্ধি; (৬) নারীরক্ষা; (৭) মন্দির বিগ্রহ রক্ষা; (৮) আদিম ও পার্ব্বত্য জনতাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দান পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে গ্রহণ; (৯) হিন্দুজনতাকে মিলন, সখ্য, সহযোগিতার সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করা; (১০) হিন্দুজনতার মধ্যে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও ক্ষাত্র-বীর্য্যের পুনরুদ্বোধন।

উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য প্রথমেই চাই:—

(১) হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনার ছাঁচে সুগঠিত এবং হিন্দু-সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিত, ত্যাগ-সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের ভাবে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র প্রচারক ও কর্ম্মী।

(২) গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুজনতার সাপ্তাহিক ও পর্ব্বাহিক সম্মেলন-ব্যবস্থা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষণের জন্য অভ্রান্ত নির্দ্দেশ বাণী এবং "হিন্দুমিলন মন্দির রক্ষীদল গঠন"—কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বহুসংখ্যক প্রচারক ও কর্ম্মী দুই সহস্র "হিন্দুমিলন মন্দির"এর মধ্য দিয়া উপরোক্ত কার্য্য করিতেছেন।

সঙ্ঘের পরিকল্পনা

হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্গ-বিভাগ। সুতরাং আজ উপরোক্ত কর্ম্মপদ্ধতিকে দ্রুত বহুব্যাপক রূপদানের সময় সমুপস্থিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দক্ষিণ কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীতে "কেন্দ্রীয় হিন্দুমিলন মন্দির" স্থাপনপূর্ব্বক এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রীয় হিন্দুমিলন মন্দিরে থাকিবে:

(১) সমাজ সেবা-ব্রতী প্রচারকগণকে হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারক শিক্ষায়তন।

(২) সহস্র সহস্র পল্লী রক্ষীদলগুলিকে ব্যায়াম চর্চ্চা ও বীরত্বমূলক অস্ত্রশস্ত্র ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক রক্ষীদল নায়ক গঠনের উদ্দেশ্যে রক্ষীদল শিক্ষায়।

(৩) হিন্দুত্বের আদর্শ ও সাধনার ভিত্তিতে বিদ্যার্থিদের জীবন ও চরিত্র গঠনের সুযোগদানের জন্য বিদ্যার্থি ভবন।

(৪) ব্যায়াম চর্চ্চা ও লাঠি, তরবারি, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যায়ামাগার।

(৫) হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থাদির রক্ষণ ও পঠন পাঠনের জন্য গ্রন্থাগার।

(৬) সমবেত উপাসনা, কীর্ত্তন, স্তবস্তুতি পাঠ, ভজন, পূজা-আরতি, জপধ্যানাদির জন্য উপাসনা মন্দির।

(৭) হিন্দুজাতীয়তা মন্দির—ইহাতে থাকিবে বৈদিক যুগ থেকে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, সমাজ-সংস্কারক, সাম্রাজ্য সংগঠন। ঋষি, অবতার, আচার্য্য, বীর, সম্রাটগণের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়; শাস্ত্রাদি হইতে সমন্বয়-মূলক আদর্শ ও সাধনার তত্ত্ব প্রকাশক শ্লোক, উপদেশাবলী ও বাণী, হিন্দুর গৌরবময় ইতিহাসের ঘটনাবলীর চিত্র ও পরিচয় এবং হিন্দু জাতীয়তার প্রেরণামূলক বাণী ও চিত্র।

এতদ্ভিন্ন চিকিৎসালয়, অতিথি নিবাস, সন্ন্যাসী নিবাস, যজ্ঞশালা প্রভৃতি থাকিবে। প্রতি বৎসর যাহাতে শত শত প্রচারক ও রক্ষীদল-নায়ক শিক্ষিত হইয়া সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে প্রেরিত হইতে পারে—এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্ঘ উপরোক্ত পরিকল্পনা করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে ৫০ লক্ষ টাকা আবশ্যক:—

প্রচারক শিক্ষায়তন—৫০ হাজার; রক্ষীদল শিক্ষালয়—৫০ হাজার; বিদ্যার্থিভবন—৫০ হাজার; চিকিৎসালয়—৫০ হাজার; অতিথি নিবাস—৫০ হাজার; ব্যায়ামাগার—৫০ হাজার; গ্রন্থাগার—৫০ হাজার; কর্ম্মীনিবাস—৫০ হাজার; হিন্দু জাতীয়তা মন্দির—১ লক্ষ; উপাসনা মন্দির ও নাটমন্দির—১ লক্ষ; অন্যান্য আবশ্যক গৃহাদি—এক লক্ষ। এতদ্ভিন্ন প্রচারক, বিদ্যার্থী, রক্ষী, শিক্ষক, রোগী, চিকিৎসক, সন্ন্যাসী, কর্ম্মী, অভ্যাগত, আশ্রয়প্রাপ্তগণের ভরণপোষণ ব্যয় মাসিক ২৫ হাজার টাকা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই বিপুল অর্থের জন্য ধনী, দানশীল, সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

কমলার কাহিনী

শ্রীসন্তোষকুমার দে

কোন বড় জংসনে একখানা ট্রেণ থেকে নেমে আর এক-খানা ট্রেণের জন্ত যখন কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তখন আপনার ক্লাশ ওয়েটিংরুমে ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে হালকা সাহিত্য পড়ুন অথবা কলম নিয়ে ডাইরি লিখুন, এর চেয়ে আরামের জিনিষ ভ্রাম্যমান জীবনে আর আমি পাইনি। নতুন সহরে যেয়ে সব যায়গায় লণ্ডনের ডরচেষ্টারের মতো হোটেল মিলবে তেমন ভরসা কম। মিললেও সেখানে হয়তো নেহেরুর মতো কোন গণ্যমান্ত অতিথির জন্ত সারা বাড়ীটা সরগরম হয়ে আছে, নতুবা হাজার স্থানীয় দর্শনীয় বস্তু টানবে আপনার মন, তিষ্টুতে দেবেনা ঘরে।

কিন্তু এই ওয়েটিংরুম, নিতান্তই প্রতীক্ষা করবার জন্ত তৈরী। ছোট বেলায় ইস্কুলে পড়েছিলাম একটি ইংরাজি কাহিনীতে—কোন বৃদ্ধা মাতা সাগর কুলের ঘরে—মোম-বাতি জ্বালিয়ে রাখত, তার নাবিক পুত্র ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায়। এই ওয়েটিংরুমের বাতি জ্বলছেই, আপনার আমার সবার জন্ত। লৌহবর্ত্মের উপর ঢেউ জাগিয়ে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার-মেল এক্সপ্রেস-লোকাল। কতজন নামছে, উঠছে। এলো গেল আপনার পাশে ভারত-ব্রহ্ম-চীন হতে সুদূর ন্যুইয়র্কের পর্টিল্যাক হোটেলের লেবেল লাগানো এটাচি-ওয়ালা স্যুটকেশ স্যুট-ধারী। আপনার খেয়াল রাখবার দরকার শুধু হাত ঘড়ির দিকে, আপনার ট্রেণের সময়টা আপনি জানেন।

অমরাবতী হতে ফিরে নাগপুর যাব। বাডনরা জংসনে এসে মেলের অপেক্ষা করছি। গাড়ী আসবে প্রত্যূষে। এখন সবে সন্ধ্যা।

কেরোসিনের আলো জ্বালা একখানা গোল টেবিলের উপর, দেওয়ালে একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে দার্জ্জিলিংএর ছবি, তলায় লেখা 'ভারতবর্ষ দেখুন'। আশে পাশের যাত্রীরা লিগ কংগ্রেস আর কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করছেন। আমার পকেটে তাকিয়ে দেখি, কলমটার ক্লিপে কেরোসিনের আলো চিক চিক করছে।

কলমেরও ভাষা আছে—আমরা সেটা ভেবে দেখিনি। ভেবে দেখুন আপনার কলমটি দিয়ে এযাবত কতকিছু লিখেছেন—প্রেমপত্র হতে সুরু করে 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট' পর্য্যন্ত। যারা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, তারা বলতে পারবেন, কত লক্ষ টাকার চেক সই করেছেন ওই কলমে। কিন্তু এমন কিছু কি করেন নি যাতে হৃদয় হাল্কা হয়ে গেছে, মনে হয়েছে আপনি যে কথা মুখে বলতে পারেন নি তাই লিখে রাখলেন। এমনও কি হয় না, যে কথা আপনার অবচেতন মনেই গুপ্ত ছিল, কলম জানত সেই কথা, আপনার অগোচর সে কথা সে বলে দিয়েছে। পরে আপনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন, মনে হয়েছে—যেন খানিকটা কর্ত্তব্যপালন হ'ল, যেন ঋণশোধ হ'ল কিছুটা। কিন্তু সব ঋণ তো শুধবার নয়। বলি শুনুন একটা ছোট্ট ঘটনা।

আমি ঘুরছি অনেকদিন বাংলার বাইরে। আমার চেহারাটা কন্দর্প-কান্তি নয় বলেই জানি, পরন্তু ট্রেণে টহল করে বেড়ালে কন্দর্পেরও দর্প থাকত কিনা সন্দেহ। কোথায় স্নান, কোথায় আহার কিছুরই ঠিক নেই। নেহাৎ শরীরটার বয়স বেশী নয়, তাই সয়ে যাচ্ছে। তবে যেদিনের কথা বলছি সেদিন রীতিমত অবগাহন স্নান করেছি, পথে ঘাটে যা নিতান্তই অমিল বস্তু। ওখায় সমুদ্র পেয়ে ডুবিয়ে নিলাম এক চোট। পুরীর সমুদ্রের মতো অত বড়ো বড়ো ঢেউ নেই। জল দূরে গাঢ় নীল, তবে ওয়ালটেয়ার-বিশাখা পট্টমের সমুদ্রের মতো নয়। নিকটের জল নীলাভ।

তীরে বড় বড় দানার উজ্জ্বল বালি প্রচণ্ড রোদে চিক চিক করছে। অনেক দূর নিয়ে বালুর চর। ছোট ছোট জাহাজ মেরামত করছে কাথিয়াবাড়ী মিস্ত্রী। স্নানের ঘাটে আলাপ হ'ল নাসিকের বালকিসন নামে একটি যুবকের সাথে। সে কলকাতা চেনে, গেছে ভারতের

ছোট বড়ো নানা সহরে আমারই মতো ভবঘুরের বেশে। ওর সাথে খাতির হয়ে গেল।

ফিরলাম একসাথে, এক ট্রেণে, ঠাসাঠাসি ভিড় তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কামরায়।

ঝঞ্ঝাট বাধালো বালকিসন, কথা প্রসঙ্গে বলে ফেল্লে—আমি বাঙ্গালী। কিন্তু আমার চেহারা বা চাল-চলন যে বাঙ্গালীসুলভ নয় এটাই সন্দেহ করলেন একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী। কলকাতার সুতাপটিতে তাদের 'চল্লিশ সাল কি'—কারবার আছে। 'বন্দিপাধ্যায়', 'মুকারজি' প্রভৃতি তার কত 'দোস্ত' আছে, 'জান পচান' আছে 'হরেক কিসিম' বাঙ্গালী বাবুর সাথে। কিন্তু 'দে-বাবু' 'কভি নেহি শুনা'।

সন্দিগ্ধ স্বরে তিনি হিন্দিতে আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি বাঙ্গালী ? 'সাচ' বলছেন ?

কি উত্তর দিই ? বল্লাম—বাংলা দেশে জন্মালে, মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন সবাই বাঙ্গালী হলে যদি বাঙ্গালী বলা হয় তবে আমি বাঙ্গালী।

আবার প্রশ্ন হ'ল—আপনি বাংলা বুলি জানেন ?

না হেসে পারলাম না, বল্লাম, আমি বাংলা বল্লে কি আপনি বুঝতে পারবেন ?

'জরুর।' তিনি বল্লেন—'হাম ভি বাংলা সামঝাতে পারি। আচ্ছা বলিয়ে জি জরু কৌন চিজ হ্যায় ?

বল্লাম উত্তরটা।

আবার প্রশ্ন—'মাশায় কেমন আছে'—এর 'সামাল' কি ?

হাসি চেপে জবাব দিলাম।

আবার প্রশ্ন—হামি ভালো আছে।

বললাম উত্তর।

প্রশ্নকর্তা বল্লেন—বাংলা আপনি থোড়া থোড়া সমঝেচেন। 'লেকিন' লেখা পড়া তো নেহি আয়ে গা।

বালকিসন এবং নিকটস্থ অনেকগুলি সহযাত্রী এতক্ষণ সাগ্রহে আমার অগ্নিপরীক্ষা লক্ষ্য করছিল। এবার বাল-কিসন রুখে উঠল—বল্লে, লেখা পড়া পারবেন না মানে ? ইয়ারকি নাকি ? কাগজ বের করুন, দেখাচ্ছেন লিখে।

মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও এভাবে নিজেকে বাঙ্গালী প্রমাণিত করবার অদম্য উৎসাহ আমার ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। জানিনা বালকিসনের মতো আমিও এবার তেড়ে উঠতাম কিনা। সকালে দ্বারকা হতে ট্রেণে চেপে ওখা গেছি, তিন মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেট দ্বীপে মন্দির দর্শন করেছি। এপারে এসে সমুদ্র-স্নানের পর সারা বন্দরে এক টুকরা পুরী কি ভাজি পাই নি, এক কাপ চিনিশূন্য চা খেয়েছিলাম, তদবধি পেটে কিছু পড়ে নি। মাথায় তেল নেই, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ে চোখে মুখে পড়ছে। পেটও চো চো করছে। বাইরে বাতাসে বালি উড়ে আসে, ট্রেণের ইঞ্জিন হতে ছাই ও কয়লার গুড়া উড়ে আসে, তাই চোখে গগলস আটা আছে। জামা কাপড় তীর্থকাকের উপযুক্ত অবিন্যস্ত এবং যথাসাধ্য ময়লা। এই বেশটাকে বাঙ্গালীর বলে প্রমাণিত করবার দৃঢ় ইচ্ছা ক্রমেই আমার শিথিল হয়ে আসছিল। কিন্তু এই সময় একটি অঘটন ঘটল।

আমার বেঞ্চের সুমুখের দুখানা বেঞ্চ পেরিয়ে তৃতীয় বেঞ্চে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে একটি সুশ্রী যুবতী। তার গায়ের রংটা উজ্জ্বল গৌর, মুখাবয়ব অনেকটা আমার ছোট বোনের মতো, হাতে সরু চুড়ি, গলায় সূক্ষ্ম মফচেন, কানে মুক্তার দল বসানো কুণ্ডল। এলো খোঁপার উপর মাথায় সামান্য কাপড় দেওয়া। শাড়ী পরবার ধরণটা অবিকল বাঙ্গালীর মতো, এমনি কি গায়ের সামিজটাও। সহসা দেখলে তাকে বাঙ্গালী বলে ভুল করা কঠিন নয়, কিন্তু মুখাবয়বে অবাঙ্গালীত্বের বিশিষ্ট ছাপ অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে।

পাশেই তার ছোট বোন, অত্যন্ত চঞ্চল। মুখখানা অবিকল বড় বোনের মতো। বাংলায় হলে এ বয়সে সে ফ্রক্‌ই পরত, কিন্তু তার মাথায় ওড়না, পরণে শাড়ী। ওদের সাথে আর কে আছে জানতে পারিনি।

কাব্য করবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না সে কথা পূর্বেই বলেছি। বেলা পড়ে আসবার সাথে সাথে শরীর ক্লান্ত হয়ে আসছিল। লবণ সমুদ্রে স্নান করবার দরুণ চর্মে খড়ি উড়তে লাগল। কৌতুকজনক ব্যাপারে জড়িত হয়ে না পড়লে হয়ত আমি নিতান্ত বিব্রত বোধ করতাম।

অনেকক্ষণ বিমনা থাকবার পর এই সিন্ধী বণিকটির সাথে বাদানুবাদের সময় লক্ষ্য করলাম, তৃতীয় বেঞ্চে উপবিষ্ট ওই যুবতীটি অন্যমনস্কার ভান করলেও অধিকাংশ সময়

আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে বাইরে বহুযোজনব্যাপী বিস্তারিত মাঠে দৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমি বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেই ওর দৃষ্টি ফিরে আসচে। এ ব্যাপারটা যে অনেকক্ষণ ধরে চলছিল সেটা আমি অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত বেশ তদুপরি গগলস আটা পাগল চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু আছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আমার ভুল ভাঙ্গল যখন আমার সুমুখের দ্বিতীয় বেঞ্চে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসা পাগড়ী মাথায় একজন বৃদ্ধ ঘুরে বসে সোজাসুজি আমার সাথে পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না, তিনিই এই কন্যাদ্বয়ের পিতা। জ্যেষ্ঠা কন্যার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিম্বা সিন্ধী বণিকের অনুচিত বাদানুবাদে বিরক্ত হয়ে আমার সাথে কথা বললেন—বোঝা গেল না।

আমাদের আলাপটা অল্পেই জমে গেল, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—আমি সত্যি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার বর্তমান খবর কি তাই শুনবার জন্যেই যে আমি ঠিক বাঙ্গালী কিনা তার পরখ হচ্ছিল সেটাও বুঝিয়ে বল্লেন। কলকাতার দাঙ্গার সংবাদ তখন সর্বত্র দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে—সেই সব কথাই তিনি বিস্তৃতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে গেল, আমাদের আলোচনা জাগতিক পরিস্থিতি হতে ক্রমে পারিবারিক আলোচনায় পর্যবসতি হয়ে গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। আমার ব্যক্তিগত খুঁটি নাটি খবর তিনি শুনতে চাইলেন, নিজের সম্যক পরিচয়ও জানালেন।

কলকাতায় কুড়ি বছর ধরে তিনি কয়লার কারবার করেছিলেন। যুদ্ধের গোলযোগে ওয়াগন অভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়। সংসারে তিনি একা, পুত্র সন্তান নেই, ওই দুটিমাত্র কন্যা। তাই আর ঝঞ্ঝাট না বাড়িয়ে কলকাতার বাস তুলে দিয়ে জন্মস্থান রাজকোটে চলে এসেচেন। এখানেই পৈতৃক বাস, বসত বাটি আছে। তা ছাড়া যা চার পয়সা জমিয়েছিলেন তাতে রাজকোটে কয়েকখানি 'দোকান' খরিদ করে তারই ভাড়ায় দিন গুজরান করছেন।

মুস্কিল হয়েছে বড়ো মেয়েটিকে নিয়ে। ওর নাম কমলা। দুই বোনেরই জন্ম কলকাতায়। কিন্তু ছোটটি খুব ছোট থাকতেই এ দেশে ফিরেচে বলে এ দেশি ভাব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছে। পারে নি কমলা, পারে নি—কারণ সে চায় নি। এ নিয়ে মাতা কন্যার অহোরহো সংঘাত লেগে আছে। কলহে পিতা কোন পক্ষ নিয়ে থাকেন সেটা আভাসে বুঝলাম। বস্তুত কেবল কমলার নয়, তার পিতারও গভীর অনুরক্তি আছে বাংলার সংস্কৃতির উপর। বিশেষ করে ষোল সতের বছর ধরে মেয়েকে যে শিক্ষা ও আদর্শে মানুষ করেছেন সেটা পুরাপুরি বাঙ্গালীর আদর্শ। পরিষ্কার বলেই ফেললেন—কমলাকে কোন উপযুক্ত বাঙ্গালীর হাতে দিতে পারলেই তিনি খুসী হতেন, কমলাও সেটা নিশ্চয় পছন্দ করত। কিন্তু বাংলা হতে হাজার মাইল দূরে বসে এ স্বপ্ন তার নিরর্থক।

কমলা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনছিল আমাদের কথা-বার্তা। শেষের দিকে পারিবারিক আলোচনা সুরু হতেই সে অন্যমনস্কের ভান করে নিজেকে দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু সে যে আদৌ অন্যমনস্ক নয় সেটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না।

আমি কাথিয়াবাড়ের গুণগান করলাম, বল্লাম—যে দেশে বাপুজীর জন্ম হয়েচে সে দেশের সংস্কৃতিও তো তুচ্ছ করবার নয়।

বৃদ্ধ বললেন—কি জানো বাবা, দোষটা আমার। এই যে পাগড়ি এটা আমি এদেশেই পরছি, বাংলায় আমি বাঙ্গালী হয়েই ছিলাম। আমার বন্ধুরা তোমার দেশের গণ্যমান্য লোক। আমি বাংলাকে অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা করি।

কমলা আমার সেই বাংলার ঘরে জন্মেছিল, সেই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, আমি ওকে বাংলার আদর্শ হতে বিচ্যুত করতে চাইনি, আজও যে মনে প্রাণে চাই তেমন নয়। ওটা যে কি জিনিস, সেটা তো জোর করে বোঝাতে পারব না। তুমি বাঙ্গালী, বিদেশীর এই মনো-ভাব হয়তো তুমি বুঝবে না। তবু এটা সত্য। আমি জানতাম রবীন্দ্রনাথের বাংলা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলা, স্যার রাজেন মুখার্জির বাংলা। সে বাংলাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব।

রাজকোট ষ্টেশন এলো। তাঁরা সবাই নামলেন। আমিও নেমে বৃদ্ধকে নমস্কার করলাম। তিনি প্রতি নমস্কার

করলেন। কমলাও পরিস্কার কণ্ঠে 'নমস্কার' জানালো। কিন্তু তার মুখে কিছুক্ষণ আগে দেখা হাসির জ্যোতিটি খুঁজে পেলাম না।

রাজকোট ছাড়িয়ে ভিরমগাম, সেখানে হতে বোম্বাই, আমার ট্রেণ কোন বাধা মানে নি। কিন্তু আজ কতো দিন পরে বাডনরা জংসনের ওয়েটিং রুমের এই প্রায়ান্ধকারে আমার স্মৃতিকথা লিখতে বসে কমলার কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেদিন রাজকোট ষ্টেশন হ'তে ট্রেণ ছাড়লে, মনে হয়েছিল কয়লার ব্যবসায়ীর ঘরেই ভগবান কি হীরক পাঠিয়েছেন? আজ মনে হচ্ছে, সেদিন তার নির্বাক প্রশংসমান দৃষ্টি দিয়ে আমার হতশ্রী চেহারাকে উপলক্ষ করে এক বিমুগ্ধা নারী বাংলাকে, বাংলা ভাষার, বাংলা সাহিত্যের, বাংলার সংস্কৃতির আভিজাত্যকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, বোধ হয় এসিয়ায় সর্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ দিয়েও নোবেল কমিটি বাংলাকে সে সম্মান দিতে পারেনি। জানিনা কমলা কোথায়, বাংলার ঘরের বধূ হওয়ার আশা তার পূরণ হয়েছে কিনা, কিন্তু এই যে বৃহত্তর বঙ্গের প্রসার এতো চলবেই, বন্ধ হবে না।

ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ

শ্রীত্রিবিক্রম পাঠক

প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষের আহ্বানে কত শত বৎসর ধরে কত মানব গোষ্ঠীর ধারা এসেছে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তারা আপনার করে নিয়েছে। ভারতের সভ্যতায় তাদের দান অনস্বীকার্য্য। দুস্তর মরুপর্ব্বত লঙ্ঘন করে এসেছে শক, হূণ, তুর্ক, মোগল, পাঠান প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতি, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে ভারতীয় সমাজে তারা তাঁদের ঠাঁই করে নিয়েছে, কিন্তু যারা ভারতকে তাদের দেশ বলে মেনে নিতে পারে নি, যারা শুধু তাকে তাদের বাজার আর শোষণের লীলাভূমি মনে করেছে, প্রতিযোগিদের পরাস্তকারী কুটকৌশলী ইংরাজই তাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী জনকল্যাণের নামে স্বশ্রেণীর কল্যাণেই সর্ব্বদা আত্মনিয়োগ করেছে তাই নবযুগ স্রষ্টা ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত রামমোহন যেদিন মাত্র যুগোপযোগী শিক্ষার দাবী জানিয়ে লর্ড আমহার্ষ্টকে ঐতিহাসিক চিঠি দিয়েছিলেন সে দিনও তার দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে স্বশ্রেণীর প্রয়োজনে স্বল্প মাহিনার কেরাণী ও প্রভুভক্ত সেবকশ্রেণীর সৃষ্টি করা। এই আত্মগোপন করা ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরেই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই নিবন্ধে আমরা তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

ভারতের দিগন্তে আলেকজাণ্ডার, তৈমুর ও নাদিরশার লুণ্ঠন বিভীষিকা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার স্বল্পকালস্থায়ী ধ্বংসলীলায় জনসাধারণের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘাত প্রতিঘাত দেখা দেয়নি। গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার পাদপীঠ ভারতবর্ষ সেদিনও তার সুকুমারশিল্পে, তার কারুকার্য্যে ও তার জ্ঞানচর্চায় আত্মসমাহিত ছিল। তার জীবন যাত্রায় বিপর্য্যয় ঘটাবার মত শক্তি দেখা দিয়েছে বহুকাল পরে ধনতন্ত্রবাদের পূর্ণ বিকশিত রূপ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের এই নগ্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়েছে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনে। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জনসমষ্টিকে শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, আহার, বাসস্থান চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রচিত হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারত সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যিক শোষণের আলোচনা করতে গেলেই মনে পড়ে ভারতের বিগত দিনের সমৃদ্ধির কথা। রোমক সভ্যতা যেদিন দেদীপ্যমান হয়ে ইউরোপকে সুসভ্য করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ করেও তাকে বিলাস-ব্যসন, কলা প্রভৃতির জন্যে নির্ভর করতে হত ভারতবর্ষের ওপর। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলেছেন "সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল রোম দিল্লী থেকে আনা সোনা রূপার ব্রোকেডে সুসজ্জিত থাকত। সারা সভ্য জগতে ঢাকার মসলিনের খ্যাতি প্রচারিত ছিল। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র, রত্নাদিখচিত বস্ত্র, সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য, ব্রোকেড, কার্পেট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাইয়ের দ্রব্যাদি আসবাব পত্রাদি, চমৎকার ও অতি তীক্ষ্ণ বিভিন্ন আকারের তরবারি প্রভৃতি, ভারতের কারুশিল্পের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছে। M, Martin Indian Empireএ লিখেছেন ঢাকার মসলিন, কাশ্মিরী শাল ও দিল্লীর সিল্কের ব্রোকেডই সিজারের দরবারের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করত। তখন বৃটেনের বর্ব্বর অধিবাসীরা রং মেখে সং সেজে থাকত। ধাতু দ্রব্যের কারুকার্য্যসমন্বিত দ্রব্যাদি, মণি-মুক্তা হীরা, ভেলভেট, কার্পেট, চমৎকার ইস্পাত, চীনা মাটির জিনিষপত্র, জাহাজের চমৎকার কাঠামো—ভারতের এই সব বিবিধ দ্রব্য সভ্য মানুষ বহুদিন ধরেই প্রশংসা করে আসছে এবং তাঁর কথায় "Before London was known in history,

India was the richest trading mart of the earth. কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক পরিচয়ই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ধর্ম্ম, শিক্ষা, কলা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অপরিমিত দান ভারতীয় উপনিবেশকারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে পূর্ব্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে। তার সাক্ষ্য আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। মানব সভ্যতা সব সময়েই যে অগ্রগামী ইতিহাস তা' স্বীকার করে না। গ্রীক, এ্যাসিরিয়, ব্যাবিলনিয়, মিশরিয়, রোমক সব সভ্যতাই জরাগ্রস্ত হয়েছে, তাই বাইরের আঘাতে জীর্ণ সভ্যতা ধ্বংস পায় বা রূপান্তরিত হয়। ভারতের ইতিহাসেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। রূপকথার মত মনোরম কল্পনার মায়াজাল রচনাকারী ভারতের ঐশ্বর্য্যকাহিনী শুনে লুব্ধ বণিকের দল ভারতের সন্ধানে সপ্ত সমুদ্র তোলপাড় সুরু করে দিল মধ্যযুগে। প্রতিযোগী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে দলে দলে আবির্ভাব হলো বণিকগোষ্ঠীর। মুখে প্রভু যীশুর বাণী আর অন্তরে রয়েছে পরদেশ লুণ্ঠনের দুর্দ্দমনীয় লোভ।

কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ ও ভাগ্যের বহু প্রতিকূলতাকে জয় করে বণিক প্রতিনিধি রাইভ যেদিন স্বদেশী দালালের সাহায্যে বাঙ্গলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন—সেদিন ভাবীকালের শোষণের স্বপ্নে তিনি পাগল হয়েছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন "কোম্পানী আজ যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেছেন তা' ফ্রান্স ও রাশিয়া বাদ দিলে ইউরোপের যে কোন রাজ্যের চেয়ে বড়। ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং খাজনা তাঁরা পাবেন আর পাবেন সমপর্য্যায়ভুক্ত বাণিজ্যিক লাভ।...... আপনারা বর্ত্তমানের চিন্তায় অধীর হবেন না, ভবিষ্যতের লাভের কথা ভুলবেন না......এখুনি লুট পাটের বখরার জন্যে অধীর হবেন না। (হাউস অব কমন্সে ৩০শে মার্চ, ক্লাইভের বক্তৃতা) আপনারা ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা পাবেন। শীঘ্রই ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। কখনই সামরিক ও অসামরিক কাজে ৬০ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হবে না। (ক্লাইভের চিঠি, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৭৬৫)।

ক্র্যাফটন লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ থেকে ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং ইংল্যাণ্ডে লুঠতরাজ করে আনার ফলে কোম্পানী তিন বৎসর ধরে ব্যবসা চালিয়েছেন বিনা পুঁজিতে এবং তাহা বিদেশী কোম্পানীদের পাওনাও পরিশোধ করেছেন। ক্লাইভ সঙ্গে করে ২৫০০০০ পাউণ্ড এনেছিলেন ও ভারত থেকে তাঁর নিজস্ব জমিদারী বাবদ বাৎসরিক ২৭০০০ পাউণ্ড পাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাইভের উপরোক্ত চিঠি থেকে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বর্ণনা থেকে বাংলার জনসাধারণ যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিল তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বর্ত্তমান যুগের মুদ্রার মূল্যে হিসেব করলে এই লুণ্ঠনের অঙ্ক ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে। মেকলে সাহেব ও ক্লাইভ, হেষ্টিংসের বাঙ্গালী অনুচরদেরই বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি মনে করে তাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছেন তার সহস্রগুণ বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছে পররাষ্ট্রলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্রে। ক্লাইভ, হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত চুরি বন্ধ করার চেষ্টা করা হলেও জাতিগতভাবে এই শোষণ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে রইল জনসাধারণের ওপর জগদ্দল পাথরের মত। ফলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, আর এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে দিন বুভুক্ষ নর-নারীর শবের পূতি গন্ধে সারা দেশ ছেয়ে গেল সে দিনও এই লোভাতুরতার হাত থেকে দেশবাসী মুক্তি পায়নি। এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হল, আর এক তৃতীয়াংশ দেশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য জঙ্গলে পরিণত হল। ১৭৭০ সাল থেকে যে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। হেষ্টিংস লিখেছেন যে এক তৃতীয়াংশ দেশের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলেও খাজনা আদায় ১৭৬৮ সালের চেয়ে ভালই হয়েছে "খাদ্য শস্যের গোলা, বাণিজ্যের ও শিল্পের প্রাচ্যের কেন্দ্র বাংলা ২০ বৎসরের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হয়েছে"—এ কথা লিখেছেন একজন ইংরাজ ১৭৮৭ সালে।

মনীষী বার্ক, হেষ্টিংসকে পার্লামেণ্টে বিচারকালে তাঁকে বিসূচিকা রোগের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বৃটিশ শাসনের কুশাসনকে ব্যাঘ্রের হিংসাপরায়ণতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অত্যুক্তি করেছিলেন বলে মনে হয় কি? ভারতে বৃটিশের এই ভয়াবহ দুঃশাসনের শোষণের প্রতিবাদ করার জন্যে বার্ক, ব্রাইট, মহামতি এ্যাণ্ড্রুজ ইংরেজ জাতের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। একথা ভেবে আমরা কিছুটা সান্ত্বনা পাই। কিন্তু আমরা ভুলতে পারিনা যে, কোম্পানীর মারফতে ইংরেজ জাত যখন তার লুঠের অংশ দিয়ে স্বদেশের জনসাধারণকে শিল্প বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন সে ভারতের শিল্পকে ধ্বংস করে সারা দেশের ধ্বংসে আত্মনিয়োগ করেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে যে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব দেখা দিল তা Brooks Adams এর লেখা থেকে, Palme Dutt তাঁর India to day-তে উদ্ধৃত করেছেন আধুনিক যুগের মাকু, বোনার কল, শক্তিচালিত তাঁত, বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি যুগান্তকারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল এই সময়ে। তিনি বলেছেন 'Possibly since the world began no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder, because for nearly fifty years Great Britain stood without a Competitor." কিন্তু কোম্পানীর এই লুণ্ঠনে স্বদেশী প্রতিযোগীরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠল Adam smith তাই লিখলেন "Such exclusive Companies are nuisances in every respect, always more or less inconvenient to the Countries in which they are established & destructive to those which have the misfortune to fall under the Government,"

ফক্স, বার্ক, শেরিডন যেদিন কোম্পানীর নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্য দিয়ে বঞ্চিত স্বদেশবাসীদের মনের কথাও প্রকাশ পেয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে বন্দোবস্ত তাঁরা কায়েম করলেন, তাতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থাই করা হল। শাসনের নামে শোষণের জয়রথ যেদিন ভারতের

ওপর দিয়ে চলেছিল ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা সব কিছুই সেদিন তার রথের চাকায় পিষ্ট হয়েছিল।

১৮৪০ সালের পার্লামেন্টারী এনকোয়ারি কমিটির বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে যে বিলিতি পণ্যকে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সুতি বস্ত্রের ওপর শতকরা ১০৲, রেশমের ওপর শতকরা ২০৲ এবং পশমের বস্ত্রের ওপর শতকরা ৩০৲ টাকা কর ধার্য্য করে বিলাতি বস্ত্রব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষা করেছিল, আর Navigation Act মারফৎ ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা হয়েছিল, নিজেদের এক চেটিয়া অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

১৮১৩ সালের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ বাজারে ভারতের তুলার ও পশমের বস্ত্র অনুরূপ বিলিতি বস্ত্রের চেয়ে শতকরা ৫০৲, ৬০৲ টাকা কম মূল্যে বিক্রী করেও ভারতের লাভ থাকত, তাই শতকরা ৮০৲ টাকা কর স্থাপন বা সরাসরি ভারতীয় বস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে এর ওপর ভারত সরকারের চাপান করের বোঝাও ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থে ভারতীয় তাঁতীদের উৎসাদনে বৃটিশ সরকার যে ব্যবস্থা করেছিলেন বহুনিন্দিত বিলিতি বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলনে ভারতীয়েরা কি অনুরূপ ঈর্ষাপরায়ণতা দেখিয়েছে? নীল করের অত্যাচার, তাঁতীদের আঙুল কাটার গল্প আজও বাংলাদেশে শোনা যায়। মনে হয় যে সুসভ্য দেশের অসভ্য অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না।

১৭৮৭ সালে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকার মসলিন ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছিল। কাঁসা, পেতল, লোহা সব শিল্পেই শিল্পীদের অভাব দেখা দিয়েছে ১৯০৯ সালে। ভারতীয় শিল্পের ওপর এই সর্ব্বাত্মক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষকে শুধু মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা সম্মত ভাবে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হল।

শিল্প বিপ্লবের নবযুগের সঙ্গে তার পরিচয় ব্যাহত করার জন্যে পদে পদে সাম্রাজ্যবাদ যে বাধা রচনা করলে তা' আজও প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি স্তরে। ভারতীয় পরাধীনতার সমস্যা বুঝতে হলে এই দিকে দৃষ্টিপাত করার সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

ক্রীতদাস ব্যবস্থা উঠে যাওয়াতে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে চা বাগান, রবার, কাফি প্রভৃতি ব্যবসায়ে পুজি নিয়োগ করে দাস ব্যবস্থা নতুন করে প্রবর্ত্তন করেছে। ফলে যারা বস্ত্র প্রস্তুত করে তাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করত, তারা তুলা চালান দিয়ে জীবনধারণ সুরু করলে, শালকর পশম চালান দিয়ে আত্মরক্ষা করলে। তৈল বীজ, চামড়া খনিজসম্পদ বিবিধ কাঁচা মাল নামমাত্র মূল্যে চালান দিয়ে ভারতবাসী তার দুর্ভাগ্যের পেয়ালা পূর্ণ করেছে।

সিপাই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তা বোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। হৃতসর্বস্ব ভারতীয় জনসাধারণের সমাজ ব্যবস্থায় যে ওলট পালট সুরু হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সেই ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যেই এই বিস্ফোরণ ঘটল। সাম্রাজ্যবাদ সেদিন তার বিপদের সঙ্কেত বুঝে নতুন রূপে নিজেকে সংগঠিত করে নিলে। কোম্পানীর হাত থেকে নিজেই শাসনভার বুঝে নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট একচেটিয়া ভারত শোষণ বন্ধ করে প্রতিযোগীদের মুখ বন্ধের ব্যবস্থা করলে, এবং এই শোষণ ব্যবস্থাকে বহু নামের নামাবলীতে ঢাকা হয়েছে। তুরস্কের সুলতান সপারিষদ ইংলণ্ড পরিদর্শন করতে এলে তার জন্যে যে নাচের পার্টি দেওয়া হয় এবং ভূমধ্যসাগরে সৈন্য রাখারও চীনের দূতাবাসের খরচা এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাবার ব্যয় প্রভৃতিও ভারতের কাছে আদায় করা হত। ইংলণ্ড ভারত থেকে Home Charge বলে একটা বিরাট অঙ্কের পাওনা আদায় করে। তাতে শুধু ১৯৩৩-৩৪ সালে যথাক্রমে ২৭০৫ লক্ষ ও ৬৯০৭ লক্ষ পাউণ্ড বলে হিসেব দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেনি, তাই যুদ্ধের সময় ১৬০০ কোটি টাকা দেনা বলে ভারতীয় জনসাধারণকে বঞ্চনা করে আদায় করা হয়েছে এবং তাও তামাদি করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের কাচ থেকে লুণ্ঠন করা অর্থের অংশ ভারতে খাটিয়েছে। ভারতের শোষণ ব্যবস্থার এই দিকটা মিঃ ব্রেলস ফোর্ড তাঁর property or peace বইতে লিখেছেন যে ৭০০ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন ভারতে খাটছে। কয়লার খনিতে লগ্নী করা টাকা থেকে তারা শতকরা ১২০ টাকা লাভ পেয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের মাত্র তাদের ৮ পেন্স দিতে হয়েছে। ৫১টা চটকলের মধ্যে ৩২টাই ১৯১৮ থেকে ১৯২৭ পর্য্যন্ত শতকরা ১০০ টাকা লাভ বণ্টন করেছে, বাকী গুলোর লভ্যাংশও বিস্ময়কর। এই চটকলগুলোর লাভ, শ্রমিকের মোট মজুরির ৮ গুণ বেশী হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের যখন তারা ৮ পাউণ্ড দিয়েছে তখনই তারা স্কটল্যাণ্ডে অংশীদারদের দিয়েছে ১০০ পাউণ্ড। এই শোষণের তুলনা আছে কি? তাই চা বাগানের অত্যাচারের কথা প্রকাশে ও ডিগবয়ের ধর্ম্মঘটের কথা শুনে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আধুনিককালের ক্লাইভেরা উন্মত্ত হয়ে ভারতবন্ধু ষ্টেটসম্যান মারফৎ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে 'Criminal Govt' বলে গাত্রদাহ মিটিয়েছিল। এই সব ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে তাদের কথা বলার লোভ সংবরণ করতে হল, কিন্তু যাঁরা এদের জীবনযাত্রার প্রহসন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা জানেন যে কি দুর্গতির মধ্যেই তারা দিন কাটাচ্ছে। একদিকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের বিলাস বহুল জীবনযাত্রার মহা-সমারোহ, আর তার পেছনে রয়েছে আদিম যুগের অন্ন বস্ত্রহীন নরনারীর ভীড়। এ যেন প্রাসাদবাসীর গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রাসাদের পাশে দরিদ্রকে কুটীর নির্ম্মাণে বাধ্য করে নির্লজ্জ ধনীর আত্মমহিমা প্রকাশের অশোভন আত্মম্ভরিতার উগ্র উন্মত্ততা।

ভারতের নামে প্রথম ১৮৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ৩ কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমশ তা বৃদ্ধি করে একটা বিরাট অঙ্কে পরিণত করা হয়। শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্র জারের আমলের ঋণ অস্বীকার করায় সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টায় যারা তৎপর হয়ে উঠেছিল, তারা তাই ভবিষ্যতের ভয়ে ভারতের কাছ থেকে সব পাওনা আদায় করে নিয়েছে। খালি ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংএর বেলায় তারা ফিকির খুঁজছে। ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে কি বিরাট বঞ্চনা করেই

না এই টাকা আদায় করা হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যারা মরেছে তাদের অস্থিও চালান দেওয়া হয়েছে। রক্ত-পিয়াসী সাম্রাজ্যবাদের নির্ম্মমতার তুলনা আছে কি? ভারতের রেলপথ বিস্তারের প্রসঙ্গে লর্ড ড্যালহৌসি খোলাখুলি ভাবে বলেছিলেন যে রেলপথ বসাবার উদ্দেশ্য এই যে, সহজেই ভারত থেকে কাঁচা মাল রেলপথ-যোগে ভারতের বন্দরগুলোয় নীত হবে ও বিভিন্ন বিলিতি মালে ভারত ছেয়ে যাবে; তা ছাড়া সামরিক কাজে এর প্রয়োজনও তাদের লক্ষ্য ছিল। ভারতে প্রস্তুত জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে তারও ধ্বংস সাধনের ইতিহাস আধুনিক লেখকরা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। ১৮৬৩ সালেও বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ বোম্বাই বন্দরে নির্ম্মিত হয়েছে; পরে স্যার রবার্ট পিলের নেতৃত্বে যে রিপোর্ট রচিত হয় তাতে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করে ভারতের জাহাজী কারবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। জাহাজী কারবারে সিন্ধিয়া কোম্পানী যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তা আজ ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত নেই। দেশের অভ্যন্তরে আজও বিদেশী কোম্পানীর ষ্টীমার চলাচল করছে। ভারতের উপকূলে আজও স্বদেশী জাহাজী কারবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তার কারণ বৃটিশ জাহাজী কারবারের প্রতিকূলতা। সারা পৃথিবীর জাহাজী কারবারে ভারত পেয়েছে মাত্র ·২৪ ভাগ, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের ভাগে রয়েছে ২৪ ভাগ। ভারতের শোষণ মুদ্রানীতি ও বাট্টানীতির মধ্যেও ফুটে উঠেছে। ১৯২৬ সালে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস টাকাকে ১ শিলিং ৬ পেন্স হারের নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থায় ভারতীয় উৎপাদনকারীরা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করবে। ৳ অংশ অধিবাসীর পেশা কৃষি, আর তারাই এর কবলে পতিত হবে। তাই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে ভারত ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপের অনুকরণের কোন পথ না পেয়ে ২০৩০ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা বৃটেনকে দিয়েছে। তারপরও ২৪১০ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সে আর শিল্প স্থাপনা করে বৃটেনের প্রতিযোগী হতে না পারে। এর সঙ্গে আমরা যদি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্তে ভারতের যুদ্ধ ব্যয় জুড়ে দিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে দেশবাসী বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্তে অধীর হয়ে উঠেছে কেন? এই খাতে যে ব্যয় হয়েছে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিসেব আজও সম্পূর্ণ হয়নি।

ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির হিসেবে ভারতীয় কৃষি ঋণ ১৯২৯ সালে ৯০০ কোটি টাকা ছিল। দশ বৎসর বাদে এই ঋণ ১৫০০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক রঙ্গ তাই মোরেটোরিয়াম ঘোষণা করে তাদের রক্ষার জন্তে সবিশেষ আবেদন করেছিলেন। সে আবেদনে সাম্রাজ্যবাদের আত্মজেরা কোন সাড়া দেয়নি। জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ এই কৃষককুলের জীবিকার্জ্জন আজও দুরূহ সমস্যা হয়ে রয়েছে। স্বদেশী বিদেশী পরভৃতকদের হাত থেকে এদের মুক্তিলাভ সম্ভবপর না হলে স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকবে না, এ কথা আজ সকলকেই বুঝতে হবে।

বিদেশী লেন-দেন, মুদ্রা বিনিময় এই সব কাজে আজও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পেছনে পড়ে আছে। অটোয়া চুক্তির দলিলের মত যে কোন দলিলে সই করিয়ে নেওয়ার দিন আজ শেষ হয়ে এসেছে, তা' প্রমাণিত হল সম্প্রতি প্রত্যাগত ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বিবৃতিতে।

ভারতের খনিজ সম্পদের লুণ্ঠন বন্ধ না করতে পারলে আমাদের সমূহ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে এ কথা স্যার বিঠলভাই দামোদর থ্যাকার্সে বলেছেন বহুদিন পূর্ব্বে। এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একথা উল্লেখ করছি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধারণকে শোষণের উদ্দেশ্যে যে পথ বেছে নিয়েছে তা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুরু থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে ভারতীয় সমস্যাকে বিকৃত করার চেষ্টার কোন ত্রুটিই করা হয়নি। পরলোকগত নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সরকার-পরিচালিত দাঙ্গা বলে অভিহিত করেছিলেন কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের কোন উত্তরই দিতে পারেন নি।

পরিশেষে আমরা জানাচ্ছি যে ভারতের শোষণকে অঙ্কে প্রকাশের চেষ্টা সম্ভবপর নয়। এই শোষণ প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে। খাদ্য, বস্ত্র, সভ্যতা সকল বিষয়েই যে অভূতপূর্ব দারিদ্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে তার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যিক শোষণ। এই শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতাকে সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ দেবার গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয়দের অন্যতম কর্ত্তব্য বলে পরিগণিত। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়পুষ্ট শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য লোপও এই সংগ্রামের অন্যতম কর্ম্মসূচি। ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা যাঁর সভাপতিত্ব কালে সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী রূপ পেয়েছে সেই মুক্তি সংগ্রামব্রতী নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle-এ লিখেছেন পরিষ্কার ভাষায় "ভারতের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ভর করবে সেই দলের ওপর—যার মতবাদ, কর্ম্মসূচি ও কাজের পরিকল্পনায় কোনো গোঁজামিল থাকবে না—যে দল শুধু স্বাধীনতার জন্তে সংগ্রাম করেই ক্ষান্ত হবে না, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে কার্য্যকরী করে তুলবে।—যে দল ভারতের পরম অভিশাপ তার একাকীত্ব ঘুচিয়ে জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে তাকে আনবে…যার গভীর বিশ্বাস থাকবে যে ভারতের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা রয়েছে বিশ্ব মানবের সঙ্গে।"

দিগম্বর

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

মানভূমের পার্বত্য অঞ্চল। মাটিহীন প্রস্তরময় ময়দান—শুষ্ক মাঠ আর নগ্ন পাহাড়—ছন্নছাড়া ভিখারীর মত এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটার গায়ে দু-চারটা পলাশ, আবার কোনোটা সম্পূর্ণ দিগম্বর। দূরে দূরে চারিপাশেই অবস্থিত শৈলশ্রেণী—সবুজ সীমারেখা দিগন্তে মিশে আছে। দেখলে মনে হয় এইটুকুই জগত জগৎ। এই পরিবেষ্টনের মধ্যেই আবার জেগে উঠেছে ঘন পলাশ জঙ্গল। এক সময় এখানে নাকি শালেরই বন ছিল, আজ সে শালের চিহ্নও আর দেখা যায় না। পলাশ—শুধু পলাশ। বসন্ত যখন ধরায় নামে—তখন আগুন লাগে পলাশ বনে। লালে লাল হ'য়ে উঠে বনভূমি। বিটপীর শীর্ষে শীর্ষে শাখায় শাখায় রক্তরাঙা তুলির স্পর্শ, সভা বসবার আগে বিছিয়ে দেওয়া লাল গালিচার মত। এই পলাশ জঙ্গলেরই সীমান্তে ছোট্ট জলস্রোত ব'য়ে চলেছে। এখানের মানুষ এটাকে বলে, "বীর কাড়া" (বনের ছোটনদী)। প্রবহমান জল কঠিন মাটির আবরণ উন্মোচন করে প্রকাশিত ক'রে দিয়েছে শিলাসন। দীর্ঘ পরিধি—বিশাল আয়তন! অপ্রশস্ত আঁকা-বাঁকা নদীটির অপর পার্শ্বে উচ্চ মালভূমি। এখানেও হয়ত এককালে শালবন ছিল। তারই কয়েকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এখনো দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ নাকি—ঐ সব গাছে এখানের অধিবাসী যারা তাদের দেবতা থাকেন। লোকে বলে "বঙা-বঙির" (সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা দম্পতি) থান। বঙা-বঙির থানেরই সংলগ্ন ক্ষুদ্র পল্লী, নাম "লাফুডিড"। এদের পূর্বপুরুষ লাফু কোন এক অখ্যাত দিবসে এখানে এসে প্রথম বাসা বেঁধেছিল—তাই তার নামেই পল্লীটার নাম-করণ করা হ'য়েছে। কে এই নামকরণ কল্লে, তার কোনো ইতিহাস নেই। ছোট ছোট মেটে চালাঘর; গোবর মাটির প্রলেপ দেওয়া চালাঘরের দেয়ালগুলো। শুধু তাই নয়—খড়পুড়িয়ে তার ছাই দেয়ালের গায়ে গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে আবার প্রলেপ দেওয়া হ'য়েছে, দেখলে মনে হয় সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো! চক্ চক্ করছে—চোখ জুড়িয়ে যায়। শান্ত সমাহিত পল্লীর আবহাওয়া—কোলাহল নেই, আধুনিক যান-বাহনের উৎপাত নেই। দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর লাফুডিডর সাঁওতাল-দের জীবন। বনের কাঠ কেটে পাতা এনে "থালা" (দোনা) বানায়, লাঙলের ফলা দিয়ে কঠিন মাটির বুক চিরে অনুর্বর জমীকে উর্বর করে তুলে—চাষ করে, ফসল ফলায়। শ্রমের বিভাগ নেই কর্তব্যের বাঁধা-ধরা "রুটিন" নেই। ভোরে যখন ঘরের মুর্গিগুলো একস্বরে প্রভাতের সূচনা জানিয়ে দেয়, তখন এরা শয্যা ত্যাগ ক'রে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে।

সেদিনও হ'য়েছে ঠিক তাই। মোরগের প্রভাত-জ্ঞাপন শব্দে বিছানা ছেড়ে মংলী কাঁকে ঝুড়ি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। বঙা-বঙির থানে প্রণাম করে এসে দাঁড়ালো "বীর কাড়া"র শিলাসনে। আকাশের গা লাল হ'য়ে উঠেছে তখন। বনানার অন্তস্তল হ'তে টিয়া ময়নার প্রভাতীসুরে বন্দনা গান ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে; আর তারই সাথে মধুর কোমল সুরে গাইতে গাইতে ছুটে চলেছে "বীর কাড়ার" জল স্রোত। ধীর শান্ত সে গতি! মংলী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো স্বচ্ছ জলস্রোতের পানে তাকিয়ে; তারপর গায়ে একটু উত্তাপ লাগতেই বন থেকে দাঁতন ভেঙে এসে বসলো শিলাসনের উপর প্রবহমান জল তরঙ্গের পাশে।

মংলী!

মংলী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো গারগু—তারই সমবয়সী গারগু। অনাবৃত কালো দেহ, চিকন কালো ঐ দিগম্বর পাহাড়টার মতো। বাহু আর বক্ষদেশের সুস্পষ্ট মাংসপেশীগুলো অচঞ্চল। সেই অনাবৃত দেহটার উপর পড়েছে সূর্যের প্রথম কিরণ! গারগুর কাঁধে কাঁড়-বাঁশ (তীর ধনুক), আর হাতে কোদাল। সে জিগ্যেস কল্লো, বিদায়াম্ আ আব্ সায়াব কানায়া? (তোর কাঁধে কাঁড়-বাঁশ কেন)

গারগু এ প্রশ্নের আর কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো।

মংলীর দাঁতন করা হ'য়ে গিয়েছিল, হাত মুখ বেশ ক'রে ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো ঝুড়িটা নিয়ে।

—ঝুড়ি কেনে? গোবর কুড়াবি নাকি?

হুঁ মংলী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, হাঁ তাই করবে।

মাঠ থেকে ধান কাটা হ'যে গেলেই ক্ষেতের মাটিকে উর্বরা করবার জন্তই এরা পৌষ মাস থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে গোময় সংগ্রহ ক'রে ক্ষেতে জমা করে রাখে। এ গোময় এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সার। বেশী সার দিলে বেশী ধান হ'বে।

গারগু একেবারে মংলীর নিকটে এসে বল্লো, চ কেন্নে আমার সঙে দুটি মাটি ফেলে দিবি? যাবি?

মংলী এক কথাতেই রাজী ল'য়ে গেলো।

তারা দু জনে এক সঙ্গে এসে উঠলো বনের মধ্যে। তখন বিহঙ্গমদের ঐক্যতানের বিরাম ঘটেছে, কিন্তু সুরটা তখনো মিলিয়ে যায়নি। এক একটা পাখী মনের আনন্দে বনের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গিয়ে বসছে—যেখানে দু চারটা সমগোত্রীয় পাখী কলরব করছে, প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রতিবেশীর খবরাখবর নিতে যাওয়াও যেন তাদের কর্তব্য। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে স্থানটা আছে ভরে। অপূর্ব পরিবেশ! গারগু এক গুচ্ছ কুড়চি ফুল তুলে স্তবক ক'রে গুঁজে দিল মংলীর এলায়িত খোঁপায়। মংলী গারগুর দিকে তাকিয়ে এক টুকরো হাসলে। খুশির আতিশয্যে গারগু গেয়ে উঠলো :—

বীররে বাহাও কানা
চেঁড্যা রাএদা,
সাগরত্যা দাউতু বালা কানা
মংলী হন্ তুলুং দেলাম বেলা কানা।

বন ছাড়িয়ে তারা এসে দাঁড়ালো অনুর্বর কঠিন মাটির উপর, যেখানে বনের শ্যামলিমা হারিয়ে গেছে গৈরিক মাটির প্রভাবে। এই স্থানেরই খানিকটা অংশ কেটে গারগু ক্ষেত তৈরী করবে, খানিকটা মাটি কাটা আছে আরো "চুয়া" (দশ ফুট্ স্কয়ার ও এক ফুট গভীর কাটা অংশ) পাঁচ মাটি কাটলেই সুন্দর ক্ষেত হ'বে।

গারগু কাঁধের কাঁড়-বাঁশ নামিয়ে রেখে মংলীকে বল্লো, ডাঁডা তোলমে চালা হোয়ন্ত মেৎ। (নে কোমর বাঁধ) মংলী ঝুড়িটা গারগুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বল্লে, আগে তুই ঝুড়ি ভর।

গারগু শক্ত হাতে কোদাল চালাতে আরম্ভ করলে। ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি পরাজয় স্বীকার করলে গারগুর কাছে। আত্ম-সমর্পণ করলে সৃষ্টির আদিম মানবের বংশ-ধরের বাহুবলের নিকট।

বেলা বেড়ে উঠেছে। প্রভাতের বালারুণ এখন পরিপূর্ণ যৌবনের সীমানায়। সূর্যতাপে পাথর-মাটি উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আরো বেশী উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে পাহাড়ের নগ্ন দেহটা।

মংলী মাথা থেকে ঝুড়ি নামিযে বল্লে, উঃ বড় ধূপ!

—দেলা না নিউইন্তয়াদা, (চল জল খেয়ে আসি)

—দেলা। (চল্)

গারগুও মাটি কাটতে কাটতে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে। সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। তারও জল পিপাসা পেয়েছে। তাই সম্মত হ'য়ে গেলো মংলীর প্রস্তাবে।

মাঠের কাজ শেষ করে যখন তারা ঘরে ফিরে এলো তখন সূর্য পাটে বসবার আয়োজন করছেন। গ্রামে ঢুকে দেখলে তাদের ভূস্বামীর গোমস্তা পাঁচকড়ি গ্রামের মাতব্বরদের জমা ক'রে কি সব বলছে। গারগু আর মংলী তাদেরই এক পাশে এসে দাঁড়ালে।

পাঁচকড়ি গারগুকে দেখে বল্লে, কিরে যাবি তুই?—কুথা? জিগ্যেস্ করলে গারগু।

পাঁচকড়ি আপনার পেট থাপড়ে বল্লে, উপোসে মরতে হবে না, আর অমন টেনাও পরতে হ'বে না। বল যাবি ত—টাকা পাবি মোটা, চাল পাবি, কি হ'বে মাঠে কোদাল চালালে? সারা বছর খেটে পাবি ত মোটে শলি কতক চাল, তাতে পেটও ভরে না। শুধু খাটাই সার হয়!

পাঁচকড়ির এক বর্ণ কথাও গারগু বুঝলে না। সে বল্লো, কুথা যাব ঠেকুর বল্।

—ঐ দিগম্বর পাহাড়ীটায় কাজ হ'বে—খাটবি ঐ খানে? হাজরি পাবি অনেক।

—কি কাজ?

—পাথর কাটা।

—কত দিবি?

—এক টাকা হাজরি—আর কামিনের দশ আনা।

—কাল আসবি, বলব।

—আচ্ছা তাই আসব। চলে গেলো পাঁচকড়ি।

অনাগত কালের অলীক সুখের ছবি তুলে ধরলে পাঁচকড়ি এদের সামনে। প্রলোভনের জাল ফেলে এদের সে ধরতে চেষ্টা করলে। সে জালে অবশ্য ধরাও পড়লো অনেকে—গারগু, মংলী, শুকার বৌ, গুড়মা। তারা এলো মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে। কোদাল ছেড়ে ধরলো গাঁইতি আর ঝড়া।

এত কাল তারা যুদ্ধ করে এসেছে বৈরাগী মাটির সঙ্গে। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ক'রে পরাজিত করেছে উপলসর্বস্ব কঠিন ভূমিকে। তারা কোথাও পরাজিত হয় নাই, কিন্তু ঠিকাদারের কাজে হাত দিয়ে তারা যেন প্রথম পরাজয় স্বীকার কল্লে।

দিগম্বর পাহাড়টা তাদের জমীদারের। জমীদার পাহাড়টা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন ঠিকাদারকে। পাহাড়ের পাথর কেটে চালান হ'বে দূরে—যেখানে এরোড্রাম তৈরী হ'চ্ছে—মিলিটারী রোড্ তৈরী হচ্ছে।

সকাল হ'তে কাজ চলে। দ্বিপ্রহরে আধ ঘণ্টার জন্ম কুলি মজুরদের ছুটি মিলে খাবার। তারপর আবার কাজ চলে সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যন্ত। গারগু শক্ত মুঠিতে গাঁইতি ধ'রে সজোরে পাথরের উপর বসিয়ে দেয়, গাইতির ফলা কখনো কখনো ছিটকে আসে। নির্জিব পাথরগুলো সজীব হ'য়ে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে—লোভী স্বার্থপর মানুষের বিরুদ্ধে। গারগু বিদ্রোহী পাথরগুলোর কাছে পরাজিত হ'য়ে যায়। আঘাতের পর আঘাত ক'রেও একটী কণাও সে ছাড়াতে পারে না। মাথা থেকে ঘাম ঝরে—সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। ঘন ঘন ভারি নিঃশ্বাস পড়ে, বুকের মাংসপেশীগুলো তারি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামা উঠা করে। ক্লান্ত গারগু গাঁইতি রেখে বসে পড়ে। কিন্তু ঠিকাদার ঐ আধ ঘণ্টা ছুটি বাদে আর এক মুহূর্তও বিশ্রাম দিতে রাজী নয়, তাই ধমক দিয়ে বলে, এই বসলি কেন? এ কী আরাম করবার জায়গা? উঠ্ ধর গাঁইতি। নিরুপায়, আবার গাঁইতি ধরতে হয়—আবার পাথরের বুকে আছাড় মারতে হয়।

মংলার জন্ম তার ভাবনা হয় বেশী। তার কথাতেই মংলী এখানে এসেছে। তাকেও এমনি পরিশ্রম করতে হয়। সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিশালকার পাথরগুলোকে হাতুড়ির ঘায়ে খণ্ড খণ্ড (রবল) করতে হয়; তারপর সেই বিখণ্ডিত উপল—জমা ক'রে সাজিয়ে রাখতে হয় ঠিকাদারের "হাটের" পাশে। খাটতে খাটতে সে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। মুখের সে সজীবতা আর নাই;—গলার হাড়গুলো পর্যন্ত উঁকি মারতে শুরু করেছে। কাজ নাকি মংলী বেশ ভাল করে—কাজে ফাঁকি দেয় না। ঠিকাদার তার উপর তাই বেশ সন্তুষ্ট। শুকার মা আর গুড়মাকে এ দুদিন কাজে লাগিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বুড়ো-বুড়ি, শক্ত কাজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দ্বারা হবে না।

মধ্যাহ্নের পর সন্ধ্যা আসে। সারা আকাশের গায়ে আবীর ছড়িয়ে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপন করেন। দূরে ঐ বনানীর পাতায় অস্তগামী রবির রংয়ের পরশ লাগে—বিহঙ্গের কণ্ঠে কণ্ঠে সান্ধ্য বন্দনা গান মুখর হ'য়ে উঠে। কুলি-মজুর-কামিনের দল এসে সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঠিকাদারের "হাটের" সামনে। এক এক করে নাম ডেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সত্যনারায়ণের প্রসাদ নেওয়ার মত সকলে হাত পেতে গ্রহণ করে দৈনিক মজুরী। তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় আপন আপন আস্তানার পানে।

সেদিনও কুলি-কামিন মজুরের দল সমবেত হ'য়েছে ঠিকাদারের কুটীরের দ্বারদেশে—দৈনিক মজুরী নেওয়ার জন্ম। প্রত্যহের মত সেদিনও ঠিকাদারের লোক এক এক করে নাম ডেকে যায়—বিনু বাগ্দী একটাকা, লোখু বাউরী আজকার একটাকা আর কালকার বাকী আট আনা, গদাই একটাকা, গারগু এক টাকা, সীতা দশ আনা, মংলী আট আনা—নে নে ধর, হাত পাত। তাড়া দিয়ে উঠলো ঠিকাদারের মুহুরী।

মংলী মুখ গম্ভীর করে বল্লো, না আট আনা পুইসা কেনে লিব? সারা দিন খাটলুম।

—কি খেটেছিস? সারাদিনে তিরিশ ঝুড়িও পাথর বইতে পারিস নাই! ধর—

দুটো ছোট ছোট গোলাকার সিকি মুহুরি ছুঁড়ে দিলো মংলীর গায়ে।

মংলী সিকি দুটো কুড়িয়ে মুহুরীর সামনে "ফিকে" (ছুড়ে) দিয়ে বল্লে—মিছা কথা কেনে বুলছিস্?

সারাদিনে আড়াই কুড়ি ঝুড়ি বইয়াছি। না লিব নাই আট আনা।

টানা টানা আয়ত চোখ দুটো উঠলো জ্বল জ্বল করে তার। দুলে উঠল সর্বাঙ্গ। বাহুর উপর অসংযত বস্ত্র খসে পড়লো।

ঠিকাদার মুহুরীকে বল্লেন, ওকে একটা টাকাই দাও। মুহুরী একটা টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে বল্লো—নে ধর!

ঠিকাদার বল্লেন, কি খুসি হ'য়েছিস্?

মংলীর মুখে দেখা দিলো হাসি। মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি চক্ চক্ করে উঠলো।

দেখতে দেখতে দিগম্বর পাহাড়ের অর্দ্ধেকটা অঙ্গ খসে পড়লো—উচ্চতা আর তার থাকল না। সমতল হ'য়ে গেলো প্রান্তরের সঙ্গে। লাকুড্ডির ঘর বাড়িগুলো—আর রেল ষ্টেশনের পাকা ইমারত পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেলো। তাদের মধ্যিখানের প্রাচীর ধ্বসে পড়েছে! লাকুড্ডির সীমান্তে কর্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত চব্বিশ প্রহর দণ্ডায়মান থেকে যে বীর বহিঃশত্রুর হাত হ'তে রক্ষণ করে এসেছে লাকুড্ডির মানুষগুলোকে—সেই বীর আজ ধরাশায়ী, প্রতিপক্ষের বলে ক্ষত বিক্ষত তার অঙ্গ। শুধু তাই নয়, লুব্ধ শকুনি আজ তার অঙ্গের মাংস-পিণ্ড কুরে কুরে তার ধারাল দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে।

গারগু গাঁইতি রেখে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল কতকালের পাহাড় এটা, এর গায়ে কেউ কোনোদিন পদাঘাত করতে সাহস করেনি, কিন্তু আজ তা অস্ত্রাঘাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে বসেছে। এর জন্যে তাদের অভিশাপ পেতে হ'বে। মনে পড়লো তার, তাদের মাতব্বর নিমাইএর কথাগুলো—ওরে উথেনে দেবতা থাকে, দেবতার গায়ে "গাঁৎ" (গাঁইতি) মারলে—লাকুড্ডির মানুষগলা সব মরে যাবেক। যাস্ না—উথেনে কাজ করতে যাস্ না! সেদিন গারগু এ কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু আজ আর না বিশ্বাস করে উপায় নেই। প্রথম হয়ত সে-ই মরবে। শুকার মা বুড়ি পোরশু মরে গেছে—হয়ত এই পাপেই—

এই বসে বসে কি ভাবছিস্। উঠ্ মাটির তল থেকে সাদা সাদা পাথরগুলো বের করতে হবে। ওগুলো ভাল পাথর।

গারগু উঠলো।

—তোরা সব গাল-গল্প করবার জায়গা পেয়েছিস্ নাকি? আজ আর সব কামিনের পাথর ভেঙ্গে কাজ নেই। মংলী ঐ-যে ছোট ছোট পাথরগুলো পড়ে আছে ওগুলো ঝুড়িতে কুড়িয়ে এনে জমা করে রাখ পাথর গাদায়।

ঠিকাদারের কর্কশ কণ্ঠ আর শোনা গেল না। গারগু তাকিয়ে দেখলো ঠিকাদার চলে গেছে, আর মংলী গারগুর পায়ের নীচের পাথরগুলোকে কুড়িয়ে ঝুড়িতে ভরছে।

দাঁড়া আমি ভরে দিছি। গারগু বল্লো।

গারগু ঝুড়ি সাজিয়ে দিলো—মংলী দিয়ে এলো সেই ঝুড়ি ভর্তি পাথর গাদায় ফেলে। এক দুই তিন—চার—পাঁচ—দশ—পনেরো—। মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে এলো, মধ্যাহ্নের পর বেলা শেষের করুণ রক্তিমা ফুটে উঠলো। কিন্তু কই মংলী সেই যে ঝুড়ি নিয়ে গেল আর ত ফিরল না। সে কপালের ঘাম মুছে কপালের উপর হাত রেখে তাকিয়ে দেখলো মংলী আসছে কি না—কিন্তু কই তার দেখা মিলল না। উচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আবার ভালো করে আসবার পথটা—উন্মুক্ত প্রান্তরটা দেখে নিলে সে, কোথাও তার চিহ্ন নেই। তবে সে গেল কোথা? সে গাঁইতি ফেলে চল্লো পাথরের গাদার দিকে। কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখলে ঠিকাদারের "হাটের" দরজার ফাঁকে কার শাড়ির প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। ভালো করে পরীক্ষা করলো শাড়ীর পাড়টা—চেনা চেনা মনে হয় শাড়িটা! তবে কী—

ক্ষিপ্রপদে সে ছুটলো কুটীরের পানে।

—ছাড় ছাড় বুলছি—হাত ছাড় বুলছি!

থমকে দাঁড়ালো গারগু। মংলীর গলার স্বর!

—তুই যা চাইবি তাই দিব। কাপড় টাকা আরো অনেক জিনিষ—

ঠিকাদারের কলুষিত দৃষ্টি, ঘৃণিত প্রলুব্ধ প্রস্তাব। গারগু আর স্থির থাকতে পারলে না। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। যা কল্পনা করেছিল

তাই দেখল সে। ফেলে আসা জীবনের স্তিমিতপ্রায় চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বন্য পশুর সঙ্গে বুনো মানুষের দ্বৈরথ সমরলিপ্সা জেগে উঠলো! সজোরে সে আঘাত কল্লে ঠিকাদারের মুখে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ঠিকাদার—ব্যাধের হাতে হিংস্র জন্তুর পরাজয় যেমন ক'রে ঘটে! মুখ নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু এত সব লক্ষ্য করবার মত সময় গারগুর ছিল না। সে মংলীর হাত ধরে সহজ সুরে বল্লে—চালাং ইস্কুলু হুজুমে। (আয় আমরা যাই) গাইতিটা পড়ে থাকলো পাহাড়ের পাদদেশে—সেটার আর প্রয়োজন নেই। কোদালই তাদের ভালো। কিন্তু দিগম্বর পাহাড়—আজ আর নেই, এদের স্বাতন্ত্র্য কি রাখতে পারবে এরা?

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পরই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল ও শোষিত রাজ্যগুলির স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের কংগ্রেস-মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডল দুর্ব্বল পশ্চিম আফ্রিকার পক্ষাবলম্বন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন ঐ রাজ্যটী কৌশলে কুক্ষীগত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিবাদ জানান। তাঁহাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়; জাতি-সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত জানান যে, পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অবশ্য, শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয় কি না—জাতি-সঙ্ঘ কোনও অবাধ্য সভ্যরাষ্ট্রকে সায়েস্তা করিতে পারেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিকামী প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজদের অন্যায় ও অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ভারতীয় প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ স্বস্তি পরিষদের সদস্য নহে বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি এই সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের আবেদন অনুসারে জাতি-সঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদ ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

গত বৎসর নভেম্বর মাসে ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ তাহার সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া চেরিবন্ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া—বিশেষতঃ বিশ্বের জনমত প্রতিকূল হইয়া ওঠায় ওলন্দাজ ধুরন্ধররা ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া কিছু সময় লইতে চাহিতেছিল। শক্তি সঞ্চয় করিবার পর কৌশলে, প্রয়োজন হইলে সামরিক বলপ্রয়োগ করিয়া নবীন ইন্দোনেশিয়ান্ রিপাবলিককে ধ্বংস করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। নাৎসী আক্রমণে পঙ্গু হল্যাণ্ডের পক্ষে নিজ শক্তিতে ইন্দোনেশিয়ার জাগ্রত ৭ কোটী অধিবাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা সম্ভব নহে। ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৃটেন্ ও আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার তৈল ব্যবসায়ে বৃটেনের বিশেষ স্বার্থ; বৃটিশ সেল্ ও ওলন্দাজ সেল্ কোম্পানী একত্রে ইন্দোনেশিয়ার তৈল আহরণ করে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আমেরিকার লোভ প্রচুর।

ইন্দোনেশিয়ায় ৩শত বৎসরের ওলন্দাজ শাসনের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে এই কোম্পানীর ব্যবসা আরম্ভ হয়। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটির মত ওলন্দাজ কোম্পানীও ব্যবসায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। অতি সত্বর ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত দ্বীপপুঞ্জ অস্ত্রবলে জয় করে। দুই শত বৎসর কোম্পানীর রাজত্ব চলিবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। তদবধি ১৯৪২ সালে জাপানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ওলন্দাজরা পলায়ন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইন্দোনেশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সিন্‌কোনা, গোলমরিচ, রবার, নারিকেল, পেট্রোল, চা, চিনি, কফি প্রভৃতি এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং বহু পরিমাণে বিদেশে চালানও যায়। এই সব কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের উৎপাদনে এবং ব্যবসায়ে একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব ওলন্দাজদের; দেশীয় জনসাধারণ কঠোর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত। শতকরা ১জন ইন্দোনেশিয়ের বাৎসরিক আয় ছিল ২ হাজার টাকা; গড়পড়তা মাথা পিছু বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০ টাকা। পক্ষান্তরে শোষক ওলন্দাজদের মাথা পিছু গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৫ হাজার টাকার উপর।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে নিষ্পিষ্ট ইন্দোনেশিয়দের পক্ষে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আশীর্ব্বাদস্বরূপ হয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাপানের তড়িৎগতি আক্রমণে ও দ্রুত সাফল্যে তাহারা উৎসাহিত হইয়া ওঠে। প্রতিবেশী জাপানকে তাহারা মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে দেরী হয় নাই। প্রতিবেশী পীত জাতিটি যে শ্বেতাঙ্গ শোষক অপেক্ষা কম নির্ম্মম ও কম স্বার্থপর নহে, তাহা বুঝিবামাত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। প্রতিরোধকারীদের বিরামহীন তৎপরতার ফলে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানীরা কখনই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তারপর ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে জাপানের পরাজয় ঘটিবামাত্র প্রতিরোধকারীরা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্য নব-প্রতিষ্ঠিত ইন্দোনেশীয় রিপাবলিককে অভিনন্দন জানায়। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট তখন ছিলেন নিরুপায়। নাৎসী আঘাতে পঙ্গু ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় অস্ত্রবলে জয় করা আর সম্ভব ছিল না।

ঔপনেবিশিক রাজ্যের শোষণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চিরাদন ঐক্যবদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বৃটিশের স্বার্থের কথা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। বৃটেন্ এই সময় ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে জাতীয় আন্দোলনের পুষ্টি, তাহাকে জাপানী চক্রান্ত আখ্যা দিয়া তাহার বিরুদ্ধে বৃটিশও জাতীয় সৈন্য লেলাইয়া দেয়। ইন্দোনেশীয়রা তখন স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে, অস্ত্রবলে তাহাদিগকে দমন করা সহজসাধ্য নহে। বৃটিশ সৈন্য নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালাইয়া নাৎসী প্রথায় নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে পোড়াইয়া মারিয়া ইন্দোনেশিয়াকে পদানত করিতে পারে না। এদিকে বিশ্বের জনমত ক্রমেই প্রতিকূল হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৪৭ সালের প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়া ও ইউক্রেন জাতি-সঙ্ঘে ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ উথাপন করে এবং অবিলম্বে তথা হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী করে। জাতি-সঙ্ঘে এই দাবী গ্রাহ্য না হইলেও সংগ্রামরত ইন্দোনেশীয়দের অনুকূলে বিশ্বের জনমত তৈয়ারী হয়। অস্ত্রবলে ইন্দোনেশীয়দের দমন করা ক্রমেই অসাধ্য হইয়া উঠিতে থাকে। তখন এই দ্বীপপুঞ্জকে অবরোধ করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান সরীর ভারতবর্ষকে ৫লক্ষ টন্ চাউল দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বৃটিশ ও ওলন্দাজরা একযোগে এই চাউল ভারতে পৌছান বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

যাহা হউক, স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশীয়দিগকে দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ওলন্দাজরা এক চুক্তি (চেরিবন্ চুক্তি) করিতে সম্মত হয়। এই চুক্তির খসড়া তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর মাসের মধ্যে তাহারা উহাতে স্বাক্ষর করে না। এদিকে যুদ্ধ-বিরতির র্ত্ত তাহারা ক্রমাগত লঙ্ঘন করিতে থাকে; অর্থনৈতিক অবরোধও ঠোরতর হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইন্দোনেশিয়ায় যত ওলন্দাজ সৈন্য াকিবার কথা, তাহার সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পশ্চিম জাভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ওলন্দাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ অধিকার করিয়া বসে; অজুহাত, ঐ অঞ্চলের সন্ধানীরা ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব চায়।

এই সব বিরোধ সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক গত মে মাসে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ওলন্দাজদের পক্ষ হইতে ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক অন্তর্ব্বর্ত্তী ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য এই ফেডারেল গভর্ণমেণ্টে ওলন্দাজ প্রতিনিধি থাকিবার অসঙ্গত প্রস্তাবেও আপত্তি করে নাই। তবে, ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি অপমানকর সর্ত্তে রিপাবলিকান্ কর্তৃপক্ষ প্রবল আপত্তি তোলেন; আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ওলন্দাজ কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে তাঁহারা কিছুতেই রাজী হন নাই। চেরিবন্ চুক্তিতে (পরে লিঙ্গজ্জাতিতে অনুমোদিত) জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরায় রিপাবলিক্যান্ গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি রিপাবলিক্যান্ গভর্ণমেণ্টের এই কর্তৃত্বের অধিকার মানিয়াও লয়। তাই, ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমীর সরিফুদ্দীন সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিয়াছেন, "We therefore, ask the question why then should we accept the joint police force in our own territory?"

ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসায় যখন এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ ওলন্দাজরা আদেশ দেয় যে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীকে তাহাদের অবস্থানক্ষেত্র হইতে ১০ কিলোমিটার সরাইয়া লইতে হইবে। এইভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ সামরিক প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া ওলন্দাজরা "মারমুখো" হইয়া ওঠে এবং ২১শে জুলাই ওলন্দাজ বিমান বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্থলবাহিনীও তৎপর হয়।

ওলন্দাজরা কেবল সময় লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে চেরিবন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহা তাহাদের আচরণে সুস্পষ্ট। বৃটেন ইন্দোনেশিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে বাধ্য হইলেও ওলন্দাজদের সে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছে। ওলন্দাজ সামরিক বিভাগকে বৃটেন্ প্রচুর পরিমাণে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়াছে। ওলন্দাজ সেনাবাহিনী শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছে বৃটেন। বৃটিশ বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই ডিভিসন সৈন্য তখন ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে। সম্প্রতি মিঃ বেভিন্ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ওলন্দাজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কাজ বন্ধ করিবেন না।

ইন্দোনেশিয়ায় দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইবার আর্থিক সঙ্গতি ওলন্দাজদের ছিল না। বৃটেন্ দরিদ্র,* তাহার পক্ষে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব নহে। তাই, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওলন্দাজ গভর্ণর জেনারেল দৌড়ান ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়। মার্কিণ ধনকুবেররা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সকলে ডলার খাটাইবার জন্য উদগ্রীব। ইন্দোনেশিয়ায়

ডলার খাটাইয়া লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজ খবর লইবার জন্ত তাহারা বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছিল। খোঁজ খবর লওয়া শেষ হইয়াছে। এখন তথাকথিত মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে রণবিক্ষত ইউরোপীয় দেশগুলিকে সাহায্য দানের নাম করিয়া তাহাদিগকে ডলারের চাকায় বাঁধিবার যে চেষ্টা হইতেছে, সেই চেষ্টায় নেদারল্যাণ্ডের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হইবে। আমেরিকা যে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে কত বেশী আগ্রহী, তাহার বড় প্রমাণ পূর্ব্ববর্ণিত ওলন্দাজদের ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়ান্ রিপাবলিককে মানাইয়া লইবার জন্ত মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট চাপ দিয়াছিলেন। তাহারা ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিককে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব না মানিলে তাহারা ইন্দোনেশিয়াকে কোনরূপ অর্থসাহায্য করিবে না।

ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘে উত্থাপিত হইলে বৃটেন ও আমেরিকা সমগ্র ব্যাপারটা ভণ্ডুল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বৃটেন অষ্ট্রেলিয়াকে এক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিল যে, ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষপাতমূলক আচরণ করিয়াছে, সে আমেরিকার পূর্ণ সম্মতিতেই অষ্ট্রেলিয়াকে এই কথা জানাইতে বাধ্য হইল। তাহার পর, স্বস্তি পরিষদে বৃটেন্ ইন্দোনেশিয়ার অনুকূলে ভোট দেয় নাই। আমেরিকা তখন ব্যস্ত হইয়া ইন্দোনেশিয়ার বিরোধ মীমাংসা করিতে আগাইয়া আসে। আমেরিকার আশঙ্কা—পাছে জাতি-সঙ্ঘ তাহার নিজস্ব প্রতিনিধিমণ্ডল পাঠাইয়া প্রকৃত ব্যাপারটা জানিয়া ফেলে এবং ইন্দোনেশিয়ার অনুকূলে রায় দেয়; তাই, সে নিজে এই ব্যাপারে মোড়লী করিতে চায়। শেষ পর্য্যন্ত রিপাবলিক্যান গভর্ণমেণ্টের আপত্তিতে আমেরিকার চাল ব্যর্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য—পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা যদি সচেষ্ট হইত, তাহা হইলে অনায়াসে এই ব্যাপারের সুমীমাংসা হইতে পারিত; জাতি-সঙ্ঘে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রয়োজনই ঘটিত না।

শিল্পী মুকুন্দ মজুমদার

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে যাঁহারা ভারতীয় শিল্প-আদর্শে সহজ কথায় 'ওরিয়েণ্টেল আর্টের' সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিন্দা ও সমালোচনার গ্লানি অতি তীব্রভাবেই সহিতে হইয়াছিল। স্বয়ং

মুক্তবেণী

অবনীন্দ্রনাথ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যবৃন্দ অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে প্রভৃতি জন-সমাজের দিক হইতে এবং সমালোচকদিগের নিকট হইতে অবহেলা ও বাক্য জ্বালা সহিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ সেই দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে।

কলেজের মেয়ে

এখন তাঁহারা শুধু বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষেই নন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও তাঁহাদের প্রাপ্য হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সি, আই-ই উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। আজ অবনীন্দ্রনাথ যশস্বী এবং অতুল গৌরবের অধিকারী তিনি। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা চিত্রজগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া তাঁহারই শিক্ষা ও আদর্শের গৌরবকে দেশে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজ আমরা যে তরুণ শিল্পীর পরিচয় দিতেছি তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টেল আর্টস' হইতে ১৯৪৪ সালে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিল্পী মুকুন্দ ছাত্রাবস্থায়ই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্র সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

ঘুমন্ত শিশু

শিল্পী—মুকুন্দ মজুমদার

আমরা এখানে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়াও সঙ্গত মনে করিতেছি। মুকুন্দ স্বদেশহিতৈষী ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পৌত্র। মুকুন্দ পারিবারিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইয়া—এই শিল্পীর জীবনকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

মুকুন্দ আপনাকে কোনদিন জনসমাজে প্রচারের জন্য উন্মুখ নয়, নীরবে আপন মনে শিল্প সাধনাই তাহার জীবনের ব্রত।

এখানে যে কয়টি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহার সব কয়টিই তাহার ব্রাসওয়ার্ক, এবং মডেল হইতে গৃহীত। খোকা ঘুমাইয়া আছে তাহার পাশে পড়িয়া আছে তাহার সাধের ঝুমঝুমিটি। ঘুমন্ত এই শিশুর মুখে যে স্বাভাবিক সারল্য এবং শান্ত মাধুর্য্যের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। আমাদের ভারতীয় চিত্রকরেরা বিদেশী চিত্রশিল্পীদের মত তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রে শিশু ও বালক-বালিকার জীবনের সহজ সরল সচ্ছন্দ গতি ও সাবলীল অঙ্গভঙ্গী—হাসি, কান্না, আদর, খেলা ধূলার বৈচিত্র্য দেখা যায় না, কাজেই এই নিদ্রিত শিশুটির চিত্র দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মুকুন্দের অঙ্কিত মুক্তবেণী ও কলেজের মেয়ে চিত্র দুইটি ব্রাশওয়ার্ক। বিনা ড্রইংএ শুধু ব্রাশের টানে দুইটি তরুণীর মুখাবয়ব বিচিত্র ও বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উভয় তরুণীর চক্ষুর দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটা চমৎকার নির্ভীক অথচ প্রসন্ন দিব্যশ্রী বিকশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই চিত্র তিনটির ভিতর দিয়া শিল্পীর চিত্র নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাই।

শিল্পী মুকুন্দ বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্কিত সেই সমুদয় চিত্রের একটি প্রদর্শনী হইলে উহা চিত্রামোদীদের কাছে আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে করি।

আশা করি একদিন এই তরুণ শিল্পী বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের ন্যায় জনসমাজে সমাদৃত হইবেন। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করি।

ভীমপলশ্রী

বনফুল

১০

খিড়কীর দরজার সামনে সুশোভন এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দেখলে একটা নয় দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, নীচে একটা—লোহার ছিটকিনি। নীচেরটা ঢল-ঢলে গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্তু এত বেশী ঢল-ঢলে যে একটুতেই পড়ে যাচ্ছে, আর এমন একটা খড়খড় আওয়াজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয়, আশঙ্কাজনকও। গোঁসাইজির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। উপরের ছিটকিনিটি আবার ঠিক বিপরীত, এমন আঁট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আছে। সুশোভনের বাঁ হাতে লণ্ঠন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান মারলে একটা। ক্যাঁ—চ করে' বিকট একটা আওয়াজ হল কিন্তু খুলল না। অর্দ্ধেকটা খুলে থেকে গেল। আলোটাও নিবে গেল দপদপ করে'। সুশোভন আলোটা তুলে নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতালার দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কি না। না, ভাঙেনি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জ্বাললে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে আর একবার টান দিলে ছিটকিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হল 'জাম' হয়ে এঁটে বসেছে আরও। বাঁ হাতের আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিতে হল দেশলাই কাঠিটা। আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। কুকুরের একটা হিল্লে না করে' সান্ত্বনার কাছে ফেরা যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে' হোক। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে' রুমালটা ছিটকিনিতে বেঁধে ঝুলে পড়ল সেটা ধরে' সে। ক্যাঁ—চ খটাৎ—ভীষণ শব্দ করে' খুলে গেল। যাক। উপর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। না' গোঁসাইজির নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। কপাটটা খুলে বেরিয়েই সুশোভনের পা পড়ল ন্যাতার মতো একটা জিনিসের উপর। দেশলাই জ্বেলে দেখলে জায়গাটা আঁস্তাকুড় গোছের। ভাঙা টিন, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরো, গোবর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের জলও বোধহয় পড়ে এইখানে। স্যাঁত স্যাঁত করছে চতুর্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা তুলে ধরে' সুশোভন দেখলে—সর্ব্বনাশ, সামনে আর একটা দেওয়াল এবং তাতে আর একটা কপাট। মনে হল এইটেই বোধহয় আসল খিড়কি। এটা পার হতে পারলে তবে গোয়ালঘরে পৌঁছানো যাবে। ভাগ্যক্রমে এ কপাটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল। বিশেষ বেগ পেতে হল না। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ালটা পেলে। ঝুনুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি সুরু হল ঝির ঝির করে'। কনকনে হাওয়া তো ছিলই। রুমালটা মাথায় দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালতে জ্বালতে গোয়ালটার দিকে অগ্রসর হল সুশোভন। ছাপ্পর-খাট-শায়িতা কম্বলাবৃতা সান্ত্বনার ছবিটা অনিবার্য্যভাবে ফুটে উঠল মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে। একটু আগে তার শয্যাপ্রান্তে বসে তার ছিমছাম ঘরোয়া মূর্ত্তি দেখে একটু অভিভূত সে যে হয় নি তা নয়। বিলাসী, জেদি,

খরচে অনীতার সঙ্গে তুলনা করে' সান্ত্বনার সাদাসিধে ভাবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু সুশোভনের মনে পড়ল সান্ত্বনাও এক কালে কম করে নি। সেই লেখন-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকেই ও বদলে গেছে এবং তারপর বোধহয় আবিষ্কার করেছে যে সাদাসিধে চাল চলনই ভাল। একটু আগে—সত্যি কথা বলতে কি—সান্ত্বনার ধীর স্থির শান্ত গার্হস্থ্য লক্ষ্মীশ্রী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম প্রকৃতির সঙ্গে তার তুলনা করে' সুশোভনের মনটা সান্ত্বনার দিকেই ঝুঁকে ছিল একটু। কিন্তু এখন সে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করছিল এইসব লক্ষ্মী-স্ত্রী-মার্কা স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীণ ব্যাপার। তাঁকে স্বেচ্ছায়, শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে এই ঠাণ্ডায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে' লক্ষ্মীছাড়া একটা কুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে! কি রকম দাম্পত্যজীবন এদের? ভদ্রহাসি-মাখানো শাস্ত্রীয় মাধুর্য্যের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি! না, তার অনীতা ঢের ভাল এর চেয়ে। উদ্দাম জিদ্দি আবদেরে বদরাগী কিন্তু প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে—আর এতটা অবুঝ স্বার্থপরও নয়। অনীতা কখনও তাকে এমনভাবে কুকুর আনতে পাঠাতো না। কখনও না।

কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে—সেই সেকালের কমরেড সান্ত্বনার সঙ্গে—একরাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত মন্দও লাগছিল না সুশোভনের। বেচারী! কি বদনামটাই রটিয়েছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধহয় গৃহলক্ষ্মীটি হয়ে গেছে একেবারে। এরকম আরও দেখেছে সে। বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা খুব বেশী প্রগতিশীলা থাকে বিয়ের পর আর চেনা যায় না তাদের। একেবারে সটান তুলসীতলা আশ্রয় করে তারা। সান্ত্বনার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি হচ্ছিল তার।

এইবার ঝুনুর খোঁজ করা যাক।

ঝুনুর কান্না শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের কপাটটা খোলা ছিল। সুশোভন কপাটের কাছে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে একটু। কিছু দেখা গেল না। খড়ের খড় খড় শব্দ আর ঝুনুর আর্ত্তনাদ ছাড়া শোনাও গেল না কিছু। সুশোভন ভিতরে ঢুকে দেশলাই জ্বাললে। সুশোভনকে দেখে ঝুনু হাহাকারের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনাসূচক একটা হর্ষোচ্ছ্বাস মিশিয়ে অদ্ভুত ধরণের শব্দ করতে করতে এগিয়ে এল। সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে দিতে চাটলে দু' একবার ভয়ে ভয়ে। আহা, আপাদমস্তক থর থর করে' কাঁপছে। লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। বেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরণে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চীৎকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা আনুনাসিক কোঁতানি আরম্ভ করলে যা অতিশয় শ্রুতিকটু।

"চুপ কর"

"কুঁই কুঁই কুঁক কুঁক"

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। সুশোভনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক।

"চুপ কর"

সুশোভন ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এ রকম ছিঁচকাঁদুনে হতে পারে তা সুশোভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠল ঝুনু।

"চুপ কর বলছি, মারব না হলে—"

সুশোভন যে-ই একটু হাত তুলেছে ঝুনু "কেঁউ" করে' বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের মধ্যে।

"আরে, এ কি হল"

কপাটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সুশোভন।

"আঃ আঃ চু চু চু"

টুসকি দিতে লাগল। কোন ফল হল না। বেরুতে হ'ল গোয়াল থেকে। বৃষ্টিও নামল বেশ জোরে।

"আয় আয় ঝুনু—আঃ—আঃ—"

নাতি-উচ্চ-কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে এগুচ্ছিল হুড়মুড় করে' হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামলা গোছের কি ছিল, গরুর জাবখাওয়াবার ডাবা বোধ হয়।

"ঝুনু ঝুনু, আয় বলছি। এস লক্ষ্মীটি। মারব না, কিচ্ছু বলব না, আঃ আঃ। আয় না—উঃ কি লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বাবা—ধরতে পারি যদি একবার। ঝুনু—ঝুনু"

দূরে বহুদূরে শর্ষে-ক্ষেতের ভিতর ছুটতে ছুটতে একটা খেজুর গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে 'কেঁউ' করে' উঠল

ঝুমু। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সুশোভন চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি রি করে' উঠল রাগে। কিন্তু করবারই বা কি আছে! এগুতে হল। শব্দটা যে দিক থেকে এল সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল সে হন হন করে'। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল কিসের উপর একটা। তলপেটে গুঁতো লাগল। টিউব ওয়েলের পাম্প না কি এটা! আর একটু গিয়ে আবার হোঁচট—আর একটা পিপে। ঝন ঝন শব্দ করে' টিনও পড়ে গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জব জবে ভিজে পা বসে যাচ্ছে। সেখানটা অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার ঠোকর খেতে হল, সান-বাঁধানো জায়গা ছিল একটা সামনেই। বোধহয় স্নান করবার জায়গা। একটা ঝাঁটা পায়ে ঠেকল, লাথি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। তারপর সে দাঁড়াল একটু। এ কোথায় এসে পড়ল! আর তো কোন শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। একটা গাছের ডাল থেকে ফোঁটা কয়েক জল পড়ল টপ টপ করে' নাকের ডগায়। সরে' দাঁড়াতে হল।

"উঃ কি ফ্যাসাদে পড়লাম।" এর পর যদি কুকুরটাকে ধরতেও পারি, কি যে হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ভিজে কুকুরকে সান্ত্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেঝেয় শুতে হবে, শুয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়, জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেব একেবারে। ঝুমু—আঃ—আঃ—ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। আর একটু এগিয়ে সুশোভন দেখলে একটা বেড়া রয়েছে, তারের বেড়া। এর ওপারেই মাঠ। মাঠে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বেড়াটায় ভর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই।

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোভনের মনে হল আর পারছে না সে। সীমা অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে দুরবস্থা আর হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়। ওই গারাজে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাক। থাকুক গোবরের গন্ধ, ওই খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কেটে যাবে কোনক্রমে। ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে'। কোলকাতায় তার নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনীতা শুয়ে আছে। কল্পনা করেও যেন আরাম হল একটু। কিন্তু একটা কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম করে' একটু দমেও গেল সে। এ সমস্তর জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। রাগ পড়ে' গেল। একটা শূন্য বিমর্ষভাব খাঁ খাঁ করতে লাগল সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছিল খুব…। বেড়াটা পেরিয়ে খুঁজে দেখবে না কি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল না সে। আর এতে লজ্জারই বা কি আছে। ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম না হয় নাই হবে। ঘুম হবেই না বা কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে।

কিন্তু না, তার মনের অন্তরতম প্রদেশে আর একটা কি যেন খচখচ করছিল। কি সেটা? সে এমন কিছুই করে নি এখনও পর্য্যন্ত যা অন্যায়, যাতে অনীতার ন্যায়ত রাগ হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে অনীতা বুঝবেই নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত। কিছুই তো করে নি সে। কিন্তু তার মনের এই বিমর্ষভাবের সঙ্গে অনীতাই যে নিগূঢ়ভাবে জড়িত এ ধারণাটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল না কিছুতে…।

"ঠিক"—হঠাৎ মনে হলে তার—"আসলে অনীতার জন্যে মন কেমন করছে। মানে বিরহ"

হ্যাঁ, বিরহই। নিজের বান্ধবীদের কাছে যে অনীতার বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাকে বিয়ের পর এক রাত্রিও ছেড়ে থাকে নি সে। নিজের বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে—পরের স্ত্রীর কুকুরের পিছু পিছু ছুটে একটা হতভাগা হোটেলের পিছনে মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে রাত দুপুরে। অনীতার সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সান্ত্বনার কাছে!

অনীতার মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া। কিন্তু ওই অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অম্লমধুর অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, তার এই মুহূর্ত্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা যদি অনীতা পেত কোনক্রমে—একরাত্রি তাকে ছেড়ে কি

রকম মন কেমন করেছিল তার—তাহলে তার কড়া মেজাজ নরম হয়ে যেত ঠিক।

সান্ত্বনা বড্ড বেশী নরম—একটা কুকুরের জন্যেই হেদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক্ তার কুকুর। হোটেলের দিকে ফিরল সে মরীয়া হয়ে। পত্নী-নিষ্ঠা, স্বামীর নিষ্কলুষ চরিত্র-মাধুর্য্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত তখন পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব কম শব্দ করে' ছুটি দুয়ারের ছিটকিনি বন্ধ করলে, বলাবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের ছিটকিনিটি স্পর্শ পর্য্যন্ত করলে না। লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি—ক্যাঁচ কোঁচ একটু আধটু শব্দ নিবারণ করা গেল না কিছুতে। উপরে উঠে সিঁড়ির উপর বসে' ভিজে জুতো দুটো খুলে ফেললে সে সর্ব্বাগ্রে। ইস্, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। জুতো খুলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে একটু। এইবারই তো—। উপরের ঘরে (মানে গোঁসাইজির ঘরে) খুটখাট শব্দ শোনা গেল দু' একবার। চকিতে উপরের দিকে একবার চেয়ে নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। সান্ত্বনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দেশলাই জ্বাললে, তবু সান্ত্বনার কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা তাকের এককোণে মোমবাতি রয়েছে একটা। হেডমাষ্টারের সম্পত্তি, বোধহয় তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক। চট্ করে' মোমবাতিটা তুলে জ্বেলে ফেললে সে।

বালিশে মাথাটি রেখে সান্ত্বনা ঘুমুচ্ছে—বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে বলে' মনে হল—অধরে শান্ত প্রসন্ন হাসি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকাতে গণ্ডের ও গ্রীবার এমন একটা লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর বললেই সবটা বলা হয় না। সুশোভন হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে' ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সামান্য একটু নড়ে চড়ে উঠল সান্ত্বনা, বাঁ হাতখানা বুকের উপর ছিল নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। অনামিকায় বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল তার পাথরখানা। সুশোভন সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। সে বেচারীও বোধহয় একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। কিম্বা সে হয় তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে··· বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ···একটা অভূতপূর্ব্ব বেদনা আকুল করে' তুলেছে হয় তো। সুশোভনের শীত করছিল, জামাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাল সে একবার। না, সে শোবে না এখানে। সান্ত্বনা, সান্ত্বনার স্বামী এবং সমস্ত শোনবার পর অনীতাও তার এখানে শোওয়ার সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, সিঁড়িতে কিম্বা ওই গোয়াল ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন উচিত তা বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা হয় তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। তার কেমন যেন আবছাভাবে মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে শুলে অনীতার সঙ্গে আত্মিকযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমন্ত সান্ত্বনার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্য আরও চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"উঃ কি সাংঘাতিক প্যাঁচেই যে পড়েছি। ভিজে জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন ছুঁকছুঁক করছে, বিবেক দংশন, রাম রাম! কি যে করি এখন ঘোড়ার ডিম"—স্বগতোক্তিটা জোরেই হয়ে গেল একটু।

"কে, ও আপনি, কি বলছেন"—জেগে উঠল সান্ত্বনা।

"বলছি, কি করি এখন"

"কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঝুনু কই"

"ঝুনু এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই আসতে চাইছে না। থাক না বেশ আছে, বাইরে আরামে থাকবে"

"খেলা করছে! না, না, সুশোভনবাবু নিয়ে আসুন তাকে। ঠাণ্ডায় অসুখ করে' যাবে"

"কিচ্ছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে"

"কেন"

"যা অন্ধকার। সূচীভেদ্য বললে কিছুই বলা হয় না। আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা—"

"ঝুনু কোথায়"

"শেষবার যে তার সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান করছি সর্ষে ক্ষেতে ঢুকেছে"

"সর্ষে ক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে গেছেন একেবারে দেখছি"

সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তার সিক্ত কোটের দিকে শুভ্র বাহুটি প্রসারিত করে বলল—"ছি, ছি, জামার দশা কি হয়েছে আপনার"

"তাতে কি হয়েছে"—ঔদাসীন্যভরে সুশোভন জবাব দিলে—"বেশী ভেজেনি, সামান্য একটু"

"সামান্য একটু কি! ভিজে সপসপ করছেন, এর নাম সামান্য একটু? এত ভিজলেন কি করে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না কি?"

"আজ্ঞে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম"

"কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুণি। অসুখ করে' যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই বা কি করে'—আপনার স্যুটকেশ তো আসে নি—সে তো অনীতার সঙ্গে চলে গেছে। মুশকিল হ'ল দেখছি, কি করা যায়"

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় সীমানা-নির্ধারণ কমিশনের রায় কি অযৌক্তিক?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভারত বিভাগ সাব্যস্ত হওয়ায় পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশও বিভক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভোটদাতাদের নির্ধারণ অনুযায়ী শ্রীহট্ট জেলাকেও পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল, বড়লাট বাহাদুরের ৩০শে জুনের ঘোষণা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কমিশন নিযুক্ত হয়। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় সীমানা কমিশনের বিচার্য্য বিষয় নিম্নলিখিত রূপ স্থির করা হইয়াছিল।

"সীমানা নির্ধারণ কমিশনকে মুসলমান ও অমুসলমান সংলগ্ন অঞ্চল নির্ণয় করিয়া বাংলার উভয় অংশের সীমানা নির্ধারণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সীমানা নির্ধারণ করিতে গিয়া কমিশন অন্যান্য বিষয় ও বিবেচনা করিবেন।" সীমানা কমিশনকে যথাসম্ভব ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ জানান হয়। বাংলাদেশে বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জ্জী, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি আবুসালে মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এম, এ, রহমানকে লইয়া কমিশন গঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগের সমর্থন অনুযায়ী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিশনই শ্রীহট্ট জেলার সীমানা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। পাঞ্জাবপ্রদেশের জন্য বিভিন্ন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য স্যার সিরিল পাঞ্জাব কমিশনেরও সভাপতি ছিলেন।

প্রাথমিক কয়েকটী বৈঠকের পরে কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগের নিকট হইতে স্মারকলিপি আহ্বান করেন। বহু বিঘোষিত নানা দলের স্মারকলিপির মধ্যে জাতীয় মহাসভা, হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগের স্মারকলিপিই উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৬ই হইতে ২৪শে জুলাই কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। কমিশনের সভাপতি প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া কোনও পক্ষেরই যুক্তিতর্ক শোনেন নাই। কমিশনের নিকটে উত্থাপিত উপাদান এবং কৌন্সূলীদের যুক্তিতর্ক পাঠ করার পরে কমিশনের সভ্যদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যার জন্য কয়েকদিন আলোচনা করেন। কমিশনের সভ্যগণ বহু আলোচনার পরও সর্ব্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হন, এমন কি প্রধান প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কেও দুই মত হওয়ায় সভাপতি স্বয়ং এক আপোষনামা দেন। সভাপতি স্যার সিরিল তাঁহার আপোষনামা দেওয়ার কৈফিয়ৎএ জানান যে কমিশনের দুইদল সভ্যই কোন স্থির সিদ্ধান্তে একমত হইতে না পারায় সভাপতির উপরে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দেন। আপোষনামায় আলোচ্য প্রশ্নগুলি উল্লেখ করিবার সময় স্যার সিরিল জানান যে বাংলাদেশকে দুভাগ করিবার মতন সন্তোষজনক প্রাকৃতিক সীমারেখা নাই বলিলেই হয়; মুসলমান ও অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় এমন কোন প্রাকৃতিক রেখা নাই। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরের দ্বারা সীমারেখা টানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন—কলিকাতা নগরী কোন ভাগে পড়িবে কিম্বা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কলিকাতা যদি সমগ্রভাবে একটী রাষ্ট্রের ভাগে পড়ে তবে কলিকাতা সহর ও বন্দর নির্ভর করে এমন কোনও অংশের সহিত ইহার সংযুক্তি অবশ্যম্ভাবী (নদীয়ার সমস্ত নদী ইহাদের অংশ অথবা কুলটীর নদীসমূহ)।

তৃতীয় প্রশ্ন—যশোহর ও নদীয়া জেলার মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দাবী অপেক্ষা গঙ্গা, পদ্মা ও মধুমতী নদী রেখার আকর্ষণ বেশী কিনা এবং তাহা দ্বারা কমিশনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লঙ্ঘন করা হয় কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন—খুলনা এবং যশোহর জেলাকে পরস্পরের সহিত পৃথক করা যায় কি না?

পঞ্চম প্রশ্ন—মালদহ এবং দিনাজপুর জেলায় অমুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করা উচিত কি না ?

ষষ্ঠ প্রশ্ন—দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ী জেলা কোন ভাগে পড়া উচিত। প্রথমটীতে শতকরা ২'৪৩ জন এবং দ্বিতীয়টীতে শতকরা ২৩'০৮% জন মুসলমান বাস করে কিন্তু এই দুইটী জেলা কোনও অমুসলমান প্রধান অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত নহে।

সপ্তম প্রশ্ন—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল কোন অঞ্চলে পড়া উচিত। এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৩ জন মাত্র হইলেও ইহা চটগ্রাম জেলার অধিকারী ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করা মুস্কিল।

গত ১৮ই আগষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাঁটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত সকলেই অবগত হইয়াছেন। ইহার পরে সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভা-সমিতিতে বাঁটোয়ারার বিপক্ষে উভয়পক্ষেরই বিরুদ্ধ আলোচনা ও বিক্ষোভের যে ঢেউ উঠে আজও তাহার সমাপ্তি হয় নাই। কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে উভয় বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় আপোষনামাকে শান্তির সহিত গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। উক্ত আবেদনে তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে আপোষনামার ক্রটীসমূহ সংশোধন করিতে হইলে বিতণ্ডা না করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় শান্তির সহিত মীমাংসা করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন, কিন্তু এই আবেদনের সাথে সাথেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুখপত্র আজাদ পত্রিকায় রাডক্লিফ সিদ্ধান্তে হিন্দুসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে বলিয়া লিখিত হয়। উক্ত পত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব লিখিতেছেন, রিপোর্টখানি দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে হিন্দুদের মনস্তুষ্টির আগ্রহাতিশয্যবশতঃ বাঙ্গলার মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করিয়া এইরূপ রায় দিয়াছেন। মৌলানা সাহেব স্বসমাজের মুছলমানদিগকে হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে তিক্ততা বাড়াইতে নিষেধ করিয়া সম্ভবতঃ মনের অগোচরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় অভ্যস্ত ইন্ধন জোগাইয়াছেন। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক স্যার সিরিল রাডক্লিফ তাঁহার রিপোর্টে কোন সম্প্রদায়ের "কোলে ঝোল" টানিয়াছেন। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ঐতিহাসিক আপোষনামা আমরা ভুলি নাই, ঐ আপোষনামায় সুদূর লভ্য হইল অখণ্ড ভারত খণ্ড বিখণ্ড। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন করার মূলে কোনও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কারসাজী আছে কিনা বিচার্য্য।

ব্রিটীশ বাংলার পরিমাণ ফল ৭৭৪৪২ বর্গমাইল।

বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫'৫ ভাগ অমুসলমান। অমুসলমানের বর্ত্তমান দখলীকৃত ভূভাগের পরিমাণ শতকরা ৭৭ভাগের বেশী, বাংলা দেশের মোট দেয় রাজস্বের ৮০ ভাগ দেয় অমুসলমান। কাজেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবার সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে হিন্দুবঙ্গের ভূভাগ অন্ততঃপক্ষে লোকসংখ্যানুযায়ী ৪৬ ভাগ হওয়া উচিত ছিল। বড়লাট তাঁহার আনুমানিক বিভাগ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ৩১৯১৯ বর্গ মাইল জমি দিয়াছিলেন। রাডক্লিফ সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম বাংলায় ২৮২৪৯ বর্গমাইল জমি পড়িয়াছে, অথচ অমুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ ৩৫ হাজার বর্গমাইল হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের পাহ পর্ব্বত, অনাবাদী ও অনুর্ব্বর জমির অংশ হিসাবে ধরিলে নীট আ জমির পরিমাণ আরও বেশী দাঁড়ায়, অথচ বাংলার সমগ্র আয়তে ৩৩'৭ ভাগ পড়িল পশ্চিমবঙ্গে, আর ৬৬'৩ ভাগ পড়িল পূর্ব্ববে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে কুমিল্লা জেলায় ১ বিঘা জ দামে বর্দ্ধমান বাঁকুড়ায় ১০ বিঘা জমি কিনিতে পাওয়া যায়। ধ উৎপাদিকা শক্তির উপরে এই মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। বাংলা দে লোকসংখ্যা ৬০৩০৬৫২৫জন, পশ্চিম ওপূর্ব্ববাংলায় লোকসংখ্যা যথাক্র ২ কোটী ৭৫ লক্ষ ও ৩ কোটী ৩০ লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। কি পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে মাত্র ২ কোটী ১২ লক্ষ ইহার মধ্যে ৫২ লক্ষ থাকিল মুসলমান। মুসলমানের এই সংখ্যা সম বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ১৬ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২৫'০১ ভাগ মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গে অমুসলমান দেওয়া হইল এক কোটী ে লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র বাংলায় অমুসলমান জনসংখ্যার ৪২ ভাগ থাকিতে পূর্ব্ববঙ্গে এবং পূর্ব্ব বাংলার লোকসংখ্যার মধ্যে ২৯'১৭জন রহি অমুসলমান। বাংলায় হিন্দু জনসাধারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রা শ্রদ্ধাবশতঃ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্তর্ভুক্ত থাকিবার জ অখণ্ড বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করিতে রাজী হইয়াছিল, সেখানে এই বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে রাষ্ট্র পরিচালনের অধিকারচ্যুত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কুখ্যাত সরিয়তী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে ঠেলিয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি ? প্রধান দুই জাতি একসঙ্গে এ রাষ্ট্রে থাকিতে অরাজী হওয়ায় দুই জাতির সংলগ্ন বেশী সংখ্যক লোকে পৃথক রাষ্ট্রভূমি রচনা করিবার জন্যই এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল সীমা নির্দ্ধারণের ফলে এক অংশে জনসংখ্যার ⅓ অংশ লোক ও ভূমি দেওয়া ব্রিটীশ সুবিচার, ন্যায় ও নীতির কি সঙ্গতিই না হইয়াছে ? সীমা নির্দ্ধারণকালে অন্যান্য বিষয়গুলিও চিন্তা করিয়া দেখিতে কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কমিশন এই মূলনীতিও কতটা মানিয়া চলিয়াছেন তাহাও দেখা যাউক।

রিপোর্ট দেখিয়া মনে হয় কমিশন "থানা"কে সীমানা নির্দ্ধারণের "ইউনিট" ধরিয়াছেন। বাংলা দেশে মোট ৬৪৭টী থানা। ইহার মধ্যে ২৯৩টী থানায় অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ এই ২৯৩ থানায় বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৩টী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ২৩৯টী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসিয়াছে। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের (সিলেট ব্যতীত) ৩৭৫টী থানার মধ্যে ৫৪টী অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। * ইহার ভিতর ৪৫টী থানা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন।

রাডক্লিফ সাহেব যে কয়েকটী প্রধান প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করা হউক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় শতকরা ৭৭জন অমুসলমান বসতিপূর্ণ কলিকাতা নগরীকে পশ্চিমবঙ্গে না ফেলিয়া পারেন নাই। এই মহানগরীকে যে বিভক্ত করা অসম্ভব তাহাও তিনি

---

* ৩নং তপশীল দেখুন।

বুঝিতে পারিয়াছেন এবং কলিকাতা নগরীও বঙ্গের গৌড় কিম্বা অপরাপর পুরাতন নগরীর স্থায় ধ্বংসস্তূপে যাহাতে পরিণত না হয় তজ্জন্ত ভাগীরথী নদী এবং যে সকল নদ নদীর জলে ভাগীরথী পরিপুষ্ট থাকিতে পারে তাহাও তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীর পয়ঃপ্রণালী উন্মুক্ত রাখিবার জন্ম কুলটী নদীও যে একান্ত প্রয়োজন তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভৈরব, জলঙ্গী ইত্যাদি নদনদী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া বহতা ছিল। বর্ত্তমানে এই সকল নদনদী মৃতপ্রায় এবং ইহাদের সংস্কার করিতে হইলে যে ভূখণ্ডের উপরে অধিকার থাকা প্রয়োজন তাহাও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভৈরব সংস্কার বিপুল অর্থসাধ্য বলিয়া পরবর্ত্তী মাথাভাঙ্গা নদী তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু পদ্মানদীর জলস্রোত যে স্বল্পপরিসর ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া মাথাভাঙ্গার মধ্যে প্রবহমানা—মাত্র সেইটুকু ভারত ইউনিয়নে রাখিয়া সম্পূর্ণ মাথাভাঙ্গা নদীকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া কি রকম ভৌগলিক-জ্ঞানসম্মত তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। দ্বিতীয়তঃ নদীয়ার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত স্থান। জঙ্গীপুর মহকুমা সংলগ্নতার জন্ম প্রয়োজন এবং এই সামান্ম প্রয়োজনের বালাইএর জন্ম সম্পূর্ণ খুলনা জেলার দাবী খারিজ হইতে পারে না। ভৈরবের পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত স্বল্পায়তন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদের মৃত ভূখণ্ড কোন কারণেই এবং কোন হিসাবেই খুলনার দাবী রদবদলে সমর্থ হয় না।

তাঁহার তৃতীয় প্রশ্নে গঙ্গা, পদ্মা ও মধুমতী পর্য্যন্ত ভূভাগকে একদিকে আনিলে সীমারেখা প্রাকৃতিক হইতে পারে কিন্তু এতদঞ্চলের অগণিত মুসলমান জনসংখ্যা তাঁহাকে বিব্রত ও বিরত করিয়াছে। মধুমতী নদীকে সীমারেখা ধরিলে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ মিলিয়া যে ভূখণ্ড হয় তাহার অমুসলমান সংখ্যা হয় শতকরা ৬৯ভাগ এবং মুসলমান হয় শতকরা ৩১জন। এই জনপদ ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক হিসাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংবদ্ধ। তত্রাচ যশোহর ও খুলনার বিষয়ে কেবলমাত্র মুসলীম লীগের অখণ্ড মুসলীমবঙ্গের দাবী উপেক্ষিত হইলে বিচার্য্য বিষয় সংক্রান্ত মূলনীতি লঙ্ঘন করা হইবে বলিয়া স্তার রাড্‌ক্লিফ তাহা করিতে পারেন নাই। বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী খুলনা জেলা, যে জেলা কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী, বরং বৃহৎ কলিকাতার খাদ্যদ্রব্যের গোলাবাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বাখরগঞ্জের সংলগ্ন দুইটী থানা বাদ দিলে যে জেলা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুগরিষ্ঠ, সেই জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দিতে আইনজ্ঞ স্তার রাড্‌ক্লিফের বিচারে অন্যায় হয় নাই। খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন নড়াইল মহকুমার অধিকাংশ ভূভাগ, অভয়নগর থানা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা, রাজৈর এবং কলকিনী থানাসমূহ, বাখরগঞ্জ জেলার ৫টী উল্লেখযোগ্য থানা এই মোট ভূভাগের আয়তন প্রায় ১৯১১ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ২২ লক্ষ, অমুসলমান সংখ্যা ১২ লক্ষের উপর (শতকরা ৫৬ ভাগ)। এই বিরাট ভূখণ্ড খুলনার সহিত আসিয়া যায় ইহা ঝুনো বৃটীশ ব্যুরোক্রাট স্তার রাড্‌ক্লিফের দৃষ্টিপথের অগোচরে থাকে নাই। সমৃদ্ধিপূর্ণ এই ভূখণ্ডের সুসংগঠিত ক্ষাত্রবীর্য্যপূর্ণ নমশূদ্র জাতি সম্ভবতঃ বিচারের সময় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়াছিল, খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ ও প্রবহমানা নদনদী, পশ্চিমবঙ্গের হস্তচ্যুত হওয়ায় কেবলমাত্র লোকসংখ্যায় এই নূতন প্রদেশ দুর্ব্বল হইল না, ভাবী জনসংখ্যার সম্ভাব্য আবাসভূমি, সুন্দরবন ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম চাউলের কেন্দ্র হস্তচ্যুত হইয়া গেল। অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ বীর নমশূদ্র জাতিও দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় চিরদিনের জন্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পঞ্চম প্রশ্নে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার অমুসলমান অংশকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া যায় কিনা? প্রশ্নের এই ধারা ও ক্রমবিকাশ দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে খুলনা ও যশোহর জেলাদ্বয়কে পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া সাব্যস্ত হইলে খুলনা যশোহরের কয়েকটী মুসলমানবহুল থানার বদলে হিন্দুবহুল দিনাজপুর ও মালদহের কয়েকটী থানা পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া বিচারসঙ্গত হয় কিনা—কিন্তু খুলনা, যশোহর বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের ৩০টী হিন্দু প্রধান থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়ার পরেই উক্ত প্রশ্নের আদৌ সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে এখানেও এই অসঙ্গত বিচার করা হইয়াছে। মালদহ জেলা রাজসাহীর সংলগ্ন বলিয়া মালদহের ৪টী মুসলমান প্রধান থানার সহিত একটী হিন্দুপ্রধান থানা (নাচোল) রাজসাহী জেলায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার সহিত সংলগ্ন পদ্মানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হিন্দুপ্রধান রাজসাহী সহরও বোয়ালিয়া থানাকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না কেন তাহা দেবতারও অবোধ্য! রাজসাহী বরেন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সহরসমেত চারিটী হিন্দুপ্রধান সংলগ্ন থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে দিয়া, হিন্দুপ্রধান দিনাজপুর জেলার পশ্চিম অংশকে কোণঠাসা করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ব্ব সীমান্ত বিহার প্রদেশের সহিত ঠেলিয়া দেওয়ার সঙ্গত কারণ কি, আপোষনামায় তাহার উল্লেখ নাই। যশোহর ও খুলনার মুসলমান গরিষ্ঠতার বেদনার স্থায় এখানে কোনও নৈতিক প্রশ্নই বিচারকের বিচারে উদয় হয় নাই। চিহ্নিত ১নং তপশীলে দেখা যাইবে যে এই অঞ্চলের সহিত জলপাইগুড়ির তলদেশ পর্য্যন্ত গড়হিসাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আছে। জলপাইগুড়ী মালদহ ও দিনাজপুর বিচ্ছিন্ন করিবার সময় নদনদীর গতিপথ, সাংস্কৃতিক কিম্বা সামাজিক, পারস্পরিক যোগাযোগও বিচার করা হয় নাই। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী মহানন্দা, করোতোয়া, ত্রিস্রোতা ও আত্রেয়ী। প্রায় সকল নদনদীই ত্রিস্রোতার জলে সুপুষ্ট ছিল। ত্রিস্রোতা বর্ত্তমানে পূর্ব্বগামিনী হওয়ায় উত্তরবঙ্গের সকল নদনদীই মৃতকল্প। ভবিষ্যতে ত্রিস্রোতা নদীর যদি কোন পরিকল্পনা করা হয় তবে এইভাবে উত্তরবঙ্গ ও তাহার নদনদীকে দুই ভাগে "ঠুঁটো জগন্নাথ" করা হইল কেন? ত্রিস্রোতার জল যেখানে শক্ত পার্ব্বত্য ভূভাগের উপর দিয়া প্রবাহিতা সেই ভূভাগ রহিল ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে, নীচে যাহারা ফল কুড়াইবে অর্থাৎ বন্যার জের সামলাইতে তাহারা রহিল পূর্ব্ব পাকিস্তানে। ভূভাগ বণ্টনেও মজার গবেষণা করা হইয়াছে। জলপাইগুড়ী জেলার বোদা, পাচগড়, দেবীগঞ্জ এবং তেতুলিয়া একসঙ্গে

বলা হয় বোদা পরগণা। এই অঞ্চলের মোট ১৯২১৯৩জন লোকের মধ্যে ৮৭৮৬০জন মুসলমান, মোটা কথায় ঐ পরগণা এখনও হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, তত্রাচ এই অংশকে পাকিস্তানে দিয়া জলপাইগুড়ীর বাদবাকী বিপুল জনসংখ্যাকে ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করা হইল কেন? এই স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গকে তথা বাংলা দেশকে কার্য্যতঃ তিন ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত রাজবংশীসমাজ তিনভাগে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর এই জাতির মৃত্যুবীজ বপন করা হইল কিনা ভবিষ্যৎ একমাত্র সত্যদ্রষ্টা, সবচেয়ে সেরা হইয়াছে ভাগ্যের খেলায় পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া, ঠিক যেন কোচবিহারের বুকে পিস্তল তাগ করিয়া আছে এই ক্ষুদ্র পাটগ্রাম। কোচবিহারের কোলে ছোট্ট এই হিন্দুপ্রধান থানা, তামাকের জন্য বিখ্যাত। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ী জেলার সংলগ্ন রঙ্গপুর জেলার ডিমলা ও হাতিবাঁধা নামক হিন্দুপ্রধান থানা দুইটীকে জলপাইগুড়ীকে না দিয়া হিন্দুপ্রধান পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গে গুর্খাদের আন্দোলন এবং জলপাইগুড়ীতে অসমিয়া স্বজাতির শুভেচ্ছামিশন প্রেরণ, ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন। "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলনে ছায়া কি পূর্ব্বগামিনী? মধুরেণ সমাপয়েৎ হইয়াছে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখে। এই অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগের কিঞ্চিৎ বেশী। অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতি এবং শাসনবহির্ভূত অঞ্চল। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ৯১ ও ৯২ ধারানুসারে শাসিত এই অঞ্চল ব্যবস্থাপরিষদে কোনও সদস্য প্রেরণ করিত না, উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মগদের সংখ্যা অত্যধিক। মোট আয়তন ৫০৭৭ বর্গমাইল। বড়লাট আনুমানিক অঞ্চল বর্ণনা করার সময় মুসলীমপ্রধান বঙ্গের তপশীল দেন, সেই তপশীলে এই জেলার কোনও উল্লেখ ছিল না; কিন্তু শাসন বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছিল কিনা তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; সীমানির্দ্ধারণ কমিশন এই অঞ্চলের কোন প্রতিনিধি কিম্বা মন্তব্য গ্রহণ করে নাই। কোনও কারণেই এই অনাবৃত অঞ্চল মুসলীম বঙ্গে যাইতে পারে না, পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত না থাকায় শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এই অঞ্চল হয় আসাম প্রদেশে কিম্বা সংলগ্ন স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত যুক্ত হইতে পারে। বিচারপতি রাডক্লিফ কোন আইনে বলিলেন যে চট্টগ্রামের মালিকই এতদঞ্চলের স্বাভাবিক অধিকারী, ধর্ম্ম কিম্বা নৃতত্ত্ব কোন কারণেই চট্টগ্রামের সহিত এই উপজাতিদের কোনও সম্পর্ক নাই। স্যার সিরিল রাডক্লিফএর বিচার দেখিয়া মনে হয় বিচারক সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই বাংলাদেশ ভাগ করিতে বসেন নাই। তাঁহার হিসাবে আছে একদিকে কলিকাতা নগরী ও অপরদিকে বাংলাদেশ; কাজেই মুসলিম বঙ্গ কিসে দাঁড়াইবে, আয়তনে, জনসংখ্যায় কিম্বা ধাতুজ দ্রব্যে, কয়লার বদলে হাইড্রো-ইলেকট্রীক স্কীমের সুবিধা দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত ত্রিস্রোতার অববাহিকা ভূমি, নিদেন পক্ষে সুসঙ্গ দুর্গাপুর, চট্টগ্রামের (পার্ব্বত্য) কাঠ, সুন্দরবনের কাঠ ও মধু, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাউল, সেতাবগঞ্জের কিম্বা দর্শনার চিনি পাটগ্রাম ও তেঁতুলিয়ার উৎকৃষ্ট তামাক, কলিকাতা মহানগরীর ব না দিলে, নবজাত প্রদেশের চলে কি করিয়া! শরিয়ৎএর অ সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে এক কোটী বার লক্ষ হিন্দুর বলি মোটেই অসঙ্গত নহে। স্পষ্টভাবে এই রকম না বলিলেও কতকট এইরকম ভাব তাহা সুস্পষ্ট। কাজেই আগে হইতে আক্রাম খাঁ সা যে দোহার টানিয়া চলিতেছেন, ইহা কি একেবারে না দেখিয়া অন্ধকা কোপ মারা। ম্যাকডোনাল্ডের স্বজাতি স্যার সিরিল রাডক্লিফ বিচার আসনে বসিয়া মূলনীতি, "দুই পক্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি" ও ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া দূরপনেয় অন্যায় করিয়াছেন। সীমানির্ধারণ কমিশ সভাপতি হইয়া তিনি প্রকাশ্য বৈঠকে উপস্থিত হন নাই, যে অঞ্চল f সীমারেখা টানা হইয়াছে তাহাও তিনি নিজ চোখে দেখিবার সুযোগ প্রয়োজন বোধ করেন নাই, দুইপক্ষ সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করিতে পা নাই বলিয়া তিনি "কাঁচি" হস্তে বাংলার মানচিত্র সোজা তিনভ বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য দুইভাগ মন্তর দিয়া মানসিক সংযো ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন! কাজেই এই অনুমান কষ্টসাধ্য নহে ইহা বিচার নহে, রাজনীতিজ্ঞের কৌশলমাত্র। ম্যাকডোনাল্ড সাহে বাঁটোয়ারা অপেক্ষাও এই রায় আরও অসন্তোষজনক, স্বাধীনতার পূজা বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু ক্লীব করা চাই, ইহাই বাঁটোয়ারার মৌন নির্দ্দেশ।

তপশীল নং ১

দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী ও রংপুর জেলার সংলগ্ন ভূভাগ। অযৌক্তি ভাবে এই ভূভাগকে পাকিস্তানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিভাগ কি পশ্চিমবঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গৃহবিবাদ স্থা করিবার জন্য?

থানার নাম	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন বর্গমাই
তেতুলিয়া	১৩১৯০	১৭২৮২	১৫
পাঁচগড়	১৫৮০৭	১৭৮০৭	
বোদা	৩৬৭৪২	৩৭৮৪৪	৩৫২
দেবীগঞ্জ	৪১৫৮৪	১৪৯২৭	
পাটগ্রাম	৩১০৩৭	২০৫৬৮	১০০
সম্পূর্ণ ঠাকুরগাম	২৯২১২৮	২৮৯১০৭	৫১৭৫
ধামাইর হাট *	৩২৪৪২	২২২৪১	১১৬
বিরল	৩৫৯৭০	৩১৬৪২	১৩৭
দিনাজপুর	৫০২২৬	৫১৬৯২	১৩ ৭
হাতিবাঁধা	৩৩২৯৮	৩৩১৮৩	১১১
ডিমলা	৫১১০৩	৪০৬৫৫	১২৭
	৬৩৩৫২৭	৫৮৩৯৪৮	২৪০৫

* বালুরঘাট থানার সংলগ্ন এই থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার কি কারণ হইতে পারে?

তপশীল নং ২

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমপ্রধান থানাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা :—

থানা	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন
হরিহরপাড়া	১৬৩১৬	৩৮৭৬৩	৯৮
ডোমকল	১৫৪৯৩	৬১০১০	১১৭
নওদা	২৩১৫৬	৩৪২৯৪	৮৯
জলঙ্গী	১০৮৮৪	৪৫৩২৬	৭৭
বেলডাঙ্গা	৬৭৩৩৪	৭৭৩০০	১৪৩
সমশেরগঞ্জ	৩৯৭৮৭	৮০৯৩০	১০০
সুতী	৪০৭৬০	৫১৪১৪	১০২
রঘুনাথগঞ্জ	৫৫৫৭০	৭২৩১৭	১০২
লালগোলা	১৭৪৪৬	৫৩২১৭	৮৪
ভগবানগোলা	১৪৮৩২	৬৪৩২৭	১১৭
মুর্শিদাবাদ	১৯০০০	২৪২২৯	৬০
রাণীনগর	১৬০২৩	৭৫০৯৩	১২৩
বনগ্রাম	৪০৯৫৫	৫৩০৬১	২২৬
গৈঘাটা	১৫০৪৭	২৪০৪১	৯৪
করিমপুর	২১৪৪০	৭৯৮৩২	১৭২
তেহাট্টা	৩৯৯০২	৫২৬৩৭	১৭৫
নাকাশীপাড়া	৩২০৪১	৩৪৭৮৬	১৪০
চাপড়া	২০৩০০	৫০০২১	১৩১
হরিণঘাটা	১৯৯৫৩	১৪৫৪৫	৬৫
হাঁসখালি	৯৭১৫	২৭৮০৬	১০৩
হরিশ্চন্দ্রপুর	৪৩২৭৮	৫৬৬৯৬	১৫০
খরবা	৪১৯১৪	৬১১৪৮	১৪২
রতুয়া	৪৪৩৭৫	৫৮৬১০	১৫৪
কালিয়াচক	৭০২৯৮	১২৪০০৬	২০৭
মুরারাই	৪৬২৬৯	৫৫৭৫০	১৩৮
মাটীয়াবুরুজ	৪৬৭৩৮	৫৬১৩৪	৪
ভাঙ্গড়	৪৮২১১	৬৫৯৭২	১২৭
হাবড়া	২৯৩১৯	৪২৩৯৯	১০৯
দেগঙ্গা	১৯৫০৯	৪৫১৯৯	৭৮
বারাসত	৩৯৭৩৪	৫৯৩৩০	১০৪
আমডাঙ্গা	১৫৪৭৯	২০৭১৭	৫৪
স্বরূপনগর	২৬৩০৮	৩১২৩৪	৮১
বাদুড়িয়া	৩৩৮৫৪	৪৯৮৩০	৮১
	১,২৫৪,২২	১৭৪০৯৭৪	৩৭৩৭

তপশীল নং ৩

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান থানা

(এই হিসাবে অসংলগ্ন হিন্দুপ্রধান থানা কিম্বা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ধরা হয় নাই)

থানা	জন সংখ্যা অমুসলমান	জন সংখ্যা মুসলমান	আয়তন বর্গ মাইল
অভয়নগর	৩৯৭৪৩	৩০৫০৫	৯৫
শালিখা	২২৪২০	২০৮৯৩	৮৮
নড়াইল	৬২৫৯০	৪৮০৯৩	১৪৮
কালিয়া	৬১৬৩৪	৬১৫৩৫	১১৮
বাটিয়াঘাটা*	৩৯৬৬৮	১৭৬৫২	৯৭
দৌলতপুর*	৩১৯২৪	২৫০৮৮	৩৪
দাকোপ*	৫৩৬৪৩	১০৬৪৬	১১০
তারাখাদা*	৩৪৭২০	৩২০৭০	৮৩
খুলনা*	৪৪৯৬৫	২৫৮৫৩	৩৮
দামুরিয়া*	৫৮২৮০	৪৭৮৪০	১৭৪
পাইকগাছা*	৯১১৭৫	৭৯৬৫৯	২৪৭
কচুয়া*	৩৫০৩৩	৩১০৩০	৬৫
বাগেরহাট*	৬৫৩১৪	৫৫০১৪	১২৬
ফকিরহাট*	৩২৭৬১	২০৭০৩	৬১
মোল্লাহাট*	৫৩৬৩১	৫৭৮৪৭	১১৬
রামপাল*	৫৪৮৪৯	৫০০২৮	১৯৪
দেবহাট্টা*	২৬১০৬	১৯৩০৯	৬৮
আশাশুনি*	৬০৭৩৬	৫৬১২১	১৫৮
শ্যামনগর*	৬১৬৩৭	৫৩৯০৯	১৭৬
গোপালগঞ্জ মহকুমা	৩৪৮৭৭৯	২৬৮২৩৩	৬৭২
বালিয়াকান্দী	৪৮৬৬৩	৪৬০৯২	১২৫
রজৈর	৬০৪৫৯	৫৭৭৩৮	১০০
গৌড়নদী	১২৩৮৭৭	৯১৩৬৭	২০০
উজীরপুর	৫৮৭৫৬	৬৭৮৩০	
ঝালকাঠি	৭০৫৭৫	৬২৮৯০	৯০
স্বরূপকাঠি	৬০৮৮৫	৫৫৫১৩	১৫০
নাজিরপুর	৪২৯৬১	৩৫৫৪১	
বোয়ালিয়া	২৮৪২০	২০৩৬০	২৫০
গোদাগাড়ী	৩২৮৯৩	৩৪৩০৬	
নাচোল	২৩২১৫	৭১৫০	১১০
দিনাজপুর	৫০২২৬	৫১৬৯২	২৭৪
বিরল	৩৫৯৭০	৩১৬৪২	
হরিপুর	১৩৬২৫	১৪১৮৩	৩৮৮
পীরগঞ্জ	৩৭৪৩৭	৩৭৬০২	
বীরগঞ্জ	৪৪৭৪৩	২৩৩২৭	
ধামাইরহাট	৩২৪৪১	২৯২৪০	১১৬
হাতীবাঁধা	৩৩২৯৮	৩৩১৮৩	১১১
ডিমলা	৫১১০৩	৪০৬৫৫	১২৭
দেবীগঞ্জ	৪১৫৮৪	১৪৯২৭	৩৫২
পাচগড়	১৫৮০৭	১৭৮০৭	
বোদা	৩৭৮৪৪	৩৬৭৪২	
পাটগ্রাম	৩১০৩৭	২০৫৬৮	১০০
	২২৫৫৪২৭	১৮৪২৩৮৩	৫৩৬১

* খুলনা জেলার সংলগ্ন থানা সমূহ।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব

(স্টেট্ গেস্ট)

অচলগড় প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম মন্দাকিনী কুণ্ডের জীর্ণ ঘাটে। ঘড়ি খুলে দেখলুম পাঁচটা বাজতে দেরী আছে। আমাদের বাস্ ঠিক পাঁচটায় আসবার কথা। সিরোহী বাস সার্ভিস্ কোম্পানীর ম্যানেজার স্বয়ং আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন অচলগড়ে। কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ৫টা থেকে ৬টায় এসে দাঁড়ালো, তবু বাসের দেখা নেই। অচল গিরিশৃঙ্গ হ'তে অস্তাচল বোধ করি বেশী দূর নয়, কারণ সূর্য্য বেলাবেলিই ডুবে গেলেন। ৬টার আগেই বাড়ী ফেরার কথা ছিল, কাজেই আমরা কেউ গরম কাপড় সঙ্গে আনিনি। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপটুকুও চলে গেল। পাহাড়ী শীতের নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনশ্রুত হলেও অননুভূত যে নয় এটা অতি দ্রুতই বোঝা যাচ্ছিল।

অচলগড়ের ধ্বংসস্তূপের উপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার তিমিরাবরণ নেমে এল। মিলিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আগাছায় ভরা চারপাশের জঙ্গল, কুশবন, নুড়িপাথর, মন্দির চূড়া, গিরিগুহা। ঠাণ্ডা বাতাসের শীতল স্পর্শ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম বাড়ী ফেরবার জন্য। সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার চারিদিক থেকে অধীর যাত্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এমন শুষ্ক করুণ মুখে নতশিরে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে তাঁকে কিছু বলতে মায়া হচ্ছিল। বেচারা বার বার জোড় হাত ক'রে সকলকে জানাচ্ছিল যে "আমিও তো

ট্রেণের কামরায় নবনীতা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি—কেন যে গাড়ী আসছে না—কেমন ক'রে বলবো? দু'টো ট্রিপ্ যাবার সময় উৎরে গেছে। দুখানা বাসের একখানারও দেখা নেই—আমি কিছু বুঝতে পারছিনি। কোনোও এ্যাকসিডেণ্ট্ হয়েছে কি পথের মাঝে

দুখানা গাড়ীরই কল বিগড়ে ব্রেক্ ডাউন হয়েছে কিছুতো জানতে পারছিনি !"

শীত বাড়ছে। সন্ধ্যা গভীর হয়ে আসছে। আর বাইরে থাকা চলে না। নবনীতার মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেয়ের ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয়ে। তাঁর নিজের শরীরও একেবারেই ঠাণ্ডা-সহ নয়। জঙ্গলে মশার উপদ্রব শুরু হ'ল। অগত্যা আমরা সকলে মিলে নিকটস্থ একটি ছোট শিব মন্দিরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। অন্যান্য যাত্রীরা সবাই একটি বাঁধানো বটগাছের তলায় বসে জটলা করতে লাগলেন।

ভাগ্যে থার্ম্মোফ্লাস্কে ভরে কিছু চা ও টিফিন ক্যারিয়ারের মধ্যে সামান্য টিফিন আনা হয়েছিল, ক্ষুধার্ত্ত কন্যাসহ আমি ধাতস্থ হলেম। বাবাজী চায়ের ফ্লাস্কেই খুশি। একটি পাহাড়ী রাজপুত মেয়ের কাছে কিছু ছোলাভাজা কিনতে পাওয়া গেল। ছোলা ভাজা চিবুতে চিবুতে রাজপুতানীর সঙ্গে দেবী তাঁর বান্ধবী সহ গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় জানা গেল মেয়েটির স্বামী খুব জোয়ান ও পরিশ্রমী ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। তার নিজেরও ঐ রোগ ধরেছে। কিন্তু এখানে কোনও ডাক্তার কবিরাজ নেই। ওষুধপত্র পাওয়া যায়না। 'বোখারে' ভুগে অনেক লোক মারা পড়েছে।

দেবী তাঁর 'হাতব্যাগ' খুলে কি একটা ওষুধ বার করে দিলেন তাকে। বলে দিলেন 'বোখার' ছাড়লেই মুখে ফেলে জল দিয়ে গিলে খাবে। মেয়েটি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'সেলাম করে চলে গেল। আমরা মনে করলুম নিশ্চয় 'কুইনিন সাল্‌ফেটের' ৫ গ্রেণ বড়ি তিনি ওকে দিলেন, কিন্তু পরে জিজ্ঞাসা করে জানলুম 'কুইনিন' নয়, সেগুলি বায়োকেমিক্—'ফেরাম ফস' ট্যাব্‌লেট! বললুম—এ প ম্যালেরিয়া সারানো 'বায়োকেমিকের' কাজ নয়।

শ্রীমতী বায়োকেমিকের পরম ভক্ত। কাজেই এই বেফাঁস নিয়ে যখন তর্ক যুদ্ধ জমে উঠবার উপক্রম, 'ভোঁ ভোঁ' করে হর্ণ্ আর ঘর্ ঘর্ শব্দে ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। শ্যামের শুনে শ্রীরাধা বোধ করি যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ঘর ছেড়ে যমুনা ছুটে যেতেন তেমনি করেই এঁরা বাসের হর্ণ্ শুনতে পেয়ে আ হয়ে ছুটলেন।

সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার আমাদের জানালেন দুখানা বাসের ড্রাইভারই পর পর দু'টি ট্রিপ নিয়ে গিয়েই ম্যালে জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়েছে। এইজন্য বাস আসতে এত দেরী হ'ল।

আমি বললুম—কিন্তু আবু থেকে যে আমাদের মোটর সিরো আসবার কথা ছিল ঠিক ৬ এখন ৭টা বেজে গেছে। সি পৌঁছতে আমাদের আরও মিনিট কি আধঘণ্টা লাগ আবুর মোটর যদি এ আমাদের জন্য অপেক্ষা না ক চলে গিয়ে থাকে তাহ'লে আমা আবু ফেরবার উপায় কি হবে?

সিরোহী মোটর সার্ভি ম্যানেজার প্রতিশ্রুতি দি আমাদের গাড়ী অপেক্ষা না ক যদি চলে গিয়ে থাকে, তা' এই বাসই আমাদের মাউণ্ট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাঁচা গেল। একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে পরি পেলুম। গাড়ীতে উঠে কোনও কথা নয়—শুধু ম্যালেরিয়া! ঈস! এ কোথায় এসেছি? এবার থেকে যেথা যেখানে যাবো আগে সেখানকার স্থানীয় স্বাস্থ্য-সংবাদ জেনে তবে যাবে

যোধপুর—নূতন সহর ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

আচলগড়ে ম্যালেরিয়া, সিরোহীতে ম্যালেরিয়া, মাউণ্ট্ আবুতে ম্যালেরিয়া!! এ আবার এমন পাহাড়ীয়া ম্যালেরিয়া যে জ্বর হ'তে বেহুঁস! বাপ্! পত্রপাঠ কাল পরশুর মধ্যেই আবু ছাড়তে হবে।

সিরোহীতে পৌঁছে দেখি ভগবানের দয়ায় ও পণ্ডিতজীর কৃপ আমাদের আবুর গাড়ী তখনও অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার গাড়ীর ম মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। দেখে ভয় হ'ল—ম্যালেরিয়ার 'বেহুঁস' নয়ত ডাকাডাকি করতে ধড়্‌মড়িয়ে উঠলো। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম— তবিয়ৎ আচ্ছা তো? গাড়ী লে'যানে সেকেগা? বোখার নেই আয়া নেতিবাচক উত্তরে আশ্বস্ত হয়ে—গাড়ীতে উঠে বাড়ী ফিরলুম

বাসায় পৌঁছেই একেবারে অর্ডোনান্স জারি করে দিলুম—গোটাও তোমাদের আস্তানা। বেঁধে ফেলো সব জিনিস পত্র। পরশু সকালেই রওনা দেবো—যোধপুর। আর এখানে নয়। মাউণ্ট আবুর সুখ-স্মৃতিটুকুই স্মরণে থাক, তাকে আর জ্বরের ধমকে বিকারের ঝোঁকে বিকৃত ক'রে কাজ নেই। "চলো মুশাফের্—বাঁধো গাঁঠ্‌রিয়া—"

পরদিন বেলা ১টায় আমরা আবু পাহাড় থেকে আবু রোড ষ্টেশনে নেমে এলুম। সেখান থেকে আহমেদাবাদ—দিল্লী মেলে রওনা হ'য়ে আবার 'মাড়ওয়াড়' ষ্টেশনে এসে নামলুম গাড়ী বদল করতে। বেলা ৫টা নাগাদ যোধপুর—বিকানীর ষ্টেট্ রেলওয়ের গাড়ী ধ'রে রাত্রি ৮৷৷টায় যোধপুর ষ্টেশনে পৌঁছলুম।

যোধপুরের ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আমাদের স্থপতিবন্ধু শ্রীমান ভূপতি চৌধুরী একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন। ভূপতির সহপাঠী ছিলেন তিনি। উভয়ের অবস্থানের মধ্যে আজ যথেষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব আজও নিকটতমই আছে। আমি মাউণ্ট আবু থেকে তাঁকে আমাদের যোধপুরে পৌঁছবার সময়টা জানিয়েছিলুম এবং সেখানে তাঁর জানা কোনও একটি ভালো হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলুম।

গুপ্ত সাহেব দেখি স্বয়ং আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে নিজের মোটর সহ এসে হাজির হয়েছেন। বহুসমাদরে আমাদের গাড়ী থেকে তিনি নামিয়ে নিলেন। তারপর আর আমাদের কিছু করতে হল না। কুলির ব্যবস্থা করে আমাদের সঙ্গের ২২টি লগেজ নামিয়ে ফিটনে বোঝাই ক'রিয়ে দিয়ে ভোলানাথকে তার সঙ্গে দিয়ে আমাদের তিনি মহারাজার পাঠানো ল্যাণ্ডো জুড়িতে এবং নিজের মোটরে ভাগাভাগী-করে নিয়ে চললেন যোধপুর রাজ্যের নূতন রাজধানীতে।

ষ্টেশনে শুল্ক ও আবগারী বিভাগের রাজকর্ম্মচারীরা প্রত্যেক নবাগত যাত্রীরই মালপত্র আটক করছিলেন—নগরে নিষিদ্ধ দ্রব্য বা পণ্য কিছু শুল্ক ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য। আমাদের পাঁচটি মানুষের সঙ্গের ছোট বড় ২২টি লাগেজ অত্যন্ত সন্দেহজনক! কর্তব্য-পরায়ণ রাজকর্ম্মচারীরা ধরেছিলেনও ঠিক আমাদের মালপত্র পরীক্ষার জন্য। কিন্তু স্বয়ং ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার গুপ্ত সাহেব আমাদের জামীন দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্বে সমস্ত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুটি কথা শুধু তাঁর মুখে শুনলুম—এঁরা 'ষ্টেট্ গেষ্ট্'...exempted from inspection!

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তো বেশ বুদ্ধি করে আমাদের ষ্টেশন পার করে নিয়ে এলেন, কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে যে আমরা হোটেলে উঠেছি, তখন হয়ত' আবার জ্বালাতন ক'রতে আসবে? গুপ্ত সাহেব হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন—ভয় নেই। আপনাদের শুভাগমন বার্তা যথাসময়ে মহামান্য মহারাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর হয়েছিল। রাজ আদেশে আপনাদের ষ্টেট-গেষ্ট্ রূপে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা হাত জোড় করে বললুম—দোহাই মশাই! আমরা 'রাজ-অতিথি' হওয়ার চেয়ে কোনও হোটেলে সাধারণ পরিব্রাজকরূপে থাকতে পারলেই সুখী হবো। কারণ, রাজকীয় ব্যাপারে আমরা মোটেই অভ্যস্ত নই! গুপ্ত সাহেব বল্লেন—হোটেলে থাকলেও—আপনারা যোধপুর রাজের 'ষ্টেট-গেষ্ট্' হয়েই থাকবেন। কিন্তু মহারাজের 'গেষ্ট্-হাউস্' খালি থাকলে—রাজ-অতিথিদের ষ্টেটহোটেলে উঠতে দেওয়া হয় না। গেষ্ট্-হাউসে স্থানাভাব ঘটলে তখন অতিরিক্ত অতিথিদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আপনাদের থাকার

রাজকীয় দপ্তরখানা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

জন্য মহারাজার 'গেষ্ট্-হাউসে' সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে। আপনাদের সেখানে কোনও অসুবিধা হবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—গেষ্ট্-হাউসে উপস্থিত আর কোন্ কোন্ অতিথিরা আছেন? গুপ্ত সাহেব বললেন—আপনারা সপরিবারে এসেছেন। যাঁরা ফ্যামিলি নিয়ে আসেন তাঁদের পৃথক বাড়ী দেওয়া হয়। আপনাদের জন্য গেষ্ট্-হাউসের দুটি পৃথক কোয়ার্টার যুক্ত অর্থাৎ একটি দো-মহলা বাড়ী সম্পূর্ণ রিজার্ভ রাখা হয়েছে। আপনারা সেখানে যে ভাবে খুশী থাকতে পারবেন। কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

ীয় বা ভারতীয় যে প্রথা পছন্দ করেন সেই রকম ব্যবস্থাই করা হবে।

যোধপুর শহরের রাজপথ দিয়ে রাজঅতিথিদের নিয়ে ষ্টেটের ল্যাণ্ডোজুড়ি পথ সচকিত করে চলেছে। পীচ ঢালা প্রশস্ত রাজপথ। দু'ধারে বড় বড় বাড়ী। কতক আধুনিক য়ুরোপীয় আদর্শে প্রস্তুত, কতক বা ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য্য গৌরব ঘোষণা করছে। পথের দু'পাশে গাছের সারি। সুদৃশ্য বিজলী বাতির পোষ্ট দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চলেছে সারি সারি লাইন হয়ে। একবারও মনে হচ্ছে না যে আমরা বাংলার রাজধানী থেকে বহুদূরে—ভারতের অপরপ্রান্তে—রাজপুতানার এক ঐতিহাসিক সামন্ত নৃপতির স্থাপিত নগরে এসে পড়েছি। আধুনিক জগতের অতি আধুনিক শহরের সমস্ত সুব্যবস্থাই চখে পড়ছিল। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

কাহারে হেরিছ ঘুমে নিশীথে,
কাহার পরশ তাপে তোমার শ্রীঅঙ্গ কাঁপে
আপনি চাহিছ নিজে সঁপিতে ?
কাহার ধেয়ান ব্রত গহন হৃদয়ে রত
উদিল তোমার কাছে স্বপনে ?
কাহার পূজার ডালা মিলন অমৃত ঢালা
লভিলে জিনিয়া সুখে গোপনে ?

কে তোমা' চাহিয়াছিল দিবসে ?
কাহার হৃদয় মাঝে ভুবন মোহন সাজে
পশিয়া হরিলে মন বিবশে ?
কে তোমা দেখেনি চোখে, অরূপ অমৃত লোকে
ভরেছ কাহার আশা গীতিতে ?
তাহারে ভোলার পরে খেয়াল খেলার ঘরে
আবার ডেকেছ হেসে নিশীথে।

তুমি কি জান না সেও গোপনে
বাহিরে দুয়ার দিয়ে ভিতরে স্বপন নিয়ে
রচিছে তোমার ছবি আপনে ?
পুলকিত পৃথিবীর কেহ কোথা নহে স্থির
তুমি যে রভসে থাক নীরবে
অসহ উন্মাদ হিয়া পলেকের শান্তি নিয়া
মৌনেরে মুখর করে গরবে।

যাহারে দেওনি কিছু আলোকে
আঁধার সাগর পারে বেদনা কল্লোল ভারে
পীড়িয়া দিয়ো না আশা ভুলোকে।
ফুটালে না যেই রাগ তাহা অমনিই থাক্
জানায়ো না চেয়েছিলে দিতে
সহজে পেয়েছ যারে মনেই মুছিয়ো তারে
ভুলিয়ো হেরেছ তারে নিশীথে।

স্বাধীন ভারত*

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা স্বাধীন পথের সাথী ;
গৌরবে আজি ফুটেছে প্রভাত কেটেছে তিমির রাতি !
দুশো বছরের ম্লান জীবনের হ'য়ে যাক্ অবসান—
মায়ের চরণে শৃঙ্খল ভার ভেঙ্গে পড়ে খান্ খান্ !

আপনার ঘরে পরবাসী হ'য়ে দেশের ভক্ত বীর—
দিয়ে গেল প্রাণ ফাঁসির মঞ্চে না ফেলি' অশ্রুনীর !
কত বীর-নারী বক্ষ পাতিয়া বিদেশী-শাসনে হায়,
দিয়াছে ঢালিয়া তপ্ত রুধির দেশ-জননীর পায়।
শিয়রে জাতির হানিল বজ্র নর-রূপী শয়তান—
রক্তধারায় হ'ল বলিদান লক্ষ বীরের প্রাণ !
ভুলে যাও আজ অতীতের ব্যথা—জীবনের অপমান—
মিলিত কণ্ঠে গাও-সবে আজ জীবনের জয়গান !

বাঙ্গালীর বীর ঘর ছেড়ে গেছে সুদূর সিন্ধুপার—
বলেছে "তোমারে দেব স্বাধীনতা, দিলেও শোণিত ধার"।
কোথায় নেতাজী, দাও দেখা দাও, নূতন উষার রথে—
অনুসারী জনে নিয়ে যাও তুমি জয় গৌরব পথে।

* কলিকাতার লেক-ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাধীনতা উৎসবে এবং অন্যান্য বহু সভা সমিতিতে শ্রীমতী ছবিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গীত।
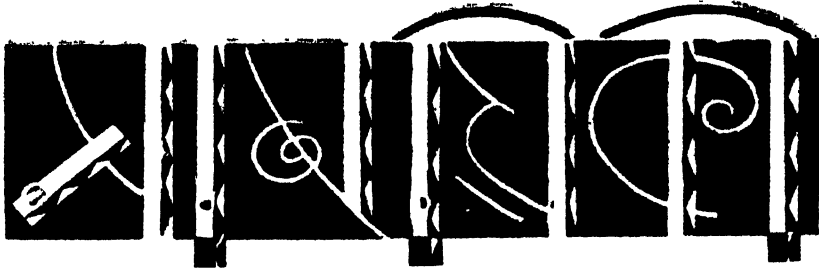
স্বাধীনতা-লাভ-উৎসব

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াও স্বাধীনতা লাভ করিল। ঐ উপলক্ষে সেদিন প্রত্যেক প্রদেশে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী ও করাচীতে স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নিয়োগে ভারতের বড়লাট হইলেন। দিল্লীতে ১৪ই আগষ্ট মধ্য-রাত্রি হইতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে উৎসব ও বক্তৃতাদি চলিল—দিল্লীর লাল কেল্লায়—এতদিন যেখানে কংগ্রেস-সেবকগণকে আবদ্ধ রাখিয়া নির্য্যাতন করা হইয়াছে—তথায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িল। কিন্তু এ

স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির শোভাযাত্রা

ফটো—শ্রীসরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সকলের অপেক্ষা অনেকগুণ মূল্যবান এক ঘটনা কলিকাতা-বাসী সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। ১৫ইএর মাত্র ২দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা সহরের বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য বাঙ্গালার অনাচারী লীগ-মন্ত্রিসভার নেতা শ্রীযুক্ত এচ-এস-সুরাবর্দ্দীকে সঙ্গে লইয়া বেলিয়াঘাটার বিধ্বস্ত অঞ্চলে এক মুসলমানের গৃহে বাস আরম্ভ করিলেন। তাহার পূর্ব্বে পশ্চিম বাঙ্গালায় হিন্দু-মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছে—কাজেই গান্ধীজির কলিকাতা আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়দিন জনকতক হিন্দু নির্ভয়ে মুসলমান দমনে অগ্রসর হইয়াছিল। গান্ধীজি আসিয়া কি শান্তিবারি ছিটাইলেন তাহা জানি না—কিন্তু ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্ণ হইতে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানে অপূর্ব্ব মিলন আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ
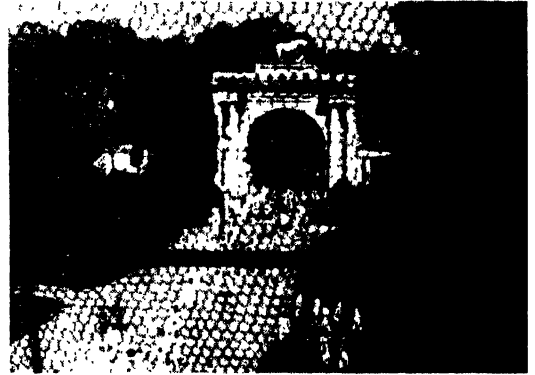
১৫ই আগষ্ট লাটভবনের সম্মুখস্থ জনতা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদের স্বাধীনতা উৎসবে পূর্ণভাবে যোগদান করিল—হিন্দুপল্লীতে যাইয়া হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব পুনপ্রতিষ্ঠা করিল ও হিন্দুদিগকে মুসলমান পল্লীতে পাইয়া সম্বর্দ্ধিত করিল। এইভাবে কলিকাতায় শান্তি আসিল—সাধারণ মানুষ বিস্মিত হইল—চমৎকৃত হইল—মুগ্ধ হইল। কলিকাতার খবর সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল—বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানিল—কাজেই পাকিস্থান পাইয়াও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিল না, বরং কলিকাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। পাকিস্থানে—বাঙ্গালার হিন্দু-অধিবাসীদের মন হইতে আশঙ্কা চলিয়া গেল। ১৫ইএর আনন্দ উৎসব ১৬ই ও ১৭ই পর্য্যন্ত চলিল—তাহার পর

১৮ই আগষ্ট আসিল, মুসলমান পর্ব্ব ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসবে হিন্দুরা যোগদান করিল—মুসলমানগণের জন্য মসজিদে মসজিদে খাদ্য পাঠাইয়া বন্ধুত্ব স্মরণীয় করিল। মহা-সমারোহে হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া ঈদ উৎসব সম্পাদন করিল। কলিকাতায় ট্রামবাস সকল পথে চলিল—যে সকল পথে গত ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত ১৬ই আগষ্টের পর হইতে হিন্দুরা যাইতে সাহস করে নাই, সে সকল পথে হিন্দু পূর্ব্বের মত অবাধে চলাফেরা করিতে লাগিল। পাছে দুষ্ট লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়, সেজন্য কর্ম্মীর দল, ছাত্রের দল, নেতার দল কলিকাতার পথে পথে মিছিল করিয়া ঘুরিয়া মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ২৬শে আগষ্ট সারা কলিকাতাব্যাপী মিলন-মিছিলের প্রদর্শন হইল—সেদিনের দৃশ্যের কথা দর্শক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না।

স্বাধীনতা উৎসবে রাজপথে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজি কলিকাতায় থাকিয়া প্রতিদিন বিকালে এক এক পল্লীতে যাইয়া প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান দ্বারা মিলন ও পুনর্বসতি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। নূতন মন্ত্রীরা গান্ধীজির উপদেশ মত দ্রুত দাঙ্গা পীড়িতদিগকে সাহায্য করিতে ও গৃহহীনদিগকে নিজ নিজ গৃহে পুনস্থাপিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। সে কার্য্যও বেশ সাফল্য লাভ করিল।

কিন্তু আবার সহসা একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। ২রা সেপ্টেম্বর গান্ধীজির নোয়াখালী যাত্রার দিন স্থির শিবিরে উপস্থিত হইয়া জানাইল—মুসলমানগণ সেদিন সন্ধ্যা হইতে পথে হিন্দুদের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সে সংবাদ তখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহারা গান্ধীজির গৃহ আক্রমণ করিল—জানালার কাচের সার্সি ভাঙ্গিয়া দিল, গান্ধীজির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করিল। ঐ ঘটনার পর হইতে সারা সহরে আবার দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িল—হিন্দু পল্লীতে মুসলমান মরিল, মুসলমান পল্লীতে হিন্দু মরিল—উভয় সম্প্রদায়ের লোকের দোকান-লুণ্ঠিত হইল। কত ক্ষতি হইল, তাহা বলা কঠিন। ১লা সেপ্টেম্বর সারাদিন ঐভাবে চলিতে দেখিয়া মহাত্মাজী স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি রাত্রি সওয়া ৮টা হইতে আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন। তিনি জানাইলেন—

স্বাধীনতা উৎসবে রাজপথে ছাত্রীবাহিনী

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার আর কোন অস্ত্র নাই—আমি উপবাস করিব—যদি কলিকাতায় হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা বন্ধ না করে, তবে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করিব।

যেদিন ১৫ই আগষ্ট সারা ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতা উৎসব সম্পাদনে আত্মহারা হইয়াছিল, সেদিন ছিল, গান্ধীজির প্রিয়ভক্ত ও পুত্র-প্রতিম শিষ্য মহাদেব দেশাইএর মৃত্যুতিথি। স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজি উপবাস, চরকায় সুতা কাটা ও উপাসনায় সারাদিন অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। যেদিন প্রথম গান্ধীজি কলিকাতা বেলিয়াঘাটার বাড়ীতে বাস করিতে যান, সেদিনও ঐ পল্লীর এক সম্প্রদায়ের লোক গান্ধীজির আগমন সহ্য করিতে না পারিয়া

যাহা হউক, ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গান্ধীজি অনশন আরম্ভ করিলেন—২রা সারাদিন অবিশ্রাম অতিবৃষ্টি চলিল। দেবতা বোধ হয় সুপ্রসন্ন হইলেন—কলিকাতার রাজপথে সোমবার যে রক্ত ছড়ান হইয়াছিল, মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে তাহা ধুইয়া গেল। বুধবার ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা আবার শান্তভাব ধারণ করিল। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী গান্ধীজির অনশন সংবাদ পাইয়া বুধবারে কলিকাতা আসিলেন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী

লাটসাহেবের প্রাসাদ শিখরে স্বাধীন ভারতের পতাকা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হইলেন। সহরের সকল নেতা—গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী, প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মী-বৃন্দ—মুসলমান নেতৃবৃন্দ—সকল সম্প্রদায়ের নেতা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—কেহই বাদ গেলেন না—সকলে মিলিয়া কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা নিজেদের শরীর ও জীবন বিপন্ন করিয়া মঙ্গলবার অতি বৃষ্টির মধ্যেও পথে পথে ঘুরিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই দলে নেতৃত্ব করিতে যাইয়া খ্যাতনামা কর্ম্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাণ দিলেন—আরও অনেকে আহত হইলেন। কিন্তু প্রহার ও হত্যা সহ্য করিয়াও সকলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একাগ্রতা দেখাইলেন। ফলে শান্তি আসিল। বুধবার ও বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণ কলিকাতা দেখিয়া ৭৩ ঘণ্টা অনশনের পর মহাত্মা গান্ধী বৃহস্পতিবার রাত্রি সওয়া ৯টার সময় অনশন ভঙ্গ করিলেন। তৎপূর্ব্বে কলিকাতার ৭জন নেতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং গিল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ আর-কে-জৈড্ক গান্ধীজির নিকট নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দান করিলেন—

রাইটাস্ বিল্ডিংসএ স্বাধীন ভারতের পতাকা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আমরা গান্ধীজির নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে যখন কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে তখন আমরা সহরে আর কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করিতে দিব না এবং মৃত্যুপণ করিয়া উহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিব।"

তাঁহার পূর্ব্বে আচার্য্য কৃপালানী প্রধান মন্ত্রীর গৃহে শতাধিক নেতার উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ৮জন নেতাকে লইয়া শান্তি কমিটী গঠন করেন—(১) মৌলানা আক্রাম খাঁ (২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (৩) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (৫) মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দি (৬) শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় (৭) শ্রীযুক্ত

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইস-চ্যান্সেলার) ও (৮) ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

গান্ধীর অনশনে সারা ভারতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বহু কর্ম্মী অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মীরা—যাহারা এতদিন তাহাদের লাঠিবাজির জন্য কুখ্যাত হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে উত্তর কলিকাতার প্রায় ৫শত পুলিশ বৃহস্পতিবার সারাদিন গান্ধীজির সহিত উপবাস করিয়া নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

১৪ই আগষ্টের শান্তিপ্রতিষ্ঠা যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের শান্তিও তেমনই কি করিয়া সম্ভব হইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। গান্ধীজির ৭৩ ঘণ্টা

রেড ক্রস্ আফিসের সম্মুখে ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনশন—তাহার সঙ্গে শচীন্দ্র স্মৃতীশ প্রভৃতির জীবনদান—সত্যই কি আমাদের মনকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? এই কথাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে।

পাঞ্জাবে হাঙ্গামা—

সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের রায় প্রকাশের পর হইতে পাঞ্জাবের উভয় খণ্ডে—মুসলমানপ্রধান পশ্চিম-পাঞ্জাব ও হিন্দুপ্রধান পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছে তাহার বিবরণ দেওয়া যায় না। উভয় খণ্ডে কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পশ্চিম-পাঞ্জাবের মুসলমানগণ যেমন তথায় শিখ ও হিন্দুদিগকে ধ্বংস করে, পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরাও সেইভাবেই মুসলমানদিগকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান নেতারা কয়দিন ধরিয়া উভয় অংশে দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ফল তেমন হয় নাই। পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে প্রায় সকল হিন্দু ও শিখ পলাইয়া আসিয়াছে, কতক পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে স্থান পাইয়াছে—বাকী সব দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গালা এমন কি সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমানগণও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হইতে কতক পূর্ব্ব দিকে চলিয়া আসিয়াছে, কতক পশ্চিম দিকে গিয়াছে। ইহার ফলে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা পাঞ্জাব আজ শ্রীহীন, বিধ্বস্ত। পাঞ্জাব প্রদেশে সেচের ব্যবস্থার ফলে কৃষি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতের কুত্রাপি আর সেরূপ হয় নাই। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের অবস্থা ও সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের অবস্থা কল্পনা করিলেও হৃদয় আতঙ্কিত হয়। রেলপথগুলি নষ্ট করা হইয়াছে—মোটর যাতায়াতের পথ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, কাজেই পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে উড়োজাহাজে করিয়া অধিবাসীদের সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। খাদ্যহীন ভারতে আজ আবার নূতন করিয়া কয়েক কোটি লোক খাদ্যহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িল—কে তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে কে জানে? শান্তিদূত মহাত্মা গান্ধী আজ অনশনজীর্ণ শরীর লইয়াই দিল্লী গমন করিয়াছেন। সারা ভারতের লোক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, গান্ধীজির শান্তি প্রচেষ্টা সার্থক হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক।

পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ—

২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জানাইয়াছেন যে পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই—তবে নভেম্বর মাসে নূতন ফসল না উঠা পর্য্যন্ত খাদ্যবণ্টন সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করা যাইবে না। কিন্তু আমাদের ত অন্যরূপ অবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে। রেশনের দোকানে চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাত খায়, আটা লইয়া তাহার ক্ষুধা মেটে না। কয়েক সপ্তাহ শুধু মোটা আতপ চাউল খাইতে হইয়াছে—ফলে সর্ব্বত্র

গ্রহণের উপযুক্ত চাউল এখনও পাওয়া যায় না। বাজারে অন্যান্য সকল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, ডাইল ও তরিতরকারী দুষ্প্রাপ্য—মাছ ত দুর্লভ বলিলেই হয়। ১ টাকা সের দরে ডাইল ও তিন টাকা সের দরে মাছ কিনিবার অবস্থা কয়জন বাঙ্গালীর আছে, প্রধানমন্ত্রীর তাহা অজ্ঞাত নহে। দুগ্ধ বা ঘৃতের কথা না বলাই ভাল। আলু, গুড় প্রভৃতি যাহাতে নূতন বৎসরে প্রচুর উৎপন্ন হয় ও বাজারে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, সেজন্য সরকারী চেষ্টা অবিলম্বে প্রয়োজন। সব্জী চাষেও দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

লাট সাহেবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালায় নূতন শ্রমিক-নীতি—

২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় পশ্চিম বাঙ্গালার শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন মন্ত্রিসভার শ্রমিক-নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শ্রমিকদিগকে লাভের অংশ প্রদান করার ব্যবস্থা হইবে। ধনী দ্বারা শ্রমিক-শোষণ বন্ধ করা হইবে। ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে।

গভর্ণরদের বেতন—

২১শে আগষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন—প্রত্যেক গভর্ণর সমান বেতন পাইবেন—তাঁহাদের বার্ষিক বেতন ৬৬ হাজার টাকা। মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণরদ্বয় পূর্ব্ব বেতন পাইবেন। গভর্ণরদের বেতন আয়কর মুক্ত নহে—ফলে তাঁহাদের মাসিক প্রকৃত বেতন হইবে তিন হাজার টাকা। পূর্ব্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণররা বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ও বিহারের গভর্ণর ১ লক্ষ টাকা, মধ্য প্রদেশের ৭২ হাজার টাকা ও উড়িষ্যার গভর্ণর ৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইতেন।

পশ্চিম বাঙ্গালায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—

৩১শে আগষ্ট মধ্যরাত্রির পর হইতে বাঙ্গালা দেশের সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দিয়া ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের অনুরূপ করা হইবে। সকল সরকারী অফিস নূতন সময়ের ১০টা হইতে কাজ করিবে।

ডালহৌসী স্কোয়ারে নেতাজী তোরণ

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতায় ইলেকট্রিক ট্রেণ—

কলিকাতায় শীঘ্রই ইলেট্রিক ট্রেণ চলাচল করিবে। দমদম হইতে চিৎপুর, বাগবাজার, নিমতলা ঘাট ও হাওড়া পুল হইয়া পোর্ট কমিশনারের রেল যে পথে গিয়াছে সেই পথে ফেয়ারলী প্লেস পর্য্যন্ত রেল চলিবে। পরে দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া উহা মাঝেরহাট পর্য্যন্ত যাইবে। বেলগাছিয়া, চিৎপুর, কুমারটুলী ঘাট, নিমতলা ঘাট, হাওড়া পুল ও ফেয়ারলী প্লেসে প্রথমতঃ ষ্টেশন খোলা হইবে। পরে ক্রমশঃ (১) হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান—হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড ও হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান উত্তর পথে (২) শিয়ালদহ হইতে কাচড়াপাড়া হইয়া রাণাঘাট, দমদম হইতে বনগাঁ, শিয়ালদহ হইতে বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর ও ক্যানিং (৩)

হাওড়া হইতে খড়্গপুর ষ্টেশনের সকল পথেই ইলেকট্রিক ট্রেণ চলিবে।

মাদ্রাজে মাদক বর্জ্জন—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আগামী অক্টোবর মাস হইতে মাদ্রাজের ২।৩ ভাগ মাদক বর্জ্জিত হইবে। ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, নীলগিরি, মাদুরা, মালাবার, নেলোর, গুণ্টুর ও দক্ষিণ কানারায় নূতন ব্যবস্থা হইবে। পূর্ব্বে তেলেগু অঞ্চলের ৫টি ও তামিল অঞ্চলের ৩টি জেলায় মাদক বর্জ্জিত হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লী ও ভিজিয়ানাগ্রামের ২টি স্কুলে ১৫০ জন পুলিশ কনেষ্টবলকে মাদক বর্জ্জন কার্য্য শিক্ষা দান করা হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় নিয়োগ—

বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইবার পর নিম্নলিখিত ৪টি জেলায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে দেওয়া হইল—(১) পশ্চিম দিনাজপুর—মিঃ বি-কে আচার্য্য ও (শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না আসা পর্য্যন্ত, শ্রীপ্রফুল্ল দত্ত (২) নবদ্বীপ—শ্রীদেবব্রত মল্লিক ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (৩) মুর্শিদাবাদ—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীনীরোদচন্দ্র সেনগুপ্ত (৪) মালদহ—শ্রীরাধারমণ সিংহ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে হাইকোর্ট—

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে নূতন হাইকোর্ট হইয়াছে, দেওয়ান রামলাল তাহার প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজন, সর্দ্দার বাহাদুর তেজ সিং, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভাণ্ডারী, শ্রীযুক্ত অছরুরাম ও শ্রীযুক্ত গোপালদাস খোসলা পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিভাগ নির্ণয়—

পূর্ব্ববঙ্গে ২টি বিভাগ পুনর্গঠন করা হইয়াছে—চট্টগ্রাম বিভাগে থাকিবে—চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল, থাকিবে—রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড় খুলনা, যশোহর ও নদীয়া। কুষ্টিয়া মহকুমা ও চুয়াডা মহকুমা লইয়া নূতন নদীয়া জেলা হইয়াছে—তাহার সদ হইয়াছে কুষ্টিয়া সহর।

গান্ধীজিকে পৌর-সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৪শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা ময়দা অক্টারলোনা মনুমেণ্টের নিকট মাঠে কলিকাতা কর্পোরে শনের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীকে পৌর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপ করা হইয়াছে। এই তৃতীয়বার কর্পোরেশন হইতে গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। উত্তরে গান্ধীজি কলিকা সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার জন্ম অনুরোধ জানাইয়াছেন

১৫ই আগষ্ট লাটভবনে পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ও প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফটো—শ্রীপান্না সেন

সীমান্তে নূতন মন্ত্রিসভা—

সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর পুরাতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন লীগ-মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। খাঁ আবদুল কোয়াম খাঁ প্রধান মন্ত্রী ও খাঁ মহম্মদ আব্বাস খাঁ অন্য মন্ত্রী হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব ও শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খান্না মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

গত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা টালীগঞ্জে প্রার্থনা সভা মহাত্মা গান্ধীকে বিহারে বাঙ্গালীদের অধিকার স্বীকৃ

বলিয়াছেন—"ভারতের প্রত্যেক নাগরিক ভারতের প্রত্যেক অংশে সমান অধিকার পাইবেন। বিহারে বাঙ্গালীদের ও বিহারীদের সমান অধিকার থাকা উচিত; কিন্তু বাঙ্গালীগণকেও বিহারীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইবে। তাঁহারা বিহারীগণকেও শোষণ করিবেন না। তাঁহারা বিহারকে বিদেশ বলিয়া মনে করিবেন না বা বিহারে গিয়া বিদেশীর মত ব্যবহার করিবেন না।"

দেশোন্নতিকর ব্যবস্থা বাবদ—১ কোটি ৩৩ লক্ষ

পথ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ বাবদ—৩ কোটি।

চোরা বাজার বন্ধের আইন—

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট চোরা বাজার বন্ধের জন্ম ২৯শে আগষ্ট নূতন জরুরী আইন ঘোষণা করিয়াছেন। বিচারে ৬ মাস হইতে ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও 'যে কোন পরিমাণ' অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। আপাতত ৬ মাস এই আইন চলিবে। চোরা বাজার ধরিবার জন্ম গুপ্তভাবে কয়েক হাজার লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সহরবাসী গোপনে খবর দিবার অধিকার পাইয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বাংলার বয়েজ স্কাউট প্রতিনিধিদলের ফ্রান্স যাত্রা　　ফটো—শ্রীপান্না সেন

ভারতের নিকট বাঙ্গালার ঋণ—

বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালা র মধ্যে বিভাগের কথা উঠে, তখন দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট মোট ৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছেন। তাহার বিবরণ এইরূপ—

বেসামরিক রক্ষা বাবদ—১ কোটি ৭৭ লক্ষ।

দামোদর বাঁধ মেরামত বাবদ—৬৬ লক্ষ।

অধিক ফসল ফলাও বাবদ—২১ লক্ষ

কৃষকদিগকে বস্ত্র বিতরণ বাবদ—১০ লক্ষ

ভারতের বস্ত্র সমস্যা—

৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় সকল বণিকসমিতির এক সম্মিলিত সভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিবেন। ঐ পরিকল্পনায় ভারতের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা আছে।

যাহাতে দেশে বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সে জন্য দেশের ধনী ও শ্রমিকদিগকে একযোগে কাজ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন কেন্দ্র—

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গে নিম্নলিখিত কয়টি নূতন নির্ব্বাচন কেন্দ্র ঘোষণা করা হইয়াছে—(১) মুর্শিদাবাদ সাধারণ—২ জন (২) দিনাজপুর মালদহ সাধারণ—২ জন (৩) দিনাজপুর ও মালদহ তপশীলী—১ জন (৪) নবদ্বীপ সাধারণ—১ জন (৫) পশ্চিম দিনাজপুর গ্রাম্য সাধারণ—১ জন (৬) নবদ্বীপ পশ্চিম মুসলমান—১ জন (৭) বহরমপুর মুসলমান—১ জন (৮) মুর্শিদাবাদ মুসলমান—১ জন (৯) জঙ্গীপুর মুসলমান—১ জন (১০) দিনাজপুর মুসলমান—১ জন (১১) মালদহ মুসলমান—১ জন। কোন মুসলমান কেন্দ্রে বা মুর্শিদাবাদ সাধারণ কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে না—পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কাজ করিবেন। বাকি ৪টি কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে।

বেলিয়াঘাটা গান্ধী-আবাসের সম্মুখে গান্ধীজীর দর্শনার্থী জনতা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

দামোদর পরিকল্পনা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ৩০শে আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতে কোন নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম দামোদর পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। উহা সম্পূর্ণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে।

সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে অন্যান্য বিষয় ভারত রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা স্থির করিতেছেন।

একটি চার বৎসরের বালিকার গান্ধীজীর হস্তে হরিজন ফণ্ডে অর্থদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

কলিকাতায় বস্তির উন্নতি—

গত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা মহম্মদ আলি পার্কে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার বস্তীগুলির অধিবাসীরা যাহাতে আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া সুখে বাস করিতে পারে, সে জন্য বস্তীর মালিকদিগকে বাধ্য করা হইবে। যে সকল নূতন কারখানা প্রস্তুত হইবে, তাহাদের মালিকদিগকেও প্রথমে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পরে কারখানার কার্য্য আরম্ভ করিতে বাধ্য করা হইবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের কল—

মধ্যপ্রদেশের জিমার জেলায় জি-আই-পি রেলের বরহানপুর-খাণ্ডোয়া শাখার চাঁদনীতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত করার জন্য শীঘ্রই একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কলপ্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিভাগ—

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ৪ জেলা (মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কলিকাতা ও ২৪ পরগণা—যশোহরের অংশ ২৪ পরগণার মধ্যে গিয়াছে) ও রাজসাহী বিভাগের ৪টি জেলা

নূতন একটি বিভাগ করা হইয়াছে। জলপাইগুড়িতে তাহার সদর কার্য্যালয় থাকিবে ও মিঃ জে-এন-তালুকদার নূতন বিভাগের কমিশনার হইয়াছেন।

বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী—

গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে অধ্যাপক শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—এই সভা বাঙ্গলা ভাষাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করে এবং গণ-পরিষদে রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ কমিটীকে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব-ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী ও যোগ্যতা বিবেচনা ও বিচার করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। উক্ত রাষ্ট্র-ভাষা নির্দ্ধারণ কমিটীতে কোন বাঙ্গালী সভ্য না থাকায় এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং গণপরিষদের কোন বঙ্গ ভাষাভাষী সভ্যকে এই কমিটীতে গ্রহণ করার দাবী জানাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্যের জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে সমগ্র পাকি-স্থানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, এই সভা তাহা সমীচীন মনে করে। এই সভা পাকিস্থান গণপরিষদকে এই দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। অনতিবিলম্বে উচ্চ শিক্ষায় ও অফিসে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন করিবার নিমিত্ত সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

গান্ধীজি ও ধনীসম্প্রদায়—

কলিকাতার হিন্দু মুসলমান ও শ্বেতাঙ্গ ধনী সম্প্রদায় গত ৩১শে আগষ্ট বিকালে কলিকাতা গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সভায় গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। সেখানে গান্ধীজি সকলকে বস্তী ও বিধ্বস্ত গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করে অর্থ-সাহায্য করিতে আবেদন জ্ঞাপন করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি—

গণপরিষদে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল রাষ্ট্র পরিচালনার নিম্নলিখিত মৌলিক নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) আইনকানুন প্রণয়নের সময় এই মৌলিক নীতি প্রযুক্ত হইবে (২) রাষ্ট্র সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবে (৩) রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে (ক) স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবিকার্জ্জনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা (খ) সমাজের কল্যাণের জন্য দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব সমভাবে বণ্টন (গ) প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের মালিকানা ও কর্তৃত্ব স্থাপিত না হয়, তজ্জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করার ব্যবস্থা (ঘ) নরনারী নির্ব্বিশেষে সমান কাজে সমান বেতনের ব্যবস্থা (ঙ) শক্তি ও স্বাস্থ্যে কুলায় না এরূপ পুরুষ ও নারী শ্রমিক ও অল্প-বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ না করার ব্যবস্থা। অভাবের তাড়নায় কেহ যাহাতে বয়স ও

১৫ই আগষ্ট গভর্ণর-হাউসে জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

সামর্থ্যের অনুপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা (চ) কেহ যাহাতে শিশু ও যুবকদের শক্তির অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করে তাহার ব্যবস্থা এবং তাহাদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। (৪) রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের জন্য চাকরী ও শিক্ষা এবং বেকার, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারের ব্যবস্থা (৫) শ্রমিকরা যাহাতে মানুষের যোগ্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে পারে এবং নারী শ্রমিকরা যাহাতে সন্তান প্রসবের সময় ছুটী পায় রাষ্ট্র কর্তৃক তাহার ব্যবস্থা। (৬) রাষ্ট্র কর্তৃক আইন, অর্থনীতিক সংগঠন ও অন্যান্য উপায়ে শিল্পে নিযুক্ত ও অন্যান্য কায়-শ্রমিকদের জন্য চাকরা, বেতন সুষ্ঠু জীবন যাত্রা, ছুটি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ ও সুবিধাদানের ব্যবস্থা (৭) নাগরিকদের মধ্যে সমান সামাজিক রীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আইন (৮) প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দশ বৎসরের মধ্যে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা (অনুন্নত ও দুর্ব্বল সম্প্রদায়, বিশেষতঃ তপশীলী ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত হইতে রক্ষা, (১০) দেশে পুষ্টি, জীবন ধরণের মান ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য (১) শিল্পকলার নিদর্শন ও ঐতিহাসিক সকল স্মৃতিস্তম্ভ ও স্থান রক্ষার ব্যবস্থা (১২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা।

সৈন্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা—

গত ২৯শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে এক সভায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী পাঞ্জাবের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের পর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলিয়াছেন—"এক সম্প্রদায়ের সৈন্যদের প্রহরাধীনে অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের প্রেরণ করা নিরাপদ নয়। হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের সৈন্যদের প্রহরাধীন ছাড়া পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আসিতে পারিবে। ... মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে সেরূপ ভাবে না হইলেও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বর্ত্তমান। মুসলেম সৈন্যবাহিনীর ন্যায় হিন্দু ও শিখরাও নিজ সম্প্রদায়ের উপর গুলী চালাইতেছে না। এই বিষ দূরীভূত না হইলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(গত ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে ইঁহার জন্মোৎসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে

কলিকাতায় রাহাজানি বৃদ্ধি—

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে মোট ২৬টি স্থানে ডাকাতি, লুঠ, রাহাজানি প্রভৃতি হইয়াছে। জিপ গাড়ীতে করিয়া বন্দুক লইয়া দুর্বৃত্তগণ লুঠতরাজ করিয়াছে। ঐ সম্পর্কে ১৮ জন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থার মনোযোগী হইয়াছে।

গান্ধীজির প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা—

গত ২৮শে আগষ্ট দিল্লীতে গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদ ভবনে মহাত্মা গান্ধীর এক চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চিত্রটি

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যখন বিলাতে যান, তখন বিখ্যাত চিত্রকর সার ওসওয়াল বীরলে ঐ চিত্র অঙ্কন করেন। সার প্রভাশঙ্কর পত্তনী উহা ক্রয় করেন ও স্বাধীন ভারতের জাতিকে দান করার মনস্থ করেন। তাহার পুত্র গণপরিষদের সদস্য মিঃ এ-পি পত্তনী উহা পরিষদকে দান করিয়াছেন।

পুলিসের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক—

কলিকাতায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে পুলিস বাহিনীর সাহায্যের জন্য এবং পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের কথা গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতা লালবাজার পুলিস অফিসে এক সভায় আলোচিত হইয়াছে। জনসাধারণের বহু প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয়, তজ্জন্য সকলেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুলিস কমিশনার এ বিষয়ে কাজ করিবেন।

বাঙ্গালীর সম্মান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী ১৯৪৮ সালের জন্য ওয়াশিংটন (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিজিটিং প্রফেসার' নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী অমিয়বাবুর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

গান্ধীজি ও নেতাজী—

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী ছাত্রগণকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, পাঠ্যাবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রের জীবনযাত্রা সন্ন্যাসীর অনুরূপ হওয়া উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের আচরণ আত্মসংযমের আদর্শ হইবে। গান্ধীজি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নেতাজী নশ্বর দেহে জীবিত নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভারতসেবকের অন্তরে তিনি বিরাজমান। তাঁহার জীবন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। তাঁহার দুঃসাহসিকতা অতুলনীয়। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম সামান্য কথা নয়। তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও নেতাজির প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ছাত্রগণ হিংসা বা অহিংস যে মতেই বিশ্বাসী হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন—এই কথা তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

১৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কে জাতি সংঘের সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব করিবার জন্য শ্রীযুক্তা

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মস্কো হইতে নিউইয়র্ক যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার কন্যা চন্দ্রলেখা পণ্ডিত ও সেক্রেটারী মিঃ টি-এন-কাউল যাইবেন। মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসে সকলে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

কোলাঘাটে ট্রেণ দুর্ঘটনা—

গত ১০ই ভাদ্র বুধবার মধ্যরাত্রির কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেলের কোলাঘাট

ষ্টেশনে (মেদিনীপুর জেলা) ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে ১৬ জন নিহত ও ১১৮ জন আহত হইয়াছে। আপ হাওড়া পুরুলিয়া টাটানগর প্যাসেঞ্জার কোলাঘাট ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল—আপ হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার তাহার উপর যাইয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটা হইতে লাইন পুনরায় ট্রেণ চলাচলের উপযুক্ত হয়। ঘটনার পর ৫।৭ দিনে আরও বহু আহত ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

হরিহরানন্দ আরণ্যের দেহত্যাগ—

মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা) কপিল মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজ গত ৫ই বৈশাখ ৭৯

স্বামী হরিহরানন্দ

বৎসর বয়সে মধুপুর কাপিল গুহায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন ও ২১ বৎসর যাবৎ একটি গুহায় প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত যোগদর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পাকিস্থানের লক্ষ্য ও মিঃ জিন্না—

গত ২৫শে আগষ্ট করাচী মিউনিসিপালিটী হইতে কায়েদে আজম জিন্নাকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইলে তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন—"আমরা আশা করি পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিবে এবং পরস্পর সৌহার্দ্দ্য ও শান্তির মধ্যে বাস করিয়া একে অন্যের শক্তিতে ভবিষ্যতে এই দুই ডোমিনিয়ান বিশ্বের দরবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। যে কোন প্রকারের ভয় ও অভাব দূর করাই কেবল নয়, পবিত্র ইসলামের আদর্শে স্বাধীনতা, সৌহার্দ্দ্য ও সাম্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭ সালের বি-এস্-সি পরীক্ষায় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র
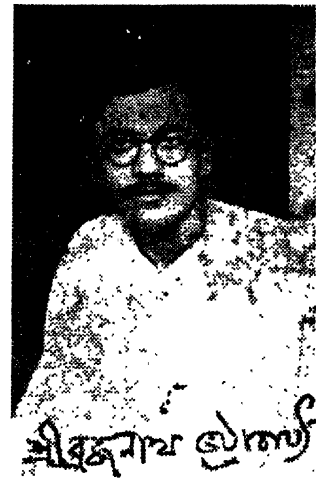
শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাভূষণের পুত্র শ্রীমান ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান, উভয় বিষয়ে অনার্স সহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে বিবেচনা—

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে রোয়েদাদ ঘোষণা করিয়াছেন সে বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে লইয়া এক সাবকমিটী গঠন করিয়াছেন—পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার পেটেল, সর্দ্দার বলদেব সিং, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর আম্বেদকর ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পাইকারী জরিমানা মুকুব—

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে, তাহা মকুব করা ও এ পর্য্যন্ত যে সব পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির উপর যে জামানত দাবী করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।

পরলোকে কবিরাজ হিরণ্ময় সেন—

পরলোগত কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ হিরণ্ময় সেন গত ২৫শে আগষ্ট ৫২ বৎসর বয়সে

৺হিরন্ময় সেন

তাঁহাদের নিমতলা ঘাটষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মাড়োয়ারী হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ও বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দিল্লীতে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দিল্লী প্রদেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। ফলে ট্রেণ চলাচল, তার, টেলিফোন, এমন কি বিমান যাতায়াত পর্য্যন্ত কয়েক দিন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে তথায় যে নিখিল ভারত সাহিত্যিক সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, তাহাও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার পেটেল প্রভৃতি হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা, তাঁহার গ্রন্থাদির প্রচার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কলিকাতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে সভাপতি ও ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি নামক এক সমিতি রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে ; কলিকাতা কাশীপুর ৬৬ মণ্ডলপাড়া লেনে সমিতির প্রধান কার্য্যালয় করিয়া এ বিষয়ে কাজ চলিতেছে। লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে সমিতির এই কার্য্য প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

পাঞ্জাবের আশ্রয়হীনদিগের সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীকে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মন্ত্রিসভায় এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। ক্ষিতীশবাবু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি—তাঁহার এই নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।

বাঙ্গালায় মন্ত্রী পরিবর্ত্তন—

পশ্চিম বাঙ্গালার ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার তিনজন মন্ত্রী—শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীযুত রাধানাথ দাস ও শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ পদত্যাগ করিয়াছেন। গভর্ণর ঐ দিনই তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীকে নূতন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্নদাবাবু অর্থ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জন স্বাস্থ্য বিভাগের ভার লইয়াছেন ও শ্রীযুত ভাণ্ডারীর উপর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার পড়িয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ইংলণ্ড ও মিডলসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী দু'টি রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯২৫ সালে জ্যাক হবস ক্রিকেট খেলার এক মরসুমে ১৬টি সেঞ্চুরী ক'রে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলায় যে নতুন রেকর্ড করেছিলেন তা দীর্ঘ ২১ বছর পর গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডেনিস কম্পটন ১৭টি সেঞ্চুরী ক'রে ভঙ্গ ক'রেছেন। হবসের রেকর্ড ভঙ্গ করা এবং নতুন রেকর্ড স্থাপন করা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে হবসের তুলনায় কম্পটন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৬টী সেঞ্চুরী করতে জ্যাক হবসের ৪৮ ইনিংস খেলার প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু ৪৫ ইনিংসেই কম্পটন ১৬টি সেঞ্চুরী করেন। কম্পটন তাঁর ৪৬ ইনিংসের খেলায় ১৭টি সেঞ্চুরী ক'রে হবসের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ সময়ের খেলায় হবস পাঁচবার নট আউট থাকেন, অন্য দিকে কম্পটন ছিলেন ৭ বার। হবসের ৭০·৩২ এভারেজ এবং কম্পটনের ৮৫·৯৪ এভারেজ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যখন উভয়েই ১৬টি সেঞ্চুরী পূর্ণ ক'রেছেন সে সময়ে হবসের গড়পড়তা রাণ ৩,০২৪, কম্পটনের ৩,২৬৬। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ডেনিস কম্পটন যে রেকর্ড স্থাপন করলেন তা অতিক্রম করা কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে সহজ ব্যাপার হবে না। কম্পটনের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান খ্যাতনামা বোলার ডগ্‌লাস রাইট বলেছেন ২৯ বছর বয়সের মিডলসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় এমন পদ্ধতির ক্রিকেট খেলেছেন যা খেলার গোঁড়ামী শূন্য, অথচ ক্রিকেট খেলার পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্নধারাগুলি নির্ভুলভাবেই তিনি পালন করেছেন।

একই মরসুমে বেশীসংখ্যক সেঞ্চুরীর রেকর্ড ঃ

খেলোয়াড়ের নাম	সাল	সংখ্যা
জ্যাক হবস	১৯২৫	১৬
হ্যামণ্ড	১৯৩৮	১৫
সাটক্লিফ	১৯৩৫	১৪
ব্র্যাডম্যান	১৯৩৮	১৩
সি বি ফ্রাই	১৯০১	১৩
হ্যামণ্ড	১৯৩৩ ও ৩৭	১৩
হেওয়ার্ড	১৯০৬	১৩
হেনড্রেন	১৯২৩, ২৭, ২৮	১৩
মীড	১৯২৮	১৩
সাটক্লিফ	১৯২৮ ও ১৯৩১	১৩

উক্ত রেকর্ড ছাড়া ১৯০৬ সালে সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (Tom Hayword) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক মরসুমে ৩,৫১৮ রাণের পৃথিবীর রেকর্ডও ডেনিস কম্পটন ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড করেছেন। সম্প্রতি স্তর পেলহাম ওয়ার্নারের দলের বিপক্ষে দক্ষিণ ইংলণ্ডের পক্ষে এক প্রদর্শনী খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে নটআউট ৩৫ রাণ করলে পর তাঁর মোট ৩,৫১৯ রাণ উঠে টম হেওয়ার্ডের পূর্ব্ব ৩,৫১৮ রাণের রেকর্ড অতিক্রম করে। এই রাণ তুলতে কম্পটনকে ৪৯ ইনিংস খেলতে হয়। অন্যদিকে হেওয়ার্ডের রেকর্ড করতে লেগেছিল ৬১ ইনিংস। এই মরসুমের শেষ খেলায় কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান মিডলসেক্সের পক্ষে খেলে ইংলণ্ডের অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে কম্পটন ২৪৬ রাণ তুলতে সক্ষম হন। ইংলণ্ডে ইহাই তাঁর সর্ব্বোচ্চ রাণ। এই রাণ তোলায়

কম্পটন স্থাপিত এক মরসুমে পৃথিবীর রেকর্ড রাণ সংখ্যা ৩৮১৬তে দাঁড়াল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কম্পটন ছাড়া মিডলসেক্সের বিল এডরিচও এই মরসুমে টম হেওয়ার্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মরসুমে তাঁর রাণ সমষ্টি ৩৫৩৯ হয়েছে।

ডেনিস কম্পটন ও এডরিচ ছাড়া নিম্নলিখিত ১৫ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় তিন সহস্রাধিক রাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার একই মরসুমে ডেনিস কম্পটনই করেছেন সর্ব্বাধিক রাণ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খ্যাতনামা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্জিৎসিংজী ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলে ১৮৯৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে সর্ব্বপ্রথম ৩,১৫৯ রাণ তুলে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

খেলোয়াড়	বছর	মোট	এভারেজ
হেওয়ার্ড	১৯০৬	৩,৫১৮	৬৬·৩৭
উলি	১৯২৮	৩,৩৫২	৬১·০৩
সাটক্লিফ	১৯৩২	৩,৩৩৬	৭৪·১৩
হ্যামণ্ড	১৯৩৩	৩,৩২৩	৬৭·৮১
হেনড্রেন	১৯২৮	৩,৩১১	৭০·৪৪
এবেল	১৯০১	৩,৩০৯	৫৫·১৫
হ্যামণ্ড	১৯৩৭	৩,২৫২	৬৫·০৪
হেনড্রেন	১৯৩৩	৩,১৮৬	৫৬·৮৯
মীড (সি. পি)	১৯২১	৩,১৭৯	৬৯·১০
হেওয়ার্ড	১৯০৪	৩,১৭০	৫৪·৬৫
রণজিৎসিংজী	১৮৯৯	৩,১৫৯	৬৩·১৮
ফ্রাই	১৯০১	৩,১৪৭	৭৮·৬৭
রণজিৎসিংজী	১৯০০	৩,০৬৫	৮৭·৫৭
এমেস	১৯৩৩	৩,০৫৮	৫৮·৮০
টিলডেসলি (জেটি)	১৯০১	৩,০৪১	৫৫·২৯
মীড (সি পি)	১৯২৮	৩,০২৭	৭৫·৬৭
হবস	১৯০৫	৩,০২৪	৭০·৩২
টিনডেসলি (ই)	১৯২৮	৩,০২৪	৭৯·৫৭
হ্যামণ্ড	১৯৩৮	৩,০১১	৭৫·২৭
হেনড্রেন	১৯২৩	৩,০১০	৭৭·১৭
সাটক্লিফ	১৯৩১	৩,০৬৬	৯৬·৯৬
পার্কস (জে এইচ)	১৯৩৭	৩,০০৩	৫০·৮৯
সাটক্লিফ	১৯২৮	৩,০০২	৭৬·৯৭

এ পর্য্যন্ত একই মরসুমের খেলায় সাটক্লিফ, হেনড্রেন ও হ্যামণ্ড তিনবার তিন সহস্রাধিক রাণ করেন। রণজিৎসিংজী মীড ও হেওয়ার্ড করেন দু' বার।

ক্রিকেট খেলায় স্মরণীয় ঘটনা ঃ

পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সব থেকে দীর্ঘ দিন খেলোয়াড়জীবন যাপন করেছিলেন জর্জ্জ হার্স্ট ; তিনি ১৮৮৯ সালে ইয়র্কসায়ারের পক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন। তাঁর সর্ব্বশেষ খেলা ১৯২৯ সালে।

* * * *

১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত ডার্বিসায়ার বনাম ওয়ারউইকসায়ারের ক্রিকেট খেলায় যে অভূতপূর্ব্ব রাজযোটক যোগ দেখা গিয়েছিল তা এ পর্য্যন্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯১৯ সালের উক্ত খেলায় ডবলউ জি কোয়াইফ এবং তাঁর পুত্র বি ডবলউ কোয়াইফ একত্র জুটী হয়ে খেলতে থাকেন এবং অপরদিকে যাঁরা তাঁদের জুটী ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা হলেন ডবলউ বেষ্টউইক ও আর বেষ্টউইক —দু'জনের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ।

ফুটবল খেলার লটারী ঃ

'ফুটবল পুল' প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী ক'রে ৪৭ বছর বয়সের ষ্টোকার জর্জ্জ স্মিথ নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। বৃটিশ চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার ডাঃ ডালটন গত এপ্রিল মাসে সিগারেটের উপর আর এক সিলিং ট্যাক্স চাপিয়ে দিলে জর্জ্জ স্মিথ বিরক্ত হয়ে ধূমপান একেবারে বর্জ্জন ক'রে সিগারেট খরচার টাকাটা 'ফুটবল পুলে' খাটাতে লাগলেন। সেই থেকেই তাঁর ভাগ্য আজ ফিরেছে। তিনি ৩,০০,০০০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদল ঃ

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদলের ক্যাপটেন ভি এম মার্চেন্ট শেষ পর্য্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার জন্য দলে যোগদান করতে সক্ষম হলেন না ; তাঁর স্থলে লালা অমরনাথ দলের অধিনায়কত্ব করবেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবরের মধ্যে কোন এক তারিখে বি ও এ সি এরোপ্লেনে ১৪জন খেলোয়াড়সহ দলের ম্যানেজার অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন।

ডেভিস কাপ ঃ

গত বছরের ডেভিসকাপ বিজয়ী আমেরিকা ৪-১ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে এ বছরও ডেভিস কাপ বিজয়ী হয়েছে। আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ১৩বার উক্ত কাপ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশীবার ডেভিস কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

ফলাফল ঃ

সিঙ্গলসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সখের খেলোয়াড় জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ডিনি পেল্‌সকে (Dinny Pails) সহজেই পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসের দ্বিতীয় খেলায় Tod Schroeder ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩ ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার ১নং খেলোয়াড় জন ব্রোমউইচকে পরাজিত করেন। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে জন ব্রোমউইচ ও কোলিন লং (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ২-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে জ্যাক ক্রামার ও টেড সক্রোডারকে (আমেরিকা) পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

অপর এক সিঙ্গলসের খেলায় জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে জন ব্রোমউইচকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসে টড সক্রোডার (আমেরিকা) ৬-৩, ৮-৬, ২-৬, ৮-১১, ও ১০-৮ গেমে ডিনি পেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

'ইউরোপীয়ান সুইমিং চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতায় ১৭ বছর বয়সে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান এলেক্স জেনী ২০০ মিটার দূরত্ব ২ মিঃ ৪·৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তাঁর পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্বের থেকে তিনি এক সেকেণ্ড কম সময়ে উক্ত দূরত্ব পথ অতিক্রম করেন। এ ছাড়া এলেক্স জেনী সাঁতারে ৪০০ মিটার দূরত্ব ৪ মিঃ ৩৫·২সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে আমেরিকার বিল স্মিথ প্রতিষ্ঠিত ৪ মিঃ ৩৮৫ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ইংলণ্ডঃ ৪২৭ (এল হাটন ৮৩) ও ৩২৬ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ডি কম্পটন ১১৩) দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩০২ (বি মির্চেন ১২০) ও ৪২৩ (৭ উইঃ মিচেল নট আউট ১৮৯, নোর্স ৯৭) ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ 'ড্র' গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বি মিচেল উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "বিবস্ত্র মানব"—৪৲
শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে কানাই বসু কর্ত্তৃক প্রদত্ত নাট্যরূপ "বিরাজ-বৌ"—২।০
রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মন্দাক্রান্তা"—৩।০
অন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "বাঁধন হারা"—২।০
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাত্রি"—২৲
শ্রীপবিত্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "রাশিয়ার রূপ"—১।০
বিজয় ব্যানার্জী প্রণীত "সংগ্রাম ও সমর-নায়ক"—৩৲, "নূতন পথে বিজ্ঞান"—১।০
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "আমাদের বাঙলা" (১ম পর্ব্ব)—১।০
সনৎ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গণপরিষদ ও কংগ্রেস"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী"—২।০
প্রণব রায় প্রণীত "সাত নম্বর বাড়ী"—২।০
শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সঙ্কলিত "নয়া-বাঙ্গলা"—৩৲
বনস্পতি—সম্পাদিত উপন্যাস "দুঃসাহসিক অলক"—২৲
শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত প্রণীত "শাশ্বত তরুণ"—২৲
ঋষি দাস কর্ত্তৃক রোমাঁ রোলাঁ রচিত গ্রন্থের অনুবাদ "মহাত্মা গান্ধী"—২।০
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীমহানাম রসমাধুরী—।০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ভগবানের চাবুক"—১৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী উপন্যাস "কলঙ্কী চাঁদ"—১৲
বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত"শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম"—।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১,কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশ তৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

☰ নাটক ☰

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

পি-ডাবলউ-ডি — আত্মাহুতি (পৌরাণিক)
সিঁথির সিন্দুর — রীতিমত নাটক
শক্তির মন্ত্র — সত্যের সন্ধান
আঁধারে আলো — রাঙা রাখী
কবি কালিদাস — প্রাণের দাবী
হাউস ফুল — নারী ধর্ম্ম
মন্দির প্রবেশ — ত্রিমুর্ত্তি

(ছেলেমেয়েদের নাটক)

রথের ঠাকুর ১৲

সমাজ চেতনামূলক গ্রন্থ

টিক্‌টিকি ও চড়াই

চলন্তি নাটক-নভেল এজেন্সি
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন উপন্যাস ! নূতন উপন্যাস !

মহাজাতির মুক্তিপথে

চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
জাতীয় কল্যাণে **নিতাই ভট্টাচার্য্যের** বলিষ্ঠ লেখনী

সংগ্রাম ২৸০

মন্মথ রায় রচিত ও গান সম্বলিত চিত্রোপন্যাস

যোগাযোগ ২৷৷০
অলকানন্দা ২৷৷০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর (উপন্যাস)

মায়ের আশীর্ব্বাদ ২৷৷০
সান্ধ্যদীপ ২৷৷০

দেশকর্ম্মী—গোপীনাথ দাসের

প্রথম মিলন ১৸০

উপন্যাসগুলি অভিনব রূপ-সজ্জায় সমৃদ্ধ

সারস্বতী সাহিত্য মন্দির
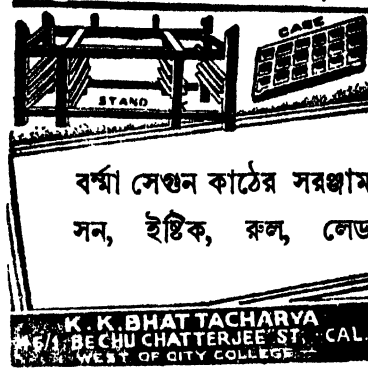
ছাপাখানার যাবতীয় সরঞ্জাম

বর্ম্মা সেগুন কাঠের সরঞ্জাম, লেড, কোটে-সন, ইষ্টিক, রুল, লেডকাটার মেসিন, বিক্রয়ার্থে সর্ব্বদা মজুত থাকে। লটের সন্ধান দেওয়া হয়।

K. K. BHATTACHARYA
6/1, BECHU CHATTERJEE ST. CAL.
WEST OF CITY COLLEGE

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত পুস্তকাবলী

গৃহশ্রী নূতন প্রকাশিত সুশোভন সংস্করণ। ভদ্র ও আদর্শ সংসার গঠনের উপযোগী জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ। এইরূপ একখানি পুস্তক গৃহে থাকিলে বহু সমস্যার সহজ সমাধান অবশ্যম্ভাবী। উপহারে অতুলনীয়।
দাম—তিন টাকা

বেহুলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৮-৪৯ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুত-পঠনরূপে নির্ব্বাচিত। দাম—পাঁচ সিকা

রামায়ণী কথা ১৲ পৌরাণিকী ২।॰ পুরাতনী ১।॰

—দিলীপকুমার রায় প্রণীত—

ভাগবতী কথা শ্রীমদ্ভাগবতের নির্ব্বাচিতাংশের কাব্যরূপ। দাম—৫৲

ছায়ার আলো মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। ১ম খণ্ড ৩৷৷॰, ২য় খণ্ড ৩৷৷॰
২য় খণ্ড সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

শাদা-কালো (নাটক) ২৲
আপদ ও জলাতঙ্ক (নাটিকা) ১৷৷॰
দোলা (উপন্যাস) (২য় ভাগ) ৩৲
তরঙ্গ রোধিবে কে ? (উপন্যাস) ১ম ২৲, ২য় ২৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটকসমূহ

কর্ণার্জ্জুন ২৲, শুভদৃষ্টি ১৲, শ্রীগৌরাঙ্গ ১৲,
পুষ্পাদিত্য ১৲, শকুন্তলা ১৲, রাখীবন্ধন ১৲,
শ্রীকৃষ্ণ ১।॰, শ্রীরামচন্দ্র ১।॰, রঙ্গিলা ।৵॰,
অপ্সরা ।৵॰, অযোধ্যার বেগম ১।॰, ছিন্নহার ১।॰

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর ১৲

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রন্ধন-শিক্ষা (রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ) ৷৷॰

বসুমতী
সাহিত্য
মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

তারাশঙ্করের
ঝড় ও ঝরা পাতা
আড়াই টাকা

—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চিহ্ন
তিন টাকা

—

শিবরামের
অথ বিবাহ ঘটিত
দুই টাকা

—

শিশু-সাহিত্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
মোহন মেলা
সোনার আনারস
(যন্ত্রস্থ)

সবে বেরুল
যামিনীমোহন করের
কলা দেখিয়ে
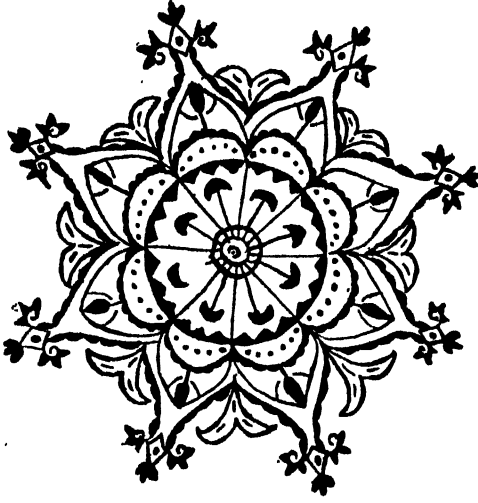
Ananda Math
শ্রীঅরবিন্দ ও বারীণের
ইংরেজী অনুবাদ
তিন টাকা

—

রাজভাষা
২৬শ সংস্করণ
পাঁচ সিকা

—

জ্যোতিষ রত্নাকর
হিন্দু জ্যোতিষের সার গ্রন্থ
সরল বাংলায়
দুই টাকা

—

বসুমতীর
গ্রন্থাবলী—
ধর্ম্মগ্রন্থ—
প্রাচীন সাহিত্যের
তালিকা সংগ্রহ করুন

দৈনিক বসুমতী
বার্ষিক—২৪৲
৬ মাস—১২৲
৩ „ —৬৲

সাপ্তাহিক বসুমতী
বার্ষিক—৩৲

মাসিক বসুমতী
বার্ষিক—৯৲

A.D.

ALL
YOU
NEED
IS.
এই অসামান্যা সুন্দরী মহিলার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য হাজার হাজার লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। কিন্তু তিনি বলেন শুধু "ওটীনের" জন্যই এ সম্ভব হয়েছে।
তাই সৌন্দর্য্যলাভ ও তা রক্ষা করতে হলে "ওটীন" আজ অপরিহার্য্য।
Oatine
SNOW for DAY CREAM for NIGHT

হরলিক্‌স কিভাবে "দুর্ব্বলতা" দূর করে

সারাদিন কাজ করার পর ক্লান্তিবোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু সর্ব্বদাই ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা বোধ করা স্বাভাবিক নয়।

যদি ঘুম থেকে ওঠবার পরও আপনি ক্লান্তিবোধ করেন তাহ'লে সাবধান … এ হ'লো প্রকৃতির বিপদ-সঙ্কেত।

আমরা যে খাদ্য খাই তার পুষ্টিকর অংশ থেকেই আমরা দৈহিক বল ও জীবনীশক্তি লাভ করি। আমাদের খাদ্যের পরিমাণের চাইতে তার গুণের মূল্যই বেশী।

আমাদের সাধারণ খাদ্যে প্রায়ই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানগুলি থাকেনা। এই উপাদানগুলির অভাবের দরুন শক্তি ক্ষয় হ'লে আমরা পুনরায় তা পুরোপুরি ফিরে পাইনা।

ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা দূর করতে হ'লে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা হরলিক্‌স খাবেন। কাজ ও খেলার জন্য অফুরন্ত শক্তি পাবেন।

হরলিক্‌স কি :
সম্পূর্ণ খাঁটি গো-দুগ্ধ এবং মলটেড যব ও গমের পুষ্টিকর সারাংশ দিয়ে হরলিক্‌স প্রস্তুত হয়। হরলিক্‌স একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য—এতে স্বাভাবিক পুষ্টির প্রয়োজনানুরূপ শরীর গঠনোপযোগী এবং শক্তিদানকারী খাদ্যবস্তু যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে। হরলিক্‌স খেতে ভারী পুষ্টিকর পানীয়।

নিয়মিতভাবে খেলে **হরলিক্‌স** আপনার শক্তি সঞ্চার করবে

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৫৪

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ঘোষ ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১১৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ
জলপাইগুড়ি
বি, বি, ২২৫৭

মেনে রাখুন
সারিডন

চিত্রা
তাল মিছরী
সর্দ্দি ও কাশির মহৌষধ
মেদিনীপুরের
প্রসিদ্ধ তাল গুড় হইতে প্রস্তুত
PALM SUGARCANDY
CHITRA CHEMICAL WORKS

শ্রীঔষধালয় লিমিটেড
প্রতিষ্ঠানের ঔষধগুলি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ও প্রথায় অভিজ্ঞ রাসায়নিক ও ভেষজবিশারদগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ায় সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য
সর্ব্বরোগে মকরধ্বজ
যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে সারিবাদ্যরিষ্ট
সর্দ্দি কাসি ইত্যাদিতে চ্যবনপ্রাশ
শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং যাবতীয় স্ত্রীরোগে অশোকারিষ্ট
যাবতীয় ক্ষয়রোগে দ্রাক্ষারিষ্ট সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার্য্য টনিক
মূল্যতালিকা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্যে লিখুন —
৪৩৮ • রসা রোড (সাউথ) টালিগঞ্জ • কলিকাতা

জন-কল্যানের
চিরস্থায়ী অধিকারের গৌরবে ধন্য!

লিলি বিস্কুট কোং :: কলিকাতা

পয়োধি
বিখ্যাত দৈ
পয়োধি
জলযোগ
লেক মার্কেট :: পার্ক সার্কাস
ফোন: সাউথ ১৪৩০

অনুপমা কেমিক্যাল : কলিকাতা

বাদ্যযন্ত্রের যাবৎকিছু সবই
৺শারদীয়া পূজার উপহার
নিখুঁত, মধুর, আওয়াজ ও মজবুত
সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের জন্য আমাদের
দোকানে আসিতে অনুরোধ করি।
"সিলভারটোন"
গ্রামোফোন
পোর্টেবিল ও
ট্রান্স-পোর্টেবিল
মডেল
পাওয়া যায়
বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট
"আমবাসাডোর"
রেডিও
বিলাতে প্রস্তুত
এসি, অথবা এসি, ডিসি
মূল্য—৯০৲
সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন
এম, এল, সাহা লিঃ
এবং
সি, সি, সাহা লিঃ
১৭০. ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

ডাঃ পি, মজুমদারের
এন্টিশ্যাম্পু
কার্বঙ্কল কিওর
বিনা অস্ত্রে ও অস্ত্রোপচারে
ফোঁড়া ইত্যাদির

বই-ই উপহারের শ্রেষ্ঠ উপকরণ
ছোটদের জন্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ বই
সুকুমার রায়
আবোল-তাবোল ২৸০
হ-য-ব-র-ল ২৲
পাগলা দাশু ২৷৷০
ঝালাপালা ২৲
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আপন কথা ৩৲
রাজকাহিনী ২৸০
শকুন্তলা ২৲
ক্ষীরের পুতুল ১৸০
লীলা মজুমদার
দিন-দুপুরে ২৷৷০
পদিপিশির বর্মিবাক্স ২৷০
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কারাগারের কাহিনী ২৷০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আম আঁটির ভেঁপু ২৷০
অস্কার ওয়াইল্ড
হাউই ২৷০
অনুবাদক : বুদ্ধদেব বসু
এরিথ মারিয়া রেমার্ক
অল্ কোয়ায়েট ২৷০
অনুবাদক : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
উপন্যাস ও গল্পের বই
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বেদে ৩৷৷০
প্রথম প্রেম ৩৲
জননী জন্মভূমিশ্চ ২৷৷০
যতনবিবি ২৷৷০
নতুন তারা (নাটিকা) ২৷৷০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
কুয়াশা ২৷৷০
পুতুল ও প্রতিমা ২৷৷০
শচীন্দ্র মজুমদার
লীলামৃগয়া ৩৲
পলাতকা ৩৲
বিজন ভট্টাচার্য
জনপদ ৩৲
আধুনিক সোভিয়েট গল্প ৩৷৷০
অনুবাদক : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ডি. এইচ. লরেন্স
লেডি চ্যাটার্লির প্রেম ৪৲
অনুবাদক : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
লরেন্সের গল্প ৩৷৷০
সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র
সমারসেট মম্-এর গল্প ৩৲
সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র
পিরানদেল্লোর গল্প ৩৲
সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু
যে বাড়িতে বই নেই সে বাড়ি জানলাহীন বন্ধ ঘরের সামিল। চারদিকে বই দেখতে দেখতেই ছেলেমেয়েরা পড়তে শেখে। আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে জ্ঞানের পিপাসা জাগে।
বড়দের জন্যে অবশ্য-পাঠ্য বই
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ৪৲
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
রুদ্ধকারার দিনগুলি ৩৲
কৃষ্ণা হাতিসিং
কোনো খেদ নাই ৪৲
জেম্‌স্ জিন্‌স্
বিশ্ব-রহস্য ৩৲
অনুবাদক : প্রমথনাথ সেনগুপ্ত
সিগনেট প্রেসের বই
পূর্ণ তালিকার জন্যে চিঠি লিখুন
১০।২ এলগিন রোড
কলিকাতা ২০

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ
এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো
মুক্তি-রণের সাথী
GE 7092
(জাতীয় সঙ্গীত)
কালোবরণ দাস
তোমার আমার মিলনের মাঝে
বাসর-শয়নে ঘুমায়োনা
GE 7094
(আধুনিক)
পরেশ দেব
রইতে নারি ঘরে
ফুলের বাগিচায়
GE 7095
(পল্লী-গীতি)
শ্রীমতী রাধারাণী
বাঁশী আমার ভাসিয়ে দেব
ও মন পাখী আমার
GE 7096
(পল্লী-গীতি)
প্রোফেসর আলী হোসেন
সানাই — "যোগিয়া"
" ছায়া চিত্রের গানের সুর
GE 7097
(যন্ত্র-সঙ্গীত)
CVK 33
Columbia
কলম্বিয়া
MAGIC NOTES
TRADE MARK
কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ লাহোর

—শা র দী য়া উ প হা র—

কার্ত্তিক—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর পদপ্রান্ত হ'তে

অগণিত সন্তানের গাঢ় তপ্ত তাজা রক্ত স্রোতে

সিক্ত হয়ে বারংবার—বন্ধন-শৃংখল ভার--বজ্র সুকঠিন--

হ'তেছিল ক্ষীয়মান জীর্ণপ্রায় অগোচরে যাহা দীর্ঘ দিন

বিশ্বের অঙ্গনে তাহা সহসা পড়েছে আজি খসি,

বংশ পরম্পরা যার প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা বহিয়া ছিনু মোরা বসি,

এসেছে সে আকাংখিত দিব্য শুভদিন,

বন্দিনী জননী ছিল সবলোক মাঝে দীর্ঘকাল মর্যাদা বিহীন

মুক্তি তাঁর এতদিনে আচম্বিতে হয়েছে সম্ভব ;

এ নহে বিজয় বন্ধু, শুধু মাত্র স্বদেশের নব-লব্ধ মুক্তির উৎসব !

এ প্রাচীন পদানত ভূমে ছোট বড় ধনী কিংবা দীন

কেহ আর নহে আজ অবাঞ্ছিত শাসন-অধীন।

স্বাধীন এ ভারতের রুধিরার্দ্র রক্তিম আকাশে

বন্ধন-মোচন-দীপ্ত নূতন অরুণ উষা হাসে।

যে সূর্য উঠেছে আজ পূর্বাচলে মুক্তির লগনে
'ওঠেনি' সে এতকাল পরাধীন এ প্রাচ্য গগনে।

নবীন অরুণোদয়ে তোমারে স্মরণ করি আজ
বাসুদেব, হে কংসারি, বৃষ্ণিকুলরাজ!
মহাভারতের স্বপ্ন একদিন দেখেছিলে তুমি ;
কুখ্যাত সে কুরুক্ষেত্র রণ-রঙ্গভূমি
আত্মীয়-শোণিত-স্রোতে স্বপ্ন তব করেছিল গ্রাস,
সেদিন এ আর্যাবর্তে ঘটেছিল কী যে সর্বনাশ!
ভ্রাতৃবিরোধের বীজ—হস্তিনার বিষাক্ত গরল—
ভারতের মৃত্তিকারে স্বজন বিদ্বেষ বিষে করে গেছে তিক্ত অসরল।
আসিয়াছে তার পরে বারে বারে যত মহারথ
চাহিয়াছে বাঁধিবারে 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'
ব্যর্থ করি সেই চেষ্টা বাধিয়াছে আত্মঘাতী রণ :
ভারতে মরেনি আজও স্ব-জাতীয়-বৈরী বিভীষণ
ভগ্ন-উরু কুরুপতি—দ্বন্দ্ব-লিপ্ত আজও হেথা দ্বৈপায়ন হ্রদে ;
পরাজিত প্রাজ্ঞ পুরু, পৃথ্বীরাজ হারায়েছে প্রাণ,
ইরাণী তুরাণী সেনা, শক, হুন, মোগল পাঠান
এসেছিল বারে বারে, দিল্লীর দুর্গের দ্বারে করেছিল নির্মম আঘাত,
একতা-বিচ্যুত এই দুর্ভাগা দেশের হায় আঁধারে আচ্ছন্ন দিবা রাত—
কাটিয়াছে তীব্র দুঃখ বেদনার মাঝে—
প্রতিপদে প্রতিক্ষণে জীবনের দৈনন্দিন কাজে,
পরবশতার রূঢ় দৃঢ় নাগপাশ
কলংকিত করিয়াছে স্বজন-বিরোধ লিপ্ত এদেশের শেষ-ইতিহাস।

আজ তাহা রাখিব না মনে।
পলাশী ও পাণিপথ ডুবে যাক চির বিস্মরণে।
জননীর শাপ-মুক্তি শুভ সন্ধিক্ষণে
রাতের দুঃস্বপ্ন যত যাক্ মিলাইয়া প্রভাতের নব সূর্য সনে।

আজ শুধু এই স্মৃতি উজ্জীবিত করুক স্মরণ
মহারাণা প্রতাপের স্বাধীনতা লাগি চিতোর-অরণ্যে মৃত্যুপণ,
ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্রে নব অভ্যুদয়,
পঞ্জাব-কেশরী যারা গুরুজীর পুণ্য নামে স্বাধিকার করেছিল জয়!
চাঁদ, কেদারের কথা, যশোরের অনন্ত প্রতাপ ;
যাদের বিপ্লবী চিন্তা—দুঃসাহসী বিদ্রোহের ছাপ—
জাগে আজও বাঙালীর মনে।

স্বরাজ্য লাভের এই আগন্তুক আনন্দ-লগনে
নমি' নানা ফড়্‌নবীশ্—মারাঠার বিদ্রোহী প্রধান !
নমামি ঝাঁসীর রাণী,—স্বাধীনতা যুদ্ধে দিলে প্রাণ ;
হে নিষ্ঠুর ধুন্ধুপন্থ্ তোমারেও করি নমস্কার
দেশের মুক্তির লাগি যুগে যুগে সর্বত্যাগী—স্মরিয়া তাঁদের বার বার
জনে জনে আজি মোরা জানাই প্রণতি।

হে পার্থ-সারথি !
তব সুদর্শন চক্র—লাঞ্ছিত কেতন
আজি মোরা করিতেছি ঊর্ধ্বে উত্তোলন
সার্ধ সপ্ত শতাব্দীর পরে—
বন্ধন-বিমুক্ত নব ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে।
অশোক-গৌরব-গাথা-মুঞ্জরিত যে চক্রের সিংহধ্বজ রথে,
অতীতের লক্ষ স্মৃতি আবর্তিত যে চক্রের উত্থান পতন গতি পথে,
ভারতের অভিনব জাতীয় পতাকা এল বক্ষে ল'য়ে সে দিব্য প্রতীক
উজ্জ্বল করিতে পুন সদ্যমুক্ত এদেশের রুদ্ধ দশদিক !

*　　　*　　　*

ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত এই গণ-দেবতার পুণ্য পতাকা সম্মুখে
বহু আকাংখিত স্বপ্ন সাফল্যের সংবিধান সুখে
মিলিত হয়েছে পুন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সকল সন্তান।
জননীর মুক্তি লাগি অকাতরে দিল যারা প্রাণ—
হাসি মুখে ফাঁসীমঞ্চ করিল বরণ
বহুদূর দ্বীপান্তরে গেল যারা চির-নির্বাসন।
আজি এ প্রভাতে স্মরি তাঁহাদের সকৃতজ্ঞচিতে—শ্রদ্ধানত শিরে
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই সব দুঃসাহসী দেশভক্ত বীরে।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত যাহাদের রাজদ্রোহী বলি দিয়াছিল মিথ্যা অপবাদ।
কারা-কক্ষে সমাহিত যাহাদের সাধনা ও সাধ
তাহাদের সসম্ভ্রমে করিয়া বন্দন
আমাদের প্রীতি-অর্ঘ করি নিবেদন।

যাহাদের শৌর্য বীর্য ত্যাগের প্লাবনে
জেগেছিল মৃতজাতি পৌরুষের দুরন্ত জীবনে
যাহাদের কণ্ঠে শুনি অভয় হুংকারে—শৃংখল-ভাঙার দীপ্ত গান—
সঞ্জীবিত হয়েছিল আপনা-বিস্মৃত অচেতন কোটী সুপ্ত প্রাণ,
তাহাদের পুণ্য-স্মৃতি স্মরি—
তোমারে বরণ আজি করি,

স্বাধীন এ ভারতের হে আরাধ্য জাতীয় পতাকা !
তোমার ত্রিবর্ণে আছে আঁকা
ত্যাগের গৈরিক-মন্ত্রে প্রাণ-ঋকে নব উদ্বোধন
অকলংক শুভ্রচ্ছটা শান্তির দ্যোতনা, সুশ্যামল সবুজ জীবন ;
চক্রসম আবর্তিত নিত্য যাহা গতিশীল অনন্ত জগতে,
তারি চিহ্ন বুকে ধরি মানব প্রেমের জয়রথে
লয়ে যাবে এ জাতিরে নব নব চিত্তজয়ে জানি,
তোমারে তাই ত মোরা বহুমানে লইলাম মানি—
প্রাচ্য গৌরবের ওগো অসামান্য সুন্দর প্রতীক !
তোমার মর্যাদা লাগি কত বীর তরুণ নির্ভীক
আগ্নেয় অস্ত্রের বুকে পাতিয়া দিয়াছে নিজ বুক,
পুত্রহারা কত মাতা সয়েছে সে বজ্র শোক—সে দুঃসহ দুখ—
সন্তানের বীরত্বের কীর্তিগাথা স্মরি।
তোমারে বরণ তাই করি,
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ—নিনাদিয়া আনন্দ বিষাণ—
হে সুন্দর মনোহর জাতীয় নিশান !

অনুকুল বায়ুভরে আন্দোলিয়া রেখে যাক লিখে
ভুবন ভরিয়া দিকে দিকে,
এই নব পতাকার পত-পত্ প্রতি সঞ্চালন—
দেশের দশের কাজে উৎসর্গিল যাহারা জীবন,
ব্যর্থ নহে তাহাদের ব্রত।
অতীতের ইতিহাসে উৎকীর্ণ হইয়া আছে কত
তোমার সম্মান-রক্ষা অপূর্ব কাহিনী !
বিশ্বের সমর ক্ষেত্রে মৃত্যুপণে কতনা বাহিনী
রেখেছে তোমারে উচ্চে ধরি।
তাহাদের অবিনাশী কীর্তি কথা স্মরি'
যে পতাকা দিনু আজ উর্ধ্বাকাশে তুলি,
মর্যাদা তাহার যেন কভু নাহি ভুলি।

জাতীয় পতাকা নহে সৈনিকের করে ক্ষুদ্র এক তুচ্ছ ক্রীড়নক
রণক্ষেত্রে রচে ইহা বীরত্বের স্বর্ণ-ইতিহাস—অসামান্য শৌর্যের নাটক,
দেশের গৌরব আর জাতির সম্মান বিজড়িত এর প্রতি সূত্রটির সাথে।
এ পতাকা শোভে শুধু সত্যনিষ্ঠ বীর্যবান বাহকের হাতে !
এই পতাকায় লেখা—শহীদের শোণিত তর্পণ,

বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীর আদর্শ পূজারা—যেথা যত তরুণ সৈনিক—
এ গুরু দায়িত্বভার সবার বলিষ্ঠ স্কন্ধে আজ তারা হেসে তুলে নিক ;
সুগম্ভীর কণ্ঠে হোক এ সংকল্প মহাবাক্য মাতৃমন্ত্র সনে উচ্চারিত
"পৃথিবীর কোনো ভয়ে নাহি হয়ে ভীত—
দণ্ড এর উচ্চে যেন রাখিবারে পারি !"
দৃঢ় করি বজ্রমুষ্টি ধরুক ইহারে দুর্জয় যৌবনদৃপ্ত যত নরনারী,
বহিয়া চলুক এরে বিজয়-উল্লাসে ভুবনের দিকে দিকে আজ।
শিখুক করিতে শ্রদ্ধা ভারতেরে পুন—জগতের মানব সমাজ।
শান্তি প্রীতি সৌহার্দ্দ্যের অকপট বাণী প্রচারিয়া
বেঁধে দিক বিশ্ব আজ একতা বন্ধনে প্রেমের ঐশ্বর্যে ভরি দিয়া।
ভারত-পতাকা আজ এনে দিক ফিরাইয়া এশিয়ার গৌরব সম্ভ্রম
আসমুদ্র হিমাচলে কোটী কণ্ঠে উঠুক ধ্বনিয়া— 'বন্দে মাতরম্'।

কর্ম্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

কেন আমরা সব কিছুকে নিজের দিকে আঁকড়ে রাখতে চাই ? এ আমাদের অহঙ্কার। মাধ্যাকর্ষণ আছে ব'লে যেমন যা-কিছু সব পৃথিবীর বুকে আঁকড়ে আছে, খসে খসে পড়ছে না, আমাদের অহঙ্কারও সেই রকম আমাদের মাধ্যাকর্ষণশক্তি। কেন ভগবান অহঙ্কার দিলেন আমাদের ? না দিলেও তো পারতেন ? তাহলে তো কেউ আর নিজের জন্য অমন করত না, নিজের জন্য সঞ্চয় করত না, পরের ভোগ খর্ব ক'রে নিজের ভোগ বাড়িয়ে চলত না, সমস্তই পরার্থে নিবেদন ক'রে দিত। মঙ্গল তখন অবাধ হ'ত, ত্যাগে আর আপত্তি থাকত না।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এরকম ভাবা ভুল। ত্যাগের কোনো মানেই হয় না, অহঙ্কার যদি না থাকে, স্বার্থ যদি না থাকে। দান করার মানেই হয় না, আগে যদি অর্জন না করি। এ সংসারে এমন কি জিনিষ আছে যা মানুষের নিজের ? জল বাতাস আলো, গাছ এবং তার ফল, ভূপৃষ্ঠের এবং মাটির নীচের যত জিনিষ—সবই তো ভগবানের। তেমনি তো কাজও, কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। সব উপকরণ, সমস্ত কাজ যদিও ঈশ্বরের, যদিও তিনিই তাদের একমাত্র স্রষ্টা,—তবু তিনি মানুষকে এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন,—এ সব জিনিষ, এ সব কাজ একমাত্র আমার হলেও, এসব তোমার অর্জন করবার ক্ষমতা রইল। তিনি এই ঢালোয়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন—তুমি তোমার ইচ্ছার দ্বারা যাকে নিজের দিকে টেনে নেবে, সে জিনিষ, সে কাজ তোমারি হবে।

তাই দান করতে হ'লে আগে নিজের করা চাই। তৃষ্ণার্ত পথিককে জলাশয় দেখিয়ে দিলে তাকে কি জলদান করা বলে ?* জলাশয় থেকে যে-জল সংগ্রহ ক'রে এনেছিলে ঘরে, তা থেকে ভাগ দিলে তবেই তাকে বলব জলদান। নইলে জলাশয়ের জলও ভগবানের জল, তোমার ঘড়ার জলও সেই ভগবানের জল। আকাশের আলো দেখিয়ে তুমি কি বলতে পারো ঐ তুমি আলো দিলে, ঐ তুমি অন্ধকার দূর করলে ? ও আলোকে আগে তুমি নিজের তো করনি, তাই ওকে দান করবার অধিকার তোমার নেই। তুমি তোমার শ্রমের দ্বারা মাটি খুঁড়ে তেল এনে, বা তোমার সঞ্চয়ের দ্বারা সেই তেল খরিদ ক'রে, তাতে যখন অগ্নি সংযোগ করো, সে আলো তোমার হ'ল। নইলে সব আলোই তো ভগবানের, তোমার আমার আলো কোথায় ? তেমনি ধরো যে-কোনো একটি সৎকাজ। এটা করা না করা আমার ইচ্ছা। আমি তা করতে ইচ্ছা করতেও পারি, নাও পারি। যে মুহূর্ত্তে তা করতে ইচ্ছা করলুম, আমার মন ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রগুলিকে সেজন্যে নিয়োজিত করলুম,—তখন হ'তে সেই কাজ আমারি কাজ হতে থাকল, যদিও তা করছে ঈশ্বরের সৃষ্ট যন্ত্রগুলি। আমার যা কিছু সম্বল সবই ঈশ্বরের, কেবল ঐ ইচ্ছাটি ছাড়া। তিনি আমার এই ইচ্ছাটির ওপর হস্তক্ষেপ করেন না, একে তিনি কোনো দিন জোর ক'রে কেড়ে নেন না, ভিক্ষা ক'রে চেয়ে নেন।

নিজের দিকে টানবার, নিজের করবার এই যে ইচ্ছা,—তাকে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কার আছে বলেই ত্যাগ আছে। ত্যাগ করতে হলে আগে নিজের দিকে টানা চাই। তাই [illegible]

ভগবান বৃথা সৃষ্টি করেছেন একথা ভেবো না। যার অহঙ্কার নেই তার আত্মসংযম নেই, তার মনুষ্যত্বও নেই। মানুষ যে অহঙ্কারকে সমূলে বিসর্জন দিয়ে জড়পদার্থের সামিল হ'য়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, এ শিক্ষা গীতার শিক্ষা নয়,—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। অহঙ্কার যখন প্রবলাকারে মাথা দেবে, তার আয়োজন-উপকরণের সঞ্চয়কে যখন পর্বতাকারে পৃষ্ঠে বহন ক'রে আনতে থাকবে, তখন তোমার অপরের প্রতি ভালবাসা যেন প্রবলতর হ'য়ে সেই স্তূপীকৃত আয়োজনকে, পুঞ্জীভূত শক্তিকে পরের মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে,—এই শিক্ষাই গীতার। তাই গীতা বলেছেন, কর্মেই তোমার অধিকার,—কাজ করবে কি না করবে এ ইচ্ছাটি একমাত্র তোমারি ইচ্ছা। তোমার এই ইচ্ছায়, এই স্বাধীন ইচ্ছায় কারো হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা নেই। তোমার এই অধিকারকে, তোমার এই অহঙ্কারকে মনে মনে জাগিয়ে রেখো, ইচ্ছাশূন্য হ'য়ে, অহঙ্কারশূন্য হ'য়ে ইট পাথরের মতো জড়পদার্থ হ'য়ে যেও না, নৈষ্কর্মের অহঙ্কারশূন্য দগ্ধপথে তাকে বিলুপ্ত হ'তে দিও না,—তবেই তো ত্যাগের অধিকার, মঙ্গল করবার অধিকার পাকা হবে।

এখন, কোন্ কাজে মঙ্গল হবে, কোন্ কাজে অমঙ্গল, এ কেমন ক'রে জানব? কে তার নির্দেশ দেবে? নিঃস্বার্থ কাজই যে মঙ্গলের কাজ,—সব সময় এমন নয়। ভক্ত বলবেন যে কাজ ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাই মঙ্গল। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রেত যে কোন্ কাজ—এ নিয়ে এক ভক্তের সঙ্গে আর এক ভক্তের লাঠালাঠি বেঁধে যেতে পারে। বাজনা বাজিয়ে মসজিদের ধারে রাস্তা দিয়ে প্রতিমা নিয়ে গেলে মঙ্গল হয় কি অমঙ্গল—এ দুই সম্প্রদায়ের ভক্তদের বিস্তর লাঠালাঠিতেও আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হল না। এক সম্প্রদায়ের ভক্তরা মঙ্গলের জন্যে অসহায় বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মেরেছেন, দেবী-প্রতিমার সামনে শত শত নরবলি দিয়েছেন, শিশুসন্তানদের সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আর এক সম্প্রদায়ের ভক্তরা বিধর্মীদের মন্দির চূর্ণ করেছেন, ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি বলে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এ সব কাজকেই ভক্তরা ভেবেছেন ঈশ্বরাভিপ্রেত কাজ। এ সব কাজ নিঃস্বার্থ কাজ, কিন্তু মঙ্গলের কাজ নয়। স্বার্থ যেমন পরকে ঠকায়, নিঃস্বার্থতা তেমনি আপনাকে ঠকাতে পারে। আত্মপ্রবঞ্চনার মার থেকে মানুষকে বাঁচাবে কে? কোন্ পথে যে যথার্থ মঙ্গল, যথার্থ কল্যাণ, কে তা ব'লে দেবে?—মানুষের "দ্বন্দ্ব মোহ বিনির্মুক্ত" বুদ্ধি, মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধি, মানুষের বিবেক, মানুষের reason, যাঁরা বলেন প্রশ্ন কোরো না, তর্ক কোরোনা, কিছু জানতে চেয়ো না, শুধু চোখবুজে অন্ধ ভক্তিতে এই রকম ক'রে যাও, তাঁরা মানুষের বিবেককে মানেন না, মানুষের যুক্তি তর্ককে, জ্ঞানকে অস্বীকার করেন। এ পথ গীতার পথ নয়। গীতা বলেছেন, গহনা কর্মনো গতিঃ—কর্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়, কোন্ কাজ যে কিসে নিয়ে যায়, কোন্‌টিতে মঙ্গল আর কোন্‌টিতে অমঙ্গল, তা জানা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং—কোন্ কাজ করা উচিত সেটি বেশ ভাল ক'রে বুঝে দেখতে কর্ম নির্বাচনের পথপ্রদর্শক অন্ধ ভক্তি নয়, জীর্ণ কুসংস্কার নয়, মোহ ভ্রান্তি বা রিপুর তাড়না নয়,—বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ—ইন্দ্রিয়দের বড় বলা হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, মন ইন্দ্রিয়দের শ্রেষ্ঠ। আর সেই মনের চেয়েও বুদ্ধি বড়,—মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ। বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া—বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। পরমাত্মার নীচেই বুদ্ধির স্থান দিয়েছেন গীতা। অন্যান্য ইন্দ্রিয় মনেরই দাসত্ব করে, তাই ইন্দ্রিয়দের চেয়ে মন বড়। কিন্তু মন হ'ল "সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা" অন্তঃকরণ-বৃত্তি। মন একবার বলে এইটে করি, আবার বলে ঐটে করি। বুদ্ধি হল "নিশ্চয়াত্মিকা" অন্তঃকরণবৃত্তি। বুদ্ধিই স্থির ক'রে দেয় কোনটি করা উচিত। তাই বুদ্ধির স্থান এত উচ্চে নির্দেশ করেছেন গীতা, শুধু এক পরমাত্মার নীচেই। এই বুদ্ধিই হল সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

আর জ্ঞান কি? অসংখ্য দাহ্য বাষ্প বুদ্বুদের প্রজ্জ্বলনে যেমন উজ্জ্বল দীপশিখা, অসংখ্য তারকার সম্মিলিত জ্যোতিঃকণায় যেমন জ্যোৎস্না, অসংখ্য বিষয়ের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সমাবেশে তেমনি জ্ঞান। গীতা বলেছেন এই জ্ঞান অতি পবিত্র জিনিষ, এর মত পবিত্র আর কিছু ইহজগতে নেই—নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তাই গীতায় কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ হাতধরাধরি ক'রে চলেছে। তাই জ্ঞানীর এত আদর—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তং একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

"জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্"—গীতার মত, জ্ঞানী ঈশ্বরের আত্মস্বরূপ।

মঙ্গল যে কোন পথে আসবে, তা নির্দেশ ক'রে দেবে এই জ্ঞান। এত বড় অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক আর কে আছে? মানুষ কতবার ভুল করেছে, কতবার ঠকেছে, অবশেষে এই বিংশশতাব্দীর কূলে পৌঁছবার পথ থেকে এবার নিঃসংশয়ে বলতে আরম্ভ করেছে—reasonই একমাত্র নির্ভুল পথপ্রদর্শক। কিন্তু তার কত সহস্র বছর আগে সেই একই কথা বলে গেছেন গীতা। মানুষ তা একবার ভেবেও দেখেনি।

যদি কোনো কাজ নিয়ে মনে কোনোদিন সংশয় আসে, যদি কোনোদিন মনে কোনো দ্বন্দ্ব বাঁধে,—এই কাজে মঙ্গল, না ঐ কাজে মঙ্গল,—গীতা বলেছেন,—অজ্ঞানতা যদি পথ ভোলায়, তাহ'লে হে ভারত, জ্ঞানের অসি দিয়ে তোমার সেই ভ্রান্তিকে, সেই মোহকে, সেই অজ্ঞানতা, সেই সংশয়কে ছেদন ক'রে যথার্থ কর্মযোগে, যথার্থ মঙ্গল কর্মযোগে উঠে দাঁড়াও—

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

মেডী-ঈভ্যাল ব'লে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁরা শুনে আনন্দিত হবেন নিশ্চয়ই, কোনো ধর্ম সংস্কারকে, কোনো ধর্ম-যাজক বা পুরোহিতের প্রত্যাদেশকে, কোনো শাস্ত্রের বচন বা বিধিনিষেধকে গীতা এ সম্মান দেন নি—দিয়েছেন মানুষের সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত মোহমুক্ত বুদ্ধিকে,

সঙ্গে লড়াই ক'রে মরেন, সকল রকম মরচে-পড়া কুসংস্কার পুনর্জ্জীবিত করতে চেষ্টিত, তাঁরাও যেন ভুলে না যান—সকল মঙ্গলের একমাত্র অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক মানুষের মোহমুক্ত বিবেক, মানুষের জ্ঞান।

এই জ্ঞান, এ বুদ্ধি যদি নিজের না থাকে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

প্রণিপাতের দ্বারা, পরিপ্রশ্নের দ্বারা, সেবার দ্বারা সেই জ্ঞানকে জানো। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দেবেন।

এই জ্ঞান যাঁর হয়েছে, একটি সুন্দর লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। পাকা আমটিকে একগাছ সবুজ ফল পাতার মাঝে শুধু তার রঙ দেখলেই যেমন চিনে নেওয়া যায়, এও তেমনি। সে লক্ষণটি হচ্ছে এই—

যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।

সমস্ত ভূতগ্রাম নিজের আত্মাতে এবং ঈশ্বরে যদি দেখতে পাওয়া যায় তবেই বুঝতে হবে এই জ্ঞান লাভ হয়েছে।

এর মানে হল নিজের দিয়ে পরকে দেখাই আসল দেখা, নিজের দিয়ে পরকে জানাই আসল জানা। সকলের মধ্যে আমি আছি, আমাতে সবাই আছে, আমি এবং আর সকলে ভগবানে আছে,—এই জানাই হল শেষ জানা। নিজের দিয়ে যখন পরকে বুঝে দেখতে পারব, তখন তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার হৃদয় বিদ্ধ হবে। তোমার কষ্ট, তোমার শোক তখন আমারি কষ্ট, আমারি শোক। তোমার আনন্দে তখন আমারি আনন্দ। যে জ্ঞানে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয় সেই হ'ল বিশুদ্ধতম জ্ঞান। সেই জ্ঞানের চোখই ঠিক চিনতে পারে কোন্ পথ মঙ্গলের পথ। যে মানুষে মানুষে ভেদ করে, আপন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মমতাবলম্বীকে নিজের মনে করে আর অন্যান্য সম্প্রদায়কে পর ভাবে, নিজের জাতিকে বা বর্ণকে ভাল—আর ভিন্ন জাতি বা বর্ণকে ইতর মনে করে, সে তো মানব-দ্বেষী, সে তো অবিবেকী, অজ্ঞানী,—কোন্ পথে মঙ্গল আসবে সে কেমন ক'রে তা নির্দেশ করবে!

কী সুন্দর এই মঙ্গলের আদর্শটি, কী উদার, উন্নত এই মনোভাব! এই তো মানুষের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার পথ। এই আদর্শ গীতার, এই আদর্শ হিন্দুর, নইলে আবার কিসের হিন্দুত্বের বড়াই করি! এই সর্বজাতি সর্বমানবগত মঙ্গলই হিন্দুর শিবরূপে উপাস্য, এই বিশ্ব হিত হিন্দুর ঘরে ঘরে শঙ্কররূপে পূজিত। হিন্দুর শক্তি এই কল্যাণকারিণী শক্তি, তাই তিনি দশভুজা। আমাদের প্রপিতামহগণ তাঁদের প্রতিদিনের নমস্কারে এই কল্যাণতমেরই আরাধনা করেছেন, তাঁদের তপস্যা ছিল সর্বমানবের এই কল্যাণকেই অর্জন করার তপস্যা—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

কী অনির্বচনীয় এই নমস্কার! ঈশ্বরকে বন্দনা করেছেন তাঁরা সর্বমানবের কল্যাণতম রূপে,—সর্বমানবের কল্যাণকে অর্জন করার মানেই তাঁকে পাওয়া। এই কল্যাণেরও যেমন শেষ নেই, তাঁকে পাওয়ারও তেমনি শেষ নেই। তাই অনন্তকে এই প্রণাম।

হে মৌন মৃত্তিকা

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

তাদের প্রথম বিরোধের কাহিনীতে নূতনত্ব আছে বই কি! বাগানের একাংশের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে' ঠাকুরমা প্রস্তাব করলেন: লাউ লাগানো যাক। সত্যব্রত বাধা দিয়ে বলল: না, ফুলের গাছ এখানে হবে ভাল। আলো আছে, বাতাসও আছে।……

প্রথম বিরোধের ইতিহাস এখানেই শেষ।

দীর্ঘ দিন পর এ গল্পের দ্বিতীয় ও শেষ অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। ঠাকুরমা আজও বেঁচে আছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যাত্রা কর্লেন। কিন্তু তা শুধু মনে হওয়াই মাত্র। আবার তিনি উঠে দাঁড়ান। লাঠিতে ভর করে তিনি এগিয়ে যান। চাকরবাকরদের কর্ত্তব্য-চ্যুতির জন্য তিরস্কার করেন। বড় নাতির বউ সুবর্ণা এক এক সময় বিদ্রূপ করে বলে: তোমার কি মরণ নাই, ঠাকুরমা।

কাত্যায়নী বলেন হতাশার সুরে: কি করব ভাই? চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে বোধহয় নামটি মুছে গেছে, তাই…

লাঠিতে ভর করে কাত্যায়নী এ ঘর থেকে ও ঘরে, ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে পূজামণ্ডপে যান। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে সবাইকে তিরস্কার করেন এবং কিছু পরে নিজেই চুপ করেন।

সুবর্ণা জিজ্ঞাসা করলে: কি হল, ঠাকুরমা?

—আর হয়েছে! সংসারই ডুবে গেল!

সুবর্ণা মৃদু হাস্য করে বললে: সংসার ডুবে যাচ্ছে, ক্ষতি কি? তুমি ভেসে থাকলেই ত হ'ল।

ঠাকুরমা বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন: চিরকাল ভেসে থাকার বিদ্যাটা আমার জানা আছে। তাই, এত দিন গেল, তবুও ডুবলাম না।

তাঁর কথাটা ঠিক। জীবনের এতটা পথ অতিক্রম করেছেন তিনি, এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে এসে পৌঁছেচেন, কিন্তু পেছনের অনেকটাই তিনি আজ ঠাওর করতে পারেন না। পথে পথে এত রইল পদরেখা, ঘটনায় ঘটনায় এত রইল স্বাক্ষর, তবু যেন চেনা যায় না। তারা বলে, ঠাকুরমার ভীমরতি হয়েছে। হয়ত, তাদের কথাই ঠিক। নইলে, কাত্যায়নীর সামনে, অনেকটা তাঁর হাতের উপর দিয়েই যে এ সংসারে এত পরিবর্তন এল, তা' তিনি ঠেকাতে পারলেন না কেন? বাড়ুয্যে-বাড়ির গিন্নি-ঠাকরুণ রূপে এত কাল তিনি যে কর্তৃত্ব করে এসেছেন, তাও ত নিতান্ত ভূঁয়া ছিল না। বাংলা-দেশের এক বনেদী জমিদার বংশ তাঁর চোখের সামনে ধীরে ধীরে ক্ষুদে তালুকদারে পরিণত হল। পূর্ব পুরুষের প্রজা ছিল মিত্রবংশ, তারাই মাত্র কয়েক বৎসর আগে জমিদারীর অধিকাংশ কিনে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাঁর আঙিনার পাশ দিয়ে চলে গেল, তা' তিনি ঠেকাতে পারলেন না।

ম্যানেজারবাবুকে ডেকে বলেছিলেন কাত্যায়নী: মিত্তিরদের এ বাজনা বন্ধ করতে ব'লো।

ম্যানেজার অনায়াসেই বললে: এ হুকুম তারা মানবে কেন?

কাত্যায়নী উঠে বসলেন। তাঁর চোখ দুটি জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বললেন: মানবে না! এ কথার অর্থ? আমি বলছি, তাদের এ বাজনা বন্ধ করতে হুকুম দাও তুমি! ম্যানেজার মৃদুহাস্য করে সরে গেল। অগত্যা তিনি ডেকে পাঠালেন সুব্রতকে। অভিমান করে বললেন: ম্যানেজারকে হুকুম করলেম, কিন্তু সে কথাটা গ্রাহ্যই করল না।

সুব্রতর ঠোঁটের কোণে বিবর্ণ হাসি। আস্তেই বললে: ম্যানেজার আমাদের কথা শুনবে কেন? সে এখন মিত্তিরদের কর্ম্মচারী। মিত্তিরদের কাছারীতেই সে এখন

কাত্যায়নী কথাটি মেনে নিলেন না। কিন্তু প্রতিবাদও করলেন না।

কিন্তু এটা শুধু কাহিনীর প্রথম পর্য্যায়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দেখা গেল—পাল বংশের লোকেরা বাড়ুয্যেদের জমিদারীর বাকি অর্দ্ধাংশ নিলামে কিনে সদরে গিয়ে কাগজপত্র রেজিষ্ট্রি করে এল। সুবর্ণাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। জানতে চাইলেন: এ ছাড়া কি উপায় ছিল না?

সুবর্ণা অসহায় কণ্ঠে বললে: উপায় আর ছিল কোথায়? তাদের নগদ দশহাজার টাকা আমরা দেবো কোথা থেকে? তা' ছাড়া, তাদের ঋণ শোধ হয়ে যে বাকি কুড়ি হাজার টাকা ঘরে এল, আপাততঃ এটাই ত একটা লাভ!

জবাবের প্রত্যাশায় সুবর্ণা বৃদ্ধার দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য্য, সে মুখখানা একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সুবর্ণা সেই পাষাণমূর্ত্তির দিকে একবার তাকাতেই কাত্যায়নী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন: আপাতত এটাই লাভ! কিন্তু আজ থেকে জমিদারের পুত্রবধূরূপে তোমার পরিচয় যে শেষ হয়ে গেল, সে কথাটা তুমি ভেবে দেখেছ? বড় লাভ হ'ল এই যে, কোম্পানার আমল থেকে জমিদার বাঁড়ুয্যেরা কাল থেকে সামান্য প্রজা সাধারণের সামিল হ'য়ে পড়ল।

সুবর্ণাকে আর কিছুমাত্র বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি দরজায় খিল দিলেন। বহুদিন আর তিনি অন্দর-মহল থেকে বাইরে এলেন না। সত্যই ত, কি পরিচয় নিয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়াবেন। তা' ছাড়া, তিনি যখন বাইরে এসে দাঁড়াবেন, তখনই হয়ত মিত্তিররা বা পালরা কোন একটা অছিলায় শোভাযাত্রা নিয়ে তাঁরই আঙিনার পাশ দিয়ে চলে যাবে। লোকে ইসারা করে বলবে, বাঁড়ুয্যেদের দুরবস্থাটা দেখেছ?

কিন্তু তথাপি এক একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে তিনি বের হয়ে পড়েন। আঙিনা পার হয়ে তিনি দরোয়ানদের ঘরের পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ান। সেখান থেকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের ওধারে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের শ্যামল রেখা দেখা যায়। এককালে ঐ গ্রামের জমিদার তাঁরাই ছিলেন। কিন্তু গ্রাম ও হিজলবনের উপর দিয়ে

তিনি অকস্মাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বাঁড়ুয্যেদের সেকেলে দোতলা বাড়িকে লজ্জা দেবে বলে মিত্তিররা যে চারতলা বাড়ি তৈরী করেছে, বাঁড়ুয্যে বাড়ির গিন্নি হয়ে তিনি সেদিকে তাকিয়ে থাকলে কি বাঁড়ুয্যে বাড়ির বিগত পুরুষকেই লজ্জা দেওয়া হয় না?

তিনি ছুটে চলে গেলেন সেখান থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে বন্দী হয়ে রইলেন। এ সংসারে সকল দিক থেকে আসছে বিদ্রূপ, আসছে নিঃশব্দ ভর্ৎসনা, বিগত কালের ঐশ্বর্য্যের মৃত আলোকে একালের দৈন্য উলঙ্গভাবে ধরা দেয়।

আবার একদিন তিনি বের হলেন। সুব্রতর ছেলে সত্যনারায়ণ গরমের ছুটিতে আসছে আজ সহর থেকে। সারা বাড়িতে তা' নিয়ে হৈ চৈ চলছে। সবার সঙ্গে কাত্যায়নীও গিয়ে দাঁড়াল। কোম্পানির আমলের জমিদারের বংশধর আজ পায়ে হেঁটেই ইষ্টিসান থেকে এল। এটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। তথাপি বিশ্বাস করতে হ'ল। কাত্যায়নী তাকালেন ছেলেটির দিকে। মুখের আদর্শটি ঠিক পিতার মতই হয়েছে। হবেই ত। বাঁড়ুয্যে বাড়ির আভিজাত্য তাদের চেহারাতেই প্রকাশ। মিত্তিররা বা পালেরা টাকার মালিক হতে পারে। দোতলা, তিনতলা বা দশতলা বাড়ি তুলতে পারে। কিন্তু চেহারার এ আভিজাত্য তারা পাবে কোথায়?

সত্যনারায়ণ সারা গাঁয়ে ঘুরে এসে। বললে: অনেক পরিবর্ত্তন দেখলাম। বাস্তবিক, গাঁটিকে চিনে নিতে আমার কষ্টই হ'ল।

অন্যেরা কথাটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করলে, তেমন কিছু মন্তব্যও করলে না। কিন্তু বৃদ্ধা একপাশে মুখ ঘুরিয়ে আপন মনেই বললেন: হাঁ, পরিবর্ত্তন হয়েছে বৈ কি! মিত্তিররা বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির পাশ দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যায়! ধীরে ধীরে তিনি গেলেন সুব্রতর ঘরে। সামান্য দু একটি কথার উপর তিনি এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন। বললেন: বলছিলাম বা' সামান্য টাকা জমিদারী বিক্রী করে' পাওয়া গেল, তা' দিয়ে তোমরা আমার স্বামীর দোতলার উপর আরও অন্ততঃ তিনটি তলা খাড়া করে দাও। পালেদের চারতলার উর্দ্ধে আমার স্বামীর বাড়ির পাঁচতলা মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে, এ আমি দেখে যেতে চাই।

প্রস্তাবটি এমনই অসম্ভব যে সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু ঠিক সে সময় একটি স্প্রিংয়ের রেলগাড়ি হুইসেল দিতে দিতে এঘরে প্রবেশ করলে এবং তার পেছনে পেছনে সত্যনারায়ণও এসে হাজির হ'ল।

বৃদ্ধা অনুকম্পার দৃষ্টিতে যন্ত্রটির দিকে তাকালেন। বললেন: আমাদের কালে এসব বালাই ছিল না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে সত্যনারায়ণ বললে: আমাদের কালে আছে। "তোমাদের কালে ছিল না, আমাদের কালে আছে"—এই কথাটি দ্বারা ছেলেটি কি বিদ্রূপ করছে সে কালকেই, যে কাল মরে গেছে এবং যার প্রতীক হয়ে একমাত্র কাত্যায়নী বেঁচে আছেন? কিন্তু, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না এ যুগকে, এ যুগের মানুষকে। অকস্মাৎ রেলগাড়িটিকে খপ্ করে ধরে তিনি জানালার পথে ছুঁড়ে দিলেন এবং আবার কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

একটু পরে সত্যনারায়ণ জামা কাপড় পরে' বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই কাত্যায়নী তাকে বাধা দিলেন। জানতে চাইলেন: যাচ্ছ কোথায়?

—যাচ্ছি, একটা সভা আছে বিকালে। কাত্যায়নী বুঝতে পারলেন। সত্যনারায়ণ সহর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই এ বাড়িতে বহু লোকের আনাগোনা চল্‌ছে, তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। দৃঢ়ভাবে বললেন: কিন্তু, তুমি যে বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলে।

সত্যনারায়ণ কথাটিতে কান দিল না। তার পথের দিকে তাকিয়ে কাত্যায়নার দৃষ্টি কাঁপতে লাগল। সুবর্ণাকে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। বললেন: সত্য-নারায়ণকে বললুম, সবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলেদের মান থাকে না।

সুবর্ণা কৈফিয়তের সুরে বললে: ছেলেমানুষ, ওরা ও সমস্ত বোঝে না।

কাত্যায়নী চোখ দুটিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে দৃঢ়ভাবে বললেন: কিন্তু ওরা যে বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলে।

অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল প্রান্তরের দিকে। সেখানে বিরাট জনস্রোত দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতে বিচিত্র বর্ণের পতাকা, বিপুল ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে' তারা এগিয়ে আসছে। সবার সামনে প্রকাণ্ড একটি

পতাকা নিয়ে যে আসছে, সে সত্যনারায়ণ। কাত্যায়নী আর্তনাদ করে উঠ্‌লো। বললেন: তোমরা থামাও ওকে। বলো নীলরতন বাঁড়ুয্যের বংশধরদের পক্ষে বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা অন্যায়, অপরাধ।

কিন্তু মুহূর্মুহুঃ জয়ধ্বনির মধ্যে পতাকা আন্দোলিত করে' তারা এদিকেই আসছে। কাত্যায়নীর স্বামীর ভিটের আঙিনায় এসে তারা প্রবেশ করলে বুঝি।

কাত্যায়নী আসন ছেড়ে উঠলেন। জানালার ও প্রাচীরের প্রত্যেকটি ছিদ্রপথ তিনি বন্ধ করে দিলেন। তাঁরই স্বামীর ভিটিতে বাজে লোকরা পতাকা নিয়ে এসে দাঁড়াবে, বক্তৃতা দিবে, তা তিনি সইবেন কেমন করে? জীবনে আজ প্রথমবার তিনি মৃত্যুকে কামনা করলেন। বাইরে চলেছে জীবনের কলোচ্ছ্বাস, জনতার বুকে বিপুল তরঙ্গ। কিন্তু তার জন্য কী? কাত্যায়নী এবার মৃত্যু চান, তাঁর প্রথম ও শেষ মৃত্যু।

বাইরের বক্তৃতা শেষ হয়েছে, জয়ধ্বনিও হয়েছে নীরব। কিন্তু ভিতরের একটি নির্বাণ ও নিরন্ধ্র অন্ধকারে একটি ক্রুদ্ধ ফণিনী দংশনের জ্বালায় প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরছে।

গভীর রাত্রিতে কাত্যায়নী বেরিয়ে এলেন। কি যে করবেন, তিনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু প্রতিশোধ নিতেই হ'বে—আর কিছুর উপর না হ'লেও নিজের উপর, বাঁড়ুয্যে বাড়ির বিগত দিনের প্রতীকের উপর প্রতিশোধ নিতেই হবে। মন্দিরের দ্বারে এসে তিনি দাঁড়ালেন, বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে দেখলেন···এই যুগের উপর, এই সংসারের উপর, বাঁড়ুয্যে বাড়ির মৃত গৌরবের উপর তিনি প্রতিশোধ নিবেন। তিনি এগিয়ে গেলেন, দিলেন বৈঠকখানার পেছনের দিকে আগুন ধরিয়ে,—ছড়িয়ে দিলেন তা' উত্তরের দিকের ফুলের বাগানে। বাঁড়ুয্যে বাড়ি মুছে যাক্ লুপ্ত হয়ে যাক ইতিহাস থেকে, কোন দুঃখ তিনি করবেন না। অগ্নিশিখা প্রসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে তা দিকে দিকে। এবার তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

কাত্যায়নী এখনও বেঁচে আছেন। স্বেচ্ছাকৃত বন্দী জীবনে কেউ তাঁকে বাধা দেয় না। বদ্ধ কুঠুরীতে বসে তিনি ভাবেন শুধু সে দিনের কথাই—যেদিন পাইক বরকন্দাজরা সারারাত টহল দিয়ে বেড়াত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজাত—সেদিন কি আবার আসছে না? ফিটনে চড়ে' জমিদার বাড়ির ছেলেরা ইষ্টিশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পাড়ার লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে—এ কি নিতান্তই অসম্ভব?

বহু আশা করে তিনি জানালাটির সামান্য একটু খুললেন। হায়রে, এ তিনি করেছেন কি? তাঁর স্বামীর ভিটেতে আগুন দিয়েছেন তিনি—একে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন তিনিই! তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন, বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। বৈঠকখানার চিহ্নমাত্রও নাই, কতকগুলি ইট-পাটকেল ও ছাইভস্ম পড়ে আছে।

অকস্মাৎ একটি জিনিষ তাঁর চোখে পড়্‌ল। কাত্যায়নী সেটাকে টেনে তুলে নিলেন। নেড়ে চেড়ে দেখলেন ভাল করে', তারপর ছুঁড়ে দিলেন জঙ্গলের দিকে।

এটি তাঁর স্বামীর গড়গড়ার নল। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে সেটা গিয়ে পড়ল, বুঝা গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্য, অকস্মাৎ তাঁর চোখে জল নেমে এল।··· অনেক ইতিহাস, অনেক কথা, অনেক কিছু যা' মরে গেছে, যা' চলে' গেছে।

আবার ভস্মস্তূপের মধ্যে তিনি হাতড়ে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। কি যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি তা' জানেন না। একটা ভাঙ্গা বাক্স, কাত্যায়নী লাঠির ঠেলা দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হলেন দেখে, বাক্সের নিচে অনেকটা যায়গা জুড়ে কতকগুলি তৃণাঙ্কুর মাটি ভেদ করে আজ উঠে এসেছে। কাত্যায়নী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, লতা কি দুর্ব্বাদল, বুঝা গেল না। কিছু একটি নূতন ইতিহাসের আবির্ভাব, প্রাণের প্রথম কলরব।

কাত্যায়নী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ইচ্ছা হ'ল, সবাইকে ডেকে এটা দেখান। হবেই ত, এ মাটি যে বাঁড়ুয্যে বাড়ির, এ মাটি কোনদিন পোড়ানো যায় না। এখানে প্রাণের আমন্ত্রণ শুধু বিস্মৃত অতীতের সাক্ষী নয়, জাগ্রত ভবিষ্যতেরও।

কাত্যায়নী আবার অচঞ্চল দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

শূন্যপথে কলিকাতা—নাগপুর—বম্বে

"বিহঙ্গ"

২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৬। কুয়াশা-ঢাকা ক্ষতবিক্ষত কোলকাতার বুকের উপর দিয়ে রাত্রি ৪॥৹টার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে পৌঁছলাম। রাস্তাগুলি নিষ্প্রাণ, তার আলোগুলি মৃতের চোখের মত পাণ্ডুর, কিন্তু হোটেলের লাউঞ্জ আর পোর্টিকো তীব্র আলোর দ্যুতিতে উজ্জ্বল, প্রাণ-চঞ্চল। গভীর নিশীথ অবধি এই লাউঞ্জ নৃত্য-বিলাসিনীদের চটুল পদাঘাতে মর্ম্মরিত হোয়ে এখন ভ্রমণ-বিলাসীদের মিলন-কেন্দ্র হোয়েছে। সামনের রাস্তায় টাটা এয়ার লাইনের অভিজাত এ্যালুমিনিয়ম-বডি বাস অপেক্ষমান—লাউঞ্জের ভিতরে বাহিরে দামী শীতবস্ত্রে সজ্জিত সভ্রান্ত যাত্রীদল ক্ষিপ্র লঘুপদে ইতস্ততঃ বিচরণ কোরছে, কেউ বা ইতিমধ্যে প্রভাতী সংবাদপত্রে শেয়ারের বাজারের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। সকলের ওজন নেওয়া হোল ছাই রংএর সৌখীন ওজন কাঁটায়, মাল-পত্রগুলিও ওজন হোল। যাঁদের ওজন নির্দ্দেশিত ওজন সীমা লঙ্ঘন কোরল, তারা বিলাতী ওয়ালেট খুলে, নোট হেলা ভরে ছুঁড়ে দিল "কিলো" হিসাবে মাশুল। হাওড়া ষ্টেশনের কোলাহল নেই, সেই কুলীদের ছেঁড়াছেঁড়ি, কাজ এগিয়ে চলেছে বিদ্যুৎ-

মেরিণ লাইনস্—বম্বে

ঘড়ির মত। সকল যাত্রীকে একটা করে কুপন দেওয়া হোল, দমদম বিমান-ঘাঁটিতে চা-পানের জন্যে। ৫টা বাজতে ১০ মিঃ আগে বাসে ওঠার সঙ্কেত দেওয়া হোল। ঠিক ৫টায় আবছা আঁধারে বাস দমদম বিমান-ঘাঁটীর উদ্দেশে যাত্রা কোরল। যারা বাসে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে যেতে গররাজি, তারা নিজেদের লিমোশিন গাড়ী কোরে মাটীর উপর দিয়ে ৬০ মাইল স্পীডে দমদম বিমানক্ষেত্রে উড়ে গেল।

কাঁচের পর্দা ঘেরা আর নরম গদি মোড়া বাস যান্ত্রের গতিতে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে এসে পোষা বিড়ালের মত নিঃশব্দে দাঁড়াল। বাক্যহীন যাত্রীদল, সিগার, সিগারেট এবং পাইপ মুখে লঘু পদবিক্ষেপে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল।

বাইরে আঁধার ফিকে হোতে আরম্ভ হোয়েছে, বিমান-ঘাঁটীর প্রাসাদের ভিতর হাজার হাজার বাতি সূর্য্যকে ম্লান কোরেছে। কুপন দিয়ে প্রাতঃ চা খাওয়া হোল। গরম জল রং ফিকে হলদে, স্বাদ নাই। সকলেই মুখ চাওয়া-চাই কোরে নিঃশব্দে পেয়ালা নিঃশেষ কোরলেম।

কিছু সময় হাতে আছে। লাউঞ্জে ইতস্ততঃ বিচরণ কোরে বেরিয়ে পড়া গেল আমাদের আকাশ পাখীর উদ্দেশে। ডাইনে বাঁয়ে সোজা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে দর্শন পাওয়া গেল অবশেষে। বৃহৎ দুটী শাদা ডানা মেলে ক্লান্ত পাখী ওটী শান্ত চরণ মাটীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আহাঃ! আবার এখুনি যাত্রা হবে সুরু অসীম নীলাকাশে—

—কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কী পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও—

একজন ইউনিফর্ম্ম-পরা লোক নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন—শুধালাম এইটি কী বম্বে যাবে?—কিন্তু লোকজন দেখছি না কেন? তিনি ব্যস্ত ভাবে
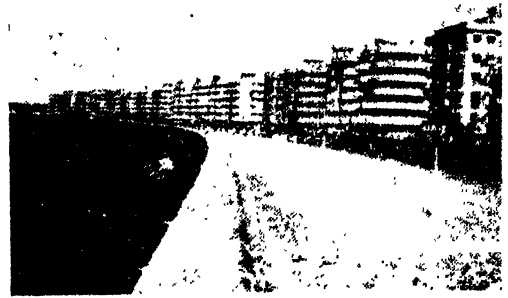
অপর একটি দৃশ্য···মেরিণ লাইনস্—বম্বে

বল্লেন—না, না, এটা Far East যাবে—বম্বের পাখী ঐ ঐ দিকে (হাত দিয়ে দেখালেন)—ছাড়ল বোলে।

কবিতা শুখিয়ে গিয়েছিল, পায়ের গতি তীব্র কোরতে হোল। ওভার কোট, গরম কোট, সোয়েটার ও গরম গেঞ্জীর তলায় দেহ ঘেমে উঠল, ঐ যে এসে পড়েছি, প্লেনের তলায় রং দেরওএর লোক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—এখনও দাঁড়িয়ে আছে—মাভৈঃ।

—ওরে বিহঙ্গ, বিহঙ্গ মোর,
অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা—

কিন্তু কাছে এসে বুকটা আবার ধ্বক করে উঠল। এঁরা যাঁরা দাঁড়িয়ে তাঁদের কাউকে হোটেলে বা বাসে তো দেখিনি—

—এটা কী বম্বে যাবে? জিজ্ঞাসা কোরলাম একজনকে।—

—না, না, এটা চায়না বাউণ্ড, ঐ যে ঐ দিকে বম্বের প্লেন এক্ষুণি উড়লো বোলে, দৌড়ুন।

ঘড়িতে দেখলাম, ৬টা বাজে বাজে, দৌড়ুতেই হোল। যাক এসে গিয়েছি। তখনও লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছে। আমরাও উঠলুম এবং ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্লেনের দরজা বন্ধ হোল।

ভিতরে পরিপাটী ব্যবস্থা। মাঝ দিয়ে কার্পেট মোড়া রাস্তা—দুদিকে বসবার সোফা। একটাতে গা ঢেলে দিলুম, সর্ব্বাঙ্গ আরামে ডুবে গেল। পাশে জানলা, কাঁচ দিয়ে মোড়া, সৌখীন নীল পরদা দিয়ে ঢাকা। পরদা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। প্লেনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোয়ে গিয়েছে, তার ৪টী ইঞ্জিন গর্জ্জন কোরছে। "Fasten your belt, please" কানের কাছে একটি সুমিষ্ট স্বর শুনলাম মুখ ফিরিয়ে দেখি

মেঘলোকে

একটি তন্বী তরুণী, নীল-সার্জ্জের পোষাক, মাথায় নীল বাঁকা টুপী, সুচারু মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে, সোফার সঙ্গে যে চামড়ার বেষ্টনী সংলগ্ন আছে তা যেন কোমরের সঙ্গে আটকে দেই। এরকম বেষ্টনীর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কৈশোরে কলেজ পালিয়ে যে জীপসীমথে শূন্যে চক্কোর দিয়েছিলাম—তাতে না ছিল সোফা, না কিছু কার্পেট মোড়া রাস্তা, না মাথার উপর আস্তরণ, তখন বাঁধতে হয়েছিল নিজেকে পিছমোড়া কোরে বসবার আসনের সঙ্গে, মাথায় পরতে হয়েছিল চামড়ার টুপি ও চোখে মোটা কাঁচের ঠুলী—

সুমিষ্ট স্বরে আবার ধ্বনিত হোল—আমি আপনাকে সাহায্য কোরছি। দুটি শুভ্র হাত, আঙুলগুলি নিখুঁত ম্যানিকিউর করা, ক্ষিপ্রগতিতে আমাকে বসবার আসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোমর বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে দিল। প্লেন এতক্ষণে Taxi অর্থাৎ মাটীর উপর দিয়ে দৌড়ুতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এবার হঠাৎ একটু মৃদু আলোড়ন—একটা ঈষৎ কোমল ধাক্কা, যা [illegible]

পর্য্যবসিত হোত, অনুভব কোরলাম। বাইরে চেয়ে দেখি শূন্যে উঠে গিয়েছি এবং মাটীর পৃথিবী দূরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। পূব আকাশে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে তপনদেব দৈনন্দিন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উপরে উঠছেন—ম্লান, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। নাই সেই বর্ণলীলার উচ্ছলতা যা দৃষ্টিগোচর হয় হিমালয় শিখর হোতে, নাই সেই চমকপ্রদ ত্বরিতগতি যা প্রতিবিম্বিত হয় সাগর নীলিমায়। আমাদের আকাশ-রথ এবার সূর্য্যকে পিছনে ফেলে পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে এগিয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণে আমরা ২০০০ ফিট উপরে উঠে পড়েছি—নীচে বাঁদিকে বালী ব্রিজ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী শুভ্র উপবীতের মত ধরিত্রীর বক্ষ বেষ্টন করে আছে। আমাদের রথ বাজ পাখীর মত ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠে অসীম নীলাকাশে দুটী শুভ্র পাখা বিস্তার করে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথের উপর দিয়ে রাজহংসের মত ভেসে যেতে লাগল। বাহিরে ৪টী ইঞ্জিনের বিকট গর্জ্জন কাঁচের পর্দ্দায় বারে বারে ব্যাহত হোয়ে ভিতরে মৃদু ম্লান গুঞ্জনে প্রবেশ কোরছে

মেঘলোকে

যেন ভ্রমরগুঞ্জনের একটানা গুরুগম্ভীর জীবন-ব্যঞ্জনা। নীচে, বহু নীচে সর্ব্বসহা বসুন্ধরা প্রাকৃতিক সম্ভার নিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছে। বিশাল বনসম্পদ, অফুরন্ত জলভাণ্ডার ছায়াছবির মত ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠে নয়নের অগোচরে আবার সরে যাচ্ছে।

এ যেন প্রকৃতিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নিরীক্ষণ করা, এ যেন তুচ্ছ অবহেলা ভরে উপর থেকে নীচে দৃষ্টিপাত করা, এ যেন দূরবীক্ষণকে উল্টে ধরে বড় জিনিষকে ছোট করে দেখা।

এবার ভিতরে নজর দিলাম। দেখি যাত্রীদল অধিকাংশই জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। কেউ কেউ বা ইতিমধ্যে কম্বলে নিজেদের ঢেকে, সোফায় যতটা শুয়ে পড়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা যায় তার

উপরদিকে সংশ্লিষ্ট তাকের ভিতর। আমাদের গরম বোধ হচ্ছিল, কম্বল তো দরকার হোলই না, উপরন্ত ওভারকোট ও গরম কোটও খুলে রাখলাম। প্লেনের ভিতর টেম্পারেচার control করা হয়, বাইরের হাওয়ার প্রবেশ পথ নিষিদ্ধ, কেবল মাথার উপর একটি সঙ্কীর্ণ যান্ত্রিক পথ দ্বারা ইচ্ছামত হাওয়া পাওয়া যায়। আবার বাইরে তাকালাম—আমাদের প্লেন দুটি রজত শুভ্র ডানা মেলে হংসবলাকার মত একভাবে উড়ে চলেছে। বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম—আমাদের উচ্চতা কত হবে? কতই বা গতিবেগ—একখানি সুদৃশ্য কার্ড সামনের আসনে উপবিষ্ট যাত্রিণীর নিকট থেকে চালান পেলাম। দেখি,—কার্ডখানা আসছে আমাদের পাইলটের নিকট থেকে, তাতে লেখা আছে আমরা তখন মধ্যপ্রদেশের ঝড়সুগড়ায় উড়ে যাচ্ছি, আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭৫ মাইল, আমাদের উচ্চতা ৫০০০ ফিট এবং আমরা শীঘ্রই পৌঁছিব নাগপুরে, ঠিক বেলা ১০টায়। কৌতূহল নিবৃত্ত হোল, বড় আরামবোধ হোল। কার্ডখানা পিছনদিকে চালান দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম।

বিমান হ'তে নাগপুরের দৃশ্য

এখনও মাটী দেখা যাচ্ছে, গাছপালার রং বোঝা যাচ্ছে। ভাবি—প্লেনের গতিবেগ এত শ্লথ কেন, উল্কাবেগে চক্ষের পলকে পৃথিবী পরিক্রমার আর দেরী কত? ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে উঠে চাঁদের দেশে যেতেই বা আপত্তি কী?

কানের কাছে আবার সুমিষ্ট কথা বেজে উঠল, আপনার কী ম্যাগাজিন চাই? Life? Esquare? Punch কিম্বা Tatler?

মুখ ফিরিয়ে দেখি আমাদের হষ্টেস্ একগাদা বিলাতী ও আমেরিকান সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা নিয়ে হাস্যমুখে দণ্ডায়মানা। ধন্যবাদ দিয়ে একখানি Readers Digest বেছে নিলাম। এবার মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে, টুপিটি বেঁকিয়ে, নয়নে ঝিলিক ফুটিয়ে হষ্টেস্ জিজ্ঞাসা কোরলেন—লজেন্স না টফি? অন্তরের গভীর কন্দরে লুক্কায়িত অনাদিকালের চিরন্তন শিশু যুগপত আনন্দ ও বিস্ময়ে রঙীণ লজেন্সের জন্য চীৎকার করে উঠলেও গম্ভীরভাবে বললাম টফি। মৃদু দেহসঞ্চালন করে গৃহকত্রী দুটী টফি আমার হাতে দিলেন। আবার ধন্যবাদ দিলাম এবং টফি দুটি গালে ফেলে Digestএর একটি সুরাসক্তের মনোরম কাহিনীর মধ্যে মনোনিবেশ করলাম। সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় তিনি লিখে গিয়েছেন কেমন করে সুরার মায়াজাল ছিন্ন কোরে সুরাকে তিনি নিজের দাস কোরলেন—নিজে সুরার দাস হোলেন না। আবার শরীরে একটি কম্পন, একটু শিহরণ অনুভব কোরলাম, প্লেনের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল Fasten your bolt please। এবার আর কারুর সাহায্য দরকার হোল না। নিজেই নিজেকে কোমর বেষ্টনীতে বেষ্টন করে বাইরে চেয়ে দেখি আমরা নাগপুরের উপরে এসে পড়েছি—নীচে বিস্তর ঘরবাড়ী ও কলকারখানা ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হোয়ে উঠছে, আমরা মাধ্যাকর্ষণের টানে হুহু করে নীচে নামছি। ঠিক ১০টায় আমাদের প্লেন মাটী ছুঁলো।

সকলেই নেমে দূরের একটা বাড়ী লক্ষ্য কোরে চলতে লাগলেন, অর্থাৎ দৌড়ুতে লাগলেন। আমাদের গৃহকত্রী ও পাইলটদ্বয় বাদ গেলেন না। বুঝতে কষ্ট হোল না ঐখানেই আছে, জীবন-বাঁচনের

আমাদের আকাশযান

সোনার-কাঠি, অর্থাৎ খাদ্য ভাণ্ডার ও পানীয় সম্ভার। আমরাও পিছু নিলাম। খানিকটা বেশ মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হয়, মাথার উপর মার্ত্তণ্ডদেব প্রায় মধ্যগগন থেকে মধ্যপ্রাদেশিক আগুন ছড়াচ্ছেন। যাক্, গিয়ে টেবিলে বসা গেল। নাগপুরি কলা আর কমলা লেবু টেবিলের উপর সাজানো আছে। অন্যান্য সকলের ইতিমধ্যে অর্দ্ধ ভোজন হয়ে গিয়েছে। আমাদের খাবারের প্লেটগুলিও বেয়ারা যন্ত্রচালিতের মত ধরে দিয়ে গেল, আমরাও বিনা বাক্যে ভোজনে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর আমরা সিগারেট ধ্বংসে মনোনিবেশ করলাম—এবং যেহেতু প্লেনে থাকাকালীন ধূমপান নিষিদ্ধ, সেহেতু অতীত এবং ভবিষ্যতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বর্ত্তমানকে ভস্মীভূত কোরতে লাগলাম।

১০।৪৫ মিঃ আমাদের প্লেন আবার গর্জ্জন কোরে নাগপুর ছাড়ল। আর নতুনত্ব নাই, নাই অজানাকে জানার আশঙ্কা আর উদগ্রীব কৌতূহল। Hostess আবার ঘুরে ঘুরে কাউকে Coffee কাউকে Sweet Drinks দিলেন। যাত্রীরাও বারে বারে (প্রয়োজন না থাকলেও) Toiletএ আনাগোনা কোরতে আরম্ভ কোরল। আরামপ্রদ

সোফা এবার যেন ক্লান্তিকর হোয়ে উঠছে। আমার দুই বন্ধু তাস খেলায় মনোনিবেশ করলেন। হষ্টেস্ তাঁদের এক প্যাকেট নূতন তাস দিয়েছেন।

বাইরে তাকালাম। মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যগগনে। আমরা এবার অনেক উঁচুতে উঠছি। এখন খণ্ড খণ্ড শাদা মেঘ পাল তোলা নৌকার মত আমাদের আশে পাশে ভেসে চলেছে। পাইলটের কার্ড থেকে জানা গেল আমরা বম্বে প্রদেশের 'ওকালা'র উপর দিয়ে যাচ্ছি, উচ্চতা ৮০০০ ফিট, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭৮ মাইল। মাথার উপর যান্ত্রিক পথ ঘুরিয়ে ৮০০০ ফিট উপরের হাওয়া মাথায় লাগালাম।

এবার আমরা প্রকৃত মেঘলোকে প্রবেশ করলাম।

নীচে ধরণীর চিহ্ন মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। দিকে দিকে সূর্য্য কিরণোজ্জ্বল নীলাকাশের পটভূমিকায় মেঘের বৈচিত্র্য অপরূপ মহিমায় ফুটে উঠতে লাগল। মেঘে মেঘে যে কল্পলোকের সৃষ্টি হোল, তাতে প্রতিফলিত দেখলাম—সর্ব্বংসহা ভারত মাতার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল ধ্যান-সুপ্ত বৃদ্ধ, অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গ...। হঠাৎ একটি বিশা মসীকৃষ্ণ ভয়াল-কালো মেঘের চাপ দৈত্যের মত হামলা দিয়ে আমাদে পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমাদের রথ দুলে উঠল, মনে হল শূন্য পথে পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মাঝে প্রবেশ করেছি, এমনিই অন্ধকার, কিন্তু নিমেষে দুটী শাণিত ডানার অভ্যাঘাতে এই কালো মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন ক আমাদের রথ আবার আলোর আলোকপুরীর মাঝে প্রবেশ কোরল।

বম্বের কাছাকাছি এসে পড়েছি, ঘড়িতে ১টা বেজেছে, আর বাকি ৪০ মিঃ। হষ্টেস্ বইগুলো ফেরৎ নিয়ে গেল। প্লেন অল্প অল্প নিচুতে নামতে আরম্ভ কোরেছে, একটু একটু দোলন লাগছে। দূরে পশ্চিম ঘাটের শৈলমালা দেখা যাচ্ছে। ১৷৩০ মিঃএ বম্বের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া হোল, প্লেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই পৌঁছে গেছে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় না চললে থাকবে না কোন মর্য্যাদা। কাজেই ১০ মিঃ এদিক ওদিক কোরে ১৷৪০ মিঃ আমাদের বিহঙ্গ বম্বে হতে ১৪ মাইল দূরে জুহুর মাটী ছুঁলো।

বাঁধ-ভাঙা

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী এম-এ

বর্ষার ময়ুরাক্ষী। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে শক্ত মাটির আস্তরণকে—তাই ঘটেছে স্তর-বিপর্যয়। তাই ভাঙনটাই চোখে পড়ে—ভাঙার প্রাবল্যে সংগঠনা বৃত্তিটা লোপ পেয়েছে কালিন্দীর।

পালেদের ভাঙা বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে ময়ূরাক্ষীর ধারে। সেখানেও ভাঙনের আস্তানা। বাড়ীটা এককালে বড় ছিল। কয়েক কাঠা জমী বাড়ীর সঙ্গে লাগোয়া—এককালে বুঝি বাগান ছিল। এখন সেখানে হেলে-পড়া বাড়ীটার ইঁট কাঠ ছড়ানো। সামনের দিকের মহলটায় খান তিনেক ঘর এখনো কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই বর্ত্তমানে পালবংশীয়দের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ মাথা গোঁজবার ঠাঁই। অধুনাতন অপ্রাচুর্য প্রাক্তন-প্রাচুর্যকে পরাভূত করেছে, তার নিদর্শন এ বাড়ীর সর্বাঙ্গে। আর অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের মতই এ বাড়ীতে লক্ষ্মীর গতায়াত নেই, কিন্তু মা ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টি আছে পুরোমাত্রায়। সর্বসাকুল্যে বাড়ীর জনসংখ্যা দশ। কর্তা চরণদাস ও গিন্নী মোক্ষদাসুন্দরী ছাড়া আটটি প্রাণী তাঁদেরই অপত্য, চরণদাস ও মোক্ষদাসুন্দরীর প্রতিনিধিত্ব। চরণদাসের আয় সামান্য, জমীজমার ধান। তাই দিয়ে ত আর এতগুলি প্রাণীর ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নয়। সুতরাং অবস্থাটা বেশ জটিল এবং করুণ। তার ওপর বড় ছেলে কৈলাসনাথ কলকাতার কোন কাগজের কলে শিক্ষানবীশ। তাকেও কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। বোঝার ওপরে শাকের আঁটি আর কি।

চরণদাসের বাড়ীর মাথায় ফ্ল্যাগষ্টাফ। হিসেবের মধ্যে প্রকৃতির বেহিসেবী খেয়াল। একটা অশত্থ গাছ বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে গৃহস্থের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে। তার মাথায় ব'সে কাক ডাকে। গাঙ চিল উড়ে এসে বসে, তারপরে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় নদীর বুকে। সেদিন সকালে হঠাৎ কৈলাসনাথ এসে হাজির। বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেল। খবর আছে, সুখবর। কৈলাসনাথের কাগজের কলের ম্যানেজার না কি বলেছে যে, আগামী মাস থেকে কৈলাসনাথের কাজ হ'বে, সে মাইনে পাবে। সারা বাড়ীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। তাই

ফিরিস্তি করতে ব'সে গেল তারা। মা মোক্ষদাসুন্দরী তুলসীতলায় হরির লুট দেবার কথা জানালেন তাঁর অন্তরের ঠাকুরকে। কর্তা চরণদাস ভাবেন, চরের জমিটা তা'হলে ফিরিয়ে আনবার একটা ব্যবস্থা হ'তে পারবে। বাড়ীর আবহাওয়া বেশ খানিকটা তাতিয়ে দিয়ে ফিরে গেল কৈলাসনাথ তার কলকাতার আলোহাওয়াশূন্য মেসের ঘরে।

বেচারী কৈলাসনাথ। জ্ঞান হ'য়ে পর্যন্ত সে দেখেছে একটানা দারিদ্র্য। কখনো স্বাচ্ছল্য সে তাদের ঘরে দেখেনি। তাই ছাত্রজীবনের 'পরে অকালে ছেদ টেনে দিয়ে সে কলকাতায় এসেছিল অর্থোপার্জনের চেষ্টায়। ঢুকেছিল একটা কাগজের কলে তারই গাঁয়ের ভটচাজ্জি ম'শায়ের সুপারিসে। কিন্তু পয়সা সে রোজগার করতে পারে নি এখনো। তাকে কাজ শিখতে হয়—বেগার দিতে হয়। কর্তৃপক্ষ তার পরিশ্রম অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করছে, কিন্তু কৈলাসনাথ তার ন্যায্য প্রাপ্য চাইলেই তাকে বলা হয়, তোমার অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে আমাদের কারখানার কোন কাজই হয় না। সুতরাং তোমায় পয়সা দেওয়া চলে না। নিরুপায় কৈলাসনাথ। সে নিজে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে এবং আরো সহ্য করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু তার বাপ, মা, ভাই বোনদের সে যে কিছু সাহায্য করতে চায়। তাদের দুঃখ অন্তত কিছুটাও লাঘব সে করতে চায়। কিন্তু সে তা' পারে না। রাতের গাঢ় আঁধারে খদ্যোতের আলো দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

তাই এবার যখন ম্যানেজার তাকে জানিয়েছিল যে আগামী মাস থেকে সে মাইনে পাবে, তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হ'বে, তখন সে ছুটে গিয়েছিল তার প্রিয়পরিজনদের মাঝে, তাদেরকে জানিয়েছিল এই সুসংবাদ। অবশ্য ম্যানেজার তাকে জানায়নি তার বেতনের পরিমাণ। তা' না জানাক্, তাতে কিছু আসে যায় না কৈলাসনাথের। যা-ই সে পাক্, তা'তে অন্ততঃ নিজের খরচটাও চলবে। তার বাবাকে আর কর্জ্জ ক'রে তা'কে টাকা পাঠাতে হ'বে না। কৈলাসনাথ নিশ্চিন্ত হল।

আসবার সময় মা বলেছিলেন কৈলাসনাথকে চিঠি দিতে। নিয়োগপত্র পেলেই যেন কৈলাসনাথ বেতনের পরিমাণ উল্লেখ ক'রে চিঠি দেয়। কৈলাসনাথ মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল 'তার করবো মা। 'টেলিগ্রাম করবো।' বেশী খরচের ভয়ে চরণদাস আপত্তি জানিয়েছিল, বলেছিল 'চিঠিই লিখো বাবা, তারে কাজ নেই।' কৈলাসনাথ ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল বাবার এই কার্পণ্যে। অন্ততঃ একটি দিনের জন্যেও কৈলাসনাথ তাদের দারিদ্র্য ভুলতে চায়। সেদিনটি তার নিয়োগপত্র প্রাপ্তির দিন। মায়ের চোখ এড়ায়নি পুত্রের এই ক্ষুণ্ণ মুখের ছবি। তিনি জোর ক'রে বলেছিলেন 'না, তারই ক'রো। চিঠি আসতে বড় দেরী হয়।' অগত্যা চরণদাসকে সময় দিতে হ'য়েছিল।

সে এক ঝড়ের রাত। সারা রাত ধ'রে ময়ূরাক্ষীর জলে সে কী উন্মত্ত তাণ্ডব! ভীষণ গর্জনে রাক্ষসী ভেঙেছে তার সীমারেখা, মাটির বুকে অনধিকার প্রবেশ করেছে। জল ঝরেছে, ঝড় ব'য়েছে—গোঁ গোঁ শব্দে নদীর বুক থেকে জোলো ঝড় ছুটে এসে ঘা দিয়েছে চরণদাসের জীর্ণ ঘরের দেওয়ালে। থর থর ক'রে দেওয়ালগুলো কেঁপে উঠেছে, বুঝিবা ভেঙে প'ড়ে যায়! এতদিনের খ'সে-না-যাওয়া চুণ বালি ঝরঝর ক'রে খ'সে পড়ে গেছে। ছাদের ফাটল দিয়ে অবিশ্রান্ত জলধারা গড়িয়ে পড়েছে ঘরের সব ক'টি প্রাণীর গায়ে। সবাই জেগে। দুঃখের বরষায় সে ধারাসম্পাত তারা নিঃশব্দে গ্রহণ করেছিল বিনা প্রতিবাদে। এতে তারা অভ্যস্ত। দুঃখ দিয়ে তাদের জীবন গড়া হ'য়েছে, তারা এত সামান্যতেই বিচলিত হয় না, অভিযোগ জানায় না অদৃশ্য দেবতার কাছে বা অদৃষ্টলিপির বিরুদ্ধে। তারা জানে, সে অভিযোগ কেউ শোনে না, কেউ তার প্রতিকার করে না। সবাই চুপটি ক'রে বসে থাকে গুটি-সুটি মেরে। বিছানাপত্তর সমস্ত ভিজে গেছে। মোক্ষদা-সুন্দরী কোন রকমে কোলের রুগ্ন ছেলেটাকে চরণদাসের জীর্ণ ছাতাটা দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছেন। ছেলেটার জ্বর এসেছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশী। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে কাশি; 'হুপিং কফ' বলেই মনে হয়। কারো গায়ের কাপড় শুকনো নেই। জীর্ণ পরিচ্ছদ ভিজে বিশ্রী হ'য়ে উঠেছে। সবাই তাকিয়ে আছে প্রভাতের প্রত্যাশায়। কখন হ'বে সকাল, কখন সূর্য উঠবে? কখন থামবে এই বিশ্রী জল আর ঝড়? তারা প্রতীক্ষা করে। তারা প্রহর গোণে।

সকাল হয়। নদীর বিস্তৃত বুকে থেমে গেছে ঝড়ের মাতন। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবু মাটি এখনো ভিজে।

সূর্য্য উঠছে ময়ূরাক্ষীর বুকে—জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি-মান কাশ্যপতনয়। প্রাণশক্তির উৎসমুখে স্ফরিত হয়েছে ভুবনে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়মন্ত্র। মোক্ষদাসুন্দরী তাঁর অঙ্গনে মেলে দিচ্ছেন গতরাত্রের বর্ষণসিক্ত ছিন্ন কাঁথা, আর কাপড়-গুলি। চরণদাস বার হ'য়েছেন মাঠের পথে জমি দেখতে। এমন সময় এল ডাক পিয়ন—চিঠি বিলির পিয়ন নয়, তার বিলির পিয়ন। মোক্ষদাসুন্দরী ছুটে আসেন। মহা মুশ্‌কিল। সই ক'রে যে তার নিতে হ'বে। তিনি ডাকতে পাঠান চরণদাসকে। নিশ্চয়ই কৈলাসনাথের চাকরীর তার এসেছে। খুশিতে তাঁর সারাটা মুখ ভ'রে ওঠে। দুঃখরাত্রির অবসানে তাঁর মুখেও দেখা দেয় তিমিরজয়ী আনন্দ—সূর্য। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পিওনকে ঘিরে ফেলে। তাকে ঘিরে কলরব করে। চরণদাস হন্তদন্ত হ'য়ে আসেন। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে সই ক'রে তিনি নেন টেলিগ্রামখানা। তার পরে খাম ছিঁড়ে পড়েন টেলিগ্রাম। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে আসে। মোক্ষদাসুন্দরী ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন তারের মর্ম। বুকভাঙা স্বরে চরণদাস বলেন 'কৈলাস মারা গেছে দাঙ্গায়। সে আর নেই।' তার কলের ম্যানেজার টেলিগ্রাম করেছে। মোক্ষদাসুন্দরী হঠাৎ ট'লে পড়ে যান। তাঁকে ধরবার আজ আর কেউ নেই। অদূরে নদীর বুকে বাঁধ ভাঙার শব্দ হয়। ডাক-পিওনটা অনেক দূরে চলে গেছে।

একটি মজার ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

কয়েকমাস পূর্ব্বে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ Magic Capital of the worldএর আমন্ত্রণক্রমে আমি কতকগুলি মৌলিক খেলা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের মুখপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি। তন্মধ্যে আলোচ্য খেলাটির ধরণে একটি খেলা ছিল; উহার নামকরণ করিয়াছিলাম Sorcar's Improved Think a-Name. এবং উহা আমেরিকায় সে-কাগজের ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকগুলি যাদুকরের নাম দেওয়া হয়—দর্শকগণ তন্মধ্য হইতে যে কোন একজনের নাম মনে করিলে তাহা বলিয়া দিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছিল। যাদুকরদের পত্রিকার জন্য উক্ত প্রবন্ধটি দেখিয়া বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় বাংলা ভাষায় প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নাম দিয়া একটি খেলা আবিষ্কার করিতে বলেন। তাঁহার সেই কথা শুনিবার পর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আলোচ্য সহজ অথচ সুন্দর খেলাটি আবিষ্কার করিয়াছি। খেলাটি Improved Think a Name জাতীয় হইলেও ইহা তদপেক্ষা অনেক নীচু দরের। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে খেলাটিকে ব্যবসায়ী যাদুকরের ন্যায় কঠিন পর্য্যায়ের করিলে আমার পাঠকপাঠিকারা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। বাধ্য হইয়া খেলাটিকে সহজ করিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত খেলাটির ন্যায় অত সুন্দর কৌশলপূর্ণ করা গেল না।

আপনার রাইটিং প্যাড হইতে সাতটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া উহাতে প্রদত্ত চার্ট অনুযায়ী নামসমূহ টাইপ করিয়া লইবেন অথবা সম্ভব হইলে সমান সাইজের পুরু কার্ডে ছাপাইয়া লইবেন। ছাপান কার্ড হইলে খেলাটি খুব ভাল হয়। প্রথম কার্ডটিতে নিম্নলিখিতভাবে একুশটি নাম ছাপাইয়া লইতে হইবে।

লেখক—যাদুকর পি-সি-সরকার

১। সজনীকান্ত দাস
২। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
৪। কণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৫। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৬। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৭। বুদ্ধদেব বসু
৮। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৯। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। অন্নদাশঙ্কর রায়
১১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। প্রবোধকুমার সান্যাল
১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪। প্রমথনাথ বিশী
১৫। গজেন্দ্রকুমার মিত্র
১৬। সুমথনাথ ঘোষ
১৭। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
১৮। বনফুল
১৯। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
২০। মনোজ বসু
২১। প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরবর্তী ছয়টি কার্ড নিম্নলিখিত কথাটি ছাপাইয়া লইবেন "আপনি যে সাহিত্যিকের নাম মনে করিয়াছেন তাঁহার নাম যদি এই কার্ডে না থাকে তবে এইটি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিন।" ইহার নীচে নিম্নপ্রদত্ত নামের লিষ্ট অনুযায়ী নামগুলি ছাপাইয়া লইবেন।

প্রথম কার্ড

সজনীকান্ত দাস
বুদ্ধদেব বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমথনাথ ঘোষ
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দ্বিতীয় কার্ড

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মনোজ বসু
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু
সুমথনাথ ঘোষ
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল

তৃতীয় কার্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সুমথনাথ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
বনফুল
মনোজ বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র

চতুর্থ কার্ড

কণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
সুমথনাথ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বনফুল
মনোজ বসু

পঞ্চম কার্ড

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বনফুল
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মনোজ বসু
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ কার্ড

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বনফুল
মনোজ বসু
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমথনাথ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বিখ্যাত তাসের খেলা, "রাণী গেল কোথায়?"
প্রদর্শনরত যাদুকর পি-সি-সরকার

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বপ্রথমে একটি কার্ডে একুশজন প্রখ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নাম লিষ্ট করা হইয়াছে ; এইটির নাম দেওয়া হইল key card যাদুকর ইচ্ছা করিলে এই কার্ডে নামের- পাশের এক, দুই, তিন প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যাগুলি না দিলেও পারেন। কাহার নামে কত ক্রমিক নম্বর তাহা মনে রাখিবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছে। মনে রাখা মোটেই কঠিন নহে প্রথম কলমে দশটি নাম পর পর আছে ; দ্বিতীয় কলমে পরবর্ত্তী দশটি অর্থাৎ এগার হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত আছে এবং সর্ব্বনিম্নের নামটি একুশ নম্বর। একটু ভাবিয়া দেখুন ক্রমিক-নম্বর

ছাপা না থাকিলেও অতি সহজে উহা গণিয়া বাহির করা যায়—মোটেই শক্ত নহে। কাজেই ক্রমিক নম্বর ছাড়া নামগুলি পর পর প্রদত্ত চার্ট অনুযায়ী ছাপাইয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। পরবর্ত্তী কার্ড ছয়টিতে প্রত্যেকটি পূর্ব্বোক্ত key card হইতে এগারটি করিয়া নাম ভাজিয়া ভাজিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। উহা এলোমেলো করিয়া সাজান হইয়াছে মাত্র।

প্রদর্শনকালে কোনই অসুবিধা নাই। যাদুকর প্রথমে key sheetটি দর্শকদের হাতে দিবেন এবং তাঁহাদিগকে ঐ একুশজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মধ্য হইতে যে কোন একজনের নাম মনে মনে ধরিতে বলিবেন। এরপর ঐটি নিজে ফিরাইয়া লইয়া অবশিষ্ট কার্ড ছয়টি তাঁহাদের নিকট দিবেন। প্রত্যেকটি কার্ডের উপরিভাগে লেখা আছে "আপনি যে সাহিত্যিকের নাম মনে করিয়াছেন তাঁহার নাম যদি এই কার্ডে না থাকে তবে এইটি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিন।" দর্শকগণ তদনুযায়ী কার্ডগুলির প্রত্যেকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া যেগুলিতে বাঞ্ছিত নাম পাইবেন সেইটি বা সেগুলি নিজেদের নিকট রাখিয়া বাকী কার্ডগুলি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিবেন। যাদুকর এইবার অনায়াসে দর্শকদের মনোনীত সাহিত্যিকের নাম বলিয়া দিতে পারিবেন।

পি-সি-সরকার কর্ত্তৃক ফিতা কাটিয়া জোড়া দেওয়ার খেলা

খেলাটির মূলকৌশল কিন্তু খুবই সহজ। দর্শকগণ যে কার্ডগুলি ফেরৎ দিবেন উহার কার্ডের নম্বরগুলি মনে মনে যোগ করিয়া যোগফল 'একুশ' হইতে বিয়োগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে key cardএ মনোনীত নামের উক্ত সংখ্যাই 'ক্রমিক নম্বর' হইবে। প্রত্যেকটি কার্ডের উপর প্রথম কার্ড, দ্বিতীয় কার্ড, তৃতীয় কার্ড প্রভৃতি ছাপান থাকে। যাদুকর ইচ্ছা করিলে প্রথম কার্ডে একটি পিনের ছিদ্র, দ্বিতীয় কার্ডে দুইটি পিনের ছিদ্র, তৃতীয় কার্ডে তিনটি পিনের ছিদ্র এইরূপ করিয়া রাখিতে পারেন। অথবা অন্য কোনরূপ চিহ্ন করিয়া রাখিতে পারেন। প্রকৃত কথা এই যে কার্ডের index number ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি বুঝিবার সহজ একটি উপায় রাখা ভাল। খেলাকে কঠিন করিবার ইচ্ছা না থাকিলে ঐ প্রথম কার্ড, দ্বিতীয় কার্ড, তৃতীয় কার্ড প্রভৃতি ছাপাইয়া লইতে পারেন। দর্শকগণ কার্ড ফেরৎ দিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর উহার কার্ড নম্বর যোগ দিতে থাকিবেন এবং অবশেষে যোগফল 'একুশ' হইতে বিয়োগ করিয়া key cardএ নামের ক্রমিক নম্বর পাইবেন।

উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন key card হইতে ১৫ নম্বর নাম গজেন্দ্রকুমার মিত্র মনে মনে ধরা হইল। ইহাতে দর্শকগণ দ্বিতীয় কার্ড ও চতুর্থ কার্ড ফেরৎ দিবেন। এক্ষণে যাদুকর (২+৪) দ্বিতীয় এবং চতুর্থ যোগফল ৬ সংখ্যাটি একুশ হইতে বিয়োগ করিয়া মনে মনে (২১−৬)=১৫ পাইবেন। তখন key sheet হইতে ১৫ ক্রমিক নম্বরের নাম গজেন্দ্রকুমার মিত্র মনোনীত হইয়াছে

পি-সি-সরকার একটি খালি বাক্স হইতে একটি প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা বাহির করিতেছেন

বলিয়া দেওয়া এবং key card হইতে উহা বাহির করা মোটেই অসুবিধার নহে। যদি কোন কার্ডই ফেরৎ পাওয়া না যায় তখন বুঝিতে হইবে যে ২১ হইতে কিছুই না (০) শূন্য বিয়োগ দিতে হইবে অর্থাৎ একুশ নম্বর নাম মনোনীত হইয়াছে। key cardএ একুশ নম্বর নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র মনোনীত হইয়াছে বুঝা গেল।

পোষ্টকার্ডের আকৃতিতে সাদা কার্ড কিনিয়া লইয়া প্রত্যেকটিতে ঐ নামগুলি টাইপ করিয়া লইয়া এই খেলা দেখান চলে। তবে ছাপাইয়া লইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। খেলাটি সহজ অথচ ভারী সুন্দর। আপনারাও অনায়াসে এইটি দেখাইতে পারিবেন। খেলাটি আমার আবিষ্কৃত একথা স্মরণে রাখিবেন। আমার যাদুকর বন্ধুরা প্রায়ই স্বীকার করিতে ভুলিয়া যান। ভবিষ্যতে অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে এইটি আমি আবিষ্কার করিয়াছি, তাঁহারা নহেন।

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৫

D. P. I.এর অফিস হইতে ফিরিয়া সুখলতা আপন কক্ষে সরাসরি গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার মাথার ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মনের ভিতরে যেন ঝড় বহিয়া সমস্ত অন্তর মথিত করিতেছিল।

সে যে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া আসিল? সেই বিতর্ক ও ব্যঙ্গ-হাস্যের উত্তাপে তাহার মাথার ঠিক ছিল না। জেদের সহিত সে স্বাক্ষর করিয়াছে। কিন্তু? কিন্তু তাহার বিবাহ যে স্থির হইয়া গিয়াছে? আর সে অবিবাহিত অবস্থায় স্কলারশিপ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবে বলিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল? রজত? আচ্ছা রজত কি ভাবিবে? কি ভাবে ইহা গ্রহণ করিবে? তাহার পর রজতের পিতা মাতা? তাহার নিজের পিতা মাতা? কিন্তু ম্যাকনীলের ওই ব্যঙ্গভরা মৃদু হাস্য ও বক্রোক্তি তাহার মনে যেন জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। যখন মৃদু লাস্য ভরে চিবাইয়া চিবাইয়া ম্যাকনীল বলিতেছিল "আমার ক্ষমা করো, কিন্তু আমার নিজেরো ধারণা যে বিবাহিত মেয়ে-ছেলেরা প্রায়ই স্কলারশিপের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে না। হয়ত সেইজন্যই এই ব্যবস্থা যে অবিবাহিত অবস্থায় স্কলারশিপ নিয়ে তবে যাবে। আমি অন্তরের সঙ্গে ইহা সমর্থন করি।"

ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সুখলতা স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিল "আপনি কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কি একে সমর্থন করছেন?"

"না মাদাম। তা না থাকলেও আমার দৃঢ়বিশ্বাস ইহা যথার্থ। আমার নিজের দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রাপ্ত করে আপনি উপার্জ্জনক্ষম হয়ে তার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। তাই এ রূল তাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমার মনে হয় এটা বিশেষ করে ভারতবাসীদের জন্য হয়েছে।"

সুখলতা বলিয়াছিল যে "আপনার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হচ্ছে।"

"আমি দুঃখিত মাদাম। তা অসম্ভব।"

ইহার পর দুই চারিটি বাক্য বিনিময় করিয়া ক্রুদ্ধা সুখলতা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল যে সে বিবাহ না করিয়াই স্কলারশিপ গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইবে।

রজত ব্যতীত কেহ সুখলতার কার্য্যকে সমর্থন করিলেন না। দুইটি পরিবারে অসন্তোষের ঝড় বহিয়া গেল যেন।

রজতের মাতা বলিয়াই ফেলিলেন "বিলেত না হয় নাই যেতে? কিম্বা বিয়ের পর তোমার সাধ মেটাতে না হয় আমি ঘর থেকেই খরচ করতুম না? এ কেলেঙ্কারীর চেয়ে সে ভাল ছিল।"

তাহার মাতা অনুরোধ করিতে লাগিলেন "ছেড়ে দে সুখ ও স্কলারশিপ ছেড়ে দে তুই। মেয়েমানুষের যা দরকার তার চেয়ে অনেক বিদ্যে তুই বেশী শিখেছিস। লোক হাসিয়ে এমন কাণ্ড করিস নি।"

কিন্তু সেদিন লোকের হাসি অপেক্ষা ম্যাকনীলের হাসি আরো মর্ম্মান্তিক বোধ করিয়া সুখলতা আপন জেদ বজায় রাখিয়াছিল। চুপ করিয়াছিল।

তাহার মৌন অসম্মতি দেখিয়া মাতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন "জেদের বশে তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস্। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন পরে তোকে অনুতাপ না করতে হয়।"

কেবল রাগ করিল না রজত। নীরবে সব কথা শুনিয়াছিল। তাহার পর বলিয়াছিল "ও যখন যাবেই, তখন যাওয়ার আগে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে ওর মন খারাপ করে দিচ্ছ কেন? বিয়েটা না হয় বন্ধ থাকলো, কিন্তু ওটা না হলে যে ওর সবটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওকে সুস্থ মনে যেতে দাও।"

তাহার পর তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়াছে। কতদিন সুখলতা জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তুমিও কি অসন্তুষ্ট হলে?"

রজত মৃদু হাসিয়া নীরবে থাকিয়াছে, অথবা বলিয়াছে "তোমার কি মনে হয়?"

সে প্রশ্নের আজিও সমাধান হয় নাই।

৬

তাহার পর তাহার বিলাত প্রবাসের দিনগুলি? অধ্যয়ন আর অধ্যয়ন। সমস্ত দিন ও রাত্রিগুলি যেন এক্সপেরিমেণ্ট ও অধ্যয়ন দিয়া ঢাকিয়া গিয়াছিল।

Electro magnetic, laws of causality fundamental equations. আইনষ্টাইন, বর শ্রোয় ডিঙ্গার, ভন্‌নয়ম্যান্। প্রামাণ্য থায়োরী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা, ও আলোচনা, ইহাই তাহার মস্তিষ্ক ও মনকে ব্যাপৃত রাখিত।

ব্রেকফাষ্ট সারিয়া সে ইউনিভারসিটির বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারে চলিয়া যাইত। লাঞ্চ কলেজেই সারিত। কাজ কাজ, ম্যাকনীলকে দেখাইতে হইবে। তাহার নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ পুরাইতে হইবে। ভারতীয় মহিলা বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী সুখলতা গুপ্ত। হায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ!

তাহার পর? তাহার সাধের সংসার আরম্ভ হইবে। রজতও দেখিবে সুখলতা শুধু দুর্লভ ছাত্রী নহে, দুর্লভ গৃহিনীও।

রজত? রজতের প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রেম ধ্রুবতারার মত অবিচল গতিতে বহিয়া তাহাকে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দিবে। রজতের কথা ভাবিয়া মন যত ব্যাকুল হয় তাহার অধ্যয়ন ততই প্রগাঢ় হয়। যত শীঘ্র থীসিস সমাপ্ত হইবে, ততশীঘ্র দেশে ফিরবো। সুখলতা আপন চিন্তা ও মনোভাবে লজ্জিত হয়। সবাইকার জন্যই মন কেমন করে, কিন্তু সবাইকে ছাপাইয়া রজত জাগিয়া ওঠে কেন? সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া যেন রজতের আসন পাতা হইয়া গিয়াছে। রজতের সুদর্শন আকৃতি, সুমধুর হাস্য, সপ্রতিভ বাক্যগুলি মনে পড়িয়া যায়। কর্ণের নিকট মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া ওঠে, ওগো প্রিয়া···

দুই বৎসর অধ্যয়ন, তাহার পর তাহার অধীত বিদ্যার পরীক্ষা। উঃ এখনও কতদিন। মধ্যে মধ্যে নিঃসঙ্গচিত্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে। সেই সময়টা অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকার্থীর সঙ্গ যেন তাহাকে শান্তি দান করে।

ডক্টর ম্যাকার্থী পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর। তাঁহার আন্তরিক সাহায্যদান, পিতার ন্যায় স্নেহ ও সুমিষ্টবচন তাহার স্বজনবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ক্লান্তমনকে যেন সঞ্জীবিত করিয়া তোলে।

আলোক তরঙ্গের গতি, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাখ্যা করিতে করিতে ম্যাকার্থী তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার সেই সময়কার মূর্ত্তি আজো যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসে—সৌম্য সাধক মূর্ত্তি।

প্রথম দিকে প্রতি মেলে রজত ও পিতামাতার পত্র আসিত, দীর্ঘপত্র। তাহার জন্য ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র। রজত লিখিয়াছিল "সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিও সু, তোমার মধ্য দিয়াই আমার ভ্রমণস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবে।" রজতের পত্র আসিলে সেইদিন ইংল্যাণ্ডের ঘোলাটে আকাশে বর্ষণসিক্ত দিন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বারম্বার পড়িয়া আশা মিটিত না। সেই সব দিন।

বৎসর ঘুরিবার সঙ্গে পত্রও বিরল হইতে লাগিল। সুখলতা ভাবিত একইকথা তাহারা বারবার কি জানাইবে? ক্রমে থাসিস লিখিতে আরম্ভ করিল। ম্যাকার্থী বলিতেন "তোমার থাসিস সবচাইতে ভাল হবে, তুমি কেবল পড়, আরো বেশী করে এক্সপেরিমেণ্ট কর।"

সফলতা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহারি আভাস ম্যাকার্থীর বাক্যে। সুখলতা অসীম আগ্রহে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অধ্যয়ন, অধ্যয়ন। হায়, অধ্যয়ন বিপুল বিশাল হইয়া তাহার জীবনকে আবৃত করিয়া দিল। রজত পত্র দিতেছে কিনা, মাতা কি লিখিতেছেন, কোনদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

মিষ্টার সিংএর সহিত সেই সময় তাহার পরিচয় হইয়াছে। ব্যারিষ্টার হইতে এবং সেই সঙ্গে ভ্রমণ সারিতে মিষ্টার সিং এখানে আসিয়াছেন।

সুখলতার সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটি সভায়। ক্রমে মিষ্টার সিং তাহার সেই পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। সুখলতা বুঝিয়াছিল যে হীরা সিং তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তবে সুখলতা হীরা সিংকে তাহা জানিতে দিত না। সে তাহাকে মিলিবার খানিক সুযোগ দিত। পাঞ্জাবের অধিবাসী হীরা সিং, শিখ—তাহার দেশের লোক—তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া খানিকটা তৃপ্তি হয় হোক্।

হীরা সিং কিন্তু তাহাকে যথার্থ ভালবাসিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ক্রমে গভীর প্রেমে পর্য্যবসিত হইতেছিল। সুখলতা হাসিলে, সুখলতা কথা কহিলে সে যেন আপনাকে কৃতার্থবোধ করিত।

৭

চরম দুঃখের দিন সেইদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যেদিন তাহারা বিশ্রাম এবং আনন্দের লোভে রোইং কম্পিটিশনে দর্শক হইয়া গিয়াছিল। ম্যাকার্থী তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রমের পর আমোদ প্রমোদে যোগ দিলে মনের খানিকটা বিশ্রাম হয়। সঙ্গে হীরা সিং গিয়াছিল।

গত কয় বৎসর কেম্‌ব্রিজ "ব্লু" হইয়াছে। সেজন্য কেম্‌ব্রিজের ছাত্র ছাত্রীগণের উল্লাসধ্বনির সীমা নাই।

টেমসের বুকে সারি সারি বাচের নৌকা দাঁড়াইয়া আছে। কিনারায় অসংখ্য নরনারী ভীড় করিয়া আছে। চীৎকার আনন্দ হৈ হৈ একটানা চলিয়াছে।

সুখলতা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল। কত ভারতবর্ষীয় ইহা দেখিতে আসিয়াছে। একটি যুবক কিছু দূরে রহিয়াছে, তাহাকে সুখলতার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। যেন তাহাদের সময়কার সহপাঠী। সুখলতা অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল "আপনি যেন বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে?"

বিস্মিত যুবক আনন্দিত হইয়া বলিল "হ্যাঁ আমি বাঙ্গালী, কলকাতা থেকে আসছি।"

ইহার পর পরিচয় অগ্রসর হইয়া গেল।

যুবকটি দুই মাস হইল আসিয়াছে, সে ইংলিশের প্রফেসার। ইংলিশ লিটারেচারের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া ডিগ্রী পাইতে আসিয়াছে।

ক্রমে পরিচয় হইতে হইতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে যুবকটি রজতের পরিচিত। রজতের সহিত পড়িয়াছে।

ইহার নিকট রজতের খবর পাওয়া যাইবে। রজত আজ প্রায় তিন মাস হইয়া গেল কোনও পত্রাদি দেয় নাই। হয়ত সুখলতার উপর অভিমান হইয়াছে, কিম্বা ব্যস্ত আছে কে জানে? মাকে লিখিলে তিনিও বিশেষ কোনও খবর দেন না আজকাল, ছোট ছোট পত্রগুলিতে কেবলমাত্র কুশল জিজ্ঞাসা থাকে, নিজেদের সংক্ষিপ্ত কুশলদান করেন। ইহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। সুখলতার সহিত রজতের যে সম্বন্ধ এ হয়ত তাহা জানে না। সুখলতা অসঙ্কোচেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। "রজতবাবুর খবর কি কিছু আপনি জানেন? তাঁর যেন পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল? তার কি হল? তিনি কেমন আছেন?"

ছেলেটি তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল "সে বড় দুঃখের ব্যাপার! আশ্চর্য্য অত বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু এবার আই-সি-এস পরীক্ষায় ফেলিয়র হল। ফিনান্স পরীক্ষায়ও ফেল করলো। তার পর বাপ মা জোর করে ধরলেন বিয়ের জন্য, বিয়েও করলো। এখন বেসরকারী কলেজে প্রফেসার হয়েছে। কিন্তু তার মত ছেলের পক্ষে স্যুট্ করবে ওরকম চাকরী? জীবনটা তার যেন কেমন একদিকে চলে গেল, বড় মন-মরা হয়ে গেছে।"

সুখলতা সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল "আর বিয়ের কথা কি যেন বললেন? বিয়ে ঠিক হয়ে আছে সেই কথা?"

ছেলেটি বলিল "হাঁ বিয়ে হয়ত আগেই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু চাকরী নিয়ে তবে বিয়ে করলেন। আর চাকরীটাও নিলেন যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, শুধু যেন বিয়ে করবার জন্য। অবশ্য বিয়ে হল খুব হাইফ্যামিলির······ওকি? আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?" ছেলেটি অগ্রসর হইয়া থামিল।

সুখলতা প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার পা দুটো—অবাধ্য পা দুটা বাধা মানে নাই, থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ছেলেটির ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে সে কি বলিয়াছিল মনে পড়ে না তার। তবে হীরা সিং সেই সময়ে তাহার পাশে উপস্থিত ছিল এবং তাহারি বাহুর আশ্রয়ে সে চেতনা হারায়।

জ্ঞান হইয়াছিল হসপিটালে, চোখ চাহিয়াই দেখিয়াছিল তাহার পাশে হীরা সিং রহিয়াছে। তাহার পর প্রবল জ্বর হয় ও চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ব্রেণ ফিবারে সে প্রায় একমাস শয্যাশায়ী ছিল।

সেই অসুস্থতার সময় সুদূর প্রবাসে আপনজনের অধিক হইয়াছিল হীরা সিং। তাহার উদ্বেগ, তাহার ব্যাকুলতা, তাহার সেবা ভুলিবার নয়।

ডক্টর ম্যাকার্থীও নিয়মিত তাহাকে দেখিতে আসিতেন।

ক্রমে রোগ সারিল। আচ্ছন্ন চেতনা জাগ্রত হইতে কিছু সময় লাগিল।

তাহার পর মাকে লিখিল এই বাক্যের সত্যতা নিরূপণ

করিতে। যে বাক্যের উপর তাহার ভবিষ্যত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে।

পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার রজতকে সে অবিশ্বাসী অপরাধী ভাবিবে?

মায়ের চিঠি যথাসময়ে সত্য খবর বহন করিয়া আনিল। "রজত পিতামাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অবশেষে বিবাহ করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুখলতার উপর তাহার পিতামাতা মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের অশেষ চেষ্টা প্রবল অনুরোধ ও চোখের জলে রজত বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে রজতকে দোষ দিই না। কতকাল সে অপেক্ষা করিবে? সবই অদৃষ্ট? রজতেরই বিশেষ অনুরোধে তোমায় খবর দেওয়া হয় নাই। তোমার পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া। যাহা হউক মন খারাপ করিও না। কত সম্বন্ধ এমন ভাঙ্গিয়া যায়। মন সুস্থ রাখিয়া পড়াশুনা করিয়া এস।"

বালিকা কন্যাকে মাতা সান্ত্বনা দিয়াছেন। সুখলতা পত্রখানা হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মায়ের চিঠির ওই লাইনটা যেন কর্ণে বাজিতেছে, "রজত আর কতকাল অপেক্ষা করিবে?"

আর সুখলতা? ওরে সুখলতা যে জন্ম-জন্মান্তরকাল ধরিয়া রজতের অপেক্ষা করিতে পারিত। রজত যদি বলিত অপেক্ষা করিতে, তবে সুখলতা যে শবরীর মত পথ চাহিয়া এ জীবনটা অনায়াসে কাটাইয়া দিত। তারপর পরজন্মে যদি চেতনা থাকিত তবে···ওঃ পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া খবর দিতে মানা করিয়াছে? দয়ালু! সহৃদয়! হৃদয়বান ব্যক্তি!

সর্ব্বস্বহারা বাঘিনীর ন্যায় অস্থির চঞ্চল পদে সুখলতা ঘরের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া নিরাশ হীরাসিং ফিরিয়া গেল। চক্ষের মনিকায় অগ্নি জ্বলিতেছে। হস্তে মায়ের পত্র দলিত পিষ্ট হইয়া ক্রমে ধুলার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল।

ধীরে লণ্ডন নগরীর জন কোলাহল স্তব্ধ হইয়া আসিল। গভীর রাত্রির নীরব নগরী যেন পরম সহানুভূতিভরে সুখলতার পানে চাহিয়া রহিল। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া যখন সুখলতা শয্যায় বসিল তখন তাহার আঁখির দাবদাহ শীতল করিয়া অশ্রুধারা নামিয়াছে। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া হাহাকার উঠিতেছে—একি করিলে রজত? একি করিলে; তুমি চিরকালের জন্য পরের হইয়া গেলে? বলে দাও—বলে দাও তুমি এ বিরাট শূন্যতা আমি কি দিয়ে পূর্ণ করবো? রজত বলে দাও।

৮

রোগের সময় হইতে হীরাসিং সুখলতার নিকট ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সুখলতা তাহার বন্ধুত্ব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া হীরাসিং তৃপ্ত হইয়াছিল।

রোগের আক্রমণ কাটিয়া গিয়াছে তবু সুখলতা এখনও সুস্থ হইতে পারে নাই। তাহার শীর্ণদেহ স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি হীরাসিংকে বিচলিত করিত। আপনার স্নেহ প্রীতির সান্নিধ্যে সে তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত।

ক্রমে কয়মাস কাটিল। সুখলতা এখনও লাইব্রেরীতে যায় না, পড়াশুনা করে না। ম্যাকাথা অনুযোগের সুরে বলিতে সুরু করিয়াছেন, তুমি একেবারে পড়ছ না মিস গুপ্ত, এইবার আরম্ভ কর। বেশী দেরী হলে তোমার লেখার link হারিয়ে যাবে যে।

মৃদু করুণ হাসি হাসে সুখলতা। কি প্রয়োজন? কি প্রয়োজন তাহার? আর প্রয়োজন থাকিলেও তাহার সে শক্তি কই?

হায় জীবনটাকে যদি আপনার হাতে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া নিঃশেষে শেষ করিয়া দেওয়া যাইত?

মনের অসহায় কাতর অবস্থার মাঝে একদিন হীরাসিং সহসা তাহার প্রেমভিক্ষা করিল।

হ্যাম্পষ্টেডহীথের একটা নির্জ্জন কুঞ্জের ভিতর একটা বেঞ্চে তাহারা বসিয়াছিল। শুনিয়া চমকিয়া চাহিল, কোন পরিচিত সুর ইহার কণ্ঠে বাজিল? কোন বিশ্বাস ভরা প্রেমপূর্ণ আঁখির চাহনী ইহার আঁখিতে ধরা দিয়াছে? না, না, তাহা কি হয়?

স্তব্ধ সুখলতা বসিয়া রহিল। হীরাসিংএর সপ্রেম নিবেদন বুঝি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল "এই তো প্রতিশোধের পন্থা রয়েছে? তুমি পার? আর আমি পারি না? যে আগুন জেলেছ তা যদি বাইরের হত, তবে একটা পৃথিবীকে অনায়াসে ছাই করে দেওয়া যেত, তবে?"

পূর্বপ্রকাশিতের পর

গেষ্টহাউসের ফটকের মধ্যে আমাদের গাড়ী এসে ঢুকলো। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ও বাগান-ঘেরা মহারাজার অতিথিশালা। সারি সারি প্রায় ৫০ খানি বাড়ী দু'থাকে সাজানো। বাড়ীগুলি সব ভারতীয় স্থাপত্য কলার আদর্শে নির্ম্মিত। সুন্দর সুদৃশ্য মনোমুগ্ধকর! ১২ ও ১৩ নং বাড়ী দু'খানি আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। গাড়ী গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই, লোকজন সব ছুটে এল। সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে তারা উপরে তুলে দিলে। আমি মণিব্যাগ বার করে কুলিভাড়া আর গাড়ীভাড়া কত দিতে হবে গুপ্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে গুপ্ত সাহেব বললেন—আপনারা হ'লেন 'ষ্টেট্ গেষ্ট' ...শনে নামা থেকে এখানে থাকা ...বং ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ...চ মহারাজা বহন করবেন। ...পনাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। গেষ্টহাউসের ...মেজার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। ...পনারা উপরে চলুন। কাপড় ...পড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে খেতে ...ন। খাবার সময় হয়েছে' ...ত্র ৯টা প্রায়। আশা করি ...পনারা কেউ নিরামিষ নন। আমি আপনাদের জন্য আমিষ খাদ্যের ...হাই করেছি। শুনে বাবাজী বললেন—...

গেষ্ট-হাউস অভিমুখে ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে আমরা উপরে গিয়ে উঠলুম। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই একটি ছাদে গিয়ে পৌঁছলুম। ছাদের দুপাশে আবার দুটি ছোট ছোট সিঁড়ি। এই দুটি সিঁড়ি দিয়ে গেষ্টহাউসের পৃথক দুটি মহলে যাওয়া যায়। বিজলী বাতীতে অতিথিশালার দুটি মহল ঝলমল করছে। ছোট সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠলাম দুধারের দুটি জাফরি-ঘেরা দীর্ঘ প্রশস্ত দালানে। দালানটি ...

বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোয় সুসজ্জিত। ঘরের মেঝের কারপেট বিছানো। সেই ঘরের এক ধারে সারি সারি তিনখানি খাট পাতা। ধবধবে বিছানা বালিশ সাজানো। আর একধারে বড় গোলটেবিল ও চেয়ার সাজানো। এককোণে লেখার সরঞ্জাম সমেত লেখার টেবিল চেয়ার পাতা। দেয়ালের গায়ে তিনদিকে তিনটি আর্‌শি আঁটা আছে।

বড় ঘরের পাশেই সংলগ্ন আর দু'টি ছোট ঘর আছে। একটিতে আমাদের মালপত্র রাখা হয়েছে দেখলুম। অপরটি একেবারে আর্‌শি

গেষ্ট হাউসের অলিন্দ ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেরাজ আলমারি বসানো সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম। ড্রেসিংরুমের সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাথরুম। কল আছে, বাথটব্ আছে। ওয়াশিংবেসিন, জগ, সোপকেস্ প্রভৃতি সাজানো মুখ-ধোবার টেবিল। এক কোণে উঁচু ষ্ট্যাণ্ডের উপর পানীয় জলের পাত্র রয়েছে। ড্রেসিংরুম ও বেডরুম সংলগ্ন মডার্ণ ল্যাভেটরী। সমস্ত সুব্যবস্থা দু'মহলে সমানভাবে রয়েছে দেখে আমরা তখনি মহল দু'টি ভাগ করে নিলুম। ডানদিকের মহলে থাকবেন মেয়েরা তিন জন এবং বাঁ দিকের মহলে পুরুষরা অর্থাৎ আমি ও শ্রীমান বাবাজী। ভোলানাথকে রাজভৃত্যরা ভৃত্য মহলে স্থান দিলে। ভৃত্যমহল আমাদের মহলের ঠিক নীচেই। কেবলমাত্র রাজ-অতিথিদের ভৃত্যরাই সেখানে ঠাঁই পায়। শ্রীমান ভোলানাথ একাই সেখানে রাজ্য বিস্তার করলেন।

মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে প্রস্তুত হ'তে না হতেই আমাদের নৈশ ভোজনের থালা এসে হাজির। হাঁ, রাজ-অতিথির যোগ্যখানাই বটে! পোলাও মাংস মৎস লুচি পুরী তরকারী, চাটনি, পায়েস পক্ষে সম্ভব নয়। দেখেই খুশী। গুপ্ত সাহেব আমাদের খেতে বসিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—কাল সকালে ৯টার মধ্যেই আসবেন। আমরা যেন শহর ভ্রমণে যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে থাকি।

আহারাদির পর গোলাপসুরভিত ঠাণ্ডা বরফ জল, ছাঁচি পান, সুপারী এলাচী মশলা এলো; আর এলো—প্রত্যেকের জন্ত এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি করে দেশলাই। মেয়েদেরও ম্যানেজার মশাই বাদ দেন নি। শুনলুম রাজপুত মেয়েরা নাকি অনেকেই ধূমপান করেন। সৌভাগ্যবশতঃ মদীয় যাত্রাসঙ্গিনীরা কেউই ওটা এখনো শেখেন নি। বাবাজী ও ধূমানন্দে বঞ্চিত। কাজেই সমস্ত সিগারেটের প্যাকেটগুলি একা আমারই ভোগে লাগলো।

আহারপর্ব্বটা আমরা একসঙ্গে মেয়ে মহলেই সারলুম। তারপর অনেকক্ষণ গল্প ক'রে রাত্রি ১১টা নাগাদ আমরা যে যার মহলে শুতে চলে গেলুম।

সকালে উঠে দেখি, চা এসে হাজির। তার সঙ্গে ডিম রুটি মিষ্টান্ন ও প্রচুর ফলমূল। প্রাতরাশের সদ্‌গতি ক'রে আমরা শহর প্রদক্ষিণের জন্ত প্রস্তুত হলুম। গুপ্ত সাহেব ঠিক সময়ে এসে হাজির তিনি মোটর নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের ল্যাণ্ডো জুড়িও সকাল থেকে দরজায় হাজির ছিল। মেয়েদের গুপ্ত সাহেবের মোটরে তুলে দিয়ে আমরা ল্যাণ্ডো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গুপ্ত সাহেব আমাদের 'গাইড ফিলজফার ও ফ্রেণ্ড' হ'য়ে নিয়ে চললেন।

প্রথমেই আমরা গেলুম মহারাজার নূতন প্রাসাদ দেখতে। চিত্তোর শৈল সরনীর উচ্চ পথে প্রায় তিনকোটী টাকা ব্যয় ক'রে যোধপুর মহারাজের এই নূতন প্রাসাদটি তৈরী হয়েছে। যে বিলিতী ইঞ্জিনীয়ার সাহেব এর নক্সা ক'রেছিলেন। তিনি এই পরিকল্পনার জন্ত মোট ফী নিয়েছেন ৭ লক্ষ টাকা। প্রাসাদ তৈরী হ'তে ১৭ বছর সময় লেগেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অদল বদল লেগেই আছে। এই সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর ধীরেন্দ্রনাথ এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্বাবধান করছেন। তাঁর কর্ম্মসংজ্ঞাই ছিল—"প্যালেস্ ইঞ্জিনীয়ার" সম্প্রতি তিনি ষ্টেট্-ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হ'য়েছেন। নিজগুণে তিনি যোধপুরবাসী সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। মহারাজা, যুবরাজগণ

পর্য্যন্ত গুপ্ত সাহেবকে চেনে জানে শ্রদ্ধা ক'রে এবং ভালবাসে। তাঁর সততা ও সদ্ব্যবহারে যোধপুরবাসীরা সকলেই মুগ্ধ। তিন কোটি টাকা যে প্রাসাদ নির্ম্মাণে ব্যয় হয়েছে তা' এই গুপ্ত সাহেবের হাত দিয়েই হয়েছে। ইচ্ছা করলে এই একটা কাজ ক'রেই লক্ষপতি হ'তে পারতেন তিনি, কিন্তু নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছাড়া তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না কারুর কাছে। এমন কি, ঠিকাদার ও মালসরবরাহকারীদের উপহার ও উপঢৌকন পর্য্যন্ত ফেরত পাঠান। এই দৃঢ় সংযম ও নির্লোভ চরিত্রের জন্ত তিনি সকলের সম্মানার্হ হয়েছেন। সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা আমাদের পরম স্নেহাস্পদা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সুযোগ্য অগ্রজ ইনি। সেদিক দিয়েও এঁ'র উপর আমাদের যে দাবীটুকু আছে, ইনি তা অস্বীকার করেন নি। যে ক'দিন আমরা যোধপুরে ছিলুম ইনি সহস্র কাজ ফেলে এমন কি অসুস্থা পত্নীকে একলা বাড়ীতে রেখেও দু'বেলা এসে আমাদের নিয়ে যোধপুরের চারিপাশের ২০।৩০ মাইল পর্য্যন্ত সেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে ঘুরে ঘুরে সমস্ত আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ তাঁর এই নবনির্ম্মিত রাজ প্রসাদের নাম রেখেছেন 'চিতোর প্রাসাদ'। চিতোর শৈল সরণী পরে নির্ম্মিত প্রাসাদের নামকরণ অতি সুন্দর হয়েছে। প্রাসাদটি দেখে আমোদের মনে হল একে রাজপুতের দেশের তাজমহল ব'ললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না, এমনিই অপূর্ব্ব সুন্দর অনুপম ও অপরূপ হয়েছে এই যোধপুরের "চিতোর প্রাসাদ।" যাঁরা 'তাজমহল' দেখবার জন্ত আগ্রা পর্য্যন্ত ছোটেন, আমি তাঁদের অনুরোধ করবো—আর কিছুদূর এগিয়ে এসে তাঁরা যেন যোধপুরের এই 'চিতোর-প্রাসাদ'—মরুভূমির বুকের এই অপ্রময় সৌন্দর্য অতুল একবার দেখে যান। প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে উপর নীচের সমস্ত কক্ষ ঘুরিয়ে মায় রাণীদের মহল, রাজারাণী ও রাজ-অন্তঃপুরের অধিবাসিনীদের সন্তরণ উপযোগী বহুমূল্য স্নানকুণ্ড পর্য্যন্ত, এমন কি প্রাসাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত বৈদ্যুতিক রন্ধনশালাটিও দেখিয়ে দিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেক ইঞ্চি থেকে যেন শিল্প ও সৌন্দর্য্যের পরম প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। ধন্য সেই অসামান্য স্থাপত্য শিল্পী, যাঁর উদার কল্পনায় প্রথম এই বিরাট প্রাসাদের ধ্যানরূপটি ধরা দিয়েছিল। বরোদা রাজ্যের "লক্ষ্মীবিলাস" প্রাসাদের পর এইটিই বোধ হয় দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদ বলে গৌরব করতে পারে।

এই প্রাসাদটি সর্ব্বাগ্রে দেখার ফলে—যোধপুর মহারাজাদের পূর্ব্ব প্রাসাদগুলি বড়বাজারের মাড়োয়ারীপটির ধনী বেনিয়া ব্যবসায়ীদের বাড়ীর চেয়ে বিশেষ উন্নত বলে মনে হ'ল না। যেমন 'রায়কাবাগ রাজপ্রাসাদ।' মহারাজ এখনও মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর 'রতনাদা রাজপ্রাসাদ'। 'রায়কাবাগ প্রাসাদ' তৈরী হবার পর মহারাজ এ প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। এ প্রাসাদটি এখন য়ুরোপীয় অতিথিগণ, অথবা বিশেষ কোনও রাজা মহারাজা যাঁরা যোধপুরে বেড়াতে আসেন তাঁদের অবস্থানের জন্ত নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক প্রাসাদটি মূল্যবান উপকরণে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত। প্রসাদ সংলগ্ন উদ্যানগুলি অতি মনোরম। রায়কাবাগ প্রাসাদের সন্নিকটেই যোধপুর রাজ্যের সামরিক সেনা-নিবাস। এখানে সর্দ্দার বাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনারা থাকে। 'যোধপুর ল্যান্সার'দের নাম সামরিক ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। রতনাদা প্রাসাদের সন্নিকটে মহারাজের বিরাট অশ্বশালা ও রথাগ্রয়। সারি সারি রকমারী ঘোড়া—মল্লানী, ওয়েলার, পোলো-পানি, রাইডিং ও রেস হর্স ইত্যাদি। রথাগ্রয়ে বর্ত্তমানে রথের পরিবর্তে অসংখ্য মূল্যবান মোটরগাড়ী রক্ষিত আছে। রোল্‌স-রয়েস্ থেকে সুরু করে বুইক, ল্যান্সেলার্ড, প্যাক উইলিস্ নাইট, ষ্টাওার্ড, শেভ্রলে, ফোর্ড 'ভি' এইট, উল্‌সলি, মরিস—কোনো দেশের কোনও মেকার ভালগাড়ী আর বাকী নেই। কোনটা টুরিষ্ট, কোনটা রেসিং, কোনটা লাইমোশিন, কোনটা ডি-ল্যাক্স্ সেডান। মহারাজের গ্যারেজত নয়, সে যেন এক বিরাট মোটর প্রদর্শনী। বাবাজী মহারাজের গ্যারেজ দেখে খুব খুশী।

যোধপুর দুর্গের নীচে প্রাচীন সহর

যোধপুরের মহারাজা ছিলেন স্বয়ং একজন উচ্চশ্রেণীর বিমান পরিচালক। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। তা ছাড়া যোধপুর রাজ্যই একমাত্র দেশীয় রাজ্য যেখানে ভারতের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বিমানঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। প্রধান একটি বিমানঘাঁটি ছাড়া আরও কয়েকটি বিমানাবতরণের উপঘাঁটিও এখানে আছে। এ ছাড়া যোধপুরে, দুটি প্রশস্ত 'পোলো গ্রাউণ্ড' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড়দের অত্যন্ত সুপরিচিত। মহারাজার নিজের 'পোলোটিম' বিশ্বের পোলো প্রতিযোগিতায় দিগ্বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল। মহারাজা স্বয়ং একজন অপরাজেয় পোলো খেলোয়াড় ছিলেন।

নাগোরিয়া গেট হইতে ফোর্টের দৃশ্য

ভারতীয় স্থাপত্য কলার যাকিছু পরিচয় তা যোধপুরের প্রাচীন রাজধানিতেই দেখতে পাওয়া যায়। নূতন শহর একেবারে বিলিতি ঘেঁষা। ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে রাঠোর বংশীয় রাজপুত সর্দার রাও যোধা স্বীয় নামে আরাবল্লী উপত্যকার মরু প্রান্তরে এই যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাইল ব্যাপী সুদৃঢ় উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত ও সপ্ত তোরণ দ্বার যুক্ত এই প্রাচীন রাজপুত নগর আজও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় চিহ্ন বহন করছে। নগরের সপ্ত তোরণ দ্বার সাতটি রাজপথের উপর নির্মিত। যে পথ দিয়ে নিকটবর্ত্তী যে নগরে যাওয়া যায় তোরণ দ্বার গুলির নামকরণ সেই সেই নগরের নামানুযায়ী হয়েছে। যেমন উত্তরে 'নাগোরিয়া'। পূবে 'মার্তিয়া'। দক্ষিণে 'সোজাতিয়া'। 'জালোরিয়া' ও 'শিবাঞ্চিয়া' তোরণ দ্বয় দক্ষিণ-পশ্চিমে। পশ্চিমে 'চাঁদপোল' তোরণ।
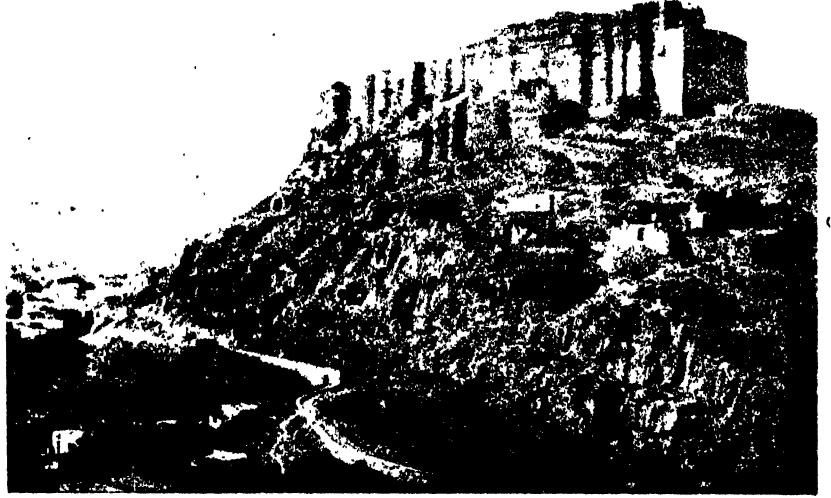
যোধপুরের প্রাচীন রাজধানী 'মান্দোর' পরিত্যাগ ক'রে রাও যোধাকে এই প্রাকার বেষ্টিত নগর প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল শত্রুর আক্রমণ থেকে নগর সুরক্ষিত রাখবার জন্য। 'মান্দোর' আক্রমণ করা অত্যন্ত সহজ ছিল, কারণ একেই নগরটি ক্ষুদ্র, তার উপর, এর চারিদিক খোলা। যোধপুরের বিখ্যাত দুর্গেরও নির্ম্মাণ কার্য্য ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

মোর গানখানি রেখে যাব
রাতের তারায় প্রিয়
ঘুম-ভাঙা-রাতে মোরে যদি পড়ে মনে
সেই গানে সাড়া দিয়ো॥
মোর হাসি র'বে ভোরের শিশিরে
একা পথে যবে যাবে তুমি ধীরে—
বনফুলে-ঝরা মোর হাসিটিরে
আনমনে চিনে নিয়ো॥

মোর বাণী রবে তোমার বীণার তারে
তোমার বুকে লাগিবে আমার ছোঁয়া
সাঁঝের অন্ধকারে।

প'ড়ে র'বে খেলাঘর খানি
হারাবেনা তবু মোরে, জানি—
এ জীবনে যত ভালবাসা দিয়ে গেনু
তারে তব সাথী করিয়ো॥
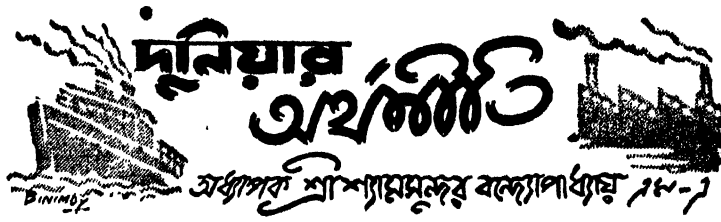
সঙ্কটে মুনাফাবৃত্তি

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের (অন্ততঃ মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির) পুনর্গঠনের নীতি নির্দ্ধারিত হইবে, এই ধরণের বহু বড় বড় কথা দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা শুনিয়া আসিতেছি। এই উদ্দেশ্য লইয়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার, ইউ এন আর আর এ (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনঃসংস্থাপন সমিতি), এফ এ ও (খাদ্য ও কৃষি সমিতি) প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রমাণ করিবার দিন আসিতেছে তখন অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে, সদস্যশ্রেণীর সচ্ছল ও শক্তিমান দেশগুলির উপর এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব অতি সামান্য এবং এই অক্ষমতার ফলে দুঃস্থ ও অসহায় সদস্য দেশগুলির দুর্দ্দশা বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষের অবস্থা বর্ত্তমানে এইরূপ। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর হইতে ভারতের খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা একটুও কমে নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতবাসী স্বতঃই আশা করিয়াছিল যে, এইবার অন্ততঃ সম্মিলিত জাতিসমূহের সহযোগিতায় তাহাদের দুঃসহ দুঃখের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংগঠিত হওয়ায় এইরূপ আশা করা অসঙ্গতও হয় নাই। কিন্তু অভাবগ্রস্ত ভারতবর্ষে খাদ্যপ্রেরণ এবং প্রেরিত খাদ্যশস্যের জন্য দাম আদায়ের নীতিতে যে অনাচারের প্রাবল্য চলিতেছে, তাহা আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যপ্রতিষ্ঠানের সুনামের পরিচায়ক নয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য ও কৃষিপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোর করিয়া বলা হইয়াছিল যে, সারা পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সমতা রক্ষা করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণ এই প্রতিষ্ঠানের নীতি। * ভারতবর্ষে কিন্তু অনটনের হিসাবে যে পরিমাণ পণ্য আমদানী হইতেছে এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ দক্ষিণা দিতে হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে উপরিউক্ত বাগাড়ম্বর অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

এ বৎসর খাদ্যশস্যের হিসাবে ভারতবর্ষের অভাব অন্ততঃ ৪৫ লক্ষ টন। বৎসরের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ইহার মধ্যে আবার মাত্র ২ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এই আমদানীর স্বল্পতা যে ভারতে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের অনুপূরক, একথা আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জানেন।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই জানা গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে সব দেশের রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত আছে, তাহাদের উপর চাপ দিলে ভারতের ন্যায় বিপন্ন দেশে অধিকতর পরিমাণ খাদ্যশস্য যে প্রেরণ করা যাইত না, এমনও নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেন্টিনায় শুধু মাত্র গো মহিষাদির খাদ্য হিসাবে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৫ লক্ষ টন গম ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার একাংশমাত্র পাইলেই বহুসহস্র ভারতবাসীর প্রাণরক্ষা হইতে পারিত (দেশে খাদ্যাভাব ঘটিলে সেই অভাবজনিত আতঙ্কে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইয়া অপচয় ও মজুতদারী যে বাড়িয়া যায়, একথা ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে নিষ্করুণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।) ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় উপরিউক্ত চারিটি দেশে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬৯ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে (৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টন হইতে ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টন), তথাপি এই দেশগুলি হইতে ঘাটতি এলাকায় রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৩৯ লক্ষ টন কমাইয়া ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি টনে দাঁড় করানো হইয়াছে।

এই তো গেল খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা। খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অসহায় ভারতবর্ষের উপর দিয়া বিভিন্ন দেশের যে মুনাফাবৃত্তি চলিতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। আর্জ্জেন্টিনা খাদ্যশস্যের দিক হইতে উদ্বৃত্ত দেশ। আর্জ্জেন্টিনায় এক বুশেল (প্রায় সাড়ে ন সের) গমের দর পৌনে এক ডলারের মত (২।৵০ আনার কাছাকাছি), অথচ এই গম আনিতে ভারতবর্ষকে ব্যয় করিতে হইতেছে প্রায় তিন ডলার। ব্রহ্মদেশ হইতে জাপবাহিনী বিতাড়িত হইবার পরও ব্রহ্ম হইতে ভারতে আমদানীকৃত প্রতি টন চাউলের দর ছিল ১৭ পাউণ্ড ১৭ শিলিং, ইহা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ২০ পাউণ্ড ৭ শিলিং ৬ পেনী হয়, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে প্রতি টন বর্ম্মী চাউলের জন্য উন্নত ও নিম্নশ্রেণীর হিসাবে যথাক্রমে ৩৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স ও ২১ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইতেছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২৮০ পাউণ্ডের প্রতি বস্তা গম ১ পাউণ্ড ১৪ শিলিং ৮ পেন্স দরে সংগ্রহ করিয়াছে, এই দর বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে ৪ পাউণ্ড ৮ শিলিংয়ে পৌঁছাইয়াছে। মার্কিণ

---

* "To develop and organise production, distribution and utilisation of basic food, to provide diets on a health standard for the people of the world and to stabilize agricultural prices at levels fair to the producers and consumers a-like."

যুক্তরাষ্ট্রকে গমের জন্য ভারতবর্ষ গত বৎসরের হিসাবে এ বৎসর শতকরা ২৫ ভাগ বাড়তি দাম দিতে বাধ্য হইতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, রপ্তানীকারক এই সব দেশের অযৌক্তিক মুনাফাবৃত্তিই এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ, যুদ্ধাবসানের পর এই সব দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এমন কিছু হয় নাই যাহাতে চলতি পণ্যমূল্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ভারতবর্ষের শোচনীয় খাদ্যাভাব ও আর্থিক পরিস্থিতির বর্ণনা করিয়া রপ্তানীকারক উদ্বৃত্ত দেশসমূহের উপরিউক্ত মুনাফাবৃত্তি সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। আবেগ ও যুক্তির দিক হইতে ডাঃ কাটজুর মন্তব্য মূল্যবান হইলেও এবং সাধারণভাবে (ভদ্রতারক্ষার জন্যই বোধ হয়) সম্মেলন এইরূপ মুনাফাবৃত্তির নিন্দা করিলেও সম্মেলনে উপস্থিত মুনাফাখোর দেশসমূহের সদস্যবৃন্দের উপর ইহা কোনরূপ প্রভাববিস্তার করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সংবাদপত্রের কাগজ

আধুনিক যুগে সংবাদপত্রের প্রয়োজন লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। ভারতবর্ষের ন্যায় বহু দিক হইতে পশ্চাৎপদ দেশেও সংবাদ-পত্রের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রের চাহিদা নিঃসন্দেহে আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজন বা চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও এ পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্র ছাপিবার কাগজের জন্য ভারতবর্ষ অসহায়ভাবে ফিনল্যাণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাহির হইতে আমদানী সঙ্কুচিত হইয়াছিল বলিয়া যুদ্ধের সময় এদেশে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের কলেবর কিভাবে কমানো হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। যুদ্ধাবসানের দু বৎসর পরে এখনো অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

কাগজশিল্পের দিক হইতে সাধারণভাবে ভারতবর্ষ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ এ পর্য্যন্ত যে এদেশে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হয় নাই, ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৪০ হাজার টনের মত নিউজপ্রিন্ট বা সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ আমদানী হয়। বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণনীতি চালু থাকায় এবং তজ্জন্য সংবাদপত্রাদির কলেবর সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও এই আমদানীতে ভারতবর্ষের চলিতেছে না। ঠিকভাবে কাগজ ছাপিলে ভারতবর্ষে এখনই বৎসরে ৮০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টন নিউজপ্রিন্টের প্রয়োজন হইতে পারে। অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনায় এই চাহিদা কিছুই নয়। বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন নিউজপ্রিন্টের প্রয়োজন হয়।

'নিউজপ্রিন্ট' শিল্পের ন্যায় বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দুঃখের বিষয় এদিক হইতে এতদিন তাঁহাদের বিশেষ কোন কার্য্যকরী আগ্রহ দেখা যায় নাই। অথচ বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতে 'নিউজপ্রিন্ট' উৎপাদনের উপাদানের অভাব নাই। কাশ্মীর ও গাড়োয়াল রাজ্যের একপ্রকার কাঠ হইতে এই শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় এবং দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে এই কাঠ লইয়া বর্ত্তমানে গবেষণা চলিতেছে। অনেকে এমনও মনে করেন যে সাধারণ কাগজ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান সাবাই ঘাস হইতেও সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রকাশ, হায়দারাবাদের একটি প্রতিষ্ঠান সাবাই ঘাস হইতে 'নিউজপ্রিন্ট' তৈয়ারীর সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

দেশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারী করিতে যে শ্রেণীর কাঠ (seruolia camoanaluta) লাগে, তাহা হইতেও বর্ত্তমানে নিউজপ্রিন্ট তৈয়ারীর কথা চিন্তা করা হইতেছে। এই কাঠ আন্দামান দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এক টন এই শ্রেণীর কাঠ (কলিকাতায় কারখানা হইলে) ১৫।১৬ টাকার মধ্যে আনান চলে। বলা বাহুল্য এই কাঠ সম্পর্কে গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হইলে 'ভারতীয় নিউজ প্রিণ্ট শিল্প'' দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিবে।

আনন্দের কথা, ইতিমধ্যে বোম্বাই-দিল্লী রেলপথের (জি-আই-পি) বারহানপুর-খাণ্ডোয়া লাইনের চাঁদনী নামক স্থানে প্রথম ভারতীয় 'নিউজপ্রিন্ট' কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার একশ্রেণীর কাঠ হইতে এই কাগজ উৎপন্ন করা যায় এবং এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বোম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিলিকৃত মূলধন লইয়া এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। (কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।) এই কারখানায় দৈনিক ১০০ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হইতে পারিবে।

এতদিন বিদেশী শাসনের অভিশাপে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য কোন সরকারী সমর্থন দেখা যাইত না; আনন্দের কথা, রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্ত্তনে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিরও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চাঁদনীর নিউজপ্রিন্ট কারখানা চালু করিতে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট নানা আশাতীত সুখসুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা এই কোম্পানীর ১০ লক্ষ টাকা মূলধন কিনিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কোম্পানীকে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যসম্পদ অবাধে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং, সবচেয়ে বড় কথা তাঁহারা কারখানার জন্য ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন উপযোগী একটি বৈদ্যুতিক কারখানা (Thermal power station) তৈয়ারী করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই কারখানা সংগঠনের ভিতর দিয়া ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় নূতন শিল্পের-তো জন্ম হইলই, সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে সরকারী সহানুভূতি

সেলাইয়ের কল

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক শুল্কনীতি পরিবর্ত্তনের ফলে যে কয়টি ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ সুবিধালাভে সমর্থ হইয়াছে, সেলাই-কল শিল্প তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রভূত সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিদেশী সেলাই কলের প্রতিযোগিতায় এদেশে তৈয়ারী কলগুলি এতকাল দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া এই সম্ভাবনাময় শিল্প এ পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। সরকারী সাহায্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করিয়া এই শিল্প যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতীয় সেলাই-কল শিল্পের পক্ষ হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে ট্যারিফ বোর্ড বা শুল্ক নির্দ্ধারক বোর্ডের নিকট সংরক্ষণ সুবিধালাভ সম্পর্কিত আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছিল। সুখের কথা, শিল্পটির ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুসন্ধানে সন্তুষ্ট হইয়া ট্যারিফ বোর্ড শিল্পটিকে সংরক্ষণ-সুবিধা দানে সম্মত হইয়াছেন এবং উপস্থিত বিদেশী সেলাই কলের উপর মূল্যানুযায়ী শতকরা ২৪ ভাগ শুল্ক সংস্থাপন করিয়া বোর্ড দেশীয় সেলাই-কল যাহাতে বাজারে সস্তায় বিক্রীত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বৎসরে ১৫ হাজারের মত সেলাই-কল নির্ম্মিত হয়। সংরক্ষণ সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যন্ত্রপাতির অসুবিধার জন্য আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় এই সংখ্যা একেবারে নগণ্য এবং দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি না হইলে এই শিল্পে সংরক্ষণ সুবিধা দান শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইবে। যোগান ব্যবস্থা নিয়মিত হইলে ভারতবর্ষে এখন বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজারের কাছাকাছি সেলাই-কলের চাহিদা আছে বলিয়া শুল্ক নির্দ্ধারক বোর্ড অনুমান করিয়াছেন। সুতরাং এই শিল্পের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে ভারতীয় সেলাই-কলগুলি উন্নত ধরণের হওয়া দরকার। সম্ভাবনাময় শিশুশিল্প হিসাবে সেলাই-কল শিল্প যে সংরক্ষণ সুবিধা পাইয়াছে তাহা একান্ত সাময়িক এবং কিছুদিনের মধ্যে এই শিল্পকে খোলাবাজারে বিদেশী কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। সংরক্ষণ সুবিধা বাতিল হইলে (অর্থাৎ সস্তায় বিক্রীত হইবার সুবিধা হারাইলে) ভারতীয় সেলাই-কল শুধু দেশী জিনিষ বলিয়াই বাজারে কাটিবে না। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবার পর ভারতবাসীর নিকট হইতে সমান পয়সা ব্যয় করিয়া খেলো দেশী জিনিষ কিনিবার আগ্রহ অবশ্যই আশা করা যায় না। এছাড়া শুধু উন্নত ধরণের কল তৈয়ারী করিলেই চলিবে না, মালিকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত ধরণের সেলাই-কল সরঞ্জামও বাজারে ছাড়িতে হইবে। এছাড়া জনসাধারণকে কলে সেলাই শিখাইবার ব্যবস্থার (বিদেশী কোম্পানীগুলির মত) ভারও তাঁহাদিগকে লইতে হইবে। মোটের উপর সেলাই-কল উৎপাদন, বণ্টন এবং কলে সেলাই শিক্ষাদানের ব্যাপক সুব্যবস্থা হইলে এদেশে একটি সমৃদ্ধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়া বহু সহস্র ভারতবাসীর অন্নসংস্থান হইবে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাওয়া বন্ধ হইবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের স্থায়ী আর্থিক স্বার্থের হিসাবে সেলাই-কল সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হইল, সংরক্ষণ সুবিধা-প্রাপ্ত প্রায় সর্ব্বপ্রকার ভারতীয় শিশুশিল্পের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিনোদ বাসায় ঢোকবার আগেই হাসির হল্লা পেয়ে বুঝলেন—কালাচাঁদ খুড়ো এসে গেছেন, মাণিকের সঙ্গে হাসি তামাসা চলছে। চিন্তা যথেষ্টই সঙ্গে করে ফিরেছিলেন, তাদের বাইরে রেখে, মুখে হাসি নিয়ে বাসায় ঢুকে পড়লেন! "আঃ বাঁচলুম, সাহেব এখনো বলেন—চা খাবে?"

খুড়ো বললেন—"আরে ও তোর জাত সাহেব নয়, সিভিউল ক্লাসের সাহেব। জন্মটা গেল ওই জন্ত চরিয়ে। বিলিতি সাহেব না হলে আবার সাহেব! আসল সাহেব চোখ লাল ক'রে খিঁচিয়ে থাকবে, বাপ বলতে শালা বলবে, yes বলতে No বলবে cloth Carrier জীবদের মত সুমধুর আওয়াজ দেবে, ঠিক কাজ করলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেবে,—তবে না সাহেব! কেবল চা খাও। কোনো মিত্রা বলেন না—দুটো রসগোল্লা খাও। তার পয়সা যে আমাদের ময়রা পাবে, এ দেশেই থাকবে! আমরাও বেশ নিশ্চিন্তে আর নিঃস্বার্থে পরের উপকার করে যাচ্ছি—এক পেয়ালা চা বইতো না। তা'তে lipton-এর কিছু বাড়েতো বাড়ুক না। উদারদের দেবার দয়া"—

বিনোদ—"আমরা কি আর কিছুই করছি না খুড়ো! কিছুই কি বাড়াচ্ছি না—বাড়ছে না?"

খুড়ো—"বেইমানী করব না—বাড়াচ্ছি বই কি, বাড়ছে বইকি। সাহিত্য বেশ কোমর কষে কলম পিষছে দেখছি। তার দয়ায় দশ দিক থেকে "শারদীয়া" বেরিয়ে আসছেন—তাদের সংখ্যাও লম্বা বাড়াচ্ছে, কিছু বাড়ছে বইকি। পাতা ওলটালেই পাঁচিলী পশ্চিমিতি পীরিতি

বাড়ায়! পারিপার্শ্বিক তার অগ্রজরূপে পূর্ব্বেই পৌঁচেছেন। 'দৃষ্টিকোণ' ক্রমে কোনঠাসা করছে, প্রায় কুষ্টির মতই মিষ্টি।"

শুনে সকলে হাসলেন।

খুড়ো বললেন—"এটা বোধহয় বাড়াবাড়ির দিন, বিনোদেরও কিছু বেড়ে থাকবে—আমাকে বললে—অনেক কথা আছে। কথা থাকবে বইকি—বাঙালীর কথাই বাড়ে। বাসাটি দেখছি খুব সুন্দর অগিল—দোরে খিল দিতে হয় না।"

বিনোদ—"বাড়ীর প্রমাণ নাকি—খিল না থাকা? উল্টো কথা হোল যে।"

খুড়ো—"একটুও নয়, খুড়ো উল্টো কথা কন না। তুমি জান না—সেকালে ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক বড় ছিল না, এখন হয়েছে—গলিতে গলিতে—খানাভাবে গোয়ালেও। লাক্ টাকার লোকেরা অর্থাৎ বড় লোকেরা তখন 'পাক্' রাখতেন—যাদের 'লেবেল' বলা হয়। তাদের first condition থাকতো—'বাড়ির সব দরজা খোলা রাখতে হবে, তবে থাকবো, খিল দিতে পারবেন না।'—'সে আবার কি, তোরা থাকবি কোথায়?'—পাকেরা বোলতো— যেখানেই থাকি না, তাতে আপনার দরকার কি? সেটা কারুর না জানাটাই নিরাপদ। ভেতরেও থাকতে পারি, বাইরেও থাকতে পারি। কেউ না বোঝে—কোথায় আছি। তাতে মাথা গলাতে কেউ সাহস পাবে না। তারাও মানুষ, তাদেরও প্রাণের ভয় আছে।—বিনোদেরও তাই নাকি?"

"আজ্ঞে না। আমার খিল নেই বলেই খোলা থাকে।—ডাক্তারেরা খিল দেবে কেনো, তারা Bill দেয়। খুড়ো বললেন—তবে নির্ভয়ে থাকো। ভয়তো মানুষকে হে, তাদের বা আমাদের চেয়ে ভীষণ জীব আবার কে? তোমার এ qualified castleএ রাতে কেউ ঢুকবে না, লোকের ভূতের ভয়ও তো আছে!"

মাণিক চা দিয়ে গেল। খুড়ো বললেন—"আচ্ছা এইবার তোমার বলার কি আছে বলো।"

বিনোদ তখন সাহেবের সঙ্গে তাঁর যা যা কথা হ'য়েছিল যথাযথ সব খুড়োকে বললেন। পরে বললেন—আমার যে বিপদটা ছিল তা হয়তো কেটে গিয়েছে বা যাবে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। তার ব্যবহারে মনে হয় সে আমাকে সত্যকার শ্রদ্ধা সম্মান ও ভক্তি করে। আমাকে আশা দিয়ে বলেছিল—"কোনো ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার মন্দ হ'তে দেব না।"—আমার মাথা নেবার ভার নিয়ে যে এসেছিল, পরে নিজের মাথা দেবার ব্যবস্থা সে করে কেন?—কোন স্বার্থের আশায়? নিজেই যদি গেলুম তার পর তার স্বার্থই বা কোথায় থাকে? আত্মরক্ষার চেয়ে বড় কিছু আছে কি?

খুড়ো বললেন—"ওটা এখন মরা কথা। ওর আর importance কি? নাই বা মিছে মাথা ঘামালে।"

"না খুড়ো। অতবড় দুর্বৃত্তের কথায় বিশ্বাস করা আমার উচিত কি। সাহেবের কথামত এখান থেকে সরে গেলেই যে এদের হাত থেকে রেহাই পাব তারই বা ঠিক কি? যুধিষ্ঠিরের আমার প্রতি এ অতিভক্তিই বা কেন?"

খুড়ো বললেন—"জ্ঞানের কথা আর বাড়িয়ে কাজ নেই, সহজ কথাই ভালো। এবার তার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারাদি দেখে শুনে, তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আমি নিজেও আশ্চর্য্য হয়েছি। সে এখন অনেক কিছু ভাবে, আনমনাও থাকে। তাতে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন বাদ না গেলেও, ঘাঁটাঘাঁটিটা মকুব হতেও পারে। সে নিজেই আমাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছে, তাতে বুঝলুম—সে তোমাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছে ও বোঝবার চেষ্টা করেছে। অবশ্য ঐ কাজের জন্যে সে তো এসেইছিল, সুতরাং তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাকে তা বলার কারণ আমি ঠিক করতে পারিনি। সম্ভবত তার বিপন্ন অবস্থায় বিশেষ সেবা যত্ন করে' তাকে বাঁচাই, পুলিসের হাতে দিইনি, সে কথা সে ভোলেনি স্মরণ রেখেছে। যা তার মত দুর্বৃত্তের কাছে কেউ আশা করতে পারে না। এটা তার বংশের পরিচয় দেয়। তা ছাড়া আর কিছু তো ভেবে পাই না। তার কাছে যে-সব কথা শুনছি শুণ্ডা খুনে দলের লোকের মুখে শোনার কথা নয়—সে সব কথা তাদের কাছে হাসি তামাসার জিনিষ। তোমার কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করে সে কি পেয়েছে—সেই জানে। কিন্তু আমি পেলুম তোমার উপর তার অসীম শ্রদ্ধা; যা মানুষের উপর মানুষের সহজে হয় না। আর সেটি সত্য বলেই আমার বিশ্বাস। যাক্ তোমার যখন কাজ হয়ে গেছে, তখন ও বৃথা চিন্তা মাথায় রেখ না।

বিনোদ লজ্জিত ভাবে বললে—"পূর্ব্বে 'বৃথা' ছিল না খুড়ো। এখন আর রাখব না।"

খুড়ো বললেন—"বেশ কথা। কিন্তু আমার নিজের চিন্তা যে রয়ে যাচ্ছে।"

আমার এ কুকাজ হতে রেহাই পাবার উপায় না হলে পেনসনটি যে পা বাড়াবেন, জেলের ফটকও হাঁ বাড়াতে পারেন। ষ্টুপিড্ কিশোরীকে পড়িয়েছিলুম—এতদিনে সে গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা করলে। সাহেবের ও কুচুটে কাজের জন্যে সে আর লোক পেলে না।

"কাজটা কি আমি তো সঠিক জানি না খুড়ো।"

"ওরা (সাহেবরা) কি উদ্দেশ্যে কখন কি করে তাকি এতদিন সৎসঙ্গ করে আমিই বুঝতে পারলুম! কিশোরী লিখলে—বসেইতো আছেন, অনেকদিন দেখিনি—দিন কতক এখানে এসে থাকলে বড় খুশি হব। ভাবলুম এত সহৃদয় আহ্বান, না গেলে দুঃখিত হবে—বাদলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সহৃদয় কিশোরী যে এদিকে আমার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছেন তা কে জানতো।"

বিনোদ—"ওই ফাঁদের কথাটাই তো জানতে চাচ্ছি খুড়ো।"

"শোনো না। এখানে নিয়ে এসে বললে—সাহেব আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, একজন ভাল লোক খুঁজছেন। যান না, দুএকদিন কিছু শুনিয়ে আসুন। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। বললুম—আমি Government Pensioner ...

তুমি এ গ্রহ জুটিয়ে রেখেছ জানলে কি এদিকে পা বাড়াই,—আমি আজকের ট্রেণেই পালাব। সে কিছুতেই শুনলে না—শেষটা খাস কামরায় ঢুকিয়ে ছাড়লে।—

"তোমাদের সাহেব বসেছিলেন। উঠে আপ্যায়ন করে সজোরে হাত মেলালেন। বললেন—আমি শুনেছি তুমি একজন সত্যবাদী লোক। এদেশে নতুন এসেছি, তোমাদের দেশ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক কিছু শোনবার জন্তে তোমাকে ডেকেছি। সেজন্তে তোমাকে তোমার demand মত পারিশ্রমিক দেব, অমনি কষ্ট দেব না।"

মনে মনে ভাবলুম, বুদ্ধিমানের জাত বটে, ঘরের খবর নিতে চান। মুখে বললুম—'তবে আমার দ্বারা হবে না হুজুর, আপনি ঠিক লোক ধরেননি, ভুল করেছেন। আমি ঠিক সত্যবাদী নই। যা বললে প্রভুরা খুশি হন, তাই বলতে শিখেছি। আর পারিশ্রমিকের কথা তুলছেন কেন, আপনাদের হুকুম শুনতেই তো আমরা অভ্যস্ত। হুকুম করলেই যথেষ্ট।'

আওয়াজ এল—'কাজ করে দিয়ে তার পারিশ্রমিক নেবে না কেন, সেটা তো ন্যায্য পাওনা।'

বললুম—'কে বললে আপনাকে। As fathers did, so sons do—ওদের রংয়ের দাম নেই কি। আবার শাদা কালো মিশ্রিত আপনাদের brown আমলার frownএর দাম আরো বেশী। মামলায় ফাঁসাবেন না।'

'কি রকম?'

'এই যেমন সূর্য্যের তাপের চেয়ে, তাঁর তাপে উত্তপ্ত বালুর তাপ অনেক বেশী।"

"আমার টাকা আমি দেবো—say প্রতি প্রশ্নের উত্তর পিছু পাঁচ ডলার করে, তাতে তোমার আপত্তির কারণ কি?"

বললুম—আমরা তিরিশ টাকা দামের লোক, এত টাকা পেলে জুচ্চুরির chargeএ সাজা নেবে কে? ছেলেপুলে একদিন মেঠাই খাচ্ছে দেখলে, সেটাই সন্দেহ জাগায় ও জাগাবে।"

'ধরবে কে?'

'রাজ্য সুশাসনের জন্তে দিশী Red army বহুৎ কেরে, তারা bed থেকে টেনে নিয়ে যাবে। কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করবে না। ওসব কথা থাক হুজুর। আর মিথ্যে কথা শুনেই বা আপনার লাভ কি? আমায় ছেড়ে দিন।'

সাহেব। 'আচ্ছা যাও, ডাকলেই এসো। তোমার পাওনার হিসেব আমি লিখে রাখছি, পরে নিও।'—

"এই পর্য্যন্ত হয়ে মামলা মুলতুবি আছে। সত্যি কথা বলতে হবে, একি পাপ! আমার চোদ্দপুরুষে তা পারে না। ও বদ অভ্যেস কোনো ভদ্রলোকের নেই। আছে কি, তা তো জানি না? এখন বাঁচাও, আমি পালাই। সাহেবকে বলে দাও বাবা—আহা লোকটা ভালো ছিল, পাগল হয়ে গিয়েছে দেখছি—ওকে ছেড়ে দিন। আমি ভুক্ত লোক দেখছি।"

বিনোদ হেসে বললে—"সে হবে, এখন শুনুন খুড়ো—সাহেব বড় ভাল লোক। কোনো ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

'ওই নিশ্চিন্তে থাকাটাই তো বিপদের কথা হে। আচ্ছা, অদৃষ্টে যা আছে হবে—এখন উঠি।'

খুড়ো উঠতে সভা ভঙ্গ হল।

*　　*　　*　　*

অন্ধকার হয়েছে, ডাক্তার মাথা হেঁট করে দ্রুত চলেছেন। হঠাৎ কানে এলো—ডাক্তার দাঁড়াও, কথা আছে। বিনোদ চমকে গেলেন—আপনি এই অন্ধকারে একা?

"তোমাদের দেশে আলো কোথায়?" বলে সাহেব হাসলেন। চারিদিকেই তো অন্ধকার। দেশটা তবু লোভের খনি। এর সব গেলেও সবই আছে—থাকবেও। মানুষ আছে, হৃদয় আছে, বুদ্ধি আছে, নাই কেবল নিজেদের মধ্যে একতা। বিরুদ্ধ দল সব দেশেই থাকে। দেশের বিপদের সময় সকলে এক হয়। এখানে তার উলটো দেখছি। দেশের বিপদে এরা রোজগারের পথ পায়। ঠিক সতীনের ঘরকন্না।

এত বড় দেশে বিভিন্ন দল থাকবে না? থাকবে বইকি। এখানে 'দল' নয়, যেন শত্রুপক্ষ। নিজের দেশের টাকা, ধন, সম্পত্তি নিজেরাই লুটে খেতে অভ্যস্ত। তাতেই আনন্দ, তাতেই সুখ, তাতেই জিত! ভাবো—বিদেশী গুরুর অনুগ্রহে বেশ আছি, দুর্ভাবনা নেই। দেশটা যেন তাদের নয়। যারা এটাকে নিজের দেশ বলে ভাবে, তারা কেবল ভোগে, কষ্ট পায়, নির্য্যাতন সহ্য করে। যারা লেখাপড়া কিছু জানে, তারা একটা জিনিষ এদের কাছেই শিখেছে—দেশের লোককে মুক্ত করে রাখতে পারলেই নিরাপদে থাকা চলে। করে রেখেছেও তাই। শিক্ষিতেরাই প্রধান শত্রু। আসল কথা দেশকে এরা ভালবাসে না।" যাক এত কথা তোমাকে বললুম কারণ—কিছুদিন থেকে তোমাদের দেশ সম্বন্ধে আমি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি, সে বিষয় ভাবছিও। আমার উদ্দেশ্য, এতদিন রইলুম একখানা বই লিখি, কিন্তু শুধু official documentএর উপর আমি নির্ভর করতে চাই না। একজন খাঁটি লোকের মুখে কিছু শুনতে চাই—তাই তোমাদের খুড়োকে আনিয়েছি। লোকটি একটু peculiar কিন্তু প্রথম দিনই আমাকে খুব impress করেছেন। সুবিধে হ'লে কাল ওঁকে নিয়ে একবার আসবে?

"আপনি যখন বলছেন—আনব বইকি"

"আচ্ছা, ঐ আমার বাসা দেখা যাচ্ছে। এবার তুমি যাও—Good night."

সাহেবের খাস কামরায় খুড়ো আর বিনোদ বসে আছেন। সাহেব খুড়োকে বললেন—"কিশোরী তুমি নাকি old manদের বুদ্ধির মর্য্যাদা দাও না—I mean youngদেরই ভালবাসো। কেনো?"

"ঠিক তা নয় হুজুর—তাঁদের যা জানবার বা করবার ছিল, তা তাঁরা

খাটের মধ্যেই ফুরিয়ে বসে থাকেন। অবশ্য honourable exception থাকতে পারে।"

"কিন্তু আমাদের দেশে ভাখো—যত বড় বড় 'প্রিমিয়ার', প্রেসিডেণ্ট' খাটের পর হন, সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন।"

খুড়ো—"তার অনেকটাই তো পরের রাজ্য—যা নিয়ে যদৃচ্ছা খেলা চলে। Pit কিন্তু ২৪ বছরে 'প্রিমিয়ার' হয়েছিলেন এবং ১৭ বছর 'প্রিমিয়ার' ছিলেন, তাঁর মত কয়জন হয়েছেন জানি না Sir—I mean সহৃদয় বিবেচক। youngদের হৃদয়টা নষ্ট হবার (নিদয় হবার) সময় পায়নি—অতি বুদ্ধি তাদের অন্ধ করেনি। পরদুঃখবোধ আছে। যাক্ আর কিছু হুকুম আছে কি?"

সাহেব একাগ্র মনে শুনছিলেন, বললেন—"uncleকে হুকুম করা চলে না। দুয়েকটা কথা শুনতে ইচ্ছা করি—"

"বলুন।"

"তোমাদের দেশে সস্তা কি?"

"অনটন, অনাহার, রোগ, আর মৃত্যু—"

"এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা?"

"কেন, ভয়ঙ্কর বলছেন কেন, লোক মরবে না?" আমাদের গরীব দেশ—সস্তা জিনিষই তো লোক খোঁজে। ওর চেয়ে সস্তা কিছু তো দেখতে পাই না।"

সাহেব—"অনাহারে মৃত্যুকে খোঁজে?"

খুড়ো—"যাঁরা বাঁচতে চায় তারাই Sir—আমাদের দেশে মরাটাই যে সত্যিকার বাঁচা।"

সাহেব—"কই, কোনো দেশের মানুষেরই মুখে এমন কথা তো শুনিনি—"

খুড়ো—"আপনাকে কে বলেছে যে আমরা "মানুষ"। 'ফেমিন' কথাটা নাই বা বললুম, ওটা আমাদের দেশের কথা নয়। হাজার হাজার লোক, নিত্য কেমন নীরবে মরছে। প্রার্থনীয় না হলে কেউ তা পারত কি? আর আমাদের সবার বড় সস্তা জিনিষ হচ্ছেন ভগবান; তাঁর ইচ্ছা পালনে আমাদের পুণ্য আছে যে। তাঁর ইচ্ছাতেই সব-হয় —অনাহারে মৃত্যুও।"

"ও কথা থাক্, বড় depressing লাগছে। আজ Sunday, প্রভুর জন্মবার। দুটো খাঁটি ধর্ম্মকথা আজ শুনবো।

"বেশ, যা শুনেছি বলব। ধর্ম্মকথা কিন্তু সকলে শুনতে পারে না। বাক্সর চাবিটে ফেলে এসেছি বলে সরে পড়ে। ওর চেয়ে বাজেকথা নেই কিনা! আপনার চাবি ঠিক আছে তো।"

সাহেব হো হো করে হেসে বললেন—"Bravo Uncle, তোমার চেয়ে খাঁটি লোক পাব না।"

"ভাববেন না, অনেক আছে—আচ্ছা বলুন—"

Richman কারা?

"যারা অনেক poorকে ফাঁকি দিয়ে ফকির করেছে ও করতে দ্বিধাশূন্য"

"আচ্ছা Truth কি?"

"Master যা শুনলে খুশি হন।"

"সবার চেয়ে শক্তি ধরে কে?

"মিথ্যা। সায়েন্সের যুগেও ওর চেয়ে বড় অস্ত্র আমি তো দেখতে পাইনা হুজুর। অস্ত্র অস্ত্র হত্যা করে, এ অস্ত্রটি মেরে রাখে। যাক্—ধর্ম্মকথা হচ্ছে কই?"

"Thank you—আমি শুনেছিলুম—ভারতবর্ষ অতিথি সৎকারে অদ্বিতীয়, তার প্রমাণ কি?"

"আপনি history পড়া লোক; নিজেও কিছু কিছু দেখেছেন; তার চেয়ে প্রমাণ আমি কোথায় পাব। পূর্ব্বের কথা এখন সকলেই ভুলে আসছে—যখন এই ভারতের সৈনিকেরা অনটনের দিনে সাদা সোলজারদের স্বেচ্ছায় নিজের নিজের ভাতগুলি খাওয়াতো, নিজেরা ফ্যান খেতো। পূর্ব্বপুরুষদের সেই অভ্যাস পেয়েছিল বলে এবার এই দুঃসময়ে তারা ফ্যান খেয়ে ও ছেলেপুলেদের খাইয়ে, দিনকতক যুজতে পেরেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সবাই প্রাণ দিলে, এ সবই তো অন্যের জন্যে ও অন্য দেশের জন্যে। নয় কি?"

সাহেব। হতে পারে, কিন্তু আমার কিছু বলবার কথা তো নয়, আমার শোনবার কথা। এখন বলো—সবার চেয়ে তোমাদের বড় বন্ধু কে?

"Death মৃত্যু। Interviewএর উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত আর ত্বরিত হওয়াই নাকি নিয়ম, আমিও সেই চেষ্টা পাচ্ছি।"

"তোমার উত্তরে বোধ হয় ভুল নেই। আমাকে কিন্তু নীরব করে দিচ্ছে।"

"তবে দয়া করে ছেড়ে দিন।"

"না না, আমি তা বলছি না। আমার যখন যা মনে আসে জিজ্ঞাসা করি। পরীক্ষা নেওয়া নয়, শোনাই আমার কাজ। আচ্ছা, ওরকম প্রশ্ন আর করব না।"

"আমি আপনাকে আগেই বলেছি—আমি আপনাদের হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত ও বাধ্য।"

"আচ্ছা আর একটা মাত্র কথা। পূর্ব্বে Truth সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ সেটা তো তোমার নিজের কথা নয়—মন রাখা কথা নয় কি?"

"কি করি বলুন, master's voice মানতেই হয়। আজকাল সকলেই তা সাগ্রহে শুনেছেন ও ভালওবাসেন; তাই তাঁরা যা শিখিয়েছেন তাই বলি। লাট কর্জ্জন ছিলেন লাটের সেরা। তিনি দেখে গেছেন —"এদের অর্থাৎ আমাদের truth বলে কিছু নেই।" ঐ একটি মাত্র truthfulmanকে বহুভাগ্যে পেয়ে India কৃতার্থ হয়েছিল। তাঁর truth পাছে ব্যর্থ হয় তাই সে অমূল্য সম্পদ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এদেশের লোকে সভা করে 'লয়ার' বা Lawyer রাসবিহারী ঘোষের মুখ থেকে তাঁর truth এর খ্যাতি শুনে ও-সম্বন্ধে কিছু কিছু জানবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছেন, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

"Truth সম্বন্ধে তাঁদের কাছেই আমরা কিছু কিছু শিখেছি ও

শিখছি সুতরাং truth সম্বন্ধে আমার ধার করা ধারণা। বেইমানী করব না, তার প্রতি অচলা ভক্তি রাখি এবং হুকুম হ'লেই তদনুরূপ কাজ করি অর্থাৎ সত্য বলে কিছু আমাদের নেই। তাঁরা যা বলান ও শুনতে ভালবাসেন তাই বলতে জানি। যাঁরা শিক্ষার বা বুদ্ধির দোষে অন্য রকম বলে ফেলেন—তাঁরাই ভয়ঙ্কর লোক, Men of vicious type. তাঁরা মতলবে ওরূপ বলেন এমনও হতে পারে, কারণ তাতে হাতে হাতে লাভ আছে ; অন্যের অর্থাৎ সরকারের খরচে অন্যের বাড়ীতে খাওয়া শোয়া চলে। এ গরীব দেশে জেলগুলো কি কম উপকার করে !"

সাহেব। "আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্তই থাক—"

"আজ্ঞে হাঁা, ধর্ম্মকথা তেমন জমে না—আগেই বলেছিলুম তো ; তবে আপনার অনুমতি নিয়ে এখন আমরা উঠি।"

খুড়ো ও বিনোদ উঠলেন। সাহেব বাইরে পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে বিনোদকে বললেন—"তুমি তো একটিও কথা বললে না ডাক্তার, এখনও মন খারাপ না কি ?"

"আজ্ঞে না, সে সব কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলেছি।"

"বেশ করেছ। আমি তোমাদের আপিসে রিপোর্ট পাঠিয়েছি যে, এখানকার centreএর দরকার নেই। বোধ হয় সত্বরই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। তার পর কি করবে ভাল করে ভেবে ঠিক করে ফেল। তোমার নিজের কোনো Plan আছে কি ?"

"থাকে না, এখনো কিছু ঠিক করিনি। জেলের জন্যেই তৈরী হচ্ছিলুম, আর কিছু মাথায় ছিল না। এবার ভাবতে হবে মাণিকও আছে।

সাহেব। "Uncleএর পরামর্শ নিও, খাঁটি জিনিস পাবে—"

খুড়ো শুনছিলেন বললেন—"হাঁা, Vagabond অর্থাৎ বাউণ্ডুলে হ'তে হলে, আমার কাছে দীক্ষা নিতে পারে। আমার শেখা বিদ্যে কিনা।" সকলে হাসলেন।

সাহেব বললেন—"ওখান থেকে ছাড়া পেতে তোমার যাতে দেরী না হয় তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাজ চুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, ভবিষ্যতে যা করবে—তাতে কোনো সাহায্য করতে পারলে আমি আন্তরিক খুশি হবো। একথা আশা করি তোমাকে নতুন করে বলার দরকার নেই। আচ্ছা তোমাদের আর detain করব না—Good day—" বলে খুড়ো ও ডাক্তারকে বিদায় দিলেন।

বিনোদ কিছু বলতে পারলে না, সাহেবের উদার দাক্ষিণ্যে তার চোখ জলে ভরে এসেছিল। খুড়ো বললেন—"আগেই বলেছিলুম বাবাজি—Trade mark লাগান খাঁটি সাহেব নয়। তা হোক্—খুঁটো ধরে রাখ—আখেরে কাজ দেবে। সাহেব নয়—'ভাল মানুষ' বলতে পারি।"

বহু দূরে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

সবরমতীর আশ্রম আজো পড়িয়া রয়েছে দূরে,
এখনো পথের অনেক যে আছে বাকি !
গুর্জ্জর কণ্ঠে বৃথা গুঞ্জরে পাইতে হারানো সুরে,
বেদনায় প্রাণ কাঁদি উঠে থাকি থাকি !!
সবরমতীর আশ্রম পথে পান্থ ফিরিতে চায়,
শান্ত নদীর সিকতা যেথায় হাসে,
শ্রান্ত পথিক চলিছে একাকী সঙ্গী খুঁজি না পায়,
ধূলি-ধূসরিত সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে !
সুমুখে রাখিয়া তিমির রাত্রি যাত্রী তবুও চলে,
পথ-কণ্টক পুষ্প বলিয়া মানে,
নয়নে তাহার তম-সংহার লক্ষ প্রদীপ জ্বলে,
ক্লান্ত-তনুতে নব উদ্যম আনে।

মেঘের আঁধারে আশার তারকা লুপ্ত হইয়া যায়,
ভেসে আসে কানে ঝটিকার গর্জ্জন
পথিকের পানে ভুলিয়া আজিকে কেহ না ফিরিয়া চায়
বিশ্ব তাহারে করিয়াছে বর্জ্জন !
দুর্যোগ মাঝে জ্বলি উঠে পথে দীপ্ত বহ্নি লেখা,
শোনা যায় শত-মানব-কণ্ঠস্বর
এত দিন পরে চির বাঞ্ছিত দিল কিরে আজ দেখা ?
পান্থ কি তবে ফিরিয়া পাইল ঘর ?
না, না, এত নহে সবরমতীর আশ্রম-হোম-শিখা,
বিশ্রাম-ভূমি দূরেতে সরিয়া যায় !
এখনো সময় আসেনি ললাটে পরিতে জয়ের টীকা
ডাকে নোয়াখালি অঙ্গুলি-ইসারায় !

কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত কয়েকদিন পূর্বেকার কথা। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান দুইটি রাষ্ট্রই স্বাধীনতা সমাগমে আনন্দমত্ত ও উৎসবমুখর। একদিকে রাজনৈতিক চেতনা, অপরদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণে বিভক্ত ভারতের উভয় অংশেই সমাজের অতি নিম্নস্তর পর্যন্তও ইহার আহ্বান গিয়া পৌঁছিয়াছে। পাকিস্থানে বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্থানের হিন্দুরা কেবল এই উৎসব আহ্বানে সাড়া দিতে পারিতেছে না। ১৫ই আগষ্টের আগমনে তাহারা নিরানন্দ, ভীত, সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় লীগের পাকিস্থান দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে, তখন হইতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের সহিত এরূপ আচরণ করিতে থাকে, যাহার ফলে ১৫ই আগষ্ট নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ভয় ও আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা হিন্দু প্রতিবেশীদিগকে পাকিস্থান আসিলে তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হইবে একথা জানাইয়া দিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করিতে যাইয়া কোথাও কোথাও বাধা পাইয়াছে, এবং পাকিস্থান পাকাপাকি হইয়া গেলে হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া কবর দিতে হইবে একথাও কেহ কেহ ঘোষণা করিতেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমান যুবকদের কুশ্রী ইঙ্গিতে বয়স্কা হিন্দু ছাত্রীরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলার দিকে চলিয়া আসিতেছে।

বেলিয়াঘাটা প্রার্থনা সভায় বিপুল জনসমাবেশ ফটো—শ্রীপান্না সেন

পূর্ববঙ্গের যখন এইরূপ অবস্থা, যখন তাহারা নোয়াখালির পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় শঙ্কিত তখন জাতীয় নেতারা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার নেতাদের স্ব স্ব জেলায় গিয়া হিন্দুদের অভয় দিবার কথা জানান হইল। কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের সমস্ত প্রবাসী যুবক ও প্রৌঢ়কে ১৫ই আগষ্টের কয়েকদিন পূর্বে ও পরে নিজ নিজ গ্রামে গিয়া বাস করিবার কথাও জানাইলেন। দুর্গত-বন্ধু মহাত্মা গান্ধী এই সময়ে নয়াদিল্লী হইতে কাশ্মীরে। মৌলানা আজাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি কাশ্মীর গিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, কাশ্মীর ভ্রমণের পর স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করিবার জন্য নয়াদিল্লী তাঁহার স্থান নহে, পূর্ব বাঙ্গলার উপদ্রুত অঞ্চলই হইল তাঁহার যোগ্য স্থান। তাই তিনি ভারতের সুদূর একপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে অপরপ্রান্তে নোয়াখালির পথে রওনা হইলেন। ৯ই আগষ্ট প্রাতে তিনি সোদপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মহাত্মাজী স্থির করিয়াছিলেন মাত্র একদিন সোদপুরে অবস্থান করিয়াই তিনি পূর্ব বাঙ্গলার যাত্রা করিবেন কিন্তু সোদপুরে আসিয়া তাঁহার সে সঙ্কল্প ওলট পালট হইয়া গেল। কলিকাতায় এই সময়ে আবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করিলে, তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। নোয়াখালি যাত্রা তাঁহার স্থগিত হইয়া গেল। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং পশ্চিম বঙ্গের ছায়া মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সহিত এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং ১১ই তারিখে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চল দেখিয়া আসিলেন। অবশেষে তিনি এইদিন সন্ধ্যায় মিঃ সুরাবর্দীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন—কলিকাতার দাঙ্গা নিবারণের জন্য আসুন আমরা উভয়ে একসঙ্গে শান্তি অভিযানে বাহির হই, বিধ্বস্ত অঞ্চলের কোনও একটি পরিত্যক্ত গৃহে আমরা উভয়ে একই কামরায় বাস করিব। দুইজনেই একসঙ্গে দুর্গত হিন্দু-মুসলমানের দুঃখের কাহিনীগুলি শুনিব।
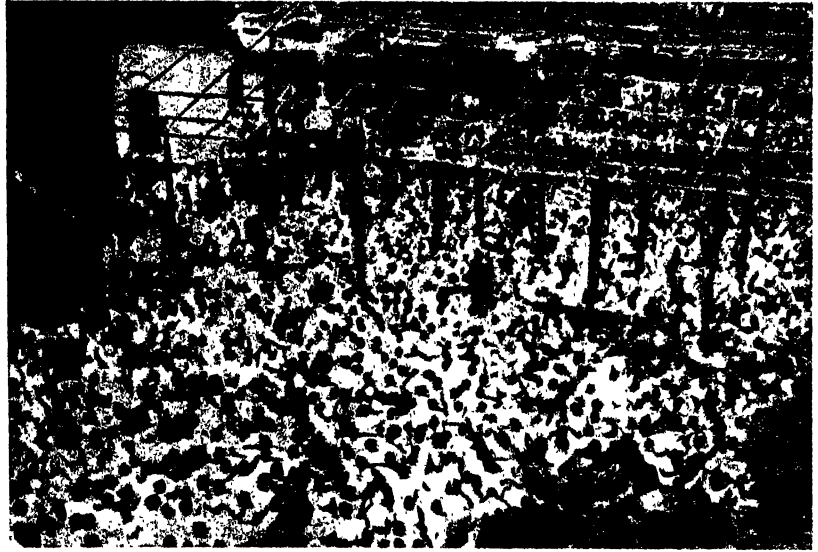
প্রস্তাবটি মিঃ সুরাবর্দীর নিকটে এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উহার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে তিনি মহাত্মা

গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও কন্যার সহিত পরামর্শ করিয়া, পরদিন মহাত্মাজীর প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন।

১৩ই আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধী সোদপুর ত্যাগ করিয়া বেলিয়াঘাটার একটি পরিত্যক্ত মুসলমানের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দল বল সমস্তই সোদপুরে রাখিয়া আসিলেন, মাত্র তাঁহার সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী ও কুমারী মানু গান্ধীকে সঙ্গে লইলেন। মিঃ সুরাবর্দীও আসিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত একই কামরায় বাস করিতে লাগিলেন। বেলিয়াঘাটার ঐ স্থানটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারাই অধ্যুসিত।

বেলিয়াঘাটার হিন্দু অধিবাসীরা, মিঃ সুরাবর্দীকে লইয়া এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল, এমন কি তাঁহাকে সে স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবার কথাও বলা হইল। এই সময় অবশ্য বাঙলায় লীগ মন্ত্রীসভার প্রতিপক্ষ হিসাবে পশ্চিম বাঙলায় একটি ছায়া মন্ত্রীমণ্ডলী খাড়া করিয়া দেওয়ায় হিন্দুরা যেমন একদিকে অনেকটা সাহস পাইয়াছিল, অপরদিকে কলিকাতা পাকিস্থানের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায় কলিকাতায় লীগের দাপট ও চুরমার হইয়া গিয়াছিল।

যাহাই হউক মহাত্মা গান্ধী, যিনি আপন কর্তব্যে স্থির ও অটল, তিনি কাহারও বিক্ষোভে ও ক্রোধ প্রকাশে বিচলিত হইলেন না। "অবিশ্বাসী" "অত্যাচারী" "মহাশঠ" সুরাবর্দীকেই তিনি কলিকাতায়

বেলিয়াঘাটা শান্তিমিশনে মহাত্মাজী ও মিঃ সুরাবর্দী ফটো—শ্রীপান্না সেন

শান্তি অভিযানে বাহির হওয়ায় মহাত্মা গান্ধীর উপরে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যে সুরাবর্দী কলিকাতা তথা বাঙ্গলার হত্যাযজ্ঞের প্রধান হোতা, তাহাকে সঙ্গে করিয়া শান্তি অভিযানে বাহির হওয়ায় হিন্দুরা উহা সহ্য করিতে পারিল না। মিঃ সুরাবর্দীর উপরে বাঙলার হিন্দু সমাজের যে ক্রোধ তাহা ক্ষমাহীন, কারণ তাহাদের ধন, ধর্ম, মান, প্রাণ বহুলাংশে নষ্ট হইয়াছে তাহারই হাতে। তাহারা উঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে বহুবার; উহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া বিচার ও চাহিয়াছে অসংখ্যবার।

এ হেন মিঃ সুরাবর্দীকে সঙ্গী করিয়া মহাত্মা গান্ধী বেলিয়াঘাটায় বাহির হইলে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ক্রোধ ও শান্তি অভিযানের সঙ্গী করিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকটেই শান্তি ও মিলনের বাণী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

ইতিপূর্বে বাঙলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও কলিকাতা সিটি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, কলিকাতার মুসলমানরা ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীনতা উৎসব সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া শোক দিবস পালন করিবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই শান্তি অভিযানের ফলে মুহূর্তের মধ্যেই যেন এক যাদু খেলিয়া গেল। যে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছে এবং স্বাধীনতা দিবসে শোক প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহার মতি ঘুরিয়া গেল। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, কলিকাতা মুসলিম লীগ ও মিঃ সুরাবর্দী

আবেদন করিয়া জানাইলেন যে, তাহারা যেন কলিকাতার হিন্দুদের সহিত সর্বতোভাবে স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে এবং নিজ নিজ বাসভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

এই আবেদনের পর ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্ণে দেখা গেল—মুসলমানরা নিজেদের পল্লীতে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য উৎসবের আয়োজন সুরু করিয়া দিয়াছে। কোথাও কোথাও মুসলমানরা সাহসে ভর করিয়া হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া বড় বড় রাস্তার উপরে তোরণ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুসলমানরা আসিলে হিন্দুরা তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিল। এক বর্ষব্যাপী হানাহানির পর হিন্দু-মুসলমান এই প্রথম পাশাপাশি দাঁড়াইল। একটি বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, কেহ কাহারও পাড়ায় যাইতে পারিত না, সুযোগ পাইলেই একে অপরকে হত্যা করিতেছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের শুভমুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, পুলকিত হৃদয়ে পরস্পর মিলিত হইল।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দেশবাসীকে উপবাস ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেন। মিঃ সুরাবর্দী ও কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ ওসমান মহাত্মার উপদেশ মত তাঁহার সহিত উপবাস করিলেন। ইহা দেখিয়া দেশবাসী আরও বিস্মিত হইয়া গেল এবং যে সুরাবর্দী ও ওসমানকে হিন্দুরা কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রধানতঃ দায়ী করে, মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের এই পরিবর্তনে প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমের দ্বারায় যেমন জগাই মাধাইকে জয় করিয়াছিলেন তাহারই কথা মনে করাইয়া দিল। বেলিয়াঘাটার হিন্দুরা, যাহারা মিঃ সুরাবর্দীকে সঙ্গে লওয়ায় মহাত্মার প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল তাহারাও মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করিল।

স্বাধীনতা উৎসবের পরই এই সময়ে মুসলমানদের ঈদপর্ব ছিল। মুসলমানরা ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রতিবেশী হিন্দুদের উপহার পাঠাইতে লাগিল। হিন্দুরা সাদরে উহা গ্রহণ করিল এবং তাহারাও মুসলমানদের বাড়ীতে মিষ্টান্নাদি পাঠাইল। কলাবাগান, মেছুয়াবাজার, রাজাবাজার, ইণ্টালী, ধর্মতলা, চীৎপুর প্রভৃতি স্থানে একটি বৎসর ধরিয়া যেখানে হিন্দু হত্যা চলিয়াছে এবং ট্রাম বাস প্রভৃতি যানবাহন যখনই ঐ সকল অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, তখন তাহাদের উপরে এসিড, বোমা ও গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এখন ঐ সকল স্থানে মুসলমানরা পথের উপর দাঁড়াইয়া আতর, গোলাপজল প্রভৃতি পিচকারীতে ভরিয়া ট্রাম ও বাসের যাত্রীদের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমগ্র সহরব্যাপী এক অভূতপূর্ব মিলনের সাড়া পড়িয়া গেল। দেশবাসী ইতিপূর্বে বোধহয় আর কোনও দিন এরূপ মিলন দেখে নাই। হিন্দু-অধ্যুসিত অঞ্চলে মুসলমানদের এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বত্রই শান্তি কমিটি গঠিত হইল।

পরে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই তাহাদের নিজনিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মুসলমান-অধ্যুসিত চীৎপুরের যে নাখোদা মসজিদকে দাঙ্গার সময়ে হিন্দুরা মুসলমানদের একটা মস্ত বড় ঘাঁটি ও দুর্গ বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছিল এবং যাহাকে ঘিরিয়া হিন্দুরা কত দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিতে ছিল, তাহা কত বড় ও কিরূপ কৌতূহলবশে তাহা দেখিবার জন্য ঈদের সময়ে হিন্দুদের ভীড় জমিয়া গেল। এমন কি কলিকাতার বহু মহিলাও উহা দেখিয়া আসিল। মুসলমানরা হিন্দুদের আদর করিয়া মসজিদ দেখাইল, মিষ্টান্ন বিতরণ করিল এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। উভয়েই মুখে বলিল—মহাত্মা গান্ধীর দয়ায় আজ অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল, আর আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নাই। আমরা হিন্দু-মুসলমান আজ এক, আমরা ভাই ভাই।

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর বেলিয়াঘাটার বাসভবন হিন্দু-মুসলমানের এক তীর্থস্থানে পরিণত হইয়া গেল। কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কয়েকদিন ধরিয়া যেন বেলিয়াঘাটায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে লোকে বেলিয়াঘাটার দিকে চলিল এবং প্রভাত হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্তও এই জনস্রোত মোটেই কমিল না। মহাত্মা গান্ধী গৃহের বাহিরে আসিয়া বারে বারে দর্শনার্থীদের দর্শন দিতে থাকিলেন।

সহর, সহরতলী এমন কি কলিকাতা হইতে বহু দূরে দূরে ও মহাত্মার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। নারিকেলডাঙ্গা, মোহমেডান স্পোর্টিং গ্রাউণ্ড, সরকারবাগান, পোলক ষ্ট্রীট ময়দান, পার্কসার্কাস, দেশবন্ধু পার্ক, আলিপুর, গড়ের মাঠ, হাওড়া ময়দান, বালিগঞ্জ লেক ময়দান, মেটিয়া বুরুজ, ইউনিভারসিটি সায়েন্স কলেজ প্রাঙ্গণ, টালিগঞ্জ পুলিশ লাইন, বারাসত, বাগমারী ময়দান এই সকল স্থানে যথাক্রমে ১৭ই আগষ্ট হইতে ৩১শে পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা হইল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার প্রার্থনা সভায় লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দিল। ইহারা কোনদিন প্রখর সূর্যের তাপে পুড়িয়া, আবার কোনদিন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া মহাত্মার উপদেশ শুনিল। মহাত্মা গান্ধী প্রতিদিনই কলিকাতার এই মিলন সৌহার্দকে দৃঢ় ও অটুট করিবার উপদেশ দিতে থাকিলেন। মিঃ সুরাবর্দীও হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে প্রকৃতই মহাত্মা বুঝিতে পারিয়া তিনি যে উঁহার পায়ের নিকটে আশ্রয় লইয়াছেন, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে এক বৎসর পরে কলকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিল। কলিকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কয়দিন পূর্ব-পর্যন্তও যে কলিকাতার বুকের উপর ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে লোকে যেন তাহা ভুলিয়া গেল। হিন্দু ও মুসলমানের মন হইতে অবিশ্বাসের ভাব একেবারে উড়িয়া গেল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল, ঠিক

পিয়ারীলাল ও খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী শ্রীযুক্ত চারুভূষণ চৌধুরী নোয়াখালির সেবাকেন্দ্র হইতে আসিয়া মহাত্মাকে নোয়াখালির অবস্থা জানাইলে, পাঞ্জাব যাওয়ার পূর্বে ২রা সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিনের জন্ম একবার নোয়াখালি যাওয়া স্থির করিলেন।

কিন্তু কলিকাতার এই মিলন স্রোতের মধ্যে ৩১শে আগষ্ট তারিখে একদল গুণ্ডা পুনরায় একটা গণ্ডগোল পাকাইবার চেষ্টা করিল। মুসলমানগণ কর্তৃক ছুরিকাহত হইয়াছে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া (কারণ তাহাদের কথামত তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইলে, তাহারা কোনও ছুরিকাঘাতের চিহ্ন দেখাইতে পারিল না) মহাত্মার বেলিয়াঘাটাস্থ বাস ভবনে গিয়া উপদ্রবের সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাত্মার প্রতি ক্রোধও যথেষ্ট অসৌজন্য প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

পরদিন মধ্যাহ্ন হইতে সহরে পুনরায় হাঙ্গামা সুরু হইয়া গেল। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়া আসায় নিশ্চিন্ত মনে একে অপরের পাড়ায় গিয়াছিল। ফলে এইদিন অতর্কিত হাঙ্গামার কারণে অনেকেই হতাহত হইল। প্রায় ৫৪ জন নিহত ও ৩০০ শত আহত হইল।

মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন—কলিকাতার মিলন-বুদ্বুদ ফাঁসিয়া গিয়াছে। কলিকাতা তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই তিনি মুখের কথা অপেক্ষা তাঁহার শক্তিশালী অস্ত্র অনশন ধরিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮-১৫ মিঃ হইতে তিনি অনশন আরম্ভ করিলেন এবং জানাইলেন যতদিন না কলিকাতায় এই অবস্থার পুনরায় প্রকৃত পরিবর্তন হইতেছে, ততদিন আমি অনশন ত্যাগ করিব না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে এইরূপ হানাহানি দেখা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কলিকাতা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাঙ্গলা সরকারের সহিত, হিন্দু-মুসলমান উভয় দলেরই সকল নেতা, উপনেতা, ছাত্র, শ্রমিক প্রভৃতি সকলেই শান্তি স্থাপনে আগাইয়া আসিলেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি শোভাযাত্রা বাহির হইল; এই শোভা যাত্রার নেতৃত্ব করিতে গিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী প্রাণও হারাইলেন।

সকলের সমবেত চেষ্টায় অবশেষে কলিকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিল। শান্তি ফিরিয়া আসায় এবং এই শান্তিকে বজায় রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিলে, মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় অনশন ভঙ্গ করিলেন।

মহাত্মার অনশন ভঙ্গের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনেকে তাহাদের নিকটে যে সকল বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তাহা তাঁহাকে সমর্পণ করে এবং শান্তি অব্যাহত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসে। পরদিনও অনেকেই আরও অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দেয়। মহাত্মা গান্ধী তাহাদিগকে দেশে শান্তিস্থাপনে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন, এবং তাহারাও তাহাতে সম্মত হয়।

এই ভাবে পুনরায় কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া আসিলে, মহাত্মা গান্ধী ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের দুর্গত জনসাধারণের সেবার জন্ম কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

১৩৫৪ সাল

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

১৩৫৪ সাল সম্বন্ধে গত বৈশাখের ভারতবর্ষে আমি জ্যোতিষের মতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, সে সম্বন্ধে আমি বহু চিঠি-পত্র পাচ্ছি ব্যক্তিগত-ভাবে এবং ভারতবর্ষের সম্পাদকের মারফতে। সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছিলুম ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাসে, এবং মাঘ মাসে যখন তা নকল ক'রে ভারতবর্ষে পাঠানো হয় তখন আমি গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত, কাজেই সে নকল আমি দেখে দিতে পারি নি। প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হ'ল দেখলুম লিপিকার প্রমাদেই হোক্ বা ছাপাখানার অসাবধানতাতেই হোক্, তাতে দুটি গুরুতর ভুল র'য়ে গেছে। আমি লিখেছিলুম "১৩৬৮ সালের আগে ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার কোন আশাই নেই" কিন্তু ১৩৬৮র জায়গায় ছাপা হয়েছে ১৩৫৮। বাঙলা বিভাগের প্রসঙ্গে লিখেছিলুম "এ বছর একটি প্রবল দল গ'ড়ে উঠবে যাঁরা বাঙলাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চাইবেন, কিন্তু বাইরের ও ভিতরের বাধায় কোন মতেই তা ঠিকমত হ'য়ে উঠবে না।" এই ঠিকমত শব্দটি ছাপা না হওয়াতে এর অর্থ একেবারে উলটে গেছে। এছাড়া আর কোন ভুল প্রবন্ধটিতে নেই।

এইবার পত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের আপত্তির কথা বলি। আমি লিখেছিলুম "স্বাধীনতার কোন সম্ভাবনা এ বছরের রাশিচক্রে পাওয়া যায় না।" আপত্তিকারীরা বলছেন যে, তা ভুল—ভারত স্বাধীন হ'য়ে গেছে। আমি যে লিখেছিলুম "বর্তমান নেতৃত্ব কোন দিনই ভারতকে স্বাধীনতা দিতে পারবে না"—তাঁরা বলতে চান বর্তমান নেতৃত্বই ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

অবশ্য, বর্তমানে ইংরেজের দেওয়া যে ব্যবস্থা আমরা মাথায় পেতে নিয়েছি—ভারতীয় ইউনিয়ন, পাকিস্থান, বহু স্বাধীন রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য—এই বহু খণ্ডে বিভক্ত ভারত এবং তাদের নানা শ্রেণীর শাসন-তন্ত্র, একে যদি কোন ব্যক্তি, সারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে চান, তাহ'লে আমার বলবার কিছু নেই। আমি লিখেছিলুম স্বাধীনতার নাম দিয়ে একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হবে কিন্তু তা প্রহেলিকা পূর্ণ ও ধোঁয়াটে হবে। এখনও আমার সে মত বদলাবার কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি না। আমি এখনও বলছি যে, বর্তমান নেতৃত্ব কোন দিনই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারবে না এবং ১৩৬৮ সালের পূর্বে পূর্ণ স্বাধীনতার কোন আশাই নেই। একমাত্র ভবিষ্যৎই প্রমাণ করতে পারে এর সত্যতা। অধিক লেখা বাহুল্য।

বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি এলো, খোঁপাটা ঠিক করে' নিলে, তারপর সোৎসাহে বললে, "হয়েছে। এক কাজ করুন। আলোটা নিবিয়ে দিন। তারপর কাপড় জামা ছেড়ে সেগুলো শুকুতে দিন চেয়ারের উপর। আমি একটা কম্বল দিচ্ছি সেইটে জড়িয়ে মড়িয়ে শুয়ে থাকুন—ওগুলো শুকুক ততক্ষণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে"

"যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে না যে আমরা ঘুমোবার আয়োজন করছি। মনে হচ্ছে 'মগ্নতরী' বা ওই গোছের কোনও ছায়াচিত্রে অবতীর্ণ হবার আয়োজন করছি"

"যা বলছি শুনুন। কোটটা খুলে ফেলুন আগে। কিন্তু তার আগে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিন দয়া করে'। ওটা পেলেন কোথা"

সুশোভন কাতর দৃষ্টিতে বিছানার দিকে চাইলে একবার। তারপর ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কোটটা খুলে ফেললে। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে দেখলে মোজাও ভিজেছে, খুলতে হবে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে খুলতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলে না, পড়ে গেল। হাতের কাছে যা পেলে তাই ধরতে গিয়ে ভীষণ কাণ্ড করে বসল একটা। ড্রেসিং টেবিলের উপর চীনে মাটির প্রকাণ্ড ফুলদানী ছিল, সেইটে ঝনঝন করে' পড়ে' চুরমার হয়ে গেল।

"কি করছেন আপনি সুশোভনবাবু"—চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সান্ত্বনা।

"কিছু না, কিছু না। হাত লেগে কি যেন পড়ে গেল। হয় নি কিছু"

"ভীষণ শব্দ হল যে"

"ভীষণ শোনাল। ভীষণ কিছু হয় নি"

"ভেঙে গেছে ?"

"দেখতে পাচ্ছি না। ভাঙলেও একটু আধটু কোণ টোন হয় তো ভেঙেছে"

"যাক যা হবার হয়েছে এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা জড়িয়ে নিন। খাটের রেলিংয়ে ঝুলছে কম্বলটা। জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন মেজের উপর। আর দেরি করবেন না"

"চুপ চুপ"—সুশোভন রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—"শুনতে পাচ্ছ ?"

হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বেশ। খড়মের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। অজ্ঞাতসারে সুশোভনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। এই পরিস্থিতিতে এই বেশে এত রাত্রে গোঁসাইজির সম্মুখীন হওয়ার 'তাগত' তার আর ছিল না। সে গুঁড়িমেরে সন্তর্পণে বিছানার ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গোঁসাইজি কড়া নাড়লেন। আর দ্বিধা না করে' সুশোভন হুড়মুড় করে বিছানার উঠে সটান শুয়ে পড়ল সান্ত্বনার পাশে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে। সান্ত্বনাও চুপ করে' রইল। টু শব্দটি করলে না। গোঁসাইজি আরও দু'বার কড়া নাড়লেন। কোন সাড়া পেলেন না।

"ঘুমের ভান কর" চুপি চুপি বললে সুশোভন। চতুর্থবার কড়া নেড়েও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন গোঁসাইজি কপাটটা একটু ঠেলে মুণ্ডটি ঢোকালেন কপাটের ফাঁক দিয়ে। জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়ার

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কপাট আর একটু ফাঁক করে' আর একটু ভিতরে ঢুকে লণ্ঠনটি তুলে দেখলেন। দেখতে পেলেন যে তাঁর অতিথি দু'জন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি মাথা দুটো বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। কংগ্রেসকর্ম্মী ব্রজেশ্বর-বাবু আগাগোড়া ঢাকা দিয়েছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর স্ত্রীর মুখটা বেশ দেখা যাচ্ছে। অধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাসও দেখতে পেলেন মনে হল।

তাঁর পিছু পিছু ফদকাও উঠে এসেছিল। সে-ও উঁকি দিয়ে দেখলে সব। অত্যধিক আগ্রহবশত নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না সে সম্ভবত, কনুইটা কড়ায় লেগে বেশ শব্দ হল আবার। গোঁসাইজি চাপা-কণ্ঠে তর্জ্জন করে' উঠলেন।

"তুই ফপরদালালি করতে এলি কেন এখানে। শুগে যা। এখানে কিছু হয় নি। ফের যদি আওয়াজ হয় ঠাকুরকে উঠিয়ে নীচেটা দেখতে হবে ভাল করে"

"বোধ হয় বেরাল"

"বেরাল না হাতী! ফাজিল কোথাকার—"

ফদকা নীচে চলে গেল। গোঁসাইজি কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে' দিলেন। তারপর আলোটা একটু তুলে নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরের বারান্দায়। ও-ধারের যে ঘরটায় তাঁর গুরু-ভগ্নী আছেন সেদিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। না, ও-ধারে কিছু হয় নি। বাইরে থেকেই নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্ত্রীলোকের এত জোরে নাক-ডাকা একটা দুর্লক্ষণ। তাঁর গুরু-ভগ্নী পুণ্যবতী নারী···ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন গোঁসাইজি চিন্তামগ্ন হয়ে। তারপর তাঁর মনে হল ওটা রোগের জন্য সম্ভবত। আরও আধ মিনিট দাঁড়িয়ে ওদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলেন। না, সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না। নিজের শয়ন ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। সিঁড়িতে কাঠার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিলেন তা-ও জানা গেল স্পষ্ট।

"সুশোভনবাবু নীচে যান। শিগগির যান বলছি—"

"হায় ভগবান! প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যেতেই হবে?"

"কি যে ছেলেমানুষি করেন, উঠুন, কি করছেন, উঠুন না"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোঁচা মেরোনা দোহাই তোমার"

"কম্বলটা বেশ করে' জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন নীচে"

"বেশ"

"দেরি কচ্ছেন কেন"

"নাবছি তো। অত চেঁচিয়ো না, চেঁচামেচি শুনলে ও ব্যাটা এক্ষুণি নেবে আসবে আবার। আঃ, ঠেলছ কেন, পা ঝুলিয়ে মোজাটা খুঁজছি। ঘুমটা বেশ এসে গিয়েছিল"

"মেজেতেও এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বেন"

"কাল সকালে কি হবে বল দিকি। ভোর না হতে হতেই ওই ফদকা এসে হাজির হবে ঝাড়ু দিতে। ড্রেসিং টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে আমি কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি দেখলে কি ভাববে বলতো। কি জবাবদিহি করব তার কাছে"

"করবেন যা হোক কিছু। বুদ্ধির তো অভাব নেই আপনার। বলবেন মোজা খুঁজছি ওর তলায়—"

"মোজা তো আমার পায়ে"

"এক পাটি খুলে তাহলে ঢুকিয়ে দিন এখন থেকে"

"কি যে তোমার ইয়ে সান্ত্বনা—মানে এরকম—"

"কথা বলে' সময় নষ্ট করছেন কেন বৃথা। আমাকে চেঁচাতে মানা করে' নিজে তো চেঁচিয়ে চলেছেন দিব্যি। বেশ গুটিয়ে সুটিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ুন না। হ্যাঁ, দেখুন—"

"কি আবার—দাঁড়াও—দুত্তোর—এক মিনিট—হ্যাঁ কি বল—"

"ওই ফুলদানী ভাঙার উপর শোবেন না যেন, হাত দিয়ে দিয়ে সরিয়ে নিন টুকরোগুলো কেমন?—"

১১

বৃষ্টিটা থেমেছিল কিন্তু মেঘ কাটে নি। মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্ত্তে সুরু হতে পারে আবার। প্রকৃতি দেবী কান্নাটা থামিয়েছেন বটে—সম্ভবত মানবজাতির শোচনীয় অধঃপতনে ব্যথিত হ'য়েই বিগলিত হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু সমস্ত মুখ থম থম করছে এখনও। বিশাল বিশাল মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। সূর্য্য-কিরণের প্রসন্ন হাসি সুদূর-পরাহত মনে হচ্ছে। চতুর্দ্দিকে বেশ ঘন-ঘোর এখনও।

একজন কিন্তু এতেই বেশ পুলকিত হয়ে উঠেছেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন "রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখছি—বাঃ—চমৎকার। দরকার ছিল, রাস্তায় যা ধুলো। বেশ মেঘলা মেঘলা আছে, রাস্তায় বাইক করতে কোনও কষ্ট হবে না। রোদ নেই—খাসা। আজ হনুমানপুরটা সেরে ফেলব তাহলে রামতারণবাবু, বুঝলেন। জলখাবার প্রস্তুত বলছেন? এর মধ্যেই? ছোলা গুড়? খুব ভালবাসি। অতি পুষ্টিকর খাদ্য। নারকোল? বলেন কি! নারকোল নাড়ু? তাহলে তো আরও চমৎকার—তোফা! কোথা! পাশের ঘরে—ও চলুন—ঠিক—"

রামতারণ ত্রিবেদী নরসিংপুর গ্রামের আপার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত। সদারঙ্গবিহারীলাল এ অঞ্চলে এলে এঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিশয় সজ্জন লোক। শুধু তাই নয় খুব নিরীহ। ভদ্রলোকের সদা-সন্তুষ্ট ভাব অথচ ব্যস্তবাগীশ। নিজের চারদিকে একটা স্নিগ্ধ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত তিনি। কোন কিছু উগ্র অমসৃণ এলোমেলো বরদাস্ত করতে পারেন না—তাড়াতাড়ি সমস্ত শান্ত না করা পর্য্যন্ত শান্তি পান না কিছুতে। বেঁটে পুরিপুষ্ট লোকটি সর্ব্বদা সব সামলাতে ব্যস্ত যেন। ছোট ছোট বেঁটে হাত দু'টি দিয়ে হয় কোঁচকানো বিছানার চাদর ঠিক করছেন, না হয় টেবিলে বই গুছিয়ে রাখছেন। অভাবে নিজের কোটের সম্মুখ ভাগটার উপরই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মসৃণতর করবার চেষ্টায় আছেন সেটা। ভারী মিষ্টি স্বভাব। তাছাড়া নিরপেক্ষ নির্ব্বিবাদী লোক। ঝগড়া তর্কের ত্রিসীমানায় থাকেন না কখনও।

সদারঙ্গবিহারীলাল ত্রিবেদী মহাশয়ের আহ্বানে সোৎসাহে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ত্রিবেদী মশায় সরে' দাঁড়িয়ে পথ দিলেন তাঁকে, তারপর সন্তর্পণে গোঁফে হাত বুলুতে বুলুতে অনুসরণ করলেন। টেবিলের উপর খাবার ছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল চেয়ার টেনে বসলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে করতালি দিলেন একবার।

"বাঃ—তোফা—"

রামতারণ ধীরকণ্ঠে বললেন—"আপনি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি, ছোট একটা বিস্কুটের টিনে পুরে যদি দি—ওখানে খাদ্যদ্রব্য কি পাওয়া যায় তারও স্থিরতা নেই—যদিই বা যায়, কি মূল্যে পাওয়া যাবে স্থিরতা নেই—"

সদারঙ্গবিহারীলাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনবার 'স্থিরতা' শুনে ভাবছিলেন যে পণ্ডিতের শব্দের সঞ্চয় এত কম সে কি করে' ছেলেদের ভাষা শিক্ষা দিতে পারে—ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যত—তাদের যদি ভাষাজ্ঞান ঠিক মতো না হয় তাহলে তো শিক্ষার ভিত্তিই অমজবুত হয়ে যাবে—অথচ লোকটা ভাল—

"কিছু নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন"

"ও—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। এ তো খুবই সুযুক্তি"—নারকোল নাড়ু দাঁতে আটকে গিয়েছিল সেটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বেশ তো, কি দিচ্ছেন সঙ্গে"

"নারকোল নাড়ু"

"আবার নারকোল নাড়ু! বেশী খেলে আবার—মানে—নারকোল অবশ্য খুবই ভালবাসি আমি, ডাক্তাররা বলেন খুবই পুষ্টিকর—কিন্তু আপনাদের সব নাড়ুগুলো আমিই যদি খেয়ে ফেলি—"

"নারকোল নাড়ু প্রচুর আছে। কলাও দিচ্ছি গোটা চারেক"

"কলা? বলেন কি, খাসা হবে"

"একটু মোহনভোগও করিয়ে দিতে পারি যদি বলেন"

ইতিপূর্ব্বে মোহনভোগ খাইয়েছেন তাঁকে রামতারণ ত্রিবেদী। কালো চটচটে আঠার মতো বস্তুটির ছবি মানসপটে ফুটে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের।

"কি দরকার মোহনভোগের। কলাই যথেষ্ট"

"কটার সময় আপনি বেরুবেন বলুন না"

"বেরুবো? দাঁড়ান তাহলে—সর্ব্বাগ্রে ওই সাইকেল-ওলা মিঠ্ঠুর কাছে যাওয়া দরকার। সে একবার গাড়িটা ঠিক করে' দিয়েছিল। বেরুবার আগে ভাল করে' তেল টেল দিয়ে নিতে হবে আজ। কাল একটু লুব্রিকেটিং তেলের অভাবে—উফ্! মিঠ্ঠু কারবুরেটার খুলে সাফ করতে চাইবে নিশ্চয়। প্লাগও বদলাতে পারে। হ্যাঁ দশটাই ধরুন—তার আগে বেরোনো যাবে না"

"মোহনভোগ হয়ে যাবে তার মধ্যে"

কোটের সম্মুখভাগে হাত বুলোতে বুলোতে রামতারণ

স্থিরকণ্ঠে বললেন কথা ক'টি। চকিতে রামতারণের দিকে একবার চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ছোলাগুলি চিবোতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ রওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি। সাইকেলের পিছনে স-মোহনভোগ বিস্কুটের টিনটি বেঁধে দিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশায়। মিঠ্ঠু ও নিখুঁতভাবে ঠিক করে' দিয়েছিল সাইকেলটি। ফট্ ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে চতুর্দ্দিক সচকিত করে' প্রধাবিত হল মোটর-বাইক। যদিও মেঘলা দিন, তবু কোথা থেকে একটু আলো লুকিয়ে এসে ঝিলিক তুলেছিল তাঁর চশমার লেন্সে। হরিমটর পান্থনিবাসের-সামনের রাস্তা দিয়েই হনুমানপুরে যেতে হয়। পান্থনিবাসের সামনাসামনি এসে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে হোটেলের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন প্রচুর গলাখাকারি দিয়ে উপরের জানলা থেকে গোঁসাইজি নিষ্ঠিবন ত্যাগ করছেন। হোটেলের জানলা কপাট সব খোলা, কিন্তু সান্ত্বনা দেবী বা আর কাউকে দেখা গেল না। সদারঙ্গবিহারীলাল ভাবলেন নিশ্চয় তাঁরা চলে গেছেন। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলেন আবার। এই সুখী দম্পতীর কথাই ভাবতে ভাবতে ভীমবেগে চলেছিলেন তিনি। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। অত বড় অধ্যাপক, অমন নামজাদা কংগ্রেস কর্ম্মী—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই···সান্ত্বনাও ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। মণি-কাঞ্চন। দেখতে দেখতে এক মাইল পার হয়ে গেল···সান্ত্বনার শুধু রূপ নয় গুণও আছে···অনেক গুণ···সামনে রাস্তাটা বেঁকেছে···ঘুরেই কি কাণ্ড!—সজোরে ব্রেকটা চেপে ধরলেন···গাড়িটা টাল খেয়ে পড়েই যেত হয় তো পাশের খানায়—যদি না বাঁ পা-টা রাস্তার পাশের একটা ঝোপে ঢুকিয়ে সামলে নিতেন তিনি কোন-ক্রমে। ছোঁড়া রাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছে! এখনও দাঁড়িয়ে আছে—দাঁত বার করে' হাসছে আবার।

ঝোপ থেকে পা বার করে' নিলেন তিনি। একটু ছড়েছে বোধহয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে' কপালটা মুছলেন, চশমাটা ঠিক করে' নিলেন। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে অনুকম্পা হল একটু—এরা এমনি করেই বেঘোরে মারা যায়—আর একটু হলে গেসল—বেঁটে গোছের ছেলেটা। পরণে ময়লা খাকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার, হলদে রঙের দাঁত। হাসছে—হাসি দেখে মনে হয় বিচ্ছু। শহর থেকে আমদানী সম্ভবত, পাড়াগেঁয়ে ভীতুভাব মোটে নেই।

"এই ছোকরা, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনি চাপা পড়তে যে—"

ছোঁড়া দাঁত বার করে' হাসল আবার।

"হাসছ কি, সাবধান না হলে মারা যাবে একদিন। আরে—"

"ছোঁড়া সরে' পড়বার উপক্রম করছিল। তার ডান হাতে একটা দড়ি ছিল, সেটা আর এক পাক দিয়ে জড়িয়ে নিলে সে ভাল করে'—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিক থেকে আর্ত্ত কেঁউ কেঁউ ধ্বনিত হয়ে উঠল। কুকুর—হ্যাঁ কুকুরই তো—ছোট কুকুরের বাচ্চা একটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ছোঁড়াটা তার গলায় দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে সেটাকে। ভ্রূকুঞ্চিত করে' সদারঙ্গবিহারীলাল দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করলেন একটু ঝুঁকে। বাচ্চাটা কিছুতে যাবেনা, ছোঁড়াও ছাড়বে না, হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"এই থাম থাম"—আদেশের ভঙ্গীতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আরে এ কুকুর যে চেনা। এ তো তোমার কুকুর নয়। এ তো চেনা কুকুর"

"চীনা নেই, বিলেইতি"

সদারঙ্গবিহারীলাল অবিলম্বে বুঝলেন ছোঁড়া বিহারী। শুধু তাই নয়, কুকুরের জাতও চেনে।

"চীনা নেই বোলতা, চেনা চেনা"

"নেই বিলেইতি"

ভারী ডেঁপো তো!

"আরে বাবা তাই সই। কুত্তা কাঁহা পায়া"

ছোঁড়া সদারঙ্গবাবুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে কুকুরটার দিকে চাইলে। ঠিক যেন মানুষের মতো এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টিকে। ভয়ে কাঁপছিল বেচারী।

"ই কুত্তা কো কাল রাতমেই হাম আদর কিয়া হ্যায়, গায়ে হাত বুলায়া হ্যায়, ইস কো মালিককো সাথ বহুক্ষণ গল্প-সল্প কিয়া হ্যায়। ই কুত্তা কাঁহা মিলা"

'ই কুত্তা নেহি হ্যয়"

"নিশ্চয় কুত্তা হ্যায়। ইসকো ল্যাজ নেহি দেখকে তুম হয়তো ভাবতা হ্যায় ই কুত্তা নেহি হ্যায়। কিন্তু ই কুত্তাই হ্যায়—ল্যাজ কাট দিয়া। কাঁহা পায়া ই কুত্তা—"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে বলে কি! কুত্তা নয় তো কি বিল্লি? বোলো কাঁহা পায়া ই কুত্তা"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে! তুম্ কি হামরা সে বেশী জানতা হ্যায়। বোকাকা মাফিক তর্ক করকে ফল কি। ইস কুত্তাকে হাম চিনতা হ্যায়, ইসকো মালিককো ভি হাম চিনতা হ্যায়, আজ সে নেই, অনেক দিন সে"

"অগর আপ জবরদস্তি ইসকো কুত্তা বানাইয়ে তো ম্যয় নাচার হুঁ। অগর ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে তুমরা মাফিক এইসা ডেঁপো ছোকরাকে পাল্লাসে ইতিপূর্ব্বে পড়া বোলকে তো ইয়াদ নেহি হোতা হ্যায়! কুত্তা নেই তো ই কি হ্যায়"

"কুত্তী হ্যায় হুজুর। দেখিয়ে—"

চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে গেল সদারঙ্গবিহারীলালের। এটা প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন—"তা হো সেকতা হ্যায় অবিশ্যি। কাঁহা পায়া"

"রস্তে মে"

"কি করে গা ইসকো লেকে"

"পোষেঙ্গে। শিখাওয়েঙ্গে—"

"উসকো শিখানে কো কুছ দরকার নেই হ্যায়। যথেষ্ট শিক্ষা হ্যায় উসকো—"

"কুছ নেই জানতি। দেখিয়ে না ঠিক সে চল ভি নেহি সকতি—"

"বাজে বক বক মত্ করো—ই কুত্তা হামকো দেও"

"ফির আপ কুত্তীকো কুত্তা কহতে হেঁ"

"সাধারণ কথাবার্ত্তায় হামলোগ ওতনা লিঙ্গ বিচার নেহি করতা হ্যায়। আসল কথা হাম ইসকো লে যায়গা, লে করকে আসল মালিক কো ঘুরায় দেগা, বুঝা?"

"কুছ বখশিশ মিলনা চাহিয়ে"

"বখশিশ? কাঁহে? দোসরা আদমিকো কুত্তা লেকে ভাগতা হ্যায়, থানামে খবর দেনেসে কি হোগা জানতা হ্যায়?"

"দিজিয়ে তব থানে মে খবর"

"আরে—এ তো ভারী তাঁদড় ছোঁড়া দেখছি!"

সদারঙ্গবিহারীলালের মাথার চকিতের মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—"দেখো, বখশিশ ফকশিশ নেই দেগা, তবে একঠো চিজ দে সেকতা হ্যায়"

"ক্যা—"

"নাড়ু"

"নাড়ু?"

"হাঁ। ঘরকা তৈরি নারকোলকা নাড়ু"

"দেখলাইয়ে তো"

সদারঙ্গবিহারীলাল বাইকের পিছন থেকে বিস্কুটের টিনটি খুলে একটি নাড়ু বার করে' দিলেন তাকে। ছেলেটি একটু কামড়ে আগে পরখ করে দেখলে, তারপর সবটা মুখে পুরে ফেললে।

"আওর একঠো হুজুর"

আর একটি নাড়ু দিলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ছোঁড়াকে উপদেশও দিলেন কিছু। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হয়, যখন তখন অমন দাঁত বার করে' হাসাটা অভদ্রতা, দাঁত মাজাও উচিত প্রত্যহ, অমন ছেতো-পড়া হলদে দাঁত দেখতে বিশ্রী নয় কি? সব শুনে ছোঁড়া দাঁত বের করে' বললে—"আউর একঠো লাড্ডু দিজিয়ে হুজুর—"

তৃতীয় নাড়ুটি দিয়ে ঝুনুকে উদ্ধার করলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু। সমস্যা, কি করে' নিয়ে যাওয়া যায় এখন। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হয়েছে! গায়ে একটা ঢিলে গোছের কোট পরেছিলেন তিনি। বুকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং ঝুনুর আপত্তি সত্ত্বেও কোটের ভিতর পুরে নিলেন তাকে, পুরে বোতাম এঁটে দিলেন। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। সোৎসাহে মোটর বাইকে সওয়ার হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল এবং সবেগে ধাবিত হতে লাগলেন হরিমটর হোটেলের উদ্দেশে।

(ক্রমশঃ)
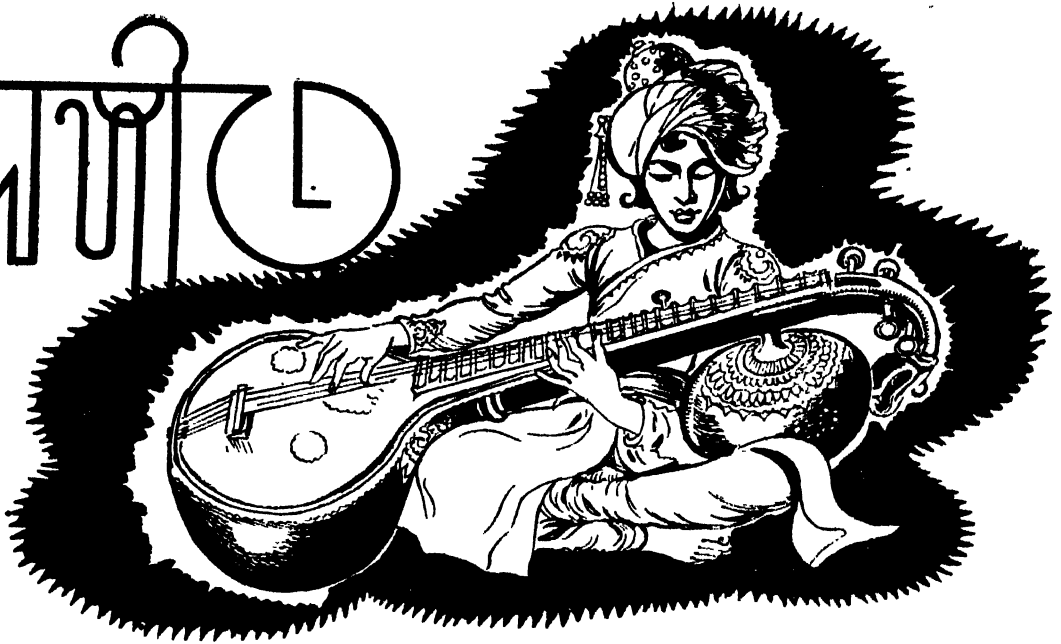
গান ও স্বরলিপি

বাগেশ্রী। আড়াঠেকা

অনন্ত সাগর-মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে সুখ, গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দু'জনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া॥
জলধি র'য়েছে স্থির, ধু-ধু করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে দুই বাহু প্রসারিয়া॥

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি ॥ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

[র্সর্সণা ধণপা -মা মমা] ॥
II { সসা -মাঃ মঃ মা | মধপাঃ -মঃ -জ্ঞা -রজ্ঞমা | -া -া রা -া | সা -া -া -া I
[০ স্তসা]
অন ০ স্ত সা গর • ০ ০০০ ০ ০ মা ০ ঝে • • •

[ ]
I সা মাঃ মঃ মমা | গমপা -মপধা -পধণা -ধণর্সা | -নর্সনা -র্রর্সা র্সণা -ধণা | -পধা -পধণা -া -ধণর্সা } I
দা •ও ত রীভা সা০০ ••• ০০০ ০০০ ০০০ ০ই য়া০ ০০ ০০ ০০০০ ০০০

I মমমা মা -া মমা | মগমা -পমা মপা -মজ্ঞা | জ্ঞমা -পমা -মণণা পমপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা I
গেছে সু • খগে ছে০০ ০০ দু ০খ্ গেছে আ• ০০ শা ০ ফু রা০ ০০০ ই য়া

I {মমা ᵐণধণা -পধণা -র্সর্সা | র্সর্সা র্সনর্সনা র্সা -া | র্সনর্সা র্রর্সা -নাঃ ননঃ |

সম্মু খে০০ ০০০ ০অ নন্ত রা০০০ ত্রি ০ আ০ম রা০ ০ তুঙ্গ

| র্সনর্সা -র্রর্সা র্সণধা -পধণা} I ণর্সর্সা র্সণা -ধণপা মমা | ᵐপমা -জ্ঞা -া -রজ্ঞমা |

নে০০ ০যা ত্রী০০ ০০০ সম্মু খে০ ০০০ ০শ য়া০ ০ ০ ০০ন্

| -া -া রা -া | সা -া -া -া I ˢমমা মমা -া মমা | গমপা -মপধা -পধণা -ধণর্সা |

০ ০ সি ০ ন্ধু ০ ০ ০ দিক বিদি ০ কহা রা০০ ০০০ ০০০ ০০০

| নর্সা -নর্রর্সা র্সণধা -পধণা | -া -া -ধণা -ধণর্সা [ ] II

০০ ০০ই য়া০০ ০০০ ০ ০ ০০ ০০০

II { ˢমমা মা -া মমা | মগমা -পমা ᵐপা -মজ্ঞা | জ্ঞমা পমা -ᵐণধণা পমপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা I

জল ধি ০ রয়ে ছে০০ ০০ স্থি ০র্ ধুধু ক০ ০০০ রে০সি ন্ধু০ ০০০ তী র্

I সসা -মা -া মমা | মগমা -পমা ᵐপা -মজ্ঞা | জ্ঞমা পমা -ᵐণণা পমপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা} I

প্রশা ঃ ০ ন্তসু নী০০ ০ল না ০র্ নীল শূ০ ০০ ন্যে০মি শা০ ০০০ ই য়া

I {মমা ᵐণধণা -পধণা র্সর্সা | র্সর্সা র্সনর্সনা র্সা -া | র্সনর্সা ˢর্রর্সা -নাঃ ননঃ |

নাহি সা০০ ০০০ ০ড়া নাহি শ০০০ ব্দ ০ ম০ন্ত্রে যে০ ০ নস

| র্সনর্সা -র্রর্সা র্সণধা -পধণা} I ধণা পা -া মা | -া মা মধা পা | -া -মা -জ্ঞা -রজ্ঞমা |

ব০০ ০স্ত ন্ধ০০ ০০০ র০ জ ০ নী ০ আ সি০ ছে ০ ০ ০ ০০

রা -া সা -া I ˢমা -া মা মমা | গমপা -মপধা -পধণা -ধণর্সা | -নর্সর্রা -র্সর্রজ্ঞা -র্রজ্ঞর্মা র্মর্মা

ঘি ০ রে ০ তুই ০ বা হুপ্র সা০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ রিয়া

-র্জ্ঞর্রা -র্সণধা -পধণা -ধণর্সা [ ] II

০০ ০০০ ০০০ ০০০

[বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতির অনুমোদন অনুসারে মুদ্রিত]

কংগ্রেসকর্ম্মীরা কোন পথে ?

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

ইহা কি হইল ? এই সেইদিন পর্য্যন্ত যে সব কংগ্রেসকর্ম্মীর নিজেদের আপনারজন বলিয়া মনে করিয়াছে গত মেমারী (বর্দ্ধমান) সম্মেলনের পর হইতে ত্াঁহাদের মানসিক পরিবর্ত্তন এত সহসা কি করিয়া সম্ভব হইল ? এই কথাই আজ সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীর (বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের) ভাবিতে হইবে। গত মেমারী সম্মেলনকেপশ্চিমবঙ্গবাসী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের (সবাকার নহে) মানসিক চিন্তাধারার একটি লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালা দেশ নেতাজীর নেতৃত্ব যেদিন কংগ্রেসের মধ্যে নিজ প্রকাশের সম্ভাবনা খুঁজিয়া পাইল না সেইদিন তাহার অন্ত পথ ধরিল। তখন একদল কর্ম্মী কংগ্রেসকে আঁকড়াইয়া ধরিল, বর্ত্তমান বাঙ্গালা কংগ্রেসের জন্ম এই হইতে শুরু হয়। ইতিপূর্ব্বে সুভাষ-সেনগুপ্তের ঝগড়া অনুশীলন ও যুগান্তর দলের গুপ্তসমিতি ঝগড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। যতদূর জানি খাদি কর্ম্মীরা ইহাতে যোগদান করেন নাই। বাঙ্গালার দলাদলিতে তখন তেজ ছিল। চট্টগ্রামে এক সুখেন্দুবিকাশের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া বহু রাজনৈতিক গোলযোগ গিয়াছে। সে অধ্যায় গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে।

গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের পর যে সব কর্ম্মী গান্ধীবাদের শিক্ষায় বিশ্বাসী হইল না, তাহারা মার্কসবাদের শিক্ষা লইয়া দল ত্যাগ করিল। যাহারা মার্কসবাদের শিক্ষা লইয়া দল (অর্থাৎ অনুশীলন ও যুগান্তর দল) ত্যাগ করিল তাহারা বাঙ্গালার যুব সম্প্রদায়ের সেরা রাজনৈতিক কর্ম্মী এবং ইহাদেরই শ্রম ও সাধনার ফলে বাঙ্গালায় আজ কম্যুনিষ্ট দল দানা বাঁধিয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণেই বলিয়া রাখি, কে ভাল করিল কে মন্দ করিল তাহা সমালোচনার স্থান এখানে নয়। শুধু সামান্ত কর্ম্মী হিসাবে যেটুকু বুঝিতেছি তাহাই লিখিতেছি। জ্ঞান সব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, এক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনে করিবার কারণ নাই।

তাহা হইলে হিসাবে দাঁড়াইল মোটামুটিভাবে পুরাতন গুপ্ত সমিতির পুরাতন বয়স্ক কর্ম্মীরা একটা চিন্তাধারার প্রতিনিধি—অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক শ্রেণী। (ইহাদের মধ্যে কারুর জীবনের তিরিশ বছর পর্য্যন্ত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়াছে)। অপেক্ষাকৃত মধ্য বয়স্ক নবীন কর্ম্মীরা আর এক শ্রেণীর চিন্তাধারার প্রতিনিধি এবং এই দুইটি চিন্তাধারার মধ্যে স্বতই বিরোধ বাধিতেছে। আর অন্ত পক্ষে থাকিল খাদি দল। যতদূর পর্য্যন্ত জানি, তাতে মনে হয় খাদি কর্ম্মীদের কোন প্রভাব বাঙ্গালার যুব সম্প্রদায়ের উপর তেমন ছিল না, সম্ভবত আজও তেমন নাই। তবে তাহারা গান্ধীবাদের প্রভাবের সুযোগ পাক আর নাই পাক, গান্ধীজীর অসীম প্রভাবের সুযোগ তাহারা পাইয়াছেন এবং সেইদিক হইতে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় তাহারা যুব সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে পাইয়াছেন বা পাইতেছেন।

যেহেতু খাদি কর্ম্মীরা কোন গুপ্ত পন্থায় বিশ্বাস করেন না সেই হেতুই তাঁহারা সরকারের নিকট ততটা অপ্রিয়ভাজন ছিলেন না। কাজেই এক শ্রেণীর জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের মিলিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের উপর প্রভাব ইঁহাদের কোনকালে ছিল না বা আজও নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত হিন্দু জনসাধারণের উপর নেতাজীর প্রভাব ছিল। আর বাঙ্গালী আপামর জনসাধারণ ও আংশিকভাবে মুসলমান জনসাধারণের (শিক্ষিত নহে) উপর গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল, গান্ধীবাদের নহে। বাঙ্গালী এখন জাত, গান্ধীবাদের শিক্ষা তার ধাতে সহ্য হয় নাই। এতদিন আমরা দেশ-স্বাধীনতার নামে যে রাজনৈতিক চেতনা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা প্রধানত দুইটি প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

একটি হিংসার পথ (গান্ধীজীর মতে), অপরটি অহিংসার পথ। গান্ধীজীর মতে এই হিংসার পথ—ভীরুর পথ। অন্তান্ত সবার মতে অহিংসা জৈবধর্ম্মবিরোধী। গান্ধীবাদের আলোচনায় একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহা অনেক ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে বলা চলে। কিন্তু 'হিংসায়' (গান্ধীজী ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে সাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিবে।) বিশ্বাসী যারা তাঁদের আলোচনায় তেমন কোন সুযোগ নাই। কোয়েল সাহেব যেভাবে ইহার দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়াছেন সেভাবে ইহা ভারতে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু মার্কসবাদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যতটা বলিয়াছে ততটাই আলোচিত হইয়াছে ; ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ অংশ তাহা গ্রহণও করিয়াছে। গান্ধী নেতৃত্বের প্রভাব ভারতের যুবসম্প্রদায়ের উপর যাহাই থাকুক না কেন, গান্ধী-বাদের প্রভাব যে বিশেষ কিছু নাই তাহা বোধহয় বলা যাইতে পারে, নেতৃত্বের প্রভাব ও কোন দর্শনের প্রভাব এক নহে। মার্কস্ তাহার জীবিতকালে গান্ধীজীর মত এত ব্যাপক প্রভাব ছড়াইতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর দর্শনের প্রভাব বাড়িয়াছে। গান্ধীবাদের শিক্ষা ও দার্শনিক প্রভাব একটু সীমাবদ্ধ, কেননা ইহা ভারতের হিন্দু জনসাধারণের কাছে তেমন অপরিচিত বস্তু নহে। ইহার প্রাথমিক ইতিহাস বুদ্ধের আমলে রচিত হইয়াছে। বুদ্ধের তুলনায় ছোট হইলেও বাঙ্গালায় চৈতন্ত তাহার সামাজিক পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীবাদ এক কথায় ভারতের ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগের পুনরভ্যুত্থান, কিন্তু ইহার পর ভারতের ইতিহাসে ইসলামের প্রবেশ ও প্রতিপত্তি লাভ।

গান্ধীবাদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করে নাই, বা ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার বিশেষ যে একটা গঠন আছে তাহা গান্ধীবাদের আলোচনায়,—যতদূর মনে পড়িতেছে—পাওয়া যায় না। গান্ধীবাদ সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক আলোচনা করিয়া একটি সার্ব্বজনীন সমাজ দর্শন গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ ইতিহাসের অর্থনৈতিক শ্রেণী বা জৈব ধর্ম্মের অবস্থিতি, তেমন ভাবে গান্ধিবাদ আলোচনা করে নাই। 'তেমন ভাবে' বলিতেছি এই কারণে যে গরীব ও বড়লোকের কর্ত্তব্য বা তাদের কি করা উচিত তাহার বহু আলোচনা গান্ধিবাদে আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান যুগোপযোগী সমস্যার পক্ষে জীর্ণ। তবে পরবর্ত্তী কালে ভারতে মার্কস্‌বাদ খানিকটা প্রসার লাভ করিবার পর গান্ধিবাদ নিজস্ব একটি পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহা ভারতের পক্ষে কতটা কার্য্যকরী হইবে আজ ও বলা কঠিন।

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের পর হইতে ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের উপর মার্কস্‌বাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বাড়িতে থাকে; এই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক টানা গতিতে চলিয়া আসে। কংগ্রেসের 'Quit India' প্রস্তাব খানিকটা পরিমাণে বাইরের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন প্রভাবিত হইয়াছে তাহা বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বম্বে অধিবেশনের পূর্ব্বে—অর্থাৎ 'Quit India' প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে—ভারতের যুব-সম্প্রদায় অনেকটা পরিমাণে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। নেতাজীর কংগ্রেস ত্যাগ, কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী দলের মনোবৃত্তি, রায় দলের মনোবৃত্তি ও কম্যুনিষ্ট দলের মনোবৃত্তি এই সমস্ত লক্ষণগুলিই—একটি সুনির্দ্দিষ্ট ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই সুনির্দ্দিষ্ট ঘটনাকে আপনার মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই সুনির্দ্দিষ্ট ঘটনাটি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসের সরকারী নীতি বরাবরই অহিংস, কিন্তু গণ-আন্দোলনের মুখে পড়িয়া সেই নীতি অনেক ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রভাব ছড়াইতে সমর্থ হয় নাই। একমাত্র ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ যাহা গান্ধীজীর নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছে তাহাই অহিংস রহিয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলন ভারতের জনসাধারণের মনে তেমন কোন সাড়া দেয় নাই। তার কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে এই আন্দোলনদ্বারা নিজেকে বিপদগ্রস্ত বোধ করে নাই।

ইংরেজের প্রাচ্যে পরাজয় ভারতের পক্ষে শুভ ও অশুভ আশীর্ব্বাদ দুই-ই আনিয়াছে। বর্মা হারাইবার পর ইংরেজ হতবাক, আর ভারতের জনগণ ঘৃণায় বিদ্বেষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধিবাদের প্রভাব কতখানি জনগণের মনের উপর প্রতিক্রিয়া ছড়াইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। জনগণের মনে জৈবধর্ম্মের সাড়াই বেশী করিয়া এসব ক্ষেত্রে মিলে। এইখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য হইত তবে কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের পর তাহারা সেই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করিত। যে নেতৃত্ব কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়াই রাজনৈতিক কর্ম্মীরা ও জনগণ আন্দোলন চালাইয়াছে। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আইন ও শৃঙ্খলা তাহারাও যেমন রক্ষা করেন নাই—জনসাধারণও মানে নাই। ইহার পিছনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কর্ম্মীর জীবনসাধন রহিয়াছে। তাহারা গান্ধি নেতৃত্ব মানিয়া লইলেও তাঁহার দর্শন মানিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসের সরকারী নীতি এই আন্দোলনের দায়িত্ব এড়াইয়াছে। প্রস্তাব করিয়া এই আন্দোলনকে স্বতস্ফূর্ত্ত আন্দোলন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী নিজস্ব পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাইবার সুযোগ পাইলে এতটা নীতির খেলাপ হইত না। গান্ধীজী নিজ দায়িত্বে দুইটি আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া চালাইয়াছেন। এক হইল ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ ও আর হইল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলন—কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে দুইটি আন্দোলন কোনক্রমেই গান্ধিবাদের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নহে। যাহা চাম্পারণ সত্যাগ্রহে সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সম্ভব হয় নাই। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সার্থক করিয়া তুলিতে যে জাতীয় ন্যায় ও নীতির প্রয়োজন তাহা কোন রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার কাজে সম্ভব নয়। সত্যাগ্রহের মূল্য নাই এমন কথা বলিতেছি না। ইহার প্রয়োগ সামাজিক অবিচার বা সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক অভিযোগের বেলায় প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু যে অধিকার বৈদেশিক কোন শক্তির নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে সেখানে ইহা সম্ভব কিনা তাহা ভাবিবার। কেন সম্ভব নয় তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। যে শক্তির অধিকারী তাহার সামাজিক মন ছোটবেলা হইতে যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সে সেইভাবেই সাড়া দিবে। সে যখনই কোন বাধার সামনে পড়িবে তখনই তাহার ঐতিহাসিক শিক্ষা, সামাজিক মনোবৃত্তি ও জৈবধর্ম্ম অনুযায়ী সাড়া দিবে। ইহা যে কেহ স্বীকার করিবেন যে ইংরেজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক শিক্ষা বুদ্ধ দর্শনদ্বারা প্রভাবিত নয়। আমরা যদি মানুষকে ইতিহাসের উপাদান বলিয়া মানিয়া লই তবে একথা স্বীকার করিতে দ্বিধা হইবে না যে, ইংরেজের ইতিহাসের উপাদানগুলির উপর কোন কালেও ঐ জাতীয় নীতির বা দর্শনের প্রভাব ছিল না; এ দেশে ইংরেজ তার কর্ম্মদ্বারা জনগণকে হিংসার কাজে বাধ্য করিয়াছে, কারণ ইংরেজ জাতির ইতিহাস জৈবধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের পক্ষে এই নব্য নীতি গ্রহণ করিবার সময় আসে নাই। তবে সমাজ-জীবনে হয়ত কোন একটা সময়ে জৈবধর্ম্মের ক্লান্তি আসে, তখন হয়ত গান্ধিবাদের নীতি য়ুরোপের কাছে সমাদৃত হইতে পারে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর তথাকথিত শান্তির কথা উঠিয়াছিল, আজও আবার শান্তির কথা উঠিতেছে—হয়ত য়ুরোপের সমাজ জীবনে সমষ্টিগতভাবে এই নীতির একটা ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে

জনগণ তাহা গ্রহণ করিবে কিনা এখন জোর করিয়া বলা যায় না। ক্রেগ সাহেব অবশ্য সবাইকেই এই নীতি গ্রহণ করিতে বলিতেছেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে গান্ধিবাদের প্রচার ও শিক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে। বিদেশেও ইহা নিয়া আলোচনা চলিতেছে তবে তাহা রাজনৈতিক দিক দিয়া নহে। এই নব্যপন্থার কতটা সম্ভাবনা আছে—তাহারই আলোচনা চলিতেছে। অবশ্য দিবাকর মহাশয় য়ুরোপে কতটা সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইয়াছে তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু তাহা য়ুরোপেরই বৃহত্তর ইতিহাসে কতটুকু স্থান অধিকার করে? য়ুরোপের ইতিহাস—ক্রমওয়েল বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব—এই তিনটি বিপ্লবই য়ুরোপের ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এক-একটি নূতন যুগ রচনা করিয়াছে।

ভারতে বর্ত্তমান ক্ষমতা হস্তান্তরকে ভারতের অহিংস বিপ্লবের বিজয় বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে, মনে হয় একটা আংশিক সত্যকে পুরোপুরি সত্য বলিয়া চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যে বাংলার নীলচাষীদের একট বিশেষ দান আছে এ কথা আজ সবাই ভুলিতে বসিয়াছে, কংগ্রেস জন্মিবার প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ব্বে বাংলার চাষীরা সক্রিয় প্রতিরোধ করিয়াছিল—তাহার নেতৃত্ব যাহারা করিয়াছিল তাহাদের প্রতি ঐতিহাসিকদের কি কোন দায়িত্ব নাই? কেবলই immediate circumstances দ্বারা কি তাহারা প্রভাবিত হইবেন? ইতিপূর্ব্বে 'হিন্দু মেলা' যে বাণিজ্য জগতে স্বদেশীব্যবহার ও প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল তাহা কি বর্ত্তমান ব্রিটিশ অপসরণ কার্য্যে কোন সহায়তা করে নাই? ইতিহাসের কোন ক্ষুদ্র অংশ এই বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মনকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে? আজ যদি ভারতে কিছু সার্থক হইয়া থাকে তবে তাহা এই সব ভিত্তির উপর হইয়াছে—অথচ তাহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই।

গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা স্থির করিয়াছিল অটোমান সাম্রাজ্যকে ভাগ করিতে হইবে। আরব জাতিকে স্বাধীনতা দিবার জন্য টি., ই. লেরেন্স সাহেবের মনে খুব প্রেরণা জাগিয়াছিল। তিনি আরব বেদুইন সাজিয়া আরব জাতির Self-Determinationএর জন্য লড়াই করিলেন, গোটা আরব জাতির মধ্যে তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়া, এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। তুর্কীর বিপ্লবীরা হয়ত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবারই জন্য লড়াই করিতেছিল। কিন্তু ইংরেজের কূটনীতি বিশাল সাম্রাজ্যের ইমারৎ ভাঙ্গিয়া খণ্ড ছিন্ন করিয়াছিল এবং তুর্কী বিপ্লবীদের বিপ্লবের মহৎ উদ্দেশ্য ভাষা, কৃষ্টি ও গোষ্ঠীগত প্রভেদের উপর জোর দিয়া ইংরেজ ব্যর্থ করিয়াছিল। ইহা ইংরেজের কূটনীতির খেলা। এই খেলা ইংরেজ রুশ বিপ্লবের বেলায়ও শুরু করিয়াছিল কিন্তু সফলকাম হয় নাই; সফলকাম হইল ভারতের বেলায়। অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে যেমন বহুজাতি ও বহুভাষা ছিল, জার সাম্রাজ্যের মধ্যেও তেমনি বহু জাতি ও বহুভাষা ছিল। কিন্তু রুশ বিপ্লবীরা ধর্ম্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা এবং স্ব স্ব রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ইত্যাদি স্বীকার করিয়া লইয়া এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। সম্ভবত রাশিয়া ছাড়া বর্ত্তমান ইতিহাসে এত বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্ম্মমত, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও কৃষ্টি একই যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় আর নাই। তাহারা যে পথে ইহার সমাধান করিয়াছে সে পথে আমাদের সমাধান হইল না। কেন সমাধান হইল না তাহাও ভাবিবার। প্রথমে কংগ্রেসনীতি ধরিয়া লইয়াছে যে ভারত এক ও অবিভাজ্য। কথাটা ভৌগোলিক তথ্যের বিচারে সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভারতে বহু জাতি আসিয়াছে, বাস করিয়াছে এবং এইখানেই শিকড় গাড়িয়াছে, কাল ধর্ম্মের প্রভাবে একে অন্যের ধর্ম্মাচরণ, সামাজিক ব্যবহার, ভাষা ও কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে এ মনে করিবার কারণ নাই যে, সবাই মূলের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া একেবারে বিলীন হইয়াছে, তবে মূলের সঙ্গে ছিন্ন হইয়া অন্যের মধ্যে যে কেহই একেবারে বিলীন হইয়া যায় নাই তাহা ও মনে করিবার কারণ নাই। তাহাও ভারতের ইতিহাসে ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারতে এমন দুই একটা জাতির প্রবেশ ঘটিয়াছে, যারা তাহাদের গোষ্ঠীগত ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নিয়া ভারতের ইতিহাসে সক্রিয় ভাবে বিরাজ করিয়াছে, যেমন ইসলাম, যেমন য়ুরোপীয় খৃষ্টান। ইতিহাসের এই সক্রিয় গতিকে যদি কংগ্রেসনীতি পূর্ব্বাহ্নেই মানিয়া লইতেন তবে ভারত বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে পারিত।

যদি কংগ্রেসনীতিকে গান্ধীবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলা যায় তবে বলিতে হয়, যে ইসলামের বিশেষ ঐতিহাসিক অংশ ও সংগঠন পুরোপুরি গান্ধীবাদে স্বীকৃত হয় নাই। খিলাফৎ আন্দোলনের ট্রাজেডি কি ছিল আজ তাহা কাহারো নিকট অবিদিত নহে। কংগ্রেস যে রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে মিলিত হইয়া কংগ্রেসের পথ সুদুর্গম করিয়াছে। সম্ভবত কংগ্রেস বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা ইহার সমাধান খোঁজে নাই। কেন খোঁজে নাই? ইহা জনসাধারণ প্রশ্ন করিতে পারেন। আমার মত সামান্য কর্ম্মীর পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব নহে। তবে মনে হয় গান্ধীবাদ ইতিহাসের এই দিকটার প্রতি সুবিচার করে নাই।

এই সব বিভিন্ন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে সব কর্ম্মীরা রাজনীতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহারা এত দিন সম্ভবত একটি বিষয়ের প্রতি মন দেবার সুযোগ পায় নাই। তাহাদের একটা সামাজিক মন যে রহিয়াছে তাহা যেন তাহারা ভুলিতে বসিয়াছিলেন। এই সামাজিক মনটি বিশেষভাবে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মাঝে পরিস্ফুট। আর আজিকার দিনে যত সব কর্ম্মী বাঙ্গালায় আছেন, তারা সবাই এই শ্রেণী হইতেই আসিয়াছেন। জেলে দেখিয়াছি খাদি কর্ম্মী ও বোমার দলের মধ্যে সামাজিক ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত। সরকার তার রাজনৈতিক উদ্দেশে একটা আইনগত প্রভেদ

রক্ষা করিতেন। ফলত সামাজিক মনে উভয়ে উভয়কে এড়াইয়া চলিতেন। এই মনোমালিন্য বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি করিয়াছে; যে সমস্ত দল বা উপদল বাঙ্গালায় আজ কংগ্রেসের মধ্যে রহিয়াছে তাহার অধিকাংশের অবস্থিতি যে ব্যাপক কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এ মনে করিবার কারণ নাই। কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অথবা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া একটা স্থানীয় রাজনীতি দানা বাধিতেছে। এই স্থানীয় রাজনীতি কি পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহা মেমারী প্রস্তাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালায় লীগ-রাজনীতি পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা কংগ্রেসের ভাঙ্গন ধরাইতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালায় লীগ-রাজনীতি মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাহারা লীগের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য বাঙ্গালাকে ভাগ করিল, এ আন্দোলনে কাহারো কোন ক্ষতি হয় নাই। শুধু টেলিগ্রাম করিতে হইয়াছে, মধ্যবিত্ত হিন্দু টেলিগ্রাম করিয়া জগৎবাসীকে বুঝাইয়া দিল যে তাহারা বাঙ্গালাকে ভাগ করিতে চায়। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে ইহারা কয়জন? যাক সে কথা, এই ভাগাভাগির মনোভাব হইতে কংগ্রেস কর্ম্মীরাও রেহাই পায় নাই। তাহারাও রাতারাতি নিজেদের ত্যাগ ও আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছেন। সেই সামাজিক মন—(খাদি বনাম অ-খাদি) (ঘটি বনাম বাঙ্গাল) নানারূপ ধরিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। ইহার পরিণতি কোথায়?

যতীন্দ্র-তর্পণ

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়

বিদ্রোহী বীর, হে মহামানব,—
বিপ্লবী অবতার—
আজি ভারতের নূতন উষায়
লহ গো নমস্কার।
হৃদয়-শোণিত সেচিয়া সেচিয়া
যেই বীজ তুমি গিয়েছ রোপিয়া—
চেয়ে দেখ বীর, আজ তাহা
মহা-মহীরুহ ফলবান—
মহাঘুম হতে জাগো বীর, শোনো
ওঠে তব জয়-গান।
শৃঙ্খল-গতা কাতরা জননী
নয়নে অশ্রু-জল—
তোমার নয়নে জ্বেলেছে বহ্নি,—
জ্বালায়েছে দাবানল;
আহুতি দিয়েছে কত মহাপ্রাণ
সে অনলে বারে বারে—
শ্বেত-শাসন-আসন টলেছে
সুদূর সাগর পারে।
আজি— অধীনতা-পাশ-মুক্ত-চরণে
ফুটে যে রক্ত-রেখা
হে বিজয়ী বীর, সে রাগ তোমারও
হৃদয়-শোণিতে লেখা।
নিষ্ঠা তোমার আকাশে, বাতাসে
ধ্বনিতেছে অবিরাম—
ইতিহাসে লেখা সোনার আখরে
রহিবে তোমার নাম।

পাঁচটি বাঙ্গালী—নায়ক যতীন—
চাষা খণ্ডের রণে—
সওয়া-দু'দণ্ড যুঝিল পাঁচশ'
পুলিশ-বাহিনী-সনে!
নমিল টেগার্ট পুরুষসিংহে
নগ্ন-আনত-শিরে!
অমর-কীর্ত্তি রেখে গেল বীর
বুড়ী বালাংএর তীরে!
দেশ-বৈরীর তুমি ছিলে ত্রাস—
নাগের গরুড় সম—
প্রয়োজন তব হয়নি ত শেষ,—
জাগো হে, দ্বিজোত্তম।
বিদেশী-বণিক্-অন্নে পুষ্ট
স্বরাজ-শত্রু যত—
বাংলার দেহ আজও পীড়িতেছে
পৃষ্ঠব্রণের মত।
সেদিনে তাহারা ছিল না অজানা,
ছিল না ছদ্মবেশ—
পয়োমুখ-বিষ-কুম্ভের দলে
ছেয়ে আছে আজ দেশ।
হে যতীন্দ্র তুমি ওঠো জ্যোতিঃ-রূপে
তরুণ হৃদয়ে জ্বলি!
কালের দধীচি—অমর শহীদ—
লহ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছবির পরে ছবির শোভাযাত্রা চলে। কিন্তু উনিশ শো তিরিশ সালের সেই গভীর গভীর পরিবেশের মধ্যেও মনে পড়ে, দলপতি ভোনা এবং তার সুযোগ্য পিতৃদেব ভবেন মজুমদারকে—ঝোড়ো মেঘের এককোণে এক ফালি রূপালি রেখার মতো তা ঝলমল করে ওঠে।

আকস্মিক দেশসেবার উত্তেজনায় বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছিল ভোনা, কিন্তু ছোট একটা কাঁটার খোঁচা লাগতেই সে বেলুন ফেটে চুপসে গেল।

দুরাত্রি হাজত বাস করেই ভোনা টের পেলো কাজটা ভালো হয়নি ; এবং দেশপ্রেম বস্তুটি আর যাই হোক, মনসাতলায় মার্বেল ফাটানো কিংবা গোষ্ঠের মেলায় হাত সাফাই করবার মতো সুখের ব্যাপার নয়। ছারপোকা আর কাঁটার মতো খসখসে রোঁয়ায় ভরা কম্বলশয্যা তার পুষ্পশয্যা বলে মনে হল না, মশার কামড়ে চোখ মুখ ফুলে উঠল, 'সোনেকি হিন্দুস্তান' গানটা ব্রহ্মতালুতে গিয়ে আটকে রইল, গলা দিয়ে আর বেরুল না। অবশেষে বাপ ভবেন মজুমদার থানা পুলিশে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুত করে, ছেলেকে বণ্ড লিখিয়ে দিয়ে, বিদেশীর এবং কংগ্রেসের বাপ-বাপান্ত করতে করতে পুত্ররত্নকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু আদালতের টাউট ভবেন মজুমদারের রাগটা ওইখানেই থামল না। পরের দিন সকাল বেলায় বুক টান করে সে দাঁড়িয়ে গেল মনসাতলার সিমেণ্টের বেদীটার ওপরে। না—বক্তৃতা দিয়ে জেলে যাওয়ার জন্যে নয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম উদ্দেশ্যে।

তারপর মুখ ছুটল ভবেন মজুমদারের।

শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় অবিশ্রান্ত গালাগালি। কংগ্রেস চোর, গান্ধী চোর। স্বদেশী ছোকরারা সব গুণ্ডা আর দমায়েসের দল। ইংরেজের সঙ্গে চালাকি করতে গেছে সব! ঠেঙিয়ে দেবে টিট করে, ভুলিয়ে দেবে বাপের নাম। তা দিক—তার জন্যে ভবেন মজুমদারের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তার ছেলেকে—এমন হীরের টুকরো ছেলেকে বিভ্রান্ত করেছে কোন্ শয়তান হতভাগারা ? তাদের কাঁচা মাথাগুলো আস্তো আস্তো চিবিয়ে খেলে তবেই রাগ মেটাতে পারে ভবেন মজুমদার।

বক্তৃতাটা হল জমাট—প্রায় ঝাড়া দেড়ঘণ্টা। যারা শুনছিল তারা তখনকার মতো কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা হল তার পরের দিন—ভোরের আলো আকাশে ফুটে ওঠবার আগেই।

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

টিন পিটানোর বিশ্রী বেখাপ্পা আওয়াজে পাড়ার লোক জেগে উঠল। আর জেগে উঠলেন ভবেন মজুমদার—কিন্তু সে জাগরণ আনন্দের নয়। এই যে বৈতালিকেরা তাঁকে প্রভাতী শুনিয়ে জাগাতে এসেছে এদের উদ্দেশ্য যে একেবারেই সাধু নয় এ সম্বন্ধে ভবেন মজুমদারের সন্দেহ রইল না!

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

প্রায় পঁচিশ তিরিশটি পাড়ার ছেলে জড়ো হয়েছে ভবেন মজুমদারের বাড়ির সামনে। আট দশটা ভাঙা ক্যানেস্তারা কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে সব—প্রাণপণে তাই পিটছে তারা। শব্দে যে কোনো লোকের শুধু কান কেন, মাথার পোকা পর্য্যন্ত বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

টিন পেটানোর দলে আজ রঞ্জুও ছিল।

—এসব কী ?—রোষরক্ত লোচনে ভবেন মজুমদার বললেন, অ্যাঁ, কী এসব ?

উত্তর এল সমস্বরে।

—বন্দে মাতরম্—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—ভারত মাতা কী জয়—

ক্রোধে ভবেন মজুমদার তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বললে, শালা শূয়ারকা বাচ্ছা সব! ভাগো, ভাগো এখান থেকে—

এবার জবাব দিলে ক্যানেস্তারা। ভবেন মজুমদারের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে কর্ণপটহবিদারী শব্দ উঠতে লাগল: ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

—পালা সব, নইলে খুন করে ফেলব বলছি—

ক্যানেস্তারা দ্বিগুণ জোরে প্রত্যুত্তর দিলে।

ভবেন মজুমদার আবার একটা লাফ দিলে শূন্যে। এ অবস্থায় হাই-জাম্প্ প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে সে বোধ হয় রেকর্ড করে ফেলতে পারত একটা। বললে, এই ভোনা, এই হারামজাদা, হামারা লাঠি লে আও—

উত্তেজনায় ভবেন মজুমদার ভুলে গিয়েছিল তার ছেলে বাঙালী, হিন্দুস্থানী নয়।

কিন্তু বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে ভোনা তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্যানেস্তারা পার্টির দিকে তাকিয়ে আছে। Thou too Brutus—অ্যাঁ! কাল পর্য্যন্ত যাদের ওপর তার একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল, আজ তারাও তার শত্রুপক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। কালী, খাঁদু, পুর্ণ—তার বিশ্বস্ত অনুচরেরা শেষে তাদেরই বাড়ির সামনে এসে ক্যানেস্তারা বাজাতে সুরু করেছে!

—এই শালা শূয়ারকা বাচ্ছা, শুনা নেই? হামি বোলানা তুম্‌কো লাঠি আনতে?—বলেই ভবেন মজুমদার একখানা দশাশই চাঁটি হাঁকড়ালো ভোনার কানের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁত্ করে উঠেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ভোনা, আর ভৈরব হুঙ্কার ছেড়ে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো ক্যানেস্তারা পার্টিকে তাড়া করলে ভবেন মজুমদার।

ক্যানেস্তারা পার্টি তৈরীই ছিল, চক্ষের নিমেষে হাওয়া। সমস্ত পাড়াটা নিষ্ফল আক্রোশে দৌড়ে ভবেন মজুমদার যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, তখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তেম্‌নি ক্যানেস্তারা তার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে বাজতে আসছে।

ভবেন মজুমদার ঝাঁ করে থেমে দাঁড়ালো, আবার তাড়া করল। আবার ফিরল, আবার তাড়া করল। তারপর যখন বেদম হয়ে দাওয়ায় বসে কদর্য গালিগালাজ সুরু করলে, তখন তার কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে দশ দশটি ক্যানেস্তারা তেম্‌নি পরম পুলকে যথাস্থানে এসে আনন্দ-ধ্বনি করছে।

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা নিশ্ছেদ নিয়মে ক্যানেস্তারা বেজে চলল। ভবেন মজুমদার ঘরে থাকে—বাড়ির চারদিকে ক্যানেস্তারা বাজে; বাজারে যায়, পেছনে ক্যানেস্তারা চলে; উকিলের সেরেস্তার দিকে হাঁটে, পেছনে ক্যানেস্তারা হেঁটে যায়; রাত্রে শোয়ার চেষ্টা করে, জানালার বাইরে ক্যানেস্তারা ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে থাকে। সমস্ত সহরের একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠল ভবেন মজুমদার।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ভবেন মজুমদার ভোনার হাত ধরে আবার সেই মনসাতলায় এসে দাঁড়ালো। বললে, ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় করছি। ক্যানেস্তারা বন্ধ হোক —আমার প্রাণ যায়।

ছেলেরা বললে, বলুন, বন্দে মাতরম্—

কাতরস্বরে ভবেন মজুমদার বললেন, বন্দে মাতরম্।

—বলুন, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!—ভবেন মজুমদার প্রায় কেঁদে ফেললে।

ক্যানেস্তারার নিনাদ বন্ধ হল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

ঝড়ের গতিতে উড়ে বেরিয়ে গেল আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনগুলি। চম্পারণে, মেদিনীপুরে জেগে রইল তার মৃত্যুঞ্জয় স্বাক্ষর। কারাগারে, নির্যাতনে, রক্তপাতে আরো দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল স্বাধীনতার শপথকে; ভয়ের সন্দেহ রইল না যে এবার যাত্রা সুরু, থেমে দাঁড়াবার উপায় রইল না।

বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তকে রাতের পর রাত জেগে রঞ্জু আবৃত্তি করে যেত:

"বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
এসেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ—"

তার পর এল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। নানা লোকে নানা ভাবে বিচার করলে তাকে। কেউ খুশি হল, কেউ হল না। কেউ এটাকে অপমান মনে করে লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে রইল, আবার কেউ বা একে সম্মানজনক সন্ধি বলে বিশ্বাস করে নিলে। আন্দোলন থামল। তখনকার মতো লাভায় আচ্ছন্ন রইল অগ্নিগিরির মুক্তিমুখ, কিন্তু 'বন্দরের কাল হল শেষ!'

জানালা দিয়ে আত্রাইয়ের বন্যা দেখেছিল রঞ্জু, অভিভূত দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল অসহযোগ আন্দোলনের রূপটাকে। কিন্তু এইবারে এল তার পালা। আর এক নতুন পথে, আগুন জালা রক্তধারা এক দুর্গমের অভিসারে তাকে হাতছানি দিলে উনিশ শো তিরিশ সাল।

সূত্রপাতটা হল আশ্চর্য রকমে।

খবরের কাগজের পাতায় ভয়ঙ্কর সংবাদ এল একটা। চঞ্চল হয়ে উঠল দেশ।—পুরের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট আততায়ীর রিভলভারের গুলিতে নিহত। সংবাদ ওইখানেই শেষ হল না। একটার পর আর একটা—ডাক লুট, ডাকাতি, হত্যা, বোমা বিস্ফোরণ। ত্রিবর্ণ-পতাকার আলোড়নে চঞ্চল শান্তিপূর্ণ অহিংস-বাংলা দেশের বুকের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করলে আগ্নেয়গিরি।

পাড়ার একদল ছেলের সঙ্গে কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে ফিরছিল রঞ্জু। হঠাৎ একজন শ্লেষভরা গলায় বললে, ওই ছাখ, ভালো ছেলে যাচ্ছে।

সকলের দৃষ্টি এক সঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে। একটা সাইকেলে করে চলেছে পরিমল।

শুনিয়ে শুনিয়ে খাঁদু বললে, হ্যাঁ, বড় হয়ে রায়বাহাদুর হবে। এত বড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, ঘর থেকে একবার বেরুল না পর্যন্ত!

পরিমল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বোঁ করে ঘুরিয়ে দিলে সাইকেলটা। তার পর দলটার একেবারে পথরোধ করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

—এই যে দেশপ্রেমিকের দল, ভারতমাতাকে স্বাধীন করে ফিরে এলে তো?

অবাক বিস্ময়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের মুখের দিকে। এমন দিনে এই রকম কথা যে কেউ উচ্চারণ করতে পারে এটা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। অল্প পরিচয়, মুখ চেনা বললেই হয়, তবু কেন কে জানে পরিমল সম্পর্কে রঞ্জুর কেমন মোহ ছিল একটা—একটা কৌতূহল ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর একটা ঘা দিয়ে যেন পরিমল তার মোহভঙ্গ করে দিলে। পরিমল আর যাই হোক—সে যে ভবেন মজুমদারের দলের লোক এতটা ভাববার জন্যে রঞ্জুর মন তৈরী ছিল না।

জবাব দিলে পূর্ণ: তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

—লজ্জা? কেন?—কৌতুকভরা হাসিতে পরিমলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: তোমরাই তো গান গেয়ে বেড়াও—'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

কালী বললে, ধিক।

কিন্তু পরিমল গায়ে মাখল না। তেমনি উজ্জ্বল স্বরে প্রশ্ন করলে, ব্যাপারটা কী? সবাই মিলে এ ভাবে চাঁদা করে আমায় গাল দিচ্ছ কেন?

খাঁদু ঘৃণামিশ্রিত মুখে বললে, বুঝতে পারছ না?

—একেবারেই না। বোঝালে বড় বাধিত হব।

তোনার অভাবে আজকাল খাঁদুই নেতা। সুতরাং বোঝাতে সুরু করলে।

—আজ দলে দলে দেশের ছেলে জেলে যাচ্ছে। স্বাধীনতা আসছে। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্তে টেরী বাগিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

পরিমল বোঝবার ভাণ করলে: ওঃ, তাই নাকি! খেয়াল করিনি তো। তা কী যেন আসছে বললে?

—স্বাধীনতা।

—স্বাধীনতা? আসছে নাকি? কোন ট্রেণে?

খাঁদুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহী হওয়ার ল্যাঠা অনেক। চটলে চলবে না—তাতে ভারত মাতা ব্যথা পাবেন। সুতরাং অহিংস গলায় জবাব দিলে, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কী দেবার সময় আমাদের নেই। আমরা কাজের লোক। সরো, পথ ছাড়ো।

পূর্ণ বললে, সামনে আসন্ন স্বাধীনতার রূপ দেখেও তুমি এমন করে ইয়ার্কী দিতে পারছ এটাই আশ্চর্য!

—স্বাধীনতার রূপ? সে কী রকম ভাই!—আবদারের সুরে পরিমল বললে, একটা ছাগলের গলায় খদ্দরের দড়ি

আর তার পিঠে একবস্তা স্বদেশী লবণ—এই কি স্বাধীনতার মূর্তি ?

—যা বোঝোনা, তা নিয়ে বাজে কথা বোলোনা—কালী চটে উঠল।

—আহা-হা, ক্ষেপছ কেন ?—পরিমল হাসিমুখে বললে, সত্যাগ্রহীর যে চটতে নেই ! আচ্ছা, তোমরা তো সবাই অহিংস, আমি যদি তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে রাম চাঁটি লাগিয়ে দিই, তোমরা নিশ্চয় তাতে আপত্তি করবে না ?

মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠল খাঁদুর, কিন্তু ব্যর্থ আক্রোশ। পরিমলের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে সে পাশ কাটিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই।

পেছন থেকে ডাক দিলে পরিমল : চললে ? হে দেশপ্রেমিকেরা, নিতান্তই যদি যাবে তা হলে যাওয়ার আগে কেউ আমাকে চার আনা পয়সা ধার দিয়ে যাও।

মুখ ফিরিয়ে কালী বললে, কী করবে চার আনা পয়সা দিয়ে ?

—গলায় দেবার জন্যে দড়ি কিনব।

এর পর আর কথা চলে না। মুখ গোঁজ করে নিরুপায় স্বেচ্ছাসেবকেরা হাঁটতে সুরু করলে। পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল পরিমলের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

দু পা এগিয়ে খাঁদু বললে, বিশ্বাসঘাতক !

পূর্ণ বললে, শেমলেস !

কালী বললে, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু।

রঞ্জু কিছুই বললে না। রাগ নয়, অনুযোগ নয়, একটা গভীর বেদনাবোধে সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পরিমলের ভেতরে অসাধারণ কিছু একটা কামনা করেছিল সে—আবিষ্কার করতে চেয়েছিল কোনো একটা আশ্চর্য কিছুকে। নির্জন কাঞ্চন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কী একটা দুর্বোধ সম্ভাবনা তার চেতনাকে দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো কাঁচের বাসন ভেঙে পড়বার মতো বিশ্রী শব্দ করে মনের ভেতরে কী যেন চুরমার হয়ে গেল তার।

কিন্তু পৃথিবী অনেক বড়—মানুষ অনেক বড়। রঞ্জু সেটা জানল এরই দিন কয়েক পরে। উনিশ শো তিরিশ সাল তার মনের সামনে খুলে দিলে আর একটা মণিকোঠার দরজা। (ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধীর ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

একথা আজ সর্ববাদীসম্মত যে, মহাত্মা গান্ধী বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত যে সকল শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পবিত্র জীবন-যাপন প্রণালী, সত্যাগ্রহ, অহিংসানীতি, মানবপ্রেম, রাজনীতিবোধ, ধর্মমত প্রভৃতিই তাঁহাকে এই সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। ভারতের মর্মবাণী "সত্য" ও "অহিংসা"কে তিনি তাঁহার রাজনীতি ও ধর্মজীবনে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন যে, তাহা অপূর্ব ও অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। পরাধীন ভারতের মুক্তিকামনাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইলেও ধর্মের ক্ষেত্র হইতে তিনি সামান্য মাত্রও দূরে থাকেন নাই। রাজনৈতিক জগতে তিনি যেমন একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মের জগতেও তিনি তেমনি কোনও ধর্মপ্রচারক বা ধর্মগুরু হইতে কম নহেন। তবে সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী বা ঋষির ন্যায় তিনি তাঁহার ধর্মসাধনার জন্য জগৎসংসার ত্যাগ করিয়া পর্বতের গুহা, নদীর তীর, বন, জঙ্গল, কি অন্য কোথাও কোন নির্জন স্থান বাছিয়া লন নাই। সমগ্র ভারতই তাঁহার কর্ম ও সাধনার স্থান। ভারতের ৪০ কোটী নরনারীর সুখ দুঃখের সহিতই তাঁহার সাধনভজন জড়িত। তাই রাজনীতি ও ধর্মনীতি তাঁহার নিকটে দুইটি পৃথক জিনিষ নহে। তিনি বলেন—ধর্ম ছাড়া রাজনীতি নাই। রাজনীতি হইল ধর্মেরই সহকারী। ধর্মবঞ্চিত রাজনীতি একটি মরণের ফাঁদ বিশেষ, কারণ ইহা আত্মার মৃত্যু ঘটায়।

এক সময়ে কয়েকজন খৃষ্টান তীর্থযাত্রী ওয়ার্ধায় আসিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ভারতে তাঁহার মূল কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—আমার কর্মপ্রণালী সম্পূর্ণ ধর্মবিষয়ক। সকল মানুষের সহিত আমি নিজেকে পরিচিত করিতে না পারিলে, আমি ধর্ম জীবন পরিচালন করিতে পারিব না এবং ইহা করিবার জন্যই আমি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছি। আজিকার দিনে মানুষের সকল কর্ম ধারাই এমন ভাবে এক সঙ্গে জড়িত যে উহাদিগকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্মবিষয়ক বলিয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না। মানুষের কাজ ছাড়া যে, কোন ধর্ম থাকিতে পারে ইহা আমার জানা নাই।

মহাত্মা গান্ধী তাই মানুষের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া তাহারই মাধ্যমে তাঁহার সত্য ও অহিংসা ধর্মের প্রচার করিতেছেন।

তাঁহার রাজনীতি ও ধর্মনীতি পাশাপাশি চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—বাহিরে আমি রাজনীতির আবরণ পরিধান করিলেও অন্তরে কিন্তু আমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও নিজের জীবনে সকল ধর্মেরই সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। তিনি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম জীবনে হিন্দুর বেদ-বহির্ভূত জগতের অপরাপর ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জগতের সকল ধর্মকেই তিনি সমান শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি নিজেকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শী সকল সম্প্রদায়েরই লোক বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন—পৃথিবীতে বহু ধর্মমত থাকিলেও প্রত্যেক ধর্মেই আধ্যাত্মিক বহু কথা রহিয়াছে এবং সকল ধর্মেই এই আধ্যাত্মিক কথাগুলি প্রায় অভিন্ন। এই দিক দিয়া এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে প্রত্যেক ধর্মেই বর্তমানে বহু দোষ জুটিয়াছে। এগুলি সকল ধর্মেরই মূল শিক্ষার বিরোধী।

মহাত্মা গান্ধী নিজে পৌত্তলিক নহেন বটে, কিন্তু পৌত্তলিকদের প্রতি তাঁহার কোনরূপ অশ্রদ্ধাও নাই। তিনি বলেন—জগতের যাহা কিছু, সকলের মধ্যেই ভগবান ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। সামান্য-ধূলিকণাতেও তিনি রহিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মূর্তিপূজা করেন, তাঁহারা সেই ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকেন। কারণ যাহা কিছু আরাধনা করা যাইবে তাঁহারই আরাধনা হইবে। যে অবর্ণনীয়, রহস্যময় ও সর্বব্যাপী-শক্তি সদাপরিবর্তনশীল ও মরণশীল জগতের মূলে থাকিয়া নিজে অপরিবর্তিত রহিয়াছেন এবং জগতের সকলকেই ধারণ করিয়া সৃষ্টি, ধ্বংস ও পুনর্সৃষ্টি করিতেছেন, সেই শক্তিই হইল ভগবান।

ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য—ভগবানের অসংখ্য নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে নামেই তাঁহাকে ডাকুন না কেন, সেই এক ভগবানকেই ডাকা হইবে। ঈশ্বর, আল্লা, গড্ প্রভৃতি নাম বিভিন্ন ধর্ম দিয়াছে মাত্র। ভগবানকে আমি রাম নামেও ভজনা করিয়া থাকি। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি অজ, স্বয়ম্ভু। মহাত্মাজী এই ভগবানকেই কেবল ভয় করিতে বলেন, এবং ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, গীতার কথামত ফলে আশা না করিয়া ভগবানে আমাদের সমস্ত কাজ অর্পণ করা উচিত। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হইল তাঁহার দৈনিক প্রার্থনা। তাহার প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেন—ভগবানে আমার বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে, আমার প্রার্থনায় আগ্রহও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। প্রার্থনা ব্যতীত জীবন নিরানন্দ ও ফাঁকা বলিয়া মনে হয়। শরীরের জন্য খাদ্যের যেমন প্রয়োজন, আত্মার জন্য তেমনি প্রার্থনাও একান্ত আবশ্যক। বরং আত্মার জন্য প্রার্থনার যতটা প্রয়োজন শরীরের জন্য খাদ্যের ততটা প্রয়োজন নাই। কারণ শরীর ঠিক রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে উপবাসের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রার্থনায় এরকম কোনও ব্যবস্থার কথা নাই।

মহাত্মা গান্ধী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রার্থনা ভিন্ন, প্রতিবার আহার গ্রহণ কালেও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রার্থনা-পদ্ধতিকে কোন এক সম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মের বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ইহাতে সকল ধর্মেরই সমন্বয় থাকায়, যে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার সহিত প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন।

তাঁহার প্রার্থনায় প্রথমেই বৌদ্ধধর্মের জাপানী মন্ত্র "নম্যো হো রেঙ্গে কো" এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করা হয়। ইহার অর্থ হইল—সদ্ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই মন্ত্রটি মাত্র অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে মহাত্মার প্রার্থনার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। একজন জাপানী-ভিক্ষু এই মন্ত্রটি প্রবর্তন করেন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের জন্মস্থান ভারত ভ্রমণে আসিয়া সেবাগ্রামে ২।৩ বৎসর অবস্থান করেন। মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় উক্ত বৌদ্ধ-ভিক্ষু ইহা আবৃত্তি করিতেন। পরে জাপানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অন্তরীন লইয়া যান। কিন্তু গান্ধীজীর প্রার্থনায় তাঁহার প্রবর্তিত মন্ত্রটি আজও চলিয়া আসিতেছে।

জাপানী মন্ত্রটি উচ্চারিত হইবার পরই গান্ধীজীর প্রার্থনায় ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক,—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করা হয়। ইহার অর্থ—জগতে যাহা কিছু বিষয় আছে, সেই সমুদয়কে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরময় এরূপ জানিয়া বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ বিষয় বদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; অথবা ঈশ্বরপ্রদত্ত বিষয় দ্বারা ভোগ নির্বাহ কর। কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

মহাত্মাগান্ধী ত্রিবাঙ্কুরে হরিজন সেবাকার্য লইয়া যখন ভ্রমণ করেন, তখন হইতে তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে এই শ্লোকটি যোগ করা হয়। ঈশোপনিষদের এই মন্ত্র ও জাপানী মন্ত্র এই দুইটিই গান্ধীজীর প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যকালীন উভয় প্রার্থনারই প্রারম্ভে উচ্চারণ করা হয়।

প্রভাতকালীন প্রার্থনায়, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শ্লোক, ভূমাতা, সরস্বতী, গণেশ, গুরু, বিষ্ণু, ব্রহ্মেরস্তব প্রভৃতি আবৃত্তি করা হয় এবং সান্ধ্য প্রার্থনায় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪-৭২ এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হয়। প্রভাত ও সন্ধ্যার প্রার্থনায় এইটুকু পার্থক্য থাকিলেও উভয় প্রার্থনারই শেষাংশে একাদশব্রত, কোরাণের শ্লোক ও জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম-শাস্ত্রের অংশ যথাক্রমে উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। এই একাদশব্রত হইল—

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ।
শরীর-শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয় বর্জন॥
সর্ব ধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শ ভাবনা।
হী একাদশ সেবাবী নম্রত্বে ব্রত নিশ্চয়ে॥

অর্থাৎ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ,

ভয়বর্জন, সর্বধর্মে সমানত্ব, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা বর্জন এই একাদশ ব্রত। এই ব্রত সমূহ পালন দ্বারা নম্রত্ব লাভ হয়।

আব্বাস তোয়েবজীর কন্যা রায়হানা তোয়েবজীর প্রস্তাব অনুযায়ী মহাত্মাজী তাঁহার প্রার্থনায় কোরাণের অংশটুকু যুক্ত করেন। কোরাণের শ্লোকটির বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ—আমি পাপাত্মা শয়তান হইতে বাঁচার জন্য পরমাত্মার স্মরণ লইতেছি।

হে প্রভু, তোমার নামেই সমস্ত কার্য আরম্ভ করি। তুমি দয়ার সাগর, তুমি কৃপাময়, তুমি সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা, তুমিই মালিক। আমি তোমারই আরাধনা করি—তোমারই সাহায্য চাই। অন্তকালে তুমিই ন্যায় করিবে। তুমি আমাকে সরল পথ দেখাও, তাঁহাদেরই চলার পথ দেখাও। যাঁহারা তোমার কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার পাত্র হইয়াছেন, যাঁহারা তোমার অপ্রসন্নতার পাত্র, যাহারা ভুল পথে চলিয়াছে তাহাদের পথ আমাকে দেখাইও না।

ঈশ্বর এক, তিনি সনাতন, তিনি নিরালম্ব, তিনি অজ, অদ্বিতীয়। তিনি সমস্ত সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই।

আগা খাঁ প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী কস্তুরবার মৃত্যু হইলে, ডাক্তার গিলডার জরথুষ্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্র হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোকটি সেই সময় হইতেই গান্ধীজীর প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জরথুষ্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্রের শ্লোকটির অর্থ হইল—হে হোরমজদ, সর্বোত্তম ধর্ম ও শব্দ এবং কর্মের বিষয় আমাকে বল। যাহাতে আমি সৎপথে থাকিয়া তোমার মহিমাকীর্তন করিতে পারি। তুমি যেমন ইচ্ছা আমাকে পরিচালিত কর। আমার জীবন চিরনবীন থাকুক ও আমাকে স্বর্গসুখ দান করুক।

প্রাতে এবং সন্ধ্যায় উভয় প্রার্থনাতেই শ্লোক উচ্চারণ শেষ হইলে ভারতীয় কোন ভাষায় একটি ভজন অথবা একটি ইংরাজী স্তোত্র গীত হয়। ভারতীয় ভাষায় ৫৪টি ভজন ঠিক করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের রচিত বাঙ্গলা গান। ভজনের পর করতালি দিয়া রামধুন গান হয়। ১৮টি রামধুন গানের মধ্যে যে কোনও একটি লইয়া করতালিসহযোগে পাঁচ মিনিট ধরিয়া গাওয়া হয়।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় রামধুন গানের পর গীতা পাঠ হয়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ভাগ করিয়া ৭ দিনে পাঠ শেষ করা হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠের পর,

বিপদো নৈব বিপদঃ সম্পদো নৈব সম্পদঃ।
বিপদ্বিস্মরণং বিষ্ণোঃসম্পন্নারায়ণ স্মৃতিঃ॥

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করা হয়। ইহার অর্থ—

বিপদ বিপদ নহে এবং সাংসারিক সম্পদ সম্পদ নহে, বিষ্ণুকে ভুলিয়া যাওয়াই বিপদ, আর নারায়ণকে স্মরণ করাই সম্পদ।

সান্ধ্য প্রার্থনায় রামধুন গানের পর রামায়ণ পাঠ করা হয়, তবে প্রকাশ্য স্থানে প্রার্থনা সভার আয়োজন হইলে সেখানে রামায়ণ পাঠ সম্ভব হইয়া উঠে না। এইসব সভায় গান্ধীজী সাধারণতঃ প্রার্থনার শেষে সমবেত নরনারীদের উদ্দেশ্য করিয়া নানারূপ উপদেশ দিয়া থাকেন এবং কেহ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দেন।

প্রভাত ও সন্ধ্যার প্রার্থনা ছাড়া মহাত্মা গান্ধী যখনই আহার গ্রহণ করেন তখনও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আহার কালীন প্রার্থনায় তিনি, ওঁ সহনাববতু। সহনৌভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইহার অর্থ হইল—তিনি আমাদের দুই জনকে একসাথে রক্ষা করুন। তিনি একসাথে আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন একত্র মিলিত হইয়া পুরুষার্থ করি। আমাদের অধ্যয়ন যেন তেজস্বী হয়। আমরা যেন একে অন্যকে দ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সেবাগ্রাম ভিন্ন মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবান্বিত সকল গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানেই যথা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত খাদি প্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানেই এই প্রথায় প্রার্থনা হইয়া থাকে। এই প্রার্থনায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভগবানের নিকটে "দেহি" বলিয়া কিছুও চাওয়া হয় না। সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া শুধু এই বলা হয় যে, আমাকে নির্মল কর, পরিশুদ্ধ কর ইত্যাদি। মহাত্মার এই প্রার্থনাপদ্ধতি হইতে দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মের সারাৎসার গীতার নিষ্কাম ধর্মকেই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হইতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবেরও সেবক হইতে হইবে। তাই তিনি এই সেবাকার্যেই নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের জন্য ভগবানের নিকটে তিনি কি বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রাতঃকালীন প্রার্থনা হইতে উদ্ধৃত নিম্নের শ্লোক দুইটিতে তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। তিনি প্রার্থনা করেন—

নত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

আমি রাজ্য অথবা স্বর্গ অথবা অপুনর্ভব বা মোক্ষ চাই না। আমি কেবল এই চাই যে, দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখের অন্ত হউক।

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং
ন্যায়েন মার্গেন মহীং মহীশাঃ
গোব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু॥

প্রজার কল্যাণ হউক। নরপতিগণ ন্যায়পথে পৃথিবী পালন করুন। গো ব্রাহ্মণের শুভ হউক ও সমস্ত লোক সুখী হউক। *

---

* সংস্কৃত, জরথুষ্ট্রীয় ও কোরানের শ্লোকগুলির বাঙলা অনুবাদ খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত 'আশ্রম ভজনাবলী' হইতে গৃহীত।

শকুন্তলা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শকুন্তলা, আজ সহসা বসন্তোদার সমীরণে
স্মৃতির খাতায় প্রীতির পাতায় তোমার কথাই পড়্‌ছে মনে!
মূর্ত্তি তোমার নিত্য-লোকের চিত্তে জাগে যে রূপ ধরি',
ব্যথার মতন ভুল্‌তে তারেই ব্যথায় মতোই স্মরণ করি।
ক্ষণে-ক্ষণে ভাব্‌ছি তাই আজ, দুষ্মন্তকে হারিয়ে দিয়ে,
নাই-বা হ'লাম রাজাধিরাজ, তোমায় ভালোবাসব প্রিয়ে,—
বাস্‌ব ভালো মনে-প্রাণে শুধু চোখের নেশাতে নয়,
রূপের মোহের ক্ষণিক খেলার নয় অভিনয় আমার প্রণয়;
যে প্রেম তাহার প্রিয়ায় চেনায় আপন-দেওয়া অভিজ্ঞানে,
চপল চোখের খেয়াল সে তো, প্রাণ কোথা তার প্রণয়-ধ্যানে।
শকুন্তলা, হায় অবলা! তপোবনের তড়িল্লিখা,
এ নয় সখের আতস-বাজি, সাগ্নিকের এ অগ্নিশিখা!

শকুন্তলা, আমি জানি তোমার গভীর গোপন ব্যথা,
শাপ দিয়ে যা' নষ্ট করে রুষ্ট ঋষির মুখের কথা!
তন্ময়তাই সত্য পূজা, ভগবানেও মিলায় যা'তে,
গুণ হয়ে তাই দুষ্ট হ'ল ভ্রষ্ট নীতির সংহিতাতে!
প্রেমের পূজায় যে মন বাঁধা, চায় কি সে মন অন্য পানে,
সকল ধর্ম্ম ভুলায় যে তার প্রাণের ধর্ম্ম-অভিধানে।
সুদুঃসহ বিরহ যার জীবন-মরণ সমান গণে,
কিসের 'অয়মহং ভোঃ' কা'র, নাই যদি তার যায় শ্রবণে।
এতই কি সে অপরাধী,—পাতকী সে এম্‌নি পাপে,
ধর্ম্ম তাহার হান্‌তে হবে মর্ম্মঘাতন অভিশাপে?
ক্রৌঞ্চীবধের যে বেদনা বিঁধল ঋষি বাল্মীকিরে,
নারীবধে দুর্ব্বাসা যে, শোধ কি তারই দিল ফিরে'?

শৈলবালার স্বয়ম্বরা যোগীন্দ্র সেই শিবের কাছে,—
সার্থতা তার বুঝতে পারি, তপের বিঘ্ন ঘটায় পাছে!
দুষ্মন্ত নয় তপস্বীরাজ, সমাজ-ধর্ম্মে শুধু রাজা,—
নারী বলে'ই তাই সে দিল কাপুরুষের যোগ্য সাজা!
রাজাই বা সে কেমন করে' বনাশ্রমের গহন-তলে
মন-হরিণীর হৃদয় হানে বন-হরিণীর শিকার-ছলে!

বনের মৃগী, সেও যে ভয়ে পালায় আপন প্রাণের লাগি',
মনের মৃগী—দেয় সে ধরা মরণ-ব্যাধের শরণ মাগি'!
যে অজানায় যায় না চেনা রাজার সজ্জা-অন্তরালে,
তার হাতে, হায়, এমন লজ্জা লেখা ছিল তোমার ভালে!
তপোবনের মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা! তোমার তরে
সতায় শিরোমণি হয়েও মিললো না ঠাঁই রাজার ঘরে!

হায় সরলা শকুন্তলা, কণ্ব মুনির তপোবনে
ভালই ছিলে অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা সখার সনে।
হরিণ-গাভী-পুষ্প-পাখী সঙ্গী-সাথী সকল ছাড়ি'
গুরুর আদেশ ভিন্ন কেন অন্য পথে চললে নারি?
খুললে কেন মনের দুয়ার অজানারে প্রণয়-দানে,
দুললে কেন কপট কথায়, ভুললে মনোভবের বাণে?
জানি তরুণ মনের ধর্ম্ম, মানি দেহের দুর্ব্বলতা,
কৃচ্ছ্র কঠোর সংযম-ডোর সেও শোনে না যুক্তি-কথা;
বনে যখন বকুল ফোটে, মনে তখন কোকিল ডাকে,
হায় অবলা, মুগ্ধ হিয়ার প্রাণের তৃষ্ণা মানবেনা কে?
তবু জানি, প্রণয়-ফাঁদে অপরাধে কে কার বেশী,
স্বভাব-কোমল বালিকা, না প্রভাব-প্রবল রাজ-বিদেশী!

কার কাছে কে প্রবঞ্চিত, অপরাধী কে কার কাছে?
প্রত্যাখ্যানের অপমানে কে কার হৃদয় বিঁধিয়াছে!
রাজার ধর্ম্ম জানেন রাজা, প্রেমের মর্ম্মে কোথায় ক্ষমা?
তোমার প্রেমের বিত্তে প্রিয়ে, তুমি নিখিল-চিত্তরমা!
কাহার শাস্তি কে লয় শিরে, যতই ভোলাও তপস্যাতে,
তোমার অসম্মানের লজ্জা ধরছেনাক এই ধরাতে!
উপেক্ষিতার মূর্ত্তি তোমার কাঁদছে আমার চিত্ত ভরি',
ব্যথার মতোই ভুলতে গিয়েও ব্যথার মতোই স্মরণ করি।
ক্ষণে-ক্ষণে তাই তো ভাবি, দুষ্মন্তকে হারিয়ে দিয়ে
তোমার প্রেমের যোগ্য হয়ে তোমায় ভালোবাসবো প্রিয়ে।
বাসবো ভালো মনে-প্রাণে, সর্ব্বস্ব মোর বিলিয়ে পায়ে
প্রেমের আলো জ্বালবো তোমার, ধূপের মতোই আত্মদাহে।

শকুন্তলা, শকুন্তলা, এ সত্য মোর, ধর্ম্ম জানে,
নিখিল নারীর নিখিল প্রেমের লও সেবা এই প্রেমের দানে।
সারা তপোবনের মূর্ত্ত প্রতীক তুমি আঁখির আগে,
তড়িল্লতা ঐ তনুতে চাঁদের চোখেও চমক লাগে!
অপ্সরা ও ঋষির মিলন দেখেছি ঐ দেহ মনে,
রতির পুণ্যারতি যেন মহেশ্বরের শ্রীচরণে।

ময়ূর-মৃগ তোমার সেবার বৎসলতায় প্রাণে বাঁচে,
বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-পাতা নিত্য তারি প্রসাদ যাচে;
বনাশ্রমের মুখশ্রীতে অভিন্ন দুই সখার সাথে
তোমার উদার দৃষ্টি বাঁধা মাতৃস্নেহের মমতাতে!
ভাব্‌ছি মনে, দেখ্‌ছি যত চপল রাজার প্রেম-অভিনয়,
তোমার প্রেমের অসম্মানে প্রেমের রাজ্যে মানুষ সে নয়!

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ

(২)

যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রহ্মে যখন ফ্যাসীবিরোধীগণ স্বাধীনতা লীগের পতাকা তলে একত্র হয়ে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে সেই সময় দলের অবিসম্বাদী নেতা উঃ আউঙ্গ-সান তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে যে ভাবে নিহত হয়েছেন তাতে ব্রহ্মদেশের দুর্ভাগ্যই সূচিত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ব্রহ্মের-রাজনীতিক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় সকল নেতাই স্থানচ্যুত হয়ে পড়লেন। উ-স এবং থাকিন-বা-সীন হলেন বন্দী, ডাঃ বা-ম'র কোন উদ্দেশ নেই। নূতন গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার নিয়েছেন আউঙ্গ-সানের সুযোগ্য সহচর থাকিন-নু। থাকিন-নু একজন চতুর রাজনীতিক সন্দেহ নেই, কিন্তু আউঙ্গ সানের মত ব্যক্তিত্ব বা জনপ্রিয়তা এখনও তিনি অর্জ্জন করতে পারেন নি। এদিক দিয়ে ডাঃ বা-ম কিংবা থাকিন-বা-সীন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর পশ্চাতে রয়েছে ফ্যাসী-বিরোধী লীগের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া মহাবামা, মায়োচিত বা দোবামা দলের শক্তিকেও উপেক্ষা করা চলে না। ব্রহ্মের রাজনীতিক আকাশের এক কোণে যে মেঘ জমেছে যে-কোন মুহূর্ত্তে তা সারা দেশকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। এর কারণ ফ্যাসিবিরোধী লীগ সমগ্র ব্রহ্মকে একমাত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে সমবেত করলেও রাজনীতিক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান। গণ-পরিষদের নির্ব্বাচনে ফ্যাসীবিরোধী লীগ কর্ত্তৃক অধিকাংশ আসন দখল করার প্রকৃত রহস্য হচ্ছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ব্বাচন বয়কট করেছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে ব্রহ্মদেশের রাজনীতিতে যে বলিষ্ঠতা এসেছে প্রথম-মহাসমর ও দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যবর্ত্তীকালে রাজনীতিক আন্দোলনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের প্রাক্কালে ব্রহ্মদেশে তিনটি রাজনৈতিকদল আন্দোলন চালাতে থাকে; ডাঃ বা-ম'র সিনেথা, উ-স'র মায়োচিত এবং থাকিন সম্প্রদায়ের দোবামা। এই তিন দলের মধ্যে দোবামা দলে সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট নেতারা কাজ করতে থাকেন। বর্ত্তমান ফ্যাসীবিরোধী দলের নেতা আউঙ্গ সান, সোস্যালিষ্ট দলের নেতা থাকিন মিয়া, বর্ত্তমান ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী থাকিন-নু, রেডশার্ট কম্যুনিষ্ট দলের নেতা থাকিন বানটুন, রেডফ্ল্যাগ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা থাকিন-সো প্রভৃতি আধুনিক ব্রহ্মের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ দোবামা দলভুক্ত ছিলেন। থাকিন-বা-সীনও এই সময় থেকেই দোবামা দলে যোগ দেন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে স্বতন্ত্র ব্রহ্মের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন ডাঃ বা-ম। চীন-ব্রহ্ম রোডের নির্ম্মাণ ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণরের সঙ্গে মতভেদের ফলে ১৯৩৯ সালে তিনি মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দিলে উ-স মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভাই দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ পর্য্যন্ত শাসন কাজ চালান। ডাঃ বা-ম'র আমলে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলে প্রধানতঃ তিনটী নেতাকে কেন্দ্র করে ডাঃ বা-ম, উ-স ও উ-আউঙ্গ-সান। জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের প্রয়াসে উ-স দেশব্যাপী ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলন সুরু করে দেন এবং তার ফলে ব্রহ্মে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। উ-স ব্রহ্মে ভারতীয়দের আগমন বা ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দিতে চাইলেন। ডাঃ বা-ম এতটা স্বার্টসীয় নীতি সমর্থন করলেন না, তিনি ভারতীয়দের আগমন নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী হলেও ভেবে চিন্তে অগ্রসর হতে চান। আউঙ্গ-সান তখন নিখিল-ব্রহ্ম ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। ব্রহ্মদেশের সমস্ত ছাত্র এই ইউনিয়নের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সংক্রান্ত কতকগুলি দাবী নিয়ে। ডাঃ বা ম'র প্রতিপক্ষ ছাত্র আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন এবং একস্থানে শোভাযাত্রাকারী একটি ছাত্র পুলিসের লাঠিতে নিহত হলে তাঁরা মহা হৈ চৈ জুড়ে দিলেন।

থাকিন-নু' ও থাকিন বা-সীনের নেতৃত্বে দোবামা দল জোর শ্রমিক আন্দোলন চালাতে থাকেন। ডাঃ বা-ম শ্রমিকদের উন্নতি সংক্রান্ত বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। এই ভাবে তিনি ক্রমশঃ জনসাধারণের আস্থা হারাতে লাগলেন। উ-স এই সুযোগে থাকিন ও দোবামা দলকে নিজের দলে টেনে ডাঃ বা-ম'র মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে সমর্থ হন।

উ-স যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন তখন ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। বর্ম্মার রাজনীতিকরা দেশের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। উ-স ডোমিনিয়ান শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ডাঃ বা-ম তখন জোর বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে আন্দোলন সুরু করলেন। দোবামা দলের থাকিনরাও তাঁকে সমর্থন করতে লাগলেন এবং ফ্রীডম-ব্লকের সৃষ্টি হল। বা-সীন, আউঙ্গসান, থাকিননু প্রভৃতির নেতৃত্বে দোবামা দল ডাঃ বা-মকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। উ-স বড়ই বিপন্ন বোধ করলেন। তিনি ভারতীয় বিরোধী আন্দোলনের দিকে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করতে চাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি অর্ডিনান্সও জারী করলেন। এদিকে বা-ম প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন দেখে নানা অর্ডিনান্স জারী করা হতে লাগল এবং ১৯৪০ সালে বা-মকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হল। দোবামা দলের অন্যান্য বহু নেতাও ধৃত হলেন। আউঙ্গসান, বা-সীন প্রভৃতি অনেকে বর্ম্মা থেকে সরে পড়লেন, আবার কোন কোন নেতা আত্মগোপন করে কাল কাটাতে লাগলেন। ১৯৪১ সালে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপ অভিযান সুরু হবার পূর্ব্বাহ্নে উ-স ইংলণ্ডে বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং ফেরবার পথে জাপানীদের হাতে বন্দী হন।

জাপ আমলে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি বর্ম্মার শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য জাপানীরা ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বে এক শাসন পরিষদ গঠন করেন। আউঙ্গসান, থাকিনমিয়া, থাকিন-নু প্রভৃতি জনসাধারণ এই পরিষদে যোগ দেন। এক বৎসর পর ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে জাপানীরা ব্রহ্মকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। ডাঃ বা-ম এই স্বাধীন ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী হন, আউঙ্গসান হলেন দেশরক্ষা সচিব, থাকিনমিয়া হলেন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং থাকিন নু হলেন পররাষ্ট্র সচিব। কম্যুনিষ্ট রেডশার্ট দলের নেতা থান-টুন কৃষিমন্ত্রীর এবং থাকিনলুন-বা সরবরাহ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন।

এমনিভাবে আপাতঃ দৃষ্টিতে অবস্থা ভাল মনে হলেও বর্ম্মার রাজনীতি-ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে থাকে। উ-বা-সীন নিজের প্রভাব বিস্তার চেষ্টায় ডাঃ বা-মর বিরোধিতা করতে লাগলেন। স্বীয় মন্ত্রিসভায় তাঁকে ও যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করে ডাঃ বা-ম তাঁকে শান্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। বা-ম'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে জাপানীরা তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলেন। এদিকে মিত্রশক্তির দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে অবস্থা তাদের অনুকূলে আসতে লাগল। আউঙ্গ-সান এই পরিবর্ত্তনের সুযোগ নিয়ে দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটাতে চাইলেন। ডাঃ বা-ম তাতে রাজী হলেন না, তিনি ধীরে সুস্থে অগ্রসর হতে চাইলেন। কিন্তু রণ-বিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে চরমপন্থীরা তাঁর কথা শুনতে চাইলেন না। জনসাধারণ আউঙ্গসানের নেতৃত্ব কামনা করতে লাগল। এই নেতৃত্ব নিয়ে আবার আউঙ্গসান ও দোবামা দলের নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। শ্রমিক মজুরদের নেতৃত্ব নিয়ে ওদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই দলের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা সুরু হয়—রেড শার্ট ও রেড ফ্ল্যাগ দলের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে যায়। এদের মধ্যে রেড ফ্ল্যাগ দল আউঙ্গসানের সঙ্গে যোগ দেয়। দেখতে দেখতে মিত্রশক্তির জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠে। ডাঃ বা-ম প্রকৃতপক্ষে জাপানীদের বন্দী হন। এইভাবে উ-স, বা-ম ও বা-সীন বর্জ্জিত বর্ম্মায় আউঙ্গসানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে ডাঃ বা-ম, উ-স ও বা-সীন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং বর্ম্মার রাজনীতিতে আবার সুরু হয় নানা জটিলতা। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ম্মার রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান জানান হয় একটা অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করে' শাসন কাজ চালানোর জন্য। আউঙ্গসান, বা-সীন ও উ-স এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু ডাঃ বা-ম এতে সাড়া দিলেন না, তিনি দেশে বিপ্লবের লক্ষণ দেখতে পেলেন। রেডশার্ট কম্যুনিষ্ট দলের নেতা থাকিন থান-টুন ও এই গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন জানালেন। থাকিন-সো'র নেতৃত্বাধীন রেডফ্ল্যাগ দলও গভর্ণমেণ্টে যোগ দিলেন না। এইভাবে ফ্যাসীবিরোধী লীগ (নেতা আউঙ্গসান), সোস্তালিষ্ট (নেতা থাকিনমিয়া), রেডশার্ট (নেতা থানটুন), দোবামা (নেতা বা-সীন), ও মায়োচিত পার্টির (নেতা উ-স) এক কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল। কেবলমাত্র ডাঃ বা-ম'র সিনেথা পার্টি এবং থাকিন সো'র রেডফ্ল্যাগ কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কোয়ালিশানে যোগদানে বিরত থাকে। কিছুদিন যেতে না যেতে ফ্যাসিবিরোধী লীগের সঙ্গে রেডশার্ট কম্যুনিষ্ট দলেরও মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসে। রেডশার্ট ও রেডফ্ল্যাগ এই উভয় কম্যুনিষ্টদল একযোগে সারা বর্ম্মায় ধর্ম্মঘটের ধূম লাগিয়ে দেয়। রেডফ্ল্যাগ দল বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং দলের নেতা থাকিন সো কিছুকালের জন্য বন্দী হন।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বর্ম্মার রাজনীতিকদের লণ্ডনে এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বাধীন সিনেথা দল এই সময় মহাবামা নাম নিয়ে বৃহত্তর ব্রহ্মের আন্দোলন সুরু করেছেন। এই দলটি ছাড়া আর সকল দলই বৃটেনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। লণ্ডনে আলোচনার শেষের দিকে কি ভাবে উ-স ও থাকিন বা-সীন আউঙ্গসানের সঙ্গে একমত না হয়ে বৃটেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তা পূর্ব্বের প্রবন্ধেই বলা হয়েছে।

দেশে ফিরে এসে উ-স ও বা-সীন হাত মিলিয়ে ডাঃ বা-ম'র সাহায্যপ্রার্থী হলেন। ডাঃ বা-মও তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং দোবামা, মহাবামা ও মায়োচিৎ পার্টি একত্র হয়ে 'সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতা'

(ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফার্ষ্ট) নাম দিয়ে এক সম্মিলিত দল গঠন করলেন। এতে হতোদ্যম না হয়ে আউঙ্গসান মন্ত্রিসভা গঠন করে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হলেন। রেডশার্ট কম্যুনিষ্ট দল তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হল।

আউঙ্গসানের বিরোধী দলগুলি তখন দেশের শাসনকার্য্যে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। রেডফ্ল্যাগ কমুনিষ্টরা পল্লী-অঞ্চলে নাশকতা-মূলক কাজে লেগে গেলেন। তাঁরা চারিদিকে ধর্ম্মঘট করাতে লাগলেন, তন্মধ্যে বেরটুনের পুলিস ধর্ম্মঘটই খুব জোরালো হয়। আরাকানে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। সুযোগ বুঝে কারেন সম্প্রদায় সরকারের বিরোধিতা সুরু করলে। আরাকানের বিদ্রোহী ও কারেনদের দাবী হল তাদের জন্য স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ব্যবস্থা করতে হবে। পার্ব্বত্য উপজাতি কাচিনরাও অনুরূপ আন্দোলন করতে আরম্ভ করলে।

এইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই গণ-পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফ্যাসীবিরোধী লীগই পরিষদের প্রায় সমস্ত আসন অধিকার করে। দৃঢ়চেতা আউঙ্গসান বিন্দুমাত্র না দমে মন্ত্রিসভা গঠন করে দেশের শাসন কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তলে তলে যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ এতখানি জঘন্য ষড়যন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে আউঙ্গসানের মত দেশ-প্রেমিককে হত্যা করবে তা কেউ ভাবতেও পারে নি। এর পরিণতিই বা কোথায় তাও কেউ বলতে পারে না।

কথা যারে বলিবার ছিল আয়োজন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কথা যারে বলিবার ছিল আয়োজন
সময় পাই নি তারে কাছে ডাকিবার,
যৌবন চলিয়া যায়, আঁখি উন্মন
রঙ্ নাহি প্রণয়ের ছবি আঁকিবার।

কি জানি কি ব্যথা ছিল তার কালো চোখে
অভিমান করে গেছে মোর দ্বারে এসে,
শরতের ফুলবায়ে প্রভাতী আলোকে
মন তার হারায়েছে অজানা আবেশে।

চপল চেতনা সম তারে বরষায়
মেঘলা আকাশে যেন দেখেছি চপলা!
বাতায়নে বসেছিনু তারি ভরসায়
অবলা হোলেও তারে ভেবেছি সবলা।

কুসুম-ফোটানো গানে ছিল হাসিমাখা
ফাগুনের রঙে রঙে সেই মুখখানি,
চৈত্র দিনের শেষে পল্লব শাখা
তারে হেরি করিত যে কত কানাকানি।

প্রথম প্রেমের মত মধুময় দিন
পেয়েছিনু ক্ষণতরে বকুল তলায়,
তার পদচারণার চিহ্ন বিহীন
ধূলি 'পরে ঝরা ফুল কাঁদে নিরালায়।

ভাবনা মেঘের মত বেদনার সুরে
নয়নে বাদল এনে দিয়ে গেল সাড়া,
মানস-বলাকা উড়ে গেছে বহুদূরে
সন্ধ্যা-ধূসর পথে পরিচয় হারা।

জীবনের ছায়াতলে গীতি গুঞ্জরি
জনতার পারে একা রহি নিরজনে,
চলে-যাওয়া দিবসের স্মৃতি-মঞ্জরী
হিমেলি হাওয়ায় ঝরে মোর মনো বনে।

এই চেনা ধরণীরে করিয়া অচেনা
যে জন চলিয়া যায়—আসেনাক ফিরে,
তার লাগি মিছে ফোটে বেলা যুঁথি হেনা,
মিছে ঢেউ ছুটে আসে হৃদয়ের তীরে।

তবুও অবুঝ প্রাণ শোনে কি সে কথা?
স্মরণের জোছনায় খোঁজে অনুরাগে,
পৃথিবীর সব পথে যার নীরবতা
দিনের সভায় বাণী তার কিগো জাগে?

সংসার অনায়াসে যে পথিক ভুলে
উদয় তীর্থ পানে গেল অগোচরে
দিক্বলয়ের নীল যবনিকা খুলে
যাত্রা শেষের মিছে আলো কণা ঝরে।

লিলি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মনের অলিগলি হইতে সদর রাস্তা পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরিতে ঘুরিতে মনঃসমীক্ষক ডাক্তার খগেন মল্লিক আজ বার্ধক্যের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; পাথেয় মিলিয়াছে দেশ-জোড়া খ্যাতি ও বিপুল অর্থ। সম্প্রতি তিনি রোগী মহলে ঘোরা ফেরার মাত্রা কমাইয়া নূতন উদ্যমে প্রচুর গবেষণামূলক মনোবিজ্ঞানের আর একখানি বই লেখা সুরু করিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁহার খাস কামরায় বসিয়া সকালের লেখা অধ্যায়টি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন এমন সময় কোন খবর না দিয়াই একজন অপরিচিত যুবক সরাসরি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনা বাক্য-ব্যয়ে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল।

হাতের কাগজগুলি ড্রয়ারের মধ্যে পুরিয়া ডাঃ মল্লিক যুবকের মুখের উপর অভিজ্ঞ দৃষ্টি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন: "আপনার উদ্দেশ্য?"

নির্বিকার চিত্তে যুবকটি জবাব দিল: "ঐ একই—মানে, অপরের মনের খবর—"

ডাঃ মল্লিক একটা চুরুট ধরাইয়া দীর্ঘ একটা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "কতদিন হলো বিয়ে করেছেন?"

—"বিয়ে!"

—"হ্যাঁ, আকাশ থেকে পড়লেন না কি?"

—"না সার, বিয়ে টিয়ের মত ব্যাপার কিছু গড়াবে না—"

ঈষৎ হাসিয়া ডাঃ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন: "কেন, সামাজিক বাধা আছে না কি?"

—"কি আশ্চর্য!"

—"আপনি আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে খোলাখুলি সব না বললে—"

—"আহা, খোলা খুলিই তো সব বলতে চাই—"

—"বেশ, তা হলে বসুন—আপনার নাম?"

কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিয়া যুবক উত্তর দিল: "নাম—সুবিমল দত্ত।" পেন্সিল দিয়া নামটি লিখিতে লিখিতে ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন: "পেশা?" যুবকটি ঘরের পূর্বদিকের দেওয়ালে একটা কটোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া বলিল: "জনগণকে প্রবুদ্ধ করা—"

পেশাটি নূতন বলিয়া মনে হইল। ডাঃ মল্লিক কৌতুক বোধ করিয়া বলিলেন: "বর্তমান যুগে তাদের Pro-গান্ধী না করে, Pro-বুদ্ধ করে আড়াই হাজার বছর পেছিয়ে যেতে বলেন?"

সুবিমল ডাঃ মল্লিকের দিকে চোখ ফিরাইয়া—বলিল: "কি মুস্কিল! Pro-বুদ্ধ নয়, প্রবুদ্ধ; অর্থাৎ সচেতন করা; মানে, যারা জানে না কিসে তাদের ভালো, আর কিসে মন্দ, তাদের সেটা বুঝিয়ে দেওয়া।"

একটু চিন্তা করিয়া ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন: "উত্তরাধিকারী-সূত্রে ব্যাঙ্কের খাতায় একটা মোটা অঙ্ক নিশ্চয় পেয়েছেন?"

—"আমি বড় লোকের ছেলে কি না, জিজ্ঞাসা করছেন?"

—"হ্যাঁ ঘরে টাকা না থাকলে নিশ্চিন্ত মনে পরের ভালো মন্দর জন্যে দৌড় ঝাঁপ করাটা যার তার পোষায় না কি না—"

—"আমি বড়লোক নই, ডাঃ মল্লিক; আর খালি পেটে দৌড়-ঝাঁপ করাটা আমারও পোষায় না বলে সাদার্ন কলেজে মাষ্টারিও করি—"

—"কলেজে মাষ্টারি?"

—"ঐ যা বলেন—" বলিয়া সুবিমল সোজা হইয়া বসিল।

—"বটে! তা আমার কাছে আসবার হেতুটা কি?" হেতুটা জানিবার জন্য ডাঃ মল্লিকের আগ্রহ কম নয়, বিশেষতঃ সাদার্ন কলেজের প্রফেসার সুবিমল দত্তের মুখ থেকে।

সুবিমল আর একটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়া বলিল "সে তো গোড়াতেই বলেছি—লোকের মনের খবর জানবার জন্যে—"

ভ্রূ দুটা কুঁচকাইয়া ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন: "কাদের মনের? যাদের আপনি প্রবুদ্ধ করতে চান, তাদের?"

—"আজ্ঞে না সার; ওদের প্রবুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যাদের বিশেষ সাহায্যের দরকার তাদের—"

ডাঃ মল্লিক হঠাৎ ধৈর্য হারাইয়া বলিলেন: "দেখুন প্রফেসর দত্ত, সময় আমার হাতে বেশী নেই; হেঁয়ালি রেখে সোজাসুজি আপনার—উদ্দেশ্যটা কি, তা জানালে ভালো হয় না কি?"

সুবিমল সপ্রতিভ হইয়া বলিল: "হেঁয়ালির দিক দিয়েই আমি যেতে চাইনে। আপনি জানেন যে পাবলিক কাজে দরকার টাকা, তবে টাকাগুলো যাদের ঘরে আটকে আছে সেই টাকা-মালিকদের মনে কত-গুলো দরজা আছে তার কোনটাতে ঘা দিলে টাকা জিনিষটা সহজলভ্য হবে, সেই কথাটা মনঃসমীক্ষক ডাঃ মল্লিকের কাছে জানতে এসেছি।"

ডাঃ মল্লিক সশব্দে চেয়ারটা ঘুরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"অসম্ভব! আপনি নিজেকে প্রফেসার বলে পরিচয় দিয়েছেন; আশা করি, এটুকু বোঝেন যে আপনার ওসব বাজে ব্যঙ্গ রহস্য শোনবার মত সময় বা ধৈর্য আমার নেই।"

সুবিমল একটুও না টলিয়া উত্তর দিল: "আপনি ভুল বুঝছেন, ডাঃ মল্লিক; ব্যঙ্গ রহস্য করবার জন্যে আপনার কাছে আসি নি। একটা নাইট স্কুল খোলবার জন্যে মোটা কিছু টাকা চাই। ধনকুবেরদের দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষাপাত্রে বা পড়েছে—"

দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া ডাঃ মল্লিক বলিলেন: "যাক্ সুবিমল-

বাবু, আমার কাছে নিছক কিছু চাঁদার জন্তেই এসেছেন, এই কথাটা সংক্ষেপে বললেই পারতেন—"

সুবিমল হাসিয়া বলিল : "না সার, আপনার কাছ থেকে চাঁদা চাওয়াটাই আমার আসল উদ্দেশ্য নয়—"

ডাঃ মল্লিক চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন : "তবে ?"

সুবিমল এতক্ষণে আসল কথাটা পাড়িল : "আপনার বিশেষ সাহায্য চাই অন্য দিক দিয়ে ; আপনার একটা প্রবন্ধ কাজে লাগাতে চাই।"

—"প্রবন্ধ ?"

—"আপনার 'সুখী অসুখীর মনঃ সম্প্রসারণের তারতম্য প্রবন্ধটা আমার কাগজে হুবহু পুনর্মুদ্রিত করতে চাই—"

—"আপনার কাগজে ?"

—"গণবাণী' কাগজের নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

সাপ দেখিলে মানুষ যেমন হঠাৎ চমকাইয়া ওঠে, কাগজের নাম শুনিয়া ডাঃ মল্লিক তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন। পরে কতকটা আত্মস্থ হইয়া ছোট্ট করিয়া বলিলেন : "Obnoxious !"

'গণবাণীর' সম্পাদক অধ্যাপক সুবিমল দত্ত মাঝে মাঝে এরূপ মন্তব্য শুনিতে অভ্যস্ত ; তবু ইচ্ছা করিয়াই যেন ডাঃ মল্লিককে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল : "obnoxious ? বলেন কি ডাঃ মল্লিক ? সারা দেশ ঘুরলে এমন একখানা কূটনীতিবর্জিত—কাগজ আর পাবেন না।"

ডাঃ মল্লিক ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন : "লজ্জা করে না আপনার ? বাজে ভনিতা না করে গোড়াতেই কেন বলেন না যে আপনি সেই সুবিমল দত্ত, গণতন্ত্রী নাম দিয়ে একটা সর্বনেশে দল গড়ে নিরীহ কতকগুলো লোকের মাথা খাওয়া, আর একটা নোংরা কাগজের মারফৎ দেশের প্রাতঃস্মরণীয় নেতাদের সম্বন্ধে কুৎসিত সমালোচনা করা যার পেশা ?"

—"কুৎসিত সমালোচনা করা ?"

—"না না, আপনার কোন কথাই শুনবো না। আপনি এখুনি—এখুনি চলে যান, নইলে—" ডাঃ মল্লিক উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিলেন।

সুবিমল এতটা আশা করে নাই। অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল ; কয়েক পা পিছাইয়া একটা তির্যক ভঙ্গী করিয়া বলিল : "বেশ নমস্কার ! ভালো কথা—আপনার সঙ্গে আজকের এই ইণ্টারভিউটার একটা সরস বর্ণনা যদি কালকের কাগজে বার করি, বিশেষ আপত্তি করবেন না, আশা করি।"

—"তার মানে ?"

—"মানে, সুখী অসুখীর মনঃ সম্প্রসারণের তারতম্যের হেতুর একটা বিশদ ব্যাখ্যা, শুধু আমার ইকনমিক্সের ছাত্রদের জন্তে, আর কিছু মনে করে নয়।"

ডাঃ মল্লিক মক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বলিলেন : "মানহানির মামলাকে ভয় করেন না বুঝি ?"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সুবিমল বলিল : "মামলার আনুষঙ্গিক কাজ ও কাগজ চালাবার জন্তে চেলাচামুণ্ডের অভাব হবে বলে মনে করি না। আচ্ছা, নমস্কার।"

সুবিমল দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিলে ডাঃ মল্লিক ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন : "একটু দাঁড়ান, প্রফেসার দত্ত ; আপনার নাইট স্কুলের চাঁদাটা নিয়ে যান।" যাক্ এতক্ষণে সুবিমলকে আয়ত্তে রাখিবার উপায়টি ডাঃ মল্লিক আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

এতগুলি শিষ্ট সম্ভাষণের পর দানের উপর দক্ষিণাস্বরূপ দুইশত টাকার চেকখানি হাতে লইয়া সুবিমল ডাঃ মল্লিককে ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় লইল।

ডাঃ মল্লিক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রেগুলেটারের কাঁটা ঘুরাইয়া পাখার গতি বাড়াইয়া দিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। বিষাক্ত হাওয়ায় আর কিছুক্ষণ থাকিলে তাঁহার দম বন্ধ হইয়া যাইত।

কী আপদ ! সুবিমল নামধারী এই লোকটা হঠাৎ জুটিল কোথা হইতে ? তাহার এতখানি ধৃষ্টতা ডাঃ মল্লিক সহ্য করিলেন কি করিয়া তাহা ভাবিলেই অবাক হইতে হয়। ঐ তথাকথিত গণতন্ত্রীদলের কীর্তি-কলাপ কাহারও অবিদিত নাই। যাহাদের নাম শুনিলে আপামর সাধারণে নাক সিঁটকায় সেই দলেরই একটা দুষ্ট চাঁই ডাঃ মল্লিকের খাস-কামরায় তাঁহার সহিত মুখোমুখি বসিয়া জরুরী কাজে বিঘ্ন ঘটাইয়া গেল, কিছু টাকাও হস্তগত করিল ; কিন্তু কি আশ্চর্য ! এককালে ইউনিভার্সিটির রত্ন বলিয়া যাহার খ্যাতি ছিল, সেই সুবিমল দত্ত আজ এমন করিয়া উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে !

—"একি দাদু, এখনো বেড়াতে যাওনি যে—"বলিতে বলিতে এক-মাত্র পৌত্রী লিলি আসিয়া ডাঃ মল্লিকের চিন্তা সূত্রটা ছিঁড়িয়া দিল।

পিতৃমাতৃহীনা লিলিই আজকাল পারিবারিক ব্যাপারে ডাঃ মল্লিকের অভিভাবকত্ব করিতেছে, একথা ডাঃ মল্লিক স্বীকার না করিলেও বাড়ির বেয়ারা দারোয়ান সকলেই জানে। তাই লিলির তত্ত্বাবধানের নিয়ম-কানুনগুলা মানিয়া না চলিলে মনের ডাঃ বুড়ো খগেন মল্লিকের শারীরিক উপসর্গগুলি দূর করিতে দেহের ডাক্তারদের কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হয়।

লিলি আসিয়াই প্রথমে ডাঃ মল্লিকের হাত হইতে মোটা নীল পেন্সিলটা কাড়িয়া লইয়া ড্রয়ারে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল : "শিগ্‌গির ওঠো, গাড়ি তৈরী ; দেড় ঘণ্টার আগে ফিরতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।"

যে অস্বস্তিকর চিন্তাটা ডাঃ মল্লিকের মনে চাপিয়া বসিয়াছিল, লিলিকে দেখিয়া তাহা যেন কাটিয়া গেল ; বলিলেন : "কোথায় গিয়েছিলি রে ?"

—"অলকাদের বাড়ি—"

ডাঃ মল্লিক একটা চুরুট ধরাইয়া বলিলেন : "বোস লিলি, কথা আছে।" লিলি ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল : "কথা ? বেশ, তাড়াতাড়ি শেষ করে বেড়াতে যেতে হবে কিন্তু—"

বেড়াইতে যাইবার বাসনার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন : "তোদের কলেজের ইকনমিক্সের প্রফেসার সুবিমল

লিলি চেয়ারের উপরকার কুশনটা হাতে লইয়া কোনগুলি সমান করিতে লাগল ; দাদুর কথা বোধ হয় শুনিতে পাই নাই।

—"কি দিদি, জবাব দিচ্ছিস না যে?"

লিলিকে উত্তর দিতে হইল : "সুবিমল দত্তর কথা বলছো? কেমন আমার পড়ায়! এই একেবারে যা তা—"

ডাঃ মল্লিক এতক্ষণে একটা উপায় খুঁজিয়া পাইতে চেষ্টা করিলেন ; বলিলেন : "একে বারে যা তা? তবে তো তোকে ও কলেজে রেখে ভুল করেছি।"

লিলি আসল ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল : "কেন?"

ডাঃ মল্লিক লিলির প্রশ্নে কান না দিয়া বলিলেন : "আচ্ছা বলতে পারিস লিলি—সুবিমল দত্তকে কলেজের আর সব ছেলে মেয়ে কি রকম চোখে দেখে?"

লিলি ঠোঁট উল্টাইয়া উত্তর দিল : "তা বাপু আমি জানবো কি করে? সে যাক্—তুমি বেশ লোক দাদু, যত সব বাজে কথা বলে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিয়ে শেষে বলবে—'তাইতো দিদি, দেরী হয়ে গেল, আজ আর বেরুবো না'—তখন কিন্তু শুনবো না, তা তোমায় আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।"

অন্য সময় হইলে কারণে অকারণে লিলির উল্টানো ঠোঁট দেখিলে ডাঃ মল্লিক ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু বর্তমানে ব্যস্ততার কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যে বি-এ পরীক্ষা দিলে সাদার্ন কলেজের সহিত লিলির সম্পর্ক চুকিয়া যাইবে ; তবু কয়েক বছরে যদি কিছু না ঘটিয়া থাকে, সুবিমল সম্বন্ধে সাবধান করিয়া না দিলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কিছু যে একটা ঘটিবে না, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি আছে? তাই মনে মনে মুসাবিদা করিয়া শেষে বলিতে সুরু করিলেন : "তোদের ঐ সুবিমল একটা বাজে দলে মিশে এতটা উচ্ছন্নে যাবে, ধারণা করি নি। তাই তোকে বলে দিচ্ছি, লিলি—"

ডাঃ মল্লিকের মুখে হাত চাপা দিয়া লিলি বলিল : "তোমার আজ হয়েছে কি তা বলবে দাদু? সেই থেকে কোন্ এক সুবিমল দত্ত ছাড়া মুখে আর কারুর কথা নেই! বলেছি তো, লোকটা ভারী বিশ্রী ; সেই জন্যে আমাদের ক্লাসে নতুন একজন প্রফেসার দিয়েছে। ব্যস্—ওর কথা আর শুনবো না।"

ডাঃ মল্লিক এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন : "আর একটু শুনতে হবে দিদি। লোকটা আজ আমার কাছে এসেছিল—"

লিলির মুখটা হঠাৎ কালো হইয়া গেল ; বলিল : "তোমার কাছে এসেছিল? কখন? কেন?"

—"একটু আগেই—আমার সেই সুখী অসুখীর মনঃ সম্প্রসারণের তারতম্য' প্রবন্ধটা ওদের দলের কাগজে ছাপাবার জন্যে ; আর—"

লিলি ভ্রূ জোড়া কপালে তুলিয়া বলিল : "আস্পার্দা মন্দ নয়! তা ভালোমানুষী করে প্রবন্ধটা দিয়ে ফেলেছো তো? চাঁদা? কিছু দাও নি নিশ্চয়?"

—"দুশো টাকা দিতে হলো।"

—"দু-শো-টা-কা!" লিলি মস্ত বড় হাঁ করিল।

—"লোকটা চলে যেতেই ভাবতে সুরু করেছি—টাকাটা জলে ফেল্লাম কি না—"

—"থাক আর ভেবে কাজ নেই। আমার দরকারে চাইলে একটা পয়সা পাইনে, আর কত সব বাজে লোক এসে হাত পাতলেই দুশো চারশো দিয়ে দাও। বেশ লোক তুমি দাদু!"

লিলির কথাগুলি ছাঁৎ করিয়া ডাঃ মল্লিকের বুকে গিয়া বিঁধিল। বলিলেন : "টাকা পয়সা চেয়ে পাসনি কবে, শুনি?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লিলি বলিল : "বারে! চাইলেই দাও না কি? 'কি হবে', 'কেন দরকার', 'যা চাইছিস তাতে কুলোবে না কি'—এই সব কত রকমের জেরা করে, কত ভুগিয়ে, শেষে যখন আমার নেবার ইচ্ছেতে ঘেন্না ধরে যায় তখন—'নে লিলি, লক্ষ্মী দিদি' আরও কত কি বলে, তার পর চেকখানা রেখে দাও আমার মুঠো-করা হাতের ওপর।"

লিলির মুখ দেখিয়া ডাঃ মল্লিক হাসিয়া ফেলিলেন। লিলি কিন্তু সে হাসিতে ভুলিবার পাত্রী নয়। বলিল : "বেশ তো, তোমার কাছে টাকা পয়সা আর চাইবো না। এই তো সেদিন বেলার বিয়েতে গিয়েছিলাম ; মেয়েরা সবাই বল্লে—'ইস্ লিলি, একটা ভালো শাড়িও কি তোর জোটে না? আমি চুপ করে রইলাম।"

—"তাই না কি? কিন্তু—" ডাঃ মল্লিক কি যেন স্মরণ করিয়া বলিলেন—"সেবার সাতশো টাকা নিয়ে যেগুলো কিনে আনলি—"

কথাটা লুফিয়া লইয়া লিলি বলিল : "তারপর পনেরো বার—ফ্যাসান বদলে গেছে।"

—"পনেরো বার!" ডাঃ মল্লিক আবার হাসিয়া বলিলেন : "তাই ভাবি—আমার যে প্রজাপতিটির রঙে রঙে সারা বাড়িতে এত জৌলুস ছিল, আর চারদিকে বসন্তের হাওয়া বইতো, সেই প্রজাপতিটির আজকাল হলো কি! বেশ!"

—"আঃ দাদু—"

—"কোন কথা নয় লিলি। কাল তোর পাশ বইটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিস ; একটা চেক দেবো, জমা দিয়ে দিবি। আজকাল আমার কাছে চাইতে ঘেন্না করে বলে—আগের মত যখন ইচ্ছে টাকা তুলিস—কেমন?"

—"চাইতে ঘেন্না করে তা বল্লাম কখন? তোমার জেরাগুলো শুনতে ভালো লাগে না, তাইতো বল্লাম।"

—"বেশ আর জেরা শুনতে হবে না। চল এখন বেড়িয়ে আসি।"

—"ক'টা বেজেছে, সে খেয়াল আছে? চট্ করে খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে। রাত জেগে আবার যদি লিখতে' বসো তা হলে কিন্তু—"

—"ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস, দিদি। সকালের লেখাটায় একটু রদবদল না করে রাখলে ঘুম আসবে না যে?"

—"ঘুম কেমন না আসে তা আমি দেখবো ; খাবে চলো তো এখন।"

অগত্যা ডাঃ মল্লিককে উঠিতে হইল। লিলিও উভয়ের আহারের জন্য পাচকের উদ্দেশ্যে হাঁক ডাক সুরু করিল।

দুই দিন পরের ঘটনা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দেশপ্রিয় পার্কের পূব দক্ষিণ কোনের একটা বেঞ্চে বসিয়া গভীর উৎকণ্ঠার সহিত সুবিমল লিলির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দুই দিন ধরিয়া তাহার নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। কলেজে এক ফাঁকে আজ সে জানাইয়াছিল, বিকালে হাত ঘড়িটার উপর চোখ বুলাইয়া মুখ তুলিতেই সুবিমল দেখিল, লিলি আসিতেছে।

অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল বলিয়া লিলিকে খুব ক্লান্ত দেখাইতেছে। কপালের উপর কয়েক গুচ্ছ চুল ঘামে আঁটিয়া গিয়াছে। শাড়ির আঁচল দিয়া মুখটা মুছিয়া লিলি সুবিমলের পাশে বসিল। ধুলা ও ঘামের স্পষ্ট একটা ছাপ আঁচলের প্রান্তে লাগিয়া গেল।

ডাঃ মল্লিকের ঘরে কয়েক বছর আগের তোলা ফটোতে লিলির প্রথম যৌবনের যে কমনীয় মুখ সুবিমল সেদিন দেখিয়াছিল তাহার সহিত লিলির আজকের শ্রমক্লিষ্ট রেখাঙ্কিত মুখের তুলনা করিয়া সে বেদনা বোধ না করিয়া পারিল না।

সুবিমলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া লিলিই প্রথমে কথা কহিল: "কি গো, ভাবনা চিন্তা গুলো যে একচেটে করে ফেললে শেষ কালে।"

সুবিমল অন্যমনস্ক হইয়া বলিল: "এত দেরী করলে যে?"

—"দেরী?—কত দিক আমাকে সামলাতে হয় তাতো জানো। সে যাক—কেমন হয়েছে তো! বলেছিলাম ঠাকুরদার কাছে যেও না—কথাটা যেমন শুনলে না, ফলটা তেমনি হলো তো! পেয়েছ প্রবন্ধটা?"

—"খারাপ এমন কি হয়েছে? দুশো টাকা এক সঙ্গে ক'জনই বা দিয়েছে? ভালো কথা—সুলতার কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিয়েছো?"

লিলি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল: "চার্জ তো নিলাম, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারবো বলে ভরসা হয় না।"

—"কেন?"

—"সুলতাদির কাছে শুনলাম, মোট একাশি টাকা সাত আনা চাঁদা পেয়েছেন নসীরামদের কাছ থেকে।"

—"তাতে হতাশ হবার কি আছে, লিলি?"

—"যাদের ঘরে এক বেলারও খাবার উদ্বৃত্ত থাকে না তাদের কাছ থেকে এমনি করে চাঁদা আদায় করতে তোমাদের মায়া হয় না?"

—"ভুল করছো লিলি। যারা দিতে পারে, অনুনয় বিনয় করে একমাত্র তাদেরই কাছ থেকে আদায় করে এই সব নিঃস্বদের জন্তে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তাতে এদের প্রাণের যোগাযোগ বেশী হয়, না এদের বহুজনের কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থ থেকে প্রত্যেকের যৎসামান্য চাঁদা দিয়ে গড়া প্রতিষ্ঠানে এদের অন্তরের টান বেশী হবে, সে কথা আমায়

লিলি চুপ করিয়া রহিল; পরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল: "এ[illegible] হাজার টাকা আমি জোগাড় করেছি, সুবিমল—"

—"এক হাজার টাকা? কোত্থেকে?"

লিলি সংক্ষেপে বলিল: "আমিই দিচ্ছি।"

—"তুমি দিচ্ছ?"

—"দোষ কি তাতে?"

—"দোষের তা বলছিনে; তবে বারে বারে তোমার কাছ থেকে[illegible] আর কত নেব?"

—"ইস্ ভারী নিয়েছো আমার কাছ থেকে!"

—"এই তো সেদিন 'গণবাণীর' ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেল, তুমি না থাকলে কাগজটা উঠেই যেতো। আমি তো কায়েমীভাবে[illegible] দেউলে, তাতো জানো; তুমিও যদি হাতখালি করে বসে থাকো, ত[illegible] হলে ভবিষ্যতের ঝড়গুলো সামলাবে কে লিলি?"

লিলি হাসিয়া বলিল: "কেন, তোমাদের বহুজনের যৎসামান্যগুলে[illegible] কি করতে থাকবে?"

—"আহা, সে তো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। তার আগে—যৎসামান্যগুলো কত রকম কাজে লাগানো যাবে সেটা শিখতেই তে[illegible] ওদের নাইট স্কুলে অনেকদিন কাটাতে হবে।"

লিলি একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "তোমার আসল মনে[illegible] কথাটা কি, বলবে?"

সুবিমল বলিল: "তাতো আগেই বলেছি—দুর্গতির কাণ্ডারী যার তাদের ভাণ্ডারের পুঁজি আগে থেকেই যদি উজাড় হয়ে যায়, তা হলে[illegible] দুর্দিনে দুর্গতের গতি হবে কোথা দিয়ে?"

মুখে আর এক ঝলক হাসি আনিয়া লিলি বলিল: "কিন্তু আজকে[illegible] কাণ্ডারীরা যদি পুঁজীগুলো উজাড় করে ফেলে নসীরামদের দলে এসে[illegible] হাত না মেলায়, তাহলে তোমাদের কল্পলোকের শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে কি করে?"

সুবিমল গম্ভীর হইয়া বলিল: "তুমি জানো লিলি, ধার-কর[illegible] কথার আমি ধার ধারি না।"

—"তা না হয় জানলুম, কিন্তু আমার টাকা সম্বন্ধে ছুৎমার্গটা তুমি[illegible] যে আজও পার হওনি, তা জানতাম না।"

সুবিমল এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল: "ছুৎমার্গটাই যদি থাকতে[illegible] তা হলে এক ছুটে গিয়ে তোমার ঠাকুরদার কাছ থেকে দুশো টাকা[illegible] আনলাম কি করে?"

লিলির মুখে কৌতূহলের ছায়া পড়িল; বলিল: "তবে অতো[illegible] ভনিতা কিসের?"

সুবিমলের মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল: "ওটা হচ্ছে আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপার—"

লিলি দুষ্টামি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "আর কারুর সঙ্গে নয় তো?"

জ্বলিয়া উঠিতেই সান্ধ্যভ্রমণকারীদের ভীড় বাড়িতে লাগিল। হাতের ঘড়ি দেখিয়া ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিল বুঝিয়া লিলি উদ্বিগ্ন হইল। তবু সুবিমলের মুখ থেকে বোঝাপড়ার কথাগুলি না শুনিয়া তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিল না।

লিলির একখানি হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে সুবিমল বলিল: "সুলতার কাছ থেকে যে খাতাগুলো আনিয়েছো, ওসব কাল আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও—"

—"বারে! তা হলে চার্জটা আমার নেওয়া হলো কি করে?

—"তোমার এই আসন্ন পরীক্ষার মুখে এদিককার কাজ কিছু না হয় কমই করলে—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না—"

—"কিন্তু বোঝাপড়ার কথাটা না বল্লে মহাভারত রামায়ণ সবই অশুদ্ধ হবে, তা বুঝি জানো না?"

—"তাই না কি? আচ্ছা, কাল বলবো।"

—"কাল? কিন্তু মনে থাকে যেন।"

—"নিশ্চয়" বলিয়া সুবিমল উঠিয়া পড়িল। লিলিও বাড়ির পথে পা বাড়াইল।

কয়েক বছর আগের কথা। সাদার্ণ কলেজে লিলি তখন প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্রী, সুবিমল তৃতীয় বার্ষিকীর। কলেজে চৌখস ছেলে বলিয়া সুবিমলের খ্যাতি যখন কায়েমী হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময় হঠাৎ একদিন কলেজের সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর বিশেষ বিতর্ক সভায় নূতন ছাত্রী সতের বছরের লিলি বাকযুদ্ধে সকলকে অবাক করিয়া দিল। সুবিমল জানিত না যে তাহাকে কাৎ করিয়া আসর মাৎ করিয়াছিল যে লিলি, সেই লিলি সেদিন সকালেই তাহার ঠাকুরদার উপর গুরুমারা বিদ্যাটুকু প্রয়োগ করিতে না পারিয়া শানানো বানগুলি অনুকূল বায়ু বুঝিয়া সুবিমলের উপরেই ছাড়িয়া দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিল। কিন্তু সেইদিনই লিলি ও সুবিমল কলেজের শ্রেণীগত পার্থক্য ভুলিয়া পরিচয়ের সূত্র খুঁজিয়া পাইল। সুবিমল দেখিল, মেয়েটি শুধু তার্কিক নয়, কোথা হইতে যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া আনিয়া ভাবভঙ্গী সহযোগে সভার মাঝে অনর্গল বলিবার ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু ঝানু তার্কিক সুবিমল আত্মরক্ষার পথগুলি শক্ত করিয়া বাঁধাইল, অতর্কিতে আক্রমণের পথও একটা একটা করিয়া আবিষ্কার করিতে লাগিল। শেষে বাক্যের রূঢ়তার উপর মোলায়েম প্রলেপ লাগাইতে লাগাইতে তাহাদের পরিচয় ঘন হইতে ঘনিষ্ঠ হইল। কিন্তু কলেজের কমনরুম ছাড়াইয়া সুবিধামত কোন না কোন পার্কের মধ্যেই তাহাদের আলাপের স্থান সীমাবদ্ধ ছিল।

কলেজে আসিবার পূর্বে ঘরে বাহিরে একমাত্র ঠাকুরদা ছাড়া লিলির বন্ধু বলিয়া আর কেহ ছিল না; তাই সেই ঠাকুরদার সহিত পরিচয় করাইবার উদ্দেশ্যে সুবিমলকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিবার লোভ যে তাহার কখনও হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সে লোভ সে দমন করিয়াছিল; পাছে ক্ষেত্র বিশেষে অপ্রিয়ভাষী সুবিমলের আবির্ভাবে রক্ষণশীল ঠাকুরদার সহজ জীবনযাত্রায় অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার সৃষ্টি হয় সেই আশঙ্কায়। কাজেই লিলিদের কলেজে প্রথম শ্রেণীর স্কলারশিপধারী একটি ভালো ছেলে আছে, ইহা ছাড়া সুবিমল সম্বন্ধে তিনি আর কিছুই জানিতে পারেন নাই।

সুবিমলের সহিত লিলির অন্তরঙ্গতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল; লিলিও নূতন চোখে পৃথিবীটা দেখিতে শিখিল। পরে লিলি যেদিন আবিষ্কার করিল, সুবিমল ও তাহার মতামতের মধ্যে পার্থক্য বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই, সেদিন সে দ্বিধাহীন চিত্তে গণতন্ত্রী দলে নাম লিখাইল।

দুই বছর পরে লিলি ও সুবিমল যখন আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রায় প্রস্তুত এমন সময় পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ পূর্বভারতের দ্বারে আসিয়া হানা দিল। বুড়া ঠাকুরদাকে লইয়া লিলি তাহার পিতার তৎকালীন কর্মস্থল পশ্চিম ভারতের একটা সহরে চলিয়া গেল, পরীক্ষা দেওয়া সে বছরের মত স্থগিত রাখিয়া। দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমের সেই সহরের বহু নাগরিক সেবার প্লেগে মারা পড়িয়াছিলেন, লিলির পিতা-মাতা ও একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাও রেহাই পাইল না। তারপর শোক-বিহ্বল ঠাকুরদাকে লইয়া দুই বছর ধরিয়া লিলি ভারতের বহুস্থান ঘুরিয়া শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিল, ঠাকুরদা তাঁহার মনোবিজ্ঞানের অসমাপ্ত বইখানি লিখিয়া শেষ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন লিলি তখন নিশ্চিন্ত মনে আবার কলেজে ভর্তি হইল এবং কয়েক মাসের মধ্যে মরি বাঁচি করিয়া আই-এ পরীক্ষা দিয়া ফেলিল।

সুবিমল কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া এক পাও না নড়িয়া বি-এ ও এম-এ পরীক্ষা দিয়াছে। লিলির সহিত প্রায় আড়াই বছর তাহার দেখা সাক্ষাতের উপায় ছিল না। তবে সরকারি ডাকযোগে যোগা-যোগটা তাহারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

সুবিমল এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—জানিয়া লিলি আনন্দ প্রকাশ করিয়া ও নিজে এখনও কোথায় তলাইয়া আছে সেজন্য হতাশা জানাইয়া সুবিমলকে ছোট্ট একখানা চিঠি লিখিল। উত্তরে সুবিমল লিখিল: "মা ভৈতব্যম্! বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করে ঠিক এক যাত্রায় রওনা না হলেও আগুপাছু দু'খানা এক্সপ্রেসে আমরা চড়ে ছিলাম; মাঝ পথে তোমার এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন যদি খারাপ হয়ে থাকে সেজন্যে দায়ী তুমি নও, টিকিটের দামটা তো পুরোই দিয়েছিলে। ভালো কথা—সাদার্ণ কলেজে একটা চাকরি পেয়েছি। বি-এটা যদি ওখানেই পড়ো তা হলে শুধু খুসীই হবো না, তোমার দু'বছরের ক্ষতিটাও সুদে আসলে উশুল করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আর একটা কথা—সাধারণের মতে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আমাকে দিয়েছে একটা মোটা লেজ, তেমনি সাধারণ থেকে সরকার পর্য্যন্ত সকলের রোগ কুড়িয়েও শৈশবেই বৈকল্য দশা ঘোষণা করে নি আমাদের যে পার্টি, সেই পার্টি দিয়েছে মস্ত দুটো শিং। আমার লেজ ও শিং দেখে ঘাবড়ে যাবে না, আশা করি।"

সাদার্ন কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়া লিলি অনেক খবরই পাইল। নূতন পাওয়া শিং দুটির জন্য সুবিমলকে মূল্য দিতে হইয়াছে

অনেক খানি। সুবিমলের পৈত্রিক বাড়িটাই আজকাল 'গণবাণীর' অফিস না, 'গণবাণী'র অফিস বাড়িটাই সুবিমল ও সমাজ যাহাদের ছন্নছাড়া নাম দিয়া সম্মানিত করে তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান তাহা ধারণা করা সহজ হইল না।

কয়েকদিন পরে সকালের দিকে লিলি গণবাণী তথা পার্টি অফিসে গিয়া দেখিল, দরজার সম্মুখে ঝোলাঝুলি হাতে লইয়া সারিবদ্ধ এক বিরাট জনতা। ভীড় ঠেলিয়া লিলি ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় জানালার কাছে সুবিমলের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল। হাঁ, তাহাকেই ডাকিতেছে—"সামনে দিয়ে পারবে না লিলি, ওপাশের দরজা দিয়ে এসো।"

লিলি ভিতরে আসিতেই সুবিমল তাহাকে উপরতলার ঘরে লইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে লিলি জিজ্ঞাসা করিল: "বাড়িতে একটা কণ্ট্রোলের দোকান খুলে ফেল্লে নাকি?"

সুবিমল হাসিয়া জবাব দিল: "উঁহু, বরং দিনের আলোয় কালো-বাজারের মুনাফা বৃদ্ধি বলতে পারো। অর্থাৎ কাউকেই ক্যাস মেমো দেবো না, বিক্রীর হিসেবও কাউকে দেখাবো না।"

—"সে কি?" লিলির মুখ শাদা হইয়া গেল।

—"আহা, ভয়ই যদি পেয়ে থাকো তা হলে আর একরকম ব্যাখ্যা শুনবে?"

—"কি?"

সুবিমল বলিল: "এটা হচ্ছে আমাদের বুদ্বুদ বিস্ফোরণ—"

—"বুদ্বুদ বিস্ফোরণ?"

—"হ্যাঁ। তুমি গত বছর এমন দিনে এখানে ছিলে না, কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। শোনো তা হলে—লোকমুখে অবশ্য অন্যরকম শুনে থাকবে। গত বছর এমন দিনে দেখা গেল কতকগুলো বিদেশী লোক হঠাৎ সহরে ঢুকে পড়ে—"

—"বিদেশী লোক?" লিলিকে আশ্চর্য হইতে হইল।

সুবিমল বলিয়া চলিল: "পোষাক পরিচ্ছদে আচার ব্যবহারে সহরের কায়দা কানুনগুলো যারা জানে না। তারা বিদেশী ছাড়া আর কি হতে পারে?"

—"তারপর?"

—"তারপর দেখা গেল, সেই বিদেশী লোকগুলো পাড়ায় পাড়ায় এক নূতন ধরণের রসিকতা করে বেড়াতে লাগলো। ভালগারিটি বর্জিত সহুরেরা সে রসিকতা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, একটা কিছু করতে হবে, এই সব যখন ভাবছে, এমন সময় বিদেশী রসিকগুলো—হাতে বন্দুক দিলে প্যারিসের পতন নিবারণ করতে পারতো প্রায় অতগুলো লোক—হঠাৎ ফুটপাতে শুয়ে পড়লো—"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের উপর রুমালটা একবার বুলাইয়া লিলি বলিতে সুরু করিল—"তারপর ওরা সেই যে শুলো আর উঠলো না। তারপর ভালগারিটি বর্জিত সহুরেরা চালে ডালে মিশিয়ে লঙ্গর-খানায় মন্বন্তর দেখিলে কারা বোধ না বলে পথ বসেছিল জানলা

তাক লাগিয়ে দিলে। আর বর্ত্তমানে সহরের দক্ষিণের ফটক দিয়ে যে সব নবাগত বিদেশী ভীড় জমাবার চেষ্টা করছে তাদেরই একটা দলের জন্যে এই মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা করেছো—তাইতো বলবে? কিন্তু জোগাড় করলে কি করে?"

—"কতকটা সরকারি, কতকটা বেসরকারি সাহায্যে কিছু চাল জোগাড় করেছি; যতক্ষণ না ফুরিয়ে যায়, দিতে পারবো। তবে সরকারি খোঁয়াড়ে আর জায়গা নেই বলে বিদেশীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গতবারের চালের মতই যদি রসিকতা করবার একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে তোমাদের তা হলে বাপুরা, তোমাদের নিজেদের দেশ গাঁয়ে ফিরে গিয়ে যা হয় করো গে, এখানে ওসব চলবে না। কাজেই তোমার আমার করবার কিছু থাকবে না।"

—"কেন, আমাদের কো-অপারেটিভ ষ্টোর গুলো কি করতে হয়েছে।"

সুবিমল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল; বলিল: "সহরের ওগুলো তো এক রকম চলছে, কিন্তু মফঃস্বলের ষ্টোরগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। গ্রামের নানা রকম লোকের দলাদলির জন্যে কতকগুলো দু'এক মাসের মধ্যে উঠে যেতে পারে। তাই ভাবছি, যেমন করেই হোক সেগুলোকে বাঁচাতে হবে, আর বিশেষ বিশেষ জেলায় বড় রকমের কতকগুলো ষ্টোর নতুন করে খুলতে হবে। কিন্তু মোটা টাকা না উঠলে তো স্কীমটা মাটি হয়ে যাবে। যাক ও সব আলোচনা আর একদিন করবো। উপস্থিত তোমার পাঠ্যবিষয়ের একটা চার্ট করে রেখেছি. সেটা নিয়ে যেও। ছাত্রানাম্ অধ্যয়নম্ হি তপঃ—এই মহাজন বাক্যটা সর্বদা মনে রাখবে। ও কি আমার কথা শুনছো না?"

লিলি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল: "সুবিমল-দা, পার্টির জন্যে কিছু টাকা এনেছি—"

—"টাকা? তুমি এনেছো?"

—"এই যে—" বলিয়া লিলি সুবিমলের হাতে একখানি চেক দিল। চেকে টাকার অঙ্কটা দেখিয়া সুবিমল প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল: I must kiss your feet, my darling! ওঃ এত টাকা পার্টি এক সঙ্গে অনেকদিন পায় নি—"

—"আঃ, কি ছেলেমানুষী করছো সুবিমল-দা!" লিলি জানিত না যে চেক পাইয়া সুবিমল এতটা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িবে।

উচ্ছ্বাসের বেগ কাটিলে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল: "ডাঃ মল্লিক জানেন নিশ্চয়?"

—"ঠাকুরদা? জানলে কি আর রক্ষে থাকতো? এটা আমার নিজের টাকা।"

—"তোমার টাকা?"

—"কেন, আমার টাকা থাকতে পারে না, না কি?"

—"থাকতে পারে না, তা বলছি নে, তবে—"

—"ভয় নেই, সুবিমল-দা। আমার নামে বাবা যে লাইফ-ইন্সিওর করেছিলেন, সেই টাকা এখন পেয়েছি। আমার টাকা আমি যে কাজেই

খরচ করি না কেন, ঠাকুরদার কাছে তার কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, তা জেনো।"

লিলির উপরোক্ত আশ্বাসের কথাতেও সুবিমলের মনের দ্বিধা কাটিল না; বলিল: "জানি লিলি, তোমাদের অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমাদের মত ভিখিরীর দলকে যদি তার সন্ধান দাও তা হলে চারদিকের পাতা হাত-গুলোতে ঢালতে ঢালতে তোমাদের তিন পুরুষের সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ হতে বেশী দিন লাগবে না। তাই বলি, কাগজখানা এখনো আমার হাতেই আছে, ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে নিতে পারো।"

সুবিমলের মুখে একথা শুনিবার জন্য লিলি সকল আট ঘাট বাঁধিয়া আজ এখানে আসে নাই। আহত হইয়া বলিল: "পারো তুমি সুবিমল-দা, তোমার বাড়িতে যাদের আশ্রয় দিয়েছো, তাদের তাড়িয়ে দিতে?"

—"আহা, তারা যে পার্টির লোক, কত আপনার জন তারা—"

—"তারা পার্টির কাজ করে তাই তারা তোমার আপনার, আর আমি দু'বছর এখানে ছিলাম না বলে আমিই বুঝি—" কথাটা লিলি শেষ করিতে পারিল না। যে অভিমান সে এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছিল, মুখের উপকার রুমালখানা তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

টেবিলের উপর প্রসারিত লিলির কমনীয় হাতখানি দেখিতে দেখিতে গাঢ়স্বরে সুবিমল বলিল: "মাপ করো লিলি। আমাদের এই দলটিকে তুমি যে আজও এত খানি ভালোবাসো তা ধারণা করতে পারি নি। আর আড়াই বছর ধরে যতগুলো চিঠি লিখেছিলে তার প্রতি ছত্রে যে কথাটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলে—" কথাটা শেষ না করিয়া সুবিমল চেকটা ড্রয়ারে রাখিয়া দিল।

—"ও কি, চুপ করলে কেন? বলো, কি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম, আর কি তুমি জানতে পেরেছো?"

—"থাক, লিলি, আর একদিন বলবো। একটা কথা বলি আজ—তোমার ঠাকুরদার মনে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন সঙ্কল্প করে বোসো না। তিনিই সংসারে তোমার শ্রেষ্ঠ আপনার জন, যতদিন বেঁচে আছেন তিনি, এই কথাটাই যেন জানতে পারেন।"

লিলি অবাক হইয়া সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল: "তোমার আমার সম্পর্কটা ঠাকুরদার কাছে খোলা মনে আজও ব্যক্ত করতে পারছিনে, এটাই সব চেয়ে পীড়াদায়ক, তা কি বোঝো না, তুমি?"

ঈষৎ হাসিয়া সুবিমল বলিল: "নাই বা ব্যক্ত করলে লিলি। জানি তিনি জ্ঞানী, বিচারবুদ্ধি তাঁর অগাধ; কিন্তু যে আদর্শ তাঁর মনে দৃঢ় ভিত গেড়ে বসে আছে, তোমার আমার সম্পর্কের খাতিরের এক ধাক্কায় সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, এটা আশা করা যেমন বাতুলতা, তেমনি তাঁর এই বয়সে মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দেবার ইচ্ছাটাও পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।"

—"কিন্তু—"

—"জানি লিলি, আপনার জনের কাছেই আর এক আপনার জনের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়—"

লিলি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল: "শুধু ব্যাকুল নয়, এতদিন পরিচয় করিয়ে দিতে পারি নি বলে জীবনটাই ব্যর্থ মনে হয় না কি?"

সুবিমল উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তারপর ফিরিয়া আসিয়া প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিল: "তুমি এখনো খুব ছেলে মানুষ, লিলি—"

লিলি ফোঁস করিয়া উত্তর দিল: "আমি ছেলে মানুষ, তাতো বলবেই; নিজে বুঝি প্রফেসার হয়েই বুড়োমানুষ হয়ে গেছো?"

লিলির কথায় সুবিমল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল: "নিশ্চয়, আমি এখন মাষ্টার, একথা সদাসর্বদা মনে রাখি।"

—"তাই বুঝি মাষ্টারিটা আমার ওপরেই প্রথম থেকে সুরু করছো?"

—"পাগল! তোমার ওপর মাষ্টারি! বরং যদি কায়েমীভাবে এ-বাড়ি আলোকিত কর, তুমিই করবে আমার ওপর মাষ্টারি; বলবে: "আর যা খুসী করো কিছু বলবো না, সময়ে নাওয়া খাওয়াটাও যে একটা দরকারি কাজ সেটা মনে রাখো না কেন?"

লিলিও দুষ্টামি করিয়া বলিল: "আর তুমি বুঝি বলতে ছাড়বে—'মিটিঙেই যাও আর যেখানেই যাও, বর্ষাকালে ছোট্ট ছাতাটা সঙ্গে নিতে ভুলে যাও কেন?"

—"বর্ষাকালে ছোট্ট ছাতাটা?" সুবিমল আকাশ হইতে পড়িল।

—"ভুলে গেলে না কি এর মধ্যে?"

—"তিন বছর আগেকার সেই কথাটা এখনো মনে রেখে দিয়েছো দেখছি" বলিয়া সুবিমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেওয়ালের ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া সুবিমলের হাসির প্রতিধ্বনি করিল। লিলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল: "তাই তো, এগারোটা বাজলো! ঠাকুরদাকে নিয়ে এক জায়গায় যাবার কথা আছে। আচ্ছা, আসি তা হলে।"

লিলি দরজার দিকে পা বাড়াইতেই সুবিমল বলিল: "এক সেকেণ্ড—"

লিলি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "আবার কি?"

সুবিমল তাহার হাতে একখানি কাগজ দিয়া বলিল: "এই চার্টটা। ছাত্রীনাম অধ্যয়নম্ হি তপঃ।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল: "বেশী যদি মাষ্টারি করো তা হলে অন্য কলেজে চলে যাবো, তা জেনে রেখো।"

—"সারা ভারতে যেমন কমরেড সোমের পার্টি, তেমনি সারা কলকাতায় এই সাদার্ন কলেজ, সেটাও জেনে রেখো।"

—"আচ্ছা গো, আচ্ছা" বলিয়া লিলি সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া পৌঁছিল। সুবিমল তাহাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

সুবিমলকে সেদিন কেহ আর নীচে নামিতে দেখে নাই। আড়াই বছর পরে লিলি আজ আসিয়াছিল, অথচ পার্টির নূতন সভ্যদের মধ্যে যাহারা সকালে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত লিলির পরিচয় করাইয়া দিবার কথাটা সুবিমল ভুলিয়া গিয়াছিল।

দীর্ঘ অদর্শনের পর সুবিমলের সহিদ আজকের সাক্ষাতে লিলির মন

অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া পার্টির জন্য চেকটা তাহাকে দিতে পারিয়াছে বলিয়া।

ট্রামে উঠিয়া লিলি মন স্থির করিয়া ফেলিল। এক দিকে ঠাকুরদা ও পাঠ্যবিষয়, অন্যদিকে সুবিমল ও তাহাদের পার্টি—এই দুই দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাকে চলিতে হইবে।

আরও দুইটি বছর কাটিয়াছে। দুই দিকে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য লিলি যে সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহা সে পালন করিয়া আসিয়াছে। বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইবার পর এই দুই বছরে লিলিকে যে কঠোর শ্রম করিতে হইয়াছে তাহা লিলি ও সুবিমল ছাড়া আর কেহ জানে না। আর কয়েক মাস পরে সে পরীক্ষা দিবে, সসম্মানে উৎরাইবে—আশা করা যায়। ঠাকুরদার কাজে সে কোন ত্রুটি রাখিতেছে, এ বদনাম কেহ দিবে না। সুবিমলের প্রতি তাহার ভালোবাসা যেমন আজও অটুট আছে, তেমনি পার্টির জন্য হাতে কলমে কাজ যতটা করিতে পারিয়াছে তার চেয়ে বেশী করিয়াছে তাহার নিজের নামে যেখানে যত টাকা ছিল সবই, ঢালিয়া দিয়াছে—এক একটি বিপদ হইতে পার্টি ও তাহার কলিকাতার মুখপত্র 'গণবাণী'কে বাঁচাইবার জন্য। কয়েকখানা অলঙ্কার ছাড়া লিলির নিজস্ব বলিয়া আর কিছুই নাই। ঠাকুরদার নামে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা থাকিতে পারে, কিন্তু ঠাকুরদার কাছ থেকে মোটা টাকা লইতে হইলে লিলিকে যে ছলনা, যে অভিনয় করিতে হয় সেজন্য তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। তবে সুবিমলের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে একটু হাসি ফুটিবার জন্য ও যাহাদের জন্য সুবিমল জীবনপাত করিতেছে তাহাদেরই মুক্তি সংগ্রামেই টাকাটা লাগিবে জানিয়া তাহার শত ছলনা শত অভিনয় সার্থক হয়।

সুবিমলের এ বাড়িতে আসা ও লিলির সহিত তাহার সম্পর্কটুকু ঠাকুরদার কাছে উদ্ঘাটন করা—এই বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঠেকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল অনুকূল ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু কয়েকদিন দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়াও নাইটস্কুলের জন্য আশানুরূপ টাকা উঠিতেছে না দেখিয়া মনঃসমীক্ষক ঠাকুরদার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার কিছু সহানুভূতি পাইবে এই ধারণার বশে লিলির অজ্ঞাতে সুবিমল গত সপ্তাহে হঠাৎ এ বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরদা তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা কোন দিক থেকেই লিলি জানিতে পারে নাই। ঠাকুরদা অবশ্য ভদ্রতা করিয়া তাহাকে দুইশত টাকা দিয়াছেন, তবু প্রয়োজনের অনুপাতে তাহা সামান্য জানিয়া লিলিকেই আবার সেই নাইটস্কুলের জন্য ঠাকুরদার কাছ থেকে মিথ্যা ভণিতা করিয়া আরও অনেক বেশী টাকা আদায় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে বসিয়া সেই টাকা প্রসঙ্গে সুবিমল যে তাহার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথাটা বলিয়াছিল কি মনে করিয়া, সারাদিন চিন্তা করিয়াও লিলি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সুবিমল তো এ ধরণের কথা আগে বলিত না। লিলির সহিত বোঝাপড়া করিবার তাহার নিজেরই সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে? তাহা ভালো করিয়া জানিবার জন্য আজও লিলিকে দেশপ্রিয় পার্কের নির্দিষ্ট কোনটিতে গিয়া বসিতে হইয়াছিল। প্রশ্নের মধ্যে জটিলতা বাদ দিয়া লিলি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "আমার জন্য আজকাল তুমি ভারী ভাবনায় পড়েছো, না?"

"—ভাবনায়?" বলিয়া সুবিমল লিলির একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। কথা যেন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে।

লিলিকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল: "কি গো কথা কইছো না যে?"

আরও একটু ভাবিয়া সুবিমল বলিল: "পাঁচ বছর আগে জুন মাসের এক মেঘলা দিনে পদ্মার ওপর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আকাশটা ছিল ঘোর লাল, আর পদ্মার বুক থেকে যে বড় বড় ঢেউ উঠছিল তার কণাগুলোও ছিল জ্বলন্ত শিখার মত টকটকে লাল। তারপর আকাশের মেঘ আর জলের তরঙ্গের মধ্যে যে মাতামাতিটা সুরু হলো তার কাছে কোথায় লাগে তোমাদের উদয়শঙ্করি নাচ! দেড়বছর পরে জানুয়ারী মাসে পদ্মার ওপর দিয়ে আর একবার গিয়েছিলাম; দেখলাম, একেবারে লক্ষ্মী মেয়েটির মত ধীর গতিতে একটানা বয়ে যাচ্ছে, শুধু কলহাসির ছলছলানি শোনাতে শোনাতে। বলতে পারো লিলি, পদ্মার কোন রূপটা ভালো?"

উত্তরে লিলি এককথা বলিতে চাহিয়াছিল: "দুটোই ভালো; তার এক রূপ তোমাকে আকৃষ্ট করেছিল, আর এক রূপ দেখে তাকে ভালোবেসেছিল"—কিন্তু ভুল করিয়া অন্যকথা বলিয়া বসিল: "জানি না; তবে আজকাল তুমি কলেজে ইকনমিক্সের বদলে পদ্মার মাতামাতির কথা পড়াও নাকি?"

সুবিমল যেন কথাটা লুফিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল: "ভালো কথা, কাল যে নোটগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো তৈরী করছো তো?"

ব্যস্! কোথাকার কথা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল!

আগে সুবিমলকে পার্টির জন্য অহর্নিশি চিন্তা করিতে হইত; বর্তমানে কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রধান নেতা কমরেড সোমই গুরুতর বিষয়গুলি মীমাংসা করিয়া দেন; সুবিমলকে শুধু আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করিতে হয়, যে-সব ব্যাপারে লিলিও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। কাজেই যে ভাবপ্রবণতাকে সুবিমল এতদিন আমল দেয় নাই, আজকাল একটু অবসর পাইলেই, সে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ফলে লিলির প্রশ্নটার জবাব দিতে গিয়া তাহাকে দেশপ্রিয় পার্ক হইতে পদ্মার কোল পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেল। যাক্ সুবিমল যাহা খোলসা করিয়া বলে না তাহা লইয়া লিলির মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই।

লিলি তবু মাথা না ঘামাইয়া পারে না। সুবিমলের পথ সরল ও মুক্ত, কিন্তু লিলি আর দুই বছর পরে কি করিবে? বি-এ পরীক্ষা দিবার পর মাত্র দুইটা বছরেই এম-এ পরীক্ষা দিবার কোন বাধা থাকিবে না। যত দিন সে কলেজে যাইতে পারিবে ততদিন পথ ঘা

এম-এ পরীক্ষা হইয়া গেলে সে ইচ্ছামত না পারিবে যখন তখন সুবিমলের কাছে যাইতে না পারিবে পার্টির কাজে যত্রতত্র ছুটাছুটি করিতে। এমন নয় যে লিলি যাইতে পারিবে না বলিয়া সুবিমল সটান এ-বাড়িতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুরদাকে বলিবে: "মহাশয়, আমাকে বোধহয় চিনিতে পারেন; আমি সেই সুবিমল দত্ত, গণতন্ত্রী দলের কলিকাতা শাখার সম্পাদক আর আমি আপনার আহ্লাদী পৌত্রী লিলিকে ভালোবাসিয়া থাকি; অতএব—" এবং সুবিমলের কথাগুলি শুনিয়াই ঠাকুরদা যে সন্দেশ আনিবার জন্য মিষ্টান্নের দোকানে লোক পাঠাইবেন, এ ভরসা করা যায় না।

একটা কথা মনে করিয়া লিলি কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। সেদিন কি একটা কাজে ঠাকুরদা তাহাকে বলিয়াছিলেন: "না দিদি, তুই ছেলেমানুষ, তুই পারবি নে।" উত্তরে লিলি দুষ্টামি করিয়া বলিয়াছিল: "বা রে! কুড়ি বছর আমার বয়েস হলো, তবু বলবে ছেলেমানুষ?"

ঠাকুরদা শাদা দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে একগাল হাসিয়া বলিয়াছিলেন: "না না না, খবরদার ও কথা বলবে না।" তারপর ছড়া কাটিয়া বলিয়াছিলেন—

> "ঘাগরা ছেড়ে পরলে বুঝি শাড়ি,
> বালিকা সে কিশোরী হয়,
> হয় না তবু নারী।"

ছড়া শেষ করিয়া ঠাকুরদা আর একবার সাবধান করিয়া দিলেন: "খবরদার, ফের যদি বয়েস বাড়িয়ে বলবি তো—" ইত্যাদি।

কিন্তু বয়স বাড়ানো দূরের কথা, ইচ্ছা করিয়া লিলি চার বছর কমাইয়াই বলিয়াছিল; কিন্তু আপন ভোলা ঠাকুরদার খেয়াল হয় নাই যে আর কয় দিন পরে লিলি বি-এ পরীক্ষা দিবে—চব্বিশ বছর বয়সে, আর এম-এ পরীক্ষা দিবে ছাব্বিশে। 'ছাব্বিশ' শুনিলেই ঠাকুরদার টনক নড়িয়া যাইবে।

ছাব্বিশ বছর! কথাটা ভাবিয়া লিলিরই যেন টনকটা নড়িয়া উঠিল।

তবে ছাব্বিশে পদার্পণ করিবার, এম-এ পাশ করিয়া বেকার হইয়া পড়িবার এবং সুবিমলের সহিত তাহার দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ইতিহাসখানা ঠাকুরদার সম্মুখে খুলিয়া ধরিবার সময় হইয়াছে কিনা ভাবিবার পূর্বে অনায়াসে দুইটা বছর সে হাতে পাইবে। দুইটা বছর নেহাৎ কম সময় নয়। দুই বছরে দেশ বিদেশে কত কি ঘটিতে পারে। আর এই দুই বছরে কমরেড সোম ও সুবিমল প্রমুখ তাহার বিশ্বস্ত অনুগামীরা তাহাদের এই মুক্তি সংগ্রামে জয়ের পথে নিশ্চয় অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিবেন। তখন যদি সুবিমল ও লিলি এক সঙ্গে, রতন প্রহ্লাদ, সুলতা, ঊর্মিলা, ননীরাম, ইয়াসিন, জোসেফ, ইসমাইল, রাবেয়া, সাকিনা, উপেন, শঙ্কর ও হাজার হাজার লোকের জনতা ভেদ করিয়া সরাসরি ঠাকুরদার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার শাদা জ্র জোড়াটা কপালে উঠিয়া যাইবে না বোধহয়। তবে সংগ্রামের পথ যদি মসৃণ না হইয়া বন্ধুর ও দুর্গম হইয়া পড়ে তখন যদি তাহাকে জনতার মধ্যে নিজেকে পুরাপুরি বিলাইয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করে তাহা হইলে ঠাকুরদা কি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তাহার মনোবিজ্ঞানের বইগুলির মধ্যে ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন না?

আর একটা কথা মনে করিয়া লিলি কৌতুক বোধ করিল। তাহার মনঃসমীক্ষক ঠাকুরদা হাজার হাজার লোকের মনের অন্ধকার গহ্বরে লুকান বস্তুগুলির সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যাহাকে শৈশব হইতে চব্বিশ বছরের করিয়া মানুষ করিয়াছেন ও যাহার এক বেলার অদর্শনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন, তাহার সেই আদরের পৌত্রী লিলির মনের একটি কথাও জানিতে পারেন নাই। যে যজ্ঞে লিলি আজ নিজেকে আহুতি দিতে বসিয়াছে তার একটু আঁচও যদি মনঃসমীক্ষকের মনে লাগিত তাহা হইলে কি হইতে পারিত, তাহা ভাবিয়া লিলি খিল খিল করিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

আধুনিক কৃষি ও চিকিৎসা বিভ্রাট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মানুষের বেলায় খাদ্য ও ঔষধে অনেক তফাৎ। উদ্ভিদের বেলায় রাসায়নিক কৃত্রিম সার কি খাদ্য না ঔষধ? এই বিষয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ ও আলোচনা সুরু হইয়াছে। আলোচনার ফলে নিত্যনূতন রাসায়নিক সারের সৃষ্টিও হইতেছে। কোন কোনও ক্ষেত্রে রাজকীয় সাহায্য, বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য সমস্যার সমাধানে সাহায্য না করিয়া চিকিৎসায় সঙ্কট উপস্থিত করিয়াছে। পশ্চিমের চাকচিক্যময় দ্রুত ও চঞ্চল প্রকৃতির সংঘাতে প্রাচ্যের ধীর সমাজ জীবনে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। অনাহার, দারিদ্র্য ও শ্রেণীসংগ্রামে প্রাচ্যের চিরপ্রোথিত জীবন-দর্শন ও ভাবধারা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পরানুকরণ প্রবৃত্তির আবেগে এক শ্রেণীর লোক পশ্চিমের সকল কিছুই অনুসরণ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা পরিহার করিবার জন্য যত্নশীল। কলের লাঙ্গল ও কৃত্রিম সারের প্রয়োগ এই শ্রেণীর লোকের স্বপ্নবিলাস। অপরদিকে সারাভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ভাবধারা উন্নত করিবার জন্য যাঁহারা সচেষ্ট তাঁহাদের কথাও উপেক্ষণীয় নহে। চিন্তার এই দ্বিধারায় অবগাহন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে। গান্ধিজীর চিন্তাধারা তাঁহার প্রায়োদ্যোগ,

সংঘের ভিতর দিয়া আংশিক প্রবাহিত। তাঁহার স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত পিয়ারী লাল, ভিনোবা, কুমারাপ্পা প্রভৃতি অনেকেই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ত্যাগী ও কর্ম্মি কাজেই তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত মন্তব্যের অনেক দাম। হরিজন পত্রিকার ফাইল হইতে কতিপয় উদাহরণ এখানে পরিবেষণ করিলে আলোচনার সুবিধা হইবে মনে হয়। ইঁহাদের অনেকেই জমির খাদ্য হিসাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিরোধী। পিয়ারীলাল বলেন রাসায়নিক সার ঔষধ হইতে পারে কদাপি খাদ্য নহে। শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা আরও অগ্রসর হইয়া সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে—"ill advised central Government"কে, সিন্ত্রি পরিকল্পনা পরিহার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। বড়লাটের executive councillors ১৯৪৪-৪৫ সালে সিংহভূম জেলার সিন্ত্রি নামক স্থানে ২২ কোটী টাকা ব্যয়ে ৩৫০০০০ টন Ammon Sulphate তৈরী হইতে পারে এইরূপ একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জহরলালের অন্তঃবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘসূত্রী নীতি পরিহার করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন মাত্র। এই ২২ কোটী টাকার মধ্যে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি খরিদেই ১২ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে। সিন্ত্রির কারখানায় ও ভারতীয় অন্যান্য কারখানার উৎপন্ন হিসাবে ধরিলে মোট ছয় লক্ষ টন পর্য্যন্ত Ammon Sulphate উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে ৬৩০০০ টন ammon sulphate খরচের হিসাব পাওয়া যায়। এই বৎসরে আমেরিকায় ৯০,৯০,০০০ টন এবং গ্রেট ব্রিটেনে ১২,২১,৩০০ টন (শতকরা ১০০ ভাগ সালফেট্‌ হিসাবে) খরচ হইয়াছে। কৃষি ব্যতীত কোন কোনও রাসায়নিক শিল্পেও ammon sulphate প্রয়োজন হয়। যুদ্ধের ডামাডোলে মাল পাওয়া মুস্কিল ছিল নচেৎ ভারতের প্রয়োজন এখনই অনেক বেশী। U. S. A. এবং U. K.-তে একভাগ ammon sulphate-এর সহিত দেড় হইতে দুই ভাগ সুপার ফস্‌ফেট মিশাইয়া সার হিসাবে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্রিত সারে ধান, ইক্ষু, চা, কফি, তুলার উৎপন্ন পরিমান শতকরা ৫০ হইতে ১০০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সিন্ত্রির কারখানা চালু হইলেও ভারতের মতন বিরাট দেশে এই পরিমান বেশী মারাত্মক নহে। পশ্চিমের তুলনায় এখানে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করিলেও উদ্বৃত্ত হইবার সঙ্গত কারণ নাই। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনাকে হীন পরামর্শজনিত বলা সঙ্গত কি?

আদর্শ খাদ্য কি? শরীর রক্ষার জন্য কম বেশী সকল গুণই যে খাদ্যে উপস্থিত তাহাকেই আদর্শ খাদ্য বলা যায়। দুধে ছানা, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, লবণ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য বর্ত্তমান থাকায় দুধ একটী প্রয়োজনীয় আদর্শ খাদ্য। এমন হয়ত সম্ভব যে কোনও রোগীর শরীরে ভিটামিন "এ" ও "ডি"র ভাগ কমিয়া গিয়াছে। সচরাচর খাদ্যে এই ভিটামিন সংগ্রহ করা অসম্ভব মনে হইলে দুধের সহিত পরিমিত 'কড্‌লিভার' কিম্বা 'শার্কলিভার' তেল খাওয়াইলে রোগীর উপকার সম্ভাবনা; চিকিৎসকরা তখনই উক্ত যে কোন তেল দুধের সহিত পথ্য দিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে ঔষধের পরিমান রোগীর বয়স ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া একমাত্র চিকিৎসকই স্থির করিতে পারেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিকূল আবহাওয়ায় যাহাদের জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয় কিম্বা সাধারণ জীবনযাত্রায় অমিতাচার ও অশরণ যাহাদের অভ্যাস তাহাদিগকে অনেক সময় উত্তেজক ঔষধের সাহায্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। অধিকাংশ উত্তেজক ঔষধেই মদ, আফিং, গাঁজা কিম্বা এই ধরণের যে কোনও তেজস্কর দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। কাজেই এই ধরণের ঔষধ সেবনের পরে ক্ষণিক উত্তেজনা কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে অতিরিক্ত ক্ষিপ্র করিয়া তুলিলেও ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইবার অব্যবহিত পরে অবসাদ আসিয়া তাহার শরীর ও মনকে আপ্লুত করিয়া দেয়। ক্রমাগতঃ এইরূপ উত্তেজক ঔষধ ব্যবহারে মাংসপেশী শিথিল ও অবশ হইতে হইতে অবশেষে নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। একমাত্র মিতাচার ও সুখাদ্য গ্রহণে মাংসপেশী, শিরা, উপশিরা দীর্ঘকাল ধরিয়া সুস্থ ও কার্য্যকরী রাখা সম্ভব। মিতাচারী ব্যক্তি দুর্ব্বল এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলে দক্ষ চিকিৎসকের পরামর্শে মাত্রানুযায়ী দুষ্ট গরল সেবন করিয়াও সঞ্জিবনী শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারেন। নিষ্প্রয়োজনে সুস্থদেহে সঞ্জিবনী সুধাও অকাল-পক্কতা আনিয়া দেয়। কাজেই দেখা যায় পৃথক কারণে, বিভিন্ন সময়ে মানুষের পক্ষেও খাদ্য, ঔষধ ও মাদক দ্রব্যের প্রয়োজন আলাদা। খেয়াল মাফিক এক জিনিষ দিয়া অপর কাজ চালাইয়া লওয়া যায় না। উদ্ভিজ্জ-জগৎ সম্পর্কেও এই কথা কি সত্য? মানুষ, পশু এবং পাখীর মতন গাছপালারও খাদ্য দরকার। উদ্ভিজ্জ-জগৎ প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী আলো, বাতাস ও মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। মাটির বুকে নিহিত জৈব ও খনিজ পদার্থ জলে দ্রব হইলে গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে। একপ্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু মাটীর অভ্যন্তরে থাকিয়া এই খাদ্যকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য সারে পরিণত করে। মানুষের পাকাশয় যন্ত্র তাহার খাদ্যের কিয়দংশ হজমযোগ্য আহার্য্যে পরিণত করিয়া বাকী অংশকে মল মূত্রাকারে বাহির করিয়া দেয়। উক্ত সূক্ষ্ম জীবাণু (micro-organism) মানুষের পরিত্যক্ত মল মূত্রকেও গাছপালার উৎকৃষ্ট খাদ্যে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। এই অদ্ভুত নিয়মে প্রকৃতির ভারসাম্য ও নির্ঘণ্টচক্র নিবর্ত্তিত হয়। মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি ও অনাচার এই ভারসাম্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে প্রকৃতি স্বয়ং তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে দ্বিধা করে না। মানুষের মল মূত্রের ন্যায় গোশালার মল মূত্র ও পচা লতাপাতা কৃষির উৎকৃষ্ট সার। এই সংমিশ্রিত জৈব সারকে compost আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য যেমন মানুষের একাধারে আহার্য্য ও ঔষধ উদ্ভিদের বেলায় কম্পোষ্ট সারে বর্ত্তমান "auxin" ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়।

প্রবল বন্যা ও বর্ষার জল ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে বালি পড়িয়া কিম্বা সার ধৌত হওয়ায় জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। এইরূপ ঘোরতর প্লাবন পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে কালে, জমি চাষের অযোগ্য হইয়া যায়। রোগীকে ঔষধ [illegible]

নাতিউর্ব্বর জমির শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ বিধেয়। এই সকল ক্ষেত্রে স্বল্পপরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগে শীঘ্র হৃত উর্ব্বরতা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু চিকিৎসক ব্যতীত যেমন রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নহে তেমনি মৃত্তিকারাসায়নিক ব্যতীত সার প্রয়োগ অবিধেয়, মৃত্তিকা রাসায়নিক জমির গুণাগুণ বিশ্লেষণ না করিয়া সারের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না। সুস্থ ও সবল মানুষ "মর্ফিয়া" খাওয়া অভ্যাস করিয়া যেমন কিছুকালের জন্য অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতা সংগ্রহ করিয়া থাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃত্রিম সার প্রয়োগ করিয়াও কয়েক বৎসর অধিক ফসল ফলান সম্ভব। তারপরে মৃত্তিকার অম্লজভাগ বৃদ্ধিজনিত সূক্ষ্ম জীবাণুর মৃত্যুতে জমি কৃষির অনুপযুক্ত হইয়া যায়। যে দেশের কৃষক মৃত্যুর পূর্ব্বে এক ফোঁটা ঔষধ সংগ্রহ করিতে হিমসিম খাইয়া যায় সে দেশে মৃত্তিকা চিকিৎসকের কথা রূপকথা নয় কি? কলের লাঙ্গলে ৯।১০ ইঞ্চি নীচের মৃত্তিকা উপরে উঠিয়া আসে, দেশীয় প্রথায় ৩।৪ ইঞ্চির নীচে লাঙ্গলের সীতা মাটীতে প্রবেশ করে না। এই সূক্ষ্ম বীজাণু পলিমাটী কিম্বা দোঁয়াশ মাটীর ৩।৪ ইঞ্চির ভিতরেই থাকে। কাজেই কলের লাঙ্গলে চাষ করিলে নাইট্রোজেন ঘটিত কৃত্রিম সার ও বীজাণু তৈরীর জন্য Compost মিশাইয়া দিলে জমির উর্ব্বরতা বজায় থাকে বরং তলদেশের অজৈব সার পদার্থ উপরে আসায় উর্ব্বরতা বাড়িবারই কথা। কিন্তু যান্ত্রিক কৃষির দোষই যে সেখানে সহজলভ্য প্রাণীজ জৈব সার সহজলভ্য থাকে না। কাজেই মৃত্তিকার humus or auxin ক্রমেই ক্ষীয়মান হইতে সুরু করে। বিলাতের একজন বৈজ্ঞানিক কৃষক Fermer Sykes বলেন যে কৃত্রিম সারে সভ্যতার সর্ব্বনাশ টেনে আনছে। কেবলমাত্র কৃত্রিমসার ব্যবহারে এমন দিন আসবে যে দিন মাটীর শস্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা একেবারে হ্রাস হয়ে যাবে। Sykesএর মতনই স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড বলেন যে কৃত্রিম সারে মানুষ ও গবাদি প্রাণীর মধ্যে ব্যারাম বাড়িয়াই চলিতেছে। তাঁহার মতে অবস্থার এত খারাপ পরিণতি যে সাধারণ লোকে কিছু জানে না। তিনি বলিতেছেন They are not encuraging and certainly not impressive. Artificial manures were born out of the abuse of Liebig's discoveris of the chemical properties of the soil and out of the imperative demands made on the farmer by the invention of machinery. *

Friend Sykes (Wiltshire এর বিখ্যাত চাষী) "Humus and Farmer" কাগজে লিখিতেছেন—তৈলসিক্ত মাংসল ও মোটা মানুষ মাত্রেই কি শক্তিধর? যে মানুষের হাড় ও মাংসপেশী স্বাভাবিক, দৃঢ় ও উন্নত তিনি স্থূলকায় না হইলেও বেশী স্বাস্থ্যসম্পন্ন। তেমনি বড় বড় ফলমূলে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় ভিটামিন আছে কি নাই বলা যায় না। কৃত্রিম সারে উৎপন্ন, লাবণ্যময় ফলমূলে কেবলমাত্র সহজাত স্বাস্থ্যের উপাদানের অভাব নহে ভাবী মৃত্যুর (Virns) বীজ লুক্কায়িত আছে। তিনি লিখিতেছেন যে, তাঁহার গরু, শুকর ও Race এর ঘোড়া প্রদর্শনীতে বরাবর পুরস্কার পাইত। হঠাৎ পর পর ২ দুই বৎসর সুনামের বিপর্য্যয় ঘটায় তিনি পশুগুলিকে পরীক্ষার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানে টিউবারকুলোশ্ রোগে সকলগুলিই আক্রান্ত বলিয়া জানিতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রোগাক্রান্ত গরুগুলি তখনও সবচেয়ে বেশী দুধ দিতেছিল। হতাশায় তিনি বাগানবাড়ী ও পশুপাল সমস্তই বেচিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে দেখিলেন কয়েকবছর থেকে তিনি কৃত্রিম সার ব্যবহার করিতেছিলেন, ইহার পরে ১৯৩৬ সালে তিনি হ্যালিশবারীর উপত্যকায় একখানা অনুর্ব্বর জমি নিয়া চাষবাস আরম্ভ করিলেন। দশ বছরের পরিশ্রমে, বন্ধুবান্ধবদের নানা ঠাট্টাবিদ্রূপ ও অনুযোগ অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভ করিলেন, এই ফলাফলই কাগজে লিখিত হইয়াছে। Farmer Sykes এর পশুগুলি পুনরায় প্রদর্শনীক্ষেত্রে পুরস্কার পাইতেছে। তিনি মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন কৃষিক্ষেত্রে যাইতে হইবে প্রাণীতত্ত্ববিস্তার মন নিয়া রসায়ন শাস্ত্র এই প্রাণীতত্ত্ব বিস্তার কাজে সহায়ক হইবে মাত্র। তিনি আরও বলেন যে, রাসায়নিকদের মতলবী প্রচারে কৃষিক্ষেত্রে আজ ভাঙ্গন ধরিয়াছে। নির্ব্বিচারে কৃত্রিম সার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভাবী জগৎকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন। নিউজিল্যাণ্ডে অত্যন্ত কৃত্রিম সার ব্যবহার প্রচলন। গত মহাযুদ্ধে রংরুটদের শতকরা ৪০ জনকে দন্তরোগে আক্রান্ত এবং Catarrah এবং Septic tonsil ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাবল্য দেখিয়া ডাঃ চ্যাপমান মাউণ্ট এলবার্ট গ্রামার স্কুলের ৬০ জন ছাত্র লইয়া কৃত্রিম ও অকৃত্রিম খাদ্যের ফলাফল গবেষণা করেন। তাঁহার মন্তব্য—অকৃত্রিম খাদ্যে দন্তরোগ, catarrah এবং Septic tonsil প্রভৃতির প্রাবল্য শতাধিক পরিমাণে কম, ভারতের মতন দরিদ্র দেশে বরুণ দেবতার উপর নির্ভরশীল কৃষিক্ষেত্রে দরিদ্রতর কৃষকের পক্ষে কৃত্রিম সার প্রয়োগ কতকটা জুয়াখেলার ন্যায়, রাসায়নিক সার প্রয়োগের পূর্ব্বে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন।

প্রাশ্চাত্য সহজলভ্য পচা লতাপাতা, গোময় ও গোমূত্র দুষ্প্রাপ্য তত্রাচ তাহাদের নাগরিক সভ্যতার যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় আবর্জ্জনাকে সারে পরিণত করা হইতেছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষার ক্ষেত্রে জল যাহাতে সমান ভাবে পাওয়া যায় তাহার জন্য খাল খনন এবং নদীর জল বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিস্তৃত জলাধার নির্ম্মিত হইতেছে, স্বল্প সময়ের ভিতরে রাশিয়া তাহার এশিয়া ভূখণ্ডের অধ্যাত জাতির মধ্যেও সভ্যতার মানদণ্ড আমাদের চেয়ে উঁচু করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ও গোড়া ঠিক না করিয়া কেবলমাত্র কৃত্রিম সারের আন্দোলন করিলে কৃষক তাহার ভাঙ্গা হাল ও চিরকগ্ন বলদ লইয়া ভগবান ও অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কৃত্রিম সারের বাজারে ছুটিয়া যাইবে না। পাশ্চাত্য শিব গড়িতে গিয়া ফ্রাঙ্কনষ্টাইন্ গড়িয়া বসিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ না লইয়াই "উজ্জ্বল আলোক হেরি পতঙ্গ যেমতি ধায়" তেমনি ছুটিব কিনা এখনই তাহা স্থির করিয়া লওয়া দরকার। *

১৯৪৭ সালের ২০শে এপ্রিলের 'হরিজনে' প্রকাশ অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি "জীবন্ত কৃষি উদ্যান সমিতি" আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। যে সমস্ত উদ্যানের মৃত্তিকায় "Humus" মৃত সেই সকল জমিতে কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ পদ্ধতিতে পুনরায় Humus সৃষ্টি ও মৃত্তিকায় ইহার যথাযথ সংরক্ষণ ব্যাপারে সাধারণ্যে আন্দোলন ও শিক্ষাদান এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির মতে কম্পোষ্ট সারে জমি চাষ করা হইলে উৎপন্ন খাদ্যে জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অসুখ কম হয় এবং সাধারণের ক্ষয়রোগ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি হয়।

---

* হরিজন পত্রিকা ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ সাল, ১০ই নভেম্বর ১৯৪৬

* ১৯৪৬ সালের ২৬শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সেণ্ট্র্যাল ইরিগেশন বিভাগের সপ্তদশ বার্ষিক সভার সভাপতি রায় বাহাদুর এ, এন, খোসলার বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। উক্ত বক্তৃতায় ভারতীয় জন সাধারণের জীবনধারা উন্নত করিতে হইলে প্রথমেই নদ-নদীশাসন প্রয়োজন, তাঁহার মতে ভারতীয় নদনদীর বিপুল জলরাশির শতকরা মাত্র ৬ ভাগ মানুষের কাজে লাগে, বাকী ৯৪ ভাগ মানুষের উপকারও দূরের কথা, বন্যা, প্লাবন ও মৃত্যুরূপেই ভারতীয় নরনারীর জীবনে দুর্দৈব সৃষ্টি করে।

গান্ধীজী

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুগ সঞ্চিত নিবিড় আঁধার
ভেদিয়া তুমি হে মহা অবতার
করিতে লাঘব মানবের ভার
এসেছ ধরণীতলে।
হিংসার মাঝে শান্তির দূত,
ঘন মেঘ মাঝে তুমি বিদ্যুৎ,
অজ্ঞতা মাঝে যেন অপরূপ
জ্ঞানালোক শিখা জ্বলে॥

তুমি ধার্ম্মিক, তুমি যাজ্ঞিক,
তুমি ঋত্বিক, তুমি সাত্বিক,
জগতের তুমি মহান মানব,
তুমি যে গো মহামানী।
তুমি রাজর্ষি, তুমি দেবর্ষি,
সারা এশিয়ার তুমি মহর্ষি,
তমসা জড়িত এই ভারতের
তুমি যে মর্ম্মবাণী॥

কঠিন তোমার তপশ্চর্য্যা,
মানব প্রেমের করিছ চর্চ্চা,
ভ্রান্তির বশে আঘাত যে হানে
তারেও লহিছ টানি।
অজ্ঞান, মূঢ় দেশবাসীগণে
আলোকের পথে চলে তব সনে,
প্রেমের পরশে চলিছ মিটায়ে
ভায়ে ভায়ে হানাহানি॥

মানবতার শ্রেষ্ঠ পূজারী
অন্তর খুলি দিতেছ উজাড়ি
মানবের কানে সিদ্ধ-মন্ত্র
হে বিশ্বের গুরুদেব।
জগতের যত বিষ করি পান
অমৃতেরে তুমি করিতেছ দান,
নব ভারতের নব নারায়ণ,
তুমি যে গো মহাদেব॥

তোমার পুণ্য হস্ত পরশে
মানব হৃদয় ভাসিছে হরষে,
তোমার শান্ত করুণা বাণীতে
নাশিয়াছ সব দ্বন্দ্ব।
দান করি তব অভয় সঙ্গ
রক্ষা করেছ নিখিল বঙ্গ,
দ্বিধা শঙ্কিত হৃদয় হইতে
ঘুচায়েছ সব সন্দ॥

অন্তর গ্লানি ম্লানি করি ক্ষয়
ঘোষিতেছ তুমি সত্যের জয়,
আহ্বান করি সারা ভারতেরে
ধ্বনিছে তোমার শঙ্খ
মাতা বসুমতী ক্ষতবিক্ষতা
চাহিছে তোমারে ভুলিবারে ব্যথা,
মানুষে আজিকে মানুষ করিয়া
বাজাও বিজয়ডঙ্ক॥

ভয়াল সুর

সাপের লেখা, বাঘের দেখা এবং জাত কালোয়াতের ছোঁয়া, তিনটির সহিতই ঘনিষ্ঠতা বিপজ্জনক　　শিল্পী— শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
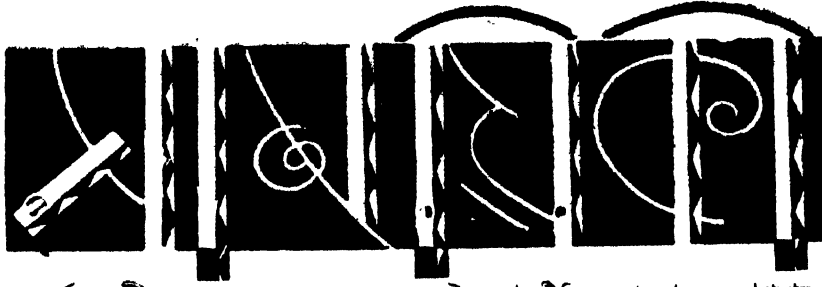
কংগ্রেসের কার্য্যসূচী—

২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যসূচী স্থির হইয়াছে—"ভারতের সমাজতন্ত্রবাদ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ নহে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব চিন্তাধারা ও সমস্যা আছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের নিকট যে সামাজিক ও অর্থনীতিক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজতন্ত্রবাদ এবং উহা ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের পক্ষে উপযোগী। সেজন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—(১) প্রত্যেক কৃষি-ভূমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। চাষীরা মালিক থাকিলে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপক কৃষিকার্য্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও তজ্জন্য সে ব্যবস্থায় উৎসাহ দেওয়া উচিত হইবে না। জমিকে যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড করা হইতেছে উহা বন্ধ করিতে হইবে এবং সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। (২) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও ছোট ছোট কারখানার সাহায্যে-সমবায় ভিত্তিতে কুটির শিল্প পুনর্গঠন করিতে হইবে। (৩) বৃহৎ শিল্প ও বড় বড় কলকারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (৪) নাগরিকদের ধর্ম্মাচরণের সহিত রাষ্ট্রের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিবে না। (৫) কেবলমাত্র অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই চলিবে না—সর্ব্বপ্রকার বর্ণ-বৈষম্যও দূর করিতে হইবে। (৬) পল্লীগুলিকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, পল্লী পঞ্চায়েৎকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। ভারতের পল্লী পঞ্চায়েৎগুলি স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন।

শ্রীভূপতি মজুমদার—

শ্রীভূপতি মজুমদার গত ২০শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি হুগলীর উকীল নীলমাধব মজুমদারের পুত্র। ১৮৯১ সালের ৭ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৫ সাল হইতে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। জার্ম্মাণী হইতে অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে ধৃত হইয়া গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে বন্দী ছিলেন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নাগপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন—১৯২৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হন। আরামবাগে চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন, জমীদারদের অত্যাচার নিবারণ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতিতে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২৩ হইতে ৫ বৎসর, ১৯৩০ হইতে ৯ বৎসর ও ১৯৪২ হইতে কয়েক বৎসর আবার তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। বহুদিন হইতে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় সিভিল প্রোটেক্‌সন কমিটীর সাধারণ সম্পাদকরূপে দেশসেবা করিতেছেন। তিনি অবিবাহিত। তাঁহার ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের দ্বারা নূতন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই সমৃদ্ধ হইবে।

গভর্ণর কর্ত্তৃক দেবস্থানাদি দর্শন—

বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির ও বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন। গভর্ণর এইভাবে বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও জনগণের সহিত সংযোগ সাধন করিলে দেশ উপকৃত হইবে। মহাত্মা গান্ধী গভর্ণরকে বাঙ্গালা শিখিয়া বাঙ্গালীদের সহিত বাঙ্গলায় কথা বলিতে উপদেশ দিয়াছেন। গভর্ণরের দর্শনের ফলে বাঙ্গালার দেবস্থানগুলির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হইলে দেবস্থানগুলির অর্থে দেশের বহু জনহিতকর অনুষ্ঠান চলিতে পারিবে।

জয়প্রকাশকে পৌর সম্বর্দ্ধনা—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে খ্যাতনামা সমাজতান্ত্রিক নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জয়প্রকাশ সভায় জানাইয়াছেন যে, ২।৩

সপ্তাহের মধ্যে তিনি দেশবাসীর সম্মুখে গণতন্ত্র-সম্মত এক সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন। তিনি ৭ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া সমাজতান্ত্রিক দলের সেক্রেটারী ছিলেন ও ভারতে ১৯৪২ সালের আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৩০০ স্কুল ছিল—উহার মধ্যে ১৩৫০ স্কুল পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে ও ২২০টি স্কুল আসামে যাইবে। পশ্চিম বাঙ্গালায় ৭৭৯টি স্কুল থাকিবে। কলেজ ছিল ১২১টি—তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে ৪০টি ও আসামে ১৭টি কলেজ গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে ৬৩টি কলেজ থাকিবে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্ষতি হইবে ১০ লক্ষ টাকা। সেজন্য যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা হয়, তবে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিবে। সেজন্য পশ্চিম বঙ্গের সকলকে এখন অর্থদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসব—

কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট আগামী এক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও মৎস্য চাষের পরিমাণ শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। চাষীদের বিনামূল্যে সার ও নামমাত্র মূল্যে উৎকৃষ্টতর বীজ দেওয়া হইতেছে। সরকারের খাস জমি ও যে সব পতিত জমি বর্ত্তমানে কৃষির অনুপযোগী হইয়া রহিয়াছে, সেগুলিতে সমবায় প্রথার ভিত্তিতে চাষ ও লোক বসতি করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তবে কোন জমি জাতীয়করণ করা হইবে না। বহু দেশীয় শিল্পকে সমবায়ের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হইবে। দেশের কৃষি পদ্ধতি উন্নত করার জন্য কৃষি যন্ত্রাদি আমদানী করা হইতেছে।

শান্তি মিশনের বিপুল শোভাযাত্রার মধ্যভাগে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ ফটো—তারক দাস

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ—

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেজন্য কলিকাতা হইতে বিমানযোগে তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু পরদিন দিল্লী গমন করেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু ক্রমে সুস্থ হইয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার সুস্থ ও শান্তিময় সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবন প্রার্থনা করি।

পুলিস কর্ত্তৃক বিপ্লববাদ প্রদর্শনী—

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে পুলিস ট্রেনিং স্কুলে এক নূতন প্রদর্শনী হইয়াছিল। পুলিসের নিকট বিপ্লববাদীদের যে সকল চিত্র, অস্ত্র ও

অন্যান্য সরঞ্জাম ছিল, সেগুলি তথায় দেখান হইয়াছে। এই সকল জিনিষ কলিকাতা পুলিসের কাছে ছিল। বাঙ্গালা পুলিসের কাছে যে সকল চিত্রাদি ছিল—তাহার কতকাংশ পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যাওয়ায় দেখান যায় নাই। পুলিস ক্লাবের এই কার্য্য প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে ইতিহাস জানিবার সুবিধা দান করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও ঘোষণা করিয়াছেন যে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব থাকিবে। মানুষ কৃষিবিমুখ হইয়াছে। দেশে কৃষির ব্যবস্থা উন্নত করিয়া অধিক ফসল উৎপাদন করিতে না পারিলে লোককে রক্ষা করা যাইবে না। রেশনের দোকানে অধিকাংশ দিন চাউল বা আটা থাকে না—কাজেই খরিদ্দারকে ফিরিয়া আসিতে হয়। সরকারী চেষ্টার ত্রুটি না থাকিলেও একথা বলা যায় যে এখনও দেশ চোরাবাজারে পূর্ণ। সে চোরাবাজার বন্ধের আরও কঠোর ব্যবস্থা না করা হইলে এই খাদ্যাভাব দূর করা যাইবে না। নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী যদি চোরাবাজার বন্ধ করিতে সমর্থ না হন, তবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে। সাহসের সহিত শক্তিমান হইয়া মন্ত্রীদিগকে সকলের অপ্রিয় হইয়াও কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে—দেশবাসী তবেই তাঁহাদিগকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে অগ্রসর হইবেন।
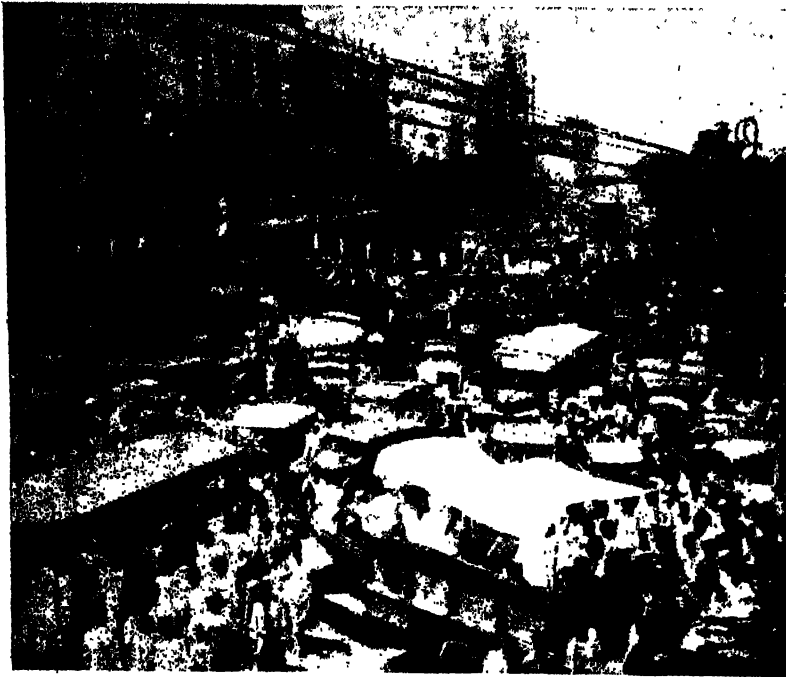
স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতার পথ ফটো—তারক দাস

আবার খাদ্য-বরাদ্দ হ্রাস—

রেশন অঞ্চলে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে আবার খাদ্য বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে এখন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ সের চাউল ও তিন পোয়া আটা পাইবে। এই ৭ পোয়া খাদ্যে কোন মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেশে খাদ্যাভাব। কোথাও খাদ্য নাই। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রায় চাউলের মণ ৪০ টাকা, কোথাও বা তদপেক্ষা বেশী। পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় ঘুরিয়া চাউল সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন—তাহাও পারিতেছেন না। বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে না। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের

খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ড—

২২শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গে সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী পশ্চিম বঙ্গ পরিষদের সকল সদস্য ও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের লইয়া ৫ ঘণ্টা ব্যাপী এক খাদ্য সম্মিলন করিয়াছিলেন—তাহাতে একটি খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। দুর্নীতি নিবারণে সকলের সহযোগিতা লাভ, জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য চোরাবাজার বন্ধ প্রভৃতির কথা সভায় আলোচিত হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয় খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা—

পশ্চিম বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ২০৫০টি ইউনিয়ন বোর্ডে একটি করিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি দাতব্য ঔষধালয় ও ৪টি স্থানযুক্ত এক হাসপাতাল হইবে—২টি স্থান প্রসূতীদের জন্ত ও দুটি আকস্মিক রোগের জন্ত রাখা হইবে। সেজন্ত এককালীন ১৫ হাজার ও বার্ষিক ৭ হাজার টাকা করিয়া প্রত্যেক স্থানে ব্যয়িত হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ঘোষণা করেন যে ঐ কার্য্যের জন্ত ঘাটালের শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কুণ্ডু ৫০ হাজার টাকা ও উমেশচন্দ্র নায়েক ৩০ হাজার টাকা তাঁহাকে দিয়াছেন। তিনি ঐ কার্য্যের জন্ত সর্ব্বসাধারণের অর্থ সাহায্যও প্রার্থনা করিয়াছেন।

নাথ মিত্র ও পরদিন স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ বাগবাজারের এটর্ণী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র। ১৯২৯ সাল হইতে তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও ১৯৩২ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত বিলাত গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়াও তিনি দেশসেবার ব্রতী ছিলেন ও বহুবার সে জন্ত কারাবরণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন ও 'সংগঠন' নামক মাসিকের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। স্মৃতীশ হাওড়া বালীর খ্যাতনামা কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও ১৯৩০ সাল হইতে কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস চিত্রে রূপান্তরিত

বেলিয়াঘাটায় গান্ধীজীর আবাস ভবন ফটো—শ্রীপান্না সেন

শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মবলিদান—

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হইলে সকল সম্প্রদায়ের কর্ম্মীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর শান্তি-প্রতিষ্ঠা করে মিছিল বাহির করিয়া খ্যাতনামা কর্ম্মী শচীন্দ্র

করিয়া তিনি বহু স্থানে সেই চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর সিনেটহলেও তিনি এক অভিনব চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। শচীন্দ্র ও স্মৃতীশ উভয়েই গান্ধীজির আদর্শে গঠনমূলক কার্য্যে [illegible]

বয়স ৪০ বৎসরের কম ছিল। তাঁহাদের শান্তি কামনায় এই আত্মদান ভারতের ইতিহাসে তাঁহাদের অমরত্ব দান করিয়াছে।

আসামে প্রাদেশিকতা বর্জ্জন—

গত ২রা সেপ্টেম্বর আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় সভাপতি মৌলানা তায়েবুল্লা ঘোষণা করেন—আসামে আসামীদের ন্যায় বাঙ্গালীর পূর্ণ অধিকার থাকিবে—কিন্তু আসামের সমস্ত অবস্থার সহিত বাঙ্গালীদের খাপ খাওয়াইয়া থাকিতে হইবে। কংগ্রেস সরকারের হাতে ভিন্ন প্রদেশবাসীদেরও এখন আসামকে নিজ প্রদেশ স্বীকার করিতে হইবে।

মাহাত্মাজীর সেক্রেটারী প্রফেসর শ্রীনির্মল বসু ও দেহরক্ষী শ্রীহেমন্ত ঘোষ ফটো—শ্রীপান্না সেন

বিহারে বাঙ্গালী সদস্য—

৩রা সেপ্টেম্বর বিহারের ৬ জন মন্ত্রী একত্র হইয়া সাংবাদিকদের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলিয়াছেন—বিহার সরকার বাঙ্গালী ও বিহারীদের সমান চোখেই দেখিয়া থাকেন। বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ও ইহা লইয়া কাহারও বাদানুবাদ করা উচিত নহে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিহারকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করা উচিত।

বাঙ্গালী চিকিৎসকের কৃতিত্ব—

হুগলী জেলার মাহেশের ডাক্তার শ্রীনলিনাকান্ত ৪ মাস বিলাতে থাকিয়া লণ্ডনের এম-আর-সি-পি সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩৯ সালে এম-বি পাশ করেন; বর্ত্তমানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজ করিতেছেন। ক্রীড়ামোদী বলিয়া তিনি ছাত্রমহলে সুপরিচিত।

যতীন দাস স্মৃতি বার্ষিকী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ফটো—শ্রীপান্না সেন

পূর্ব্ববঙ্গের কলেজ—

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া ঘোষণা করেন—পূর্ব্ববঙ্গের এলাকার মধ্যে যে সকল কলেজ অবস্থিত সেগুলির পরিচালনা কার্য্যে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য সেগুলিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করিয়া লওয়া হইবে। তাহাদের আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ঐ অঞ্চলের স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য অস্থায়ী সেকেণ্ডারী বোর্ড গঠন করা হইবে।

চট্টগ্রাম বন্যায় ক্ষতি—

চট্টগ্রামের বন্যায় ঐ জেলার সকল স্থান ও নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমায় মোট ১০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় খাজা নাজিমুদ্দীন একথা প্রকাশ করিয়াছেন। সকল আউস ধান ও আমন ধানের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল পুকুর ও কুয়ার জল অপবিত্র হওয়ায় জলাভাবে চারিদিকে ব্যাপক

কলিকাতার রাজপথে নেতাজীর বিরাট প্রতিকৃতিসহ শান্তি মিশনের বিশাল শোভাযাত্রা—প্রতিকৃতির পার্শ্বদেশে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ

ফটো—তারক দাস

স্বাধীনতা দিবসে সুসজ্জিত কলিকাতার একটি প্রশস্ত রাজপথ

ফটো—তারক দাস

ভারতে খাদ্যাভাব ও ব্যবস্থা—

৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত ভি-কৃষ্ণ মেনন ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য ধার স্বরূপ পাইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটেন ও অন্যান্য দেশের নিকট পত্র দিয়াছেন। ভারতে কি করিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় ও ভাল করিয়া খাদ্য বণ্টন করা যায়, বিদেশ হইতে আমদানী করা খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করা যায় কিনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য ৫ই সেপ্টেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৩জন সদস্য লইয়া কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটী আগামী ৫ বৎসর কাজ করিবেন। সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, সার শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়া, ঠাকুরলাল সিং, ঠাকুর দীপনারায়ণ সিং প্রভৃতি কমিটীর সদস্য ও মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত আর-এ-গোপালস্বামী কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বায়ে নূতন গভর্ণর—

বোম্বায়ের গভর্ণর সার জন কলভিল পারিবারিক কারণে ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করায় সার এচ-পি-মোদী তাঁহার স্থানে বোম্বায়ের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া ৭ই সেপ্টেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দু রক্ষা—

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় দুর্গত হিন্দুদিগকে সাহায্য দান ও তাহাদের পুনর্বসতি কার্য্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ও খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত চারুভূষণ চৌধুরী গত ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় যাইয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা মিঃ নাজিমুদ্দীনের নামে গান্ধীজির লিখিত এক পত্র লইয়াছিলেন। ঢাকায় অন্যতম মন্ত্রী মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীর সহিতও তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বাংলার গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর শপথ গ্রহণ ফটো—তারক দাস

পশ্চিমবঙ্গে নূতন নির্ব্বাচন—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের সদস্যগণের এক সভায় ৪৯জন সদস্যের মধ্যে ৪৭জন উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বর দাস জালানকে স্পীকার ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিককে ডেপুটী স্পীকার পদে মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুবের হালদার ও দামোদরসিং গুরুং নামক ২জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। দলের নেতা ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন ও রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী সভায় বক্তৃতা করেন।

মিঃ এম-এ-হাসান ইস্পাহানি—

পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট মিঃ এম-এ-এচ্ ইস্পাহানিকে আমেরিকায় তাঁহাদের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ ইস্পাহানি আমেরিকার পথে গত ৬ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন।

বিহারে ও বাঙ্গলা—

গত ১৯শে আগষ্ট হইতে ২ দিন জামসেদপুরে

এসোসিয়েসনের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত প্রস্তাব তথায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—এই সম্মেলন বিহারের বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চল—মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা এবং ভাগলপুর জেলার বাঁকা মহকুমা পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী জানাইতেছে। এই অঞ্চলগুলি ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে বাঙলারই প্রাপ্য ও উহার সন্নিকটে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থানগুলি বিহার প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল।

লীলা পুরস্কার প্রদান—

গত ২৩শে আগষ্ট নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলা রচনার জন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে নগদ ১০০ টাকা ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামীকে একটি স্বর্ণ পদক 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সভায় মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গলা ভাষাকে সামান্য রূপান্তরিত করিয়া উহাকে সকল প্রদেশের বোধগম্য ভাষায় পরিণত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা

গত ২৬শে আগষ্ট মঙ্গলবার নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্রতী সংঘের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নূতন মন্ত্রিসভার শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙলার মধ্যে অল্প ব্যয়ে যাহাতে সাধারণ শিক্ষা হয়, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়ে, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা হয়—সকল বিষয়েই মন্ত্রীরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বঙ্গ হাইকোর্ট—

ইতিপূর্বে বিচারপতি আক্রামকে পূর্ব্ব বঙ্গ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ৩রা সেপ্টেম্বর মিঃ টি-এচ-এলিস, আমিরুদ্দীন আমেদ ও আমান আমেদকে হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সৈয়দ আলি জাহীর—

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ভূতপূর্ব্ব সদস্য সৈয়দ আলি জাহীর পারস্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আজীবন দেশহিতব্রতী।

য্যাটম চরকা ঃ—

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রঘুগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক য্যাটম চরকা নামে এক অভিনব চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক

দৈর্ঘ্যে মাত্র সাত ইঞ্চি ও প্রস্থে দেড় ইঞ্চি। ইহাতে ঘণ্টায় ৪০০ গজ পর্য্যন্ত সূতা কাটা যায় এবং সূতা ৬০ নম্বর পর্য্যন্ত সরু হয়। ইহার কলকব্জা বিশেষ কিছুই নাই। দীর্ঘকাল ব্যবহারেও ইহা অটুট থাকে। এই চরকার সুবিধা এই যে, যে কোনও স্থানে বসিয়া সূতা কাটা চলে। ঈশ্বর বাবু এই চরকার সমস্ত আয় কৃষ্ণনগর (পোঃ ছৈতো জেঃ মেদিনীপুর) গান্ধীভবনের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

সীমান্ত নেতৃবৃন্দ—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুলগফুর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান সাহেব সরদারিয়া লালকোর্ত্তা শিক্ষা শিবিরে বাস করিতেছেন। তথায় গত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কয়েকদিন লালকোর্ত্তা ও কংগ্রেস কর্মীদের এক যুক্ত সম্মিলন হইয়াছিল।

সুখের সংসার

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বিপ্লবী-বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

বিপ্লবী-বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সপ্তাহ অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ৮নং রাজা বসন্ত রায় রোডে, শহীদগঞ্জে শহীদ স্মৃতি প্রদর্শনীতে এক বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাঙলার বিপ্লববাদের ধারাবাহিক কাহিনী সঙ্গীতে কথায় রূপায়িত করেন বিখ্যাত বেতারশিল্পী অনিল ভট্টাচার্য ও তারা লাহিড়ী সম্প্রদায়। বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া বাঙলার গৌরবময় অগ্নি যুগের আলেখ্য সাহিত্যিক অনিলকুমার ভট্টাচার্য আবেগময়ী ভাষায় বিবৃত করেন।

আগমনী

ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

ঐ বুঝি উমা এল, ছড়িয়ে দিয়ে রূপের আলো।
মুখখানি চল চল শতদল হ'তে ভালো॥
ষড়ানন গণপতি
লক্ষ্মী আর সরস্বতী
সিংহবাহিনী মায়ের সাথে এসে ঐ দাঁড়ালো॥
তনয়ায় নিয়ে বুকে
মা'র প্রাণ ভাস্‌লো সুখে;
ভবানীর হাসিখানি, সুধাবাণী প্রাণ জুড়ালো॥
আজ কত দিন পরে
মুখখানি হাতে ধ'রে
দেখিতে পরাণ ভ'রে আঁখিবারি বাঁধ ছাপালো॥

নবমী তিথি

উমারে নিয়ে সবাই তোরা আনন্দে আজ রইবি মাতি।
গানের সুরে হবে না বিরতি উজল ক'রে সকল বাতি॥
হাসির উৎসে উৎসব রাণী
থাক নিমগনা আমার শিবানী,
ঘুরিতে ফিরিতে চাঁদমুখখানি হেরিয়া কাটাবো রাতি॥
দেখিস্ যদি রে মায়েরে ক্লান্ত
শ্রান্তি-মলিন বদন কান্ত
দিস রে তখনি বক্ষোপ্রান্ত শয়নের তরে পাতি॥
কতদিন পরে জননী বুকেতে
মা আমার রবে ঘুমায়ে সুখেতে
দিস না নবমী-নিশি পোহাইতে, উদিতে অরুণ ভাতি॥

দশমী প্রভাত

গিরিরাজ! ওগো গিরিরাজ!
আঁধারে লুকালো শশী পোহাইয়া এল নিশি,
আসিছে দশমী ওগো! হানিতে মাথায় বাজ॥
এসেছিল মা আমার তিনটি দিবস তরে,
আছিল ভুবন মোর পুলক হাসিতে ভরে;
(আজি) সে লবে বিদায়—ঐ বেদগাথা গায়
তপোবনে তাপস সমাজ!
নিভে যায় শুকতারা ম্লান গগন গায়—
এসেছিল প্রবোধিতে ব্যাকুলতা কাতরা মা'য়—
প্রবোধ কোথায়? প্রভাতে যে যাবে হায়!
মা আমার কৈলাস-মাঝ॥

বিজয়া—বিদায়ের পর

উমা আমার চলে গেল, এ পুরী আঁধার হ'ল।
ফিরে কতদিন পরে দেখিব মুখ-কমল॥
সিঁদুর পরায়ে ভালে
চুমা যবে দিনু গালে,
দেখেছি বিদায় কালে, আঁখি ছিল ছল ছল॥
কৈলাস যে শূন্য ক'রে
এলো তিন দিন তরে,
কেমনে রাখি ধ'রে মহেশ হবে উতল॥
ব'লে গেল আঁখি-নীরে
দুখিনী এ জননীরে
কেঁদোনা আসবো ফিরে, মুছ মা নয়ন জল॥

ময়দানের প্রার্থনা সভায়
মহাত্মাজী
ফটো—পান্না সেন
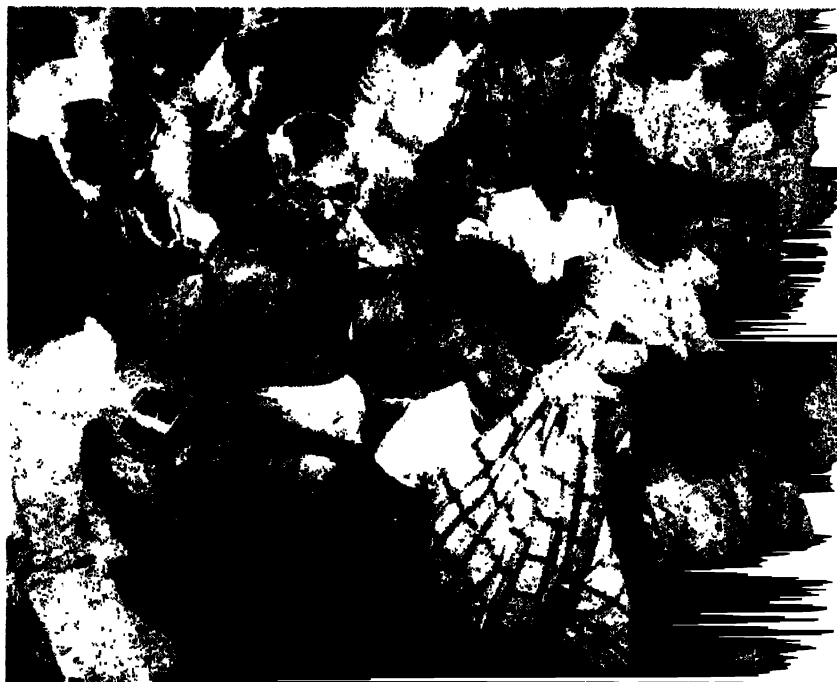
বিজ্ঞান কলেজে মহাত্মা
ও মিঃ সুরাবর্দী
ফটো—পান্না

জাতিস্মর

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্‌সি

জীবনের সায়াহ্নে বিহঙ্গমাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে যেদিন ঘরে আনলাম—সেদিনে সকলের মুখের মিক্সড-ফিলিং (মিশ্রভাব)এর জন্য আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে। আমার পুত্র সুব্রত তখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। ছোট ভায়েদের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল। একজন ভ্রাতুষ্পুত্রী বিবাহযোগ্যা। এমত অবস্থায় আমাকে দিয়ে একাজ ক'রিয়ে নিয়েছিল—আমার বন্ধু সোমেশ চক্রান্ত ক'রে। তার চেয়ে বড় চক্রান্ত ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চক্রীর। তাই বন্ধুর চায়ের নিমন্ত্রণে সেদিন গিয়েছিলাম। সোমেশ চায়ের টেবিলে তার বোনকে ইনট্রডিউস্ ক'রে দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বিহঙ্গমাকে বিয়ে ক'রতে বাক্যবদ্ধ হ'য়ে গেলাম। একটা 'হাই ভোল্টেজে চার্জ্জ' করা বৈদ্যুতিক শক্তির মত আমার মন তার প্রতি যেন আকৃষ্ট হ'য়ে গেল। সেদিন বাড়ী ফিরে এসে মাকে ব'লেছিলাম—মা, তোমার কথাটাই ঠিক, পরে ভেবে দেখেছিলাম, সেই জন্যই আমি—ইত্যাদি। মা কিন্তু আমাকে শেষবার এজন্য অনুরোধ ক'রেছিলেন—দশ বৎসর পূর্ব্বে। বলা বাহুল্য, প্রথমা পত্নী সরমার কাছে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম—সে যদি আমাকে অসময়ে ছেড়ে যায়—আমি আর দার-পরিগ্রহ ক'রবো না। তাকে বিয়ে করার পর আমার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিন সুখ-পূর্ণ হ'য়েছিল। বিশ্বনিয়ন্তার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পলকে সব ওলট পালট হ'য়ে গেল। একমাত্র সন্তান সুব্রতকে রেখে সূতিকাগারে 'এক্ল্যামসিয়া' হওয়ায় সরমার জীবন প্রদীপ অকস্মাৎ নিবে যায়।

সুব্রত বালক অবস্থা থেকেই তার সঙ্গ দিয়ে আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিল—বিশেষ চেষ্টা ক'রে। বিহঙ্গমা যত তাকে ছোট পুতুলের মত সম্পূর্ণ করায়ত্তভাবে পেতে চায় এবং আদর ক'রতে চায়—সুব্রত তত তাকে এড়িয়ে চলে। 'উনি' ব'লে সে তার বিমাতার উল্লেখ ক'রে সকলের কাছে। বিহঙ্গমা তাকে প্রথম দেখে অবধি 'বাপ' ব'লে ডাকে। শৈশবে সে নিজের বাপ মাকে হারিয়েছিল। এত স্নেহ ও ভালবাসা—সপত্নী পুত্রকে কেউ ক'রতে পারে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না—যে চোখে না দেখেছে। প্রথম প্রথম সকলেই "মায়ের চেয়ে বেশী" ইত্যাদি বচন অনুযায়ী সন্দেহ প্রকাশ করেছিল—বিহঙ্গমার বাড়াবাড়ি দেখে। বিহঙ্গমা ক্রমশঃ সকলকে কিন্তু প্রিয় ক'রে নিল অল্প সময় মধ্যে।

এ বাড়ীর কুড়ি বছর পূর্ব্বেকার অবস্থা আর ঘটনা সম্বন্ধে বিহঙ্গমার অনেক ধারণাও জ্ঞান—আশ্চর্য্যজনকভাবে সঠিক কি ক'রে হ'য়েছিল—সেটা দুর্বোধ্য ছিল তার। ছাতের কুঠ্‌রি ঘরের মধ্যে একটা কেউটে সাপ মারা হ'য়েছিল। আমার ছোট ভায়ের হাতের দাগটা গরম ঘিয়ে ছাঁকা লাগার দাগ, কুঁয়াতলায় যেখানে গোয়াল হ'য়েছে—সেখানে অনেক আগে কলাবাগান ছিল, আমার সেজভাই ছেলেবেলায় খুব ঝাল খেত—প্রভৃতি কি ক'রে তার পক্ষে জানা সম্ভব তা' আমরা সমাধান ক'রতে পারতাম না। কোন সূত্রে সে এসব জেনেছিল, তা সে নিজেও মনে ক'রে ব'লতে পারত' না। আমার পৌরাণিক ও আধুনিক পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে অনেক খুঁটি নাটি তথ্য বিহঙ্গমার নখদর্পণে ছিল। সে আমাকে একদিন চিন্তোত্থিতভাবে প্রশ্ন ক'রলে, দিদির কাছে তুমি কথা দিয়েছিলে আর বিয়ে ক'রবে না—তবে আবার কেন বিয়ে ক'রলে? কথা দেওয়ার কথা—তাকে আমি বলি নি, সে কি ক'রে জান্‌লো? সে কথার আলোচনা এড়িয়ে আমি ব'ললাম—তোমাকে দেখে। সে উত্তরে সে খুসী না হয়ে ব'ললে—পুরুষেরা ওই রকমই। একদিন বিহঙ্গমা আমাকে ব'ললে—হাজারীবাগ সহরে বড়মবাজারে আগের জন্মে তাদের বাড়ী ছিল। তার এক ছোট ভাইয়ের নাম ছিল মুক্তো। নেংড়ি ব'লে এক ঝি তাদের দুভাইবোনকে মানুষ ক'রেছিল। মুক্তো ছিল সরমার ভাইয়ের নাম। সে সরমার মৃত্যুর পর মারা যায়। এসকল সংবাদ বিহঙ্গমার জানার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বিহঙ্গমা আগের জন্মে

সরমা ছিল এবং পূর্ব্বজন্মের কথা তার মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে মনে প'ড়ে যায়—এ বিষয় আমার আর কোনও সন্দেহ থাকলো না। তাকে একথা কিছু জানতে দিলাম না। সুব্রতকে তার গর্ভধারিণীর হাতে স'পে দিতে পারার সম্ভাবনায় আমার মন পুলকে ভ'রে গেল। বিহঙ্গমা কিছু বুঝ্‌লো না। আমিও কাকেও কিছু ব'ললাম না।

বিহঙ্গমা আমার সকল প্রয়োজনের ভার নিয়েছে দেখে সুব্রত স'রে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশঃ সে যেন দূরে দূরে স'রে যাচ্ছে। বিহঙ্গমা কিন্তু তার সকল ভারিক্কিপনা তুড়িতে উড়িয়ে দেয়। কোনও আমল দেয় না তার পৌরুষ বা গাম্ভীর্য্যকে। সে মা—সুব্রত তার ছেলে। কোনও ব্যবধান তাদের মাঝখানে সে থাকতে দেবে না—থাকার কথা ভাব্‌তে পারে না। তার উষ্ণ বক্ষে ওকে চেপে শিশুর মত চট্‌কাতে পেলে সে তিনদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রতে রাজী আছে, এ কথা 'গ্যারান্টি' দিয়ে বলা যায়। স্নেহের শাসন, ধমক প্রভৃতি সে তার ওপর দরকার মত চালায়, কিন্তু সুব্রতর বিমাতার সঙ্গে সম্পর্ক 'উনি'র চেয়ে আর অগ্রসর হয় নি। আর ঠাকুমা ও কাকিমারা মজা দেখেন এবং ছেলের বুড়োমি ও গাম্ভীর্য্য দেখে হাসেন। ওকে শাসন করার খুব প্রয়োজন হ'ত না, শাসকেরও অভাব ছিল না। ঠাকুমা, কাকা ও কাকীমাদের যথেষ্ট সম্মান ও ভয় সে ক'রত। বিমাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে বিহঙ্গমাকে সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল না। আমি সেজন্য ওর বিষয়ে নানা কারণে নির্লিপ্ত থাক্‌তাম।

'ইণ্টার্‌মিডিয়েট্' পাশ ক'রে, সুব্রত কাকেও কিছু না ব'লে 'আর্-আই-এন্-এ 'ক্যাডেট্‌শিপ্ ট্রেনিং'এর জন্য 'বণ্ড্'সই ক'রে বাড়ীতে জানাতে যেদিন এল—সেদিন হঠাৎ বুঝলাম—ওর প্রতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ত্রুটি হ' গেছে। বিহঙ্গমা অগ্নিমূর্ত্তি ধ'রে তাকে হুকুম ক'রলে ঠাকুমা, কাকা ও কাকীমাদের কাছ থেকে অন্যায় ক করার জন্য ক্ষমা চেয়ে এসো আমার কাছে—আমি ব ছিঁড়বো তোমার। তার ছোট কাকা রাগের মাথ তাকে উত্তম মধ্যম দু'ঘা দিয়ে দিলো—এবং বিহঙ্গ আদেশ পালন ক'রতে কঠিনভাবে আদেশ দিলে। সু সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিমাতার কাছে গেল। বিহ তাকে ব'ললে—আমার এ বাড়ীর ভাত বন্ধ হয়ে গে আমি এখানে আর কুটো মুখে দিতে পারবো না। আ চ'লে যাচ্ছি। তুমি 'বণ্ড' ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে তার জন্য যা খেসারৎ লাগে, কাকারা ব্যবস্থা ক'রবে।

আপনি চলে গেলে বাবাকে কে দেখবে?—সু ব'ললে। বিহঙ্গমা কঠিন স্বরে ব'ললে—তুমি আগে যে ভাবে দেখতে, তেম্‌নিভাবে।

তা কি ক'রে হয়, মা—সুব্রত ব'ল্‌লে। বিহঙ্গ বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় সুব্রতর মুখে 'মা' ডাক শুনে বিভ্র হ'য়ে গেল। সে ব'লল—কি ব'ললে? সুব্রত কিছু বুঝে আরও কোমল স্বরে ব'লল—আপনি চলে গে বাবার বড় কষ্ট হবে যে মা।

বিহঙ্গমা মাতৃ সম্বোধনে সুখের আবেগে বিহ্বল হ অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে গেল। গোলমালের শব্দে কাছে গি দেখি সুব্রতর কোলে বিহঙ্গমা মাথা রেখে অচৈতন্য অব পড়ে রয়েছে এবং সকলে তার জ্ঞান সঞ্চারের চে ক'রছে। তার মুখ দেখে মনে হ'ল—অবচেতন অবস্থ মধ্যে সে যেন কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছে—হয় পূর্ব্বজন্মের আরও কোনও স্মৃতি তার মানসপ প্রতিফলিত হচ্ছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেট ঃ

ভারতীয় ক্রিকেটের জন্মকাল খুব বেশী দিনের নয়। জানা যায়, ১৭৯৩ সালে প্রথম কলকাতায় যে ক্রিকেট খেলাটি হয়েছিল তাই নাকি ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ। তাহলেও বোম্বাইকে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্মভূমি বলা হয়। প্রথমে পার্শিরা ক্রিকেট খেলায় বিশেষ উৎসাহ দেখায় এবং দক্ষতা লাভ করে। ১৮৪৮ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পার্শি ক্রিকেট দলই হ'ল প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল। হিন্দুর মধ্যে প্রথম ক্রিকেট খেলেছিলেন রামচন্দ্র নাভালকার ১৮৬১ সালে। এর পাঁচ বছর পর ১৮৬৬ সালে বোম্বাইয়ে হিন্দু ইউনিয়ন নামে একটি ক্রিকেট দল গড়ে উঠে। ভারতীয় দলের মধ্যে পার্শি দলই ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম ক্রিকেট খেলবার দুঃসাহস দেখায়। ১৮৮৬ সালে ইংলণ্ডগামী প্রথম পার্শি দল মোট ২৮টি ম্যাচ খেলে মাত্র একটি খেলায় জয়লাভ করে—ব্যাটসফিল্ডের নরম্যানহার্স্টের সঙ্গে। প্রথম দলের হার হয় উনিশটা ম্যাচে, ড্র হয় আটটা ম্যাচ। ১৮৮৮ সালে, দ্বিতীয় পার্শি দল খ্যাতনামা বোলার ডক্টর প্যাভরির অধিনায়কত্বে পুনরায় ইংলণ্ডে খেলতে যায়। এবারের ফলাফল অনেক ভাল হ'ল। মোট ৩১টা খেলায় ৮টা জয়, ১১টা হার, ড্র ১২টা খেলায়। ইংলণ্ড থেকে প্রথম ইংরেজ দল ভারতবর্ষে খেলতে আসে ১৮৮৯-৯৯ সালে জি এফ ভার্ণোনয়ের (G. F. Vernon) অধিনায়কত্বে। এই দলটি মোট ১৩টা ম্যাচ খেলে ১০টায় জয়লাভ করে, ২টো খেলা ড্র করে এবং দ্বিতীয় পার্শি দলের কাছে তারা একটা ম্যাচে ৪ উইকেটে হেরে যায়। পার্শিদের বিজয় গৌরবে ভারতবাসী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করলো।

১৮৯২-৯৩ সালে দ্বিতীয় ইংরেজ দলকে ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন লর্ড হক। মোট ২৩টা খেলায় তাদের জয় ১৫টায়, ড্র ৬টায় হ'ল, হার হ'ল দুটো খেলায়—পার্শিদলের কাছে ১০৯ রানে ও বিহার-ওবাণ্ডারার্স দলের কাছে সাত রানে। এদিকে ঐ বছরেই ভারতবর্ষের কুমার রণজিৎ সিংজী ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট খেলায় 'কেম্ব্রিজ ব্লু' পেলেন। এ সংবাদে ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ দারুণ উৎসাহিত হ'ল।

১৯০২-৩ সালে কে জে কি-র (K. J. Key) তত্ত্বাবধানে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি অথেনটিকস্ নাম নিয়ে তৃতীয় ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড় দল ভারতবর্ষে খেলে গেল। ইংরেজদের হার হ'ল পুনরায় পার্শিদের হাতে আর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাছে। বাকি ১২টা খেলায় জয় এবং ৫টা খেলা ড্র গেল।

সর্ব্বদল সম্মিলিত প্রথম ভারতীয় দল ইংলণ্ডে খেলতে যায় ১৯১১ সালে পাতিয়ালা মহারাজার অধিনায়কত্বে। মোট ২৩টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দলের জয় হ'ল ৬টায়, হার ১৫টায় আর ড্র গেল ২টো খেলা। এই সময়েই ভারতবর্ষে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলার অভ্যুদয় হ'ল। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্রিকেট খেলার অনুশীলন আরম্ভ হ'ল এই সময় থেকেই।

তারপর দীর্ঘ পনের বছর পর ১৯২৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব, পৃথিবীর লোকের কাছে যে ক্লাব এম সি-সি নামে পরিচিত, ভারতবর্ষে সরকারীভাবে

ক্রিকেট খেলতে এসে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাস পৃষ্ঠায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। এ দলের ক্যাপটেন ছিলেন A. E. R. Gilligan। মোট ৩৪টি ম্যাচের মধ্যে এম-সি-সি জয়ী হয় ১১টা খেলায়, কোন ম্যাচ হার হয়না, ড্র যায় ১১টা। বোম্বাইয়ের বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ খেলাটি ড্র যায়।

১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং খেলার প্রসারকল্পে একটি শক্তিশালী Central Bord of Control প্রতিষ্ঠা। হ'ল এই ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনায় ১৯৩২ সালে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব ভারতীয় বাছাই দল ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলতে যায়। পোরবন্দরের মহারাজা ক্যাপটেন হয়ে গেলেন। দলে ছিল আঠারোজন খেলোয়াড়। তারা মোট ২৬টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ খেলে ৯টা খেলায় জয়ী হয়, হারে ৮টায়, ড্র যায় ৯টা খেলা। এছাড়া আরও ১২টা ম্যাচ খেলেছিল। মোট ৩৮টা খেলার মধ্যে জয় ১৩টায়, হার ৯টায়, ড্র যায় ১৪টা ম্যাচ। শেষ পর্য্যন্ত ২টো খেলা হয় নি। ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে ইংলণ্ড ভারতীয় দলকে ঐ বছর প্রথম টেষ্ট ম্যাচে নিমন্ত্রণ করলো। নাইডু ক্যাপটেন হ'লেন ভারতীয় দলের, ওদিকে ইংলণ্ডের ক্যাপটেন হ'লেন জার্ডিন। ইংলণ্ড ১৫৮ রানে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করলো।

১৯৩৩-৩৪ সালে ডি আর জার্ডিনের নেতৃত্বে শক্তিশালী খেলোয়াড় নিয়ে দ্বিতীয়বার এম-সি-সি দল ভারতে খেলতে এল। মোট ৩৪টি খেলায় এম-সি-সি জয়ী হ'ল ১৭টায়, ১টা ম্যাচ হেরে ড্র করলো ১৬টা ম্যাচ। এম-সি-সি বেনারসে ভিজিয়ান গ্রাম একাদশ দলের কাছে ১৪ রানে হেরে যায়। এম-সি-সি বনাম ভারতীয় দলের মোট তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ক'লকাতায়। প্রথম দুটী খেলায় এম-সি-সি জয়ী হয় যথাক্রমে ৯ উইকেট এবং ২০২ রানে। কলকাতায় টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়। বোম্বাইয়ে টেষ্ট খেলায় লালা অমরনাথ ১১৮ রান ক'রে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার নতুন রেকর্ড করলেন। এর পূর্ব্বে ইঙ্গ-ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় কোন ভারতীয় খেলোয়াড় সেঞ্চুরী বানাতে পারেন নি।

১৯৩৬ সালে দ্বিতীয় সর্ব্বদলীয় ভারতীয় দল ইংলণ্ডে খেলে আসে। ক্যাপটেন হ'য়েছিলেন ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা। ২৮টি প্রথম শ্রেণীর খেলার মধ্যে ভারত জয়ী হয় ৪টি খেলায় আর ড্র ও হার হয় যথাক্রমে ১২ খেলায়। ইংলণ্ডের সঙ্গে তিনটি টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ হয় লর্ডসের প্রথম টেষ্টে এবং ওভালের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড উভয় ক্ষেত্রেই ৯ উইকেটে জয়ী হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ড্র যায়। ভারতীয় দলের পক্ষে এ অভিযানে সেঞ্চুরী করেন—মাস্তাক আলি ৪, অমরনাথ ৩, ভি এম মার্চেন্ট—৩; এস ওয়াজির আলি এবং দিলওয়ার হোসেন—২, বাকাজিলানী, সি রামস্বামী এবং এস জয় যথাক্রমে—১। টেষ্ট খেলায় মাত্র দু'জন ভারতীয় সেঞ্চুরী করেন—মাস্তাক আলি ১১২ রান এবং ভি এম মার্চেন্ট ১১৪ রান দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায়।

১৯৩৫-৩৬ সালে প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে খেলতে আসে। এই দলটির ক্যাপটেন ছিলেন জে রাইডার। মোট ২৩টি খেলায় তারা ১১টায় জয়ী হয়, হারে ৩টে খেলায়, ৯টা খেলা ড্র যায়। অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে ৪টি বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ খেলেছিল। প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ৯ উইকেট এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ান দল জয়লাভ করে। ভারতীয় দল তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট খেলায় যথাক্রমে ৬৮ রান এবং ৩৩ রানে জয়ী হয়।

১৯৪৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল এ এল হ্যাসেটের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল। অষ্ট্রেলিয়ান দল মোট ৯টি খেলায় জয়ী হয় ১টিতে, হারে ২টো খেলায় আর বাকি ৬টি খেলা ড্র যায়। এই মোট খেলার মধ্যে তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়। বোম্বাই এবং ক'লকাতায় প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়। মাদ্রাজে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে 'রবার' পায়।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সম্পাদকের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৭ই অক্টোবর ক'লকাতা থেকে বিমানপথে অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে [illegible]

তা সম্ভব হয়নি। রওনা হ'তে ছ'দিন দেরী হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া অভিযান শেষ হবে। সর্ব্বসমেত ভারতীয় দল পাঁচটি 'টেষ্ট ম্যাচ' খেলায় যোগদান করবে। এই দলের সঙ্গে বিখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রিন্স দিলীপ সিংজী রয়টার সংবাদ পরিবেষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে ভ্রমণ করে খেলার বিবরণ এবং সমালোচনা পরিবেষণ করবেন। বিজয় মার্চেণ্ট অসুস্থতার জন্ম এ দলের খেলায় যোগদান করতে সক্ষম হবেন না, তার স্থানে অমরনাথ ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছেন। ভি এম মার্চেণ্ট যে অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে যোগদান করতে পারবেন না তা ইতিপূর্ব্বেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু যাত্রার শেষ সময়ে মুস্তাক আলি, আর এস মোদী এবং ফজল মামুদ এই তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে যোগদানের অক্ষমতা জানান। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ আশা পোষণ ক'রছিলেন তাঁরা খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন। এই চারজন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পরিবর্ত্তে সারভাতে, ক্যাপ্টেন রায় সিংহ, রঙ্গচারী এবং রণবীর সিংহজীকে দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তারযোগে তাঁদের এই নির্ব্বাচন ফলাফল জানানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই চারজন খেলোয়াড় এডিলেডে ভারতীয় দলের সঙ্গে দশদিন পর মিলিত হবেন। উপস্থিত এগারজন খেলোয়াড়, ম্যানেজার এবং প্রিন্স দিলীপ সিংহজী সমেত এই ভারতীয় ক্রিকেট দলটি আকাশপথে অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। দলের মধ্যে কালীঘাট ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড় পি সেনই একমাত্র বাঙ্গালী। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি তিনি বিদেশে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের সম্মান বর্দ্ধিত করবেন। এই সঙ্গে আমরা সমগ্র দলকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

গত ৪ঠা অক্টোবর ক্যালকাটা মাঠে আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনাল খেলার কথা ছিল কিন্তু এক অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম শেষ পর্য্যন্ত আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ খেলাটি ঐদিন বন্ধ রাখাই উচিত মনে করেন। ঘটনায় প্রকাশ, আই-এফ-এ অফিস কর্ত্তৃক সংবাদপত্রে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জনসাধারণ জানতে পারে যে, এবছর আই-এফ এ অফিসে ঐদিনের খেলায় কোন টিকিট সাধারণকে বিক্রী করা হবে না। ফলে বেশী টিকিটের আশা ক'রে সকাল ১০টা ১১টা থেকেই মাঠে জনসমাগম হয়। বেলা ২টার সময় নাকি টিকিট ঘর খোলার কথা ছিল। কিন্তু তা আড়াইটায় খোলা হয় এবং তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গেট বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘোষণা করা হয় আর জায়গা নেই সুতরাং টিকিট বিক্রী বন্ধ। পূর্ব্বাহ্নেই টিকিট বিক্রী ক'রে মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের জন্ম যে সবুজ গ্যালারীর আসন রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। সেই শূন্ত স্থানের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি পড়ে এবং টিকিট বিক্রেতা ও গেট রক্ষকদের কথায় বিশ্বাস না ক'রে এক শ্রেণীর দর্শক জোর ক'রে গেট খুলে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে ময়দানে মানুষের যে লম্বা সারিগুলি সুশৃঙ্খলভাবে তৈরী হয়েছিল বিশৃঙ্খল অবস্থায় মাঠে ঢুকে পড়ে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের শূন্ত আসনগুলি দখল করে নেয়। উল্লিখিত দুই দলের সভ্যদের অগ্রিম টিকিট বিক্রী করার ফলে আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সভ্যদের খেলা দেখাবার স্থান দিতে বাধ্য ছিলেন কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ খেলাটি স্থগিত রাখাই উচিত বিবেচনা করেন এবং যাঁরা টিকিট ক্রয় করেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করেন যে, পরে ফাইনাল খেলা পরিচালনা সম্ভব হ'লে ঐ টিকিটেই তাঁরা খেলার ময়দানে প্রবেশ করতে পারবেন আর একান্তই খেলা না হলে টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেবেন। এই ঘোষণা একশ্রেণীর দর্শকদের মনঃপূত না হওয়ায় ঐ দিনই ফাইনাল খেলার দাবী ক'রে তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করে ও খেলার মাঠের চেয়ার টেবল ভেঙ্গে ফেলে, ক্যালকাটা মাঠের তাঁবু ফুটো ক'রে দেয়। গোলমালের সুরু থেকেই পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ করজোড়ে ঐ শ্রেণীর জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে প্রহৃত হ'ন। শেষে অবস্থা চরমে পৌছলে কাঁদুনে ধোঁয়া এবং গুলি চালানোর আদেশ দেন। এ ঘটনায় পুলিস এবং জনতার মধ্যে কয়েকজনকে অল্পবিস্তর আহত হ'তে দেখা যায়। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটির সমস্ত দিক বিচার ক'রে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ এবং মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যাঁরা সেদিন লজ্জাকর ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকায় সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন তাঁরাও লজ্জাবোধ করবেন এবং শঙ্কিত হবেন। প্রখর রৌদ্র এবং বৃষ্টি মাথায় পেতে নিয়ে যে দর্শকমণ্ডলী ফুটবল খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলায় জনপ্রিয়তা প্রচার করেন এবং খেলোয়াড়দের খেলায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন তাঁদের চরম দুর্গতির প্রতি আমরা সর্ব্বদাই সহানুভূতিশীল। একথা খুবই সত্য, দর্শক ব্যতিরেকে খেলার সার্থকতা বজায় থাকে না। কিন্তু সকল শান্তিকামীর বক্তব্য, আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধে দর্শকশ্রেণীর যে অভাব অভিযোগের কথা সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়েছে তার প্রতিকার পদ্ধতি কি অন্তভাবে করা যেত না? দর্শকশ্রেণী যদি এইটুকু অনুভব করতে পেরে থাকেন যে, দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে অন্তায়, অত্যাচার এবং অবিচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে তাহ'লে স্বাধীন দেশের জনসাধারণ যেভাবে অন্তায়

অত্যাচার দূরীকরণে অগ্রসর হয় ঠিক সেই পন্থা অনুসরণ করাই কি এক্ষেত্রে শ্রেয় ছিল না? অন্যায় কার্য্য দ্বারা কখনও অন্যায়ের প্রতিকার যে হয় না পৃথিবীর ঘটনাপঞ্জিকা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমাদের সমাজ দেহে যদি এই ভুল-নীতি:কেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে ঐ দিন মাঠে যে এক শ্রেণীর দর্শক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা তাদের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের দাবী জানিয়েছিলো ঘটনাচক্রে তাদেরই অপর এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতার সম্মুখীন হতে হবে। আজ যাঁদের উপর দেশের শাসন ভার অর্পিত হয়েছে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি সজাগ আছে। জনসাধারণ যদি তাঁদের অভাব অভিযোগগুলি শাসন কর্ত্তাদের গোচরীভূত না ক'রে নিজেরাই অপর আর এক বে-আইনী কাজ দ্বারা তার প্রতিকার করতে অগ্রসর হন তাহ'লে শাসন ব্যবস্থার এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ফাইনাল খেলার দিন এক শ্রেণীর জনসাধারণ যদি অন্যায়ভাবে সভ্যদের রিজার্ভ আসনগুলি অধিকার না করতো তাহলে খেলা না হওয়ার পক্ষে কোন বাধা সেদিন ছিল না।

সব কাজেরই একটা সীমা আছে। মাঠের যা আয়তন তাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের স্থান দেওয়া যেতে পারে, তার বেশী সম্ভব নয়। ঐ দিন দর্শকশ্রেণীর যে এক অংশ অন্যায়ভাবে অপর দর্শকদের স্থান জুড়ে বসে একদলের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল তাদের স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে বলি যদি তারাই ঐ দিন টিকিট কিনে মাঠে ঢুকতে পেত আর মাঠ ভর্ত্তি হওয়ার দরুণ যে অবশিষ্ট দর্শক মাঠে প্রবেশ করতে পারতো না তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কি তারা মাঠ ত্যাগ ক'রে আসতো? ফাইনালে এ বছর দুটী প্রবল শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় দল উঠেছিল বলেই টিকিটের এত চাহিদা, বিরাট জনসমাগম। কিন্তু দর্শকদের চাহিদা মিটানোর মত মাঠের আয়তন ছিল না। আই এফ এ-র খেলা পরিচালনা ব্যাপারে যদি জনসাধারণের অভিযোগ থাকে তাহলে সহরের পুলিস কমিশনার এবং প্রধান মন্ত্রীর নিকট তা জানিয়ে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করাই শোভন হবে। জনসাধারণের হতাশ হবার কারণ নেই, কারণ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই বহু সমাজবিরোধী কাজের মূলোৎপাটন ক'রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। গভর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের সহযোগিতা করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ মহলকে আমাদের কিছু বলবার আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে সমস্ত অভি:যোগ প্রকাশ পেয়েছে আমরা আশা করি তাঁরা নিজেরাই তার প্রতিকার করবেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলা ঃ

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল টুর্ণামেণ্টের মোট এগারটি দল এই এবছর যোগদান করেছে। প্রথম রাউণ্ডের খেলা: (১) আসাম বনাম হায়দ্রাবাদ; (২) বিহার বনাম উড়িষ্যা; (৩) মাদ্রাজ বনাম দিল্লী।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে: ১নং বিজয়ী বনাম মহীশূর; ২নং বিজয়ী বনাম ডবলউ আই এফ আই (বোম্বাই); ৩নং বিজয়ী বনাম আই এফ এ (ক্যালকাটা); যুক্তপ্রদেশ বনাম ত্রিবাঙ্কুর।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ছায়ার আলো" (২য় খণ্ড)—৩৷০
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "নূতন আলো"—১৲
শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক মিষ্ট্রি"—১৷০
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "উপনিষদ" (২য় খণ্ড)—২৲
শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যাত্রী"—১৷০
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হিন্দু মুসলমান" (১ম পর্ব্ব)—৩৲
বন্দে আলি মিঞা প্রণীত উপন্যাস "ঘূর্ণি হাওয়া"—২৲
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি প্রণীত "উপনিষদের কথা"—৩৷০
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "জীবনের জয়গান"—২৲
শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত প্রণীত "অজানা দেশে"—৸০
রেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত রাষ্ট্রভাষা প্রচার পুস্তকমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ "প্রাথমিক অনুবাদ-শিক্ষা"—।/০
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ডিলিরিয়াম"—৷০
কবিরাজ হেরম্বনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "Voice of Ayurveda"—১৲
সুভাষচন্দ্র বসু প্রণীত "Dreams of a Youth"—৪৲, "In Quest of the New"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশতৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

হিমানী * কলিকাতা

৺পূজার উপহার! ৺পূজার উপহার!

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সামাজিক নাটক
পতিব্রতা ১॥০
বাংলার মেয়ে ১॥০
পরিণীতা ১॥০
মাকড়সার জাল ১॥০
পথের সাথী ১॥০

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সামাজিক নাটক
বাঙ্গালী ১॥০
পৌরাণিক নাটক
ক্ষত্রবীর ১॥০

শিবপ্রসাদ কর
পৌরাণিক নাটক
স্বর্ণলঙ্কা ১৸০

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
অভিষেক ১॥০

দীনেন্দ্রকুমার রায়
ঐতিহাসিক উপন্যাস
নানাসাহেব ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যাল
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
যাযাবর ৩॥০

প্রফুল্লকুমার সরকার
বালির বাঁধ ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
পূর্ণচ্ছেদ ২৲
অভিশাপ ২৲

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
বহ্নিশিখা ২॥০

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
পৃথিবীর প্রেম ৩॥০

দিলীপকুমার রায়
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
নানারূপী ১৲

চরণদাস ঘোষের
অভিনব উপন্যাস
তেপান্তর ২৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
নূতন সংস্করণ
হিমালয় পারে
কৈলাস ও মানসসরবর
চার টাকা
তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ
পাঁচ টাকা

অনুরূপা দেবী
উত্তরাখণ্ডের পত্র
কেদার-বদরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ গাইড-বুক। দাম: দুই টাকা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
সদ্যপ্রকাশিত অভিনব সংস্করণ
শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ
বেণু ও বীণা
"ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, ঝঙ্কারে—কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।"—বঙ্গবাসী
"বেণু ও বীণা" পাঠ করিয়া অনেক দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম।
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
তীর্থরেণু ৩৲
"এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্প-কার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেলাশেষের গান ৩৲

প্রকাশক—আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স ঃ ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

— প্রেমেন্দ্র মিত্র —
প্রথমা ২॥০
(কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভার, বৈশিষ্ট্য ও অভিনব পরিচয়···—পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

— বুদ্ধদেব বসু —
হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি ২৲
···বুদ্ধদেব বসুর প্রখর প্রতিভা ও লিপি-চাতুর্য্য সমস্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া বাংলা সাহিত্যকে সরস ও গৌরবান্বিত করিয়াছে···

— নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—
ম্যাক্সিম গোর্কী 'মাদার'
মা
৪র্থ সংস্করণ
সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত দুই খণ্ডে ২৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—২৸০
···মুক্তিকামী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রাখার একমাত্র বই···

শেলী (২য় সং) ২৲
উপন্যাসের চাইতেও চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক··· লিখনভঙ্গী অনন্যসাধারণ···

— প্রফুল্ল সরকার —
লোকারণ্য ২॥০
(উপন্যাস)

— নির্ম্মলকুমার ঘোষ —
মুসোলিনী ১০
ইতালীর জনজাগরণের ইতিবৃত্ত

— পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় —
নালপাখী ৸০
(মাতারলিঙ্কের ব্লু-বার্ড, ছোটদের উপযোগী ভাষায় অপূর্ব্ব পরিবর্দ্ধিত ২য় সং)
বাদশাহ্‌নামা ৸৵০
(ছোটদের মোগলদের কীর্ত্তি কাহিনী)

— মনোরঞ্জন হাজরা —
নোঙরহীন নৌকা
নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মানবতার উপন্যাস—২॥০

— প্রফুল্লবালা ঘোষ —
বয়নিকা ১॥০
উল শিল্পের বই—৪র্থ সং

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।

বিজয়ের সাধনা ...

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহামায়ার পাদপদ্মে হৃদয়ের পূজা নিবেদন করবার পর...... সেই প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে আমরা আজ মাতৃচরণে উপহার দেব ভক্তিনীলোৎপল ..যেন অকল্যাণের বিরুদ্ধে অভিযান বিজয়মণ্ডিত হয়!

লক্ষ্মীবিলাসের ট্রেডমার্ক এক গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মারক, যেমন শ্রীরামচন্দ্র শারদীয়া উৎসবের !

এম. এল. বসু এণ্ড কোং লিঃ • কলিকাতা

C.P.S.

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

হংসদূত

"মেঘদূত" ব্যক্ত করিয়াছে বিরহী পুরুষের অন্তর-বেদন', "হংসদূত" প্রকাশ করিয়াছে নারী-হৃদয়ের গোপনতম ব্যাকুলতা। দাম—চার টাকা

সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে হিন্দু-শ্বশুরঘরে সকলকে সুখী করিতে পারিবে, তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ত্রিবর্ণ চিত্রশোভিত।

দাম—দুই টাকা

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

নিখিল-বিরহী-জন হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অনুপম কাব্য "মেঘদূত"-এর শ্লোকে শ্লোকে বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে গেছেন, ইহা সেই অক্ষয় "মেঘদূত" কাব্যের সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। নয়ন-মুগ্ধকর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত নব-প্রকাশিত দশম সংস্করণ। দাম—৬৲

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত

কুমার-সম্ভব

মহাকবি কালিদাসের অনুসরণে সিদ্ধ কবির কাব্য-সাহিত্য সাধনার অনবদ্য নিদর্শন। দাম—চার টাকা

অনুরাধা দেবী প্রণীত

কপোত-কপোতী

কপোত-কপোতীর মত যারা বেঁধেছে ভালবাসার বাসা, তাদেরই নিরালা-ক্ষণের নিভৃত আলাপন এবং দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন নিবিড় প্রেমের অকপট স্বীকারোক্তি। প্রিয়া ও বান্ধবীর হাতে দিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। দাম—২৲

রজনীকান্ত সেন প্রণীত

বাণী — কল্যাণী

কান্ত কবির অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রতীক এই বই দুইখানির প্রতি পৃষ্ঠা দামী আর্ট পেপারে দুই রঙের উত্তম কালীতে উন্নত পরিকল্পনায় ছাপা। দুইখানি কাব্যগ্রন্থেরই নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সুমুদ্রিত প্রচ্ছদপট।

প্রতি বইখানির দাম দুই টাকা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পদ্মা নদীর মাঝি ২৲

মিহি ও মোটা কাহিনী ১৷৷০

প্রাগৈতিহাসিক ১৷৷০ অতসী মামী ২৲

সহরতলী ১ম পর্ব্ব—২৲ ২য় পর্ব্ব—২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ঝড়ো হাওয়া একটি রুদ্র-মধুর ঝড়ের সুন্দর চিত্র। দাম—২৲

মারণ-মন্ত্র ১৷৷০ গঙ্গা-যমুনা ১৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ব্যোমকেশের ডায়েরী ২৲

ব্যোমকেশের কাহিনী ২৲

ব্যোমকেশের গল্প ২৲

ঝিন্দের বন্দী ৩৲ বিষকন্যা ২৷৷০

কালকূট ২৲ বন্ধু (নাটক) ১৷৷০

কালিদাস (চিত্রনাট্য) ২৲ পথ বেঁধে দিল (চিত্রনাট্য) ২৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রাঙ্গামাটির পথ ৩৲

অস্বীকার ২৷৷০ পরকীয়া ২৷৷০ সাহসিকা ২৲

গৃহ ও গ্রহ ২৷৷০ এই পৃথিবী ৩৲

লজ্জাবতী ২৲

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ২৲

চির-নূতন প্রেম-চিত্র। সদ্য-প্রকাশিত নূতন সংস্করণ।

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত

প্রিয় বান্ধবী নূতন প্রকাশিত সুশোভন সংস্করণ। দাম—৩৲

ঘুম ভাঙার রাত ৷৷০ দিবাস্বপ্ন ২৲ নিশিপদ্ম ১৷৷০

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ১৲ কলরব ১৷০ অবিকল ১৷০

তরুণী-সঙ্ঘ ১৷৷০

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম ২৲

শান্তি ১৷৷০ তেজস্বতী ১৷৷০ বিপত্তি ২৷৷০ নমিতা ২৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

জলের আল্পনা

ব্যর্থ প্রণয়ের মর্ম্মস্পর্শী চিত্র। দাম—দেড় টাকা

কাল-বৈশাখী ১৷৷০ আলেয়ার আলো ১৷৷০

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

দিগ্‌ভ্রষ্ট ১৷৷০ লক্ষ্মীর বিবাহ ১৷৷০

নিশিকান্তের প্রতিশোধ ২৲

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

উদাসীর মাঠ ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

ক্রিম
ক্র্যাকার
Britannia
Cream Cracker
Biscuits
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

রেডিয়ম
নারিকেল তৈল
RADIUM

বাধকের মৃতসঞ্জীবন মহৌষধ
হাঁপানীর টান দূর করে।

শ্রেষ্ঠ প্রসাধন হিসাবে "ওটীন" আজ সর্ব্বত্র পরিচিত, তেমনি
শ্রীমতী সাধনা বসু শুধু সৌন্দর্য্যের জন্যই নহে—অভিনেত্রী
ও নৃত্যশিল্পী হিসাবেও, দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।
"ওটীন" তাঁহার বক্তব্য নিম্নে দেখুন—
OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.
Sadhana Bose
Oatine
SNOW for DAY • CREAM for NIGHT

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

সম্পাদক ঃ শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সুবৃহৎ পূজা সংখ্যা ঃ মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা

ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

আছে ঃ

বার্ষিক মূল্য ১২৲
ষাণ্মাসিক " ৬৲

সুবোধ বসুর একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস

নীড়

ত্রৈমাসিক মূল্য ৩৲
প্রতি সংখ্যা " ১৲

এবং প্রায় পঞ্চাশজন প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক-
লেখিকার গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা

কার্য্যালয় ঃ ৩৩এ, মদন মিত্র লেন ঃ কলিকাতা—৬

শুধু বাছা-বাছা গল্প-স

কথাচয়ন

সম্পাদক ঃ শ্রীরঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, হাসিরাশি দেবী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও 'অগ্রগামী' প্রভৃতি—

দ্বিতীয় গ্রন্থের বিশেষত্ব ঃ

'অগ্রগামী'-লিখিত অগ্নি-অক্ষরে শহীদ ক্ষুদিরামের জীবনী-উপন্যাস।

প্রতি সংখ্যা—পাঁচ সিকা :: ডাক মাশুল—স্বতন্ত্র

ডিটেকটিভ উপন্যাসের একমাত্র সাপ্তাহিক

রোমাঞ্চ

প্রতি সংখ্যা—৵০, বার্ষিক—৬৲, ষাণ্মাসিক—৩৲

রোমাঞ্চের প্রকাশিত কয়েকখানি বই।

মরণের ঢেউ ২৲, সর্ব্বনাশা ২৲, দিগ্বিজয়ীর পুনরভিযান ২৲, বজ্র ও বিদ্যুৎ ১৷৵০, হত্যা ৷৵০, গারো পাহাড়ের গুহায় ৷৷৵০, অপরাজেয় মেঘনাদ ৷৷৵০, মরণ কুহর ৷৷০, মরণ পথের পথিক ১৷০, ধূমকেতু ৷৵০, রক্তের মূল্য ৷৵০, রক্তনেত্র ৷৷৵০, দুর্নিবার ৷৷৵০, কালো মুখোস ১৲, লক্ষ্যবেধ ১৲, মাটির পুতুল ১৷৷০, কালসর্প ১৲, সোনার হরিণ ১৷৷০, চন্-চত্রির মাঠ ১৷০, মরণোল্লাস ১৲, কালান্তক ১৷৷০, বহ্নি-বিপ্লব ১৷৷০, অসম্ভব ৷৷৵০, সংঘর্ষ ৷৷৵০, মৃত্যুমল্লার ৷৷৵০,

মহাকাল—(যন্ত্রস্থ)—১৷০

'রোমাঞ্চ' (ডিটেক্‌টিভ গল্প-সঞ্চয়ন) ৪৲

পবিত্র স্নান
অবগাহন ব্যতীত প্রকৃত স্নান বা স্নানের প্রকৃত তৃপ্তি মেলে না—এ ধারণা আমাদের মনে বহুদিন থেকে বদ্ধমূল। দুঃখের বিষয়, এ যুগের শহরের বাসিন্দাদের ভাগ্যে এই রকম স্নানের সুযোগ বা অবসর মেলে কই? তবে ভালো সাবান দিয়ে গাত্রমার্জনা করে প্রচুর জল ঢেলে স্নান করতে পারলে সেই পরিতৃপ্তি যে মেলে না এমন নয়। আর 'রেণু' এমনই একটি ভালো সাবান যা মাখলে স্নানের আনন্দ সত্যিই বেড়ে যায়—'রেণু'-র সুগন্ধী সুপ্রচুর ফেনরাশি শরীরের প্রতিটি রোমকূপ সুপরিষ্কৃত করে স্নানের প্রকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এনে দেয়। 'রেণু' সহজলভ্য ও সুলভ।
রেণু
শিশির সোপ ওয়ার্কস দমদম
SKK

সেকালে আর একালে

আগেকার দিনে আমাদের পূর্বপুরুষেরা দাঁত পরিষ্কার রাখতেন অশ্বথ এবং নিমের দাঁতন ব্যবহার ক'রে এবং তার ফলেই তাঁদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কখনো বিঘ্ন সৃষ্টি হতো না।

আধুনিক বিজ্ঞানের দান হিসেবে আজ আমরা পেয়েছি কলিনোস্ দাঁতের মাজন যা দাঁত পরিষ্কার করার কাজকে বহু অংশে সহজ এবং উপভোগ্য করে' তুলেছে। কলিনোস্-এর সক্রিয় ফেনা মুখগহ্বরের প্রত্যেক অংশে প্রবেশ ক'রে যেন শুচিতায় ভরা এক মনোজ্ঞ স্বাদ অবশিষ্ট রেখে যায় এবং তার ফলেই নিঃশ্বাসে ফুটে ওঠে স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত সুগন্ধি।

কলিনোস্-এ সাশ্রয় অনেক—
টুথ্ ব্রাশের উপর আধ ইঞ্চি
পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।

KL.28EN.

সুরমা
কেশ-বিলাসের
শ্রেষ্ঠত্ব আজও
অবিস্মরণীয়!
পি. শেঠ এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

লিপটনের
বলতেই
সেরা
চা
JAKOOJA BRAND
FINEST DUST TEA
LIPTON'S
FINEST DUST TEA
PACKED BY LIPTON
JAKOOJA

শ্রীঔষধালয় লিমিটেড

"বেনারসী
শাড়ী"
টাওয়ার
ব্লক
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শহিদ্‌-স্মরণে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(স্বাধীনতা-দিবসে)

বহু সাধনার বহু বেদনার ধন
　　স্বাধীনতা, তোমা বোধনে বরি এ বঙ্গে।
এসেছ মূর্ত্ত জীবন-মরণ-পণ,
　　এখনো রক্ত ঝরিছে তোমার অঙ্গে।
বরিতে তোমারে স্মরি আজি তাহাদেরে
　　স্মরি সেই সব শহিদ স্বদেশ-ভক্তে,
যাহারা তোমার উদয়ের গগনেরে
　　অরুণ করিয়া দিয়াছে হৃদয়-রক্তে।
তাদের আত্মা নীহারিকাগুলি মিলে
　　শুকতারা হ'য়ে জাগিল গগন প্রান্তে,
অরুণোদয়ের আগেই যা তিলে তিলে
　　তরল করিল অমানিশীথের ধ্বান্তে।
ভোর না হ'তেই ভোরের পাখীরা জাগি'
　　ভোরের খবর জানাল কাকলী হর্ষে,
প্রথম অর্ঘ্য আজি তাহাদের লাগি'
　　বুক যারা ক্রূর কিরাতের শরবর্ষে।

কত বিগ্রহ কত নিগ্রহ জ্বালা
　　শত লাঞ্ছনা করিল না তারা গণ্য,
কণ্ঠে পরিল যূপের জবার মালা
　　আজিকার জয়মালা তাদেরি জন্য।
সেই মাসিকাটি দুহাতে তুলিয়া ধরি
　　ঊর্দ্ধে চাহিয়া স্মরি সেই বীরবর্গে,
এই শুভদিনে অশ্রু পড়িছে ঝরি'
　　জানি না তাহারা আছে কোন শূর স্বর্গে!
বাসি ত ও কেশ তাদেরি চিতার ধূমে
　　অঙ্গে তোমার তাদেরি অস্থি-চূর্ণ,
স্বাধীনতা, তোমা বরি এ বঙ্গভূমে
　　তাদের কামনা আশা কর তুমি পূর্ণ।
জীবনের চেয়ে ব্রতেরে জানিল বড়
　　ব্রতের মাঝারে আজো আছে ব্রতী দীপ্ত,
সে ব্রত তাদের পূর্ণ সফল কর
　　তাতেই তাদের আত্মাও হবে তৃপ্ত।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব যেমন এক অসাধারণ ঘটনা, দার্শনিক জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের উদ্ঘাটনও তেমনি এক অনন্যসাধারণ ব্যাপার। ইহা আমাদের বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে দার্শনিক সমাজে শ্লাঘান্বিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্দ্ধ সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই রমণীয় দর্শনশাস্ত্রটির আশানুরূপ অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থাই হইল না। এতদিন যেখানে যতটুকু বা ছিল, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাহাও শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

ফলে, অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ লইয়া পবিত্র ভারতবর্ষে যতদূর আলোচনা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে তদনুপাতে কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, প্রেমধর্ম্ম, লীলাপ্রসঙ্গ ও নাম-মহিমা সম্বন্ধে আলোচনার বরং দিন দিন প্রসারই হইতেছে ; ইহা খুবই উৎসাহ ও আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে দার্শনিক ভিত্তির উপর এই ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ শ্রীরসলীলাটি বিলসিত হইয়া ভক্তজনকে কৃতার্থ করিতেছে, সে বিষয়ে তাদৃশ আলোচনা হইতেছে বলিয়া তো মনে হয় না।

তত্ত্বদর্শী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতখানিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া বুঝিলেই কবিরাজের এই আগ্রহময়ী কৃপার বলিহারী যাইতে হয়। কারণ এই দার্শনিকসিদ্ধান্তটি না বুঝিলে, বৈষ্ণবের সাহিত্য বল, কীর্ত্তন বল, আর নাম প্রচারই বল,—তাহার মূল উৎসটির সন্ধান অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। সুতরাং একথা আমাদিগকে মানিয়া লইতেই হইবে যে, কি সাহিত্য, কি পদাবলী, কি রসকীর্ত্তন—পাঠ-কথকতা ব্যাখ্যা-বক্তৃতার তো কথাই নাই,—এ সব কিছুরই মূল হইল—আমাদের প্রাণপ্রিয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন।

এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে যাহা কিছু লিখিব, যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে যাইব,—এমন কি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস যে কোন পদকর্ত্তার কোন একটি পদে একটি অক্ষরও 'আখর' বসাইতে যাইব, অমনি হয়ত বা তাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধই হইয়া পড়িবে। বড় বড় কীর্ত্তন-গায়কেরা পূর্ব্বে তাই রসশাস্ত্রটি ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিতেন। রসশাস্ত্রে প্রবীণতা লাভ না করিয়া শুধু কণ্ঠমাধুর্য্যের পুঁজি লইয়া তখন কেহই রসজ্ঞ সমাজে পদকীর্ত্তন করিতে সাহসী হইতেন না। কীর্ত্তন শুনিবার শ্রোতাই কি আবার সামান্য ব্যক্তি ? শ্রীহরিস্মরণে মন [illegible] রসবিভাবিত, যুবরাজ ও প্রাণেশ্বরীর বিলাসকলায় যাঁহারা নিত্য কুতূহলী, মধুরকোমলকান্তপদাবলী শ্রবণে [illegible] ব্যতীত অন্য বা কাহার অধিকার থাকিতে পারে ? সংসার ভাবনাবর্ত্তপীড়িত কামাদিরিপুবশম্বদ অস্মদাদিবদ্ জীবনিচয়ের প্রতি করুণাময় ঠাকুর জয়দেব তাই না সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥

একটি দিনের পবিত্র চিত্র উপস্থাপিত করিব।

প্রভু সীতানাথের আবির্ভাব মহোৎসব। শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীশ্রীমদন-গোপালের নাট্যমন্দিরে সারাদিন আনন্দের বন্যা বহিতেছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের গান হইবে। সারা শান্তিপুরে ভক্তহৃদয়ে উৎসাহপুলকের সীমা নাই। সন্ধ্যারতির পর স্বয়ং প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী মহোদয় সদলে কীর্ত্তন শুনিতে বসিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শনের পরমাচার্য্য মদনগোপাল প্রমুখ প্রবীণ প্রভুসন্তানগণ শ্রোতা, আর রসশাস্ত্রপ্রবীণ পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনীয়া। মৃদঙ্গ মন্দিরার মধুর নিক্বণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনীয়ার সুরব্রহ্ম এক মাধুর্য্যময়ী পটভূমিকা রচনা করিতেছেন। গৌরচন্দ্রিকার আকুল আহ্বানে প্রভু সীতানাথের সাধনকুঞ্জে মদনগোপালকে প্রকটায়িত করিবার প্রাচীন স্মৃতি আর একবার ভক্তচিত্তে সমুদ্ভাসিত হইল। ভক্ত ভাবুক শ্রোতার প্রেমাশ্রুনয়ঞ্জিত নয়নপ্রান্ত হইতে প্রেমমন্দাকিনীর মুক্তাধারা ক্ষরিত হইয়া শত শত অভক্ত হৃদয়কেও যেন সরস করিয়া তুলিল। মানবজীবন যেন কৃতার্থ হইল।

অজ্ঞ লোকে দেখিল—একজন কীর্ত্তনীয়া উচ্চৈঃস্বরে অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, আর বৃদ্ধ গোস্বামী 'ভাবকালি' করিতেছেন ; কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবান্, যাঁহারা ভাগবত সঙ্গে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি দেখিলেন ? ভাববিভাবিত মানসনয়নে তাঁহারা দেখিলেন—কীর্ত্তনীয়ার চিত্ত যেন ভূলোক দ্যুলোক ছাড়াইয়া—এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উদ্ভেদ করিয়া ভাবদেহে গুরুরূপা সখীর অনুগা হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। যেন অপ্রাকৃত নয়নে সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে অপ্রাকৃত নবীন-মদনের নিরন্তর কামক্রীড়াবিদগ্ধতা প্রত্যক্ষভূত হইতেছে! যেন মুরলীধরের মধুর অধরে মুনিমনোহারি মধুর মুরলী নিক্বণিত হইতেছে ? যমুনা উজান বহিতেছে ! ময়ূর ময়ূরী মনোবিমোহন নৃত্য করিতেছে ! শুক সারিকা কদম্বশাখায় রাধামাধবের গাহিতেছে ! গোপকুমারী অভিসারচঞ্চলা ! কতক্ষণে কুঞ্জে দরশন করিবেন—উৎকণ্ঠার আজ ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—সংকেত

বংশী ঐ—ঐ বুঝি আবার বাজিয়া উঠিল ! কুলগর্ব্ব পর্ব্বতের জটিলা বাধা অপসারিত করিয়া রাধারাণীর মানসতরঙ্গিনী শ্যামসিন্ধুসঙ্গমে ধাবন-চঞ্চলা। সংকেতবংশী বাজিয়াই চলিয়াছে। ক্রমে যেন সুস্পষ্ট নাম ধরিয়াই ডাকিতেছে—রাধে রাধে ! বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—রাধে রাধে ! আর কি নবীনা কিশোরীর ঘরের ভিতরে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব। ধনী তাই—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।

সে এক অপূর্ব্ব সুন্দর অপ্রাকৃত চিত্রদর্শনে প্রেমপুলকাবিষ্ট ভক্ত-ভাবুকের রসানুভূতি বাঙ্ময়রূপ পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছিল, আজ তাহাই আর এক ভক্তিসাধকের ভাবার্দ্র কণ্ঠবিগলিত হইয়া সজ্জনর হৃদয়ে রূপায়িত হইল—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।

ইহাই বৈষ্ণব পদাবলী। ইহাকে কবির অপূর্ব্ব কবিত্বনৈপুণ্য বলিলে ঠিক বলা হইল না। পদকর্ত্তা ভাবদেহে নিধুনিকুঞ্জে সৌন্দর্য্যমাধুরী প্রত্যক্ষ করিতেন—প্রেমরাজ্যের লীলাবৈচিত্র্য দর্শনে কখনও বা বিরহ-বিধুরা রাধারাণীকে সান্ত্বনা দান করিতেন; কখনও বা খণ্ডিতার ভৎর্সনাতাড়িত বিদগ্ধ মাধবকে সঙ্গে লইয়া মানময়ীর মানমন্দির দ্বারে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ভাবী মিলনের মঙ্গল সূচনায় ভক্তচিত্তচকোরকে আনন্দজ্যোৎস্নায় পরিস্নাত করিয়া তুলিতেন।

পদাবলী তাই সামান্য কবিতা নয়, উহা রসের ভজন। উহাই সাধ্যবস্তুলাভের পরম সাধন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন এই সাধ্যবস্তুলাভেরই চরম সন্ধান দান করিয়াছেন। মানবাত্মার চির-আকাঙ্ক্ষিতপ্রাণপ্রিয়তমের অঙ্গসুখলাভের স্মৃতিটি জাগরূক করিয়া দিয়া সমগ্র বিশ্বের এক বিস্ময়বস্তু হইয়া রহিয়াছে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন।

ইহার আবির্ভাবের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক চিত্ত ঐকান্তিক অভেদ অথবা ঐকান্তিক ভেদের তর্ক পরম্পরার বেষ্টনী মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যখন অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন সে তাঁর বুদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে? জগৎ স্তম্ভিত হইল। হরি হরি, জীব কি তবে সত্যসত্যই নিজ সত্তা হারাইয়া অনাদি বিরহের চির-সমাধি রচনা করিল? আর কি সে তাহাকে দেখিতে পাইবে না? যাহাকে দেখিবার জন্য জন্মে জন্মের কত কামনা? সংসার দুঃখময় জানিয়াও চিরনির্ব্বাণ কামনা করিতে প্রাণ চাহে নাই—যাহাকে পাইবার প্রলোভনে জন্মে হইয়াছিল—কোন দিন কোন জন্মে জন্ম-জন্মান্তরেও যদি বা তোমায় পাই—এই ক্ষীণ আশাটুকুও থাকে—তবে তোমায় পাইবার প্রলোভনে মরিতে বাঁচিতে—কোটি কোটি স্বর্গ নরক ভোগ করিতেও আমার দুঃখ কিসের? কিন্তু হে আচার্য্য! আপনি কি সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলেন—সবই মায়া! ইহার কি কোন শুধুই ব্যবহারিক সত্তা। তবে আর ইহাকে লইয়া কি করিব—আমার ভাগ্যে বুঝি আর অমৃতের আস্বাদন ঘটিল না! উপনিষদের ভাষায় তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

তেনাহং কিমকুর্য্যাম্
যেনাহং নামৃতং স্যাম্?

আচার্য্য শঙ্কর মানবের বুদ্ধি-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। জীবের বড় অহংকার—সে তত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিয়াছে—শঙ্করের কুঠারাঘাতে সে অহংকার চিরচূর্ণ হইল; নাস্তিক্যবাদ ধূলায় লুটাইল; লোকায়ত মত তিষ্ঠিতে পারিল না; বৌদ্ধের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইল; শূন্যবাদের সৌধের ভিত্তি ধ্বসিয়া গেল, আর তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইল সনাতনধর্ম্মের অটল অট্টালিকা; শিখরে তাহার উড্ডীন হইল—ব্রহ্মবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী; আর বিস্মিত বিশ্ব দেখিল—সেই পতপতায়মান পতাকার ভিতর আঁকা রহিয়াছে—ওঁ তৎ সৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক ব্রহ্ম—বৃহদ্ ব্রহ্ম—ব্যাপক ব্রহ্ম—সবই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। একমাত্র ব্রহ্মই রহিয়াছেন—নিত্য সত্তায় চিরবিরাজমান। ইঁহা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টিধারা অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, জাত জীবিত রহিয়াছে ইঁহারই দ্বারা—তারপর তাঁহাতেই সব কিছু বিলীন হইতেছে—পরিদৃশ্যমানতার চিরবিশ্রান্তি ইঁহাতেই।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

নাস্তিক্যবাদ ত নিরস্ত হইল; কিন্তু হায় হায়! আস্তিকের ভগবানকে যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ তবে আমাদের কি হইল? তুমি নাই, আমি নাই; তোমায় আমায় মাঝে যে অনাদিকালের সম্বন্ধ তাহাও নাই; আমি হয়ত সে সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইতেও পারি, তোমার মায়া তার জন্য না হয় আমার গলায় ফাঁসি পরাইতেও পারে, হয়ত বা কখনও স্বর্গে উঠাইয়া কখনও বা নরকে ডুবাইয়া গভীরতর দুঃখ দিতে পারে; সে দুঃখকে তো আর দুঃখ বলিয়াই মনে করিব না—কারণ তখনো তো তোমায় পাইবার সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ হয় নাই। কিন্তু তোমাতে চিরবিলীন হইয়া আমার এত সাধের এত দুঃখের এত জন্ম-জন্মান্তরের ভোগান্তি-সওয়া জীবসত্তাটি এক কথায় চিরতরে হারাইয়া ফেলিব?

প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। না কখনই নয়, সত্য নয় ও কথা। উহা একান্তই মায়াবাদ? তোমায় আমি ভুলিয়াছিলাম—তুমি কিন্তু ভুলিতে পার নাই, তাই নিজ চরণে টানিয়া লইবার ছলে এও তোমারই এক অপূর্ব্ব ছলনা। তর্ক বুদ্ধিকে তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বিরাট সাত্বত সম্প্রদায় চারিদিক্ হইতে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

ফলে ভারতীয় দর্শনক্ষেত্রে অভেদবাদের বিরুদ্ধে ভেদবাদী বিভিন্ন

স্ব স্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন ব্যাপারে ইঁহারা যে সকল অপূর্ব্ব যুক্তি শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে যে শুধু অপূর্ব্ব মণীষাই অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, ভক্তিভাবাঢ্য হৃদয়ে ভগবানের উপর যে কতখানা ভালবাসা লীলায়িত, তাহারও অপূর্ব্ব পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য বল্লভ, আচার্য্য নিম্বাদিত্য এবং পরমাচার্য্য মধ্বমুনি প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। ইঁহারা কৃপা করিয়া রূপব্রহ্মকে লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন। নতুবা জগতের চক্ষু অদ্বৈত-বিদ্যুচ্ছটায় যেরূপ ধাঁধিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আর যে কোনদিন তাহার দর্শনশক্তি ফিরিয়া আসিবে কেহ তাহা মনেই করিতে পারিত না। এই সকল দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহতী মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। অমন যে "তত্ত্বমসির" বিরাট দুর্গ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে তাহার "তস্য ত্বং" এই প্রকার ব্যাখ্যা উপন্যাস করিয়া শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য মহাপ্রভুর মনোমোহন করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রভু আমার পরে এই দুই ঐকান্তিক বিরোধের অপূর্ব্ব সমন্বয় সমাধান করিয়া লক্ষাশ্রয় মধ্ব সম্প্রদায় মধ্যেই মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে ইচ্ছা করিলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের ক্রমবিকাশের কথা তুলিতে পারা যায়। কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া লাভ নাই।' এ সম্বন্ধে বহু আলোচনাই হইয়াছে। একরূপ সিদ্ধান্তিতই হইয়াছে যে, একমাত্র বেদান্ত দর্শনই ঈশ্বরকে অকুণ্ঠকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ঈশ্বরকেই মূল প্রতিপাদ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং বেদের চরমভাগ জ্ঞানকাণ্ড হইতে ঈশ্বর প্রতিপাদিকা শ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্থাপনে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই বেদান্ত দর্শন অন্যান্য দর্শনের মত সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছেন এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানকেই দুঃখনাশ ও সুখ সাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভ বিষয়ে বেদান্ত যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অতুলনীয় ও অপূর্ব্ব। শ্রীগৌরসুন্দর এই বেদান্তদর্শনকেই নিজ অলৌকিক লীলাবিলাসের ভিতর দিয়া যেভাবে প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত পরিকরগণ সেই ভাবটিকেই অবলম্বন করিয়া এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের শাখা বর্দ্ধন করেন। শ্রীপাদ জীব, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির কথা তাই আমরা আজ সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। তাঁহারাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশাবলী অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভামণ্ডিত ভাষ্য রচনাপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বালোকসমুজ্জ্বল করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তদর্শনকেই যদি এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রধান উপজীব্য বলি, তবে আদৌ অসমীচীন হইবে না।

প্রধান উপজীব্য বলিয়াছি, কিন্তু একমাত্র উপজীব্য বলিতে পারি নাই। তাহার কারণ, কৃপাপ্রাপ্ত যে সকল মহাপুরুষের অন্তরে তত্ত্বরূপ অহরহ উদ্ভাসিত হওয়ায় অষ্টকালীন লীলা বিলসিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নিকট ঘটপটাদির আলোচনা যদি 'এহো বাহ্য' বলিয়াই গণ্য হয়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কত কত অভ্যাগত মহাত্মা ভক্তবর্য্যের মুখে হয়ত বা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব্যতীত আর কোন কথাই শুনিতে পাই নাই। ঝাড়খণ্ডের বনপথে আত্মভোলা গৌর আমার শুধু তো ঐ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়াই স্থাবর জঙ্গমকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের কানে প্রাণে আজও যেন সেই অমিয়মাখা বাণী নৃত্য করিতেছে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

অভিন্নকৃষ্ণ গৌরসুন্দর ব্যতীত অমন করিয়া কৃষ্ণমহিমা আর কে শুনাইতে পারে? রসিকশেখর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, বেদ-বেদান্তের চরমতত্ত্ব কৃষ্ণ—এ সব কথা গৌর না আসিলে কে বা জানাইত। রাধারাণীর ভাবে ভোরা গৌর আমার শতমুখেও কৃষ্ণ কথা বলিয়া যেন শেষ করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণময়ীর ভাবাবেশে গৌরকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ীর মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেই পারিতেছেন না। দর্শনের গহন কাননে প্রবেশের পূর্ব্বে একবার শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণাশ্রয়ে সেই অমৃত সরোবরের বারি প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লই—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতী
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

'কৃষ্ণ'—এই দুইটি বর্ণাত্মক বস্তুটি বুঝিতে পারিলেই সমগ্র বৈষ্ণবদর্শন বুঝা হইয়া যায়।

বেদের সেই গুহাহিত চরম তত্ত্বটিকে এতদিন শুধু অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপেই লোকে ধরিতে পারিয়াছিল, কিন্তু করুণাময় গৌরের কৃপায় জগতে সর্ব্বপ্রথম বেদের মুখ্যার্থ প্রচারিত হইল—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"

বেদান্তকৃৎ ব্যাস স্বয়ং ভাষ্যকার হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, সুতরাং গ্রন্থকারকৃত ভাষ্যের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবার তো উপায় নাই। গ্রন্থকারকে স্বয়ং ভাষ্য করিতেই বা হইল কেন; সে রহস্যটিও উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন—পূজনীয় শ্রীধর স্বামী মহোদয়—

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যন্নারদোপদেশতঃ শ্রীভগবদ্‌গুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাসঃ।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এতকাল জগতে সুপ্রচারিত থাকা সত্ত্বেও সূত্র-ভাষ্যের সম্বন্ধ কেহই বুঝাইতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর না আসিলে তত্ত্বটী রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইত। বেদান্তপ্রচারিত ব্রহ্মই সে নির্ব্বিশেষ ধারণার ধারা বাহিয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তিবিলাসে ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বরূপে নিত্যবৃন্দাবনে মুরলিধ্বনি করিতেছেন, আর তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি সে মূর্ত্তিময়ী হইয়া শৃঙ্গাররসরাজকে ভাবরসমধু পান করাইতেছেন—এই জ্ঞান সম্পদ্ হইতে জগৎ চিরদিনের জন্যই বঞ্চিত

হইত। আজ তাই গৌড়ীয়দর্শন কথা বলিতে গেলেই বার বার সেই-কথাই মনে হয়—

যদি গৌর না হৈত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে'
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাতো কে?
তাইরে ভাই—গোরাগুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়।

যেব বড় দরশন পড়িয়াও সো যদি
আমার গৌরাঙ্গ নাহি ভজে;
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন জন
দরপণে কিবা তার কাজে?

পদকর্ত্তার আনুগত্যে 'গৌরচন্দ্র' গাহিয়া—

অথপ্রকৃতমনুসরামঃ।

দার্শনিক সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের বিশিষ্ট দান হইল—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। পরে সেই সম্বন্ধে দু'একটি কথা নিবেদন করিব।

(আগামীবারে সমাপ্য)

নিশাস্বপ্ন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

প্রেমের মধ্যে আমি আর নেই।

অবশ্য আমি যে প্রেমে পড়েছিলাম তা নয়। অথবা আমার প্রেমে যে কেউ পড়েছিল তা-ও নয়।

যে নিশীথের কাহিনী এটা, সেটা প্রেমের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটি দুর্লভ দুর্বার রাত্রি। পূর্ণিমার আলো মনে হচ্ছিল যেন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবার জন্য আকাশ থেকে নেমে এসেছে। চিত্রাঙ্গদা বর চেয়েছিলেন যে তার এক বৎসর ছলনার শেষ রাত্রিটি যেন সব চেয়ে বেশী মাধুরী ও মাদকতা নিয়ে বসন্তের পুষ্পাভরণ দিয়ে তাকে সাজিয়ে দেয়। অর্জুনের হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে শেষবারের জন্য তিনি হরণ করতে পারেন। আজ রাত্রিতে মনে হচ্ছে যে বহু আধুনিক অর্জুনের হৃদয় ভেনিসের চিত্রাঙ্গদারা—আহা, রুজ-লিপষ্টিক-পাউডারে চিত্রিত অঙ্গ তাদের—হেলায় হরণ করবে।

আমার হোটেলের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সারি সারি সাইপ্রেস গাছের আড়ালে আলোছায়ার মত মায়াজাল রচিত হয়েছে। জ্যোৎস্নার ভাষায় শাদা ও কালোতে যে ছবি তৈরী হয় সে ছবিই সব চেয়ে সুন্দর, তার প্রমাণ দক্ষিণ ইটালীর সুন্দরীদের কালো আঁখি। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত মূর্ত্তির মধ্যে ঘন কৃষ্ণ আঁখিই সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। সে বলে যে আমাদের দেশের কৃষ্ণকলিদের কালো কাজল চোখের সৌন্দর্য্য তেমন খোলে না তারা ইটালিয়ান মেয়েদের রং পায় নি বলে। জ্যোৎস্না পৃথিবীর কোথায় যে না ঘুরেছে তার ঠিক নেই।

মোটকথা এই মায়াজাল আমার মনকে সামনের আলোয় উদ্ভাসিত পথে টেনে আনছিল; ঘরে থাকতে দিচ্ছিল না। এমন চাঁদনী রাত্রি শুধু কবি, প্রেমিক ও পাগলদেরই পথে টেনে আনে। তা ছাড়া আর যাদের টেনে আনে তাদেরও এই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীতে পরিণত করে দেয়।

এমন রাত্রিতে হোটেলের রেস্তোরাঁ ঘরে বসে সুসভ্য টুরিষ্টের মত আদব কায়দা মাফিক গুণে গুণে ঠিক মত ছুরী কাঁটা চামচ চালিয়ে "অদ্য রজনীর ফরাসী স্পেশিয়ালিটী" নামক খাবারগুলির সদ্গতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পথ আমায় ডেকেছে। উদ্যানপথে ঝাউকুঞ্জের পাশে পাশে মর্মরের প্রস্তরমূর্ত্তিগুলিও আমায় ডেকেছে।

ওই পথ অবশ্য কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না—যদিও ওদেশে একটা কথা আছে যে সব রাস্তাই রোমে নিয়ে যায়। দুধারে বাগান ও পুরানো ইতিহাসের গন্ধমাখানো বাড়ী; তার মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যেতে যেতে হাজির হলাম ভেনিসের জল পথে। এই "গ্রাণ্ড ক্যানালেই" এই পথের পরিসমাপ্তি এবং আমার গল্পেরও এখানে প্রারম্ভ।

সারাটা দিন আমার খুব সম্ভ্রান্তভাবে কেটেছে অর্থাৎ আমি যদিও সম্ভ্রান্ত নই, অতীতের সম্ভ্রান্ত নগরশ্রেষ্ঠ 'ডোজের' প্রাসাদের অতুলনীয় চিত্রগুলির সামনে আমার সারা দিন কেটে গেছে। আমার চারপাশে ত্বরিত গতিতে ঘোরা ফেরা করে গেছে কোটিপতি আমেরিকান টুরিষ্টরা; তাদের যে একদিনের মাত্র মেয়াদ ভেনিসে। একমাসে ভূ-প্রদক্ষিণ করে যেতে হবে তাদেরকে। আবার বইয়ে লিখেছে যে "টু সি ভেনিস য়্যাণ্ড দেন ডাই"—অর্থাৎ ভেনিস না দেখে মরলে সেটা আমেরিকান টুরিষ্ট শাস্ত্র অনুসারে মরাই হবে না।

আমি কিন্তু মজে গেলাম ইটালিয়ান ছবিগুলির বর্ণবৈভবমাতে। এমন বর্ণমিশ্রণের সুষমা শুধু ছবিতেই নয়, ইটালীর অপরূপ আকাশে—ভেনিসের সাগরস্নানের সৈকতে—'লিডো'র স্বচ্ছ জলরাশিতে ও নীলাঞ্জন ইটালীয়ান আঁখিতে ছড়িয়ে পড়েছে ছবিগুলি ছাপিয়ে। তার রঙের পরশ প্রলেপ দিয়েছে আমার মনে। সেই রঙই আমায় হাতছানি দিয়ে পথে টেনে এনেছে আজ রাত্রিতে।

ভেনিসের সুসজ্জিত নৌকাগুলিকে গণ্ডোলা বলে। গাঙে দোলা খেতে খেতে ভেসে যায় বলেই বোধ হয় নাম হয়েছে গণ্ডোলা। ইঞ্জিনে-চালান গণ্ডোলায় আমি কোন দিন চড়তে পারলাম না, কারণ সোনার পাথর বাটীতে খেলে আমার তৃপ্তি হয় না। হাতে-বাওয়া ছোট আমার পান্সী (ফ্যান্সি-ও বলতে পারা যায়) তরীখানি বেয়ে 'রিয়াল্‌টো' সাঁকোর তলায় এসে নামলাম।

আমি টুরিষ্ট হ'লেও ওই দলটাকে পছন্দ করি না। তাই ছোট্ট একটি পথপ্রান্তের রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকলাম। আমি যে বিদেশী, আমার বিদেশী মনকে স্বদেশী আবহাওয়ায় প্রকৃতরূপে ঢেলে দিতে চাই, তার সঠিক পরিচয় চাই। এ সব জায়গায় এলে খাঁটি ইটালিয়ানকে পাওয়া যাবে। সে আমার আমেরিকান টুরিষ্টের উদ্ধত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে নীরবে প্রশ্ন করবে না—"তুমি কে বট হে" ?

ধীরে ধীরে খেতে খেতে চোখ প্রায় বুজে এসেছিল। কারণ মন খুলে গিয়েছিল একটি ভিক্ষুকশিল্পীর 'ম্যাণ্ডোলিন' বাজনাতে। সে খুব পুরানো একটি দক্ষিণী সুর বাজাচ্ছিল। সে সুর যেন আমার সারা দিন ও সারা সন্ধ্যার ঘটনাগুলিকে চিত্ররূপ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে ওলট পালট লেগে গেল। সে সার্থকতা এই সব সাধারণ ইটালিয়ানের জীবনে নেই; যে অস্তিত্বের কথা এরা ভাবে না, স্বপ্নেও সেই গৌরবে এদের মহিমান্বিত মনে হতে লাগল। চোখ বুজে বেঁচে থাকার আরাম উপভোগ করছি এমন সময়ে খুব মৃদু একটা শব্দে চোখ মেলে দেখলাম—সামনে এসে বসেছে একটি প্রৌঢ় ইটালিয়ান। চোখে সহানুভূতি, মুখে প্রসন্নতা ও সর্ব্বাঙ্গে গতযৌবন এক সুপুরুষের কমনীয়তার অম্লান আভাস।

"সিনর, ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার বন্ধুভাবে নিয়ে আমার দোষ মার্জনা করবেন। আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় কিছু ভাবছেন। কারো কথা বোধ হয় ভাবছেন।"

এ লোকটি বলে কি ? বড় অপ্রস্তুত বোধ করলাম। সত্যিই ত সাধারণ সস্তা একটা রেস্তোরাঁয় বসে খেতে খেতে চোখ বুজে এলে লোকে কি ভাবতে পারে ? মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন—ঠিকই বুঝেছি, সিনর, আপনি কারো কথা ভাবছেন। এমন রাতে সেটা খুবই স্বাভাবিক। সহানুভূতিতে তার স্বর একটু আর্দ্র, চোখ একটু কোমল হয়ে এল। তিনি বললেন—আপনি যার কথা ভাবছেন তিনিও নিশ্চয়ই আপনার কথা এখন এই মুহূর্ত্তেই ভাবছেন।

কি সর্বনাশ! অর্থাৎ এ বলতে চায় যে আমি প্রেমে পড়েছি! অবশ্য আমার মাথার চুল একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে তরুণ কবিদের মত সারা দিন ঘোরাঘুরির পরে; ভেনিসের আকাশের ও 'লিডো'র সুনীল রঙের আঁকাবাঁকা খেলার সঙ্গে 'ম্যাচ' করে অর্থাৎ সামঞ্জস্য রেখে একটা টাই আমার গলায় পরা রয়েছে। কিন্তু তাতেই কি প্রেমে পড়ার কোন নিশানা পাওয়া যায় ? বিব্রত হয়ে আবার একটু হাসলাম। সামনের প্লেটটাতে পরম সুখাদ্য 'এস্কালপ' (অনেকটা কাটলেট গোছের) ও ম্যাকারোণি য়্যাল পোমাদোরো (টোমাটো রসে মাখান ম্যাকারোণি) এখনো বাকী রয়েছে। আনমনে প্লেটটা একটু সরিয়ে রাখলাম।

ভদ্রলোক বোধহয় এতে একটু সমর্থন বোধ করলেন। চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনে নীচু স্বরে বললেন—আমি দুঃখিত যে আপনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলাম; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ভেবেছিলাম যে আমি একজন সমব্যথীর সন্ধান পেয়েছি। কেন এমন মনে হল জানি না, কিন্তু জানেন তো একই কথা যারা ভাবে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। অবশ্য আপনার স্বপ্ন গড়ে উঠছে, আর আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আজই, এইখানে, এই রেস্তোরাঁতে।

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। আমি ত কোন স্বপ্ন এখনো দেখতে সুরু করি নি। অবশ্য যদি করতাম, আমার বাইশ বছর বয়সকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু এর অনুমানকে ভেঙ্গে লাভ নেই। এর জীবনে যা ভেঙ্গেছে আমার সম্বন্ধে একটা কল্পিত অনুমান তার তুলনায় অতি সামান্য। তাই আমার মন কোমল হয়ে এল; গাঢ় কণ্ঠে বললাম—ভেঙ্গে গেল ? আপনার আশা-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ? আহা—

ভাবাবেগে আর কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু আমার নীরবতাকে অতিক্রম করে চোখ সপ্রশ্ন হয়ে উঠল।

ভ—সত্যি। কেন যে দেশে ফিরে এলাম এত বছর পরে আমি জানি না। আর দেশের চেনা লোকদের মধ্যে আমার ফিরে আসা যেন জানাজানি না হয়ে যায়, তাই আমি শীঘ্রই আবার চলে যাব।

আ—বিদেশে চলে যাবেন ? বিদেশে ? আবার প্রবাসী হবেন ? কথাটা জিজ্ঞাসা করেই মনে পড়ে গেল যে তিন বছর ধরে আমিও প্রবাসী।

ভ—কেন হব না ? দেশে আমার রইল কি ? যাকে নিয়ে আমার দেশ, আমার দেশের স্বপ্ন, সে ত আর সে নেই। শুধু আমিই একা সে-ই আছি।

এই রেস্তোরাঁতে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে বলেছিলেন তাই একবার ঘরটার চারদিকে চকিতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। শুধু একটি নারী আছে সেখানে; এই রেস্তোরাঁরই মালিক, সদ্য অতিক্রান্তযৌবনা, কিন্তু সুন্দরী যে ছিল এককালে তা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য ইটালীতে কেই বা সুন্দর নয়, এ প্রশ্ন একবার মনে যে না উঠল তা নয়।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রৌঢ়ও চারদিকে তাকিয়ে যাচ্ছিলেন; তারও দৃষ্টির গতি ওই নারীতে এসে সমাপ্ত হল; আঁখির ভুরু দুটি প্রচ্ছন্ন একটু হাসির আভাস দিয়ে রামধনুর মত বেঁকে খেলে গেল। তিনিও মৃদু ভ্রূভঙ্গী করলেন। দুজনে যে পরিচিত তা বুঝতে পারা গেল সহজেই। ভাবলাম হায়, কত নিকটে এরা, অথচ কত দূরে।

ভ—জান বন্ধু—ওই হচ্ছে আমার অতীতের প্রিয়া, যে অতীত আমার কাছে এই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল সত্য হ'য়ে। আমার আর এখানে মন টিকছে না, চল আমরা বাইরে কোথাও চলে যাই।

আমার সেই নারীর দিকে তাকালাম। তার অধরে—যে অধর

এই ভদ্রলোকের জন্ম ধরাতে স্বর্গ রচনা করেছিল সে অধরের প্রান্তে একটু হাসি লেগে আছে। আমরা দুজনে বাইরে চলে এলাম। গণ্ডোলা ঘাটেই বাঁধা ছিল।

ততক্ষণে 'সান মার্কো' গির্জ্জার সুন্দর চত্বর খালি হয়ে গেছে। কিন্তু ভরে আছে সে জায়গাটা জ্যোৎস্নায়. প্রায় সমুদ্রের মত বিপুল জলরাশিতে সে জ্যোৎস্না পুলকে কুটি কুটি হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। জলের ধারে এসে দুজনে বসলাম।

ক্রপো বলে যেতে লাগল তার কাহিনী। আমরা ততক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পৌছিয়েছি। সে বলে যেতে লাগল—এক দরিদ্র প্রেমিকের অবস্থাপন্ন রাজপুরুষের কন্যার সঙ্গে ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী।

ক্র—ক্লারেটা ফরাসী 'ক্লারেট' সুরার মতই আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যে দ্রাক্ষাগুচ্ছ থেকে ক্লারেট নিষ্কাষণ করা হয় সে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষার মত কোঁকড়ানো অলকগুচ্ছ ঘিরে থাকত তার মুখখানাকে। সে মুখ শুধু আঙুরের মত নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে পান করতে ইচ্ছা হত. কিন্তু আমরা হচ্ছি রোম্যান ক্যাথলিক।

আ—তাতে লোকসান কি? সে দ্রাক্ষারসে পরাণ ত তোমার ছিল "অরুণ বরণী"; পানই যে করতে হবে তার কি কোন মানে আছে?

ক্র—নেই? তুমি বলছ নেই? তোমার বয়স কত?

আমি তার বাহুতে মৃদু একটু টোকা দিয়ে হেসে বললাম—সে কথা থাক; তার পর বল?

ক্র—তার পর? আমি ক্লারেটাকে নাম দিয়েছিলাম 'তাজ'। তোমাদের দেশে যে শ্বেত পাথরের তাজমহল আছে তার মত শুভ্র সুন্দর ছিল সে।

আ—আমার ত মনে হয় যে জীবন্ত তাজ প্রস্তরীভূত তাজের চেয়ে বেশীই সুন্দর ছিল তোমার কাছে।

ক্র। ঠিক বলেছ। এই দেখ না আজো ক্লারেটার সেই শুভ্র বর্ণ আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। আজ সে প্রস্তরীভূতা; শুধু প্রস্তর; কিন্তু প্রাণ পেলাম না তাতে।

আ। কেন? সে কি তোমায় আর ভালবাসে না?

ক্র। সে কথা আজ গৌণ। যদি সে আজো ভালবাসতে চায় তাতেই বা কি হবে?

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' অক্ষয় প্রেমের কথা শুনে এসেছি কাব্যে; অনন্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা লেখে উপন্যাসে। আর বাস্তব জীবনে যে লোকটী একটি চম্পকাঙ্গুলীর ধাক্কা খেয়ে যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রবাসী হয়ে ফিরে এল সে এ কি কথা বলছে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

ক্রপো। জান, আমার যখন তোমার মত বয়স ছিল তখন তাজের জন্ম কি কাজই না করতে পারতাম? আমার অর্থের অভাবকে পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি অর্থহীন প্রেমগুঞ্জন দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, সেবা দিয়ে। উপহারের অভাবকে লঘু করে দিতে চেষ্টা করেছি পুষ্প হারে সাজিয়ে। গণ্ডোলায় চড়িয়ে তাকে নৌকা বিহারে নিয়ে গিয়েছি। সে আমার হ'তে রাজী ছিল কিন্তু তাকে আমি পাই নি।

আ। কেন? তুমি ইংরেজীতে যাকে বলে 'সিনিক' তাই হয়ে গিয়েছিলে?

ক্র। না, ভেনিসে 'সিনিক' হওয়া সহজ বা স্বাভাবিক নয়। আঙুর ফল টক হলে লোকে সিনিক সাজে, কিন্তু প্রেম বৃক্ষের ওই ফলটি নাটকীয় ভঙ্গিতে কবে এসে মুখে ঝুপ করে পড়বে তার প্রতীক্ষায় নৃত্যাকুশলা নটীর মত মন তাদের ঘুঙুর পরে ঘুর ঘুর করে নেচে বেড়ায় সেই বৃক্ষতলে।

আ। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের সহপাঠীরা কলেজে অনেকেই প্রেমের কবিতা পড়ে সিনিক হয়ে উঠেছে এবং সে ভাবটা তাদের কারো যাবে না প্রেমে সত্যি না পড়া পর্য্যন্ত।

ক্র। সাবাস, বন্ধু। তোমার বিশ্লেষণ খুব ঠিক হয়েছে। কাজেই দেখ আমি সিনিক হ'তে যাব কেন? আর তা-ই যদি হব তবে আমার এ ফ্যাসাদ কেনই বা হবে?

আ। কিন্তু তার দোষে এমন হল?

ক্র। দোষ কারো ছিল না। দোষ যদি কারো থাকে তবে আমাদের দেশের সুনীল নির্ম্মল আকাশের—যার ওই রকম সুন্দর রঙ হয়েছে আমাদের তরুণীদের চোখের রঙের প্রলেপ পেয়ে। দোষ এই ভেনিসের জলরাশির যারা আঁকা বাঁকা খালগুলির মধ্যে সারাদিন সারারাত্রি প্রত্যেক রূপসীর বাতায়ন তলে গান করে করে খেলে বেড়ায়। জান, ভেনিসের জলের এই লীলা চঞ্চলতা হচ্ছে ইটালিয়ান মেয়েদের হৃদয়-মাধুরীর সজল সংস্করণ।

ক্রপোর বর্ণনার ব্যঞ্জনা আমায় প্রায় দিশেহারা করে ফেলেছিল। বুঝতে পারছিলাম যে প্রেমে পড়লে মানুষ এমনভাবেই প্রলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে নিজেকে। আর পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ প্রেমের গীতিকাই ত প্রলাপ ও বিলাপের সংগীত সংলাপ। অবশ্য ক্রপোর অনেক কথা ও অনেক উপমা ব্যাকরণ-বিলাসী বা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকদের মতে সুবোধ বা সুশ্লীল হবে না; কিন্তু সে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলে উঠবে যে তার জন্ম দোষ দাও ওই ভেনিসের বারিরাশিতে ভাসমান বসন্ত মত্ততাকে. আমাকে নয়।

আ। তার পর?

ক্র। তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত—যদিও দীর্ঘ জীবন যে কি ভাবেই কাটিয়েছি। ক্লারেটার বাবা একদিন এইখানে এই রকম চাঁদের আলোর মধ্যে আমাদের আবিষ্কার করলেন। আমি তখন দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে গেয়ে ওকে নিয়ে গণ্ডোলায় চলেছি; ওর বাবা ফিরছিলেন আর একটা গণ্ডোলায়; আমার দাঁড়ের ধাক্কায় তার নৌকা ওল্টাবার যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। সামলিয়ে নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন আমাদের দুজনকে। তার পরের কথা বুঝে নিতে তোমার কষ্ট হবে না।

আ। তুমি কেন তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলে না যৌবনের দাবীতে, প্রেমের দাবীতে, ক্লারেটার দাবীতে?

ক্র। তার কি পথ ছিল, বন্ধু? তার সামনেই ত তার বড়লোক বাবা আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করে বললেন—আগে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করে এস, তারপর আমার সোনামণির কথা ভেবো। আমিও সেই শপথ করে হাতের দাঁড় জলে ভাসিয়ে দিয়ে, ভাসমান পানসীতেই ক্ল্যারেটাকে রেখে সাঁতরিয়ে ক্যানাল পার হয়ে প্রবাসী হয়ে গেলাম।

তার পরের কাহিনী ক্রণো নিজে থেকেই বলে যেতে লাগল। কত দেশে সে ভাগ্যান্বেষণ করে বেড়িয়েছে তার হিসাব নেই। ভারতবর্ষেও সে এসেছিল তাজ দেখবার জন্ম; তাজের সমাধি পার্শ্বে অশ্রুময় যে ইয়োরোপীয় মূর্ত্তি নিত্য দেখা যেত বলে গাইডরা বলে—সে মূর্ত্তি হচ্ছে ক্রণোর। তার পর মালয়ের জঙ্গলে রবারের ব্যবসায় ফটকায় বড়লোক হয়ে সে মাত্র দেশে ফিরে এসেছে। আজ সকালেই সে তার তাজকে খুঁজে বের করেছে এই সামান্য 'রিস্তোরান্তির' মালিকের মধ্যে। ক্ল্যারেটার বাবা মারা যাবার পর দেখা গেল যে টাকাকড়ি কিছুই বিশেষ রেখে যান নি। তার ধনী পাণিপ্রার্থীরা সরে গেল শূন্য মধুভাণ্ড দেখে। অভিমানে সে নিজে উপার্জ্জনের চেষ্টায় লেগে গেল; বিয়ে করা তার আর হল না।

প্রায় অশোভন একটা উল্লাসে বলে উঠলাম—বেশ ত, এখন ত তুমি তোমার তাজে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে পার।

মলিন একটু হাসি হেসে সে বলল—সেইখানেই ত হ'ল আমার পরাজয়।

বুঝতে পারলাম না। দূরে গণ্ডোলার মাঝিটা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত কম্পমান ছোট তরীটির উপর ত্রিভঙ্গিম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রণোর কাহিনী সন্ধ্যা-তারার মত আমার মনের আকাশে জ্বল জ্বল করে বিরাজ করছে; কি যে তার শেষ বক্তব্য তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

আ। সে যখন অবিবাহিতা, পিতা যখন নেই পথে বাধা দিতে, তুমি যখন ধনী হয়ে ফিরে এসেছ, তখন তোমার জয়ের মুহূর্ত্ত ত সামনেই অপেক্ষা করছে।

ক্র। তুমি তা বুঝবে না বন্ধু, তোমার বয়স অল্প; তুমি এখনো রচনা করতে পার। আমি আর পারি না।

আ। অর্থাৎ?

ক্র। অর্থাৎ আমি সেই আমিই আছি, সেই মন, সেই অন্বেষণ, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা। এই পঁচিশ বছর আমি যাকে মনে মনে বসন্ত-পুষ্পাভরণা তরুণী রূপেই শুধু কল্পনা করে এসেছি সে যে আমার মনের সীমা ছাড়িয়ে কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়া হয়ে গেছে তা আমি কখনো ভাবি নি। আজ সকালে যে প্রতিমা দেখব বলে ছুটে এসেছিলাম শুধু তার প্রেতাত্মাকে পেলাম। হায়! এর জন্ম ত আমি সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াই নি।

আ। কিন্তু তুমি নিজেও ত আর বিশের কোঠায় নেই; তুমি ও ক্ল্যারেটা দুজনেই কবে যৌবন পার হয়ে এসেছ। তা ছাড়া সেও ত ভাবতে পারে যে ক্রণোও ত আর তরুণ নেই।

ক্র। সে ঠিক তা ভাববে না। সে ত আমার জন্ম সব কিছু ছেড়ে মনের দ্বার রুদ্ধ করে পরিবর্ত্তনের স্রোতের গতি প্রতিরোধ করে বসে ছিল না। তার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে সে গড়ে উঠেছে। আমার ত সে অবস্থা ছিল না।

আ। তুমি কি আয়নাতেও কখনো নিজের বয়স বেড়ে যাওয়া লক্ষ্য কর নি? অনুভব কর নি যে তুমি আপনার অজ্ঞাতসারে বদলিয়ে যাচ্ছ ক্রমে ক্রমে?

ক্র। তা কখনো করি নি; যদি করতাম তাহলে হয়ত এমন করে ছুটে আসতাম না। যদি বা আসতাম নির্বিচারে অকুণ্ঠিতচিত্তে যাকে পাচ্ছি তাকেই গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠতাম।

আ। আশ্চর্য্য! তুমি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসতে?

ক্র। ভাল—বাসতাম না? ভালবাসতাম না? তাহলে এতদিন কাকে নিয়ে দিন কাটিয়েছি, দুঃখ দৈন্য হতচ্ছাড়া জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি? কার স্বপ্ন মনে আলো জ্বেলে ছিল তাহলে? কার মূর্ত্তি চোখের মণিতে আসন নিয়েছিল?

আ। ঠিক সে-ই ত আছে। তুমি আর সে দুজনেই যেটুকু বদলিয়েছ তা শুধু প্রকৃতির জৈব পরিবর্ত্তন। তাকে তুমি স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছ না কেন?

ক্র। যে জিনিষ তর্কের বাইরে তাকে তর্ক দিয়ে হারাতে পার, কিন্তু গড়তে পার না। সেদিন যে দ্রাক্ষাগুচ্ছ রসে শোভায় আমার রসনা সিক্ত করে তুলত, সেই গুচ্ছ এতদিন পরে শুধু সেই গুচ্ছ বলেই কি আকর্ষণ করতে পারবে? কোথায় তার স্বাদ, তার সুবাস? তুমি বইপড়া বালক, তাই বুঝছ না যে আমি পঁচিশ বছর বয়সে এসে ঠেকে রয়েছি এবং সে জন্মই আজ ঠকে গিয়েছি। বিদেশে ছিলাম যতদিন ঠিক ছিলাম; বেহিসাবী হয়ে দেশে এসে বেঠিক কাজ করে ফেলেছি।

এর পর আর কথা চলে না। চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ তার হিসেব নেই। শুধু চাঁদ মাথার উপর দিয়ে উঠে অন্যদিকে হেলে যেতে লাগল; জ্যোৎস্নার বান আশেপাশে জলরাশিতে নূতন নূতন আলপনা কাটতে লাগল, আর যে চত্বরে বসে অতীতে বিখ্যাত প্রেমিক ক্যাসানোভা তার অসংখ্য প্রণয়িনীদের প্রেমপত্র লিখত এবং তার চারদিকে ধান্যলোভী পায়রার দল অশ্রান্ত কলগুঞ্জনে অলস দ্বিপ্রহর-গুলিকে চঞ্চল করে তুলত—সেই চত্বরের এক পাশে জলের ধারে আমি বেদনায় বিবশ হয়ে বসে রইলাম।

ধীরে ধীরে ক্রণোর মতটার জন্ম একটা ব্যথাভরা করুণতা অনুভব করতে লাগলাম। সত্যই ত। জীবনের উষার যে অধরোষ্ঠ রক্তগোলাপের পাঁপড়ীর মত সরস লোভন ছিল, মধ্যাহ্নতাপের পর অপরাহ্নের রৌদ্রপীড়িত সে পাঁপড়ীতে যে উষারই স্বপ্ন দেখে চলেছে সে এখনো সার্থকতা খুঁজে পাবে কি করে? হায়! প্রেমিকপ্রেমিকারা সময় সাগরতীরে বসে বালুসৌধ গড়তে ভালবাসে, কিন্তু সে সাগর ত সে দিনের জলরাশিকে সেখানেই রেখে যায় না। ইহলোকে কারো প্রেমের অপেক্ষা করবার অবসর নেই। আজ হচ্ছে সত্য, বর্ত্তমান সত্য;

আগামী কালই সে হয়ে যাবে অতীত ও মিথ্যা। কবি গেয়ে গেছেন অনন্ত প্রেমের মহিমা, কিন্তু মানুষ চেয়ে যায় আজকের সান্ত প্রেমের সুষমা। দ্বিতীয়টি ত প্রথমটির চেয়ে বিন্দুমাত্র কম সত্য নয়।

হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি ক্রণো নেই। অধীর হৃদয়তার লাঘব করে কখন বোধ হয় সে অলক্ষিতে উঠে গেছে। অন্তরকে খুলে দেখানর সংকোচে সে বোধ হয় আর আমার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করতে চায় নি। এ কথা ভেবে একটু সান্ত্বনা পেল্যম স্নেহসহানুভূতির মায়াকাঠিতে এক জনের মনের দুয়ার খুলতে পেরেছিলাম। এই প্রৌঢ়েরই মত কতজন নীড় বাঁধবার সাধত্যাগ করে প্রিয় গৃহ ও প্রিয়া সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তরে বা আফ্রিকার দগ্ধ উষর অরণ্যানীর মধ্যে। তারপর কতজনেরই যৌবন স্বপ্ন হয়ত এরই মত করুণভাবে সমাপ্ত হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনার অজ্ঞাতসারেই বের হয়ে এল। ভেনিসের জলরাশি সে নিঃশ্বাসে দুলে উঠল। সমগ্র মধুরজনী সে দীর্ঘশ্বাসে সাড়া দিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠেই সেই কথাগুলি আবার হৃদয় মথিত করে উঠতে লাগল। ক্রণোর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এ ভুলের জন্য তার অবশিষ্ট জীবন সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হবে; ক্লারেটাও কম কষ্ট পাবে না। বৃথাই আমি শেলী রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, যদি তার এই ভুলটা তাকে না বুঝিয়ে দিতে পারি। তাকে এখনই খুঁজে বের করতে হবে। জ্যোৎস্নার আলোকে লোকে অবাস্তব ও সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে একটু বেশী করেই, দিনের আলোয় বাস্তব দৃষ্টিপথ বের করে নিতে পারে। তাই তাকে আজ সকালেই বোঝাতে হবে তার ভুলের কথা।

ভুল, নিশ্চয়ই ভুল। আমায় সে বাইশবছরের বই-পড়া বালক বলে মনে করে, কিন্তু সে জানে না বইয়ে কত সময় সত্যের আলো দেখতে পাওয়া যায়। কোনক্রমে প্রাতরাশ শেষ করে ছুটলাম খালের পারে। এবারে আর সোনার পাথরবাটী ইঞ্জিনে চালান নৌকায় কোন আপত্তি বোধ করলাম না। রিয়াল্টো সেতুর পাশে সেই রেস্তোরায় গিয়ে ক্রণোর ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি বের করতে হবে। কি জানি যদি সে এতক্ষণে আবার দূরদেশে পাড়ি দিয়ে থাকে। বলা যায় না।

রিয়াল্টোর ঘাটে নেমে ক্লারেটার রেস্তোরাঁয় যেতে একটু ইতস্তত বোধ করলাম। ওকে কি করে জিজ্ঞেস করব ক্রণোর কথা? কি না জানি ভাববে। অথবা হয়ত লজ্জা পাবে। বুঝতে কি আর পারবে না যে আমিও তাদের কাহিনী একটা মোহিনী রাতের মায়ার সুযোগ নিয়ে জেনে ফেলেছি?

সন্তর্পণে ঘাটের পাশে একটা ছোট কেক বিস্কুটের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম—জান কি ওই রেস্তোরাঁয় যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ক্রণো কাল এসেছিল সে কোথায় থাকে? যে ক্রণো মাত্র কাল বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে এখানে, সেই ক্রণো?

দোকানী অবাক্ হয়ে গেল। বলল—ক্রণো ত মশায়, এখানে একজনই আসে; ওই রেস্তোরাঁর বুড়ীর সঙ্গে খুব ভাব; রোজই আসে আর যা জুয়ো খেলতে পারে,মশায়। যেমন জুয়ো খেলে,তেমনই 'কিয়ান্তি' খায়। ওস্তাদ, পাঁড় ওস্তাদ। এ কথা বলেই খাস ইটালীয় নটবর ভঙ্গিতে দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিভ রেখে রসিকতা সূচক একটা শব্দ করল।

আমি একটু অধীর হয়ে বললাম—না, না সে নয়। যে কালই মাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছে তার কথা বলছি।

দোকানী বলল—ও তো একই লোক, সিনর। যদিও পড়ুয়া লোক, পেটে ভাল ভাবে 'কিয়ান্তি' পড়লে সে অনেক দেশই ঘুরে আসে। কাল বুঝি সে আপনার খরচায় পেয়েছিল?

সত্যিই ত। কাল তার কাহিনী শুনবার প্রলোভনে তাড়াতাড়িতে তার বিলটা আমিই মিটিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিছু শুনতে ভাল লাগল না। ধীরে ধীরে সরে গেলাম।

আস্তে আস্তে সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠতে লাগল। কিছুই ভাল লাগছে না। এলোমেলো মন নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শেষে ক্লান্ত হয়ে লিডোর সমুদ্র স্নানের সৈকত ছাড়িয়ে একটা উদ্যানকুঞ্জে এসে ঝাউ গাছের ছায়ায় বসলাম। নীল আকাশ, নীল জল, মনে বেদনার নীল আভাস। সিক্ত সমীরণ ধীরে ধীরে আমার মানসিক ও দৈহিক অবসাদ মুছে দিতে লাগল। ক্রমে নিজেকে আবার গড়ে নিলাম।

সেই গড়ে নেবার ক্ষমতাটাই সত্য বলে মনে হল। ক্রণো আমায় ঠকিয়েছে; ভেনিসের পূর্ণিমা রজনীর বিহ্বলতা আমায় ঠকিয়েছে। কিন্তু, কিন্তু হোক্ সে প্রবঞ্চনা। না হয় লোকে মনে করুক যে অনভিজ্ঞের উপর বারুণীর প্রভাবেই এমন একটা বোকামী সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞ ও কাজের লোকরা অনুকম্পা করে একটু মৃদু হেসে আমার কালকের রাত্রিটিকে সম্মান দেবেন। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যে বিডেকারের ভ্রমণ গ্রন্থে লেখা 'প্রাসাদের রাজপুত্রী' বা 'দুর্গম দুর্গের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ' প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী বিশ্বাস করে লোকে তাকে বোকাই বলবে। ও সব কাজ ভদ্রোচিত অর্থাৎ "রেস্পেক্টেবল" নয়।

না হোক্। তবু আমি সেই গল্পে এখনো বিশ্বাস করি। না করে উপায় কি? ক্রণো ও তার তাজের প্রেম কাহিনী শুনে রাত্রিতে ঘুম আসছিল না মোটেই। অধীরভাবে পাইচারী করতে করতে আমি একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম ক্রণোর তাজকে উপহার দিব বলে।

> ধরণীর ধূলি প্রেম
>
> মরণেরে দিল অমরতা
>
> নিরুপায় নিরজনে
>
> রাখি গেল তোমার বারতা;
>
> মর্মরের মর্ম মাঝে
>
> দিয়ে গেনু জোছনা আখরে
>
> অনন্ত কালের পাতে,
>
> সান্ত মোর জীবন স্বাক্ষরে।

সে কবিতার পিছনে যে অনুভব ছিল তা ত মিথ্যা নয়।

সে গল্পে বিশ্বাস না করে উপায় কি? ভেনিসে যে মদির চাঁদিনী রাতে সুনীল জলরাশি এখনো গণ্ডোলার আশে পাশে মায়া জাল বুনতে বুনতে চলে। সে সব স্মৃতি সব সময় মনে আসবে না। যদি বা আসে, দিবা স্বপ্নের মত অলীক বলে তাদের মনে হবে। প্রেমকে যে সর্ব্বথা পরিহার করে চলা উচিত সে কথা বহুবার নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েছি। হয়ত আর কখনো কোন বিধুর নিশীথে চোখে স্বপ্নের অঞ্জন ও হৃদয়ে সহানুভূতির করুণতা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসব না, কাজের ভিড় ঠেলে কোন প্রেমকাহিনীর অস্ফুট আবেদন মনের গহন ভরে উঠবে না। সম্ভবত ভেনিসের রাত্রিগুলি শুধু স্বপ্নই। কিন্তু সে রাত্রিটি ত স্বপ্ন নয়।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

শ্রীউর্ম্মিলা দাশ এম-এ

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মেয়েদের ভালোমন্দ, সুখ দুঃখ, অন্তর্দ্বন্দ্বকেই আপনার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখনীতে তাই ফুটে উঠেছে আমাদেরই ব্যক্তিগত ঘরোয়া সাধারণ জীবনের নানা বৈচিত্র্য।

নারী হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ, বেদনা, প্রেম ও মাতৃত্ব, আত্মবলিদান যাঁর তুলিতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে তাঁকে স্মরণ করেই আজ আমি আপনাদের কাছে দুএকটি কথা বলতে চাই। আমাদের বাস্তব জীবনে শরৎ-প্রতিভাকে আমরা কতটুকু মূল্য দিয়েছি কিংবা দেওয়া সম্ভবপর, সেকথাটি আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রের অসাধারণত্ব সম্বন্ধেই আমি কিছু বলতে চেষ্টা করব।

তাঁর অঙ্কিত নারী-চিত্র গুলিকে সম্ভবত মোটামুটি ৩ ভাগে ফেলা যেতে পারে। প্রথম আমাদের সামাজিক পরিবেষ্টনে, সীমাবদ্ধ গৃহিণীত্বের মধ্যে যাঁদের পরিচয় আমরা পাই। যেমন পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, দত্তা প্রভৃতি। ২য় স্তরে পাই তাঁদের ছবি যাঁরা অন্যায় না করে, সামাজিক রীতিনীতি পালন করেও আমাদের ভুলের জন্যই চির-নিন্দিত হয়েছেন। যেমন বড়দিদি, বিরাজ-বৌ, অন্নদা, ষোড়শী, রমা, সরযূ। সর্বশেষে আমি তাঁদেরই উল্লেখ করছি যাঁরা মানব ধর্মের, নারী ধর্মের সত্যিকারের সীমা লঙ্ঘন না করেও কুলত্যাগিনী, অস্পৃশ্যা বলে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম অভয়া, তারপর রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলা, কমল, বামুনের মেয়ে জ্ঞানদা ও সন্ধ্যা।

প্রথম স্তরের সাধারণ পারিবারিক জীবনে যাঁরা চরিত্রের সবলতায় ও মাধুর্যে আপনাদের ব্যক্তিত্বকে সাধারণের চেয়ে অনেকখানি উঁচুতে তুলে ধরেছেন যেমন বিন্দু, কাদম্বিনী, পোড়াকাঠ, শৈল, আমাদের বাস্তব জীবনে তাঁদের দেখা আমরা অনেক জায়গায় পেয়ে থাকি। স্নেহে, কোমলতায়, তেজস্বিতায়, কর্তব্যপরায়ণতায় তাঁরা আমাদের চির-নমস্য। সেই প্রাচীন যুগ থেকে এঁদেরই বন্দনা-গান ধ্বনিত হচ্ছে। কাজেই এঁদের কথা আর বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

তারপরে যাঁদের উল্লেখ করছি তাঁরা আমাদের অজ্ঞতা ও ভুলের জন্য, দুঃখ, লাঞ্ছনা, সমাজের দণ্ড বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেছেন। উদারতায়, বলিষ্ঠ সাহসিকতায়, আপন হৃদয়ের ঐশ্বর্যে নির্বিবাদে তাঁরা তিলে তিলে আত্মবিসর্জন করেছেন। যেমন মাধবী, রমা, অন্নদা। এই অন্নদা দিদির চরিত্রের একনিষ্ঠতা ও মাধুর্য্যের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে বৈদিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পতিব্রতা সাধ্বীর সঙ্গেই এঁকে শ্রদ্ধা জানানো যায়। তিনি ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বললেন "কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বই ত নয়। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই জানিল, সবাই শুনিল, "অন্নদা কুলত্যাগ করিয়াছে" আমাদের সমাজে এঁদের মত চরিত্র বিরল নয়। রীতিনীতির যূপকাষ্ঠে অনেক অন্নদা, মাধবী, রমা, হেম নিজেদের নীরবে বলি দিয়ে থাকেন। সে আদর্শ ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্নের উত্তর আশা করি শরৎচন্দ্র একদিন আপনাদের কাছ থেকেই পাবেন।

তৃতীয় পর্য্যায়ে যাঁদের নাম করছি তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি সমস্যা। সামাজিক জীবনের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছাড়িয়ে মেয়েদের কোন সার্থক সম্মান লাভ হ'তে পারে কিনা, আজকের দিনে এ প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে ভেবেছেন তারই আভাস দিতে চেষ্টা করব। তাঁর নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, একথা বলা চলে না। অভয়ার জীবনের জটিলতা যে কত কঠিন কত গভীর সেটা তার দুএকটা উক্তি থেকেই বোঝা যাবে। অনাথা, অসহায়া, কপর্দকশূন্য অভয়া, বহুদিন—ব্রহ্মপলাতক স্বামীর নিকট উপস্থিত হয়ে লাভ করল বেত্রাঘাত। এ সম্বন্ধে শ্রীকান্তের সঙ্গে তার যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে দুএকটি কথা আপনাদের বলছি। স্বামীর কর্তব্য জ্ঞানের উল্লেখ করে অভয়া বলল "অর্থহীন মন্ত্র আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল—কিন্তু সেকি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারই উপরে? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী, স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব

ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? সব জাতে সব ধর্মে এ অবিচারের প্রতিবাদ আছে—হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হয়ে গেছে? অভয়ার এই প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরই একদিন দিতে হবে।

তারপর রাজলক্ষ্মী একনিষ্ঠতায়, আত্মত্যাগে, কোমলতায় আমাদের অন্তরে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। সমাজের অত্যাচারে একরাত্রে এক কুলীন পাচক বামুনের হাতে রাজলক্ষ্মী ও তার বোনকে সমর্পণ করা হ'ল, মন্ত্র পড়ে। কিন্তু তার সত্যিকারের মর্য্যাদা যে কার ওপরে নির্ভর করছিল সেকথা রাজলক্ষ্মীর মুখ থেকেই শুনব। শ্রীকান্তকে সে লিখেছে "পেয়েছিলুম তোমাকে অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়, আমাকে ত্যাগ করার অধিকার তোমার হাতে নেই। ফুলের বদলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম। বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায়, তোমার বুকের পরে রক্ত-রেখায় যে লেখা এঁকে দিতো, সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁচেছিল। তাঁরপরে এলো আমার দুর্দ্দিনের রাত্রি, কলঙ্ক দিলে দুচোখের সকল আলো নিভিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?" শ্রীকান্তের জন্য এই সীমাহীন একনিষ্ঠ ভালোবাসা সামাজিক কষ্টিপাথরে যাচাই করে এর ভালোমন্দ বিচারের ভার শরৎচন্দ্র আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

কমললতার বিচার লেখক একটুখানি নিজেই করেছেন বলে মনে হয়, কারণ মিথ্যা অপবাদে কমললতার আশ্রম ছেড়ে যাবার সময় আশ্রমের বড় গোঁসাইএর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, তিনি বললেন "নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি তবে মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ পথে আসা।" শেষ বিদায়ের ক্ষণে কমললতার কথা থেকেও তার কিছু পরিচয় পাই। শ্রীকান্তকে সে বলল "আমি জানি আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও—এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।" ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাও কমললতার কম ছিল না, সে রাজলক্ষ্মীকে চিঠিতে লেখেছে "সুখেই আছি বোন্, যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার দায় যে তাঁদের ভাই!" বৈষ্ণব কবির নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণের ভাবটিই এখানে সুন্দর, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সাবিত্রী চরিত্রের শুচিতাই কি কম? সতীশের একাগ্র ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে সে বলল "না আর একটি কথাও না, তোমার দেহটাকে ত তুমি পূর্ব্বেই নষ্ট করেছ, সে না হয় একদিন পুড়েও ছাই হ'তে পারবে, কিন্তু একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালী মাখিয়ো না।" সাবিত্রীর এই আত্ম-বিসর্জন ও নিষ্ঠাই ওকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই চরিত্রের ভালো মন্দ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু যেটুকু বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে আমি সেটুকুই আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি।

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের কমলকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এই গ্রন্থে তিনি যে একটা সমস্যার সমাধান কর্ত্তে চেয়েছেন সেটা খুবই সত্যি। তাঁর মনোগত একটা বিশেষ আদর্শকেই তিনি কমলের মধ্য দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন। কমল কারো কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে না। নীতি নিয়মের, সমাজের অনুশাসনের বাইরে ও যে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকতে পারে, চিরন্তন প্রথা অবমাননা করলেই মানুষ ছোট হ'য়ে যায় না, মানুষে মানুষে একটি সরল সত্যিকারের বন্ধন থাকতে পারে এ সবেরই ইঙ্গিত তিনি কমলের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কমলের মনে আত্মসম্মান, মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধারও যে অভাব ছিল না তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকার ও সীমা যে কোথায় পৌঁছুতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি একটু আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। নীলিমার উক্তি থেকে আমরা কমলের একটু পরিচয় পাই। বেলার পরিত্যক্ত স্বামীর অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে নীলিমা বলল "ওঁর অবস্থায় কমল কি করত, তা সেই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ কর্ত্তে গেলে আজ ওঁকে কুলী মজুরদের জামা সেলাই করে আহার সংগ্রহ কর্ত্তে হোত—তাও হয়ত সবদিন জুটত না। কমল আর যাই করুক, যে স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জানিবারণ করে বাঁচতে চাইত না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরত।" মেয়েদের সম্মানিত সম্বন্ধ কিরূপ হ'তে পারে সেটাও এ থেকে আমরা খানিকটা বুঝতে পারি।

আমাদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে শরৎচন্দ্র কতদিক থেকে যে ভেবেছেন কমলের কথায় তা ধরা পড়ে। শিবনাথ সম্পর্কে অজিতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কমল বলেছে "নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দ্দেশের ভার নারীর পরেই থাক্। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই—মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ, কলুষিত হ'য়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে মামলার আর নিষ্পত্তি হ'তে পেলে না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অজিতবাবু, দু'পক্ষের সর্বনাশ করে।" সামাজিক রীতি নীতির বিরুদ্ধে কমলের বিদ্রোহ নীলিমার মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—"ওর মত বেপরোয়া হ'য়ে উঠতে আমরা পারিনে। কারণ জগৎ সংসার যে কালী গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই। সমাজের অত্যাচারে জ্বলে মরেছি কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা ত আজকাল নরনারীর মুখে মুখে—কিন্তু ঐ মুখের বেশী আর এক পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েছি স্বাধীনতা তত্ত্ব বিচারে মেলে না—কেউ কাউকে দিতে পারে না, দেনা পাওনার বস্তুই এ নয়; কমলকে দেখলেই বোঝা যায়—এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে।"

শরৎচন্দ্র নারীত্ব ও মাতৃত্ব নিয়েই তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই যে কয়েকটি ছবি আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি তা নীতির মাপ কাঠিতে, মনুষ্যত্বের বিচারে ভালো কি মন্দ—তার বিচার আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৬

পরদিন প্রাতে, যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন প্রভাতের অরুণিমা আমার কক্ষে ও আমার শয্যার উপর তাহার অমল স্নিগ্ধ স্বর্ণাভা অনেকটা ছড়াইয়া দিয়া একটা মুগ্ধ সৌন্দর্য্যের সূচনা করিতেছে। বাহিরে উচ্ছল জীবন প্রবাহ জাগিয়া উঠিয়াছে—সর্ব্বত্র মুখর সজীবতা—ব্যাকুল চাঞ্চল্য। আলোকে, বর্ণে, শব্দে, সেই তরুণ চেতনার স্পন্দন আমার এই নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া আঘাত করিতেছে। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দে দাঁড়াইলাম। গৃহপ্রাঙ্গণের উপবনের অপর পারে, রাজপথে, জনস্রোতের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, সকলই সজীব, সচেতন, সচঞ্চল। প্রভাতের অরুণালোকে একটি ক্ষুদ্র বিহঙ্গম তাহার কলকাকলীতে নীলিমা প্লাবিত করিয়া দুইটি ক্ষুদ্র পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক অনন্তের বক্ষে অভিযান করিয়াছে। অসীমের বক্ষে এই ক্ষুদ্রের অভিযান, অনন্ত কলস্রোতে ক্ষুদ্র মানবজীবনের মত, সমুদ্র বক্ষে বুদ্বুদের মত—অনন্ত পথের যাত্রী, আকস্মিক, উদ্দেশ্য-বিহীন, অনিশ্চিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্রের চাঞ্চল্য, সুবিশাল স্তব্ধ প্রভাতের আকাশকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষণিক স্পন্দন, এই মুহূর্ত্তের উদ্বেলন যাহা অনন্তের স্তব্ধতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, যাহা মৌন ও মূককে মুখর করে, সে রহস্যময়ী শক্তি কি?—কে বলিয়া দিবে? তমসার অন্ধ জয়ন্তীর উপর এই আলোক সম্পাত কোথা হইতে হয়? এই জীবনরশ্মির রেখা জড়কণায় সঞ্চার করা মানবের সাধনার এখনও বহু দূরে। কিন্তু এই রহস্যময়ী দীপ্তিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে এই ক্ষুদ্র মানবের সামান্য শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

গত রাত্রে আমরা দুইটি জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছি। ভগবান্ তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধের উপদেশ আমাদের ক্ষণিক জল্পনা কল্পনার ফলে ভঙ্গ করিতে হইল। প্রাণহনন হইতে বিরত হইতে ভগবান্ তথাগত যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা কি গত রাত্রের চর-মারণ বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারিত?—গুপ্তচরদিগের প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর কোনও উপায়ে কি ইহাদের এই সাধারণের অনিষ্টকর বৃত্তি হইতে নিরস্ত করিবার উপায় ছিল না?—কিন্তু তাহাদের এই ঘৃণ্য ও হীন এবং জন-সমাজের অমঙ্গলজনক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিবার অন্য পন্থা আর কি ছিল?—যদি কেহ সাধারণের উৎপীড়নে দৃঢ়ব্রতী হয় এবং তাহার প্রচেষ্টায় যদি বহু নিরপরাধ ব্যক্তির জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে, কিংবা তাহার প্রয়াসের ব্যর্থতাসাধনে জনসমাজকে একটা অবশ্যম্ভাবী ও সমধিক অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে যে কোনও প্রকারে উহা সম্পাদন আবশ্যক। আর, যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মানবের হিতকল্পে ব্রতধারণ করিয়াছে, সেই সর্ব্বহারার দলকে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে দুই একজন ঘৃণ্য, নীচ, স্বার্থপর মনুষ্য নামধেয় জীবের জীবনস্পন্দন যদি চিরতরে রোধ হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ।—ইহা হত্যা নহে—ইহা একটা বৃহত্তর পাপানুষ্ঠানের প্রতিরোধ।—জনসাধারণের উপর একটী ব্যাপক অত্যাচার ও উৎপীড়নের নিরাকরণ—একটা ভাবী ভীষণ ও সাধারণ রক্তপাতের প্রতিবিধান—বিষ বৃক্ষের অঙ্কুর বিনাশসাধন। কিন্তু প্রাণাতিপাত—না, ইহা প্রাণাতিপাত হইতেই পারে না—মানবের হিতকল্পে ইহা চরম উৎসর্গ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুর মত এই সকল ক্ষুদ্রতর হীন মনুষ্য নামধেয় পশুর বধসাধন বিধেয়—সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠেয়।

কিন্তু প্রাণাতিপাত—হত্যা—চিরকালই হত্যা। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া—একটা মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যপদেশে ইহার ঔচিত্য প্রদর্শন করা কি হত্যাকারীর আত্মপ্রবঞ্চনা নহে? হত্যা যে জন্যই সম্পাদিত হউক, উহা হত্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে।—দীপ নির্ব্বাণ

সংসাধিত হইল—সে দীপ ইঙ্গুদী তৈল দীপই হউক, বা এরণ্ড তৈলে সে দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকুক, অথবা রাজপ্রাসাদ কক্ষ উদ্ভাসিত করিবার জন্য বহুমূল্য গন্ধ তৈলে সুসজ্জিত দীপই হউক, কিংবা মৃৎপ্রদীপ বা সুবর্ণ বর্তিকাধারই হউক।

কিন্তু, আজ আমার চিত্ত এত চঞ্চল হইবার কারণ কি? যাহাদের জীবনে যবনিকাপাত হইল, তাহারা যদি আজ কোনও প্রকারে মুক্তি পাইয়া সংসারে সক্রিয় থাকিত, তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রচেষ্টা হইতে হয়ত কখনই বিরত হইত না; কারণ ইহাই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল এবং ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র অভীষ্ট ছিল। তাহাদের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে কত নির্দ্দোষ, নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক নরনারী বিপর্য্যস্ত হইয়া ইহসংসার হইতে অপসারিত হইয়াছে।—তাহাদের গণনা কে করিয়াছে? না—ইহাদের দণ্ডবিধান ঠিকই হইয়াছে—ইহাতে অনুশোচনার কিছুই নাই।

আর ধর্ম্ম ও সংঘের রক্ষাকল্পে, আর্ত্তের ত্রাণের জন্য এবং জনসাধারণের মাৎস্যন্যায়ের কবল হইতে মুক্ত করিতে যে ব্রত আমরা ধারণ করিয়াছি তাহাতে দণ্ডনীতি অনুসারে অত্যাচারীকে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারণ করা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। নিরপরাধ ও নিরীহ আর্ত্তকে ত্রাণ করিতে যদি আমরা বিরত থাকি তবে আমাদের এই ব্রত-গ্রহণ নিস্ফল ও ব্যর্থ। দুষ্কৃতদিগের দণ্ডবিধান না করিলে উৎপীড়িত আর্ত্তের ত্রাণ সম্ভব নহে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডনীতিতে চরম দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা আছে। গত কল্য চরগণের দণ্ডবিধান তদনুসারেই হইয়াছিল।

যাহা করিয়াছি তাহা ঠিকই করিয়াছি। ইহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ ন্যায়বিচারেই হইয়াছে। আমাদের ব্রতের সাফল্যের জন্য দণ্ডনীতি প্রয়োগ অনেক বিষয়ে ও অনেক সময়ে আবশ্যক।

ঠিকই হইয়াছে।—দণ্ডনীতির প্রয়োগ যথা নিয়মেই হইয়াছে। ইহারা মানবের শত্রু। সমাজকে বিপর্য্যস্ত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। নীতিজ্ঞগণ মন্ত্ররক্ষা সম্বন্ধে যে বিধান করিয়াছেন তাহা যে অত্যন্ত সুচিন্তিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর মন্ত্রভেদ প্রচেষ্টায় যে প্রতিবিধান করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ সমীচীন। এই চরগণ অত্যাচারের অভিনব উপায় উদ্ভাবনের পথপ্রদর্শক। ইহাদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা মাৎস্যন্যায়ের বীজ বপন করে; বিদ্রোহের সৃষ্টি ইহাদের দ্বারাই হয়; অবাঞ্ছিত বিপ্লবের অকাল-প্লাবনের পথ পরিমুক্ত করা ইহাদেরই কার্য্য।

আর ইহা ত আমার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আমি শপথ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—যদি আবশ্যক হয় আর্ত্তের ত্রাণকল্পে উৎপীড়িতকে বিধ্বস্ত করিব।—এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—আমি আমার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সুসংযতভাবে এবং দণ্ডনীতির অনুজ্ঞা ও বিধান অনুসারে পালন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি; তবে আমার আজ এই চাঞ্চল্য কেন? বোধ হয় ইহা দুর্ব্বলতা, প্রাচীন এবং আজীবনের শিক্ষার ও চিন্তাধারার সহিত অভিনব নির্দ্দেশের সংঘাত। যাহা করিয়াছি তাহা ভ্রান্ত অনুষ্ঠান নহে—স্বার্থান্ধ কর্ম্মবিচ্যুত নহে।

আমি অলিন্দ হইতে নিম্নে অবতরণ করিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহ-প্রাঙ্গণের একটি প্রস্তর বেদিকায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, এমন সময়ে প্রজ্ঞা ও শেখর আসিল। তাহারা আসিয়া বেদিকায় আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। শেখর প্রত্যহ প্রাতে কপিশায় স্নান করিতে গিয়া থাকে এবং আমাদের ঘাটেই সে স্নান করে; অদ্যও সে তেমনিই গিয়াছিল এবং নদীতীরে তাহার প্রাত্যহিক সূর্য্যোপাসনা সমাপন করিয়া, সঙ্কর্ষণ বাসুদেব মন্দিরে বাসুদেব পূজা সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। পথে আমার সহিত তাহার দেখা করিবার ইচ্ছা হইল এবং আসিবার সময়ে বাটীর দ্বার সন্নিকটে প্রজ্ঞার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। প্রজ্ঞাও আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল। আমরা তিনজনে বহির্বাটীর একটি কক্ষে একত্রে বসিলাম।

শেখর বলিল, "অদ্য প্রাতে নগরে একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে! প্রত্যূষে নগর কোটাল ঘোষকের দ্বারা নগরের পথে পথে প্রচার করিয়াছে যে নগর হইতে দুইজন যখন অদৃশ্য হইয়াছে এবং একদল বিজাতীয় বেশধারী ও অজ্ঞাত ভাষাভাষী—সম্ভবতঃ একদল পার্ব্বত্য দস্যু আসিয়া তাহাদের গৃহের তৈজসপত্র ও অপর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি কেহ তাহাদের সন্ধান বলিয়া

দিতে পারে বা তাহাদের সন্ধানের সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে সে পঞ্চশত সুবর্ণ দীনার বা বিবেচনানুসারে ততোধিক পুরস্কার পাইবে। এ ঘোষণা তুমি শুনিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম, "না শুনি নাই।—অদ্য প্রত্যুষে উঠিতে পারি নাই—বিলম্ব হইয়াছে—কিংবা, হয়ত ঘোষক এখনও এ পথে আসে নাই।"

ঠিক এমনই সময়ে একটা তূর্য্যধ্বনি শ্রুত হইল এবং তৎপরে ক্ষত্রপের এই অভিনব অনুশাসন যাবনিক ও গান্ধারের সাধারণ প্রচলিত উভয়বিধ ভাষায় বিঘোষিত হইল। এই উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত ঘোষণা আমরা সকলে শুনিলাম।

আমি বলিলাম, "এইরূপ একটা গোলযোগ যে উঠিবে তাহা ত আমরা সকলেই জানি—তাহার জন্য চঞ্চল ও অধীর হইয়া কি হইবে?"

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষণাটা লিপিবদ্ধ করিলে হয় না?"

আমি বলিলাম, "তাহার ত আমি কোনও আবশ্যকবোধ করিতেছি না।"

প্রজ্ঞা বলিল, "ভবিষ্যৎ কার্য্য সূচনায় আমাদের ইহা আবশ্যক হইতে পারে না কি?"

আমি বলিলাম, "আমাদের কার্য্যসূচনার সহিত ইহা কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট নহে। এই সকল বাধা বিঘ্ন আকস্মিক এবং গত কল্যের মত সেই সকল বিঘ্ন নির্ম্মূল ও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। আর গত কল্যের ঘটনার পর এইরূপ ঘোষণা ত স্বাভাবিক। ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে আমাদের ত কোনও লাভই নাই—এবং বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ বিপদ?"

আমি বলিলাম, "এই লিপি যদি কোনও প্রকারে হস্তান্তরিত হয় ও অবশেষে যদি ক্ষত্রপের কোনও গুপ্তচরের হস্তগত হয়, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার মিশ্রিত করিয়া সংঘের কর্ম্মপন্থার নূতন বাধা সৃজন করিতে পারে। কেমন?—ইহা সম্ভব নয় কি?"

প্রজ্ঞা বলিল "হাঁ, নূতন বিঘ্নের সৃষ্টি ইহা হইতে অসম্ভব নহে।"

শেখর বলিল, "কিন্তু যদি আমাদের সংঘের ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য এই ঘোষণার আবশ্যক হয় তখন আমরা কি করিব?"

আমি বলিলাম, "এই ঘোষণা আমাদের কর্ম্মপন্থার কখনও কোনও প্রয়োজন হইবে না। ইহার মূল আমরা উচ্ছেদ ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছি।—গত কল্যের ঘটনা একটা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া যাও।—আর যদি ইহার আবশ্যক হয় ত ইহা আমার সম্পূর্ণ স্মরণ থাকিবে।"

প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিল, "সমগ্র অনুশাসন উভয়বিধ ভাষায় তুমি স্মরণ রাখিতে পারিবে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, পারিব। পরীক্ষা কর; শুন তবে আমি বলিয়া যাইতেছি?"

আমি সমগ্র ঘোষণা আদ্যোপান্ত উভয়বিধ ভাষায় আবৃত্তি করিলাম। শেখর ও প্রজ্ঞা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শেখর বলিল, "তুমি শ্রুতিধর—আর তুমি ঠিকই বলিয়াছ। যখন অনুশাসনের মূল আমরা উচ্ছেদ করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়াছি, তখন তাহাতে আর আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহার কোনও প্রয়োজন হইবে না।"

কিন্তু প্রজ্ঞা এই ঘোষণা লিখিয়া রাখিবার পক্ষে তর্ক উত্থাপন করিল। সে বলিল, "ইহার প্রয়োজন হইবে না এরূপ কথা ত বলিতে পার না—ভবিষ্যতে ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা এখন বলিতে পারা যায় না। হয় ত, আবশ্যক হইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "আমি ত বলিতেছি আমার স্মরণ থাকিবে—আর তাহার প্রমাণও ত আমি দিলাম।"

—তাহা ত তুমি দিয়াছ। কিন্তু যদি তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়, তখন যদি সংঘের এই ঘোষণা প্রয়োজন হয়, কোথায় পাওয়া যাইবে?

—তবে লিখিয়া রাখ—কিন্তু, ঐ লিপি তোমাদের আপনার নিকট রাখিবে—দেখিও, যেন কোনওরূপে উহা অপর কাহারও হস্তে গিয়া না পড়ে।—তবে লিখিয়া লও!"

আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, "রাজাধিরাজ ত্রাতা হেরমরাজানুগৃহীত গান্ধার-পুরুষপুরাধিষ্ঠানের ক্ষত্রপ মহা-বলাধিকৃত অমাত্যপদে—"

এমন সময়ে শেখর বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু প্রজ্ঞা,

আমার মনে হয় দেবদত্ত যথার্থ-ই বলিয়াছে—ক্ষত্রপের এই ঘোষণা আমাদের লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোনও সার্থকতা নাই। আর এই লিখন রক্ষা কার্য্যে আমাদের সামান্ত অনবধানতায় একটা মহা অনর্থের সূচনা হইতে পারে। লিখিয়া রাখিয়া কাজ নাই।"

প্রজ্ঞা বলিল, "বেশ তবে থাক্, ইহা আর লিখিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই।"

প্রজ্ঞা ক্ষত্রপ-প্রচারিত ঘোষণা আর লিপিবদ্ধ করিল না, আমিও উহা আবৃত্তি করিতে নিরস্ত হইলাম।

আমরা আমাদের কথাবার্ত্তা সমাপ্ত করিয়া পরস্পরের নিকট তখনকার মত বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় নায়ক পুষ্টপাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে আসিয়া বলিল, "এই যে! তিন জনেই এখানে আছ! নগরে কি হইতেছে তাহার সংবাদ বোধহয়, ইতিপূর্ব্বেই তোমরা পাইয়া থাকিবে ?"

আমি বলিলাম, "ক্ষত্রপের ঘোষণা ত শুনিলাম—আর কোনও সংবাদ ত পাই নাই—আরও কিছু আছে না কি ?"

পুষ্টপাল বলিল, "আছে। নগরের যে অংশে পার্ব্বত্য প্রদেশের এবং তক্ষশিলার বণিক ও সার্থবাহগণ বাস করে সেখানে তাহাদের উপর ভীষণ উৎপীড়ন হইতেছে। নগরপাল ও চৌরদ্ধরনিকের বাহিনী তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—নগরপালের ও চৌরদ্ধরনিকের ধারণা যে, দুইজন যবন এই সকল বিদেশী বণিক ও সার্থবাহগণের দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্ম নগর হইতে অপহৃত হইয়াছে এবং তাহাদের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে।—অন্ততঃ ইহাদের জ্ঞাতসারেই হইয়াছে ও ইহারা হয়ত তাহাদের অনুসন্ধানে সহায়তা করিতে সক্ষম, এইরূপ অনুমান করিয়া নগরপাল এই পীড়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন হইতে ইহাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল ? তুমি কখন এবং কাহার নিকট হইতে এ সংবাদ পাইলে ?"

পুষ্টপাল বলিল, "ইহাদের পল্লীতে কল্যরাত্রি হইতে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে; কয়জনকে ধরিয়া নগরপালের নিকট লইয়া গিয়াছে।"

—এই সকল সার্থবাহ ও বিদেশী বণিকগণের একটা নিগম আছে না ?

হাঁ আছে।—ঐ নিগমে আমাদেরও একটা বিপণী আছে।

—উহাদের অনেকের সহিত তোমরা বোধ হয় বিশেষভাবে পরিচিত।

—হাঁ, উহাদের অনেকের সহিত আমার পিতার এবং আমার পরিচয় আছে। সকলেই প্রায় আমাদের বিপণীতে পণ্য বিনিময়ের জন্ম আসিয়া থাকে। কেহ কেহ তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্ম আমাদের বিপণীতে রাখিয়া যায়।

—তাহা হইলে তুমি ইহাদিগকে বলিও যেন ইহারা এখন কোনও প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন না করে এবং ধৃত ব্যক্তিগণ যে নিরপরাধ তাহা তাহারা ক্ষত্রপের গোচরে যেন আনয়ন করে। শেখর, আর্য্য জ্যেষ্ঠতাত ইহাদের মুক্তির জন্ম কি চেষ্টা করিবেন ?

শেখর বলিল, "ক্ষত্রপ বিচারকার্য্যের সময়ে পিতাকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্ম অনুরোধ করেন। ধৃত ব্যক্তিগণের বিচারের জন্ম অদ্য অপরাহ্নেই হয়ত সভা আহূত হইবে। এতক্ষণে হয়ত ক্ষত্রপের সভায় উপস্থিতির জন্ম অনুরোধপত্র পিতার নিকট আসিয়া পঁহুছিয়াছে। পুষ্টপাল, মণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় জনকয়েককে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে বলিবে।

পুষ্টপাল বলিল, "আমি এখনই বিপণীতে গমন করিয়া সার্থবাহ নিগমের কয়েকজন নেতাকে ডাকিয়া আনাইয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া দিতেছি।"

শেখর বলিল, "তাহাদের নিজের ভাষায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে বলিবে। পিতা তাহাদের ভাষা অতি উত্তম-রূপেই জানেন।—গান্ধারের ভাষায় তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে হয়ত এই সার্থবাহগণ ততটা সক্ষম হইবে না।"

আমি বলিলাম, "শেখর ভাই, তুমিও এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিও! জ্যেষ্ঠতাতকে বুঝাইয়া বলিবে যে ধৃত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ, বিনাপ্রমাণে ও ভিত্তিহীন সন্দেহে এই সকল বিদেশী বণিকগণ ধৃত হইয়াছে।"

—আমি এখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি।—পুষ্টপাল, এই বণিক নেতৃমণ্ডলীকে পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্ম মধ্যাহ্নে আমাদের গৃহে যাইতে বলিবে।

আমি বলিলাম, "তবে, তাহাই হউক—বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন।"

শেখর ও পুষ্টপাল উঠিল। আমরা তখনকার মত পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে সার্থবাহ পীড়ন নামক ষোড়শ বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছয়

জংলা বাগানটায় অজস্র ভাঁট ফুল ফুটেছে। বেগুনি রঙের হালকা একটুখানি ছোঁয়া-লাগা রাশি রাশি শাদা ফুলে যেন চারদিক আলো করে দিয়েছে, মধুর একটা বুনো গন্ধ যেন সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রেললাইনের ওপারে একটা ন্যাড়া মুড়ো মাদার গাছ—এখান থেকে মনে হয় তার সারা গায়ে রঙের ছিটে। আমের মুকুল থেকে শুকনো পাতার ওপরে টপ টপ করে মধু পড়বার শব্দ। বসন্ত।

রঞ্জু চুপ করে ছাই গাদাটার পেছনে বসে ছিল। উড়তে উড়তে হঠাৎ এল হলদে রঙের একটা বড় প্রজাপতি, সেয়াকুল কাঁটার হলদে ফুলের দুটো উড়ন্ত পাপড়ি যেন। কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল নীলাভ কালো রঙের মস্ত বড় একটা ভ্রমর। গোটা তিনেক শালিক পাখি নাচতে নাচতে এগিয়ে এল, কিচ্ কিচ্ করে রঞ্জুকে যেন জিজ্ঞাসা করলে, কী ভায়া, এমন চুপচাপ যে? ব্যাপারটা কী? আমাদের দুটো চারটে ঢিল পাটকেল মারবার মতলব নাকি? কোথা থেকে তীব্র মিহি গলায় একটা চিল চেঁচিয়ে উঠল—যথাকালে বোধ হয় মরা ইঁদুর-টিঁদুর কিছু জোটেনি, খুব সম্ভব ওর খিদে পেয়েছে। বাতাবী লেবু গাছটার কালো কোটরের ভেতরে এক জোড়া কাঁটার মতো উজ্জ্বল গোল চোখ দেখা যাচ্ছে—ওখানে দুটো প্যাঁচা থাকে। চোখ বড় বড় করে বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করছে—বেলা ডুবতে আর দেরী কত।

বেশ লাগে। বেশ লাগে এখানে নিরিবিলিতে এম্নি করে বসে থাকা। কেমন যেন হয়ে গেছে, পাড়ার কারুর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, ভালোও লাগে না। স্বদেশী আন্দোলনের ঝাঁঝটা মরে গেছে, আবার ফিরে আসছে সেই পুরোনো, সেই স্বাভাবিক দিনযাত্রা। আজ রবিবার—মনসাতলায় তেম্নি পরমোৎসাহে মার্বেল খেলা চলছে, তেমনি আনন্দ ভরে উঠেছে বাগবন্দীর কোলাহল। শুধু রঞ্জুর মনের সুর কেটে গেছে। কী একটা চাই, কিছু একটা একান্ত দরকার। যখন সমস্ত দেশটা এক সঙ্গে ত্রিবর্ণ পতাকার শপথ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তখন দূরে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জু, দেখেছিল দর্শকের অভিভূত একটা দৃষ্টি নিয়ে, ভাবতে চেষ্টা করেছিল—বুঝতে চেয়েছিল সমস্তটাকে! আজ ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে সব কিছু। ঘরের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে উঠেছে এখন। কিন্তু এখন আন্দোলন থেমে গেছে—এখন সন্ধি, এখন শান্তি। এখন তার কিছু করবার নেই।

কিন্তু কিছু করা চাই। ভোনা, কালী, পূর্ণ, খাঁদু যত সহজে এগিয়ে গিয়েছিল, তত সহজেই আবার নিজেদের জায়গাতে ফিরে এসেছে—ভুলে গেছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু রঞ্জুর তো তা নয়। ঝড় যখন থামল তখন তার ঘা এসে লাগল তার বুকের মধ্যে। দেরী করে এসেছে বলেই যেতে চাইছে না।

কি করবে? কিছু জানে না। আজকাল তার আজগুবি খেয়াল জেগেছে একটা—লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে। মিষ্টি কোমল কবিতা নয়। জীবনে যাকে সে রূপ দিতে পারল না, কবিতার ভেতর দিয়ে ধরতে চায় তাকে। বলাতে চেষ্টা করে ভালো ভালো শব্দ: রুদ্র, নটরাজ, ঈশ্বর, বিষাণ, শৃঙ্খল, বহ্নি, শোণিত, আহব।

লেখার চাইতে আরো ভালো লাগে কবিতার বই। সেদিন একটা বই এনেছিল পাশের যতীনবাবুর বাড়ি থেকে: "সর্বহারাদের গান।" আশ্চর্য লেগেছে তার কতগুলো লাইন:

"বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান,
সাগরের কূলে কূলে দুলে দুলে তরুণ নিশান
ডাকিছে তোমারে সখে, দেশে দেশে সাজে বীরদল,
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তরবারি রণ কোলাহল—"

শুধু ওইগুলো নয়। আরো অনেকগুলি কথা আছে, অপরিচিত নাম আছে। তাদের অর্থ রঞ্জুর কাছে পরিস্ফুট নয়। কিন্তু পরিস্ফুট না হোক, সমুদ্র-ঢেউয়ের গম্ভীর গর্জনের মতো বিশাল দুর্বোধ্য কণ্ঠে কিছু একটা যেন তারা বলবার চেষ্টা করে। ভয় করে, ভালো লাগে :

"মিশরের জগলুল, সাথে যার বীর ডি-ভ্যালেরা,
সানিয়াৎ সেন-মন্ত্রে চলে নব দীক্ষিত চীনেরা।
সব আগে ওই চলে গুর্জরের তাপস-নির্ভয়,
মৃদুতায় মেষশিশু, পরাক্রমে কেশরী দুর্জয়!
সত্যাগ্রহ-ধ্বজা ধরে পিছে চলে কোটি নর-নারী,
জেগেছে ভারতবর্ষ—সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী—"

সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী। বার বার আওড়াতে ইচ্ছে করে পংক্তিগুলোকে। এলোমেলোভাবে খবরের কাগজে চাঞ্চল্যকর বিবরণ মনে পড়ে : ম্যাজিস্ট্রেট নিহত। বোমা বিস্ফোরণ। বিদ্যুৎচমকের মতো ফিরে আসে শৈশব-স্মৃতি—খেড়ে ছেলে অশ্বিনীর সেই গবেষণা। এরাই কি নিখিলিষ্ট!' মাটির তলায় এদেরই কি বন্দুক-পিস্তলের কারখানা। ক্ষুদিরামের কামানের কি গর্জে ওঠবার সময় হল এতদিনে?

একদিন বৈরাগী এসেছিল বাড়িতে। একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল ননাচোরা যশোদা দুলালের গান। চমৎকার মিষ্টি লোকটির গলা। রঞ্জু তাকে এক মুঠো চালের সঙ্গে দুটো পয়সাও দিয়েছিল।

খুশি হয়ে বৈরাগী বলেছিল, আরো গান শুনবে খোকাবাবু! স্বদেশী গান?

স্বদেশী যুগ। আগ্রহভরে রঞ্জু বলেছিল, হাঁা, হাঁা, স্বদেশী গান শোনাও।

একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে বৈরাগী গান ধরেছিল :

"একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
অভয়রামের দ্বীপান্তর মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
লাট সাহেবকে মারতে গিয়ে মারলেম ভারতবাসী।
বারো বছর পরে
জনম নেব মাসীর ঘরে মাগো,
চিনতে যদি না পারো মা, দেখবে গলায় ফাঁসি—"

বৈরাগীর অজ্ঞতা আর কল্পনার বহর মনে করলে আজকে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের হাসি পায়, কিন্তু রঞ্জু—সেদিনের ছোট রঞ্জুর হাসি পায়নি। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল তার—বুকের ভেতরে যেন তার দ্রুত পায়ের শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বড় বড় চোখ মেলে আগ্রহ-ব্যাকুল রঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা বৈরাগী, তুমি জানো অভয়রাম কে, ক্ষুদিরামই বা কে?

বৈরাগী বলেছিল, ওই গানেই তো আছে।

—না, না, তুমি বলো।—রঞ্জুর স্বরে আকুলতা প্রকাশ পেল : আচ্ছা, সত্যি বলো তো, ক্ষুদিরামের কি ফাঁসি হয়েছে?

ছেলেমানুষি প্রশ্নে বৈরাগী কৌতুক বোধ করেছিল : ফাঁসি না হলে তো গানই হত না খোকাবাবু।

—কক্ষণো নয়, কিছু জানো না তুমি। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়নি। মাটির নীচে তার বোমার কারখানা আছে।

হঠাৎ ভয় পেয়েছিল বৈরাগী। চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে দেখে নিয়েছিল একবার—এই সাংঘাতিক ছেলেটির ভয়ঙ্কর কথা কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে কি না। তার পর তাড়াতাড়ি বলেছিল, গান গানই খোকাবাবু, আমরা গরীব মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—অত আমরা জানব কোত্থেকে?

গোপীযন্ত্রে দ্রুত ঝঙ্কার তুলে বৈরাগী চলে গিয়েছিল :

"নাচে আমার মাখনচোরা ননী লয়ে হাতে"—

একটা অতৃপ্ত হতাশায় ভরে গিয়েছিল রঞ্জুর মনটা। বিশ্বাস হয় না—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়নি, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে মাটির তলায় নিঃশব্দে তার কারখানার কাজ চলেছে। একদিন উঠে আসবে তার কামান—একদিন ভেঙে-চুরে শেষ করে দেবে সমস্ত, একদিন—

একা একা ছাইগাদাটার পাশে বসে এসব ভেবেছে রঞ্জু, ভেবেছে নির্জন কাঞ্চন নদীর ধারে, বৈঁচিবনের নীচে বিছানো মখমলের মতো নরম মুরো-বালির ওপরে বসে। এখন আর ভয় করে না কাঞ্চন নদীকে, লোহার পুলের তলা থেকে কালীমূর্তি উঠে আসবে খেটক-খর্পর নিয়ে—এটাকে একটা ছেলেমানুষি আতঙ্ক বলেই মনে হয় এখন। নদীর নীল নির্মল জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ভেতরে এই সব কথা নিয়েই আলোচনা করেছে রঞ্জু—ভেবেছে ক্ষুদিরামের কথা।

আজও এলোমেলোভাবে এই সমস্তই মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল। 'জেগেছে ভারতবর্ষ, সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী।' কিন্তু একটা ক্ষোভ তাকে পীড়ন করছে, কাঁটার মতো ফুটছে একটা বিশ্রী অস্বস্তি। সত্যিই কি জেগেছে ভারতবর্ষ? যদি জাগলই, তবে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল কেন? এখনো কি ক্ষুদিরামের উঠে আসবার সময় হয়নি, শেষ হয়নি তার নির্জন নিস্তব্ধ তপস্যার?

—রঞ্জু?

কে ডাকে? চকিত হয়ে রঞ্জু ঘাড় ফেরালো। এখানে, এই নিরিবিলি খিড়কির বাগানে আবার কে এসে হানা দিয়েছে? ভারী বিরক্তি বোধ হল।

কিন্তু যে ডাকছিল তার দিকে চোখ পড়তেই সে বিরক্তি আর রইল না—কপালের মেঘ কেটে গিয়ে আলো হয়ে উঠল সমস্ত মুখ—বিস্ময়ে এবং আনন্দে।

একটু দূরে পরিমল দাঁড়িয়ে।

—পরিমল? আয় আয়—

হাসিমুখে পরিমল এগিয়ে এল।

—অনেক খুঁজে তোকে আবিষ্কার করা গেল। বাপরে, যা জংলা বাগান—গোরু হারালে পাত্তা মেলে না। বেশ চমৎকার জায়গাটা বার করেছিস তো?

রঞ্জু শুধু হাসল।

—নির্জনতার ওপরে তোর খুব ঝোঁক আছে দেখছি!—একটা গাছের ছায়ায় যেখানে রোদের তাপ না পেয়ে খানিকটা হলদে রঙের বিবর্ণ ঘাস উঠেছে, সেইখানে পা ছড়িয়ে বসল পরিমল।—সেদিন দেখলুম একা একা নদীর ধারে ঘুরছিস, আজ দেখছি চুপচাপ করে বসে আছিস বাগানে। ব্যাপার কি রে? একেবারে ভাবুকের মতো চাল-চলন, কবিতা-টবিতা লিখিস নাকি?

রঞ্জু চমকে উঠল, মুখের ওপরে খেলা করে গেল রক্তের উচ্ছ্বাস। অন্তর্যামী নাকি পরিমল? তার কবিতার খাতা এখনো একান্তভাবে তারই নিজস্ব জিনিস—পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো মানুষকে সে খাতা দেখানোর উৎসাহ তার নেই, সাহসও না। একটা গোপন অপরাধের মতো—গোষ্ঠের মেলায় চুরি করে আনা সেই সাবান আর সুতোর গুলির মতো এ তার মনের ভেতরেই লুকিয়ে রাখবার জিনিস।

প্রসঙ্গটা বদলে দিলে পরিমল। মনের ওপর থেকে নেমে গেল একটা অস্বস্তির বোঝা।

পরিমল বললে, তোকে একটা কথা বলবার জন্যে খুঁজছিলাম রঞ্জু।

—কী কথা?—বিস্মিত কৌতুকে রঞ্জু চোখ তুলল। একবার আপাদমস্তক দেখে নিলে পরিমলের। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে চেহারা—সে যে বড়লোকের ছেলে এ কথা কাউকে না বলে দিলেও চলে। নিখুঁত সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল, গায়ে একটা সিল্কের হাফসার্ট, পায়ে হরিণের চামড়ার চটিজুতো। একটা ব্যবধান আছে—সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে; শুধু রঞ্জুর সঙ্গে নয়—পাড়ার সকলের সঙ্গেই। ওকে কাছে পাওয়ার কথা, ভোনা কিম্বা খাঁদুর মতো ওর সঙ্গে মার্বেল খেলার কথা মনেও পড়ে না। তবু ওর ভেতরে কিছু একটা আছে—যা মনকে টানে, ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী একটা আশ্চর্য ইঙ্গিতের দ্যোতনা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাদের ভেতরে। কিন্তু একটা ব্যথা বোধ আছে—সূক্ষ্ম একটা অনুযোগ জেগে আছে কোনোখানে। যেন আশা করেছিল ঠিক সেটা পায়নি—কোথাও মোহভঙ্গ হয়ে গেছে তার।

মনে পড়েছে। সেই কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড্ করে আসবার দিন—

কিন্তু আজ রঞ্জু কোনো কথা ভাববার আগেই পরিমল ভাবছে। বললে, আমার ওপর খুব চটেছিস, নারে?

—কেন? চটব কেন?

—বাঃ সেদিন? তোরা সব প্যারেড করে আসছিলি, আমি ঠাট্টা করেছিলাম?

ক্ষুণ্ণ গম্ভীর গলায় রঞ্জু বললে, তাতে চটবার কী আছে? তুমি এসব পছন্দ করো না, তোমার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না। সেজন্যে রাগ করে তো লাভ নেই?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করছিল পরিমল—কিছু একটা ভাবছিল। রঞ্জুর কথাটা শুনেছে অথচ যেন তার মানে বুঝতে পারেনি, এমনি একটা ফাঁকা দৃষ্টিতে খানিকটা সে তাকিয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে বললে, তোদের বিশ্বাস আছে,

—কেন আসবে না?—রঞ্জু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল: তিরিশ কোটি লোক জেগে উঠেছে। তারা আর পড়ে পড়ে পরাধীনতার অপমান সইবে না।

পরিমল মৃদু হাসল।

—তা হলে এই তিরিশ কোটি জেগে-ওঠা লোক কী করবে এখন?

—লড়াই করবে ইংরেজের সঙ্গে।

—লড়াই করবে? বেশ, খুব ভালো কথা—এর চেয়ে ভালো কথা আর কিছুই হতে পারে না। আমি শুধু জানতে চাইছি—এই লড়াইটা হবে কী উপায়ে?

—কেন?—মুখস্থ করা কথাগুলো রঞ্জু আউড়ে যেতে লাগল: অহিংস আত্মত্যাগে। আইন-অমান্য আন্দোলনে। বিদেশী বয়কট করে।

পরিমল বললে, কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়—পুণ্যি হয়। কিন্তু ওরা যদি গুলি চালায়? মারে?

—মরব। কত আর মারবে? মরতে মরতেই স্বাধীনতা আসবে।

পরিমল এবার খিল খিল করে হেসে উঠল: তা হলে পাঁটা আর মুরগীর স্বাধীনতা আজ পর্যন্ত এল না কেন? পৃথিবীর প্রথম দিনটি থেকে এ অবধি ওরাই তো মরেছে সব চাইতে বেশি!

—কিন্তু ওরা খাদ্য—পরিমলের জেরার ধরণে রঞ্জু ক্রমশ বিব্রত হয়ে উঠছিল: মানুষ তো আর খাবার জিনিস নয়। তা ছাড়া ওরা প্রতিবাদ করতে পারে না, মানুষে প্রতিবাদ করতে পারে।

পরিমল বললে, সে প্রতিবাদ কি সহিংস?

—না, অহিংস।

—তা হলে বলির পাঁটা কাঠগড়ায় ফেলবার সময় যে ব্যা ব্যা করে ডাকে, সেটাও তো অহিংস প্রতিবাদ?

—কী মুশকিল! মানুষ আর পশুকে তুমি একভাবে দেখছ কেন?

পরিমল রঞ্জুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অপলক-দৃষ্টিতে: তোমার কি বিশ্বাস ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে কখনো?

—করে না?

নিশ্চয় না—কথাটার ওপরে অস্বাভাবিক একটা জোর দিলে পরিমল: করে না। তাই কথায় কথায় ওরা আমাদের লাথি মারে, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পোষা কুকুরকে রুটি খাওয়ায়। দুনিয়ার কালো জাতিদের ওপরে ওদের কোনো সহানুভূতি নেই। শিকার করার আনন্দে ওরা আফ্রিকায় গিয়ে কালো মানুষগুলোকে গুলি করে মারে, আমেরিকার নিগ্রোদের ওপরে চালায় অকথ্য অত্যাচার, অষ্ট্রেলিয়ায় সুখের রাজত্ব গড়তে গিয়ে ওরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়েছে।

রঞ্জুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে চলে গেল। এ কে কথা কইছে? এ কোন্ পরিমল?

পরিমল বলে চলল, তুই বলছিলি, মানুষ খাদ্য নয়। কে বললে নয়? মানুষের চাইতে ভালো খাদ্য কী আর কিছু আছে? কালো মানুষের সর্বস্ব গ্রাস ক'রে ওরা রাজার হালে কাল কাটায়, আমাদের সব কিছু লুটে-পুটে নিয়ে ওদের লণ্ডন ঝলমল করে ওঠে। ওরা বলে, আফ্রিকার লোকে নর মাংস খায়। দু' দশটা মানুষকে তারা খায়—আর এরা খাচ্ছে কোটি কোটি মানুষকে। তারা যদি বর্বর নরখাদক হয়, তা হলে এদের সভ্যতাটা কী রকমের?

বদলে গেছে পরিমল—এ নতুন পরিমল। গলার স্বর অল্প অল্প কাঁপছে, চকচক ঝকঝক করছে চোখ দুটো, প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন কথায় কথায় ঠিকরে পড়ছে আগুন: অহিংসা দিয়ে এদের রুখতে পারবি রঞ্জু? একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে এলে তুই কি হাত জোড় করে বলতে পারবি, দ্যাখো বাপু, হিংসেটা বড় খারাপ, তুমি এই তুলসীপাতাটা খেয়ে বোষ্টুম হও, তারপরে ঘরে গিয়ে দিনরাত 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বলে কেত্তন গাইতে থাকো?

—কিন্তু ওরা তো সাপ নয়।

—না। সাপের চাইতেও ওরা সাংঘাতিক। আমরা মানুষ নই—পশু; ওরা মানুষ নয়—নরখাদক। আমরা যদি মানুষ হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারি তবে ওরাও মানুষ হবে—নইলে নয়।

—সেটা কি অহিংসা দিয়ে সম্ভব হতে পারে না?

—না। কোনোকালে পৃথিবীর কোনোদেশ তা পারেনি। আজও পারবে না।

—তা হলে?

—তা হলে মার খেয়ে পড়ে থাকাই সার হবে। যা এবারেও হল।

রঞ্জু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল: তোর কথা আমি মানি না।

—বেশ তো, মানা না মানা সে তো তোরই হাত। কিন্তু দুঃখ কী জানিস রঞ্জু? চোখ বুজে যারা যুক্তিকে অস্বীকার করে, তাদের দুর্গতি কোনোকালে ঘোচে না।

পরিমল চুপ করল, রঞ্জু চুপ করে রইল। বাগানটা নির্জন। শেয়াকুল কাঁটার হলদে ফুলের পাতলা পাপড়ির মতো পাখনা মেলে সেই প্রজাপতিটা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমের গাছে শিস্ দিচ্ছে দোয়েল, মুকুলের টাটকা ভাঙা মধু খেয়ে তার আনন্দের যেন সীমা নেই। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুতরো ফুলের গন্ধ, ভাঁট ফুলের গন্ধ। ওদিকের জংলা আমগাছটায় বেয়ে বেয়ে উঠেছে বুনো কাঁকরোলের মস্ত একটা লতা, দু' তিনটে মস্ত কাঁকরোল পেকে টুকটুকে হয়ে হাওয়ায় দুলছে রঙীন বেলুনের মতো। বহুদূর থেকে গুম্ গুম্ করে একটা চাপা অস্পষ্ট শব্দ আসছে—একটু আগেই যে মাল গাড়িটা সামনের রেল লাইন দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা এখন কাঞ্চননদীর পুলটা পার হচ্ছে বোধ হয়।

কয়েক মিনিট কেটে গেল চুপ চাপ। হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁট ফুলের মঞ্জরী ছিঁড়ে আনল পরিমল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, তুই বই পড়তে ভালোবাসিস রঞ্জু?

রঞ্জু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। কথার সুরটা নতুন ঠেকছে।

পরিমল আবার বললে, পড়ার বই ছাড়া আর কিছু তোর ভালো লাগে?

রঞ্জু হাসল: পড়ার বই ছাড়া আর সব বই পড়তেই ভালো লাগে।

—উপন্যাস পড়িস?

—পড়ি বই কি। বাবার আলমারী থেকে চুরি করে আনি।

—শরৎচন্দ্রের বই পড়েছিস?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো? অনেক বই পড়েছি তার। দত্তা, শ্রীকান্ত, বিন্দুর ছেলে—

ভাঁটফুলের মঞ্জরীটা নিজের মুখের ওপরে বুলোতে লাগল পরিমল: বেশ লেখে লোকটা, তাই না?

—চমৎকার।

পরিমল আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, শরৎচন্দ্রের একখানা বই আছে, নাম শুনেছিস কখনো? 'পথের দাবী'?

—'পথের দাবী?' না শুনিনি তো।

—পড়বি বইটা?

—দেবে?—রঞ্জু লোলুপ হয়ে উঠল।

—দেব, কিন্তু এখন নয়।—পরিমল বললে, তার আগে তোকে আরো খানকয়েক বই পড়তে হবে, নইলে সে বইটার মানে ঠিক বুঝতে পারবি না।

—বেশ তো, দাওনা বই। সাগ্রহে রঞ্জু বললে, আজই দেবে?

—আজই?—পরিমল আবার একটু চুপ করে রইল: আচ্ছা, আয় তবে আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—কেন?—পরিমল উজ্জ্বল ভাবে হাসল: আমাদের বাড়িতে? বই তো আর আমি সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি না। তা ছাড়া—পরিমলের কথার ভেতরে একটা অস্পষ্ট গোপনতার ইঙ্গিত ফুটে বেরুল: সঙ্গে করে নিয়ে বেরুনোর মতো বইও সেগুলো নয়। একটু লুকিয়েই পড়তে হবে—ধরা পড়লে একেবারে সর্বনাশ।

—সর্বনাশ? কেন?

—সেটা পরে বুঝতে পারবি—পরিমলের কথার ইঙ্গিতটা যেন চোখের চাউনিতেও এবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল: আয় রঞ্জু আমার সঙ্গে।

—তোদের বাড়িতে?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। কেন, তোর লজ্জা করছে নাকি?

—ধ্যেৎ, লজ্জা আবার কিসের?—লজ্জিত মুখে রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো।

* * * *

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মমত আছে, তার প্রায় সব কটাতেই উপবাস বা অনশনের বিধান রয়েছে। এই উপবাস ব্যবস্থা প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গেই একটা সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম হিন্দু ধর্মে মনে হয় অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা উপবাস সবচেয়ে বেশী। হিন্দুর নানা পূজাপার্বণে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন তিথিতে উপবাস করার প্রথা বর্তমান। মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় পর্ব যেটা ঈদ্, তাতে তারা একটানা একমাস ধরে দিনে উপবাস করে। এ ছাড়া মহরম মাসে ১০ দিন এবং ঈদের উপবাসের সাক্ষী হিসাবে আরও ৬ দিন উপবাস করে। এই উপবাসের ব্যবস্থা তাদেরও ধর্মপালনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং পার্শী ধর্মেও উপবাসের প্রথা আছে। বৌদ্ধরা প্রতি ৮মী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে বিহারে (বৌদ্ধমঠ) যাইয়া উপাসথ (উপবাস) পালন করেন এবং বুদ্ধের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ও আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই এইরূপ ব্যবস্থা। বুদ্ধ, যীশু, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ধর্মগুরুই ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য উপবাস করেছেন। এই সেদিন ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে সারা ইউরোপ জুড়ে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, তখন ইউরোপে যাতে আবার শান্তি ফিরে আসে এবং ইউরোপবাসীরা যাতে ভগবানের সাক্ষাৎ পায়, তার জন্য খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপও সাতদিনের জন্য উপবাস করেছিলেন।

ধর্মের কথা বাদ দিলে শারীরিক প্রয়োজনেও মাঝে মাঝে উপবাসের প্রয়োজন হয়। শরীরকে সুস্থ রাখতে হোলে অনেক সময়ে উপবাস একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

উপবাসের সঙ্গে ধর্ম ও স্বাস্থ্যের যে একটা সম্পর্ক আছে এটা আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে, কিন্তু এই উপবাসকে যে আবার একটা নির্দোষ অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, একথা বোধহয় মহাত্মা গান্ধীর আগে কেহ জানতেন না। গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, এই উপবাস বা অনশন হোল তার শেষ চরম অস্ত্র। এ যেন মহারথী অর্জুনের ঠিক পাশুপত অস্ত্র। এর প্রয়োগও যেমন অহরহ নয়, ফলও তেমনি অমোঘ। যুক্তি ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে (অবশ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনই হোল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত) যদি এই অনশনের প্রয়োগ হয়, তা হোলে প্রতিপক্ষ, সে যত বড়ই শক্ত, নিষ্ঠুর বা কঠোর হউক না কেন, তাকে পরিবর্তিত করবেই এবং অনশনকারী সত্যাগ্রহীর জয় নিশ্চিত হবেই। নিজের উপবাসের দ্বারা অপরকে যে এত সহজে জয় করা যেতে পারে, এরূপ অস্ত্র এর আগে কোন দিন বেরোয় নি। সাধারণ কলকারখানায় শ্রমিকদের অনশন ধর্মঘট, জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন প্রভৃতি যেখানেই এই অনশন ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে হয়েছে, সেখানেই তারা জয়লাভ করেছে। এ উদাহরণ আজ আমাদের চোখের সামনেই ঘটে চলেছে।

এই অনশন অস্ত্রের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী কখন কোন অবস্থায় পড়ে তিনি নিজে এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের নিকটে তার কিরূপই বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, এবার তারই আলোচনা করা যাক্।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অতি বাল্যকাল থেকেই আত্মশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য মাঝে মাঝে উপবাস করে আসছেন। তিনি সর্বপ্রথম একটানা কয়েকদিন উপবাস করেন, তাঁর এক বিপথগামী পুত্রের সংশোধনের জন্য। এরপরে তিনি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কন্যার জন্যও কয়েকদিন উপবাস করেছিলেন। কিন্তু এই সব উপবাস তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে সাধারণের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি সর্বপ্রথম সাধারণ উপবাস আরম্ভ করেন, দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স আশ্রমের দুইজন কর্মী অন্যায় কাজ করলে, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি প্রথমে সাত দিনের উপবাস ও সাড়ে চার মাস একবেলা আহারের ব্রত গ্রহণ করেন। এই উপবাসের কিছুদিন পরে আর একবার ১৪ দিন উপবাস করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই তিনি পুরাপুরি ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ভারতবর্ষে এসে তাঁর প্রথম সাধারণ উপবাস হোল, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এই সময়ে আমেদাবাদ মিলের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে গান্ধীজী একটা মিটমাটের জন্য আগিয়ে গেলেন। মিলমালিকদের তরফ থেকে যিনি নেতৃত্ব করছিলেন তিনি ছিলেন, অম্বালাল সরাভাই। এই সরাভাই আবার গান্ধীজীর বিশেষ বন্ধুস্থানীয়। গান্ধীজী অম্বালাল সরাভাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে শ্রমিক-মালিক বিরোধের বিষয়টি সালিশীতে দেবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সরাভাই তা প্রত্যাখ্যান করলেন। গান্ধীজী উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন, একদিকে সরাভাই তাঁর বন্ধু, অপর দিকে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী।

গান্ধীজী অবশেষে ন্যায়ের পক্ষই অবলম্বন করলেন। শ্রমিকদের বললেন—ধর্মঘট সুরু কর। কেহ কাজে যোগ দিও না। আর তিনি শ্রমিকদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে, শ্রমিকরা সর্বদাই অহিংস থাকবে এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী থেকে বিচ্যুত হবে না।

অম্বালাল সরাভাইএর ভগ্নী অনুসূয়া বেন ভাইএর বিরুদ্ধ হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

বেশ শান্তভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রমিকরা দু সপ্তাহ ধর্মঘট চালিয়ে

গেল। কিন্তু এর পর থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। কেহ কেহ ধর্মঘট ছেড়ে কাজে যোগ দেবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে উঠল। মালিকরাও এই সুযোগ পেয়ে আরও শক্ত হোল।

শ্রমিকদের মধ্যে এইরূপ ভাঙ্গন দেখে গান্ধীজী নিজেকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত বলে মনে করলেন। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগ্‌লেন। এমনি সময়ে তিনি হঠাৎ যেন একটা আলোর সন্ধান পেলেন। তিনি ব্যক্ত করলেন—একটা সম্মানজনক মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে শ্রমিকরা যদি ঠিক না থাকে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে মিল বর্জন না করে, তা হোলে আমি আর কোনরূপ খাদ্য স্পর্শ করব না।

গান্ধীজীর মুখ থেকে কথাটা বেরোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্তা অনুসূয়া বেনের দুগণ্ড দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল এবং এই কথাটায় শ্রমিকদের মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। শ্রমিকরা গান্ধীজীকে বললে—উপবাস আমরাই করব, আপনি নয়। আপনি যদি উপবাস করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে সেটা মহা কলঙ্কের হবে। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পুনরায় আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের দাবীতে আমরা এবার নিশ্চয়ই দৃঢ় থাকব।

গান্ধীজী কিন্তু অনশন ছাড়্‌লেন না। তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। গান্ধীজীর এই অনশনের ফলে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে পুনরায় একতা এসে গেল এবং গান্ধীজীর এই অনশন মিল-মালিকদেরও হৃদয় গিয়ে স্পর্শ করল। শ্রীযুক্তা অনুসূয়া বেনের গৃহে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের মিটমাটের জন্ম সভা বস্‌ল এবং তাড়াতাড়ি একটা মিটমাটও হয়ে গেল। তখন গান্ধীজী তিনদিন পরে অনশন ভঙ্গ করলেন।

গান্ধীজী আত্মশুদ্ধির জন্ম জনসাধারণকে সর্বপ্রথম উপবাসের নির্দেশ দেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে ভারতরক্ষা আইনে যে সকল বিধান প্রয়োগকরা হয়েছিল, যুদ্ধান্তে সেইগুলিকেই আবার স্থায়ী করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে রাউলাট কমিটি বিল রচনা ক'রে আইনে পরিণত করার জন্ম বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিলেন যে, রাউলাট বিল যদি আইনে পরিণত করা হয়, তাহলে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কথা উপেক্ষা ক'রে ১৯১৯ সালের ৩রা মার্চ বিলটা আইনে পরিণত করলেন।

এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ আরম্ভের দিন ধার্য করলেন। এটাই হোল ভারতে তাঁর প্রথম সত্যাগ্রহ। ঐ দিন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্ম তিনি যে নির্দেশ দেন, তাতে হরতাল পালন, জনসভা করে রাউলাট আইনের প্রতিবাদ জানানর সঙ্গে আত্মশুদ্ধির জন্ম দেশবাসীকে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী উপবাস করারও কথা বলেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত সেদিন সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এই নিয়ে বহুস্থানেই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়ের পক্ষ থেকেই হাঙ্গামা ও খুন জখমের সৃষ্টি হয়েছিল। জনসাধারণের পক্ষ থেকে অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই সময়ে এক সভার বলেছিলেন—সত্যাগ্রহ হোল সত্যের খেলা। লোকে যদি শান্তি না রাখে, তবে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চালান আমার দ্বারা কখনও সম্ভব হবে না।

এর কদিন পরেই মহাত্মা জনসাধারণের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্ম নিজে তিনদিন উপবাস করেন এবং সাধারণকে একদিনের উপবাসের পরামর্শ দেন ও যারা খুন ইত্যাদির সহিত জড়িত ছিল, তাদের দোষ স্বীকার করতে বলেন।

১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজরা ভারতীয়দের উপরে এক নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এই ১৩ই এপ্রিলের উল্লেখ করে, পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে "ইয়ং ইণ্ডিয়াতে" তিনি লিখেছিলেন—The day of the days should be devoted to fasting and prayer—এই দিনের মত দিনটিকে উপবাস ও প্রার্থনায় অতিবাহিত করা উচিত। সেই থেকে গান্ধীজী প্রতিবৎসরই ঐ দিনটিতে উপবাস করে আসছেন এবং দেশবাসীর অনেকেও তাঁর উপদেশ পালন করেন।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এক বেসরকারী জনতা গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামের থানা লুঠ করে এবং পুলিশের লোকদের নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারে। এ সম্পর্কে তখন যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় যে, পুলিশের ২১ জন এবং জনতার মধ্য হ'তে ২জন মারা গিয়েছিল। এই বেসরকারী জনতার মধ্যে অসহযোগী সত্যাগ্রহীও থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে ইহা এক দুর্নামের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কংগ্রেস অহিংসায় বিশ্বাসী এবং অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকরাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তারা সর্বদা অহিংস থাকবে। অসহযোগীদের দ্বারায় এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটায় চৌরী চৌরার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্ম মহাত্মা গান্ধী ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে পাঁচদিনের জন্ম উপবাস করেন।

ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর সর্বপ্রথম দীর্ঘ অনশন হোল ১৯২৪ সালে। এই সময়ে ভারতের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। গান্ধীজী হিন্দুমুসলমানের এই বিবাদ বন্ধ ক'রে উভয়ের মধ্যে মিলন আনবার জন্ম ১৯২৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১ দিনের জন্ম অনশন আরম্ভ করেন। ঐ দিন তিনি তাঁর অনশন সম্পর্কে এক বিবৃতিতে জানালেন—

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমার নিকটে অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ধর্ম আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, যখন দুঃখ ঘনিয়ে আসে এবং একজন যখন তাকে কিছুতেই দূর করতে পারে না, তখন সে অবশ্যই উপবাস ও উপাসনা করবে।...আমার কোন কথা বা লেখা দুটো বিবদমান সম্প্রদায়কে কিছুতেই এক করতে পারবে না। তাই

আমি আজ থেকে ২১ দিনের জন্য অনশন করা স্থির করেছি। এটা একদিকে প্রায়শ্চিত্ত, এবং সেই সঙ্গে উপাসনা।...আমি সসম্ভ্রমে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে, এমন কি ইংরাজদেরও আমন্ত্রণ করছি যে, তাঁরা যত শীঘ্র সম্ভব এই ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পক্ষে কলঙ্কজনক বিবাদের অবসান করুন।

গান্ধীজী দীর্ঘদিনের জন্য অনশন আরম্ভ করতেই সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর দিল্লী সহরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ভারতীয় খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজদের এক সম্মিলন বসল। এর পর থেকেই দাঙ্গা ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসতে লাগল। দাঙ্গার অবসান হোলে ৮ই অক্টোবর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। ঐদিন ভারতের সর্বত্রই মিলন দিবস পালিত হোল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেখানে যুক্তি ও আবেদনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূর করতে অকৃতকার্য হচ্ছিলেন, মহাত্মা গান্ধী অনশনের দ্বারায় তা সম্ভব করলেন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ড ১৯৩২ সালের ৮ই আগষ্ট যে কমিউন্যাল এওয়ার্ড বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন, তার প্রতিবাদ হিসাবে পরদিনই মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন—আমি আমরণ অনশন ভিন্ন এই এওয়ার্ড রদ করার আর কোন পথ দেখছি না।

২০শে সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধীজী কমিউন্যাল এওয়ার্ডের প্রতিবাদ হিসাবে অনশন সুরু করলেন। গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করলে অনুন্নত ও বর্ণহিন্দু নেতারা যারবেদায় একটা চুক্তিবদ্ধ হলেন। এদিকে গান্ধীজীর অবস্থার অবনতি দেখে বিলাতে বৃটিশ মন্ত্রিসভাও তাড়াতাড়ি মিলিত হোল এবং তাঁরাও অনুন্নত ও বর্ণহিন্দুদের চুক্তি মেনে নিতে স্বীকৃত হলেন। অবশেষে গান্ধীজী ২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অনশন ভঙ্গ করলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সমগ্র দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা বর্জন দিবস পালিত হোল এবং পুণায় অস্পৃশ্যতা বর্জন উপলক্ষে যে বিরাট সভা হোল তাতে সভাপতিত্ব করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

মহাত্মা গান্ধী আত্মশুদ্ধি ও সহকর্মীদের শুদ্ধির জন্য ১৯৩৩ সালের মে মাসে যারবেদা জেলে একবার ২১ দিন অনশন করেন। ৮ই মে বেলা ১২টা থেকে এই অনশন আরম্ভ হয় এবং ২৯শে মে পর্যন্ত অনশন চলে। এই অনশন সম্পর্কে তিনি তখন বলেছিলেন—

আমার মরার ইচ্ছা নাই। আমি মানুষের সেবার জন্যই বাঁচতে চাই। তবে আমি এবং আমার সহকর্মীরা, আমরা সকলেই যাতে আরও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারি এবং প্রকৃত সেবক হবার উপযুক্ত হতে পারি, তারই চেষ্টা করছি। আমার কয়েকজন সহকর্মীর কয়েকটা অন্যায় কাজের কথা আমার কাণে আসে, আশা করি আমার এই অনশন তাদের কাছে একটা জরুরী আবেদন হিসাবে গিয়ে পৌঁছবে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট থেকে গান্ধীজী সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করার নির্দেশ দেন এবং গান্ধীজী নিজে ১লা আগষ্ট তারিখেই গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজী জেল থেকে হরিজন সেবার কাজ চালাতে চাইলে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি সর্ত দেন। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে ১৭ই আগষ্ট থেকে অনশন আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন অনশনের পর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। তখন গবর্ণমেণ্ট ২৩শে আগষ্ট তারিখে বিনা সর্তে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলেন এবং কারাগার থেকে পুণায় সেসুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলেন। গান্ধীজীর এই অনশন তাঁর মুক্তির দিন ২৩শে তারিখ পর্যন্ত চলেছিল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী তাঁর সহকর্মী সত্যাগ্রহীদের অন্যায় কাজের জন্য আর একবার নিজে অনশন করেছিলেন। এই সময়ে হরিজন সেবার কাজে গান্ধীজী যখন দেশসফর করছিলেন, তখন একজন স্বেচ্ছাসেবক আজমীরে একজন সনাতনীকে প্রহার করে। এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ওয়ার্ধা সত্যাগ্রহ আশ্রমে গান্ধীজী ৭ই আগষ্ট থেকে এক সপ্তাহের জন্য অনশন করেন।

এরপরে গান্ধীজী যে অনশন করেন, সেটা হইল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজকোট দেশীয় রাজ্যের শাসনসংস্কার ব্যাপার নিয়ে। রাজকোটের রাজা ঠাকুরসাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যে শাসন সংস্কার না করায় রাজ্যের প্রজারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করে। গান্ধীজীর সহধর্মিণী কস্তুর-বাঈ গান্ধী ছিলেন রাজকোটের মেয়ে। তিনিও এই সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজী ঠাকুর সাহেবকে দিয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করাবার জন্য রাজকোটে গিয়ে ৩রা মার্চ থেকে সেখানে অনশন আরম্ভ করলেন এবং বললেন—রাজা যদি না তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, তাহা হলে আমার এই অনশন মৃত্যু-দিন পর্যন্ত থাকবে।

বড়লাট এই সময়ে রাজপুতানা-সফর করছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দিল্লীতে ফিরে এলেন এবং রাজকোটের ব্যাপারটা মেটাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ারের উপর মীমাংসার ভার দেওয়া হোল। গান্ধীজী বড়লাটের কাছ থেকে মীমাংসার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ৭ই মার্চ অনশন ভঙ্গ করলেন।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ইংরাজের বিরুদ্ধে "কুইট ইণ্ডিয়া" বা "ভারত ছাড়া"র প্রস্তাব গ্রহণ করলে, ঐদিন ভোরেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেখা দেয় এবং এই আন্দোলন বহু স্থানেই বৃটিশের বিরুদ্ধে চরম আকার ধারণ করে। বালিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে জাতীয় গবর্ণমেণ্টও গঠিত হয়। ইংরাজ এই আন্দোলনকে দৃঢ়হস্তে নির্মমভাবে দমন করতে থাকে এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রচারও করতে সুরু করে। মহাত্মা গান্ধী ইংরাজ সরকারের এই মিথ্যা প্রচার কার্য ও দমননীতির প্রতিবাদ-কল্পে ১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে পুণা বন্দীশালার আগা খাঁ প্রাসাদে ২১ দিনব্যাপী অনশন করেন। এইবারের অনশনে তাঁর শরীর

বিশেষভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আশ্চর্যজনকভাবে এইবার তাঁর জীবন রক্ষা হয়।

এ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী যতবার অনশন করেছেন, তার মধ্যে শেষ সাধারণ অনশন হোল, কিছুদিন পূর্বে তাঁর কলকাতায় অনশন।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ যে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করে, বহুদিন পর্যন্ত সমগ্র দেশ জুড়ে তার জের চলে। কলকাতা সহরেও একটা বৎসর ধরে এই সংগ্রাম লেগে থাকে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগষ্ট থেকে কলকাতার এই হাঙ্গামাকে একেবারে দূরীভূত করবার জন্ত কলকাতায় শান্তি অভিযানে বেরোলেন। তাঁর শান্তি অভিযানের ফলে ১৪ই আগষ্ট থেকেই যেন এক মন্ত্রের প্রভাবের মত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত মিলনসম্ভব হইল। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে একদল গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে এই মিলন আবার হঠাৎ ফেঁসে গেল এবং জোর দাঙ্গা সুরু হোল। উক্ত গুণ্ডারদল মহাত্মার বাসভবনে গিয়ে তাঁর প্রতি ক্রোধ এবং অসৌজন্তও প্রকাশ করল।

মহাত্মা দেখলেন—কলকাতার হিন্দু-মুসলমান তাঁর উপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুনরায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের আর কোনও উপায় না পেয়ে, অবশেষে ঐদিন রাত্রি ৮।১৫ মিঃ থেকে তিনি তাঁহার শেষ অস্ত্র অনশন আরম্ভ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কলকাতা বিচলিত হয়ে উঠল। বাঙ্গলার নবনিযুক্ত গবর্ণর, নবগঠিত মন্ত্রিসভা ও হিন্দুমুসলমান নেতৃবৃন্দ মহাত্মার অনশন ভঙ্গ করবার জন্ত এগিয়ে এলেন। কলকাতার জনসাধারণ, ছাত্র, শ্রমিক, কেরাণী সকলেই হিন্দুমুসলমান মিলনের জন্ত সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। এই মিলন ঘটাতে গিয়ে কেহ কেহ জীবন পর্যন্ত দিলেন। ফলে অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরে এল এবং কলকাতার হিন্দু মুসলমান নেতারা এই শান্তি অব্যাহত রাখার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯.১৫ মিনিটে অনশন ভঙ্গ করলেন।

কলকাতার এই অনশনটাই হইল মহাত্মার শেষ সাধারণ অনশন। মহাত্মা গান্ধীর সবকটা সাধারণ অনশন নিয়েই আলোচনা করে দেখা গেল যে তাঁর প্রত্যেক অনশনটার পিছনেই একটা ক'রে সুমহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত মহাত্মা যখন অন্ত কোন উপায় ঠিক করতে না পেরেছেন, তখনই তিনি তাঁর অহিংস সংগ্রামের এই শেষ অস্ত্রটি ছেড়েছেন এবং প্রতিবারেই তিনি অসামান্যরূপে জয় লাভ করেছেন।

অনেকদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী তাঁর উপবাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে একবার বলেছিলেন—

উপবাসপ্রথা ঠিক আদমের ন্যায়ই সুপ্রাচীন। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ভগবানকে সামনা সামনি দেখার জন্ত উপবাস করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর বানর সৈন্তদের জন্ত পথ করে দেবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের কাছে অনশন করে ছিলেন। মহাদেবকে স্বামী ও প্রভু হিসাবে লাভ করবার জন্ত পার্বতীও উপবাস করেছিলেন। আমার উপবাস সমূহে এই সকল মহৎ দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছি এবং আমি নিঃসন্দেহ আমার উদ্দেশ্য তাঁদের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

মহাত্মা গান্ধী হোলেন সত্য ও ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক। তিনি তাঁর জীবনে যখনই যেখানে অসত্য ও অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যখন আবশ্যক বোধ করেছেন, তখন তাঁর শেষ অস্ত্র অনশনেরও প্রয়োগ করেছেন। এর জন্ত কঠিন কষ্ট সহ্য করে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নি।

মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তাহার শক্তি, গুণ ও অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে অগণিত নরনারী সত্যাগ্রহী হন। কিন্তু এই অহিংস সত্যাগ্রহের পথ এমনি কঠিন যে, বহু সত্যাগ্রহী এ পথে চলার কালে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী এই সব পথভ্রষ্ট সত্যাগ্রহীদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত অনশন করেছেন নিজে এবং এই অনশনের অমোঘ আবেদন গিয়ে পৌঁচেছে অন্যায়কারী সত্যাগ্রহীদের নিকটে। তাই আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণ আফ্রিকা, চৌরীচৌরা, আজমীর প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহীদের অন্যায় কাজের জন্ত মহাত্মা গান্ধীর অনশন।

গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস—প্রত্যেক মানুষই মূলতঃ সৎ। তবে মানুষের মধ্যে যে অসৎ কাজের প্রকাশ, তা হোল তার উপর স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতি প্রভাবে। তা হোলেও দেখা যায়, ঐসকল অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যেও তাদের বিবেক মাথা চাড়া দেয়। মহাত্মা গান্ধী তাই বলেন—যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী বা পরমশত্রু বলে মনে হচ্ছে, তার মধ্যেও ইষ্ট করার বা বন্ধুত্বের সন্ধান রয়েছে। তার ভিতরের সেই সদ্‌গুণটাকেই টেনে আনতে হবে এবং তার জন্ত প্রয়োজন প্রতিশোধ নয়, যেমনকে তেমন নয়, প্রয়োজন হোল অহিংসা, প্রেম বা ভালবাসার। এই অহিংসার শেষ স্তরই অনশন। এর মধ্যে প্রতিশোধের ঝাঁজ নেই, ক্রোধেরও লেশ নেই।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, মৃত্যু হোল ভগবানের আশীর্বাদ, তবে মৃত্যুটা কার কিভাবে হোল সেইটাই বা লক্ষ্যনীয়।

অনশনের মধ্য দিয়ে এই যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা, এর মূল সূত্রটা হোচ্ছে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানের শক্তি এত বেশী যে, অন্যায় এর কাছে মাথা নত করবেই। তাই এই অনশন সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই, অনশন কারী তাঁর সকল শারীরিক কষ্ট ও যন্ত্রণাকে হাসতে হাসতে বরণ করেন, এবং তাঁর সমস্ত দুঃখই সহনীয় ও মধুময় হয়ে ওঠে সত্যের প্রভাবে। কারণ সত্যই ত ঈশ্বর।

বনফুল

১২

শার্দ্দুল সিংহের ম্যানেজার প্রীতম্ সিং ফোন ধরেছিলেন। পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারেন ভদ্রলোক। গণেশের টুকরো টুকরো কথা থেকে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা খাড়া করেছিলেন—গণেশ ছিপসরকারী থেকে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পরে পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলেন, ছিপসরকারি নয় ছিপছররামারি। লাইনটা কোথায় যেন লীক্ করছে। সুশোভনবাবুরা রাত্রে যে হোটেলে ছিলেন তার নাম—প্রীতম্ সিং প্রথমে শুনলেন হয়মোটন্ পান্থনিবাস।

"জায়গাটার নামগুলো একটু অদ্ভুত গোছের, নয়?" —প্রীতম্ সিং বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ অদ্ভুতই। মান্ধাতার আমলের ব্যাপার" গণেশ তখন পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এল তার নাম কি।

পোষ্টমাষ্টার প্রবীণ লোক। মাথার একটি চুল কালো নেই। তার উপর এক-চক্ষু। অনেকদিন চাকরি করে ঘাগি হয়েছেন, চট করে কথার জবাব দেন না, বেফাঁস বা বেমক্কা হয়ে যেতে পারে। যা বলেন—ভেবে চিন্তে ধীরে সুস্থে বলেন। এই যে সব মোটরে চড়ে' শহর থেকে বাবুরা আসেন, কড়কড় করে' যা' তা জিগ্যেস করেন, এদের উপর মনে মনে হাড়ে-চটা তিনি। যত সব ফক্কড় দালাল জ্বালাতে আসে খালি। সকালে ওই ভদ্রমহিলাটি বেশ জ্বালিয়েছেন এক চোট। টেলিফোন ডাইরেকটারিখানাকে তচনচ করে তবে ঠিক করলেন যে, দিগ্বিজয় সিংহরায়ের ফোন নেই। তিনি গেছেন, এবার ইনি এসেছেন!

"যেখান থেকে আপনারা এলেন সে জায়গাটার নাম জিগ্যেস করছেন?"—সংযতকণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন।

"হ্যাঁ"—মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিলে গণেশ।

"কোন রাস্তা দিয়ে এলেন আপনারা?"

"এই যে এই রাস্তার এক্ষুণি এলাম।"

পোষ্টমাষ্টারের একচক্ষুর দৃষ্টিটি নিবদ্ধ হল গণেশের মুখের উপর।

"এই রাস্তায় মেলা গ্রাম আছে, একটা নয় মেলা। আপনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি কি করে' বলব? যেখান থেকে এলেন সে জায়গার নাম আপনি যদি না জানেন আমি কি করে জানব? একটা নয় মেলা গ্রাম আছে এ রাস্তায়, মেলা—মেলার চেয়েও বেশী—"

"ধরে থাকুন", গণেশ বললে প্রীতম সিংকে—"আমি মান্ধাতাকে জিগ্যেস করেছি। দেখছি স্বয়ং তিনিই এখানে আছেন।"

"লোকে আপিসে ঢুকে ক্রমাগত জিগ্যেস করে আমি এই রাস্তা দিয়ে যেখান থেকে এলাম তার নাম কি —তাহলে কি করে' জবাব দিই বলুন। সেকথা তাদের নিজেদেরই তো জানা উচিত। তারাই সেখান থেকে এসেছে, আমি আসি নি। আপনি যেখান থেকে এলেন কি রকম সে জায়গাটা—"

পোষ্টমাষ্টার বলে' চলেছিলেন।

অনেক ধস্তাধস্তির পর প্রীতম্ সিং যে সংবাদটী সংগ্রহ করলেন তা এই যে, সুশোভনবাবুরা যে হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন তার নাম হরিনাটি এবং হোটেলটি যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম কতিমারজপুর। এর পর তাঁরা কোথা যাবেন তা গণেশ কিছুতে বলতে পারলে না। খুচুকুন্দ—কুন্তলেশ্বরীর নাম কিছুতেই মনে এল না তার।

"আমাদের আপিসে যে ম্যাপটা আছে সেটা দেখলে নামটা পাবেন বোধহয়। চমৎকারকুণ্ডু বা ওই গোছের কিছু একটা—মচকানকাণ্ডও হতে পারে। দেখবেন, ম্যাপে থাকা সম্ভব। ম্যাপেই ওই ধরণের নাম থাকে। এখান থেকে খুব দূর নয় এইটুকুই শুনেছি—এর বেশী কিছু জানি না। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না। ফোন কি করে পেলাম? এ রকম অজ পাড়াগাঁয়ে ফোন পাব আশাই করি নি। শুনলুম এদিকে মিলিটারির একটা ছাউনি ছিল, তারাই নাকি পোষ্টাফিসে ফোনটা বসিয়েছিল। হ্যাঁ, আপনারা ভাববেন তাই ফোনটা করে দিলাম—"

"ভাবনা অবশ্য ঘুচল না"—উত্তর দিলেন প্রীতম সিং।

"তা কি করব বলুন সার। ভাল বুঝলাম তাই করলাম—"

একদিকে পোষ্টমাষ্টার, অন্য দিকে ম্যানেজার—গণেশের মেজাজ ক্রমেই চড়ে' উঠছিল।

"মিছিমিছি ফোন করে অতগুলো পয়সা নষ্ট না করলেও পারতে—"

"খবর না দিলে বলতেন, ফোন করবার যখন সুবিধে ছিল একটু খবর দিলেই পারতে। ফোন করেছি—এখন বলছেন অনর্থক পয়সা খরচ করছ কেন। আপনাদের অন্ত পাওয়া ভার"

"যাক্ তাড়াতাড়ি ফিরে এস"

ফোনে কথাবার্তা শেষ হল।

এক হিসেবে এই অবশ্য যথেষ্ট হল। যতটুকু খবর পেলেন প্রীতম্ সিং, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং লোহার দালাল জিতু সরকার লৌহসংক্রান্ত ব্যাপারে যদিও তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তাঁর তন্ময়তা বাধাপ্রাপ্ত হল। একটি কেরাণী এসে চুপি চুপি খবর দিয়ে গেল যে মিসেস সরকার ফোনে ডাকছেন।

"ডাকছেন? আমাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আচ্ছা, যাচ্ছি যাও—না শোন—"

জিতুবাবুর মুখের বিপন্ন ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"ওঁকে ফোনটা ধরে থাকতে বল। আর ওই টেলিগ্রাফের ফর্মগুলো দাও তো—"

ফর্ম দিয়ে কেরাণী চলে গেল।

জিতুবাবুর মাথায় চুল বেশী ছিল না, যা ছিল তাই তিনি মুঠো করে' ধরে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর মরীয়া হয়ে সুরু করে' দিলে—"সুশোভন কট্ ট্রেণ, বাট মিস্‌ড্ ওয়াইফ, কট বাট রিটার্ণড্"

কেরাণী পুনঃপ্রবেশ করে বলে গেল মিসেস সরকার আপনার ফোনেই কথা বলছেন। জিতুবাবুর নিজের প্রাইভেট ফোনটা পাশেই ছিল, পরমুহূর্ত্তেই ঝনঝন করে' বেজে উঠল সেটা। জিতুবাবু ধীরে সুস্থে রিসিভারটা তুলেই বুঝলেন স্বয়ম্প্রভা ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন। "তুমি শুনছো?"—হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"শুনছি বই কি"

"সাড়া দিচ্ছ না কেন তাহলে। টেলিগ্রাফ করেছ?"

"নিশ্চয়"

"তাহলে বেকুবি করেছ। তখনই তোমাকে পই পই করে' মানা করলাম যে টেলিগ্রাফ কোরোনা, করা বৃথা—"

"বল ত এখনও বন্ধ করে' দিতে পারি"

"ও, পাঠাও নি এখনও! বহুক্ষণ আগেই ত পাঠাবার কথা—"

"তোমার ইচ্ছেটা কি তা-ই বল না। টেলিগ্রাফ করব, কি করব না"

"কি—"

"করব, না করব না"

"কি—"

"টেলিগ্রাফ গো"

"টেলিগ্রাফ করে' আর কি হবে। এখনও কর নি তাহলে?"

"মানে যদি চাও, বন্ধ করে দিতে পারি এখনও"

"বন্ধ করবে কি করে! কখন পাঠিয়েছ?"

"চেষ্টা করে' দেখতে পারি। টেলিগ্রাফ করতে মানা করছ কেন"

"কেন? কারণ, আমি বলছি সে সেখানে নেই। কোথায় আছে তাও জেনেছি আমি। বুঝলে? শুনছ?"

"কোথায় আছে, বল না"

"সে সেই মাগীকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"বল কি! হোটেলে? বাস করছে? বাস করছে মানে কি—মোটে কালই তো গেছে—"

"মানে, কাল রাত্রে তারা দুজনে সেখানে বাস করেছিল"

"কি বলছ যা তা"

"কি?"

"কি বলছ যা তা"

"জাঁতা কি? শুনতে পাচ্ছি না কিছু। ব্যাপারটা বোঝ একবার! হোটেলে গিয়ে বাস করছে!"

"কি যা তা বলছ, সম্পু—"

"অসম্পু? অসম্পু কি! অসম্ভব বলছ? কি অসম্ভব?

"এই হোটেলে বাস করা। মানে, সম্পু—"

"যা বলছ, স্পষ্ট করে' উচ্চারণ কর না। মুখটা ফোনের কাছে এগিয়ে আন—"

"আমি বলছি সম্পূর্ণ বাজে কথা এটা"

"খোকামি না করে বাড়ি চলে এস। বেরুতে হবে এক্ষুণি—"

"যাব না। একটি কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার"

"মুখে কিছু পুরেছ না কি, সুপুরি টুপুরি?"

"না। শোন—"

"শুনব কি করে' যা ফোন তোমার। আপিসের ফোনটাও ঠিক করে' রাখতে পার না? কিছু শোনা যাচ্ছে না; বানান কর—বানান করে' বল—"

"কি"

"বাড়ি চলে এস"

"এখন যাওয়া অসম্ভব। কেন ঘাবড়াচ্ছ, আমি বলছি তেমন কিছু হয় নি। সে হোটেল কোথায়—"

"মফঃস্বলে। হরিকোটর না কোথা—"

"তার মানে অনীতার খোঁজেই গেছে। বলিনি আমি?"

"অনীতার খোঁজে? কি বুদ্ধি তোমার মরি মরি। অনীতাকে ফেলে পালিয়েছে সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ—"

"ইচ্ছে করে' তো পালায় নি। ট্রেণ ছেড়ে গেল, কি করবে বেচারা—"

"খুব হয়েছে! লোহার ব্যবসা ছেড়ে ওকালতি কর গিয়ে।"

"না না, জিনিসটা ভেবে দেখ আগে"

আমি বলছি ওই মাগীর খপ্পরে ও পড়েছে। ওরকম লোক পড়েই থাকে"

"না পড়ে নি। যেটুকু শোনা গেছে, তার থেকে ও কথা বলা যায় না"

"যায় খুব যায়। আমি চিনি ওদের। আমি যা বলছি ভদ্রভাষায় এর চেয়ে বেশী আর বলা যায় না"

"কি প্রমাণ আছে তোমার?"

"ওরা দুজনে মফঃস্বলের একটা হোটেলে কাল একসঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এ প্রমাণ আমার আছে। এই যথেষ্ট মনে করি আমি। পুরুষদের চিনতে আর বাকী নেই। তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না ওর হয়ে। বাড়ি চলে এস। ওই মাগীর সঙ্গে ও যে বাস করছে, তাতে আর সন্দেহ নেই—"

"কিন্তু ছি ছি সম্পু—এমনভাবে একজন ভদ্রসন্তানের নামে"—এখানে বলা প্রয়োজন, স্বয়ম্ভাকে জিতু সরকার আদরকরে' 'সম্পু' বলে ডাকেন।

"কি? পষ্ট করে' বল না, কি বলছ"

"বলছি সুশোভন অনীতার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে ট্যাকসি করে'। সে তো আর জানে না যে অনীতা পরের ষ্টেশনে নেবে ফিরে এসেছে। তাছাড়া অনীতার সঙ্গে ওর সব জিনিস রয়েছে যে"

"জিনিস?"

"হ্যাঁ"

"কি জিনিস"

"কাপড় চোপড়, এই সব জিনিস"

"কি?"

"কাপড় চোপড় এই সব জিনিস। জিনিস—জিনিস। সুশোভনের জিনিস। বুঝতে পারছ না?"

"কি কি জিনিস"

"আরে, কি বিপদ, তার সমস্ত জিনিস। যা যা নিয়ে সে বেরিয়েছিল। হোটেলটা কি সিংহরায়েদের বাড়ির কাছাকাছি?"

"তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে যা বলছি ভাল করে' শোন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে সুশোভন ওই মাগীর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

ছি—ছি—সম্পু—যা বলছ তা ভদ্রতাবিরুদ্ধ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ভুল হচ্ছে তোমাদের। সে অনীতাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। সে মনে করেছে যে অনীতা সিংহরায়বাবুদের ওখানেই গেছে—"

"তাহলে সিংহরায়বাবুদের ওখানে না গিয়ে হোটেলে গেল কেন"

"হয়তো কিছু—"

"এবং একটি যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে?"

"মানে হয়ত কিছু—"

"বাড়ি চলে এস। অপিস বন্ধ করে দাও"

পোষ্টাফিসে টেলিফোন-গাইডটি রেখে সান্ত্বনা সেলুনের দিকে অগ্রসর হ'ল। ভিতরে ঢোকবার আগেই কানে এল অনেকগুলি লোক একসঙ্গে কথা কইছে। দ্বারের কাছে গিয়ে দেখতে পেল সুশোভনের দাড়ি অর্দ্ধেক কামানো হয়েছে, বাকি অর্দ্ধেকটায় তখনও সাবানের ফ্যানা লেগে রয়েছে, নাপিতটি ক্ষুর হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। পিলে-রোগা একটি ছোকরা এক হাতে কাঁচি এবং আর এক হাতে আয়না নিয়ে নিকটস্থ টুলটির উপর বসে নিজেই তার ছিটলারি গোঁফ জোড়াকে আরও হিটলারি করবার চেষ্টা করছে, কোণের দিকে টেবিলে আর একটি নাপিত ভুঁড়ি-ওলা এক স্থূলকায় ব্যক্তির বগল কামাচ্ছে—এবং সকলে মিলে যুগবৎ কথা কইছে। সুশোভনও। বস্তুত সুশোভনই আলোচনাটা সুরু করেছিল। অন্য কিছু নয়—মুচুকুন্দ কুন্তলেশ্বরী বাবার কোন শর্টকাট আছে কি না—।

সান্ত্বনা বুঝলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। তার চেয়ে ইতিমধ্যে বরং আর একটা কাজ সেরে ফেলা যাক। তাঁর সঙ্গে দেখা করে' কালকের রাত্রির ঘটনাটা খুলে বলা যাক। সান্ত্বনার মনে হতে লাগল অবিলম্বে এটা করা দরকার। আর এই ফাঁকেই সেটা সেরে ফেলা ভাল। সদারঙ্গবিহারীলালের ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। মোটরবাইকবিহারী সদারঙ্গবিহারীকে এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই চেনে। খোঁজ করতেই একজন বললে যে আজ সকালে তিনি ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়িতে এসেছেন। ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়ি বেশী দূরে নয়—সোজা কিছুদূর গিয়েই বাঁ-হাতি।

বড় রাস্তাটা ধরেই সোজা হাঁটতে লাগল সে এবং বলাবাহুল্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ একটি দৃশ্য হয়ে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় একটি লম্বা ফরসা যুবতী জুতো পরে' ফার-কোট গায়ে দিয়ে অসঙ্কোচে খটখটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—এ অতি চমকপ্রদ দৃশ্য। সান্ত্বনা নিজেও সেটা বুঝতে পারছিল। তার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল যেন। দরিদ্রনারায়ণ, পল্লী উন্নয়ন, নৈশ বিদ্যালয়, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহ তার—কিন্তু এখন রাস্তার দুধারে সারি সারি দণ্ডায়মান ব্যস্ত আনন দরিদ্রনারায়ণদের দেখে মনে মনে বেশ একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল বেচারী। তাকে দেখে কি ভাবছে এরা কে জানে।

জনমতকে চিরকালই ভয় তার। জনমত ভীমরুলের দংশন একবার সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অবশ্য কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার কৌতুকজনক বিবরণ জনসাধারণের গোচর হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, কে আর অত খোঁজ করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনক্রমে এটা যদি প্রচার হয়ে যায় যে, কালরাত্রে সে সুশোভনবাবুকে স্বামী বলে' চালিয়েছে এবং হরিমটর পান্থনিবাসে একঘরে রাত্রিবাস করেছে—তাহলে যা হবে তা আর কহতব্য নয়। তা ছাড়া অপরে যা-ই বলুক, তার নিজের মনের ভিতরই খচ খচ করছিল যে! কি যে কাণ্ড হল।

অবশ্য স্বামীর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। উদার গম্ভীর শান্ত মিতভাষী ব্রজেশ্বরের মুখখানা মনের উপর ভেসে উঠল—না, ও কিছু মনে করবে না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবার মতো নীচতা ওর নেই। কিন্তু তা না থাকলেও

ভেবে দেখলে জনমতকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা যদি রটে'.যায় যে কংগ্রেস-কর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের যুবতী পত্নী সুশোভন সরকারকে স্বামী বলে' পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছিল, তাহলে তো টি টি পড়ে' যাবে। এমনিতেই তো কংগ্রেস পার্টিতে শত্রুর অভাব নেই, এ খবর পেলে তো নেচে উঠবে তারা! কাল এই হতভাগা হোটেলটা দেখে প্রথমে কি আনন্দই হয়েছিল তার। না এলেই হ'ত। বেশ কেটে যেত মোটরে। মোটর ড্রাইভার ছিল, সন্দেহের কোন কারণই ঘটত না। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। ছি, ছি—

সদারঙ্গবিহারীলালের (অর্থাৎ ত্রিবেদী মশায়ের) বাড়ির কাছাকাছি এসে 'অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল সে। ওই হড়বড়ে বাক্যবাগীশ লোকটার মুখ বন্ধ করতে পারলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তার স্বামীর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের চরিমটর হোটেলে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর যদিই বা আসেন কেউ, গোঁসাইজির কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আরও কম। গোঁসাইজির কাছে আমোল পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সান্ত্বনার ভয় এই অদূরদর্শিতার ফলে তার অমন স্বামীর সুনাম পাছে নষ্ট হয়। মিতবাক খদ্দরধারী ব্যক্তিটির মূর্ত্তি আর একবার ফুটে উঠল মনে।

বেশ সপ্রতিভভাবেই সে বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়তে লাগল। ভাবটা যেন যাবার আগে দেখা করতে এসেছে, প্রসঙ্গত শুধু বলে যাবে—কাল রাত্রে কি বিপদেই পড়েছিল তারা। অতদূর হেঁটে ওই হোটেলে এসে তারা গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে বুঝল যে স্বামী-স্ত্রী বলে' নিজেদের পরিচয় না দিলে নিষ্ঠাবান গোঁসাইজি নির্ঘাত বলে' বসবেন—'সংকার করতে অক্ষম'। সুতরাং তাই পরিচয় দিতে হয়েছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল এসে অজ্ঞাতসারে তাতে বাস্তবতার এক পোঁচ রং চড়িয়ে দেওয়াতে তাদের সুবিধেই হয়ে গেল—সেজন্যও ধন্যবাদ দেবে সে। আর বেশী কিছু বলবার দরকার নেই। ওইটুকুতেই যথেষ্ট হবে।

ত্রিবেদী মশায় গামছা পরে' সর্ষপ তৈল যোগে নিজের অঙ্গমর্দ্দন করছিলেন। নিজের গাল দুটিতে হাত বুলুতে বুলুতে এসে ধীরে সুস্থে কপাট খুললেন এবং খুলেই সান্ত্বনাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। বুঝলেন সাবধানে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীবাবু ছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে গেছেন। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

সান্ত্বনা ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। "কখন ফিরবেন বলতে পারেন"

"সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না"

হাতের চেটো দুটো উভয় গণ্ডে আর একবার বুলিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চাইতে লাগলেন ত্রিবেদী মশায় যে সান্ত্বনার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

ধীরে ধীরেই ফিরে এল বেচারী। ফিরে এসে মোটরে বসে' সুশোভনের অপেক্ষা করতে লাগল। মনটা কেমন যেন খারাপ লাগছিল। নানা কথা মনে হচ্ছিল। কাল রাত্রে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে। এখন নানারকম বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা মনে হতে লাগল। যা বাক্যবাগীশ লোক, কি বলতে কোথায় যে কি বলে' বসবে! কোলকাতায় কারুও যদি কানে ওঠে, তবেই তো হয়েছে!

সুশোভনের মেজাজও ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছিল। সেলুনে মুচুকুন্দ-কুন্তলেশ্বরী সম্পর্কে যে ভৌগোলিক আলোচনা চলছিল, তা শুনে ক্রমেই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিল সে। ভাবছিল, সান্ত্বনার মুখও গোমড়া হয়ে আসছে ক্রমশ। কাল যখন মোটরে উঠল কি হাসি-হাসি মুখ, ভাসাভাসা চোখে কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি। এখন যেন একেবারে আলাদা লোক। নারী চরিত্র! দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা! কিন্তু তার অনীতা এ রকম ভেতর-বুঝে' নয়, আর যাই হোক। এ রকম ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না সে। তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল যে সুশোভন এক চুল টলে নি, টলতে পারে না, বাস্ তাহলেই মিটে যাবে। এ বিষয়ে সুশোভনের সন্দেহ ছিল না। আর তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। আগে থাকতে ভেবে লাভই বা কি। তার বিশ্বাস অনীতা বুঝবে। নাপিত গলায় তোয়ালে জড়িয়ে গালে ক্ষুর চালাতে লাগল। সুশোভন ভাবতে লাগল। অনীতার সঙ্গে দেখা হলে কি বলে' সুরু করবে।

(ক্রমশঃ)

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

Preparations for war have passed propaganda stage— যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রচারের স্তর অতিক্রম করিয়াছে। নিউইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে রুশ প্রতিনিধি মঃ ভিসিনিস্কি এই উক্তি করিয়াছেন। কোটী মানুষের উষ্ণ শোণিতস্রোতের দাগ এখনও শুকায় নাই; তিনটি মহাদেশে ধ্বংসলীলার বীভৎস চিহ্নগুলি এখনও মানুষের দানবীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার মধ্যেই আবার পরবর্ত্তী নরমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি!

দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি

এই আয়োজন কেন? কাহার স্বার্থে আবার কোটী মানুষকে বলি দিবার এই প্রয়াস? বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না, বৈজ্ঞানিক ধ্বংসকাণ্ডের মর্ম্মান্তিক স্মৃতি তাহার মনে গভীরভাবে জাগিয়া আছে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য এই, ঘটনাস্রোত তাহার আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জগতে প্রভুত্বকামী শক্তির চরম পরাভব ঘটিবে ইহাই ছিল সাধারণ মানুষের আশা। কিন্তু মাত্র দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই সে সবিস্ময়ে দেখিতেছে—প্রতিক্রিয়া-শক্তি আবার বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাগ্নি প্রজ্জলিত করিবার আয়োজন করিতেছে।

ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিঘোষিত উদ্দেশ্য। বিশ্বের জনসাধারণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার জন্য এই যুদ্ধ সমর্থন করিয়াছিল; আর সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া-শক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের ধ্বংস চাহিয়াছিল। যুদ্ধের অবসানে এই প্রতিক্রিয়া শক্তি আর এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন। প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের পরাজয় ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসাধারণ প্রতিক্রিয়া-শক্তির নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা তাহাদের সুদৃঢ় দাবী। এই জাগ্রত জনগণকে—নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এই প্রগতিশক্তিকে দাবাইয়া প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব নির্ব্বিঘ্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এই রণসজ্জা। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রগতি ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের রণসজ্জা নহে—ইহা বিশ্বের দুইটি শক্তির চরম সঙ্ঘর্ষের আয়োজন। যে শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া এবং শ্রমিকের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী, সেই শক্তিই মার্কিণ ভূমির বাহিরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপের গণ-রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হরণ, আর রাষ্ট্র হিসাবে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার ধ্বংস সাধন—এই দুইটি প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য অভিন্ন। ফ্রান্সে যে উদ্দেশ্যে বৃহত্তম বামপন্থী দলটিকে বাদ দিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলিতেছে।

এই বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য ভাগে নিউইয়র্কে জাতি সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন; প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় গত বৎসর অক্টোবর মাসে এবং চলে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত। জাতি-সঙ্ঘের গত সাধারণ অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের সহিত মীমাংসা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সে নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে; এই প্রসঙ্গ এবার পরিষদে আলোচিত হইবে। ইহা ছাড়া, প্যালেষ্টাইনের ও গ্রীসের প্রসঙ্গ, শান্তি পরিষদের "ভিটো" সংক্রান্ত প্রশ্ন, ঔপনিবেশিক সমস্যা প্রভৃতি জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন ৫৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিমণ্ডলও উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতের প্রতিনিধিদের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিউ ইয়র্কে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনও দলকে সমর্থন করিবেন না; নীতিগত দিক হইতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঔদ্ধত্য

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ লঙ্ঘনের কৈফিয়ৎ হিসাবে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্ ভারতের প্রতিই দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে হাই কমিশনার পুনর্নিয়োগে আপত্তি উঠাতেই এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে স্মাট্‌স্-নেহরু পত্রাবলীতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন—তাঁহারা ঐ নির্দ্দেশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্শাল স্মাট্‌স ভারতের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধকে তাঁহার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিণ সংবাদপত্রগুলিও সাম্প্রদায়িক বিরোধের অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাকে সহায়তা করিতেছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টই সেখানে বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সব অপ্রাসঙ্গিক কথা কিন্তু মার্শাল স্মাট্‌স গতবারও উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কাজ হয় নাই। বস্তুতঃ, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গে এবার জাতি-সঙ্ঘের পরীক্ষা। জাতি-সঙ্ঘ যদি এই সুযোগে বৃটিশ ডোমিনিয়নটিকে তাহাদের নির্দ্দেশ পালনে

বাধ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই বুঝিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রথম মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম আফ্রিকার উপর ম্যাণ্ডেটারী অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা ঐ রাজ্যটি কুক্ষীগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। জাতি-সঙ্ঘের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ঐ রাজ্যটিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না ; উহার সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের ট্রাষ্টিগণের ব্যবস্থা হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই নির্দ্দেশও লঙ্ঘন করিয়াছে এবং কৈফিয়ৎ স্বরূপ আইনগত প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছে।

"ভিটো" প্রসঙ্গ

স্বস্তি পরিষদে "ভিটো" সংক্রান্ত প্রশ্ন জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। স্বস্তি পরিষদ জাতি-সঙ্ঘ কর্ম্ম পরিষদ ; ইহার ১১জন সভ্যের মধ্যে বৃহৎ পাঁচটি শক্তি (বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া) স্থায়ী সদস্য ; আর ৬ জন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যের সর্ব্বসম্মতি ব্যতিরেকে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যেক স্থায়ী সভ্যের আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিবার যে অধিকার, তাহাই "ভিটোর" অধিকার বলিয়া পরিচিত। সোভিয়েট রুশিয়া এই অধিকার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ায় মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রব উঠিয়াছে—"ভিটোর" প্রয়োগ সঙ্কুচিত না হইলে জাতি-সঙ্ঘ অচল হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—বৃহৎ ৫টি শক্তির মধ্যে ৩টি মার্কিণ ডলারের আশ্রয়প্রার্থী। বৃটেন আমেরিকার ২৭৫ কোটি ডলার এক বৎসরের মধ্যে উড়াইয়া দিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে ওয়াল্ ষ্ট্রীটে ধর্ণা দিয়াছে ; চীন ৪ কোটী ডলার হজম করিয়া আবার ৫০ কোটী ডলারের জন্য হা করিতেছে ; ফ্রান্স সম্প্রতি ২৫ কোটী ডলার ভিক্ষা লইয়াছে। ইহা ছাড়া, স্বস্তি পরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্য রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই বৃটেন অথবা আমেরিকার প্রভাবাধীন ; তাহাদের ভোট স্বাধীন ভোট নহে। কাজেই, ভোটাধিক্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি স্বস্তি পরিষদের কাজ চলে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ঐ পরিষদে একচ্ছত্র মার্কিণ প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর নীতির দিক হইতে বলা চলে—গণতান্ত্রিক আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ভোটের জোরে জগতে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব নহে—বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যদি শান্তিমূলক কার্য্যে একমত হয়, তাহা হইলে বিশ্বের শান্তি অব্যাহত থাকা সম্ভব।

জাতি-সঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে ৫টি শক্তির সম্মতি ব্যতীত গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংস্কার হইতে পারে না। ৫টি শক্তি সহ সাধারণ পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সভ্যরাষ্ট্র যদি সংস্কারের পক্ষে ভোট দেয়, তাহা হইলেই গঠনতন্ত্রের সংস্কার সম্ভব। কাজেই, সাধারণ পরিষদে "ভিটো"র অধিকার সঙ্কুচিত করিবার জন্য কোনরূপ প্রস্তাব বানচাল হইতে পারে। অর্থাৎ "ভিটোর" অধিকার সঙ্কোচের সিদ্ধান্তও সে ভিটো করিতে পারে। এই আইনগত অসুবিধা এড়াইবার জন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কাজ করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের সকল সভ্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া একটী স্থায়ী কমিটী গঠিত হউক। সোভিয়েট রুশিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি তুলিয়াছে।

এই সম্পর্কে পরিষদে কিরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। তবে, ইহা সত্য—বৃহৎ ৫টি শক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে জাতি সঙ্ঘে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা যদি হয়, তাহা হইলে সঙ্ঘের নৈতিক মৃত্যু ঘটিবে। ইহাতে প্রতিক্রিয়া-শক্তির সমরপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে। জাতি সঙ্ঘকে উপেক্ষা করিয়া গ্রীস ও তুরস্কের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমেরিকা তৎপর হইয়াছে ; মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকার অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার আয়োজন চলিতেছে ; কোরিয়ায় মার্কিণ প্রতিনিধিরা সেখানকার গণ প্রতিষ্ঠান—পিপ্‌ল্‌স্ রিপাবলিককে উপেক্ষা করিয়া জাপানের সহযোগীদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন ; আমেরিকা তাহার নিজের শতাধিক আণবিক বোমা ধ্বংস করিতে অস্বীকার করিয়া সমগ্র জগতের আণবিক গবেষণায় কর্তৃত্ব করিতে চাহিতেছে। এই সব ঐকিক তৎপরতা বন্ধ করিয়া জাতিসঙ্ঘকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই প্রকৃত কাজ। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সঙ্ঘে আমেরিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টাই চলিতেছে। সর্ব্বসম্মতিমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ, আর আমেরিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব একই কথা।

ইরাণ-সোভিয়েট বিরোধ

জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈদেশিক সাংবাদিকেরা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল যে, সোভিয়েট রুশিয়া কর্তৃক ইরাণ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নিকটবর্ত্তী। বলা বাহুল্য, এই প্রকার কার্য্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ইরাণের বিরোধ ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু উহাকে উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধের কোনও সম্ভবনাই ঘটে নাই।

গত বৎসর এপ্রিল মাসে উত্তর ইরাণে সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে তৈল নিষ্কাষণের অধিকার সম্পর্কে ইরাণের সুলতান-মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এক চুক্তি হয়। কথা ছিল —৭ মাসের মধ্যে মজলিস্ (পার্লামেণ্ট) কর্ত্তৃক ঐ চুক্তি অনুমোদনের ব্যবস্থা হইবে। সুলতান-মন্ত্রিসভা এতদিন ঐচুক্তি অনুমোদনের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। ইতিমধ্যে ইরাণে গণতান্ত্রিক "তুদে" দলটিকে কঠোরভাবে দমন করা হইয়াছে ; কৌশলে সুলতানের নিজস্ব দলটিকে নির্ব্বাচনে জয়ী করা হইয়াছে। এদিকে ইরাণের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইরাণের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে তখন মার্কিণ কর্ম্মচারীরা প্রতিষ্ঠিত ; বিভিন্ন স্থানে আমেরিকা বিমানঘাঁটী স্থাপন করিতেছে ; আমেরিকা তুরস্ককে যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিবে, ইরাণকেও সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র প্রদানের

ভার লইয়াছে। ইরাণের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই ক্রমবর্দ্ধমান মার্কিণ প্রভাব দেখিয়া সোভিয়েট রুশিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছে এবং তৈল সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করাইবার জন্ত ইরাণ গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিতেছে।

এই তৈল চুক্তি সম্পর্কে রুশিয়ার বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার বক্তব্য—উক্ত ইরাণে (সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্ত-বর্ত্তী অঞ্চলে) কোনও বৈদেশিক শক্তিকে তৈল নিষ্কাষণের অধিকার যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াকেই সে অধিকার দিতে হইবে। ইরাণ নিজে তৈল নিষ্কাষণ করুক, তাহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি নাই। কিন্তু তৈল আহরণের নামে আমেরিকা অথবা বৃটেনকে সোভিয়েট সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত করা চলিবে না। কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার এই দাবী অসঙ্গত মনে করিবেন না। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে কোনও শত্রু রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর প্রয়োজন—সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চলে যে—সে ইরাণে তাহার সৈন্ত রাখিয়া চাপ দিয়া তৈল-চুক্তি আদায় করিয়াছিল। কিন্তু ইরাণ হইতে লাল ফৌজ চলিয়া যাইবার পরও ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ঘাটাম্-সুলতানে সোভিয়েট রুশিয়াকে জানান যে, তিনি ঐ চুক্তি মানিয়া লইবেন। তবে, ঐ তৈল অঞ্চলে শান্তি রক্ষার ভার ইরাণের উপর থাকিবে। সোভিয়েট রুশিয়া তাহার এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই—আমেরিকার প্রভাবে ইরাণ গভর্ণমেণ্টের সুর এখন বদলাইতেছে। আমেরিকা এখন গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের মধ্য দিয়া ইরাণ পর্য্যন্ত সোভিয়েট-বিরোধী দুর্গশ্রেণী রচনায় আগ্রহান্বিত। সুলতান-মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করিয়া এই সামরিক চক্রান্ত সে সকল করিতেছে।

সেবাগ্রামে বনিয়াদী বিদ্যালয়

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

বনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জ্জন করবার জন্ত আমি ছয়মাস সেবাগ্রামে থেকে এসেছি, দেখে এলুম ওখানকার ছেলেমেয়েদের হাস্যোজ্জল মুখচ্ছবি প্রতিদিনের প্রতিটি কাজের মধ্যে, তারা নিজের কাজ নিজে করতে কোন লজ্জা পায় না, তারা ভোরে সাড়ে পাঁচটায় জেগেই প্রার্থনা করে। এর পর কোন দল করিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ, কোন দল কুটিত তরকারী, কেউ কেউ প্রস্তুত করিত প্রাতরাশ—। কাজ করিত আর সকাল বেলাকার আকাশটাকে ওরা ভরে দিত গানে। তখন কি যে ভালো লাগতো, প্রাণে কি যে আশা জাগত, তা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। মাঘের সেই দারুণ শীতে বালতি দিয়ে জল তুলে

সেবাগ্রামে শিশুকর্মী (গৃহ নির্মাণে রত)

মিঃ সি-এফ্-এণ্ডরুজ, আর্য্যনায়কম্ ও আশা দেবী

পর ওরা অনাবৃত দেহে ব্যায়াম করিত—অভ্যাস করিত নানা যৌগিক আসনের ও "সূর্য্য প্রণাম"। এতেই ওদের দেহ সুন্দররূপে বিকশিত হয়েছে। শীতের ভয়ে কোনদিন ওদের কাবু হতে দেখি নি। শীতেও ওরা অনাবৃত দেহেই থাকবার অভ্যাস সাধন করেছে। কদাচিত ওদের গায়ে জামা দেখতুম। আমরা যখন জামার ওপর জামা দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি, তখনও তাদের বিনা জামায় সেই দারুণ শীতের কনকনে বাতাসে স্বাভাবিক ভাবে চলা ফিরা করতে দেখতুম। ওরা ভোরে ৫টা থেকে ৭-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত তরকারী কুটা, গম পেশা, স্নানাদি করা, গৃহ ও প্রাঙ্গণ, পথ, ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ব্যায়াম প্রভৃতি কাজ

সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজে ব্যাপৃত থাকত। বারটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা যার যার থালা বাসন হাতে নিয়ে রান্না ঘরে সারিবেঁধে খেতে যেত। সবার পাতে পরিবেশন হয়ে গেলে পর সবাই প্রার্থনা-মন্ত্রীর আদেশ ক্রমে মিনিট খানেক নীরব থেকে এই মন্ত্রটি পাঠ করে ভোজন সুরু করত। ওঁ সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওদের কণ্ঠে এই মন্ত্র যখন শুনতুম তখন মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতুম। আবহাওয়া কি সুন্দর হয়ে যেত।

ভোজনের পর ওরা ওদের নিজ নিজ থালা বাসন মেজে ঘসে ঝক-ঝকে তকতকে করে নিত। তার পর কোন দল করত আনাজ পরিষ্কার, কোন দল বিকালের জন্ত কুটতে বসত তরকারী। খেয়ে দেয়ে যে

রাজদ্রোহী ফকির

বিশ্রাম করবে তার উপায়টি নেই, যতদিন পর্য্যন্ত না এই কাজের পালা শেষ হয়েছে ততদিন পর্য্যন্ত ওদেরি গড়া নিয়মে ওরা এই কাজগুলো সুষ্ঠুরূপে সমাপন করতে বাধ্য। এসব কাজ যাদের ওপর থাকত তাদের প্রায়ই দুপুরে বিশ্রাম করা হয়ে ওঠত না। কিছুদিন আগে শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় এই শিক্ষার জন্মভূমি সেবাগ্রাম গিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন "স্কুল বাড়ীতে ঢুকে প্রথমে ছেলেদের শোবার ঘর গুলিতে পৌছলাম। পরিষ্কার ঝকঝকে ঘরগুলি, বিছানা, বই সব গুছানো; কিন্তু ঘরে কেউ ছিল না। তখন ছাত্রছাত্রীদের খোঁজে গেলাম রান্না ঘরে। সেখানেও সকলে ছিল না বটে, কিন্তু নানা বয়সের যে কটি ছাত্রী বসেছিল, তারা খুবই ব্যস্ত। ৭।৮ বছরের গুলি রুটি সেঁকছে। আমাদের সঙ্গে ২।১টা কথা বলেই তারা আবার কাজে মন দিল, কারণ এ' ত লঘু ব্যাপার নয়, রুটি পুড়িয়ে ফেললে, তাদের নিজেদেরই তো সেই পোড়ারুটি খেতে হবে। তা' ছাড়া সেদিন আবার বিশেষ খাওয়া বলতে হবে, আটার রুটি হচ্ছে—অন্যদিন তো জোয়ারের রুটিতেই চালাতে হয়। যে সময় এরা ব্যস্ত ছিল রান্না নিয়ে, সে সময় ছেলেমেয়েরা জীবনযাত্রার জন্ত অন্ত নানা কাজ করছিল। তার মানে এই যে, শিক্ষা বলতে এখানে শুধু লিখতে, পড়তে শেখা নয়, প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীরা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে।" *

আড়াইটা থেকে ছয়টা পর্য্যন্ত আবার বিদ্যালয়ের কাজে ছুটিতে হোত ওদের। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে একথা কল্পনা করার সাথে সাথেই চোখের সামনে যে ছবিখানি ভেসে ওঠে ঠিক সেই ছবিখানার সাথে সেবাগ্রামের বিদ্যালয়ের পথের ছেলেমেয়েদের কিন্তু

মহাত্মা গান্ধী ফটো—গোপাল কৃষ্ণ

একটুও মিল নেই। ওখানকার ছাত্রদের বগলে পুঁথির বদলে কাঁধে কিষাণ চরকা, হাতে হয়ত একখানা ধুনকী না হয় একখানা কুড়ল। ওরা সারি বেঁধে স্কুলে যাবার সময় যুদ্ধে যাত্রী সৈনিকদের কথা মনে জেগে ওঠে—এমন তাদের পথে চলার ভাব ভঙ্গী।

বিদ্যালয়ে গিয়েও ওদের হাত পায়ের বিশ্রাম নেই। কেউ কেউ তুলো ধুনছে, কারো পড়েছে কার্পাসের বীজ ছাড়াবার পালা, আবার কোন কোন দল হয়ত একমনে পাঁজই করে যাচ্ছে—এসব কাজ করতে করতেই ওদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়—শিক্ষক মহাশয় ওদের প্রশ্নের জবাব দেন—এই প্রশ্ন ও উত্তরের ভেতর দিয়েই ওরা প্রায় সমস্ত

---

* "শিক্ষকের কথা" চৈত্র ১৩৫১ সাল বুনিয়াদী শিক্ষা—শ্রীযুক্তা সুজাতা রায়।

জগতের ইতিহাস—ভূগোল, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম ও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির খবর ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করে নেয়। এটাই হোল বনিয়াদী শিক্ষার সমবায়। কাজ করতে করতে যদি ওদের মনে কোন প্রশ্নই না জাগে তবে কাজের ভেতরেই সময় কেটে যাবে—শিক্ষক মহাশয় ভাববেন না যে আজ কিছু তাদের শিখানো গেলো না। জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার জন্ত শিক্ষক মহাশয়ের একটুও আগ্রহ থাকে না। তাই ওখানকার ছেলেমেয়েরা শিশু রবীন্দ্রনাথের মত পাঠশালা

সেবাগ্রামে শিশুকর্মী (জল উত্তোলন)

থেকে পালিয়ে আসবার জন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করে না। ছুটির ঘণ্টা বেজে যায় তবু তারা আরো একটু কথা শুনবার জন্ত বসে থাকে শিক্ষককে ঘিরে—এমন একটা সুন্দর মিষ্টি আবহাওয়া বিত্তালয়ের ভেতরটায়।

ছয়টার পর ছুটি। সাড়ে ছয়টায় ভোজন। রাত্রের খাওয়া এ সময়েই শেষ হয়ে যায়। ভোজনান্তে সাতটায় সমবেত প্রার্থনা। বিত্তালয়ের ছেলেমেয়েরা বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া গান্ধীজীর প্রার্থনায় যায় না। ওরা ওদেরই প্রাঙ্গণে বসে প্রার্থনা করে নেয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য-যোগের ৫৪ শ্লোক অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত ও কোরাণ শরিফের একটা শ্লোক। এই শ্লোকগুলি শ্রদ্ধেয় বিনোবা ভাবেজীর মারাঠা অনুবাদ। এগুলোই ওরা তখন সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করে। উপাসনার পর রাত আটটায় আধ পাউণ্ড (এক পোয়া) দুধ পান করে খবরের কাগজ নিয়ে বসত মুক্ত প্রাঙ্গণের মাঝটায় আলো জ্বালিয়ে—যুদ্ধের খবর পড়ত, আর নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করত। কেউ কেউ আবার লাইব্রেরী থেকে বই এনে এ সুযোগে পড়ে নিত। কোন কোন দিন উপাসনার শেষে বিশেষভাবে ওরা ভজনের আয়োজন করত, তখন কত সুন্দর সুন্দর মারাঠি ভজন ওদের মিষ্টি কণ্ঠে শুনতুম। নিজেরাই খঞ্জনী বাজিয়ে মাথা নেড়ে হাত তুলে অতি স্বাভাবিক ভাবে ওরা যখন গান গুলি করত, তখন নিজের ভেতরের মানুষটি না নেচে—পারত না। সাড়ে নয়টা বেজে গেলে পর ছোটদের শোবার ঘণ্টা পড়ত—আর তখন দেখতুম টু শব্দটি না করে ওদের শুয়ে পড়তে। এমন ভাবে প্রতিদিন ওরা নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের কাজগুলো পালন করবার অভ্যাস সাধন করছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছে একটা নূতন মানব-সমাজ রচনা করবার কর্ম্মকুশলতা। যে সমাজের স্বপ্নে আজ মহাত্মা গান্ধী বিভোর, ভারতের লক্ষ লক্ষ কর্ম্মী যে সমাজের ভিত্তি ভূমি সুদৃঢ় করে চলেছেন নিজের প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে—সেই আদর্শ মানব সমাজের আদর্শ পুরুষ ও নারী যাতে ওরা হতে পারে এরই সাধনা চলেছে সেবাগ্রামের বনিয়াদী বিত্তালয়ের মধ্যে।

তপশিলী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তপ্‌শিলী মোরা—খাঁটি শিলীমুখ জেনো,
ভোর হয়ে আছি হরি নাম মধু পানে,
ওই গুঞ্জন ভুলাবে কে আছে হেন ?
ফুল ফোটানেরা, হুল ফুটাইতে জানে।

২

আমরা হিন্দু ওই এক পরিচয়
কাহার সাধ্য করে দেয় ছাড়াছাড়ি ?
চূড়া থেকে গোড়া সবটুকু হিমালয়।
গোমুখী গঙ্গাসাগরেতে একই বারি।

৩

ছোট বড় ঘাট, আমরা পঞ্চ ভাই—
বড়রে রাখিতে—লাঠিকে রোধিব লাঠি
শত ভেদ থাক—তবু ভেদাভেদ নাই
এক পরিবার একই বসত বাটী।

৪

অস্থি মজ্জা রক্তেতে হরি নাম,
উদ্বেল প্রাণ শঙ্খ ঘণ্টা রবে।
রক্ষা কর্ত্তা নিজে রাবণারি রাম
আমাদিকে কোন ধর্ম্মের কথা কবে ?

৫

লোভ দেখাইয়া ভুলাইবে তুমি কারে ?
শ্মশানবাসিনী শ্যামা যে মোদের মা,
পরমার্থ কি অর্থেতে দিতে পারে ?
স্বার্থের কথা শুনে জ্বলে যায় গা।

৬

কনক মৃগের চাতুরী আমরা চিনি
সিদ্ধ আমরা সব সাধনায় প্রিয়,
চিরদিন মোরা বিদুরের কাছে ঋণী
এড়াইতে পারি গোভন জতুগৃহ।

। যোধপুর

পূর্ব্বেই বলেছি যোধপুরের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল।

প্রাচীন রাজধানী 'মান্দোর' পরিত্যাগ করে রাও যোধাজী যখন এই যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় তিনি এই দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন।

কাজেই রাও যোধাজী নগর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ নির্ম্মাণও সুরু করেন।

তদানিন্তন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দুর্গের মধ্যেই মহারাজা বাস করতেন। সুতরাং দুর্গের 'মধ্যেই সেনা-নিবাস, অস্ত্রাগার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সামরিক ব্যবস্থা ছাড়াও, রাজপ্রাসাদ, রাণীদের মহল, দাসদাসীদের আবাস প্রভৃতি সবই নিরাপত্তার জন্য দুর্গের মধ্যেই নির্ম্মিত হত।

যোধপুরের প্রাচীন নগরের প্রাকারবেষ্টিত তোরণ দ্বার

প্রাচীন যোধপুরের বাজার

নূতন রাজধানী পত্তনের কারণই হ'ল রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান। রাজ্য নিরাপদ রাখতে হলে সেকালে প্রয়োজন ছিল সুদৃঢ় দুর্গের। যোধপুর দুর্গের মধ্যেও এ সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু মহারাজারা এখন আর বন্দীর মতো দুর্গের মধ্যে বাস করেন না। তাঁরা দুর্গের

বাইরে বেরিয়ে এসে এক একজন নিজের ইচ্ছা রুচি ও পছন্দ মতো স্থানে বসবাসের জন্য এক একটি পৃথক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।

আমরা যখন যোধপুরে যাই, তখন যিনি যোধপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরই ইচ্ছানুসারে পূর্ব্ববর্ণিত 'চিতোরপ্রাসাদ' নির্ম্মিত হয়েছিল। সম্প্রতি আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হ'তেই তিনি তাঁর এই নবনির্ম্মিত প্রাসাদে এসে বসবাস করছিলেন। তাঁর অভিলাষ তিনি পূর্ণ ক'রে যেতে পেরেছেন।

স্বর্গগত মহারাজ অত্যন্ত অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁর চরিত্র রাজপুত নৃপতিদের মধ্যে আদর্শ স্বরূপ ছিল। একমাত্র পত্নীকে নিয়েই তিনি পরিতুষ্ট ছিলেন। অন্যান্য রাজাদের ন্যায় তাঁর একাধিক রাণী ছিল না। তাঁর পাঁচটি ছেলে মেয়ে। বড় দুটি ছেলে সাবালক। যুবরাজ পিতার বহুগুণের অধিকারী। ইনি বিবাহিত এবং পত্নী-নিষ্ঠ। মহারাণী একজন আদর্শ ভারত মহিলা। তিনি প্রাসাদে তাঁর ঠাকুরঘর নির্ম্মাণ ক'রে নিয়েছেন। ভোরে উঠে স্নান করে তিনি নিত্যপূজায় বসেন। পূজান্তে তিনি সাংসারিক কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। স্বামী পুত্রকন্যা ও নাতিনাতনীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি। কোনো ছেলে মেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়লে তিনি নিজে তার সেবা-শুশ্রূষার ভার নেন। ডাক্তার ও নার্সদের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন না। রাজপুতানার অধিকাংশ রাজারাণীরা অধুনা মেমসাহেব বনে গেছেন। পার্টি, সোস্যাল, লেটেষ্ট্ প্যারিস ও লণ্ডনের ফ্যাসান, দামী শাড়ী, বহুমূল্য জহরত, তার সঙ্গে ককটেল, সিগারেট, টেনিস্, মটোরপ্রাইড, শিকার, বিমান-বিহার এই সব নিয়েই আছেন। বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কণ্টিনেণ্টে কাটিয়ে আসেন তাঁরা। তাঁদের বিলাতী সেক্রেটারী ও গভর্ণেসরা এই সব রাজারাণীদের পুরোদস্তুর য়ুরোপীয় করে তোলার সাধনায় অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন।

কেবলমাত্র State Function অর্থাৎ রাজ্যের কতকগুলি প্রচলিত প্রাচীন উৎসব উপলক্ষে ও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমারোহে যে দরবার বা রাজসভা, মিছিল বা শোভাযাত্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়, সেগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায়। আবার, পোলো, ক্রিকেট, ঘোড়দৌড়, টেনিস্ ও বিলিয়ার্ড টুর্ণামেণ্ট্ এবং বিলাতী কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির অভ্যর্থনা উপলক্ষে বা লাট বেলাটের সংবর্দ্ধনায় যে ডিনার পার্টি, ড্যান্স্, বা টি-পার্টির ব্যবস্থা হয় তা' সম্পূর্ণ নিখুঁৎ বিলাতী আদব-কায়দায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

যোধপুরের মহারাজা পোলো খেলায় অদ্বিতীয় ছিলেন একথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর নেতৃত্বে যোধপুর পোলো টিম দিগ্বিজয়ীর খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বৈমানিক হিসাবে যোধপুরের মহারাজার তুল্য দক্ষতা আর কেউ দাবী করতে পারতেন না। খেলাধুলা ইত্যাদি সখের ব্যাপার। যুদ্ধের মধ্যে সামরিক কৃতিত্ব অর্জ্জনের দিক দিয়েও যোধপুর কারও পশ্চাৎপদ নয়। বিকানীর মহারাজের "ক্যামেল কোর" বা উষ্ট্রবাহিনী যেমন আফ্রিকার

যোধপুরের মহারাজা বাহাদুর

মরুযুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বীর যশ অর্জ্জন করেছে, তেমনি সম্মুখযুদ্ধে শত্রুর ব্যূহ ও বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হবার দুঃসাহস দেখিয়ে "যোধপুর লান্সার্" আজ বিশ্ববিখ্যাত। যোধপুরী পায়জামার বিশেষত্বের জন্য যতটা না হোক, যোধপুরী যোদ্ধাদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েই আজ য়ুরোপের অভিজাত ও সামরিক ঘোড়-সওয়ারগণও "যোধপুর ব্রীচেস্" সগর্ব্বে পরিধান করেন। রাজপুতের দেশে যোধপুরের প্রাধান্য যোধকরি উদয়পুর ও জয়পুরের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।

মহারাজ উচ্চশিক্ষায় একান্ত অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালীরা ভারতে সবচেয়ে অগ্রসর বলে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজে তিনি বাঙালীদের নিয়োগ করেছেন। যোধপুরে বাঙালীর প্রতিপত্তি তাঁর পৈতৃক আমল থেকে চলে আসছে, কিন্তু

সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, দেশীয় লোকেরাই আজকাল উচ্চশিক্ষা লাভ করে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার নেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করছে এবং একে একে নানা বিভাগে উচ্চ রাজকীয় পদ অধিকার করছে। রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধেও এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যেই একদিন বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী। কিন্তু কিছুদিন থেকে মাদ্রাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙালী হটে আসছে বা আসতে বাধ্য হয়েছে।

রাজ্যের উচ্চ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মহারাজ ও রাজপরিবারের ব্যবহার এত সুন্দর যে চপে দেখে না এলে হয়ত আমরা তা বিশ্বাস করতে পারতুম না। রাজপরিবারের যিনি প্রধান চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মজুমদার মহাশয়কে দেখেছি যেন রাজপরিবারেরই একজন আত্মীয়ের মতন। আমাদের বন্ধু স্থাপত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে দেখেছি যেন যুবরাজদেরই একজন সমবয়সী বন্ধুর মতো। যোধপুরে তাঁদের বিশেষ খাতির ও মর্য্যাদা দেখে এসেছি। রাজ্যে তাঁদের সম্মান রাজপরিবারের অন্তর্গত কারুর চেয়েই কম নয়। মহারাজ ও যুবরাজেরা তাঁদের শুধু ভালবাসেন না, তাঁদের চরিত্রগুণে শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন।

ভরতপুরের দুর্গ যেমন সেকালে দুর্ভেদ্যতার গুণে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, মানসিংহের অম্বর-দুর্গ যেমন ঐশ্বর্য্য সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ, যোধপুরের এই গিরিদুর্গ তেমনি বিশালতার জন্য বিখ্যাত। এর মধ্যে সব কিছুই আছে। এই দুর্গ যেন সতর্ক প্রহরীর মত দিবারাত্র পর্ব্বত চূড়ায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যোধপুর রাজধানীকে পাহারা দিচ্ছে। দূর থেকে এই বিশাল সুউচ্চ দুর্গটি দেখলে মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব আপনি জেগে ওঠে। যোধপুর রাজ্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও যোধপুরী যোদ্ধাদের সমস্ত বীর্য্য যেন এই শৈলশিখরস্থ দুর্গটিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই দুর্গের প্রতি পাষাণ ফলকে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কত বীরত্বের ঐতিহাসিক কাহিনী—কত লজ্জা—কত বেদনা! অতীত ভারতের বিলুপ্তপ্রায় গৌরবের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত এর বুকে। যোধপুর

রতনাদা প্রাসাদ

"সোজাতীর" তোরণ
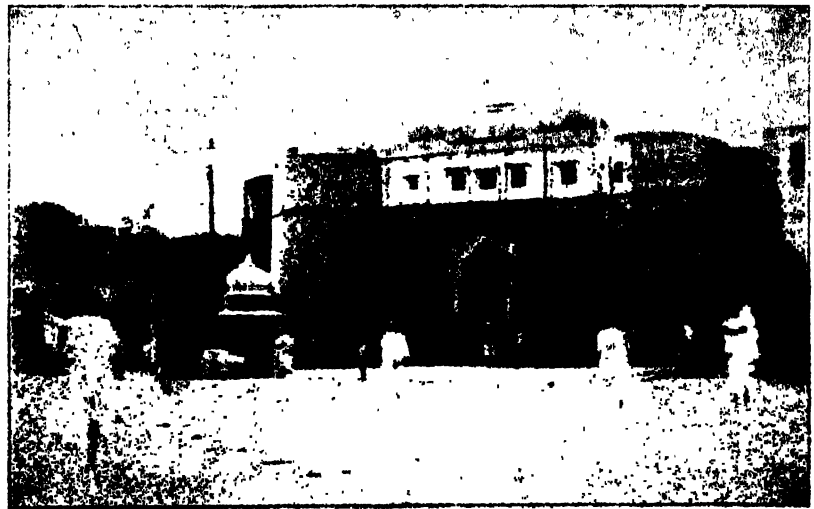
দুর্গের অস্ত্রাগারে সঞ্চিত হয়ে আছে যে সব প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, অসি, ধনুঃশর, ভল্ল, শেল, শূল, কাটা, খড়্গ, খঞ্জর, দীর্ঘ বর্শাফলক, বর্ম্মচর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, নানা আকারের ছোট বড় বন্দুক, কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য বহু সামরিক দ্রব্যাদি। রাজা মহারাজাদের নিজের ব্যবহারের বন্দুকগুলি প্রায়ই স্বর্ণ মণ্ডিত এবং চুনী পান্না হীরা জহরৎ

সংযুক্ত তাঁদের তরবারির খাপ ও হাতলগুলিও স্বর্ণ রৌপ্যে গঠিত ও বহুমূল্য মণিরত্নখচিত। পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে এগুলিকে এক অমূল্য সংগ্রহ বলা চলে।

যে শৈল শিখরে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়েছিল তার চূড়া ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই শিখরদেশটিকে সমতল করে নিতে হয়েছিল। দুর্গের চালু পথ সমতল ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত প্রধান তোরণ থেকে সুরু হয়ে পাহাড়ের উপর দুর্গের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত উঠে গেছে। পর পর সাতটি কটক পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রত্যেক কটকে সঙীন-খাড়া প্রহরীরা দুর্গ প্রবেশকে দুর্গম করে রেখেছে।

ধীরেন ভায়া যেদিন আমাদের এই দুর্গ দেখাতে নিয়ে গেলেন সেদিন বিনীতভাবে দুটি অনুরোধ জানালেন। বললেন, এখানে পায়জামা ও পাগড়ি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ! তবে আপনারা বাংলা দেশের অতিথি, আপনাদের পায়জামার পরিবর্ত্তে কাপড়খানাই মাল-কোচা বেঁধে পরে গেলেই চলবে।

চিতোর প্রাসাদ

বললুম—পায়জামার দায় থেকে তো উদ্ধার করলে, কিন্তু পাগড়ি পাই কোথা?

ধীরেন বললে—রুমাল থাকে যদি পকেটে, বার করে মাথায় বেঁধে নিন। তাতেই নিয়ম রক্ষা হবে। একেবারে নেহাৎ 'নাঙ্গা-শির' না হ'লেই হল।

বাবাজী খাঁ করে মালকোঁচা বেঁধে ফেললেন এবং পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মাথায় জড়ালেন!

আমিও মল্লদের মতো কাপড়ের কোঁচা কাছার দিকে ঘুরিয়ে নিলুম বটে, কিন্তু জামার সবকটা পকেট হাতড়েও একখানা রুমাল খুঁজে পেলুম না! বেরুবার সময় ভুল হয়ে গেছে আনতে।

প্রাসাদের আঙিনায়। (দক্ষিণে নবনীতার পিছনে দাঁড়িয়ে গুপ্তসাহেব)

শ্রীমতী হেসে তাঁর হাতব্যাগ থেকে বার করে দিলেন—রুমাল নয়, দুটি টুপী! আমারই টুপী। একটি প্রাচীন কাশ্মিরী শালের পৈতৃক টুপী, আর একটি গান্ধীক্যাপ!'

টুপী পরার বিশেষ পক্ষপাতী আমি নই। ১৯৩১ সালে মাতৃবিয়োগের পর মুণ্ডিত মস্তক আবৃত করবার জন্যই একটি গান্ধী টুপী কিনেছিলুম। [illegible]

মূলদেশ, যা পার্ব্বত্য-ভিত্তি নিম্নভূমি থেকে প্রায় ১২০ ফুট উঁচু। এই ১২০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে [illegible]

আমাদের কবি-বন্ধু স্বর্গগত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কেশবিরল বন্ধুদের এই টুপী পরার রহস্য আমাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তিনি একে টুপী না বলে, বলতেন—'টাকের গেলাপ'! আমাদের আর এক সৌখীন কাব্যরসিক সুপুরুষ বন্ধু মাথায় কিছু বেঁটে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুন্দরী পত্নী ছিলেন দেবদারু তরুর মতো দীর্ঘাঙ্গী ও তন্বী। বন্ধুবর শেষে অনেক বুদ্ধি ক'রে তাঁর এই হ্রস্বতাটুকু লোকচক্ষুর আড়াল করতে পেরেছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘাবয়ব টুপী মাথায় দিয়ে তাঁর উচ্চতা প্রায় পত্নীর সমান ক'রে এনেছিলেন! আমরা যদি কেউ তাঁকে অপ্রতিভ করবার জন্য সভার মধ্যে জিজ্ঞাসা করতুম—"একি! মাথায় আবার এত বড় এক টুপী কিসের?"

তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়েই চোখ টিপে একবার পত্নীর দিকে চেয়ে চাপা কণ্ঠে বলতেন—"চুপ! এটা গাধার টুপী!"

শ্রীমতী আমার গৃহে বধূ হয়ে আসবার পূর্ব্বে একবার রাজপুতানা বেড়িয়ে এসেছিলেন। এদেশের আদব-কায়দা অনুসারে টুপী মাথায় দেবার যে দরকার হবেই এটা তিনি জানতেন। তাই আমার দুটি টুপীই তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। টুপীর দেশে অর্থাৎ উত্তর ভারত ভ্রমণকালে আমি বরাবর এই টুপী ও গান্ধীক্যাপ পরেই ঘুরেছি। পাগড়ির দেশে এসে তা' খুলে রেখেছিলুম। উপস্থিত সেই টুপী দুটি খুব কাজে লেগে গেল। বর্গীদের মতো মাথায় রুমাল বেঁধে চলাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন একটু পেছিয়ে পড়া জাতের পরিচয় বয়ে বলে মনে হয়। বাবাজীকে তাই শালের টুপীটা দিয়ে বললুম রুমালখানা খুলে এই টুপীটা পরো।

মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বিধি নিষেধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ধীরেন তারা বললেন—বিশেষ কিছু না, শুধু, বৌদি ঘোমটাটা যদি না দেন, অন্ততঃ মাথার কাপড়টা যেন তুলে রাখেন। একখানা ওড়না মাথায় থাকলেই ভাল হ'ত। তবে, মাথার কাপড়ের আঁচলটা টানা থাকলেও চলে।

অতিথিদের জন্য স্টেট্ বগ্‌গী
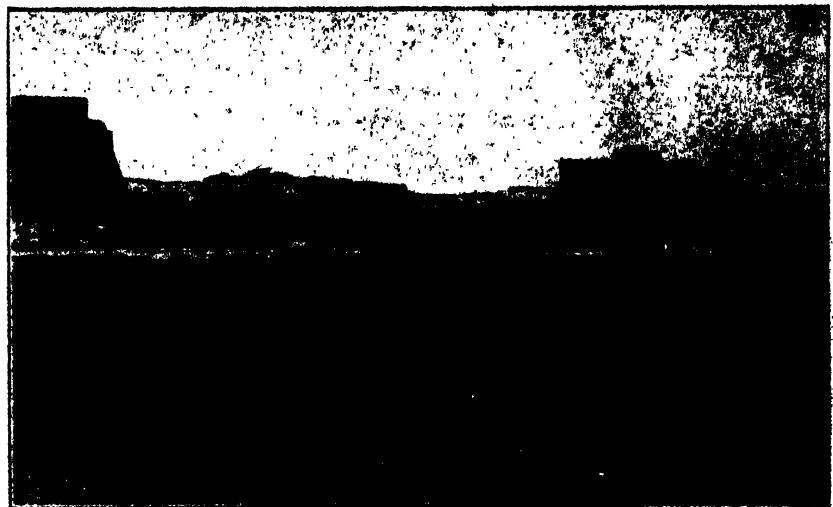
পোলো গ্রাউণ্ড (দক্ষিণ কোণে জাহাজ কুঠি)

ধীরেন তারার দ্বিতীয় অনুরোধ ছিল কেল্লার মধ্যে মাথায় ছাতা আপনারা কেউ অনুগ্রহ করে ছাতা মাথায় দেবেন না! এ অনুশাসন শুনে আমরা খুড়ো ভাইপো দু'জনেই বেশ একটু দমে গেলুম। কারণ,

আমাদের দু'জনেরই রৌদ্রতপ্ত দিনে বিনা ছাতায় পথ চলা একেবারেই অভ্যাস নেই। তাই আমাদের দু'জনের হাতেই ছুটি ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা ছাতা ছিল। ব্ল্যাকমার্কেট থেকে ডবল দামে কেনা। কারণ যুদ্ধের বাজারে আর সকল জিনিসের মতো ছাতাও কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছিল। কাজেই আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করলুম--এ রকম এক বেয়াড়া নিয়মের অর্থ কি? সাধে কি লোকে বলে—মেড়োর দেশ!"

ধীরেন ভায়া একটু হেসে বললেন—"একমাত্র স্বয়ং মহারাজা ছাড়া দুর্গের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে যাবার রাজকীয় সম্মান আর কাউকে দেওয়া হয় না।"

আমাদের দু'জনেরই ছত্র নিবারণ আইনমানা সম্বন্ধে একটু ইতস্তত কুণ্ঠিতভাব ও মুখের সকরুণ অবস্থা দেখেই বোধ করি গুপ্তসাহেব বললেন, "ভয় নেই। একটু এধার ওধার চেয়ে দেখে মাথায় দেবেন মশাই।"

আমরা মুখে বললুম বটে—না না, সেকি কথা! নিয়ম যা তা মানতেই হবে। "যস্মিন দেশে যদাচারঃ" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথা রাখতে পারিনি। (ক্রমশঃ)

স্বাধীনতা

শ্রীকৃষ্ণাবতী দেবী

জানিয়াছি ভাই, শুনেছি সত্য—স্বাধীন হয়েছে অর্দ্ধ বঙ্গ,
আধেক অঙ্গ আলোক দীপ্ত—আঁধারে ঢাকিল আধেক অঙ্গ।
আমি কি ধরেছি অশোক চক্র, তুমি কি ধরিলে তারকা চাঁদ?
বিষ নাগপাশে—জগতে নিজেরে—সবে মিলে ভাই রচিনু ফাঁদ।
বিশাল নদীর দু'দিকে আমরা, কাণ্ডারীহীন তরণীখানি,
সব মিছে, সব মরীচিকা, যদি তোমারে না দেয় নিকটে আনি।
কিসের প্রদীপ জ্বালাইব ভাই, কোন সে ঝাণ্ডা উড়াব আজ?
মাথা নীচু কর—নয়ন নামাও, ঢাকো ভারতের গভীর লাজ।
বিশ্ববাসীরা কেহ অবহেলে কেহবা পরম কৌতূহলে—
গোপন হর্ষে করে কানাকানি, মিথ্যার সম বেদনা ছলে।
যে মহাভারত নিজ মহিমায় ছিল ধরণীর মুকুট ভূষা,
চারিদিকে তার শত্রু হাসিছে সেই ভারতের দেখিয়া দশা!

হেন স্বাধীনতা চাহিনি আমরা চাহেনি কখনো দেশের কেহ,
যে স্বাধীনতায় পর হয়ে যায় নিজ ভাই বোন নিজের গেহ।
অয়ি দেশমাতা, পরাধীনকালে ছিলাম সকলে তোমার কোলে,
আধেক সন্তানে দিয়ে বিসর্জ্জন—আজ কি তুমি মা স্বাধীন হলে?

যাদের শৌর্য সাহসের বলে পেয়েছে বাঙ্গালী এ স্বাধীনতা,
পশ্চিমে বসি বিপদ এড়ায়ে ভুলিল কি আজ তাদের কথা?
নিজ বাহু বল ভুলেছ কি ভাই, কেন রহিয়াছ পরের দেশে?
তব অর্জ্জিত স্বাধীন বঙ্গে কেন না আসিছ বিজয়ী বেশে?
কার দয়া কার করুণা আশায় অপরাধী সম রহিলে বসি?
তোমার অভাবে পশ্চিম আজ আঁধার আকুল বিহীন শশী।

ভাই বোন সখা শতেক স্বজন পরদেশে যদি রহিয়া যায়,
আধ খণ্ডিত ছিন্ন অঙ্গে কি কাজ হবে এ স্বাধীনতায়?
প্রভু হে বিধাতা! বঙ্গের ভালে কি দারুণ লিপি লিখিয়াছিলে!
শত বরষের দুঃখ ও তাপ সাধনায় এই বিধান দিলে?

সাধের পদ্মা হারায়েছে আজ আঁধারে না পাই পথের দিশা
অশ্রু আকুল নয়নে পূরবে চাহিয়া কাটাই দিবস নিশা।
স্বাধীন কি আমি? কোথায় আমার প্রাণাধিক প্রিয় জনম ভূমি?
কোথায় রাখি মা প্রণাম আমার, হে দেশ জননী কোথায় তুমি?
করতোয়া হতে শীতল লক্ষ্যা, ছিল এক দেশ একটি ঘর,
তরবারি হাতে স্বাধীনতা এসে দু'ভাগে কাটিয়া করিল পর।
আমি নিরাপদ দূর ব্যবধানে—নিরুপায় আজ আমারি ভাই,
কি কারণে এই অবিচার হবে এই কথা আজ জানিতে চাই।
জানাইতে চাই উচ্চকণ্ঠে এ স্বাধীনতায় নাহিক কাজ
দেহ হতে প্রাণ তফাৎ রাখিয়া চাহি না পরিতে নকল সাজ।
পশ্চিমে যায় প্রাণহীন কায় পূরব উত্তরে জীবন তার,
সকল আশার সমাধি রচিল স্বাধীন দেশের এ সুবিচার।
কোথা আত্রেয়ী পদ্মা যমুনা মায়ের সমান করুণাবতী,
ধবল সলিলা ধলেশ্বরী মা ব্রহ্মপুত্র ইচ্ছামতী।
প্রিয়তম দেশ প্রিয় নদ নদী কোন পাপে আজ আমার নহে,
স্বাধীনতা নামে অবমাননায় অগ্নি দহনে অঙ্গ দহে!

স্বাধীনতা নামে সর্ব্বনাশের বিনাশ বজ্র পড়িল শিরে
জাগে ধিক্কার ওঠে অভিশাপ পাঞ্জাব আর বাংলা ঘিরে।
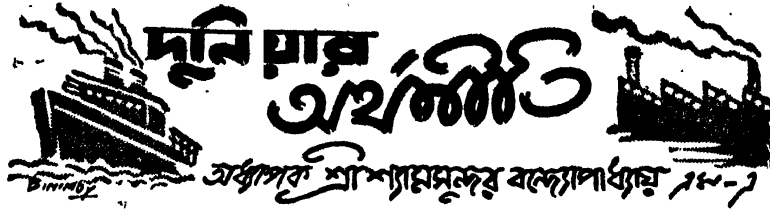
ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের নবযুগ

ভারতবর্ষ কাঁচা মালে সমৃদ্ধ দেশ। এই বিরাট দেশের শিল্প-ভবিষ্যতও অত্যুজ্জল সন্দেহ নাই। কাঁচা মাল রপ্তানীকারক ও ভোগ্যপণ্য আমদানীকারক দেশ হিসাবে এতদিন ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে; এখন সাধারণভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের পণ্য আমদানী-রপ্তানী বা বহির্বাণিজ্য অবশ্যই দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষের কিছুটা সম্ভ্রম থাকিলেও এতকাল জাহাজী ব্যবসার দিক হইতে ভারতের অবস্থা শোচনীয় ছিল। ভারতের উপকূলভাগের আয়তন সাড়ে চার হাজার মাইলের মত। বিরাট বহির্বাণিজ্য ছাড়া এই উপকূল বাণিজ্যেও ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা এতকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মাল চলাচলে নিযুক্ত জাহাজ কোম্পানী-গুলির মোট আয় হয় ৫৭ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মাত্র ৭ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ টন। এই সময় সারা পৃথিবীতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন বাণিজ্য জাহাজ ছিল এবং শুধু মাত্র ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ শতকরা মাত্র ২০ ভাগ অংশ গ্রহণ করিত।

প্রধানতঃ ব্রিটিশ জাহাজী ব্যবসায়ের স্বার্থরক্ষার জন্যই যে বিদেশী আমলাতান্ত্রিক সরকার ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়কে এভাবে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া এখন আর আলোচনা না করিলেও চলে। সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির নানা বিভাগে এখন যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ভারত সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের পরিকল্পনা হইতেই তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি (Shipping Policy sub-committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের বিরাট ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টে প্রদত্ত পরামর্শগুলি মূল্যবান এবং আগের মত রিপোর্ট দপ্তরে ধামা চাপা না পড়িলে (বর্ত্তমান জাতীয় সরকারের আমলে তাহা আশা করা যায় না) ইহাতে অবশ্যই অনেক কাজ হইবে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর ভারত সরকারকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয় জাহাজ এদেশের উপকূল বাণিজ্যের শতকরা ১০০ ভাগ, ভারতের সহিত সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দেশের বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ভারতের সহিত দূরবর্ত্তী দেশগুলির বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পরিচালনা করিতে পারে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে আগে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্য জাহাজ যে বাণিজ্য পরিচালনা করিত, কমিটি এখন ভারতীয় জাহাজ দ্বারা তাহার শতকরা ৩০ ভাগ পরিচালনা করাইবার সুপারিশ করিয়াছেন।

রিপোর্ট অনুসারে কোন একটি কোম্পানীকে ভারতীয় কোম্পানী বলা হইবে তখনই, যখন:—(১) ইহা ভারতের কোন বন্দরে রেজিষ্ট্রিকৃত হইবে;

(২) ভারতীয়েরা নিজেদের টাকায় ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ মূলধন যোগাইবে;

(৩) সমস্ত পরিচালক ভারতীয় হইবেন;

(৪) কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ থাকিলে তাঁহাদিগকে ভারতীয় হইতে হইবে।

ভারত সরকার ভারতের জাহাজী ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও যে এ বিষয়ে কার্য্যকরী উৎসাহ দেখাইতেছেন, ইহা সত্যই আশার কথা। সম্প্রতি কয়েকটি ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে জাহাজ সংগ্রহ করিয়া কাজ-কারবার বাড়াইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন' ও 'ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫০ হাজার টন মাল বহনের উপযোগী পাঁচখানি বাণিজ্য জাহাজ কিনিয়াছেন। এই জাহাজগুলি এখন ভারতবর্ষ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বন্দরসমূহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই জাহাজগুলি ভারতে আসিবার সময় ৪৮ হাজার টন খাদ্যশস্য বহন করিয়া আনিয়াছে। ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানীও সম্প্রতি আটখানি 'লিবার্টি সিপ' ক্রয় করিয়াছেন; এই জাহাজগুলি ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। সিন্ধিয়া-ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই পশ্চিম আমেরিকার বন্দরগুলির এবং সমগ্রভাবে সারা পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানীও শীঘ্র উপকূল বাণিজ্য ছাড়া ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশীয় কোম্পানীগুলির কার্য্যক্রম বাড়াইবার এই চেষ্টা জাতীয় স্বার্থের হিসাবে মূল্যবান সন্দেহ নাই।

আশা করা যায় এইবার ভারতে জাতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যবসায়ও দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে। ভিজাগাপত্তনের কারখানা সম্প্রসারণের চেষ্টা এই উন্নতির অনুপূরক; তাছাড়া চেষ্টা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এখন ভারতীয় কোম্পানীসমূহ অনেক উদ্বৃত্ত যুদ্ধ জাহাজ কিনিয়া লইয়া সুবিধামত সেগুলিকে বাণিজ্য জাহাজে রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারেন। অবশ্য বর্ত্তমান ডলার সঙ্কটের দিনে এইভাবে মার্কিন জাহাজ কেনার প্রত্যক্ষ অসুবিধা আছে; তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারত সরকারের পূর্ণ সংযোগিতা আশা করা যায় বলিয়া ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির এই ধরণের আন্তরিক চেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূ না হইয়া পারে না।

মিউনিসিপালিটি প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটির অবস্থাই শোচনীয়। বেশীর ভাগ মিউনিসিপাল এলাকাতেই রাস্তায় আলোর, নিয়মিতভাবে রাস্তা পরিষ্কারের বা রাস্তাঘাট মেরামতের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না। অধিবাসীদের এই অব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় ক্ষেত্রেই উত্তর আসে—'আর বলবেন না, যতো চোরের কারবার, এসব দিকে নজর দিলে কর্ত্তাদের পকেটে যে টান পড়বে।' বলা নিষ্প্রয়োজন, করদাতাদের পক্ষ হইতে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের সততা সম্পর্কে এই ধরণের সন্দেহ প্রকাশ অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। এই কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ; নির্ব্বাচকদের অনাস্থাভাজন হওয়ার মত লজ্জার বিষয় তাঁহাদের আর কিছুই নাই।

মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের এই ধরণের কোন দুর্নীতিপরায়ণতা প্রমাণিত হইলে সে সম্বন্ধে কঠোর শাস্তিবিধান (কারাবাস, বেত্রদণ্ড, অর্থদণ্ড ইত্যাদি) অবশ্যই আবশ্যক। এইরূপ সমাজ-শত্রুদের শিক্ষা দেওয়া ভারতের জাতীয় সরকারের একটি বড় কর্ত্তব্য। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু পরিচালকবৃন্দ অপব্যয় বা চুরি করেন বলিয়াই মিউনিসিপালিটি পরিচালনায় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না। মিউনিসিপালিটিগুলির কাজ যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, বর্ত্তমানে সেরূপ অর্থাগমেরও কোন সুযোগ নাই। যে সব মিউনিসিপালিটিতে কলকারখানার সংখ্যা বেশী তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বসত বাড়ীর সংখ্যা যে সব মিউনিসিপালিটিতে বেশী, সেগুলির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের সময় হইতে মিউনিসিপাল সহর গুলিতে লোকজন বাড়িয়াছে, রাস্তা দিয়া অবিরাম ভারী ভারী গাড়ী যাতায়াত করিতেছে, পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া একই সঙ্গে মিউনিসিপালিটিগুলিকে জনস্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাট রক্ষায় বাড়তি ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। ততাবলের বর্ত্তমান অবস্থায় এইভাবে কাজ চালা না অসম্ভব। মিউনিসিপাল এলাকাগুলিতে ট্যাক্সের হার একরকম স্থির আছে, অথচ নানাভাবে মিউনিসিপালিটিগুলির কার্য্য পরিচালনার ব্যয় আগের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে পরিচালকবৃন্দের হইয়াছে উভয় সঙ্কট। লোকসংখ্যা এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণ এখন খানিকটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, পরিচালনা ব্যবস্থায় ত্রুটি ঘটিলে তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নিন্দাভাজন হইতে হয়, অথচ কর-নীতি সংশোধন করিবার দায়িত্বও তাঁহারা লইতে সাহস করেন না। ইহার কারণ, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ আহত হইবে বলিয়া করদাতাদের (যাঁহাদের ভোটে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন) নিকট তাঁহাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির কথা উল্লেখ করা যাক। এই মিউনিসিপালিটির ৬নং ওয়ার্ড একেবারে অবহেলিত, অন্যান্য ওয়ার্ডেও বিধিব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণীর। যুদ্ধের জন্য এই মিউনিসিপালিটির কাজ এবং খরচ যত বাড়িয়াছে, আয় সে হিসাবে বলিতে গেলে বিশেষ কিছুই বাড়ে নাই। চুঁচুড়ার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সব কিছুর হিসাবেই খরচ বাড়িয়াছে, সহরের গুরুত্বও এখন অনেক বাড়িয়াছে, এক্ষেত্রে বাড়ীর জন্য কিছু বেশী ট্যাক্স দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন হিসাবেই বড় কথা নয়। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়—জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ মিউনিসিপালিটির চরম আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও কর-নীতির সংশোধন করিতেছেন না। রাস্তায় আলো, মেথরের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতির হিসাবে কালকাতা কর্পোরেশনের তুলনায় চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির দায়িত্ব কিছু কম নয়, কিন্তু বাড়ীর ট্যাক্সের হিসাবে তাঁহাদের সুবিধা অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে চুঁচুড়ায় যে ধরণের বাড়ীর জন্য মালিককে তিন মাসে ১৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়, কলিকাতায় তজ্জন্য কমপক্ষে দিতে হয় ৭৫ টাকা। ট্যাক্সের এই নিম্ন-হার সংশোধিত হইলে মিউনিসিপালিটি পরিচালনা ত্রুটিশূন্য করা কার্য্যতঃ অসম্ভব। পতিত জমির উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ট্যাক্স লাগে না। ইহাতে একদিকে 'জমিকে খাইতে দিতে হয় না' এ অজুহাতে মালিক জমি ফেলিয়া রাখিয়া চোরাবাজারী মুনাফা বৃদ্ধির যেমন ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে তেমনি মিউনিসিপালিটি ন্যায্য আয় হইতে বঞ্চিত হয়। এইরূপ জমির উপর ট্যাক্স বসিলে বর্ত্তমান তীব্র গৃহ-সমস্যারও আংশিক সমাধান হইবে এবং মিউনিসিপালিটিগুলিরও আয় বাড়িবে। নির্দ্দিষ্ট এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য হইতে কর হিসাবে যে টাকা আদায় হয়, সরকার তাহার একাংশ নিয়মিতভাবে মিউনিসি-পালিটিগুলিকে দিবার ব্যবস্থা করিলেও কার্য্য পরিচালনার প্রভূত সুবিধা হয়। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের সাইনবোর্ড, দেয়াল বিজ্ঞাপন প্রভৃতি হইতেও মিউনিসিপালিটির আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। যে সব অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীর দরজায় নাম লিখিবার মোহ আছে, তাঁহাদের উপর সামান্য ট্যাক্স বসাইলে ধনী গৃহস্থের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ ইহাতে মিউনিসিপালিটির আয় অনেক বাড়িয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে দরজায় 'নেমপ্লেট' লাগানো এ দেশের বিত্তবান শ্রেণীর একটি বড় ফ্যাসান।

মোটের উপর সব মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষই চোর নন এবং যেখানে দুর্নীতি দেখা যায়, সেই দুর্নীতিও সমগ্র অব্যবস্থার একমাত্র কারণ নয়। আসল কারণ হইল অর্থাভাব এবং জনসাধারণের সহযোগিতা

না থাকিলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সমন্বিত এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের পক্ষে আয় বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করাও খুবই কঠিন। রাজনৈতিক পট-ভূমিকার পরিবর্ত্তনের পর এখন এ দেশের মিউনিসিপাল অর্থনীতি লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে। মিউনিসিপালিটি-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ, জনসাধারণ, অর্থনীতিবিদগণ এবং দেশের শাসক সম্প্রদায় অবহিত হইলে এদিক হইতে অনতিবিলম্বে বহু সমৃদ্ধি আশা করা যায়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট চাষ

পাট ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থকরী ফসল এবং সারা পৃথিবীতে ভারতীয় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা আছে। বহির্বাণিজ্যের গতি যে ভারতের অনুকূলে থাকে, এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীই তাহার প্রধান কারণ। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাবেই নয়, ভারতে পাটের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও কম নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির সহিত ভারতীয় পাট চাষ ও পাট শিল্পের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান।

ভারত বিভাগের পর যে সব এলাকা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ভারতের অধিকাংশ পাটই কিন্তু সেই সব এলাকায় উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে ভারত বিভাগের পর পাটের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে নিঃসন্দেহে কতকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। এখনও ভারতের ১০৮ পাট কলের সব কয়টি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বলিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হয়তো পাকিস্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা পাট সংগ্রহ করার অসুবিধা হইবে না, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইলেই (শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষ এখন খুবই আগ্রহ দেখাইতেছেন বলিয়া শীঘ্র এইরূপ কল-কারখানা গড়িয়া উঠার বিশেষ সম্ভাবনা আছে) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্দেশীয় চাহিদার হিসাবে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং সময় থাকিতে এখনই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট চাষ বাড়াইবার কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভারতের ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পাট চাষের হিসাব হইতেই পাকিস্থানের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অসহায়তা উপলব্ধি করা যাইবে। এই বৎসর সারা ভারতে যে ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়, তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমি ছিল পাকীস্থানের এবং মোট উৎপন্ন ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার বেলের (প্রতি বেল ৪০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৫ মণ) মধ্যে পাকীস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪০ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল পাট।

দিনাজপুর, যশোহর, মালদহ, নদীয়া, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার যে সব অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে সেগুলিতে পাট চাষ বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বাড়ানো চলে। এ ছাড়া পশ্চিম বাঙ্গলার হুগলী, দার্জ্জিলিং, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায়, উড়িষ্যায়, আসামে এবং বিহারে পাটচাষ বাড়াইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরা রাজ্য, কুচবিহার ও নেপাল রাজ্যে পাট চাষ বাড়ানো মোটেই কঠিন নয়। মোটের উপর কাঁচা পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিয়া চাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয় এবং ফসল উৎপন্ন হয় ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল। বিভিন্ন এলাকায় কতখানি জমিতে চাষ হয় এবং কিরূপ ফসল উৎপন্ন হয় তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

এলাকা	পাটচাষের জমি (একর-জমি)	ফসল (বেল হিসাবে)
পশ্চিম বঙ্গ	১,৫৪,১২৫	৪,৭৯,৮৭৫
মুর্শিদাবাদ	২৬,৬৫০	৮৫,২৮০
২৪পরগণা	২৪,০৭৫	৭৭,০৪০
জলপাইগুড়ি	১৯,৩১১০	৫০,৪০২
হুগলী	১৯,০৬৫	৬১,০১০
মালদহ	১৭,৬৬১	৫৬,৫১৭
নদীয়া	১৬,৭৩৬	৫০,২০৯
দিনাজপুর	১০,৮৭৫	৩২,৬২৬
মেদিনীপুর	৬,৭১৫	২১,৪৯০
যশোহর	৪,৯২৭	১৮,২৩১
বর্দ্ধমান	৩,২৪০	১১,৩৪০
হাওড়া	৩,৩৩৫	১০,৬৯০
দার্জ্জিলিং	১,২৭০	৪,১৯০
বাঁকুড়া	২০০	৬৪০
বীরভূম	৬৫	২১০
কুচবিহার রাজ্য	২৬,৮২৫	৫৬,৫৫৫
ত্রিপুরা রাজ্য	১০,০০০	২২,০০০
বিহার	১,৪৪,৯০০	২,৫০,৭০০
উড়িষ্যা	২৩,৮০০	৫৮,০২০
আসাম	১,৬১,৫০০	৪,০৭,৩০০
নেপাল	—	২,০০,০০০

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পরেশ—এই গল্পটির নাম গুরুচরণ না হইয়া পরেশ কেন হইল বুঝা যায় না। পরেশ চরিত্রটি গল্পে ফুটে নাই। সে গুরুচরণের হাতে গড়া, তাঁহারই মানুষ-করা কৃতবিদ্য যুবক। মজুমদার-পরিবারের দ্বন্দ্বকোলাহলে সে নীরব নিষ্ক্রিয়। বোধহয় বিমাতার সংসারে তাহার ব্যক্তিত্বপ্রকাশের সুযোগই ছিল না। শেস পর্য্যন্ত পরেশ্ই তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের অবলম্বন হইল অর্থাৎ সে তাঁহার কাশীবাসের ব্যবস্থা করিল। গুরুচরণের পক্ষে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্র গল্পটির নাম দিয়াছেন 'পরেশ'।

গুরুচরণ একজন সাধুচরিত্রের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি—চিরদিন শিক্ষা-ব্রতী থাকিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা ও চরিত্রে উন্নত করিয়াছেন। "তাঁহার অপরিসীম স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতার সম্মুখে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করিত।" শরৎচন্দ্র এই গল্পে বলিতে চাহিয়াছেন—এই শ্রেণীর লোক যতই দেশমান্য, চরিত্রবান্ ও নমস্য হউন—নিজের পরিবারের লোকেরা তাঁহাদের চরিত্রের মূল্যমর্য্যাদা উপলব্ধি করে না—তাঁহাদের অসামান্যতা স্বীকারও করে না। নিজ পরিবারের লোকেরা এইরূপ চরিত্রের অনুসরণও করে না—অন্ততঃ আমাদের এই বাঙ্গালী সমাজে। পুত্র বিদ্রোহী হইল—তাহার চরিত্র হইল গুরুচরণের বিপরীত। সে বহুদুঃখ দিল তাহার দুশ্চরিত্রতার নিত্য নূতন উপদ্রবে। সহোদর ভাই এমন সদাশয় অগ্রজের মর্য্যাদা বুঝিল না। সে শুধু সম্পত্তি হইতেই বঞ্চিত করিতে চাহিল না—নানা ভাবে বিড়ম্বিত করিল। ভ্রাতৃবধূ বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে লাগিল। পুত্রের চেয়েও অধিক যে, সে ও নৈতিক সাহস দেখাইতে পারিল না।

শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজের একটি পরম সত্য কলঙ্ক এখানে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা নিত্যই দেখিতেপাই, দেশের বড় বড় সাহিত্যিকদের আপন পরিবারের লোকদের দ্বারা অনাদৃত—এমনকি বিড়ম্বিত হইতে। দেশবিদেশে বিখ্যাত দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে ও দেখিয়াছি আপন পত্নী, পুত্র, কন্যাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে। যিনি নিজের শক্তি ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজ পরিবারকে ধনে মানে প্রতিষ্ঠায় সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বহুজনকে প্রতিপালন করিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার দুর্গতি দেখিয়াছি নিজেরই আত্মীয়বন্ধু প্রতিপালিতবর্গের হাতে। পুত্রের পক্ষে সাধু পিতার বিপরীত চরিত্রের লোক হওয়া এবং পণ্ডিত পিতার মূর্খ পুত্র হওয়া যেন সমাজে প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছে। আর নিষ্কলঙ্ক সরল ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রের লোকও নিজ পরিজনের কাছে পাগল কিংবা ভণ্ড। তাঁহাদের দশা হয় রবীন্দ্রনাথের গল্পবিশেষের 'রাম-কানাইএর' মত। অতএব বলিতে পারা যায়—শরৎচন্দ্র একটি অপ্রিয় কঠোর সত্যকে বাণীরূপ দান করিয়াছেন এই গল্পে।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের পারিবারিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে গুরুচরণের প্রতি হরিচরণের যে আচরণের কথা শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—তাহা একটুও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের শ্রদ্ধা সম্মানের মধ্যেও নিষ্ক্রিয়তা আছে। নতুবা গুরুচরণ যখন সমাজে নানা ভাবে বিড়ম্বিত হইতেছেন—তখন গুরুচরণের ভক্তস্থানীয় গ্রাম-বাসীদের মধ্য হইতেও কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকারের চেষ্টা দেখা যায় না কেন? শ্রদ্ধার এইনিষ্ক্রিয়তাও পরম সত্য।

শরৎচন্দ্রের একটা ধারণা (সম্ভবতঃ বহুদর্শিতা হইতেই তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল)—প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ যাহা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিয়া চলে, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মনের বল কমিয়া গেলে সুযোগ পাইয়া ছিদ্রান্বেষী শত্রুর মত তাহাই তাহাকে আক্রমণ করে। বিরাজ-বৌএর পরিণাম স্মরণ করিতে বলি। গুরুচরণের পক্ষে নারীর গায়ে হাত তোলা ও খ্যামটা নাচের আসরে রাত্রিযাপন—ঐ ধারণারই দৃষ্টান্ত। তাঁহার চির জীবনব্যাপী শুচিতার অনুশীলনের মর্য্যাদা কেহ রাখিল না বলিয়া রাগ অভিমানভরে তিনি শুচিতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—একথা কেহ যেন মনে না করেন।

হরিচরণ ও বাল্যস্মৃতি—পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন পরিজন-সম্পর্ক লইয়াই সামাজিক গল্প রচিত হয়। ভৃত্যও আমাদের সংসারে পরিজন; বিশেষতঃ অনেক ভৃত্যের প্রভুগৃহই আপন গৃহ—নিজের কোন পৃথক্ গৃহই নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ভৃত্য অবলম্বনে একাধিক কবিতা ও গল্প রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের সংসারে ভৃত্যের প্রতি অবিচার কম হয় না—বর্ত্তমান যুগে যুগধর্ম্মের গুণে ভৃত্যের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে—তাহাদের প্রতি অবিচার হইবার উপায় আর নাই। ভৃত্য অবলম্বনে গল্প কবিতার সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছে। আগে ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার অবিচার যথেষ্টই হইত। দরদী কবি বা সাহিত্যিকের দৃষ্টি ইহা এড়াইত না। শরৎচন্দ্র এই দুটি ছোট গল্পে লাঞ্ছিত ভৃত্যের প্রতি দরদকে বাণীরূপ দিয়াছেন।

ভৃত্যকের সবচেয়ে বিপদ চুরির অপবাদ। বহু ভৃত্যই চোর—চুরি করিয়া বহু ভৃত্যই পলায় একথাও সত্য। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য, বাড়ীতে কোন কিছু চুরি গেলেই ভৃত্যের অপবাদ হয়। "যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।" অনেক সময় এ অপবাদ মিথ্যা। যেখানে অপবাদ মিথ্যা, সেখানেই সাহিত্যিকের দরদ। ভৃত্যের যে শারীরিক বা মানসিক বেদনা থাকিতে পারে, তাহার শরীরও অত্যন্ত অসুস্থ হইতে পারে প্রভুরা একথা ভুলিয়া যায়—কখনও চিন্তাও করে না। এই হৃদয়হীনতা সাহিত্যিকদের মর্ম্মস্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের 'ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে' কবিতাটি স্মরণ করিতে বলি। 'খোকাবাবুর

প্রত্যাবর্তন' গল্পে ভৃত্য রাইচরণের দৈববিড়ম্বনার কাহিনী ভৃত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর দরদের চূড়ান্ত নিদর্শন। হরিচরণ গল্পে অবিচারী প্রভুর পক্ষ হইতে চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার একটি চিত্র আঁকিয়াছেন দরদী শরৎচন্দ্র। গল্পটি একটি লিরিকের মত মর্মস্পর্শী।

বোঝা—বোঝা শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা। ইহা একটি যুবকের তিনটি পর পর বিবাহের কাহিনী। এক পত্নী সত্ত্বেও অন্য পত্নী গ্রহণ এ সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। তবু ব্যাপারটিকে অধিকতর স্বাভাবিক করিয়া দেখানোর জন্য যুবক সত্যেন্দ্রনাথকে ধনীর সন্তান করা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রকে ডেপুটি না করিলেও চলিত। সাধারণত: ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া যে ডেপুটি হয়, তাহার সুবিচারবোধ ও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। তবে শরৎচন্দ্রের আগেই রবীন্দ্রনাথ দেনাপাওনা গল্পে দেখাইয়াছেন ইংরাজি বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী ডেপুটিবাবুদেরও পত্নী সম্বন্ধে সুবিচার-বোধ সেকালে ছিল না।

নারীজাতি নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইবার পর হইতেই আমাদের সমাজে পুরুষজাতি নারীর নারীত্ব ও তাহার হৃদয়ের মর্য্যাদা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্র যে সময়ের সমাজের কথা 'বোঝায়' লিখিয়াছেন—সে সময়ের নারিজাতি আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাই পুরুষেরই যথেচ্ছাচার চলিতেছে। যেখানে নারী নিজের নারীত্বের মর্য্যাদা সম্বন্ধে একটু সচেতনতা দেখাইয়াছে—সেখানে দুর্ব্বলা নারীর জীবনে Tragedyই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমর-চরিত্র আঁকিয়া পূর্ব্বসূচনা দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের ভ্রমর-চরিত্র সেকালের সমাজের পাঠকের কাছে একটা অসামান্য ও অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। শরৎচন্দ্র তাঁহার অল্পবয়সের এই রচনায় বঙ্কিমের দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিলেন—তিনিও নলিনীর মধ্যে একটু ভ্রমরত্ব আরোপ করিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে সত্যেন্দ্রের মনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইয়াছে ইহা দেখাইতে পারেন নাই—নলিনীর জীবনে Tragedyই দেখাইয়াছেন।

এই গল্পটিতে বঙ্কিমের প্রভাব আরো একাধিক ব্যাপারে দৃষ্ট হয়। নলিনী তাহার সপত্নীকে বস্ত্রালঙ্কার উপহার পাঠাইয়া চির বিদায় লইতেছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বঙ্কিমী ধরণের শিরোনামাই ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন—'কপাল ভাঙ্গিয়াছে কি ?' 'ভাঙ্গিয়াছে।' ধনী লোকের অন্তঃপুরের কথা লইয়া পাড়াপড়সীদের মধ্যে কুৎসা-প্রচার বঙ্কিমী ধরণেই নিষ্পাদিত হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে নায়ক নায়িকাকে আহ্বান করিয়া লেখকের মন্তব্য প্রকাশ একালে আর চলে না। উহা সম্পূর্ণ বঙ্কিমী ব্যাপার।

শরৎচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন—"সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি একা নও। অনেকেরই কপাল তোমার মত অল্প বয়সে পুড়িয়া যায়। সকলেই কি তোমার মত পাগল হয়? সাবধান, সত্য। সকলেরই একটা সীমা আছে। স্বর্গীয় ভালবাসারও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি সীমা ছাড়াইয়া যাও, কষ্ট পাইবে। কেহ রাখিতে পারিবে না।"

আর এক স্থলে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সত্যেন্দ্রনাথ! তোমার দোষ দিই না, তাহারও দোষ দিই না। দুই জনেই ভুল করিয়াছ, দোষ কর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্মগ্লানি কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরাত বুঝিতে পারিতাম না। তোমরাও বুঝিতে পারিতে না। বুঝিতে পারি না, কি আকাঙ্ক্ষায় কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এতটা করিলে।"

যৌবনে পদার্পণ করিয়াই শরৎচন্দ্র প্রবীণ বিজ্ঞ সাজিয়া বলিয়াছেন—"সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছ শাস্তি পাইবে ভয় হয় কি ?

তোমরা যুবা, সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন; কিন্তু বল দেখি তোমাদের কাহারও কি এমন একটা সময় আসে নাই—যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভারবোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিগুলি শ্লথ হইয়া ক্লান্তভাবে চলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না হইয়া থাকে একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ। ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে ঘৃণা কর। ঘৃণা কর, সহানুভূতি প্রকাশ করিও না। ঘৃণা-কর, কিছু বলিবে না। দয়া করিও না মরিয়া যাইবে।"

এই সমস্ত বঙ্কিমী ধরণের প্রাজ্ঞতার অভিনয় মাত্র। শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনায় এই ঢঙ আর ছিল না।

বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও শরৎচন্দ্রের রচনায় এই সময়েই পতিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত অংশে রবীন্দ্রনাথের বাচনভঙ্গীর ছায়াপাত দেখা যায়—

"তাড়াতাড়িতে দুই হাতে দুই রকমের বোতাম কিংবা আহার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেছে, কলেজের একঘণ্টা যায়-যায় সময়ে এক পায় কার্পেটের অপর পায় বার্নিস করা জুতা সে না পরিয়া ফেলে, ফর্সা জামার উপর রজক-ভবনে শুভগমনের জন্য প্রস্তুত চাদরের জুলুম না হয়, সেইসব কাজগুলা সরলাই দেখিত।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নারীরই প্রাধান্য, পুরুষ সাধারণতঃ পরিচালিত অথবা উদাসীন। 'বোঝা' গল্পে নারীর প্রাধান্য ঘটে নাই—নারী এখানে খেলার পুতুল মাত্র অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই গল্পে অঙ্কুরিত অবস্থাতেও নাই। শরৎচন্দ্র তখনও তাঁহার স্বকীয়তা লাভ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনায় নারী বহুভাষিণী, বোঝার নারী মিত-ভাষিণী। কথাবস্তুর এক অংশ বা চিত্র হইতে অন্য অংশ বা চিত্রে প্রয়াণের (Transition) স্বাভাবিকতা ও যথাযথতা এই গল্পে নাই। প্রথম পরিচ্ছেদেই এই দোষের দৃষ্টান্ত মিলিবে। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এই গল্পে শরৎচন্দ্রের, বৈশিষ্ট্যের না হউক, প্রতিভার অঙ্কুর যে একেবারে নাই, তাহা নয়।

পাকিস্থানে বাঙ্গালার স্থান

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাঁহারা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মপ্রসাদ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র পৃথিবীর যে ক্ষতি তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার হিসাব করা কঠিন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার জন্ম ভারত বিভাগের দাবী যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী এবং পৃথিবীর ইতিহাসে যে অধ্যায়ে ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকিবে, তখন এই সকল লোকের নাম কলঙ্কমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু সে ত বহুদিনের কথা। যাঁহারা ভারতবিভাগের চেষ্টায় সমগ্র ভারতে লুঠ, অগ্নিকাণ্ড, নৃশংস হত্যা, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া সমগ্র অমুসলমান নরনারীর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জগতে প্রাধান্য লাভ করিবার আশা করিয়া আছেন, তাঁহাদের হিসাব যে কত বড় ভুল তাহা প্রকৃত ঘটনা বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষ পাকিস্থান ও ইণ্ডিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাকিস্থানে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান বাস করে না এবং ইণ্ডিয়াতে মুসলমান সংস্পর্শ-বিহীন হয় নাই। পাকিস্থানে আড়াই কোটী হিন্দু এবং ইণ্ডিয়ায় চার কোটী মুসলমান থাকিয়া গেল। কায়েদে আজমের শান্তি নাই, তিনি সমস্ত হিন্দুকে পাকিস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া ইণ্ডিয়ার মুসলমান আমদানী করিতেছেন। সত্য সত্যই লোকে তাহা চায় কিনা, সে বিচার তিনি কোনও দিনই করেন নাই। এখন তাঁহার হিন্দু মুসলমান "লেন-দেন"-এর কারবার চলিতেছে, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, কত লোকের অঙ্গহানি, জীবননাশ ঘটিতেছে, দুর্দ্দশা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব লইবার সময় তাঁহার নাই।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এই অস্বাভাবিক জাতি বা শ্রেণী বিভাগ থাকিয়া যাইবে? কায়েদে আজম চিরজীবী নহেন, তাঁহার অন্ধ ভক্তস্তাবকের দল চিরকাল ধরিয়া ভারতে "দক্ষযজ্ঞ" ঘটাইবার শক্তিধারণ করিয়া যে থাকিবে, তাহা সম্ভব নহে। মাদ্রাজ উড়িষ্যার মুস্লিম লীগ সভাপতিদ্বয় প্রকাশ্যভাবে লীগ মতবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন এবং আশা করা যায়, ক্রমশঃ সাধারণের মধ্যে এ জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিবে।

এ-দিন বোধ হয় বেশী দূরে অপেক্ষা করিয়া নাই। যদি পাকিস্থান বাঁচিতে চায় তাহা হইলে, এ সম্বিৎ যত শীঘ্র ফিরিয়া আসে ততই মঙ্গল। যখন পাকিস্থান এক সত্তায় বাঁচিতে চাহিবে, তখন জনাব জিন্নাহ সাহেবের এক-কর্ত্তৃত্বের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা একবার ভাবিবার কথা।

"প্রাদেশিক সত্তা একদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য। বিশেষতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সহিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের যোগাযোগ অন্ততঃ আটশত মাইল ব্যবধান বাঁচাইয়া চলিবে। সুতরাং বাঙ্গালী আপনাকে চিনিয়া লইবে, এইরূপ আশা করা ভুল হইবে না। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে রাষ্ট্রিক যোগসূত্র থাকিলেও ব্যক্তিগত, এমন কি সমাজগত মেলামেশা না থাকিলে রাষ্ট্রের একত্ব সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান জন্মিতে বিলম্ব হইবে। হয়ত সেই সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালা আপনাকে চিনিয়া লইয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের অধিবাসী বঙ্গভাষাভাষীসমস্ত হিন্দু মুসলমান, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষার স্বার্থে মিলিত হইয়া এক যোগে কাজ করিতে থাকিলে পাকিস্থান রাষ্ট্রে বাঙ্গালীর প্রাধান্য গড়িয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী মিলিবে কিনা, একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর নিকট ইহা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে। গত ১৫ই আগষ্ট ডোমিনিয়ন শাসনলাভ উপলক্ষে যতমান হিন্দু মুসলমান যে মিলনের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী নির্ব্বিশেষে মিলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইংরাজ চলিয়া যাইবার পর, কিছু কালের মধ্যে ধর্ম্মবিশেষের আওতা ছাড়িয়া অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দল গড়িয়া উঠিতে বাধা এবং প্রাদেশিক স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গালী এক হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই আশা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কতদিন বাদে এই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পাকিস্থান রাষ্ট্রে ৬ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের বাস দাঁড়াইয়াছে। জানিনা কত লক্ষ লোক প্রাণভয়ে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যদি উভয় সংখ্যা সমান হয়, তাহা হইলে মোটামুটী একই অবস্থায় দাঁড়ায়। এই ৬ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রদেশ হিসাবে লোক সংখ্যা—

প্রদেশ	লোক সংখ্যা
পঞ্চনদ	১ কোটী ৫৭ লক্ষ
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০·৪ "
সিন্ধু	৪৫·৩ "
বালুচিস্থান	৫ "
বাঙ্গালা ও আসাম-সিলেট	৪ " ১৮ "
	৬ কোটী ৫৫·৭ লক্ষ

আজকাল সংখ্যা হিসাবে রাষ্ট্র শাসন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই হিসাবে পাকিস্থান-কেন্দ্রীয়-পরিষদে বাঙ্গালীর স্থান দুই-তৃতীয়াংশ। এখনও কায়েদে আজম অথবা মুস্লিম লীগ কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে বাঙ্গালার প্রতিনিধি করিয়া বাঙ্গালার বাহিরের পাকিস্থানী নেতৃবর্গকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হয়; কিন্তু বাঙ্গালী আপনার

দাবী দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করিলে, শীঘ্রই এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটিবে।

পাকিস্থান রাষ্ট্রে অর্থ-নৈতিক হিসাবে বাঙ্গালার স্থান প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা। অবিভক্ত ভারতে রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে বাৎসরিক এক কোটী এবং বালুচিস্থানকে এক কোটী তিরাশী লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া প্রদেশ হিসাবে ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই দুইটী পাকিস্থানের অংশ। সুতরাং পাকিস্থান রাষ্ট্রভুক্ত হইলেই রাতারাতি ইহারা আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে করা ভুল।

লোক সংখ্যা ও অর্থ-নৈতিক প্রাধান্য ছাড়া বাঙ্গালার ভাষার দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। সারা পাকিস্থানে সাড়ে ছয় কোটী লোকের মধ্যে সওয়া চার কোটী লোকের এক ভাষা—অর্থাৎ বাঙ্গালা। আর দুই কোটী লোকের ছয়টী ভাষা। অর্থাৎ হিন্দী, উর্দ্দু, গুরুমুখী, পুস্তো বা পুস্তু, বালুচি ও সিন্ধী। সেই হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাই পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। আজ হঠাৎ যদি উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা হইলে পাকিস্থানের অধিবাসীর শতকরা নিরানব্বই জন "নিরক্ষর" হইয়া যাইবে ; জগতের মধ্যে পরিচয়ে ইহা মোটেই গৌরবের বস্তু নহে।

সিন্ধু ও পঞ্চনদ খাদ্যশস্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম পঞ্চনদে দাঙ্গার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এই হিসাবে প্রকৃত অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। করাচী বন্দর এবং স্বর্ণ পাত্র শস্যক্ষেত্র পাকিস্থানের গর্ব্ব করিবার বিষয়, কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালার অবস্থা শীঘ্রই উন্নত হইবার কথা। চট্টগ্রাম বন্দর, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে নব মূর্ত্তি ধারণ করিবার আশা রাখে। বিস্তীর্ণ খাদ্য ক্ষেত্রের উন্নতি হওয়া সম্ভব। তাহার উপর আছে পাট, যাহা কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব্ব-বাঙ্গলা প্রায় এক-সত্ব দাবী করিয়া থাকে।

পাটের আয়, ভূমিরাজস্ব, বিক্রয় শুল্ক, আবগারী ও আয়কর প্রভৃতি সমস্তই অর্থ-নৈতিক সংস্থার মধ্যে পড়ে, সুতরাং প্রত্যেকটী স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। সেখানে পূর্ব্ব পাকিস্থান, সমগ্র পাকিস্থান রাষ্ট্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে।

সকল দিক দিয়াই বাঙ্গালা পাকিস্থানে একটী অতীব গুরু স্থান অধিকার করিবার কথা। কিন্তু হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া বাঙ্গালী পরিচয় দিতে হইবে। এই মিলন সমগ্র ভারতের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার বাঙ্গালী জগতে আপনার পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে এই আশা পোষণ করি। জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, নবীন সেন, আনন্দমোহন, অশ্বিনীকুমার, মনোরঞ্জন, চন্দ্রমাধব, যতীন্দ্রমোহন, অম্বিকা মজুমদার প্রভৃতি বহু দেশবরেণ্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ যে পূর্ব্ববঙ্গের সন্তান, সেই পূর্ব্ববঙ্গ আবার নূতন গরিমায় মণ্ডিত হইয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, দেশসেবক, রাষ্ট্রনায়ক প্রসব করিয়া পাকিস্থানে প্রাধান্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাতিগঠন ও জনকল্যাণ প্রচেষ্টা

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনাধীনে এতকাল আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত দিন কাটিয়েছি। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিশিল্প, শিক্ষাদীক্ষা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে এতকাল আমাদের বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। জাতিগঠন, জনকল্যাণকর প্রচেষ্টা—এমন কি নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের অতি সাধারণ অধিকারটুকু থেকে পর্যন্ত আমরা বঞ্চিত ছিলাম। ইংরেজরা এদেশে রাজ্যশাসনের নামে এতদিন আমাদের নির্মমভাবে শোষণ করেছে, আমাদের ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য যথেচ্ছায় লুট করে নিয়ে গিয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম রাখা হয়েছে, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার নামে দেশের শিল্প বাণিজ্যকে গলা টিপে মেরে বিদেশী শিল্প বাণিজ্যের বনিয়াদ পাকা করার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম থেকেই একদিকে হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে আমাদের যাবতীয় কল্যাণ প্রচেষ্টা ও প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নীতির অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের নিজস্ব কুটীরশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে তা থেকে তৈরী মাল আমাদের দেশে এনে বিক্রী করে অজস্র টাকা লুটে নিয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষ প্রচুর লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা আজ দীন দরিদ্র, বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আমাদের আজও তাই বিদেশীর মুখ চেয়ে থাকতে হয়। দীর্ঘদিনের বৃটিশ শাসনের ফলে আমাদের অশেষ দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, রোগ ও দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি নরনারী প্রাণ দিয়েছে, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, মহামারী, অনাহার, অশিক্ষা

আমাদের নিত্য সহচর। কৃষিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা—কোন দিক দিয়েই জনকল্যাণকর বা জাতিগঠনমূলক কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা এতকাল আন্তরিকভাবে কার্যকরী করার কোন চেষ্টা হয় নি। এর প্রধান কারণ, ইংরেজরা তাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষকে চিরকাল অনুন্নত রাখার জন্যই চেষ্টা করেছে, ভারতের উন্নতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হয়েছে। এইজন্য কোনদিনই আমলাতান্ত্রিক বৃটিশ শাসনের সঙ্গে জনকল্যাণ বা জাতি গঠনের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে আরম্ভ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে বৃটিশ শাসন ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার ইতিহাসের ধারাটি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি সহজেই ধরা পড়ে।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে ১৯২৯-৩৩এর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য মন্দার পর এদেশে সরকারী এবং বে-সরকারীভাবে জাতিগঠন-মূলক কয়েকটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু সব পরিকল্পনাই কল্পনায় থেকে গেছে, কোনটাই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে মূলগত দুরভিসন্ধি ও আন্তরিকতার অভাবে এবং 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'বোম্বাই পরিকল্পনা', 'গান্ধী পরিকল্পনা', 'পিপলস্ প্ল্যান' প্রভৃতি সমধিক পরিচিত বে-সরকারী পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এই কারণে যে, এই ধরণের জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে দেশবাসীর হাতে যে ক্ষমতা, অধিকার ও অর্থবল থাকা প্রয়োজন আমাদের তা ছিল না। কিন্তু আজ প্রকৃত ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে এসেছে। আমরা আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার লাভ করেছি। কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে প্রকৃত জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার জনকল্যাণের আদর্শকে লক্ষ্য করে সুপরিকল্পিত উপায়ে জাতিগঠনের কার্যে ব্রতী হবেন এবং কৃষিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা—সমস্ত কিছু বিষয়ে জাতিকে সমুন্নত করে তোলার কার্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী পরবশতার গ্লানি ও লাঞ্ছনা ভোগের পর, অনাহারক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত, রোগ দারিদ্র্যে জর্জরিত, অশিক্ষার অন্ধসংস্কারে সমাচ্ছন্ন বেদনাহত জাতি আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অদূরাগত ভবিষ্যতের আশার আলোক। জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী যাঁরা তাঁরাই আজ এই নিপীড়িত জাতির দুঃখ বিমোচনের ভার নিয়েছেন, কাজেই সমস্ত ভারতবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে ইংরেজ যে আবর্জনার বোঝা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেল, সেই আবর্জনা পরিষ্কার করে জাতিকে সুস্থ সবল করে দাঁড় করাতে বহু সময়ের প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা, প্রচুর অর্থ ও সুপরিকল্পিত উদ্যমের আবশ্যক। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা যেমন উদ্যোগী হবেন, জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতাও তেমনি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন হবে।

আমাদের জাতির সামনে আজ বহু সমস্যা। এই সব সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্যমের প্রয়োজন, তাকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা (১) স্বল্প মেয়াদী এবং (২) দীর্ঘ মেয়াদী। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে অন্ন বস্ত্র ও চাকরী সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের আশু সমাধান এবং তজ্জন্য অবিলম্বে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, বাঙ্গলা দেশে—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে চাউলের দর মণ পিছু ২০৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। বহুস্থানে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্ত্রাভাবেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ কিরূপ কষ্ট পাচ্ছে সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতালাভের পর প্রথম থেকেই দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। ব্যাপকভাবে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও কানাডা থেকে ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমাদের দেশে এসে পৌঁচেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিদেশে যাঁরা আমাদের রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক খাদ্যভাণ্ডার থেকে ভারতের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহেরও বিশেষ চেষ্টা করছেন। ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি শক্তিশালী খাদ্য-কমিটি নিযুক্ত করেছেন। আমেদাবাদ, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের কাপড়ের কলগুলিতে শ্রমিক-ধর্মঘট প্রভৃতি এড়িয়ে বস্ত্র উৎপাদন কার্য যাতে পূর্ণগতিতে চালু থাকে তার জন্যও বিশেষ চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে যেটুকু খাদ্য এবং বস্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে তার সুবন্টনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারী পরিচালনাধীনে বড় বড় সহর ও মিল এলাকাগুলিতে রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে বটে, কিন্তু পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশক্ষেত্রে চোরা-কারবারীদের অসঙ্গত মুনাফা লাভের চেষ্টার ফলে জনসাধারণের দুর্গতির শেষ নেই, অধিকাংশ স্থানে পণ্য-মূল্য এত উঁচু যে তা জনসাধারণের নাগালের বাইরে। অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র নিয়ে চোরাকারবারীদের এই অসঙ্গত মুনাফাবৃত্তিকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সুখের বিষয়, কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারও অবিলম্বে এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছু আগে ভারতের বিদেশী সরকার ভারতবর্ষের জন্য যে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন তাতে স্বল্পমেয়াদী কার্যসূচীর একটি প্রধান বিষয় ছিল এই যে, যে সমস্ত লোক যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং যে সমস্ত লোক যুদ্ধ-

শিল্পে ও অন্যান্য সামরিক কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান জাতীয় সরকারকেও এ বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগ দিতে হয়েছে। কারণ যুদ্ধের সময়কার কৃত্রিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য কারণে জিনিষপত্রের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সরকারী নিয়োগের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণ। তার ফলে বহু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবার পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ অসুবিধা-জনক অবস্থার মধ্যে পড়লেও, পরিবারে চাকুরীয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থাৎ পরিবার পিছু মোট আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা কোন রকমে সংসার নির্বাহ করে যাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-শিল্পকে শান্তিকালীন শিল্পে পরিণত করার সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মী ছাঁটাই নীতির ফলে এবং বহু সমরবিভাগের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য কর্মীকে বরখাস্ত করতে হয়েছে। অথচ দ্রব্যমূল্যের স্তর নিম্নগামী হওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী হয়ে চলেছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের দুর্গতির আর শেষ নেই। কাজেই লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরীর সংস্থান মধ্যবিত্ত পরিবার ও দরিদ্র পরিবারগুলিকে বাঁচানর দায়িত্ব জাতীয় সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ নতুন নতুন বিভাগ ও কাজের সৃষ্টি করে যুদ্ধ ফেরৎ লোকদের নিযুক্ত করার কাজে ইতিমধ্যেই ব্রতী হয়েছেন, এর বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। জাতি গঠন ও উন্নয়নের কাজ যখন প্রকৃতভাবে আরম্ভ হবে, তখন এদিক দিয়ে সরকারী প্রচেষ্টা আরও সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বলতে প্রধানতঃ জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ কৃষি শিল্পের উন্নয়ন, যান বাহন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি এই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও, আমাদের দেশে একর পিছু শস্য উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর প্রধান কারণ, চাষাবাদের ব্যাপারে এখনও আমরা সেই মধ্যযুগীয় অবস্থায় পড়ে আছি। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে অবিলম্বে আধুনিকতম কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, জমি কর্ষণে ট্রাক্টর প্রচলন, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, বীজের উন্নয়ন প্রভৃতির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রের সাহায্য দরকার। প্রথমতঃ মূল শিল্প বা ভারী শিল্পগুলি জাতীয় শিল্পে পরিণত করতে হবে। তারপর দেশের সুকুমার শিল্পগুলি বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে যাতে অকালে মারা না যায় তার জন্য প্রয়োজনমত সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সাহায্য বা সাবসিডির ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন হবে। আমাদের নিজস্ব কুটীর-শিল্পগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে। শিল্পীরা নিকৃত পল্লী অঞ্চলেও যাতে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সমস্ত সুবিধা আছে, সরকারী উদ্যোগে এ বিষয়ে অনায়াসে তার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। রেলপথ, হাঁটাপথ, জলপথ ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব বাণিজ্যপোত, বিমান, মোটর-গাড়ী, ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈরী করারও ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃটিশ শাসনাধীনে জনসাধারণ দীর্ঘকাল রোগ, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে। কিন্তু আজ আমাদের মত সাধারণ মানুষ যাতে খেয়ে পরে সুস্থ সবল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে, আমাদের জীবনযাত্রা যাতে সহজ হয়ে ওঠে, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ-সামগ্রী যাতে আমাদের পক্ষে সহজলভ্য হয়, রোগের বিরুদ্ধে যাতে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি, ভারতের জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই সে বিষয়ে পরিপূর্ণ নজর দেবেন। রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান, সহরাঞ্চলে বসতবাটী ও বস্তি উন্নয়ন, গ্রামাঞ্চলে আদর্শ পল্লী গঠন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কীয় যে সমস্ত পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে সেগুলিকে অবিলম্বে কার্যকরী করে তুলতে হবে। ব্যাপকভাবে সমবায়প্রথা চালু করে ও অন্যান্য উপায়ে দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীদের অর্থসংস্থানেরও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। তারপর দরিদ্র লোকদের বাঁচিয়ে ধনী ও অপেক্ষাকৃত সম্পত্তিসম্পন্ন লোকেদের ওপর সরকারী ট্যাক্সের চাপ বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের জীবনে সামাজিক অসাম্য ও ধন-বৈষম্যের পাপ এতকাল যে ভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে, তাতে করে সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি বা ভাগ্য উন্নয়নের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় সরকার মুষ্টিমেয়ের কায়েমী স্বার্থ, সুবিধা ও বিলাসবৈভবকে সর্বপ্রকারে খর্ব করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সর্ববিধ কল্যাণ সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছেন।

দুর্নীতি, অপচয় ও অমিতব্যয়িতা বন্ধ করে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জাতিগঠনমূলক কার্যে কিভাবে সমস্ত সরকারী শক্তি নিযুক্ত হচ্ছে এবং জাতিগঠন ও জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপরিকল্পিত উপায়ে জাতীয় উন্নতির কার্যে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

৮।১০।৪৭

নববঙ্গের সমস্যা ও তাহার পশ্চিম সীমান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভারত আজ স্বাধীন, কোন দেশ কোন কালেই বিনামূল্যে স্বাধীনতা পায় নাই ; ভারতের বেলায় এই শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন ? অগণিত জনগণের রুধির মূল্যে খণ্ডিত ভারত আজ স্বাধীন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাভাবিক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রেরণায় অখণ্ড সোনার বাংলা দেশ ও আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

মুসলীম লীগের ধর্ম্মকেন্দ্রিক শাসনে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; অবস্থা এমন গুরুতর ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল যে বাঙ্গালী হিন্দু তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুও এই আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান করিল, অথচ এই বাঙ্গালীই কার্জ্জনী ভঙ্গবঙ্গ জোড়া দেওয়ার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিল ; সেদিনের নবীন জনতরঙ্গ কেহই উপেক্ষা করিতে পারে নাই, এবারও তাহাই হইল। পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া নিজস্ব আবাসভূমি রচনা করিবার প্রত্যাশা আজ আমাদের আসিয়াছে। আঘাতে আঘাতে নূতন বাংলা আমাদের শীর্ণ জীর্ণ হইয়াছে, পুরাতন শাসকেরা যাওয়ার সময় ভেল্কি খেলিয়া আয়তনেও এই নূতন প্রদেশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কাহিল করিয়া দিয়া গিয়াছে। তবুও ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া এই নবীন দেশকে যথাস্থানে পৃথিবীর বুকে দাঁড় করাইতে হইবে। আজ এক মুষ্টি অন্ন ও একখণ্ড বস্ত্র সংস্থানের জন্য জাতির সমস্ত মনুষ্যত্বটুকু নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, এই সময় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন, বার মাসের-তের-পার্ব্বণের আনন্দ, হাসি ও সঙ্গীত,—মানসিক ভাব বিলাস ও জাতির চরমদুঃখে ব্যঙ্গ প্রকাশ মনে হওয়া স্বাভাবিক ; তথাচ পরম ধৈর্য্যের সহিত, সাহসও ভরস লইয়া আজ বাঁচিবার মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের সহিত মনুষ্যত্ববিকাশের সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজ-চেতনার বিকাশ সম্ভব ;না হইলে যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা রক্ষা করা দুরূহ হইবে। যে বীরত্ব মহামৃত্যুকে বরণ করিবার শিক্ষা দিয়াছে, সেই তেজ বক্ষে লইয়াই আজ সম্মুখে যাত্রা করিতে হইবে, এই সময় পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া আমাদের জমা ক্ষতি, ভুল ভ্রান্তির, লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করিয়া না দেখিলে সামনে চলার পথ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।

ভূগোল ও ইতিহাস পড়িবার সময় বড় বড় নদনদী, রাজা মহারাজার কাহিনী মুখস্থ করিয়া সস্তায় কেরামাৎ করি, ছোট ছোট গিরিনদী, ফোয়ারা প্রস্রবণ কিম্বা অগণিত নরনারী, শৈবালদামে অবরুদ্ধ শীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, ডোবা কিম্বা ম্যালেরিয়ায় প্রকম্পিত কুটীরের কথা খেয়াল করি না, অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সকলই মিলিত হইয়া জলতরঙ্গময় নদনদী কিম্বা বিলাস ও লাস্যে আকণ্ঠমগ্ন যথেচ্ছাচারী রাজা মহারাজার কাহিনী রচনা করিয়া চলে। কাজেই সময় থাকিতে যাহাতে বর্ত্তমান কিম্বা অতীত, নববঙ্গের সকল সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণ প্রসারিত হয় তাহার প্রচেষ্টা সুরু হওয়া দরকার। অতীত সমস্যা আলোচনার কারণ অতীত না বুঝিলে বর্ত্তমান ও ধারণা করা সম্ভব নয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সওয়া কোটী হিন্দুর বাস। পুরুষপরম্পরায় বাঙ্গালী হিন্দু সেখানে বিরাট ধনৈশ্বর্য্যের মালিক। পশ্চিম পাঞ্জাবে পঞ্চাশ লক্ষ শিখও হিন্দুর হাতে ৩০,০০০ একর চাষ যোগ্য জমিই ছিল, ইহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব পাঞ্জাবে ৫৫ লক্ষ মুসলমানের হাতে মাত্র ছিল ২০০০০। একর জমি। পশ্চিম পাঞ্জাবে মহারাজ রণজিৎসিংহের আমল হইতে সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি ও চাষ যোগ্য জমি পাকিস্তানী কায়েম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাণ্ডা বাজীতে কবুল দখল খতম্ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব্বপাকিস্তানের অসম অর্থনৈতিক অনৈক্যের কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। এই ধর্ম্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ইতিহাসের পুনরভিনয় হইবার পূর্ব্বেই আমাদের ঘর সামলান দরকার।

প্রথমেই দেখা যাউক পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের চাষযোগ্য জমি এবং তাহার জন সংখ্যা। এই হিসাবে দেখা যাইবে পশ্চিমবঙ্গে জমির উপরে চাপ কত বেশী। ফ্লাউড্ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, সমপরিমাণ আবাদযোগ্য জমিতে পশ্চিম বঙ্গের চেয়ে পূর্ব্ববঙ্গের শস্যোৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। এই কারণেই কুমিল্লা জেলায় একবিঘা জমির মূল্যে বীরভূম, বাঁকুড়ায় পাঁচবিঘা কিম্বা আরও বেশী পরিমাণ জমি পাওয়া সম্ভব। কাজেই অনুর্ব্বর ও অনাবাদী জমির উপরে চাপ অত্যধিক বেশী পড়ায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব অনটন এই নূতন প্রদেশে হ্রাস পাওয়ার সঙ্গত কারণের অভাব।

	নূতন পশ্চিম বঙ্গ (নব বঙ্গ)	নূতন পূর্ব্ববঙ্গ (শ্রীহট্ট ব্যতীত)
লোক সংখ্যা	২১১৯৪৬১৩	৩৯১১১৯১২
আয়তন (বর্গ মাইলে)	২৮০৩৩	৪৯৪০৯
প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা	৭৫৬	৭৯২
মীট আবাদী জমি (বর্গ মাইলে)	১৬১৩৩	২৯১০৬
প্রতি বর্গ মাইল আবাদী জমিতে লোক সংখ্যা—	১৩১৫	১৩৪৪
গ্রোস আবাদী জমি (বর্গ মাইল হিঃ)	১১৯৬৩	৩৬৮২১
গ্রোস আবাদী জমির বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা	১১৮০	১০৬২
আবাদযোগ্য পতিত জমি (বর্গ মাইলে)	২৬১১	৩২১০
গ্রোস আবাদযোগ্য জমি (বর্গ মাইল হিঃ)	২০৫৭৪	৪০০৩১
গ্রোস আবাদযোগ্য জমির প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা	১০৩০	৯৭৭

উক্ত হিসাবে যে জমিতে ফসল জন্মে সেই জমিকে নীট আবাদী জমি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহার যে অংশে দুই বা তিনবার ফসল হয়, সেই সমস্ত অংশের জমিকে ২.৩বার ধরা হইয়াছে। এই জন্ত নীট আবাদী জমির পরিমাণ অপেক্ষা গ্রোস আবাদী জমির পরিমাণ বেশী, গ্রোস আবাদী জমি এবং আবাদযোগ্য পতিত জমির যোগফলকে গ্রোস আবাদযোগ্য জমি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট হইতে সংখ্যা সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে) সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের জমি কেবল অনুর্ব্বর নহে, দক্ষিণ পশ্চিম ভূভাগের কতকাংশ কঙ্করময় বালুকাকীর্ণ প্রান্তর। গত কয়েক বৎসরে বন্যা ও প্লাবনে আবাদযোগ্য জমিও অনাবাদী হইয়া পড়িয়াছে।*

সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও আবাদী জমির মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। পশ্চিম বঙ্গের অস্বাস্থ্যকর ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত ভূভাগের সহিত জনসংখ্যা হ্রাস ও অনাবাদী জমি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক নৈকট্য বিদ্যমান, আদমসুমারীর তালিকা হইতে সঙ্কলিত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের লোক-সমাজের ক্রতক্ষয়, রোগ-বৃদ্ধি এবং কর্ষিত জমি হ্রাসের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের তুলনামূলক লোকবৃদ্ধি, কর্ষিত জমির বৃদ্ধি এবং পরিশেষে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে এই বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধ হইবে।

১৯০১—১৯৩১

	কর্ষিত ভূমির হ্রাস (শতকরা)	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি
বর্দ্ধমান	৪০	৫০·৪	+৩·৭
নদীয়া	৭	৫৭·৫	+৮·১
মুর্শিদাবাদ	১৪	৪১·৭	+২২·৯
যশোহর	৩১	৪৮·২	—৭·২
হুগলী	৪৫	৪৬·৩	+৬·২

	কর্ষিত ভূমির বৃদ্ধি	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি
ঢাকা	+৫৭	৯·৭	+২৮·৯
ফরিদপুর	+১৩	২৬·৬	+২১·৮
মৈমনসিংহ	+১৯	১১·১০	+২৮·৫
বাখরগঞ্জ	+২১	৮·৩০	+২৭·১

সাধারণভাবে দেখা যায় পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া কম, আবাদী জমি বৃদ্ধি, লোকসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি সত্ত্বেও লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই পার্থক্য গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে দ্বিতীয় এক নূতন প্রশ্নের সামনে দাঁড়াইতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় মৃত ভাগীরথীর দুইধারে আবাদী জমি হ্রাসের সহিত ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি হওয়ায় লোকসংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে কিন্তু চরঅঞ্চলে নূতন আবাদী জমি বৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যা এত প্রচুর বাড়িয়াছে যে মোট লোকসংখ্যা ত্রিশ বৎসরে মোট পাঁচলক্ষ [illegible] বাড়িয়াছে। পদ্মা কিম্বা ভৈরবের চরঅঞ্চলে মুসলমান কৃষকই উপনিবেশ গাড়িয়াছে; ফলে গত ৫০ বৎসরে হিন্দুবহুল এই জেলা মুসলমানবহুল জেলায় পরিণত হইয়াছে। সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা আরও দেখিয়াছেন হিন্দুর অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্ব্বত্রই অসম্ভব বেশী। গত একশত বৎসরে মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার মুসলমান জনসংখ্যার বাড়্‌তি এত বেশী হইয়াছে যে সমান সংখ্যক হিন্দু মুসলমান জেলা দুইটীতে আজ এক তৃতীয়াংশ হিন্দুও নাই। সর্ব্বত্রই দেখা যায় একদিকে ভূমিহীন শিল্পী জাতির লোকসংখ্যা হ্রাস, অন্যদিকে ভূমিহীন বাস্তুত্যাগী মুসলমান, জনমানবহীন চরঅঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্রুতহারে বাড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন হিন্দু শিল্পী-জাতির বাস্তুর উপরে অত্যধিক মায়া অনেকটা আর্থিক দুর্গতির কারণ, কিন্তু লোকসংখ্যার ভয়াবহ হ্রাস ও ক্রমিক মৃত্যুর কারণ জৈবনিক (Biological)

আদমসুমারীর সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনা করিলে আর এক নূতন দিকে আলোকসম্পাত হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী! অথচ বঙ্গের তিন দিকেই আদিবাসী পাহাড়িয়া জাতির বাস। ছোটনাগপুর, ভোটান, আসামের গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড় হইতে যে সকল আদিম জাতি সোনার বাংলায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাদের অস্তিত্ব এখনও পশ্চিমবঙ্গে নিখুঁত ভাবে রহিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কয়েক জেলায় ইহাদের বিলুপ্তি হইল কবে এবং কেমন করিয়া? বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই অনার্য্য জাতি "আর্য্যীকরণ" প্রথায় ক্রমে ক্রমে হিন্দু জাতির শতেক সিঁড়ির নীচে কিম্বা আশে পাশে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতেছিল, বৌদ্ধ কিম্বা ঐরূপ ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে দিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল। ঠিক এমনই সময় মুসলিম বিজয় আনিল প্রচণ্ড বাধা, সময় পাইলে অসমীয়াদের মতন সমস্ত আদিম জাতিই হিন্দুত্ব স্বীকার করিয়া লইত; কিন্তু বাংলা বিজয়ের পরে ইসলামের সৌভ্রাত্র এবং রাজধর্ম্মগ্রহণের প্রলোভন, পৌরহিত্যবাদের কড়া শাসন এই উভয় দ্বন্দ্বে ইসলামের উদার আহ্বান বিজয়ী হইল। গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের অনুকূল প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গের আদিম জাতিসমূহকে ধাক্কা সামলাইতে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের আদিম জাতি ও সিঁড়ির নীচে অবস্থিত পতিত হিন্দু, মুসলমান হইয়া গেল, "আর্য্যীকরণ" প্রথায় বর্ণশঙ্করের দল অধুনাখ্যাত "তপসিলী" দল সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ইসলাম বিভিন্ন শ্রেণীকে সম্মিলিত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক নূতন বলিষ্ঠ জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। যুগ যুগবাহী হিন্দুসভ্যতাও সংস্কৃতির মসলা উচ্চশ্রেণী হিন্দু ও "তপসিলী" সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করিলেও স্তরে স্তরে সাজান বিশাল হিন্দুসমাজের সোপান বাহু সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তাই আজও আমাদের কত সমস্যা, সমাজের এক অঙ্গে আঘাত পাইলে অপর অঙ্গ সেই বেদনা বুঝিতে পারে না। আমাদের অবস্থা ঠিক উপদেশমালায় "একগ্রাব বিভিন্ন উদর" পক্ষী। বাংলা শক্তিশালী হইবে তখনই যখন এই হিন্দু সমাজের heterogeneous element নূতন জাতীয়তার আদর্শে, ধনসাম্যের ভিত্তিতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনর্গঠিত

হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের আদিম জাতির সংখ্যা দেখিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা	সংখ্যা
জলপাইগুড়ী	২৭৮,১৭১
নূতন মালদহ	৫১,৪৬২
২৪পরগণা	৪১,০৮৫
মেদিনীপুর	২৫৩,৬২৫
দার্জ্জিলিং	১৪১,৩০১
বীরভূম	৭৪০৮৪
বর্দ্ধমান	১৫১৩৫৫
নূতন দিনাজপুর	৯৮৬৪২
মুর্শিদাবাদ	২৬১৩৮
হুগলী	৬৯৫০০
ইত্যাদি	

এক কোটী ৬২ লক্ষ অমুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মোট ১৩৬৭৮৫৬ জন আদিম অধিবাসী। অমুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ।

পূর্ব্ববঙ্গ

জেলা	সংখ্যা
খুলনা	২৬৭৫
যশোহর	৪৯৭৮
রংপুর	১৮২০০
বগুড়া	১৪৩৮৭
পাবনা	৬৯০৬
ঢাকা	৪০২৯
ফরিদপুর	১৩৬৩
বাখরগঞ্জ	২৮৪
ত্রিপুরা	১৫২৪
নোয়াখালী	৩৪
চিটাগং	৬৩৪৮
মৈমনসিংহ	৫৯৭২২
ইত্যাদি	

হীল চিটাগং ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গে মোট ২৭৩ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ২৯০০৪০ জন আদিম অধিবাসী, মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগের কিছু বেশী মাত্র।

বাংলা মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সাক্ষাৎভাবে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে বলিলেই চলে। অথচ হিন্দুর অধিকসংখ্যক লোকই গ্রামে বাস করে। কৃষির উপর নিতান্ত নির্ভরশীল, অথচ কৃষিকর্মে বিমুখ জাতির ধারণা "লাঙ্গল ছুঁইলে অশুচি হয়"। এই ধারণার বশবর্তী হওয়ায় কৃষি সম্পর্কীয় অন্যান্য কাজকর্ম্ম করিলেও নিজে লাঙ্গলের মুঠো ধরিয়া সচরাচর চাষ করে না। মুসলমানদের মধ্যে "কাজকর্ম্মে" কোনরূপ বাচবিচার নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কিম্বা মুসলমান চাষী হিন্দুর জমি চাষ করিয়া দেয়। এই জন্য আস্তে আস্তে হইলেও হিন্দুর জমি জনসাধারণের হস্তচ্যুৎ হইয়া যাইতেছে। ভাড়াকরা চাষীকে দিয়া জমি চাষ করাইতে গিয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ক্রমেই মাটীর সহিত সম্পর্ক উঠিয়া যাইতেছে। এইরূপে বাঙ্গালী যদি "ধরিত্রী করিয়া? হিন্দুর মধ্যে যাহারা সত্যিকারের কৃষক, যাহারা আজও সুন্দরবনের জঙ্গলে, রাঢ় বরেন্দ্রের ঊষর ক্ষেত্রে কিম্বা নিম্ন বঙ্গের সৈকত ভূমিতে সাপ ও কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিয়া, মশামাছি, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে প্রধানতঃ তাহারাই তপশিলীভুক্ত। হিন্দু সমাজের শ্রমজীবী সাধারণতঃ আদিম জাতি ও এই তপশিলীদের মধ্য হইতে আসিয়া থাকে। পুরাতন হিন্দু-সমাজব্যবস্থায় শিল্পীসমাজকে "নবশাখ" বলা হয়। এই নবশাখ সমাজ প্রায় মৃতকল্প। অন্নসমস্যায় হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মৃৎশিল্পী, কামার, কুমোর, সূত্রধর, নরসুন্দর, সস্তাসুন্দর আজ এলুমিনিয়মের সস্তা বাসন, টাটার কৃষিযন্ত্র, চীনা মজুর কিম্বা বিহারী ধোপা নাপিতের প্রতিযোগিতায় কুপোকাৎ হইয়াছে। তারপরে, সকলেই উচ্চশ্রেণীর দেখাদেখি আধপেটা খেয়ে ভদ্রলোক সাজিবার প্রলোভনে সহরে ভীড় জমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজেই হিন্দুর প্রাচীন গ্রাম বলিলেই ঝোপঝাড়ে আবৃত এঁদো পুকুর ও ডোবা পরিপূর্ণ নিরানন্দ অস্বাস্থ্যকর গ্রামের ছবিই সামনে ভাসিয়া উঠে।

পূর্ব্ববঙ্গে "তপশিলী" জাতির লোকসংখ্যা প্রায় ৪৪ লক্ষ, মোট হিন্দুর শতকরা ৪০ ভাগ, ঠিক সেখানে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী ও আদি জাতির সংখ্যা ৪৭-লক্ষ, (মোট) হিন্দুর শতকরা ৩০ ভাগ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী সম্প্রদায় শিক্ষা দীক্ষায়, আর্থিক সঙ্গতি কিম্বা রাজনৈতিক প্রতিভা, সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ।

পূর্ব্ববঙ্গে, তপশিলী বহু জাতির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ববঙ্গের রাজবংশী ও মধ্যবঙ্গের নমশূদ্র জাতি সংখ্যায় গুরুত্বসম্পন্ন। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের বসতি একচাপে থাকায় রাজনৈতিক সংহতি খুব বেশী; কৃষিজীবী সম্প্রদায় বলিয়া কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও গোষ্ঠীচৈতন্য-সম্পন্ন। রাজবংশী সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিরীহ, নমশূদ্র জাতির মতন গোষ্ঠীচৈতন্য সম্পন্ন না হওয়ায় এবং বাসভূমি সমস্ত উত্তর বঙ্গে ছড়াইয়া থাকায় উচ্চঃশ্রেণীর হিন্দু জমিদার ও সংখ্যাভূয়িষ্ঠ প্রতিবাসী মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত বিব্রত থাকিতে হইতেছে। ধর্ম্মবন্ধন ও সংস্কৃতি খুব গভীর ও সজীব না থাকায় রাজবংশী সম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান হইয়াছে খুব বেশী। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ কোনও তপশিলী সম্প্রদায় নাই। এখানকার পোদ, বাগ্দী, তিয়র, চামার, মুচী, ধোপা, পাটনী, সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষায়, আর্থিক সঙ্গতিতে নগণ্য, অনেকেই ভূমিহীন এবং দ্রুত বিলুপ্তির মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যাহাদের হাতে মাটী আছে তাহাদের অবস্থা কিছু নহে। মুসলমানদের মতন দ্রুত বর্দ্ধনশীল না হইলেও কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য ও নমশূদ্রজাতি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরশীল।

পশ্চিমবঙ্গের পতিত মাটীকে বন্ধ্যা দুর্ণাম হইতে রক্ষা করিতে হইলে মা-টীর সন্তানকেও বাঁচাইতে হইবে। ভূমিহীন, বৃত্তিহীন সম্প্রদায়কে ভূমি, বৃত্তি, ভাষা, জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির প্রেরণা দিতে হইবে। সামাজিক অসাম্য, শ্রেণীভেদ, সিঁড়িভেদ প্রভৃতি অসংগত প্রতিবাদক

তবে সহরের হিন্দুর মুখে অন্ন দিবে কে ? সহরের বিপুল জনসংখ্যার বিরাট উদর, পল্লীগ্রামই এই উদরপূর্ত্তির সরবরাহকারক।

পশ্চিমবঙ্গের মোট লোকসংখ্যা দুই কোটী দশলক্ষ, ইহার মধ্যে কলিকাতা, হাওড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী কলকারখানা অঞ্চলে মোট ৫৫ লক্ষ লোকের বাস ; এই পঞ্চান্ন লক্ষ লোক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে না বরং সাধারণ দেশবাসীর চেয়ে গড়পড়তা আয় বেশী বলিয়া ক্রয়শক্তি ইহাদের বেশী, কাজেই দেশের সকল স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য—তরিতরকারী, মাছ ডিম ও দুধ সহরেই চলিয়া আসে। কলিকাতা ব্যতীত নূতন এই প্রদেশে ছোট বড় ও মাঝারী আরও অনেকগুলি সহর আছে। খুব কম করিয়া ধরিলেও আরও ৪।৫ লাখ লোক কেবলমাত্র "রূপেয়ার" বিনিময়ে দরিদ্র জনসাধারণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। ঠিক যেন বিটপীতরুর রস জোগাইতে গিয়া সমস্ত মাঠ অনুর্ব্বর প্রান্তরে পরিণত হওয়ার মত। অথচ বাংলায় শতকরা ৭৫ জন লোক চাষের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া সকলের মুখে অন্ন জোটাইতে পারিত না, সেখানে নূতন বাংলার শতকরা ত্রিশজন লোক চাষ করিয়া সকলের মুখে অন্ন দিবে কেমন করিয়া ? তাহার উপরে আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা অতি পুরাতন, সাবেকী ধরণের। হলাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষি ব্যবস্থা, পশু-প্রজনন, ডেয়ারী, ফার্ম্মিং প্রভৃতি আমাদের দেশে থাকিলে নগরের বাহিরে যে জনসমাজ ও অবারিত মাঠ পড়িয়া আছে, খাদ্যোৎপাদনে ইহাই আমাদের পক্ষে প্রচুর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অনেক জেলায় দেখা যায় শ্রমিকের অভাবে মাঠের পরে মাঠ পড়িয়া আছে। এতদঞ্চলের মাটী একে শক্ত, তাহাতে জলের অভাব, কারখানার শ্রমিকের হারে আমদানী শ্রমিকের বেতন দিয়া কৃষকের কিছুই থাকে না। দরিদ্র দেশের দরিদ্রকৃষক বরুণদেবতার কৃপার উপরে নির্ভরশীল। কৃষিতে আগে থেকেই টাকা ফেলিয়া "রাই কুড়াইয়া বেল" বাঁধিবে এমন দুরাশা ও আর্থিক সঙ্গতি তাহাদের নাই। কাজেই যেখানে পূর্ব্ববঙ্গের হরিৎক্ষেত্রে সোনার ফসলে মন ও চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায় সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কাঁটানটের সবুজ ফুলে প্রাণের আত্মারাম কাঁপিয়া উঠে ! ইহার পরিত্রাণ এতদিন সম্ভাবনার অতীত ছিল। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এবার "সামন্ত-চক্রের" আহ্বানে নহে, জনসাধারণের নির্ব্বাচনে দেশের সুসন্তান, ত্যাগী ও দরদী "গোপালদেব"এর দল দেশের "রাজপদে" অভিষিক্ত হইয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের এক প্রধান অংশের মরনদী, খাল-বিল-তড়াগসমূহের পঙ্কোদ্ধার হইয়া পুনরায় জলে-ফুলে পরিপূর্ণ হইবে, ক্রমেই দেশ হইতে বন্যা, হাজামজা, শুখা, দৈব প্রভৃতি বিপত্তির অতলজলে ডুবিয়া যাইবে, টুকরা টুকরা জমির পরিবর্ত্তে সস্তা বিদ্যুতে যন্ত্র-লাঙ্গল জমি চাষ করিবে, যন্ত্রনিড়ানী আগাছা দূর করিবে ; আমেরিকার মতন আমাদের দেশেও শতকরা ১০।১৫ জনের বেশী লোক কৃষিক্ষেত্রে কেন আটকাইয়া থাকিবে ? যেভাবে সে দেশে অল্পলোকে অত্যধিক জমিতে বেশী উৎপন্ন করিয়া বেশী রোজগার করে, বেশী খাইয়া সুখ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন উপভোগ করিতেছে [illegible] থাকিবে কেন ?

সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে নবসংগঠনের জয়যাত্রার সহিত নববঙ্গের শ্রমিক সমস্যা আরও গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা। আদম শুমারীর হিসাবে প্রকাশ, কলিকাতা ও কারখানা অঞ্চলে আন্দাজ দশলক্ষ অবাঙ্গালীর বাস। বাগানের মালী, রাস্তার মুটেগিরি, ফিরিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, পাইপমিস্ত্রি, গৃহস্থবাড়ী ও হোটেলের ঠাকুর, চাকর, খানসামা প্রভৃতি কাজ উৎকলদেশীয় শ্রমিকের একচেটিয়া। গোয়ালা, গাড়োয়ান, দারোয়ান, কলকারখানার শ্রমিক সাধারণতঃ বিহার, মাদ্রাজ, ইউ. পি. প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে। বাস, লরী ও ট্যাক্সী ত পাঞ্জাবীদের একচেটিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংগঠনের প্রতি-যোগিতায় এই সকল শ্রমিকের দাবীদাবী বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং নবজাত প্রদেশের রোজগারী অর্থের প্রধান অংশ এই পথেই চলিয়া যাইতেছে। কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার জন্য কিম্বা রাস্তাঘাটের যানবাহন চালু রাখিবার তাগিদে, ধন ভাণ্ডারের উপরে এই চাপ প্রতিনিয়ত বাড়িয়াই যাওয়ার আশঙ্কা। বাংলা ও বাঙ্গালীর বিপর্য্যস্ত অর্থসমস্যাকে ভরাডুবি হইতে আত্মরক্ষা করাইতে হইলে দরকার লোকপ্রিয় অথচ জবরদস্ত শাসকের। এককালে জার্ম্মানীতে পুরুষের বেকার সমস্যায় সমাধান করিবার জন্য হিটলারকে বলিতে হইয়াছিল, "পুরুষের বেকারজীবনের সমস্যা তীব্রতর না করিয়া সিমন্তিনীরা গৃহের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত হউন।" আমাদের দেশের কল্যাণীরা, একমাত্র কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতে বিদেশী ২।৩ লক্ষ রাঁধুনী, ভৃত্য ও খানসামাকে বিদায় করিতে সমর্থ হইলে ন্যূনপক্ষে বাংলার মাসিক এককোটি টাকা দেশেই থাকিয়া যাইত ! অথচ প্রতি ঘরেই অন্নসমস্যার তীব্রতা কত কঠিন।

পৃথিবীর অপরাপর দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় চাষের উপযুক্ত জমি না পাইয়া কিম্বা লোকবলের ঘাটতি সত্ত্বেও দেশকে দাঁড় করান যায়। জার্ম্মানী তাহার বিপুল শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়াছিল কেবলমাত্র দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে কাজে লাগাইয়া। কলাবিদ্যার প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া লোকবল সমস্যাও তাহারা বিদূরিত করিয়াছিল। নববঙ্গের সীমানায় প্রকৃতির অফুরন্ত দান ছড়াইয়া আছে। উদ্যম ও রাজকীয় শক্তির যোগাযোগের অভাবে বিধাতার এই দান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কয়লার উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক যন্ত্রবল ও কারু শিল্পের উৎকর্ষ্যসাধন করিয়া জার্ম্মানী অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। আমাদের বিহ্বল ও ব্যহত দৃষ্টি ঐ লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে বহু দেরী, যন্ত্রবিজ্ঞান এখানে মধ্যযুগীয় অবস্থায়। তারপর বাংলার স্বাভাবিক সীমানা এখানে যে ভাবে সঙ্কুচিত তাহাতে প্রকৃতির বিপুল দান ও পরহস্তগত, বাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি এইদিকেও আকৃষ্ট হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। পশ্চিম সীমান্তের ন্যায়সঙ্গত সমাধানের উপরে বাংলার বহু সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে সিংহভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলা অবস্থিত। এই বিপুল জনসংখ্যার সামান্য ভাগ বাংলার সহিত একত্রীভূত হইলে বাংলার লোকসংখ্যা ও ভূভাগ শুধু বর্দ্ধিত

হইবে না, পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত কয়লা, লৌহমাক্ষিক, তাম্রমাক্ষিক, চূণাপাথর, মাইকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত ভাগলপুরের বাঙ্কা মহকুমা, পূর্ব্ব-মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলার শস্য সম্পদ ও জন সম্পদে নববঙ্গের অসামান্য উন্নতিলাভ ঘটিবে। র‍্যাড্‌ক্লিফের দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া অখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ নববঙ্গ গঠনে সাহায্য করিবে।

একভাষাভাষী লোকদিগকে একই প্রদেশে যুক্ত না করিলে অন্য ভাষাভাষী প্রদেশে অল্পসংখ্যক লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সরকারী কাজকর্ম্মে, ব্যবসাবাণিজ্যে, এমন কি সরকারী ঠিকা ফরমাইস্ পাওয়ার অসুবিধা হয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি না থাকায় তাহাদের অভাব অভিযোগের ও নিষ্পত্তি হয় না। ১৯১১ সালের পরিবর্ত্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমানায় যে সকল অংশ বিহার কিম্বা উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে তাহাদের সংস্কৃতির অবনতি এই কারণেই ঘটিতেছে। ১৯২১ সালের লোকগণনায় বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে ১৭ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী লোকের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৯৩১ সালের লোকগণনায় এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে বাংলা ভাষাভাষীদের হিসাব পৃথকভাবে না লেখায় এই সংখ্যা আরও হ্রাস পাইয়াছে অনুমান কষ্টসাধ্য নহে। বরং উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তীয় প্রদেশে যে ভাবে উড়িয়া কিম্বা হিন্দীর প্রচার হইতেছে তাহাতে উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না।

পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার ভাষাকে "কিষণগঞ্জিয়া" বলা হইত। ১৯১১ সালের লোকগণনায় এই ভাষায় ৬০৩৬২৩ জন কথা বলিত। অন্য কোনও উপদেশ না থাকায় এবং বাংলাভাষার সহিত অত্যধিক ঐক্য থাকায় ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই উপভাষায় যাহারা কথা বলিত তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া লিখিত হইত। ১৯২১ সাল হইতে এই উপভাষাকে "হিন্দী" বলিয়া লিখিত হইয়া আসিতেছে। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব প্রান্তীয় প্রদেশে, সকলেই এখনও এই আধাবাংলা ভাষায় কথা বলে। নৃতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে স্থানীয় রাজবংশী ও কেবটসম্প্রদায় অধ্যুষিত নরনারীর সহিত জলপাইগুড়ী ও উত্তর দিনাজপুরের সাদৃশ্য সমধিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্বের দিক হইতে মিতাক্ষরার চেয়ে এখনও এখানে "দায়ভাগ" বেশী প্রচলিত। "আইন আকবরীর" আমলেও মহানন্দার পূর্ব্বধারে অবস্থিত সরকার "লক্ষ্মণাবতী" সুবা বাংলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই একই কারণে ভাগলপুর জেলার বাঙ্কা মহকুমা ও বাংলার পশ্চিম সীমানার অন্তর্গত। এমনকি "মাধিপুরা" অঞ্চলেও বহু বাঙ্গালীর বাস। সাঁওতাল পরগণার রাজমহল, পাকুড়, জামতাড়া, দুমকা প্রভৃতি স্থান, হাজারীবাগ জেলার গিরিডি মহকুমা, মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা, সম্পূর্ণ বাঙ্গালী অধ্যুষিত স্থান। বালেশ্বর জেলায় ভদ্রকের মত সিংহভূম জেলায় উড়িয়া এবং হিন্দী প্রচারের প্রবল উদ্যম চলিতেছে। ইহা সত্ত্বেও ১৯৩১ সালে একমাত্র সিংহভূম জেলায় ১৪৭৫১৭ জন*লোক বাঙ্গালী বলিয়া লিখাইয়াছে। ১৯২১ সালে এই জেলার অর্দ্ধেক লোক বাংলা ভাষায় কথা বলিত। স্থানীয় সাঁওতাল, হো এবং ভূমিজ সম্প্রদায় বৃহত্তর বাংলারই অধিবাসী। কিন্তু দশবৎসর ধরিয়া উড়িয়া প্রচারের ফলে উড়িয়া ভাষীর সংখ্যা বিপুল ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, তত্রাচ উক্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায় ব্যতীত ৮৫৫৩০ জন লোক বাংলা ও উড়িয়া উভয় ভাষায় কথা বলিতে পারে বলিয়া আদমসুমারীর কর্ত্তৃপক্ষ কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ফেলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এতদঞ্চল বাংলায় আসা একান্ত ও অবিলম্বে প্রয়োজন। আশা করি, অপর কোনও তথ্যের দরকার নাই। মানভূম জেলা প্রকৃতই বাংলার অংশ হিন্দী ও উড়িয়া অভিযানের দক্ষতা ব্যর্থ করিয়া ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে ৫২০০০ জন বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধিতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৮ সালে সর্ব্বদলীয় কনফারেন্সে নেহরু রিপোর্ট আলোচনার সময় ভৌগলিক, অর্থ-নৈতিক এবং নৃতত্ত্ব সম্পর্কে ঐক্য থাকিলে, একভাষাভাষী অঞ্চলকে একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। সাইমন কমিশনে একভাষাভাষী অঞ্চলকে একই শাসনে আনয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্প্রতি গণপরিষদেও একভাষাভাষী সংলগ্ন অঞ্চলকে এক শাসনাধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার সুসংলগ্ন এই প্রান্তীয় ভূভাগকে বাংলার শাসনাধীনে আনায় বিরোধিতা করিয়া সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শের নামে মিথ্যা বুকনী প্রচার করা হইতেছে। ক্ষমতাশালী প্রাদেশিক নেতৃবর্গের প্রবল আপত্তি উত্থিত হইয়াছে। এই সময়ে বাংলার নেতৃবর্গের নিস্তব্ধ থাকা আশঙ্কাজনক। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ধর্ম্ম চক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকার নিম্নে প্রত্যেক জাতিই গড়িয়া উঠুক, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, স্থান কাল পাত্র ও সম্প্রদায়রহিত ভারতীয় জাতির নব অভ্যুদয়ে—ইহাই হউক আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

আজ

শ্রীবীণা দেবী

জীবনে যে গান হয়নিকো গাওয়া
আজ গাও সেই গান,
জীবনে যে প্রাণ হয়নিকো পাওয়া
আজ পাও সেই প্রাণ।
জীবনে যে দান হয়নিকো দেওয়া

জীবনে যে ধন হয়নিকো নেওয়া
সেই ধনে হাত ভর।
জীবনে সে সুধা হয়নিকো ঢালা
আজ সেই সুধা ঢালো,
জীবনে যে আলো হয়নিকো জ্বালা

সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ,পিএচ্-ডি

আমরা সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষার কথা মনে করিতেছি না। আমরা চতুষ্পাঠীর কথা ধরিতেছি। কারণ চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত আত্মত্যাগী, ভোগনিস্পৃহ ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বিদ্যালয় জাতির পুণ্যতীর্থ। বিধর্মী রাজাদের রাজত্বকালে তাঁহারা শাস্ত্রসমূহকে আপনার প্রাণের মত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অপ্রতিকূল আবহাওয়ায় শাস্ত্র প্রসার লাভও করিয়াছিল। তাঁহাদের চতুষ্পাঠী হিন্দুদিগের সংস্কৃতির উৎস। সেই উৎস আজ শুষ্কপ্রায়। এই চতুষ্পাঠীর অতীত স্মৃতি বড়ই মধুর হউক্, বর্ত্তমানের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তেই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে প্রাচীন হিন্দুর সংস্কৃতির স্পন্দন অদূর ভবিষ্যতে রুদ্ধ হইবে কি?

এই দুশ্চিন্তার কারণ কি? চতুষ্পাঠীর আদ্যপরীক্ষা ত এখন বহু সহস্র বিদ্যার্থী দিতেছে। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ত নগণ্য নয়। উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।

পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার সহিত জাতির সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রে স্থান লাভে অসুবিধা ছিল না। সমাজের চিন্তানায়ক ছিলেন এই সংস্কৃতজ্ঞরা। ভারতে মুসলমান যুগে বস্তুতঃ দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমানদের অধিকারে ছিল রাষ্ট্র। বহু হিন্দুরও সেই রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি ছিল এবং এই সব হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। এমন কি মুসলমান সম্রাট্রাও সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। আর দ্বিতীয় কথা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন অব্যাহত ছিল। হিন্দুসমাজের শিক্ষাগুরু ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এইজন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অনুদার ও অত্যাচারী সম্রাট্ অথবা নবাবেরা মধ্যে মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির শত্রুতা করিলেও স্বাধীন হিন্দুসমাজ সেই বর্ব্বর আঘাত সহ্য করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং তাহাতে মুহ্যমান হয় নাই।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসকদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের আধিপত্যে ঘুণ ধরে। এই মারাত্মক ব্যাধিটি তখন তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর ছিল। এখনও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই ব্যাধিটাকে ব্যাধিরূপে বুঝিতে পারেন না। হিন্দু রাজাদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ছিল এবং থাকাও স্বাভাবিক। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসকদের রাজত্বকালে রাজধর্ম্মাবলম্বীদের সমাজ প্রতিপত্তিশালী হয়। বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে জনসাধারণের ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অধিক সুযোগ থাকায় ইহা বহু লোকের চিত্তাকর্ষক হয়। ধনী মুসলমানগণ ছিলেন ভোগীশ্রেষ্ঠ এবং রুচি শিক্ষায় গুরু। মানুষের ভোগের প্রতি স্বাভাবিক টান আছে। হিন্দু সমাজে যাঁহারা অতি নিম্নস্তরে ছিলেন, মনুষ্যোচিত শিক্ষায় এবং সকল ভোগে বঞ্চিত হইতেন তাঁহারা রাজার ধর্ম্মগ্রহণ করিলে যদি ঐহিক ভোগ ও অন্যের মত শিক্ষা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ এবং স্বর্গসুখের আশ্বাস পান তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন। একদিকে ধর্ম্মত্যাগে নরকের ভয় অপরদিকে ঐহিকসুখের ও স্বর্গের আকর্ষণ। শুধু বিশ্বাস মানুষকে কতদিন স্বসমাজে অটল রাখিতে পারে। বেদ বড়, না কোরাণ বড়—এই প্রশ্ন উঠে নাই। অথবা জনসাধারণকে সন্তোষজনকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তীব্র অনাদর ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে। মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যে সত্যই সাধু ও মহাপুরুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অস্তিত্বই মুসলমানধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম্মের আকর্ষণ থাকা অন্যায় নয়। ইহার উপরে রাজশক্তি যদি ধর্ম্মপ্রচারে সৎ ও অসদুপায়ে সহায়তা করে এবং সমাজরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সম্প্রদায় এবং উচ্চ বর্ণের সমাজপতিরা যদি স্নিগ্ধপথ অবলম্বন না করেন তাহা হইলে সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যাঁহারা ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবন অভিশপ্ত হয় নাই, বরং তাঁহাদের অনেকেরই জাগতিক সুখ অনেক অধিক হইয়াছিল। একমাত্র পরলোকের যুক্তি এই শিক্ষাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারে না। জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয় হৃদয়কন্দরে এই শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বহুপূর্ব্বে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা যে অযুক্তিযুক্ত, সেই ধারণা জনমনের গুপ্তকক্ষে সঞ্চিত হইতে লাগিল।

সংস্কৃতি শিক্ষার মূলে চরমাঘাত হানিল ইংরাজ আমল। স্কুল ও কলেজ শহরে শহরে প্রতিষ্ঠিত হইল। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইল। অন্নের জন্য ইংরাজি শিক্ষার আদর হইল। আর এক কথা, জড়বিজ্ঞান জনসাধারণের সংস্কার ও বিশ্বাসের দৃঢ় প্রাচীর অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। ম্লেচ্ছ জাতি তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির যে পরিচয় দিতে লাগিল তাহাতে লোকের মনে হইল যে কোন বিদ্যাই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। জার্ম্মানীতে ও অন্য দেশে বেদে পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজও বিস্মিত না হইয়া পারেন না। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিলেন না। জ্যোতিষে ও অঙ্কশাস্ত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ অনেক বেশী অগ্রসর হইয়া উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে, রসায়নে, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব পাশ্চাত্য সমাজ

আনিয়াছেন। বিজ্ঞানে উন্নতির ফলে যানবাহন, যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান, স্থাপত্য বিদ্যা প্রভৃতিতে পাশ্চাত্য জগৎ একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে জগতের ব্যবসা বাণিজ্য তাঁহাদের করতলগত হইয়াছে। যন্ত্র দৈত্যের অপব্যবহারে শোষণের সুবিধাও হইয়াছে অপরিসীম। এই শোষণের ফলে ভারতের ধনভাণ্ডার ও শস্যসম্পদ নিঃশেষিত হইয়াছে। আর্থিক অবস্থায় শোচনীয় পরিণাম ভারতীয়দের চিত্তবিকারের ও রুচি পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা আর্থিক শোষণের কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। এই শাসনকালে সংস্কৃত শিক্ষার উৎকর্ষ জনসাধারণের নিকটে অপ্রমাণিত হইয়াছে।

ইংরাজ শাসকেরা জনসাধারণকে শিক্ষার অনুমতি মাত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ দেন নাই। ইংরাজের শিক্ষাপদ্ধতি এতই ব্যয়বহুল যে ভারতের শোষিত জনসাধারণের পক্ষে এই শিক্ষা আলেয়ার মত চিরদিন স্পর্শের বাহিরেই রহিল। চতুষ্পাঠীর শিক্ষার সুযোগ আছে প্রচুর, কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণও বিদ্যমান। উচ্চবর্ণের লোকেরা ইংরাজের শিক্ষার দিকে ঝুঁকিলেন। ফলে দরিদ্র ও উপেক্ষিত উচ্চবর্ণের বালকদের জন্য উন্মুক্ত রহিল চতুষ্পাঠী। এর ফলে চতুষ্পাঠীর আকর্ষণ ক্ষীণশক্তি হইতে লাগিল। দরিদ্র হইলেই অমেধাবী হয় না। সুতরাং এই অবজ্ঞাতদের মধ্যেও মনীষী দেখা গেল। তাঁহারাই এখন চতুষ্পাঠীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। চতুষ্পাঠীর কর্ণধারেরা শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিলেন না। তাহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তৃতির কোন সম্ভাবনাই হইল না।

ইংরাজ শাসনকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমাজের উপর প্রভাব ক্ষীণ হইতে লাগিল। ইংরাজের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রজাদের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদার বৈষম্য চলিয়া গেল। ইহার ফলে ব্রাহ্মণদের সামাজিক শাসন শিথিলমূল হইল। বস্তুতঃ সামাজিক শাসন রহিল বিবাহে, পংক্তি ভোজনে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও দেবালয়ে। বহু ইংরাজিশিক্ষিত উচ্চবর্ণের বালক ও যুবকেরা পাঠশালায় নীচবর্ণের বালক ও যুবকদের সহিত মেলামেশা করিয়া জাত্যভিমান শিথিল করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে একাংশও পরাশ্রিত হইয়া আপনাদের তেজস্বিতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের বিবেক বিক্রয় করিয়া সমাজসংস্কারে সম্মতি দিলেন। সাধারণ লোক বুঝিল ঠিক বিপরীত। তাহারা মনে করিল যে সংস্কৃত পড়িলে মানুষ হয় অনুদার। এই ভাবে সংস্কৃত শিক্ষার বিপক্ষে জনমত গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ ছিলেন সমাজের শাসক। উৎপন্নদ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণের দায়ী হওয়া উচিত, কারণ এইটী সামাজিক ব্যবস্থা। যে বণ্টন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা এতই বিকৃত হইল যে তাহার দ্বারা সমাজ রক্ষা করা যায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রকৃত প্রতিকারের পথের দিকে দৃষ্টি পড়িল না। তাঁহারা অদৃষ্ট ও অধর্ম্মের দোহাই দিয়া জনসমাজকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। ইংরাজের যন্ত্রশিল্পের ও ব্যবসায় অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন আন্দোলন অথবা বিপ্লব করিলেন না। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যুগের প্রয়োজন ধরা পড়িল না। তাঁহারা শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন। অদৃষ্টবাদ ভূতের মত তাঁহাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিল—দৃষ্টি প্রসারতা প্রাপ্ত হইল না। অথচ প্রকৃত কর্ম্মবাদের তাঁহারা যদি আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সত্যপথের সন্ধান পাইতেন। ইংরাজের শোষণের প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ আপনাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এই আন্দোলনের স্রষ্টা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের দল। "বহুখ্যাতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা অথবা রাণীর অভিষেকের সময় প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন এবং রাজানুগত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মের নামে অনুন্নত প্রজাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াও দাঁড়াইয়াছিলেন। অনভিজ্ঞ সাধারণ লোক এই সব কুকার্য্যের জন্য সংস্কৃত শিক্ষাকেই দায়ী করিল। এই ভাবে সংস্কৃত শিক্ষার আদর ম্লান হইল।

যুগের পরিবর্ত্তনে সমাজে আভিজাত্যের মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিল অর্থকৌলীন্য। সংস্কৃত শিক্ষায় অর্থাগমের পথ অতি অপ্রশস্ত। বড় বড় পণ্ডিতদের প্রায়ই ধনীর মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কালের প্রভাবে ধনীদের চিত্ত হরণ করিল বিজ্ঞান। ধনীরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্যে বিমুখ হইলেন। আশ্রয়হীন লতার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ নিরালম্ব হইয়া পড়িলেন। বিদ্যার গৌরব ও মলিন হইয়াছে এবং অর্থাগমের পথও রুদ্ধ হইল। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের নূতন নূতন সমস্যাগুলি উঠিল না। সুতরাং ইহাদের সমাধান ও সম্ভবপর হইল না। এক কথায় সংস্কৃত সাহিত্য জাতির জীবনের সহিত সম্পর্ক হারাইল। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের আদর ধর্ম্ম মঠের কাছে থাকিলেও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিকট হ্রাস প্রাপ্ত হইল। এই কারণেই অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বলিয়া উপহাসও করিতে লাগিল, যদিও জাতির ধর্ম্ম জীবনে সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ জীবন্ত রহিয়াছে। এই সব কারণের সমষ্টে সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমানে জনসমাজে অপ্রীতিরও উপেক্ষার পাত্র হইয়াছে। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার যে ধারা প্রচলিত ছিল সে ধারা এখন অচল হওয়া উচিত। পূর্ব্বে ছিল এক ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণ শাসনের অকুণ্ঠিত প্রভাব। বর্ত্তমানে সেই দেশে কত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় বাস করিতেছে। ব্যক্তির উপর সমাজের যে অধিকার ছিল এখন আর তাহা নাই। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে। এখন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন ধরণের হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বাঁচিবার অধিকার আছে এবং বৈধভাবে সম্প্রসারণের সুযোগও আছে। অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দুসমাজকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে, কারণ হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট। হিন্দু সমাজকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যে সম্মানজনক চুক্তি করিতে হইবে। আর এককথা, হিন্দু

সমাজের মধ্যে সকল ব্যক্তিকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। তাহা না হইলে সমাজক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এই প্রেম শুধু মুখের কথা নয়। ব্যবহারিক জগতে এই প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিতে হইবে। সকলকে মানুষ হইবার সুযোগ দিতে হইবে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে; অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইবে; ব্যাধি শিশুমৃত্যু প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে; সকলের স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রত্যেকের নিরপত্তার বিধান করিতে হইবে। এরই নাম প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চতুষ্পাঠীর সংস্কার সাধন করিলে সংস্কৃত শিক্ষা আবার জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংস্কৃত শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই, বরং নূতন করিয়া শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা যাক। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব যে সংস্কৃত শিক্ষা আমাদের প্রগতির পথে অন্তরায় নহে বরং সহায়ক। আমরা কি চাই—নূতন ধরণের শিক্ষা, না দেশের উপযোগী শিক্ষা। নূতনত্বের মোহ মানুষের বেশী দিন থাকে না। যাহার কার্য্যকারিতা আছে তাহাই শেষ পর্য্যন্ত আদৃত হয়। এখন দেখিতে হইবে বর্ত্তমান ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার কোন উপযোগিতা আছে কি না? সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে দুইটী অংশ আছে। (১) সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে এমন বিষয় আছে কি—যাহা বর্ত্তমান কালে উপযোগী। (২) সংস্কৃত-ভাষার এখনও নিজস্ব কোন প্রয়োজন আছে কি? এই প্রশ্ন দুইটীর সদুত্তর পাইলে আমরা বুঝিব যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

সংস্কৃত শিক্ষার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, বর্ত্তমান অতীতের সন্তান এবং ভবিষ্যতের জনক। বর্ত্তমান অতীত এবং ভবিষ্যতের মিলনস্থল। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ প্রাচীন সমাজ বৃক্ষের ফল এবং ভবিষ্যৎ সমাজ বৃক্ষের বীজ। অতএব প্রাচীন সমাজ বর্ত্তমান সমাজকে রূপ এবং জীবনীশক্তি দিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক অতীতের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে না। সকল ঐতিহ্য ত্যাগ করিয়া যদি কোন সমাজ বাঁচিতে চায় তাহা হইলে সে সমাজ হইবে সম্পূর্ণ নূতন সমাজ। এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থীরা যেমন মনে করেন যে তাঁহারা আরব সভ্যতার অচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে বিচার করিয়া দেখুন যে তাহারা কি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছেন। ভিন্ন সংস্কারাপন্ন দুইটী জাতির রক্তের সম্বন্ধ ঘটিলে এদেশের সমাজের বিকৃত রূপ দেখা দেয়। এই জন্য প্রাচীন হিন্দুরা বিবাহ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। য়ুরেশিয়ান সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদের মনে হয় জাতির সংমিশ্রণে সুফল প্রমাণিত হয় নাই। একই সংস্কারে সংস্কৃত দুইটী পৃথক্ জাতি যদি মিলিত হয় তাহা হইলে ফল বোধ হয় মন্দ হয় না। এই জন্য শক, হূণ প্রভৃতি জাতি হিন্দু সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ হইতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমান সমাজ প্রাচীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নয়। প্রাচীন সমাজ নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকে। কতক প্রাচীন প্রবৃত্তি সুপ্ত হইয়া পড়ে এবং কতক প্রবৃত্তি অধিক জাগ্রত হয়। জাগ্রত প্রবৃত্তির মধ্যে কোনটি হইয়া উঠে সক্রিয় এবং কোনটি হয় নিষ্ক্রিয়। বাহ্যরূপ দেখিলে মনে হয় যেন দুইটী সমাজ পৃথক্ এবং ইহাদের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। ভারতের হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মনে হয় যেন দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ দুইটীর মধ্যে ভেদ আত্যন্তিক ছিল না। একই আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ দুই সমাজেরই কাম্য। সুতরাং দুই সমাজের লক্ষ্য এক। এই জন্য পরের যুগে দুই সমাজের মিলনও ঘটিল। এখন কোন বৌদ্ধ নিজেকে হিন্দু বলিতে আপত্তি করেন না। কিন্তু এমন একটী দিন ছিল, যখন বৌদ্ধ নিজকে হিন্দু ভাবিলে অপরাধী হইত। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রাচীন সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ নয়। এই সমাজ প্রাচীন সংস্কৃতির আংশিক প্রকাশ মাত্র। সংস্কৃত-শিক্ষা প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। বর্ত্তমান সংস্কৃতশিক্ষিত সমাজ সংস্কৃতশিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান শিক্ষায় জগতে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার জন্য বিজ্ঞান দায়ী হয় না; যে সমাজ বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে সেই সমাজই দায়ী। বর্ত্তমান পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যদি অনুদারই হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা দায়ী হইতে পারে না।

সংস্কৃত শিক্ষায় যে সব অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যদি আমরা আমাদের পৈতৃক ধন নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা অবিবেচনার ফলে নিঃস্ব হইব—সংস্কৃত শিক্ষার তাহাতে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীর নিম্নস্তরে স্বর্ণ প্রোথিত রহিয়াছে, অজ্ঞানী তাহার সন্ধান পায় না। যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বলে এই মহামূল্য খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিবেন তাঁহারাই উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন। কালের অতল তলে প্রাচীন ভারতের চিন্তারত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার পূর্ণ আলোচনা করিলে সেই রত্নসমূহের আবিষ্কার হইতে পারে। প্রাচীন অমুদ্রিত পুঁথিসমূহের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। এখনও এমন অনেক প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতিতে প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন আছে যাহাদের সন্ধান আমরা পাই নাই। সে সকল গ্রন্থের সযত্নে আবিষ্কার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা হয়ত কত রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিব। ইতিহাস আমরা পড়ি কেন? ইতিহাস যে জন্য পড়ি, সেই জন্যই আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িব। ভারতের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। এই অসমাপ্ত কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে।

অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনপথের প্রদীপ। প্রাচীন সাহিত্যেই এই প্রদীপটী সংরক্ষিত রহিয়াছে। অজ্ঞতার দ্বারা প্রদীপটী আবৃত রহিয়াছে। আবরণ দূর করিতে না পারিলে সংসার যাত্রার বন্ধুর পথে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের আশঙ্কা রহিয়াছে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার করিতে হইলেও আদর্শের প্রয়োজন এবং উপায়ও জানা চাই। অতীতে কি কি সংস্কার হইয়াছে এবং আমরা কি যে ফল লাভ করিয়াছি তাহা জানিতে হইবে। অবকাশে আজ

পদক্ষেপের অপেক্ষা আলোকে দৃঢ় ও স্থির পদবিক্ষেপ অধিক কাম্য নয় কি? আমরা অন্য দেশের অভিজ্ঞতা দ্বারা চক্ষুষ্মান্ হইতে পারি সত্য, কিন্তু আমাদের জীবনের সন্ধান পাইতে পারি না। আমরা চাই, সমাজে মৈত্রী, রাষ্ট্রে শান্তি, শিক্ষায় সত্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে আদর্শের দিকে অগ্রগতি। জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধিকে আমরা তুচ্ছ মনে করি নাই। আমরা কিন্তু আন্তর সুখ ও প্রসারতার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়াছি। আমরা চাহিয়াছি যে সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি আমরা মিত্রের মত আচরণ করিব এবং নিখিল বিশ্ববাসী আমাদের প্রতি মিত্রের মত আচরণ করুন। চিন্তায় ও কার্য্যে আমরা এই আদর্শকে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের চেষ্টার পথে অভ্যন্তরের ও বাহিরের কত বাধা আসিয়াছে। আমরা সেই বাধাসমূহ কত দূর অতিক্রম করিতে পারিয়াছি—আমাদের অসাফল্য কোথায় হইয়াছে—এই সব ব্যবহারিক গুণ দোষের পরিচয় হইবে প্রাচীন সাহিত্য হইতে। আমাদের জীবনপথের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাথী প্রাচীন সাহিত্য। এখন একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমরা যদি সংস্কৃত সাহিত্যের সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া লই, তাহা হইলে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার আর কোন আবশ্যকতা থাকিবে না। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে অনূদিত গ্রন্থগুলির আমরা আলোচনা করিব কিনা। যদি করি—তাহা হইলে প্রাচীন সাহিত্যেরই আলোচনা করা হইল—শুধু ভাষার ব্যবধান দূর হইল। অনুবাদের দ্বারা অপর ভাষার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। ছবি দেখিলে যেমন ব্যক্তিকে দেখার জ্ঞান হয় না তেমন অনুবাদ পড়িলে মূল গ্রন্থের সম্যক্ আস্বাদ পাওয়া যায় না। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল—' এই ন্যায়ানুসারে অনুবাদ চলিতে পারে। (ক্রমশঃ)

দ্রৌপদী

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

একটি প্রচলিত শ্লোক আছে—

> অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
> পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

অনেকে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বে এই শ্লোক পাঠ করেন। কিন্তু রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে এই শ্লোক পাঠের কথা লিখেন নাই—অন্য শ্লোকের কথা লিখিয়াছেন। এই শ্লোকটি কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা কাহার রচনা তাহা বলা কঠিন। ইহাকে শাস্ত্রবাক্য বা ঋষিবাক্য বলা যায় না।

কেহ কেহ এই বাক্য উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রাচীন ভারতে রমণীর সতীত্ব বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। প্রথমতঃ এই বাক্য প্রামাণিক নহে। দ্বিতীয়তঃ এই বাক্য গ্রহণ করিলেও এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সতীত্বের মূল্য নাই। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া বোধহয় যে, এই পাঁচটি রমণীর একাধিক পতিসংযোগ হইলেও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা ইঁহাদের চরিত্র পবিত্র হইয়াছিল। সাধারণতঃ একাধিক পতিসংযোগ পাপজনক। এই শ্লোকে ইহাকে "মহাপাতক" বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা মহাপাতকও নষ্ট হইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই ঈশ্বরে ভক্তি দ্বারা ইঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আমরাও ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা আমাদের পাপ নষ্ট করিতে পারি ইহাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

ইঁহাদের মধ্যে তারা ও মন্দোদরী স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারা বানরী এবং মন্দোদরী রাক্ষসী ছিলেন। উভয়েই অনার্য্য। অনার্য্য-সমাজে পাতিব্রত্যের আদর আর্য্য-সমাজ অপেক্ষা কম ছিল। অনার্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং তারা ও মন্দোদরী প্রচলিত আচারেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় যে ইন্দ্র যখন গৌতমের মূর্ত্তিধারণ করিয়া অহল্যার নিকট গিয়াছিলেন তখন অহল্যা তাঁহাকে প্রকৃতই গৌতম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এজন্য অহল্যার দোষ ছিল না। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে, অহল্যা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইন্দ্রই ঋষির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, অতএব অহল্যার পাপ হইয়াছিল। সেই পাপের ফলে অহল্যাকে দীর্ঘকাল অদৃশ্যা হইয়া বায়ুমাত্র আহার করিয়া ভস্মে শয়ন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল তপস্যার পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে অহল্যা শাপমুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ভগবৎকৃপায় মহাপাতক হইতে মুক্তি হইয়াছিল।

কুন্তী কুমারী অবস্থায় দুর্বাসার সেবা করিয়া একটি মন্ত্র পাইয়াছিলেন, ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া যে দেবতার আহ্বান করিবেন, ঐ দেবতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং দেবতার প্রভাবে তাঁহার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে। কৌতুহলবশতঃ কুন্তী কুমারী অবস্থায় মন্ত্রপাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন, সূর্য্যদেব উপস্থিত হইলে কুন্তী প্রথমে সহবাসে সম্মত হন নাই, পরে সূর্য্যদেবের অনুরোধে সম্মত হন। সাধারণ চরিত্র-গুলের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য। পরে স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে শাস্ত্রবিহিত নিয়োগপ্রথায় যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জন্ম হয়। কুমারী অবস্থায় কুন্তীর যে পাপ হইয়াছিল, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল ইহাই শ্লোকের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, কেহ যদি মনে করে

আমি এখন পাপ করিতে পারি পরে ভক্তির দ্বারা বিনষ্ট করিব—তাহা হইলে তাহার পাপ নষ্ট হয় না। বাইবেলে দেখা যায় মেরী ম্যাগ্‌ডেলিন দুশ্চরিত্রা রমণী ছিল, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এই শ্লোকের মর্মের অনুরূপ ধারণা অন্য ধর্মেও আছে।

অতঃপর দ্রৌপদীর চরিত্র। কেহ কেহ বলেন মহাভারতের যুগে রমণী একাধিক স্বামী গ্রহণ করিত। এই মত যে সম্পূর্ণ অলীক, তাহা দ্রৌপদীর বিবাহের বিবরণ পড়িলেই জানা যায়। সেখানে দেখা যায় যে, দ্রুপদ বলিতেছেন "হে কুরুনন্দন, এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই।" বস্তুতঃ দ্রুপদ এই প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হন নাই। পরে ব্যাসদেবের কথায় রাজি হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন যে পঞ্চপাণ্ডব এক ইন্দ্রেরই বিভিন্ন রূপ এবং দ্রৌপদী স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিনী। দ্রৌপদী যে সাধারণ রমণী ছিলেন না, ইহা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতেই দেখা যায়। কারণ দ্রৌপদী কোনও রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যজ্ঞের অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

দ্রৌপদী যদি স্ব-ইচ্ছায় একাধিক পতি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পাতিব্রত্যের দোষ দেওয়া যাইত। কিন্তু কুন্তী, যুধিষ্ঠির এবং স্বয়ং ব্যাসদেবের আগ্রহে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পঞ্চপাণ্ডবের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইঁহারা পাঁচজনেই তোমার স্বামী।" দ্রৌপদী এই সকল গুরুজনের নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন। পাঁচজনকেই তিনি সমানভাবে পতিরূপে সেবা করিয়াছিলেন, কখনও স্বেচ্ছাচারিণী হন নাই। এজন্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক তিনি সতীরূপেই পূজিত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ পতিব্রতা ছিলেন সেইরূপ তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হারিয়া যাইবার পর প্রতিকামী দুর্য্যোধনের আদেশে যখন তাঁহাকে আনিতে যায়, তখন তাঁহার বুদ্ধি ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রৌপদী দুইবার সেই দূত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময় দ্রৌপদী অতিশয় বুদ্ধির সহিত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সভায় কেহই তাহার উত্তর দিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে দ্রৌপদী কহিয়াছিলেন—"পৃথ্বীতলে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা ধর্মকে রক্ষা করিব, ধর্ম আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" প্রতিকামী অসমর্থ হওয়াতে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে প্রেরণ করিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী তাহাকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তাহা একাধারে বীর রস এবং করুণ রসের অলৌকিক সংমিশ্রণ। অবশেষে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিল তখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "হে গোবিন্দ, হে দ্বারকাবাসী কৃষ্ণ, হে গোপীজনবল্লভ, কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে দুঃখনাশন, আমি কৌরব-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে জনার্দন, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন, হে বিশ্বাত্মন, হে বিশ্বভাবন, আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ, এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর।" শ্রীকৃষ্ণ বিপন্ন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শয্যা ও লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করিয়া আসিতে লাগিলেন। ধর্মের অনির্বচনীয় প্রভাবে নানা রাগরঞ্জিত বিবিধ বস্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিল। দ্রৌপদীর চরিত্র যে কত মহৎ তাহা এই ঘটনার বিবরণ হইতেই জানা যায়।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে দ্রৌপদী চরিত্রের বিশিষ্টতা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "দ্রৌপদীর ধর্মজ্ঞান অসামান্য। যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্মানুরাগিণী আছে বলিয়া বোধ হয় না। * * দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসক্ত ধর্মের মূর্তিস্বরূপিণী। তাই পঞ্চপুরুষের সংসর্গযুক্ত হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট একপতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু এবং ধর্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট একমাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চস্বামী অনাসক্তযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট একমাত্র ধর্মাচরণের স্থল।"

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি (ইরাণ)

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

ইরাণের তেল লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। দুর্বলের অধিকারে যেমন রূপ থাকিতে নাই তেমন সম্পদও—সে প্রাকৃতিক হউক না কেন—থাকিতে নাই। যাহা সমাজ জীবনে সত্য, তাহা রাষ্ট্রিক জীবনে কোন কোন সময় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পারস্যের নিজের তেল থাকিলেও তাহা নিজের ভোগে তেমন কোনদিনই লাগে নাই। এ অনেকটা পরের নৈবেদ্যে চাল-কলা সাজাইবার মত। ভাল করিয়া নৈবেদ্য রচনা হইল, তারপর দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ সবই আত্মসাৎ করিলেন—পূজক ব্রাহ্মণ নিজের সুবিধামত কাহাকেও প্রসাদ দিবার কথাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। পারস্যের ভাগ্যেও প্রায় অনুরূপই ঘটিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইঙ্গ-রুশ শক্তিবর্গ পারস্যের রূপে মজিল। একজন উত্তর সীমান্ত হইতে আর একজন দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আসিয়া প্রেম আলিঙ্গন করিল। এখন বিপদ হইল পারস্যের—সে কোন কূল রাখে, কার মনরক্ষা করে। উভয়েরই দুর্দম যৌবন, উভয়েই পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চায় পারস্যকে। আপাততঃ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে স্থির হইল যে, পারস্যকে

আঞ্চলিক প্রভাবে পরিণত করা হউক, নতুবা রুশ ভল্লুক ও ব্রিটিশ সিংহ কামড়া-কামড়ি শুরু করিয়া দিবে। কিন্তু যে সন্দেহ একবার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে তাহাকে একেবারে ভাঙিয়া দেওয়া মুস্কিল। সেই ব্রিটিশ সিংহ ভারত সীমান্তে একবারে ওত পাতিয়া বসিয়া রহিল—অন্য পক্ষ অর্থাৎ রাশিয়া ক্যাস্পিয়া হ্রদের তীর হইতে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে পারস্যের দিকে আগাইতে শুরু করিল।

রুশভল্লুকের পারস্যের প্রতি মায়া থাকিবার বিশেষ একটি কারণ আছে। উত্তর পারস্যে সে অনেক টাকাকড়ি ঢালিয়াছে। এমন কি রেল পথ হইতে শুরু করিয়া বড় বড় রাস্তাও সে তৈরী করিয়াছে। কাজেই জার-শাসিত রাশিয়া পারস্যকে নিজের পকেটের করায়ত্ত বস্তু বলিয়া ভাবিত। জার-সাম্রাজ্য পতনের পর ইহার অবশ্য আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং লেনিন নিজে পারস্যের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই আকস্মিক নীতি পরিবর্ত্তনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পারস্যে নিজেদের ভারি বিপদগ্রস্ত বোধ করিতে লাগিল এবং শেষাশেষি রুশ-জুজুর ভয় দেখাইবার কাজে লাগিয়া গেল। রেজা শা পহ্লবীকে পারস্যের সিংহাসনে বসাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজে একটু সোয়াস্তি বোধ করিল। যাই হোক, মোটামুটি পারস্যের ইতিহাস রুশ বিপ্লবের পর এইভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে পারস্য, ব্রিটিশ ও রুশ কেহই "রাজনৈতিক সন্দেহবাদ" নামক ব্যাধিটি হইতে মুক্ত হইলেন না। ইহার মধ্যে মার্কিন আবির্ভাবের ইতিহাসটিও জানিয়া রাখা ভাল। মার্কিনরা শুধু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে সূত্র করিয়া পারস্যে আনাগোনা শুরু করে নাই। তাহারা ইতিপুর্ব্বেই যথাস্থানে টোপ ফেলিয়াছিল এবং আজ যেমন পারস্য মার্কিনদের টোপ গিলিয়াছে সেদিনও তেমনি করিয়া গিলিয়াছিল। আজ অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন আঁতাত রাশিয়াকে হটাইবার জন্য দানা বাঁধিতেছে, সেদিন তাহা ঘটে নাই। সেদিন ইঙ্গ-মার্কিন মন-কষাকষি চলিতেছিল। সেদিন মার্কিনরা ব্রিটিশকে বেশী ঘাঁটায় নাই—বা আজকার মত গুণ নাগপাশে মার্কিনরা এমন করিয়া বাঁধিতে পারে নাই।

রাশিয়ার খোষ্টারিয়া কনসেসন লইয়া পারস্য ব্রিটিশের মতবিরোধ দেখা দেয়। পারস্যের ইচ্ছা ছিল না যে, খোষ্টারিয়া তৈল কনসেসন ব্রিটিশ-হাতে পড়ুক। তাই তারা স্থির করিল যে, আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে এই তৈল কনসেসনটি দেওয়া হইবে, অথচ কোন রহস্যজনক কারণেই বোধ হয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ব্রিটিশদের চটাইতে রাজি ছিল না। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি এই তৈল কনসেসনের কর্ত্তৃত্ব নিয়া বাদানুবাদ করিয়াছে, এই সব বাদানুবাদের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী শেষাশেষি ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা করিতে রাজি ছিল। পারস্য সরকার এই খবর পাইবামাত্রই মজলিসে (পারস্য পার্লামেণ্টে) অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইল এবং যাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী তৈল কনসেসনের কোন সুযোগ না পায় তার জন্য পারস্য সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিল।

ইহাই মার্কিনদের পারস্যে প্রবেশের একমাত্র কারণ তাহা নহে। পারস্যের আর্থিক বিশৃঙ্খলা দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রভু মার্কিন বহুবার মহৎ বুলি আওড়াইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বেশ খানিকটা বিশৃঙ্খলা কাটাইয়া শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে যাই হউক বর্ত্তমানে আমরা মার্কিনদের পারস্যের তৈল সম্পর্কে যে কৌতূহল তাহা স্বার্থ-বিবর্জ্জিত নির্জ্জলা-সততা বলিয়া বিশ্বাস করি না। কেন বিশ্বাস করি না, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর জে. এম. ব্যালফোর এই রকম মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে মার্কিনরা নিজেদের স্বার্থ যাহারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে তাহাদের ওপর দিয়া উসুল করিতে চায়। একথা অবশ্য ব্যালফোর সাহেব কিছুতেই বলিতেন না, যদি পারস্যের উত্তর অঞ্চলের তৈল কনসেসনটি ব্রিটিশ বেনেদের তিলমাত্র পাইবার সম্ভাবনা থাকিত। তিনি গত প্রথম মহাযুদ্ধের পরই এই মতামত প্রকাশ করেন যে—মার্কিনরা পারস্যের উত্তরাঞ্চলের তৈল কনসেসন্ পাইলে আমাদের (অর্থাৎ ব্রিটিশদের) আপত্তি নাই। কেন না রাশিয়া উত্তরে রহিয়াছে—মাঝে মার্কিনরা রহিল, আমরা (ব্রিটিশরা) রহিলাম একেবারে দক্ষিণে। কাজেই তেলের মামলা যখন রক্তপাতে পরিণত হইবে তখন মার্কিন-রুশ দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য; কথাটা এখন সত্য সত্যই ফলিতে শুরু করিয়াছে।

ঐ জাগে নবযুগ-সূর্য্য

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কত শত প্রাণ দিল ফাঁসির মঞ্চে যারা
ইতিহাস তাহাদের বন্দে;
ভেসে আসে দিগন্তে সেই গীতি-ঝঙ্কার
রক্ত পাগল করা ছন্দে!
রচিয়াছে শহীদের চির-নিদ্রার বেদী
তৃষার্ত্ত ধরণীর বক্ষে—
ঘনায়ে উঠিল তাই পুঞ্জীত ব্যথা যত
অন্ধ সে কারাগার কক্ষে!
মরণের বেদীমূলে ঝ'রে যায় আঁখিজল—
—স্তব্ধ কাকলী মৃদুমন্দ—
চকিতে থামিয়া যায় বিহগের কলতান,
বিরহীর মরমিয়া ছন্দ!
স্বপ্ন তাদের ছিল সততায় রঞ্জিত
উজ্জ্বল অন্তর-দ্বার—

অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ
অতীতের মহিমায় মগ্ন!
মুক্ত ক'রেছে যারা চরণের শৃঙ্খল,
আনিয়াছে জাগরণ-মন্ত্র,
সর্ব্বহারার বুকে সুগভীর সান্ত্বনা
সর্ব্বহারার গণতন্ত্র।

বিশ্ব কাঁপায়ে জাগে সেই মহাসঙ্গীত
দীর্ণ দলিত জয় শঙ্খ—
মৃত্যুপথের জয়যাত্রীর রক্তে
নেতাজীর জয় হিন্দ্ ডঙ্কা!
ঐ জাগে নবযুগ-সূর্য্য—
আকাশ বাতাস আর উজলিয়া ক্ষিতিজল
মন্ত্রিত স্বাধীনতা-সূর্য্য!

কবিতার অপমৃত্যু

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

রাতটা অভাবনীয়।

শ্রাবণ মাস। কোথায় ধারাশ্রাবণ দিনরাত কদম-ফুলের রেণুর মত ঝির ঝির ক'রে ঝ'রতে থাকবে, এলো-মেলো পূবালী বাতাসে তা হবে আন্দোলিত, বাতায়ন ফাঁক দিয়ে হবে বিচ্ছুরিত, তা না হ'য়ে আজ কৌতুকময়ী চঞ্চলা কিশোরীর মতই নীল আকাশখানা দশমীর চাঁদটাকে বুকে ধ'রে হাসছে। সত্যই এ রাত অভাবনীয়—নিঃসঙ্গ পথে হঠাৎ সঙ্গী পাওয়ার মত, বাঞ্ছিত প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মতই।

বিকেলের রান্না সেরে রোয়াকে এসে ব'সল বিজয়া। শাশুড়ী গেছেন রায়েদের বাড়ী কথকথা শুনতে। নইলে তাঁকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প'ড়ে শোনাতে হত। রোজ রোজ একঘেয়ে একটানা কাজ সত্যিই ভাল লাগে না বিজয়ার। কিন্তু উপায় কি? তাই তাকে করতে হয়। সে যে বধূ! স্বামী অফিস থেকে এসে টিউসন্ ক'রতে গেছেন। আসতে প্রায় রাত দশটা হবে। বড় মেয়ে ও কচি ছেলেটা ঘুমিয়েছে। জ্বালাতন করবার মত কেউ নেই। বিজয়ার এখন অখণ্ড অবসর।

আজকের রাতটা বিজয়ার ভারী ভালো লাগলো।

বিজয়া পা ছড়িয়ে বসে। উঠানের সজনা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদখানা দেখা যাচ্ছে। মৃদু বাতাসের আন্দোলনে গাছের হাল্‌কা ঝিরঝিরে পাতাগুলো দুলছে। পেলব, কোমল, চাঁপা ফুলের তোড়ার মত হাল্‌কা চাঁদখানাও যেন দুলে দুলে উঠছে। গাছের ছায়া উঠানে আলোছায়ার আল্পনা এঁকে দিয়েছে। বিজয়া চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। পৃথিবী আজ যেন তার কাছে বড় হাল্‌কা, বড় নূতন, বড় রঙীণ। জ্যোৎস্না-সমারোহে পূর্ণা প্রকৃতি।

এমন নির্জ্জনে ব'সে থাকলে মনে পড়ে অতীতকে। অতীতের স্মৃতি পেছনের ইতিহাসটার পাতা উল্টে চোখের সামনে তুলে ধরে। দেখতে পাই বর্ত্তমান আর অতীতের লাভ লোকসান, আশা-নিরাশার খতিয়ান।

বিজয়ার মনে পড়ে কুমারী-জীবনের পুরাণ ডায়েরী-খানাকে। যেটা আছে তার পিতৃগৃহে, মা বাবা, ভাই-বোনদের স্নেহ, প্রীতি, মমতার সঙ্গে জড়িয়ে। বিজয়া বুঝতে পারে না এ বাড়ীতে সে কেমন ক'রে এল। এখানে তার আসবার কথা নয়—তার সংসার, তার চিন্তা, তার ভাবধারা কোথাও খাপ খায়না এ বাড়ীর সঙ্গে। সব সময়েই বেসুরো বাজে। তবু সেই বেসুরোকেই সুরেলা ক'রে তুলতে হবে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের সে যে বধূ।

পিতা শান্তিপ্রসন্নবাবু কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। মেয়ের কালচারের দিকটা তিনি বিশেষ ক'রেই লক্ষ্য রেখে-ছিলেন। বিজয়াকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন, সূচী কর্ম্ম নিপুণা ক'রে তুলেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। অসুখের জন্ম বিজয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে নি। পাড়াগাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর কোনদিনই ছিল না। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যেন হ'য়ে গেল। বন্ধু হরিপদবাবু বল্লেন—"কাঞ্চনপুর এমনই বা কি পাড়াগাঁ ভাই? কলকাতা থেকে আঠার মাইল বইত নয়? চল্লিশ মিনিট লাগে ট্রেণে যেতে। ছেলেটী গ্র্যাজুয়েট, গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস, বাপের একটু জমিদারী আছে। নিন্দের কি? মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে।"

কত সুখেই বিজয়া আছে! বিজয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে।

বিজয়ার মনে পড়'ল তা'র রবিদা'কে। রবিদা ছিল কবি। বিজয়াকে রোজ বিকেলে পড়াতে আসত। শান্তিপ্রসন্নবাবুর সে ছিল প্রিয় ছাত্র। এম-এ পাশ ক'রে ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ্চ করত। রবিদা তাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে। ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, চয়নিকা, শিশু, চিত্রা, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি থেকে নিখুঁতভাবে ছন্দের মিল শিখিয়েছে। ভাল ভাল কথা বেছে নিতে শিখিয়েছে। বিজয়ার কত কাঁচা কবিতা

রবিদা' কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিয়েছে। বিজয়ার কী দুঃখু হোত কবিতা কাটা দেখে। বলত "তোমাকে আর কবিতা দেখাবো না রবিদা, তুমি বড় কেটে দাও। আমার ক্লাশের মেয়েরা বলে বেশ হয়েছে, আর তোমার কাছে একেবারে যাচ্ছে তাই। ট্রানশ্লেসন লিখি ইস্কুলে কারেক্ট হয়, আর তুমি কেটে দাও।"

রবি বলে "হয় তোর মাষ্টার ঠিকমত দেখেনা—না হয় জানে না। এই দেখ এ সেন্‌টেন্‌স্‌টা একেবারে ভুল। একেবারে কিচ্ছু হয় নি। প্রথমে সাজানো হয় নি, তারপরে অতীত কালের জায়গায় বর্ত্তমান কাল, আবার কর্ত্তা সিঙ্গুলার, ক্রিয়া প্লুর্যাল। স্কুলের মাষ্টার এতগুলো ঠিক রেখে দেয় ত ?"

বিজয়া অভিমানভরা মুখে একটুখানি ফিক্ ক'রে হেসে ওঠে।

'কাটব ? না, কাটব না ? রবি জিগেস্ করে।'

'কাটো'—অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে নেহাৎ অনিচ্ছায় বলে বিজয়া।

"আরে আমার কি ইচ্ছে যে তোর যেগুলো রাইট হ'য়েছে সেগুলোও কেটে দিই। আমাকে ভুলগুলোত কাটতেই হবে। তুই যাতে ভালো ক'রে শিখিস সেত আমারও ইচ্ছে। কবিতা লিখছিস্, ভালো ক'রে না শিখলে শেখবার দরকার কি বল ? তোর যে কবিতা প্রথম পারফেক্ট হবে, সেই কবিতাটা আমি কাগজে প্রকাশ ক'রে দেবো।"

বিজয়া 'ধেৎ' ব'লে অবিশ্বাসের হাসি হাসলে। কিন্তু আনন্দে তার বুকখানা দুলে উঠল।

'দেখিস'—রবি বলে।

"বোস রবিদা' তোমার খাবারটা নিয়ে আসি" বলে বিজয়া ঘর থেকে চলে যায়।

সত্যিই বিজয়ার কবিতা যেদিন 'ঝরণা'র আত্মপ্রকাশ করলো সেদিন বিজয়ার কী আনন্দ! নিজহাতে কচুরী ভেজে রবিদা'কে খাইয়েছিল সে।

রবি ছিল বহুগুণ। সে ভাল সেতার বাজাতে পারত। বিজয়াকেও সে শিখিয়েছিল সেতার। শান্তিপ্রসন্নবাবু বিজয়াকে একটা সেতার কিনে দিয়েছিলেন। রবি আসত বিকেলে, যেত রাত্তিরে সেতার শিখিয়ে। জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রে, নীল আকাশের নাচে, বেলা, মালতী, যুথীসুরভিত ছাদে মাদুর বিছিয়ে তারা বসত দুজনে। বিজয়া সেতার খানাকে বুকে রেখে যখন কোমল আঙুলের ছন্দিত চালনায় সেতারের বুক থেকে জয়-জয়ন্তী, কাফি, ইমনকল্যাণ, ভূপালী প্রভৃতি সুরের জাল বুনে যেত তার মূর্চ্ছনায় নীরব চাঁদিনী থেকে থেকে কেঁপে উঠত, প্রকৃতি সম্মোহিতা হয়ে অপলক চেয়ে থাকত, তখন বিজয়ার মনে কি এক অব্যক্ত স্বপ্ন ভেসে উঠত যে তা সে এখন বলতে পারে না। তার কিশোরী প্রাণে অনুভব ক'রত অব্যক্ত চাঞ্চল্য। সে বাজাত, দরদ দিয়ে বাজাত—শুধু রবিদার মুখ থেকে একটা কথা শুনবার জন্য "চমৎকার"। রবিদাকে সেতার বাজিয়ে আনন্দ দিতে পারলেই সে নিজেকে ধন্য মনে ক'রত। বিজয়া এখন একথা অস্বীকার ক'রতে পারে না যে, তার মনে হত—সে এমনি সেতার বাজিয়ে চলুক রাতের পর রাত। নীরব জোছনায়, ফুলের সুবাসে, সুপ্ত ধরণীতে। শুধু রবিদা' তার পাশে থাক্। রবিদা' তার কোনদিন যাবে না। সে রবিদা'কে যেতে দেবে না। তার জগৎ রবিদা'কে নিয়ে—রবিদার বিদ্যা, রবিদার প্রতিভা, রবিদার কাল্‌চার—সেখানে সে আর রবিদা, রবিদা আর সে।

শেষ ঝংকার তুলে সেতার থেমে যেত। রবিদা বলত "অপূর্ব্ব"

"আমি কি ভাবছিলুম জানিস্ বিজু ?"

"কী রবিদা ?" বিজয়া উৎসুক হ'য়ে ওঠে।

"ভাবছিলুম আমরা যেন নিরুদ্দেশের পথে চ'লেছি সুরের তরী বেয়ে। কত নদী, পাহাড়, মরু পার হ'য়ে চ'লেছি। চ'লতে চ'লতে শেষে পৌঁছুলুম এক আলোর দেশে। সেখানে শুধু আলো আর আলো। রাত নেই—শিশির নেই—কুয়াসা নেই। সেখানে এক শাদা পাহাড়ের কোলে রঞ্জনী নদীর তীরে আমরা বাঁধব কুটীর। তুমি বাজাবে সেতার, আমি তুলে আনব ফুল।"

বিজয়ার চোখ দুটী ভরা-নদীর মত ছল ছল ক'রে উঠত। রবিদা'র আঙুলের আংটীটা ঘোরাতে ঘোরাতে বিজয়া বলত "তোমার কল্পনা অপূর্ব্ব রবিদা। তুমি এটাকে কবিতায় রূপ দাও। কবিতা হিসেবে এটা হবে অনবদ্য।"

রবি যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ শেষ ক'রে লক্ষ্ণৌ কলেজের প্রফেসারী নিয়ে চ'লে গেল, সেদিন বিজয়া যে রাত্রে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছিল একথা সে ভুলবে না কোনদিন। যাবার সময় রবিদা বলেছিল "বিজু, এখন থেকে তোমার আর আমার মধ্যে উঠল সময় আর পথের ব্যবধানের পাচিল। এই পাঁচিল টপ্‌কে আমাদের দেখা হবে বছরে দুবার কি একবার। তখন আমরা পরস্পর নতুন। কিন্তু সেই নতুনের মাঝখান থেকে খুঁজে বার করব আমাদের পুরাণকে।" বিজুর একখানা হাত ধরে একথা বলেছিল রবি। বিজয়া চোখের জল চাপা দিতে তাড়াতাড়ি ঘরে চ'লে গিছল।

বাবার কাছ থেকে বিজয়া রবিদার খবর পায়। সে নাকি প্রফেসার হিসেবে নাম ক'রেছে বিস্তর। বিয়ে এখনও করেনি, ব্যাচিলর থাকবে নাকি বলেছে।

বিজয়া উদগত অশ্রু রোধ করে।

কী পরিবেশ থেকে কী পরিবেশেই না এসে প'ড়েছে বিজয়া। সহর আর পাড়াগাঁ—অনেক তফাৎ। আচারে, ব্যবহারে, সভ্যতায়। পাড়াগাঁয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের—এমন কি অপেক্ষাকৃত ধনীর ঘরের বউকেও অবশ্যই কাজ ক'রতে হবে। কাজ না জানা যেন তার মহা অপরাধ। না জানার জন্য শুধু যে সেই দোষী তা নয়—মাতা পিতাকেও দোষ পেতে হয়। এ অভিজ্ঞতা বিজয়ার ছিল না, এখন হ'য়েছে।

বিজয়া যেবার প্রথম ঘর ক'রতে এল শ্বশুর উমানাথবাবু মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বিজয়াকে ডেকে বল্লেন "তামাকটা সেজে কাঠের উনুন থেকে আগুনটা নিয়ে এসত মা।' বিজয়া তামাক কখনও সাজেনি, তামাক সাজার স্বপ্নও সে কখনও দেখেনি। শ্বশুরের কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। যেন একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। যা হোক ক'রে সে তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে দিলে। উমানাথবাবু দু' একবার টেনে গুড়গুড়ির নলটা রেখে দিয়ে বল্লেন "নাঃ পারলে না মা, একটুও ধোঁয়া বেরুল না। বৌমার বাবা ত আর তামাক খান না, কিন্তু তাঁর খাওয়া উচিত।" বিজয়া বুঝতে পারে না, যদিও বা তার বাবা খেতেন তবু তাকে কেন তামাক সাজতে হবে।

ননদ কল্যাণী বলে "তোমার বড় ঐ সব বাবা, বৌদিকে দলে তামাক সাজতে, পান সাজতে বল্লেও যা কথা থাকত। তোমার বাকী খাজনা, হাল-বকেয়া ক'রে ক'রে মাথাটা বিগড়েছে দেখছি। চল বৌদি খাবে চল। বাবা যেন কী।"

শাশুড়ী বৌ ক'রেছেন তাঁর কষ্টের লাঘব হবার জন্য। হাঁড়ি হেঁসেলের ভার বৌয়ের গলায় তুলে দিতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এতদিন হাঁড়ি হেঁসেল ঠেলে তিনি ক্লান্ত। এখন বৌকে সেখানে বসিয়ে পানদোক্তা খেয়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্পগুজব করাতেই তাঁর বেশী আনন্দ। নাতি-নাতনীকে কোলে নিয়ে পাড়া বেড়ান তাঁর কাম্য।

কিন্তু বিজয়া ত কখনও রাঁধে নি। মায়ের সংসারে তাকে ত বিশেষ কোন কাজ ক'রতে হ'ত না, রান্না ত দূরের কথা। মা খেয়ে উঠলে মাকে পান সেজে দিত। বাবাকে স্কুল যাবার সময় কৌটোয় মশলা ভরে দিত। এখানে সে রাঁধবে কেমন ক'রে!

দ্বিতীয়বার ঘর ক'রতে এসে বিজয়ার এ অভিজ্ঞতা হ'ল। শাশুড়ী হরসুন্দরী একদিন বল্লেন—"বৌমা, আমি ঠাকুরঘর থেকে আসছি, তুমি ভাতটা দেখো। কিন্তু বিজয়া জল কমবেশী বুঝতে না পেরে ভাতটাকে গলিয়ে ধরিয়ে ফেলেছিল। ফেন্ গালতে কিছু ফেন ভাতের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল।

রায়েদের বড় গিন্নী বিকেলে বেড়াতে এলে হরসুন্দরী ঠেঙ ছড়িয়ে ব'সে বলতে লাগলেন—"কী বউই হ'য়েছে ভাই, ভাত চাপিয়ে ঠাকুর ঘরে গেছি—এসে দেখিনা পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে আঙার ক'রেছে। ওর মা কী ভাতটাও রাঁধতে শেখায় নি গা। লেখাপড়া নিয়ে আমি যেন ধুয়ে খাবো!"

একটু থেমে বললেন, "আমাদের যে সময় বিয়ে হ'য়েছে সে সময় বিয়ে হ'লে অমন মেয়ের তিনটে ছেলে হ'ত?"

কল্যাণীর তখন বিয়ে হ'য়ে গেছে। বিজয়ার পক্ষে কেউ তখন বলবার নেই। উকীলবিহীন আসামীর মত সে নিরুপায়।

স্বামী ভোলানাথকে নিয়ে বিজয়া সুখী হ'তে পারে নি। ভোলানাথের বিত্ত আছে বটে, কিন্তু কাল্‌চার মোটে নেই। মানসিক রুচির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। সুকুমার শিল্পের প্রতি কোন রকম অনুরাগ নেই। অনুরাগ

শুধু আপনার শরীরের দিকে। কবিরাজী চিকিৎসাই তার মতে সবচেয়ে ভাল। ওষুধ যদি খেতেই হয় তবে গাছগাছড়ার ওষুধই একমাত্র জিনিষ। বাড়ীর অসুখ-বিসুখের প্রতি তার কোন লক্ষ্য নেই। গাছগাছড়ার ওষুধ যদি খেতে চায় তবে সে রুগীকে দেখবে নইলে নয়। পোষাকের প্রতি লক্ষ্য নেই, কালো কালোই সই। রবীন্দ্র সঙ্গীত ভাল লাগে না, ভালো লাগে খেয়াল। কাব্য ভালো লাগে না, ভালো লাগে গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা। তাই বিজয়ার কাছে সে যেন একটা ভারী পাথর, যার গুরুত্ব আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই।

বিজয়া কাব্য ভালবাসে। কবি সে। সে আশা করে—ভোলানাথ প'ড়বে রবীন্দ্রনাথ, শোনাবে তাকে—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে সেকথা কি গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
তারই স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী।

কিংবা—বিজয়াকে বুকে টেনে নিয়ে ব'লবে—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার
কতরূপ ধ'রে পরেছ গলায় নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে বিজয়া ভোলানাথের কাছে কারণে অকারণে কতবার গেছে, অফিসের খাতাপত্র দেখতে দেখতে তার কি একবারও মনে হয় নি এত সুবাস কোথা হ'তে এল! বিজয়ার অলক্ষ্যে চুপি চুপি গিয়ে মাথার কাপড়খানি খুলে দেখতে পারত না কবরীজড়িত বেলফুলের মালাটী। আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে বলতে পারত না—

অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিও।

ভোলানাথ একটা নিরেট্ ভারী পাথর।

বিজয়া শ্বশুরবাড়ীতেও তার প্রিয় সেতারটা নিয়ে এসেছিল। সেতারটা না বাজিয়ে বাজিয়ে ধুলোবালি প'ড়ে বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছিল। তারে মরচে ধরছিল। একদিন ছুটীর দিনে বিজয়া সেতারটাকে ঝেড়ে মুছে তারগুলো টেনে-টুনে ঠিকঠাক করল। একটা তারে ঝঙ্কার দিলে। সেতারের যেন বেদনাতুর মনের গোপন বাণী প্রকাশ পেল। সে যেন বলতে চায়—"আমি কত কথা বলতে চাই, কিন্তু তুমি ত আমাকে বলাও নি। আমি যে পাষাণ হয়ে গেলুম।"

ভোলানাথ বললে—'সেতারটা কি শুধু দেখাতেই আনলে, একদিনও ত বাজালে না'।

"বাজাতে ত কোনদিন বলনি।"

"আজ বাজিযো"

বিজয়া আজ ভেবে পেলে না—কেমন ক'রে ভোলানাথের শীতের কুহেলিকাময় মনে বসন্তের আবির্ভাব হোলো। ভোলানাথকে সে যা নীরস উদাসীন ভেবে এসেছে তা কি সে নয়? বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রণয়পেলব কলকল্লোল তা হ'লে ভোলানাথের এখনও আছে। তবে কি তা ফল্গু?

বিজয়া বলে 'আচ্ছা।'

দীপ্ত চাঁদিনী পৃথিবীর বুকে প্লাবন এনে দিয়েছে। আকাশ ও মাটীর মাঝে শুভ্র জ্যোৎস্না রচনা ক'রেছে আলোকের জ্যোতির্ম্ময় সেতু। নীরব প্রকৃতি—নিঝুম বিশ্ব—নিরালা ছাদ। 'বৌ কথা কও' পাখার অশ্রান্ত ডাকে বিজয়ার বুকের বীণা কথা ক'য়ে উঠল। সেতারের তারে পড়ল ঝঙ্কার। বিজয়া বাজালে বেহাগ।

বিজয়া ডাকলে—'শুনলে'

নিদ্রিত ভোলানাথ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বিজয়া।

নাঃ, বিজয়া আর ভাববে না। সজনাগাছের আড়াল থেকে চাঁদখানা এসে প'ড়েছে সুপুরিগাছের মাথায়। অনেক ভেবেছে সে। আজকের রাত্তিরটা তাকে জাগিয়েছে। অতীত আজ ফিরে এসেছে তার কাছে, তাতে বেদনার জড়তা নেই, আছে ভবিষ্যতের পাথেয়। সে আজ লিখবে, কবিতা সে বহুদিন লেখেনি—আজ সে লিখবে।

বিছানায় স্বামী নিদ্রিত। কচি ছেলেটী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিজয়া বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়ীর পেছনটায় কলাগাছের বাগান। একটা গাছের মধ্যে কচি পাতাটার পরে জ্যোৎস্না পড়ে রূপালী বধুর মত দেখাচ্ছে। মৃদু বাতাসে কলাগাছের পাতাগুলো দুলছে। তাদের ছায়া কাঁপছে মাটীতে দুরাশার স্বপ্নের মত। একটা কোণে হ'য়েছে ধুতরো ফুলের গাছ। ফুল ফুটেছে অনেকগুলো। গন্ধে ভরপুর ক'রেছে জায়গাটা। ভারী মিষ্টি লাগলো গন্ধটা বিজয়ার। সে খাতা পেনসিল নিয়ে বসলো। লিখে চ'ললো—

ভুলে যাওয়া মোর স্মৃতিখানি আজ কেমনে জাগিল মনে
জোছনাধবল, বর্ষাসজল শ্রাবণের ভীরু ক্ষণে,
নীরব চাঁদিনী পৃথিবী ছড়ায়ে অসীমে দিতেছে পাড়ি
বেদনা বিধুর প্রকৃতি আজিকে—

খোকা ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠল। কলম বন্ধ করলে বিজয়া। চেয়ে রইল সাদা আকাশের দিকে। নীল তারকার আলোটা কেঁপে চলেছে দপ্—দপ্।
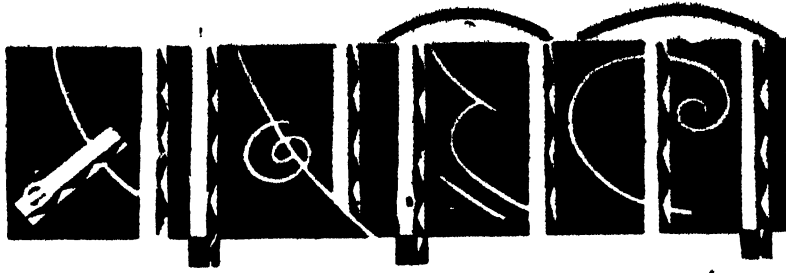
উন্নয়ন পরিকল্পনার বিবৃতি—

গত ৩১শে অক্টোবর একই দিনে দিল্লীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের এসিয়া সম্মিলনে সরবরাহ মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতায় পূর্ত্ত ও শক্তি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত গ্যাডগিল ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমিতির বার্ষিক সভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয়গণকে বিবিধ শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা এবং অধিক-পরিমাণে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা এবং সে বিষয়ে সরকারী চেষ্টার কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুত গ্যাডগিলও সকলকে অধিক পরিমাণে জিনিষ উৎপাদনের দ্বারা দেশের অভাব পূরণে উৎসাহী হইতে উপদেশ দেন। উৎপাদন কম বলিয়াই আজ দেশের সর্ব্বত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা যদি লাভের পরিমাণ কমাইয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তবে দেশে অভাবও থাকিবে না, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে না। শ্রীযুত গ্যাডগিল দেশের সকল বড় বড় শিল্প জাতীয়-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সত্বর দেশকে উন্নত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদও বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কর্ম্মী আমদানী করিয়া এ দেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান—

কাশ্মীর রাজ্য যাহাতে পাকিস্থানে যোগদান করে, সে জন্য পাকিস্থানের নেতারা প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের মহারাজাকে সে বিষয়ে সম্মত করাইতে না পারিয়া তাঁহারা কাশ্মীর আক্রমণ করেন। মহারাজা পূর্ব্ব হইতে উহার সম্ভাবনা বুঝিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাকিস্থানী সৈন্যরা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া মহারাজা পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সাহায্যপ্রার্থী হন ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা যাইয়া পাকিস্থানী আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এখন কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে ও মহারাজা যোগদানের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কাশ্মীরে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠনে মহারাজা উদ্যোগী হইয়াছেন ও সেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। সেখ আবদুল্লা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন—কাশ্মীর বিপন্ন। মাতৃভূমি রক্ষা করা প্রত্যেক কাশ্মীরবাসীর প্রথম কর্ত্তব্য। কাশ্মীর আক্রমণের অর্থ কাশ্মীরের জনগণকে পাকিস্থানে যোগদানে বাধ্য করা। কোন কাশ্মীরীই এই জবরদস্তি সহ্য করিবে না।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত ফটো—ডি-রতন

ভারতে বাণিজ্য জাহাজের উন্নতি—

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ গত ১ অক্টোবর বোম্বায়ে এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন,

"আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে বাণিজ্য জাহাজ-সমূহের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির আয়োজন চলিতেছে। ভারত এই ব্যাপারে পিছনে পড়িয়া আছে। ভারতের বাণিজ্য-জাহাজের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, জাতীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটানও উহাদের পক্ষে অসম্ভব। বৃটিশের সহিত এ বিষয়ে বৃথা আলোচনায় কালক্ষেপ না করিয়া নিজ বাণিজ্য-জাহাজ বৃদ্ধির জন্য ভারতের অবিলম্বে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ভারতকে তাহার অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে দেশরক্ষার জন্য শক্তিশালী নৌবহর ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক বাণিজ্য-জাহাজ থাকা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকার চেষ্টিত হইলে টাকার অভাব মোটেই হইবে না।" শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ জাহাজ ব্যবসায়ী। তাঁর এই সকল কথা সকল প্রদেশের ব্যবসায়ীদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।
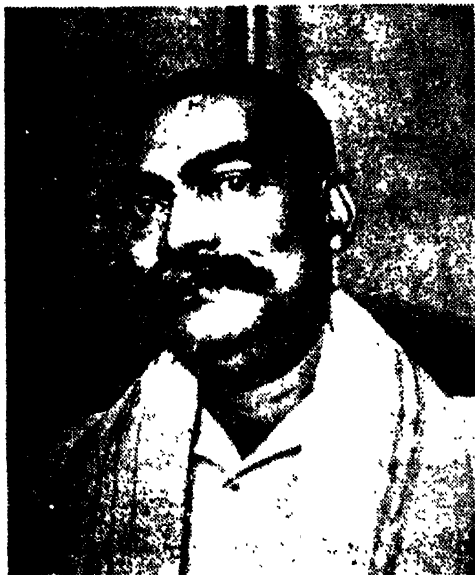
পশ্চিম-বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর

নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিত প্রস্তাব—

১৮ই অক্টোবর দিল্লীতে অধ্যাপক এন্-জি-রঙ্গের সভাপতিত্বে গ্রামাঞ্চল অধিবাসীদের এক সম্মিলনে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানে দেশের খাদ্যের অবস্থা এবং একদিকে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও অপরদিকে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে লোভী-ব্যবসায়ী, কারখানা-মালিকদের ব্যাপক ও নির্লজ্জ চোরাকারবার প্রভৃতির জন্য সমগ্র সমাজ যে নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিতেছে তাহা ঘুচাইয়া নিয়ন্ত্রণকারী আমলাদের দুর্নীতি বন্ধ করা প্রয়োজন। সে জন্য বর্ত্তমানে যে ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে তাহা রহিত করিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্য ব্যবস্থা মারফত খাদ্য ও বস্ত্রের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি ও নিখিল ভারত কুটীর শিল্প সম্মেলন আহ্বান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বৃহৎ শিল্পের সহিত কুটীর শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। প্রস্তাবটি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নূতন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী

ফটো—ডি-রতন

গোরক্ষা ও স্বামী করপাত্রীজি—

স্বামী করপাত্রীজি গোবধ নিবারণ আন্দোলন উপলক্ষে মথুরাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গোবধ বন্ধের দাবী লইয়া গত ২৮শে এপ্রিল হইতে দিল্লীতে ধর্ম্মযুদ্ধ চলিতেছে। তাহাদের দাবী ৫টি—(১) অখণ্ড ভারত (২) গোবধ নিবারণ (৩) ধর্ম্মবিরোধী আইন প্রত্যাহার (৪) মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা (৫) বিধান পরিষদে হিন্দুশাস্ত্রবিশ্বাসী প্রতিনিধি প্রেরণ।

এই দাবী জানাইতে যাইয়া বহুলোক কারাবরণ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে হিন্দুদিগের এই সকল দাবী রক্ষার জন্ত হিন্দুমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচোরী
ফটো—ইউনিভার্স্যাল আর্ট গ্যালারী

লোকাপসারণ—

গত ২০শে অক্টোবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ঘোষণা করিয়াছেন—পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে প্রায় পৌনে ২৩ লক্ষ লোক এবং পাকিস্থানে সাড়ে ২৫ লক্ষ লোক স্থানান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের ৫ লক্ষাধিক লোক এখনও আশ্রয় শিবিরে আছে। এখনও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে ১৮ লক্ষ লোক ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব হইতে ২৪ লক্ষ লোক স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সিন্ধু হইতে প্রতি সপ্তাহে ১০ হাজার লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। দিল্লী হইতে ৫০ হাজার মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। উহার পরিণাম কি তাহা চিন্তা করাও কঠিন।

কলিকাতায় ডাকাতি—

কলিকাতায় প্রায়ই দিবালোকে ডাকাতি হইতেছে। গত ২০শে অক্টোবর বালীগঞ্জের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পে-অফিস হইতে ৯১ হাজার টাকা লুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীমাণি বাজারের নিকট একটি কাপড়ের দোকান হইতে ২ হাজার টাকা হয়।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ
প্রফেসর জে-এম সেনগুপ্ত ফটো—জলধিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গভর্ণরদের বেতন—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রাদেশিক গভর্ণরের বেতন ৬৬ হাজার টাকা হইবে স্থির হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের লাট প্রাসাদের বার্ষিক খরচ ৮৪ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরদের বেতন বার্ষিক ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ও বিহারে ১লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ৭২ হাজার টাকা এবং আসাম, সীমান্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও সিন্ধুতে বার্ষিক ৬৬ হাজার টাকা ছিল।

কলিকাতায় কয়লা সমস্যা—

কিছুদিন হইতে কলিকাতায় কয়লা ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলীর জন্ত প্রত্যহ ৮৮ গাড়ী

কয়লা প্রয়োজন ; মালগাড়ী ও এঞ্জিন চালকের অভাবে, প্রত্যহ মাত্র ২৭ গাড়ী কয়লা আসিতেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হইতে ৪৪ গাড়ী কয়লার ব্যবস্থা হইয়াছে। চোরা-কারবার বন্ধ করার জন্য সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রত্যেক পরিবারকে রেশন কার্ড দেখাইয়া কয়লা দিবার প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

মহীশূরে জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা—

মহীশূরের মহারাজা রাজ্যের জনগণের মতানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন —(১) কে-সি-রেড্ডী প্রধান মন্ত্রী (কংগ্রেস-সভাপতি) (২) এচ-সি দাসাপ্পা—রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী ও ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-সভাপতি (৩), কে-টি-বি আয়েঙ্গার, ভূতপূর্ব্ব
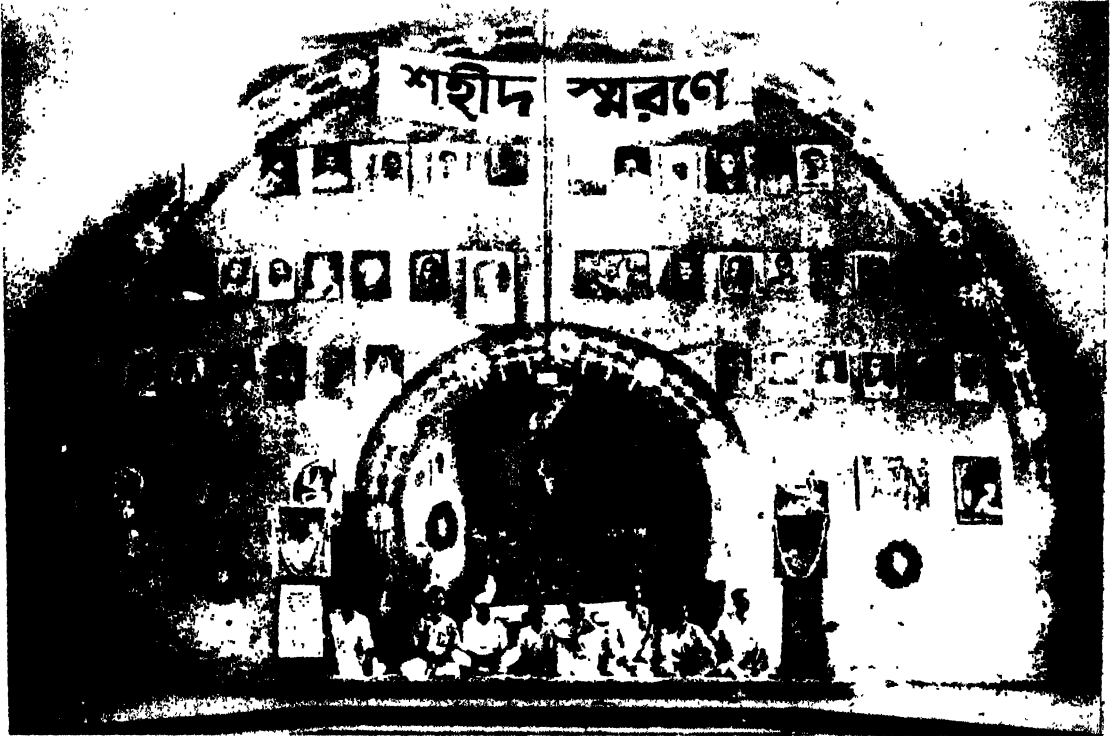
সিনেট হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রদর্শনীর শহীদ-বেদী ফটো—ডি-রতন

কংগ্রেস-সভাপতি (৪) এচ-সিদ্ধবা—ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি (৫) টি-সারিয়াপ্পা—কংগ্রেস কর্ম্মী (৬) আর-চেন্না গিরামিয়া কংগ্রেস কর্ম্মী (৭) মহম্মদ সেরিফ—লীগনেতা (৮) ডি-এচ চন্দ্রশেখরিয়া—ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (৯) সুব্রহ্মণ্য চেট্টি—বণিক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ২৪শে অক্টোবর তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এসিয়া-শ্রমিক সম্মিলন—

২৭শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে গণপরিষদ ভবনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের এশিয়া সম্মিলন আরম্ভ হয়। এশিয়ার এই ধরণের সম্মিলন এই প্রথম। এশিয়ার ২০টি দেশের ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগদান করেন। ভারত সরকারের শ্রম-সচিব শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সম্মেলনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন। এশিয়ার শ্রমিকদের সমস্যার কথাই বিশেষ ভাবে সম্মিলনে আলোচিত

চট্টগ্রামে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা—

গত ২০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রিতে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলের উপর আড়াই ঘণ্টা ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে। স্মরণীয় কালের মধ্যে ঐ অঞ্চলে ঐরূপ

াইল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বন্যার ক্ষতি অপেক্ষা ঝড়ের ক্ষতি অনেক বেশী।

আমেদাবাদে কাপড় মজুত—

যানবাহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আমেদাবাদে ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫০ হাজার গাঁট কাপড় মজুত রহিয়াছে। অথচ পূজার সময় বাঙ্গালা দেশে বহু দোকানে কাপড় আসে নাই, ফলে স্থানীয় ব্যক্তিগণও কাপড় পায় নাই।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ উমেশচন্দ্র নাগ
ফটো—জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় সমিতি ও গণপরিষদ—

১৫ই নভেম্বর হইতে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা এবং ১৭ই নভেম্বর হইতে ভারতীয় গণপরিষদের সভা বসিয়াছে। গণপরিষদ এবার ব্যবস্থা পরিষদের কাজ করিতেছে। প্রথমেই পরিষদের স্পীকার নির্ব্বাচিত হইবে এবং ২০শে নভেম্বর রেলবাজেট ও ৬ দিন পরে সংশোধিত সাধারণ বাজেট পেশ করা হইবে। স্বাধীন ভারতে আয়ব্যয় স্থির করা কঠিন সমস্যা হইয়াছে।

নুতন পাবলিক সার্ভিস কমিশন—

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ৩ জন সদস্য লইয়া নূতন পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করিয়াছেন—(১) অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস বীরেন্দ্রকুমার বসু (২) ডাক্তার নালরতন ধর ও (৩) অধ্যাপক জে-পি নিয়োগী।

বাঙ্গালায় আলু আমদানী—

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী ব্রহ্মদেশ ও সিমলা হইতে ১লক্ষ ৪২ হাজার মণ এবং দার্জ্জিলিং হইতে ৮০ হাজার মণ আলু আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন নূতন আলু উঠিবে—গত ২ মাস বাঙ্গালার লোক দেড় টাকা সের দরে আলু কিনিতে বাধ্য হইয়াছে—এ সময়ের মধ্যে আলু আমদানী হইলে লোক উপকৃত হইত।

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

কংগ্রেস ও মুসলমান নেতা—

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নিম্নলিখিত ১০জন মুসলমান নেতা গত ১৯শে অক্টোবর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—কংগ্রেসই ভারতের সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আজ মুসলাম লীগ পরিত্যাগ করিয়া একযোগে কংগ্রেসে যোগদান করাই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র কর্ত্তব্য। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিলেই সাধারণভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ সম্ভব। স্বাক্ষরকারীদের নাম—(১) সৈয়দ নৌসের আলী (২) আর আমেদ (৩) জাহাঙ্গীর কবীর (৪) চৌধুরী আসফ আলি বেগ (৫) আবদুল মালেক (৬) সিরাজুদ্দীন আমেদ (৭) এ-কে-কাসিম চৌধুরী (৮) অজিয়ার রসিদ (৯) মৌলনা আহমদ আলি (১০) আন্‌ওয়ার রহমন।

দেশরক্ষা বাহিনী গঠন—

সৈন্যদল ছাড়াও বিলাতের হোমগার্ডের মত এ দেশে যাহাতে সর্ব্বত্র দেশরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়, সে জন্য ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এ ভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করিলে কম অর্থব্যয় হইবে ও দেশবাসী সকলে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনের সময়ে দেশরক্ষা কার্য্যে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে। অধিক সৈন্য বাহিনী রাখিয়া ব্যয় না বাড়াইয়া এইভাবে দেশের সকলকে সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আজ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

১লা সেপ্টেম্বরের দাঙ্গায় নিহত ৺সুশীল দাশগুপ্ত
ফটো—ইউনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৩১শে মে তারিখে ভারত ত্যাগ করিয়া ৫ মাস কাল লণ্ডন, আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া গত ১লা নভেম্বর সকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে পদে যোগদান করিবেন কি না, তাহার এখনও স্থিরতা নাই। তিনি ৪ঠা নভেম্বর দিল্লী গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। আমেরিকায় ভারত-কথা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নূতন বড়লাট—

ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন বিলাতে রাজকুমারীর বিবাহ উৎসবে যোগদানের জন্য ১২ই নভেম্বর ১৫ দিনের ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রী চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী অস্থায়ী বড়লাট হইয়াছেন এবং সার বি-এল-মিত্র শ্রীযুত রাজা-গোপালাচারীর অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালার গভর্ণরের কাজ করিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় জন্মোৎসব হইয়াছে, শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমারী ইন্দিরা সরকার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের কন্যা কুমারী ইন্দিরা সম্প্রতি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সরকারী বৃত্তি পাইয়া প্যারিসে গিয়াছেন। তিনি তথায় সমাজ, সাহিত্য ও লোকমঙ্গল বিষয়ে লেখাপড়া করিবেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ফরাসী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁহার অন্যতম কার্য্য হইবে। ইতালী দেশের বোলৎসানো সহরে তাহার জন্ম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফরাসী সাহিত্যে তিনি এম-এ পাশ করেন—বাঙ্গালা, ইংরাজি ও জার্ম্মাণ সাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসাল ওয়ার্ক ডিপ্লোমা ক্লাসেও অধ্যয়ন করিয়াছেন।

তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হউক, আমরা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—

খ্যাতনামা কোবিদ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের দৌহিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পাশ করিয়া

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগের অধীনে প্রাচীন ভারত ও সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি শ্যাম দেশের 'থাই ভারত সংস্কৃতি সমিতি'র নিমন্ত্রণে ব্যাঙ্কক গিয়াছেন। তথায় তিনি চূড়াসঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে অধ্যাপনা করিবেন ও 'অহিংসা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা বিষয়ে স্থানীয় কর্ম্মীদিগকে সাহায্য করিবেন। ভারত ও শ্যামদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রচার কার্য্যই তাঁহার তথায় প্রধান কার্য্য হইবে। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

জুনাগড় সমস্যা—

জুনাগড় কয়েকটি হিন্দুরাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হইলেও উহার নবাব পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত করায় জুনাগড় রাজ্যের প্রজারা একযোগে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে প্রজামণ্ডলী নবাবের প্রাসাদ ও তাহার চারিদিকের বহু গ্রাম দখল করিয়া আর একজন নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছে। নবাব সপরিবারে করাচীতে পলায়ন করিয়াছে। পাকিস্থানী সৈন্যরা এখনও সিন্ধু সীমান্তে আসিয়া জুনাগড়ে অশান্তি সৃষ্টির হুমকী দিতেছে। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় প্রভৃতি রাজ্যের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সমস্যা লইয়া পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে ও উহা ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী—

এই নভেম্বর মাসেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়া এক বৎসর কাল চলিবে। আজ স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতার কথা দেশের সর্ব্বত্র আলোচিত হওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস, গ্রামে গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি-আন্দোলনের কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল—

গত ৩১শে অক্টোবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার পেটেলের ৭২তম জন্মদিনের উৎসব ভারতের সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছে। সর্দ্দারজীর মত কর্ম্মীর সংখ্যা ভারতে খুবই কম। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার পেটেল যে ভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত করিতেছেন, তাহা অভিনব ও অসাধারণ।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি ডক্টর মেঘনাদ সাহা ফরাসী দেশে আন্তর্জাতিক আণবিক সম্মিলনে যোগদানের জন্য গত ৩রা নভেম্বর প্যারিস গিয়াছেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন সেই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবেন। অধ্যাপক সাহা সম্মিলনের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিদর্শন করিয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন

দুর্নীতি দমন চেষ্টা—

পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে দুর্নীতি দূর করিবার উপায় নির্ণয়ের জন্য মিঃ আর-এস-কৃষ্ণস্বামী আই-সি-এসকে এক বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ কৃষ্ণস্বামী এ বিষয়ে অনুসন্ধান

করিয়া প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। দেশ হইতে দুর্নীতি দূর না হইলে দেশবাসীকে রক্ষার এখন আর অন্য উপায় নাই।

ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা জেলার খ্যাতনামা দেশসেবক ডাঃ শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই নভেম্বর ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি নিখিল ভারত মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট এসোসিয়েসনেরও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার দ্বারা ২৪ পরগণা জেলাবাসীরা উপকৃত হইবেন।
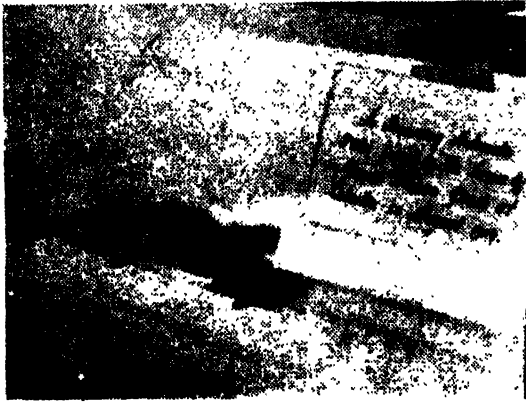
১৯১৪ সালে কলিকাতায় মুরারীমোহন ঘোষের গৃহে প্রাপ্ত কয়েকটি অটোমেটিক পিস্তল ফটো—শ্রীপান্না সেন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

২রা অক্টোবর এলাহাবাদের বিচারপতি বিধুভূষণ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আগামী বড়দিনের ছুটীতে ২৭শে ডিসেম্বর হইতে তিনদিন ধরিয়া এই সম্মিলনের ২৫ বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাইতে অনুষ্ঠান হইবে স্থির হয়। এসে-মাষ্টার শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মিত্র ও ব্যবসায়ী শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা) এর প্রস্তাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিবার জন্য ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ তারাচাঁদকে অনুরোধ করা হয় এবং এই অধ্যাপক পদের ব্যবস্থার জন্য বিচারপতি মল্লিক মহাশয় ও ইণ্ডিয়া প্রেসের শ্রীযুক্ত হরিকেশব ঘোষ মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

বিস্কুটের অভাব—

গত কয়েক মাস যাবৎ কলিকাতায় বিস্কুটের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় যে বিস্কুটের পাউণ্ড এক টাকা ছিল, এখন চোরা বাজারে তাহা তিন টাকা পাউণ্ড দরে বিক্রীত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের বহু বিস্কুটের কারখানা আটার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে বহু সহস্র শ্রমিক বেকার হইয়াছে। দরিদ্র শ্রমিক-গণ চায়ের সহিত বিস্কুট খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিত, তাহার কোন উপায় নাই। যে ভাবে সরকার আটা সরবরাহ করেন, তাহারও প্রশংসা করা যায় না। আমরা এ বিষয়ে সরকারী সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, এখন বাজারে আটা আসিয়াছে, কাজেই কর্তৃপক্ষ বিস্কুটের জন্য বাঙ্গালা দেশে উপযুক্ত আটা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া বাজার হইতে বিস্কুটের অভাব দূর করিবেন ও যাহাতে বিস্কুটের ব্যবসায়ে চোরাবাজার না চলে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।
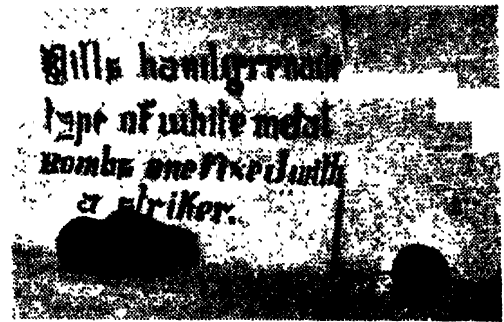
পুলিসের হেপাজাতে স্থিত কয়েকটি হাত বোমা ফটো—শ্রীপান্না সেন

ত্রিপুরা ছাত্র ও সংস্কৃতি সম্মিলন—

গত ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট কুমিল্লা মহেশ প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা জেলা ছাত্রসম্মিলন ও সংস্কৃতি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ছাত্রসম্মিলনে এবং খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল সংস্কৃতি সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্ত্তী ছাত্রসম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও ছাত্র-নেতা শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন

গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ তাঁহার ভাষণে ছাত্রগণকে মাতৃভূমির সেবায় ও গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার জন্ম সংঘবদ্ধ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কলিকাতার অতিথিদিগকে নিকটবর্তী দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পুলিশের নিকট গচ্ছিত দুই প্রকারের রিভলবার ফটো—শ্রীপান্না সেন

রেশনে খাদ্য পরিমাণ বৃদ্ধি—

পশ্চিম বঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে আগামী ২৪শে নভেম্বর হইতে সাপ্তাহিক রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২ সের ৩ ছটাকের স্থানে ২ সের ১০ ছটাক করিবেন। মধ্যে রেশন খাদ্য কমাইয়া ১ সের ১২ ছটাক করায় লোকের অসুবিধার শেষ ছিল না। যাহাতে ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য স্থায়ীভাবে প্রদত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে লোক উপকৃত হইবে।
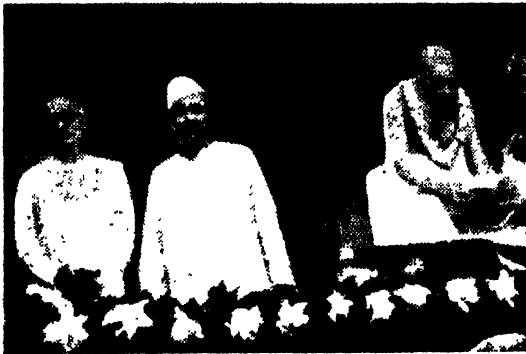
গড়ের মাঠে শান্তি সেনাবাহিনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গান্ধীজয়ন্তীর সভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ফটো—শ্রীপান্না সেন

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ সৃষ্টি—

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তপ্রাদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাশীতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ বাঙ্গালীর বাস। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম-এ পর্য্যন্ত পাঠ ও পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্ম নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি বহুদিন যাবত চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার রাধাকিষণ স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা যদি এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন তাহা হইলে স্যার রাধাকিষণ আর এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিয়া ৪০০-৭০০৲ মাসিক মাহিনার একটি বাঙ্গালার অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করিবেন। যদি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার হইতে লক্ষ টাকা প্রদান করেন উক্ত অধ্যাপক পদটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে "রবীন্দ্র অধ্যাপক" রাখা হইবে। এই পদটির জন্ম লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালার মর্য্যাদাই বৃদ্ধি পাইবে।

আরিয়াদহে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—

আরিয়াদহ (২৪পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের উদ্যোগে সম্প্রতি ভাণ্ডার ভবনেই একটি মাতৃ মঙ্গল প্রতিষ্ঠান

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার মাতৃমঙ্গলের ভিত্তিস্থাপন

নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিমুক্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন ও মেজর জেনারেল ডাঃ অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে মাতৃ-

মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের অভাব অত্যন্ত অধিক এবং অনাথ ভাণ্ডারের প্রাণস্বরূপ খ্যাতনামা কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া সে অভাব দূর করার ব্যবস্থা করায় গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যারম্ভ হইবে। অনাথ ভাণ্ডারের বিবিধ

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার মাতৃমঙ্গলের ভিত্তিস্থাপন উৎসব উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণ

কার্য্যের কথা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সুবিদিত। এ বিষয়ে সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে কালে অনাথ ভাণ্ডার ঐ অঞ্চলের বহু অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী—

স্বামী বিবেকানন্দের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হ'লে এক বিরাট জন-সভায় পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন—দৈনিক এক পোয়া চাউল ও আটা যাহারা পায় তাহাদের কষ্ট আমার অজানা নয়। তাহাদের মুখে অন্ন পৌছাইয়া দিতে হইবে। আমাই ব্রহ্ম একথা বলার সময় আজ আসিয়াছে।

যদি তাহা করিতে পারি—নিরন্ন দেশবাসীর দুঃখ যদি মোচন করিতে পারি তবেই স্বামীজীর আদর্শ পালন করা হইবে। অশিক্ষিতদিগকে যদি শিক্ষিত করিতে পারি, চিকিৎসার অভাবে যাহারা মরিয়া যাইতেছে তাহাদিগকে যদি বাঁচাইতে পারি তবে তাহাই হইবে স্বামী বিবেকানন্দের বড় স্মৃতি-মন্দির। স্বামীজীর আদর্শ পালন করিলে তবে দেশে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ২ শত বৎসরের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল হইতে দেশ এখনো মুক্ত হয় নাই। তাহা করিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের পদাংক অনুসরণ করিতে হইবে। মানুষের জন্য সত্যকার দরদ যদি আমাদের হৃদয়কে সিক্ত করে তাহা হইলে স্বামীজীর জন্মদিনে এখানে উপস্থিতি সার্থক হইবে।

আলিপুর আদালতে নেতাজীর প্রতিকৃতি—

আলিপুর জেলা জজের আদালত কক্ষে 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। প্রতিকৃতির দুই পার্শ্বে ভারতীয় ইউনিয়নের দুটি পতাকা ...

জেলা জজ শ্রীযুক্ত এস্-এন-গুহরায় আই-সি-এস প্রতিকৃতির আবরণ মোচন করেন। প্রতিকৃতিটি বার এসোসিয়েশনের জুনিয়ার সদস্যগণের সমিতি 'দ ইয়ার্স কর্ণার' কর্তৃক প্রদত্ত হয়। আলিপুর বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত পি-এন ব্রহ্ম বক্তৃতা প্রসঙ্গে আলিপুরে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ ও স্বাধীনতার অন্যান্য পূজারীগণের বিচারের উল্লেখ করেন।

আর-ডব্লিউ-এ-সি—

গত বৎসর আগষ্টে কলিকাতায় যখন নরহত্যার বিভীষিকা চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিতেছিল তখন মানুষের সেই অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার পরিত্রাণের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য এম্বুলেন্স বাহিনী ছিল না। একদিকে লোকের পৈশাচিক উন্মাদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে সরকারী সাহায্যের ব্যর্থতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই সময় অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া দুর্দ্দমনীয় বাধার মাঝে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই বিভীষিকাময় দিনের মাঝেই রিলিফ ওয়েলফেয়ার এম্বুলেন্স কোর এর অভ্যুদয়। দ্রুত ইহা একটি অতি কার্য্যকরী য়্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে পরিণত হয়। আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠে একদল আত্মত্যাগী কর্ম্মী, যাহাদের নাম সমভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাই যখন নোয়াখালী হইতে আর্ত্তনাদ আসিল তখন সেই বধ্যভূমিতে আর-ডব্লিউ এ-সির প্রথম সরঞ্জাম ঔষধ ও পথ্য লইয়া দাঁড়াইল। সেখানে আর-ডব্লিউ-এ-সি স্বয়ং মহাত্মাজীর নির্দ্দেশেই কাজ করিয়াছিল এবং শুধুই সাতশত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান করে নাই, পলায়মান অজস্র আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে নানাভাবে সাহায্য করে। নোয়াখালী হইতে এই বাহিনী সুদূর অগম্য দ্বীপ সন্দ্বীপেও তাহার সাহায্য কেন্দ্রে দুঃস্থজনগণের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। তারপর যখন বিহারের শুভ্রাকাশ ভ্রাতৃ-বিরোধের কৃষ্ণ ছায়ায় পরিব্যাপ্ত হইল, তখন আর-ডব্লিউ-এ-সি কোন বিলম্ব না করিয়া দুঃস্থ প্রদেশের সাহায্যে একটা দল পাঠায়। এই দল অজস্র বাধা অগ্রাহ্য করিয়া যে সেবা কার্য্যের পরিচয় দেয় তাহার প্রশংসা করেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্ণেল মেহবুব। গত বৎসর অক্টোবরে ও এ বৎসরের মার্চ্চ মাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্যে আর-ডব্লিউ-এ-সি যথাযথ কার্য্য করে; তখন সঙ্গে ছিল সুগঠিত শক্তিশালী বাহিনী ও জনসাধারণের প্রভূত সাহায্য। হাঙ্গামা কালে যখন নানা প্রকার ব্যাধি ভীষণাকারে দেখা দেয় তখন আর-ডব্লিউ-এ-সি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তার প্রতিষেধক টিকা বা ইন্‌জেকসন দিবার ব্যবস্থা করে। চট্টগ্রামের ও চব্বিশ পরগণার বন্যায় আর-ডব্লিউ-এ-সির সাহায্য দানের ত্রুটি হয় নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনগণের সাহায্যে এই বাহিনী সুদূর পাঞ্জাবে একটি দল পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠানে সকলের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মল বসু—মহাত্মাজীর সেক্রেটারী, বাই আম্মা—বেলিয়াঘাটায় ইঁহার গৃহে মহাত্মাজী ছিলেন, ডাঃ দিনশা মেটা—গান্ধীজীর চিকিৎসক ফটো—তারক দাস ও পান্না সেন

কুমারী চিত্রা ঘোষ—

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর এস-কে-ঘোষ

মধ্যস্থলে কুমারী চিত্রা ঘোষ

মহাশয়ের কন্যা কুমারী চিত্রা ঘোষ এ বৎসর ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সকলের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ১৯৪৬ সালে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করিয়া এক বৎসরে ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—

বেঙ্গল কেমিক্যালের চীফ কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল ডিগ্রী

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এম-এস-সি পাশ করিবার কুড়ি বৎসর পরে ডক্টরেট উপাধি পাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে কারখানার নিত্যকর্মের অবসরে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণা করিয়া উচ্চ ডিগ্রী লাভ এই প্রথম উদাহরণ। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়। ইনি জার্মাণীতে না গিয়াই জার্মাণ ভাষায় এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যে, ইহার লিখিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'জার্মাণ প্রাইমার' সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও সুপরিচিত। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক। আমরা শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নিবাসী রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ সুরের পুত্র শ্রীমান বিমলকুমার সুর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবিমলকুমার সুর

হইতে কৃতিত্বের সহিত রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস্‌সি পাশ করিয়া কে-ই-এম বৃত্তি লাভ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালোর ইনিষ্টিটিউটের বায়ো-কেমিষ্ট্রি বিভাগে গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

শোক-সংবাদ

অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৯শে অক্টোবর রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পটুতা ছিল। মুদ্রাতত্ত্বের সম্পর্কে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা ও ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপি তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। জনহিতকর বহু কার্য্য ও বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

সি. ও হিন্দুমহাসভার হইয়া দুর্গতি নিবারণের জন্ত অনেক কাজ করিয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতার নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ছিলেন।
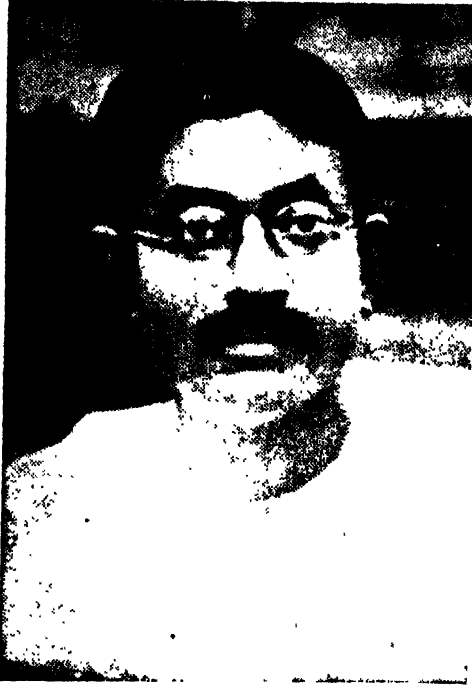
অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অম্বুজনাথ মজঃফরপুরের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৪০ বৎসর যাবৎ ইউরোপে বাস করিতে-ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি রুসিয়ায় ছিলেন। ১৯৪১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তথায় তিনি পরলোকগমন করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট বহু অনুসন্ধানের পর এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ সারা জীবন বিপ্লবী দেশ সেবক ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা—

স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা জননায়ক মনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতার পুত্র প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী চিত্তরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা গত ৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার ৭২ বৎসর বয়সে ২৪ পরগণা আড়িয়াদহ গ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের সময় তিনি পুলিস কর্ত্তৃক ভীষণভাবে নির্য্যাতীত হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ বসু—

কলিকাতার খেলাধুলা জগতে সর্ব্বজনপরিচিত ক্রীড়া-শিল্পী বৈদ্যনাথবসু সম্প্রতি মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থায় তিনি ১৯৩৬ সালে লাহোরে নিখিল ভারত অলিম্পিকে বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধিত্ব করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পর

বৈদ্যনাথ বসু

বোম্বাই, পাতিয়ালা, বাঙ্গালোর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথ বাঙ্গলার দলের নায়কত্ব করিয়া ও জয়লাভ করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন।

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—

বাঙ্গালার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গত ৮ই কার্ত্তিক রবিবার ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার হুগলী শ্রীরামপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি

প্রায় ৩৫ বৎসর কাল দেশ-সেবা করিয়াছেন ও বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। কিছুদিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মৃত্যুকালে বাঙ্গালার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়ের প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন।

পরলোকে মৃণালকান্তি ঘোষ—

অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ভক্তিভূষণ মৃণালকান্তি ঘোষ গত ২৪শে আশ্বিন শনিবার তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মৃণালকান্তি যৌবনের প্রারম্ভেই অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল উক্ত পত্রিকার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সূচনা হইতেই তিনি উহার অংশীদার ও ডিরেক্টর হন। ১৯৩৭ সালে তিনি আনন্দবাজারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবক মৃণালকান্তি শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী সম্পাদনা করিয়া অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ 'পরলোকের কথা' হিন্দি ও ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া বৃহত্তর সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোকপ্রিয় হইয়া আছে।

মণিকা মহলানবীশ—

প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের পত্নী মণিকা মহলানবীশ ৭০ বৎসর বয়সে কলিকাতা ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গত ২৮শে

মণিকা মহলানবীশ

অক্টোবর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্থ কন্যা ছিলেন ও বহু লোকহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

স্বপ্ন

শ্রীআরতি সেন

আমরা ইতর, আমরা চাষী
আমরা কামার, আমরা ছুতোর
আমরা মেথর, আমরা মুচী
যোগা শুধুই তোমার জুতোর ;
তোমার তরে আছে পাতা
এ দুনিয়ার ভোগ্য যত,
আমার তরে আছে গাঁথা
জীবনভরা দুঃখশত।
তোমার আছে সুখ,
তোমার আছে টাকা
অভাবের চিত্র কেবল
আমার ঘরে আঁকা,
নাই অন্ন, নাই বস্ত্র, নাই সুখ, নাই স্বাস্থ্য
সকলি দিয়েছি আমি তোমারে,
দেওয়ার চেয়ে নেওয়া বড়
সে কথাই তুমি বুঝাও আমারে।
জমিদারের জমি আর মহাজনের অর্থ
ধনীর আছে ধন তাই আমার জীবন ব্যর্থ,
তোমার বিদ্যা তোমার মান
সবই যে গো আমার দান—
ভোলো তোমরা কেমন করে
নিয়েছ সব হরণ করে,
আধপেটা খাই, তবু সান্ত্বনা পাই
স্বপ্নে দেখি এদিনের শেষ অদূরে।
তুমি যদি নাই কিছু করো
ভাঙতে পারবেনা বিধাতার বিধিরে।
ধৈর্য্য ধরি, সহ্য করি
ন্যায়ের কাছে অন্যায় হার মানবেই—
দীন দুনিয়ার মালিক সেদিন
আমার ব্যথা জানবেই।

স্বামী—সেই বাচাল শিল্পী আমার ছবি দেখতে অনুরোধ করেছে। তুমি আমার হ'য়ে শিল্পপ্রদর্শনীতে গেলে, আমি রেসে যেতে পাই। আজ আমার সব কয়টাই হট ফেভারিট।

স্ত্রী—রেসে যে সব ফেভারিটদের দেখতে চাও, তারা তো ফিরতি মুখে প্রদর্শনীতেই হাজির হবে। ভীড়ের মধ্যে সুবিধে খুঁজে নেওয়া কি তোমার নতুন কাজ?

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের নূতন গবর্ণর স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

ফটো—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

প্রথম খেলা ঃ

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ঃ ১৭১ (মানকাদ ৬৮ রানে ৫ উইকেট) ও ৭০ (৪ উইঃ).

ভারতীয় দল ঃ ১২৭ (মানকাদ ৫৭)

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটখেলারত ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের প্রথম খেলা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'ড্র' করেছে। এ খেলা হয়েছিল পার্থে। খেলাটি ১৭ই অক্টোবর থেকে ২০শে অক্টোবর এই চারদিন হ'বার কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টির জন্য খেলাটি বাধা পায় এবং নির্দ্ধারিত সময়ে খেলা শেষ না হয়ে মাত্র দেড় দিনের খেলার ফলাফলের উপরই অমীমাংসিত-ভাবে খেলা শেষ হয়েছে ব'লে ঘোষণা করা হয়।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ১০০ মিটার, সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী আরতী প্রথম, শ্রীমতী বরণা দ্বিতীয় এবং শ্রীমতী গীতা তৃতীয়

ফটো—জে-কে-সান্যাল

দ্বিতীয় খেলা ঃ (২৪শে অক্টোবর—২৮শে অক্টোবর)

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫১৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ২১৯ (৮ উইঃ ডিক্লে)

ভারতীয় দল ঃ ৪৫১ ও ২৩৫ (৫ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া একমাত্র বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড় পি-সেন

ফটো—জে-কে-সান্যাল

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এডিলেডে

২৪শে অক্টোবর খেলা আরম্ভ হয়। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যান। টসে জিতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলার শেষে ৩ উইকেটে ৩৭৯ রান উঠে। ঐদিন তিনজন খেলোয়াড় আর নিহাস, আর ক্রেগ যথাক্রমে ১৩৭ ও ১০০ রান করেন। ডন্ ব্র্যাডম্যান ১০২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ব্রজগোপাল বালক সংঘের নূতন খেলার মাঠে কলিকাতার মেয়র ফটো—জে-কে-সান্যাল

দ্বিতীয় দিনে ডন্ ব্র্যাডম্যানের জুটি খেলতে নামে। চতুর্থ উইকেট পড়ে গেল পূর্ব্বদিনের রানে মাত্র এক রান যোগ হবার পর। ব্র্যাডম্যানের জুটী হলেন রাইডিংস। দ্বিতীয় দিনের ১৮ মিনিট খেলায় ৪০০ রান হয়। ব্র্যাডম্যানের জুটী বেশ দ্রুত রান তুলতে লাগলো। এই সময়ে মানকাদের প্রথম ওভারের বলে ব্র্যাডম্যান ৪টে বাউণ্ডারী, ১টা স্কোয়ার কাট, ২টো ড্রাইভ এবং ১টা পুল ক'রে ১৫০ রান পূর্ণ করলো। ব্র্যাডম্যান খুব জোর ব্যাট চালিয়ে খেলতে থাকেন এবং তাঁর ১৫০ রান পূর্ণ হওয়ার দু' মিনিট পর ১৫৬ রানে মানকাদের বলে সারভাতের হাতে ধরা পড়লেন। তিনি ২২টা বাউণ্ডারী করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ব্র্যাডম্যান দলের ৮ উইকেটে ৫১৮ রানের উপর প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। মানকাদ ২৬ ওভার বলে ১২৭ রান দিয়ে ৪টে এবং সারভাতে ১৬ ওভার বলে ৮৩ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই ভাল হ'ল না। মাত্র ১ রানে ১ম উইঃ এবং ২ রানে ২য় উইকেট পড়ে গেল। ওপনিং ব্যাটসম্যান মানকাদ এবং পরে তাঁর জুটী হাজারে এই ভাঙনের মুখ রক্ষা করলেন। তাঁদের খেলা দর্শকদের খুবই আনন্দদায়ক হ'ল। প্রায় প্রতি মিনিটেই ভারতীয় দলের ১ রান ক'রে উঠতে লাগলো এবং এ গড়পড়তা দলের মোট ১৪৭ রান পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। নোবলেটের নতুন বলে খেলতে গিয়ে হাজারী রাইডিংসের হাতে নিজস্ব ৯৫ রানের মাথায় ধরা পড়ে আউট হ'লেন। তিনি ২ঘণ্টা ২৮মিঃ ব্যাট করেছিলেন এবং তাঁর রানে ১৩টা বাউণ্ডারী ছিল। দলের রান তখন ১৫৪। এর পর আবার এক ভাঙন দেখা দিল। কোন রান যোগ না হওয়ার পূর্ব্বেই মানকাদ নিজস্ব ৫৭ রানের মাথায় ও'নীলের বলে বোল্ড হ'লেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২২৪ রান উঠলো। লালা অমরনাথ ৩৮ ও সারভাতে ২ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের থেকে ২৯৪ রান পিছনে থেকে এবং হাতে মাত্র ৪টা উইকেট নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় দলের পূর্ব্বদিনের জুটী খেলতে নামলেন। মাঠে সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন ভারতীয় দল 'ফলো-অন' থেকে মাত্র অব্যাহতি পাবে না তার থেকেও আশাতীত ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাতে পারবে। অমরনাথ ও সারভাতের জুটী ভারতীয় দলের মুখ রক্ষা করলো। ঠিক লাঞ্চের পূর্ব্বের শেষ বলে রান ক'রে অমরনাথ তাঁর শতরান পূর্ণ করলেন। শতরান তুলতে তাঁর ২ ঘণ্টা ৯ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী ছিল ১১টা। ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যান-ক্রমপর্য্যালকায় ৩নং ব্যাটসম্যানের যে সমস্যা ছিল তিনি শতরান পূর্ণ ক'রে সে সমস্যার সমাধান করলেন। এখন ওপনিং ব্যাটসম্যান আবিষ্কার করতে পারলেনই অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সারভাতে এবার ক্রিকেট খেলায় বিশেষ অনুশীলন [illegible]

ভাঙ্গনের মুখে যেরূপ ধৈর্য্য সহযোগে তিনি অমরনাথের সঙ্গে খেলে জুটী রক্ষা ক'রে ৪৭ রান করেছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়। অমরনাথ নিজস্ব ১৪৪ রানে ষ্ট্যাম্পড হ'ন। তিনি ১৪টা বাউণ্ডারী করেন এবং ঐ রান তুলতে তিনি ৩ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন। সোহনীর ২৭ এবং সিএস নাইডুর ১৯ রান দলের পক্ষে খুবই কার্য্যকরী হয়েছিল। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৪৫১৯ রানে শেষ হয়। নোবলেট ৬৫ রানে ৩ উইকেট পান।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ১০১ রান করে। ক্রেগ ও ব্র্যাডম্যানকে পি সেন দক্ষতার সঙ্গে 'ষ্ট্যাম্পড আউট' করেন। নিহাস ৪৯ এবং হোমেল ১০ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট আউট থাকেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের ফিল্ডিং খুব উচ্চ শ্রেণীর হয়েছিল। ব্র্যাডম্যান ঠিক ঠিক জায়গায় খেলোয়াড় সাজিয়ে যেমন ভারতীয় খেলোয়াড়দের বেশীরান তুলতে দেননি তেমনি অপরদিকে অমরনাথের মাঠ সাজানোও ঐদিক থেকে যথেষ্ট কার্য্যকরী হয়েছিল।

খেলার চতুর্থ দিনে ব্র্যাডম্যান দলের ৮ উইকেটের ২১৯ রানের উপর লাঞ্চের সময় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করলেন। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন নোবলেট নট আউট ৫০, এর পরই নিহাসের ৪৯ রান। হাতে মাত্র ৩ ঘণ্টা সময় নিয়ে ২৮৭ রান তুলে খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে জয়লাভ করা নিশ্চয়ই খুব বড় আশা।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন মানকাদ এবং সোহনী। সূচনা মোটেই আশাপ্রদ হ'ল না। দলের মাত্র ১৩ রানের মাথায় সোহনী ২ রান ক'রে আউট হলেন। তার পর থেকেই ভাঙ্গন। একদিকে মানকাদ উইকেট রক্ষা ক'রে চলেছেন অপরদিকে তাঁর জুটীরা একে একে আউট হয়ে বিদায় নিচ্ছেন। এইভাবে মাত্র দলের মোট ৭০ রানে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। শেষে মানকাদের সঙ্গে জুটী হলেন স্বয়ং ক্যাপটেন লালা অমরনাথ। এরা দু'জনে চতুর্থ দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত নট আউট থেকে দলকে রক্ষা করলেন। মানকাদ ১১৬ এবং অমরনাথ ২৬ রান করে নট আউট থাকেন। ৫ উইকেটে দলের ২৩৫ রান উঠলে পরে খেলা বন্ধ হয়। আর ৫২ রান তুলতে পারলেই ভারতীয় দল জয়লাভ করতে পারতো। হাতে উইকেট ছিল কিন্তু সময় ছিল না। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ইলিয়াট শীল্ড বিজয়ী বিদ্যাসাগর কলেজ ফটো—জে-কে-সান্যাল

তৃতীয় খেলা: (৩০শে অক্টোবর—৩রা নভেম্বর)

ভারতীয় দল: ৪০৩ ও ২০৩

ভিক্টোরিয়া: ২৭৩ ও ১৩৮ (২ উইঃ)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম ভিক্টোরিয়া দলের চারদিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা এই প্রথম আরম্ভ করলো। খেলার সূচনা খুবই নৈরাশ্যজনক হ'ল। দলের কোন রান হবার আগেই মানকাদ, রঙ্গনেকার এবং হাজারে এই তিনজন নির্ভরশীল খেলোয়াড় আউট হলেন। সারভাতের সঙ্গে অমরনাথ জুটী হয়ে দলের ভাঙ্গনের পতিরোধ করলেন। তিনি সারাদিন ধরে ব্যাট ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ১৫৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। তাঁর সঙ্গে জুটী হয়ে প্রথমদিকে সারভাতে এবং শেষের দিকে

আমীর ইলাহী এবং সি এস নাইডু তাঁকে এবং দলকে রান তুলতে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ভারতীয় দলের ২৮৩ রান উঠে। অমরনাথ ১৮৭ এবং নাইডু ২২ রান করে ঐ দিনের মত নট আউট থাকে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলায় উভয় দলের ক্যাপটেনদ্বয়ের করমর্দন
ফটো—জে-কে-সান্যাল

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অমরনাথ ও নাইডুর জুটী ভেঙে গেল যখন নাইডু নিজস্ব ৫৮ রান ক'রে দলের ৩৭২ রানের মাথায় আউট হলেন। নাইডু তিনটে বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী করেন। মোট দু'ঘণ্টা নাইডু ও অমরনাথের জুটী খেলে দলের জন্য ১৫৩ রান তুলে দেন। এরপর ব্রহ্মচারী জুটী হ'লেন অমরনাথের সঙ্গে; কিন্তু কোন রান না করেই আউট হলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে ৩৮৩ রান উঠেছে, অমরনাথ ২১৬ এবং ইরানী ৪ রান করে নট আউট। লাঞ্চের পর রান খুব ধীরে উঠতে লাগলো। ৩৮৪ মিনিট খেলার পর ভারতীয় দলের ৪০০ রান উঠল। ইরানী দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হ'লে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৪০৩ রানে শেষ হয়ে যায়। ইরানী ২১ রান করেন আধ ঘণ্টার খেলায়। অমরনাথের নট আউট ২২৮ রান এই ইনিংসের খেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে মেলবোর্ণ মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় যে সব খেলোয়াড়ের ক্রীড়াচাতুর্য্য স্মরণীয় হয়ে আছে অমরনাথের এই নট আউট ২২৮ রান তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। এই রান নিয়ে তিনটে ইনিংসের খেলায় যোগদান ক'রে অমরনাথ মোট ৪৬৬ রান করেন, তার মধ্যে মাত্র একবার আউট হ'ন। আলোচ্য খেলায় জনষ্টোন ৫৬ রানে ৩ এবং ইয়ান জনসন ১০৮ রানে ৪টে উইকেট পান।

ভিক্টোরিয়া দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হ'ল না কিন্তু পরে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলেন হার্ভে এবং লক্সটোন। তাঁরা যথাক্রমে ৮৭ ও ৭৭ রান করে আউট হলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা বন্ধ হ'লে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ৬ উইকেটে ২০৮ রান উঠেছে।

খেলার তৃতীয় দিনে ভিক্টোরিয়া দলের প্রথম ইনিংস ২৭৩ রানে শেষ হ'ল। ঐদিন ফোদারগিলের ৫৪ রান উল্লেখযোগ্য। মানকাদ ৫৫ রানে ৪ উইকেট পান।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের খেলায় বিজয়ী ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাব
ফটো—জে কে সান্যাল

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যায় ভিক্টোরিয়া দলের থেকে ১৩০ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা বন্ধ হলে দেখা গেল ভারতীয় দল ৬ উইকেটে ১৭০ রান করেছে। মানকাদ ৪১ এবং অমরনাথ ১৬ রান করে আউট হ'ন। হাজারী ৭৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ঐদিন অমরনাথের ভুল বিবেচনার ফলে 'ব্যাটিং অর্ডার' ঠিক হয় নি; ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় দলকে ২টো উইকেট

হারাতে হয়েছিল। সরকারীভাবে জানা যায় ঐদিনের খেলায় ২১৫২১জন দর্শক উপস্থিত ছিল। টিকিট বিক্রী হয়েছিল ১৫৫৭ পাউণ্ডের।

খেলার চতুর্থ দনে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৩ রানে শেষ হয়। হাজারী ৮৩ রানে আউট হ'ন। জনষ্টোন ৪০ রানে এবং জনসন ৫৭ রানে ৩টে ক'রে উইকেট পান।

৩৩৪ রান পিছনে থেকে ভিক্টোরিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে। চা পানের সময় তাদের ২ উইকেটে ১৩৮ রান উঠে। চা পানের পর আর খেলা হয় না বৃষ্টির জন্য এবং খেলার উপযুক্ত আলোর অভাবে। হাসেট ৬৭ এবং লক্সটন ৩৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলাটি অমীমাংসিতভাবে পরিত্যক্ত হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটিতে কোন পক্ষে গোল না হওয়ায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ১৯৪১ এবং ১৯৪৫ সালের ফাইনালেও বাঙলা জয়ী হয়।

ইলিয়াট শীল্ড ফাইনালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ দল ফটো—জে-কে-সান্যাল

ফাইনালের আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল টুর্ণামেন্টের খেলোয়াড়গণ ফটো—জে-কে-সান্যাল

ফাইনাল খেলায় বাঙলা ১-০ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে তৃতীয়বার 'সন্তোষ ট্রফি' বিজয়ী হয়েছে।

১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ঃ

আগামী ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে যে অলিম্পিক খেলা হবে, তার জোর তোড়জোড় চলছে। মোট ৪৭টি দেশকে এই বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৭টি দেশ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে যোগদানের ইচ্ছা জানিয়েছে। এ পর্য্যন্ত জানা গেছে। ৪০০০ হাজার প্রতিযোগী যোগদান করবে। অবিশ্যি এই সংখ্যার আরও বেশী হবে কারণ অনেক দেশের অভিপ্রায় এখনও জানা যায়নি। পূর্ব্বের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিদের সংখ্যা এইরূপ ছিল :— ৩,৯৫৬—বার্লিন (১৯৩৬); আমষ্টারডাম (১৯২৮)—৩,৯০৫; প্যারিস (১৯২৪)—৩,৩৮৫; ইকহলম (১৯১২)—৩,২৮২; এন্টোয়ার্প

(১৯২০)—২,৭৪১ ; লণ্ডন (১৯০৮)—২,০৮২ ; লসএ্যাঞ্জেলস (১৯১২)—১,৭৯০ ; সেন্ট লুই (১৯০৪)—৫৯৫ ; এথেন্স (১৮৯৬)—৪৮৪ ; প্যারিস (১৯০০)—৪২৭।

মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু সংখ্যক যোগদান করবে এবং মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে আগামী বছর কয়েকটি নতুন খেলা থাকবে। তেরটি দেশ জানিয়েছে যে, তারা মেয়েদের খেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

১৯৪৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহন-বাগান ক্লাব ১-০ গোলে তাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারিয়ে সুদীর্ঘ ৩৬ বছর পর পুনরায় শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় ফুটবল দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ ক'রে ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে; আজ সুদীর্ঘ ৩৬ বছর পর স্বাধীন ভারতে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে তাদের এ শীল্ড বিজয় সেই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান ক্লাব ১৯২৩, ১৯৪০ এবং ১৯৪৫ সালের শীল্ড ফাইনালে উঠে পরাজিত হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম শীল্ড খেলার ফাইনালে উঠে ১৯৪২ সালে, কিন্তু তারা হেরে যায়। ১৯৪৩ সালে তারা প্রথম শীল্ড বিজয়ী হয়। এর পর ১৯৪৫ সালে ১-০ গোলে মোহনবাগানকে ফাইনাল খেলায় হারিয়ে দ্বিতীয়বার শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। সুতরাং এবারের মোহনবাগান ক্লাবের বিজয় পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ বলা যেতে পারে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উপর্য্যুপরি পাঁচবার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠে রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ক্লাব উপর্য্যুপরি এত অধিকবার শীল্ড ফাইনালে উঠতে সক্ষম হয় নি। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলাটি গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে হবার কথা ছিল কিন্তু এক-শ্রেণীর দর্শকদের গোলমালের দরুণ ঐদিন খেলা হয়নি, ১৫ই নভেম্বর বিশেষ পুলিস পাহারায় নির্ব্বিঘ্নে খেলা শেষ হয়েছে। ফাইনাল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটেই ভাল হয় নি। এ খেলাটি ১৯৪৫ সালের ফাইনাল খেলায় সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ঐ বছর এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলই খেলেছিল তবে এবার খেলার ফলাফল যা বিপরীত হ'ল। মোহনবাগান দলের রাইট আউট ডি রায়ের পাশ থেকে সেলিম গোলটি দেন। মোহনবাগান ক্লাব ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলেছে কিন্তু খেলার সমস্ত দিক বিচার ক'রে দর্শকবৃন্দ ফাইনাল খেলা দেখে মোটেই খুসী হ'তে পারেনি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "বাঙ্গলার প্রতাপ"—২৲
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত "ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান"—৩৲
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জাগ্রত যৌবন"—৩॥০
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সুর-সপ্তক"—২॥
শ্রীনীরোদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "পলাতক"—৪৲
শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত "ভবঘুরের ভিনদেশী বন্ধু"—১॥০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বর্ম্মা-ফেরত"—১৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "তন্ত্রের আলো"—৪৲
আবদুর রহমান প্রণীত "মানুষের মানচিত্র"—১৲
শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী প্রণীত "মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র" (১ম ভাগ)—২৲
শ্রীহরিনাথ কাব্যতীর্থ প্রণীত উপন্যাস "আমার নাটক"—২॥০
শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত "রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান"—৸০
সমরেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "বহ্নি-কণা"—১৲
শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মনোতোষিণী"—২৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ভোগবতী"—৩৲
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "খতিয়ান"—২॥০
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "রাজপথ"—২৲
শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী প্রণীত "স্বাধীন ভারতের জন্মপত্রিকা"—৸৴০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশতৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

হিমানী * কলিকাতা

বই-ই উপহারের শ্রেষ্ঠ উপকরণ
ছোটদের জন্যে শ্রেষ্ঠ
সুকুমার রায়
আবোল-তাবোল ২৸৹
হ-য-ব-র-ল ২৲
পাগলা দাশু ২৷৹
ঝালাপালা ২৲
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আপন কথা ৩৲
রাজকাহিনী ২৸৹
শকুন্তলা ২৲
ক্ষীরের পুতুল ১৸৹
লীলা মজুমদার
দিন-দুপুরে ২৷৹
পদিপিশির বর্মিবাক্স ২৷৹
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কায়াহীনের কাহিনী ২৷৹
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আম আঁটির ভেঁপু ২৷৹
অসকার ওয়াইল্ড
হাউই ২৷৹
অনুবাদক : বুদ্ধদেব বসু
এরিখ মারিয়া রেমার্ক
অল্ কোয়ায়েট ২৷৹
অনুবাদক : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
যে বাড়িতে বই নেই সে বাড়ি
জানলাহীন বন্ধ ঘরের সামিল।
চারদিকে বই দেখতে দেখতেই
ছেলেমেয়েরা পড়তে শেখে।
আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের
মনে জ্ঞানের পিপাসা জাগে।
বড়দের জন্য অবশ্য-পাঠ্য বই
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ৪৲
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
রুদ্ধকারার দিনগুলি ৩৲
কৃষ্ণা হাতিসিং
কোনো খেদ নাই ৪৲
জেম্‌স জিন্‌স্‌
বিশ্ব-রহস্য ৩৲
অনুবাদক : প্রমথনাথ সেনগুপ্ত
উপন্যাস ও গল্পের বই
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বেদে ৩৷৹
প্রথম প্রেম ৩৲
জননী জন্মভূমিশ্চ ২৷৹
বস্তনবিবি ২৷৹
নতুন তারা (নাটিকা) ২৷৹
প্রেমেন্দ্র মিত্র
কুয়াশা ২৷৹
পুতুল ও প্রতিমা ২৷৹
শচীন্দ্র মজুমদার
লীলামৃগয়া ৩৲
পলাতকা ৩৲
বিজন ভট্টাচার্য
জনপদ ৩৲
আধুনিক সোভিয়েট গল্প ৩৷৹
অনুবাদক : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ডি. এইচ. লরেন্স
লেডি চ্যাটার্লির প্রেম ৪৲
অনুবাদক : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
লরেন্সের গল্প ৩৷৹
সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র
সমারসেট মম্-এর গল্প ৩৲
সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র
পিরানদেল্লোর গল্প ৩৲
সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু
সিগনেট প্রেসের বই
তালিকার জন্যে চিঠি লিখুন
১০৷২ এলগিন রোড
কলিকাতা ২০

শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণে

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ২২৬০—৬২

আর, এম, গোস্বামী
চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট।

ডি, এম, মুখার্জি, এম. এল. এ.
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারত বিখ্যাত রাজবৈদ্য
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম. এ. আবিষ্কৃত

সোমরস

সর্বপ্রকার জ্বর, রক্তদুষ্টি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডু, কামলা, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও যকৃতের দোষ অজীর্ণ, পিত্তশূল ও হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি বহু-রোগনাশক মহৌষধ।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য পুস্তিকা চাহিয়া পাঠান।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন
১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন: বি. বি. ৪০৩৯

শ্রীসত্যেন প্রণীত

"ষ্টার গাইড"

('নবশক্তি', 'দীপালী', 'দৈনিক বসুমতী' কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত)
"বসুমতী"—"জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকও ইহা দ্বারা বহু বিষয় জানিতে পারিবেন"। মূল্য—।।০

নির্ভুল ঠিকুজী প্রস্তুতির পারিশ্রমিক ২।০
ইন্‌সিওরেন্স ঠিকুজী ১।০

জন্মস্থান, সময়, মাস, সাল, বারাদি প্রেরিতব্য।
গণিতবিদ্—শ্রীসত্যেন মুখোপাধ্যায়
কাশীমপুর, ৶কালীবাড়ী, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা

অসাধ্য সাধন

হাজার অচল, কঠিন বা পাষাণ হৃদয়ের যে কোনও লোকই হোক্ তাদের নির্ঘাৎ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনুগত ও জয় করিয়া অনায়াসেই স্বকার্য্য সাধনের অভিনব গুপ্ত কৌশল শাস্ত্রে নূতন নহে। পদ্মা (গভঃ রেজি) অতি সহজ ও সরল। চুক্তিতে কার্য্যভার নেওয়াই আমার বিশেষত্ব। রহস্যময় বিস্তারিত ষ্ট্যাম্পে জানুন।

Rev. O. Saine. Faridabad (B); Dacca.

শ্বেতকুষ্ঠ (LEUCODERMA) যাঁহাদের বিশ্বাস, এই রোগ সারে না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে একটি ছোট দাগ আরোগ্য করিয়া দিব, এজন্য মূল্য দিতে হয় না।

তৈল মালিশে ছুলি, মেচেতা, বসন্ত ও ব্রণাদির কুৎসিত দাগ মিলাইয়া চর্ম্মের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনে। মূল্য ১ আউন্স ১৲ টাকা।

পক্ষাঘাত অবশ, শুক-ফুলা ও বেদনাযুক্ত বাত, গেঁটেবাত, সায়াটিকা, কম্পন প্রভৃতি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধে সম্পূর্ণ নিরাময়। মূল্য ৩৸০।

একজিমা বা কাউরের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ—"বিচর্চ্চিকারী লেপ" ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য চুলকানির উপশম, সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য। মূল্য এক টাকা, নমুনা ছয় আনা মাত্র।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্ম্মরোগ চিকিৎসক—
পণ্ডিত এস, শর্ম্মা: (সময় ৩-৮) ২৩।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
পত্র দিবার ঠিকানা—পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

অলৌকিক দৈব চিকিৎসা

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা চরমে উঠিয়াছে সত্য কিন্তু কতগুলি কালব্যাধি বস্তুতই দৈব অনুগ্রহ ব্যতীত আরোগ্য হয় না; যেমন: *যক্ষ্মা বা রাজযক্ষ্মা—শত চিকিৎসায় ব্যর্থ যে কোন উপসর্গযুক্ত বা যে কোনও Stage-এর যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ যতই মারাত্মক হউক না কেন—এমন কি ডাক্তার-কবিরাজ-পরিত্যক্ত মুমূর্ষ রোগীরও প্রাণটুকুমাত্র থাকিলেই ৶কামাখ্যা মায়ের স্বপ্নাদ্য দৈব মহৌষধিকল্প (সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে সুপরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত) মহৌষধ ভক্তি বিশ্বাস সহকারে সেবনে ২১ দিনেই মন্ত্রবৎ সম্পূর্ণ ও স্থায়ী আরোগ্য হইবেই হইবে—গ্যারান্টি। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া ব্যর্থতা জানাইলে মূল্য ১৬৵০ (উৎকৃষ্ট স্বর্ণ ও মুক্তাভস্মযুক্ত ৩৬।০) ফেরৎ। কাল বিলম্ব না করিয়া আজই অর্ডার দিন।

ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচই অব্যর্থ

দুরারোগ্য ব্যাধি, গ্রহবৈগুণ্য, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, কর্মচ্যুতি বা কর্মহীন, নৈরাশ্য, প্রণয়ভঙ্গ, ক্ষতি, অপমান, মামলা, অকালমৃত্যু, বংশনাশ প্রভৃতি দূর করিতে দৈবশক্তিই একমাত্র উপায়। ১। নবগ্রহ কবচ দক্ষিণা ৫৲ ২। শনি কবচ ৩৲ ৩। ধনদা কবচ ৭৲ ৪। বগলামুখী কবচ ১৫ ৫। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ১৩৲ ৬। নৃসিংহ কবচ ১১৲। ৭। রাহু কবচ ৫৲ ৮। বশীকরণ কবচ ৭৲ ৯। সূর্য্য কবচ ৫৲। অর্ডারের সঙ্গে নাম, গোত্র, সম্ভব হইলে জন্মসময় বা রাশিচক্র পাঠাইবেন। ইহা ভিন্ন কোষ্ঠী ঠিকুজী, কোষ্ঠী গণনা ও প্রস্তুত হয়, যোটক বিচার, প্রশ্ন ও বর্ষফল গণনা, গ্রহশান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কার্য্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। পত্রে সবিশেষ জ্ঞাত হউন। ঠিকানা—অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।